শিল্পাচার্য শ্রীনন্দলাল বসু-কর্তৃক

ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস

(দ্বিতীয় খণ্ড)

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক : স্বামী আত্মানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ আগষ্ট ১৯৫৬
দ্বিতীয় সংস্করণ আগষ্ট ১৯৬১

প্রথমের ন্যায় দ্বিতীয় সংস্করণের বিক্রয়লব্ধ অর্থ কলিকাতা,
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পুস্তক-প্রচার-বিভাগে ব্যয়িত হবে।

গ্রন্থের বিষয়বস্তু এক হইতে বত্রিশ + ১—৫২৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত—মুদ্রাকর : শ্রীপ্রভাত চন্দ্র কর, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, (প্রাইভেট) লিমিটেড, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯ এবং টাইটেল পেজ + দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা—মুদ্রাকর শ্রীযোগেশ চন্দ্র সরখেল, কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস (প্রাইভেট লিমিটেড), ৯, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা-৯ হইতে।

॥ দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা ॥

"ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস" দ্বিতীয় ভাগ 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' দ্বিতীয় ভাগের নবরূপায়ণ রূপে প্রকাশিত হোল পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ "ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস" প্রথম ভাগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। সুপ্রাচীন আদিম যুগ (primitive period) থেকে প্রাগৈতিহাসিক, বৈদিক ও ক্ল্যাসিক্যাল যুগের সঙ্গীতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের রূপ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে ধারাবাহিক প্রমাণপঞ্জীর নিদর্শন নিয়ে প্রকাশিত হল। আদিম যুগ থেকে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত ভারতীয় সঙ্গীতের ধারা এই দুটি খণ্ডে প্রকাশিত এবং তৃতীয় খণ্ডে থাকবে খ্রীষ্টীয় অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ভারতীয় সঙ্গীতের ঐতিহাসিক উপাদান। সঙ্গীতের সঙ্গে ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতার অগ্রগতির ইতিকথাও গ্রন্থ-দুটিতে স্থান পেয়েছে এজন্য যে, ভারতের সামাজিক শ্রীসম্পন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির অপরিহার্য উপাদান সঙ্গীত। সমাজের বুদ্ধি ও বোধির সবিশেষ সমুন্নতি না হলে কখনই সংস্কৃতির মাধুর্যময় সম্পদ সঙ্গীত, সাহিত্য, কাব্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, চিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, দর্শন প্রভৃতির স্বাস্থ্যময় ও কমনীয় রূপের সৃষ্টি হতে পারে না। সঙ্গীত-সংস্কৃতির সঙ্গে তাই ললিতকলা চিত্র, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের বিকাশবৈচিত্র্যের ধারা এবং প্রকৃতি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতিসম্পন্ন শিক্ষা ও সভ্যতার প্রাণবান রূপই সাহিত্য, সাঙ্গীতাদি, ললিতকলা, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি। সঙ্গীতের ক্রমবর্ধমান রূপের আলোচনায় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যান্য রূপদানের কিছু কিছু প্রসঙ্গ এ'গ্রন্থে স্থান পেয়েছে, সেজন্য কেউ যেন মনে না করেন সঙ্গীতের আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিকতার স্থান পেয়েছে অন্যান্য বিষয়ের অন্তর্নিবেশ ঘটিয়ে।

আশা করি প্রথম সংস্করণের মতো 'ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস' দ্বিতীয় ভাগ দ্বিতীয় সংস্করণের সমাদরও অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং ইতিহাসসেবী ছাত্র-ছাত্রী ও সঙ্গীতপ্রেমিকদের সহায়তা লাভ করবে। পরিশেষে বক্তব্য এই গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পুস্তক-প্রচার-বিভাগে ব্যয়িত হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬
আগষ্ট ১৯৬১

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

অনাগত ভবিষ্যতে ভারতীয় সঙ্গীতের যাঁরা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস
রচনা ক'রে ঐতিহ্যবাহী ভারতের সঙ্গীত-সংস্কৃতিকে
সমুজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ করবেন তাঁদেরই উদ্দেশ্যে
'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি'-র উত্তরভাগ
সমর্পিত হ'ল।

"Five Year Plan of Educational Development—Scheme No. 3 (b)—Publication of suitable literature".

Publication of 'SANGIT O SAMSKRITI'

(History of Indian Music)

The popular price of the books has been possible through the subvention received from the Government of India and the State Government of West Bengal under the above Scheme.

॥ প্রকাশকের নিবেদন ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-রচিত 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' ভারতীয় সঙ্গীতের ধারাবাহিক ইতিহাসের অনবদ্য দান। সঙ্গীতের ক্রমবিকাশের চাক্ষুষ পরিচয় দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। স্বামিজী আসলে দর্শনশাস্ত্রের ছাত্র। কিন্তু সঙ্গীতকে ইনি ভালোবাসেন ও সঙ্গীত-সাধনার সংস্কারও পেয়েছেন পূর্বাশ্রমের বংশধারা থেকে। ইনি নব্যন্যায়, বেদান্তদর্শন ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রের অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে সুদীর্ঘকাল সঙ্গীত শিক্ষা করেছেন স্বর্গীয় সঙ্গীতাচার্য অঘোরনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের শিষ্য ও শ্রদ্ধেয় গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সতীর্থ অন্ধগায়ক নিকুঞ্জবিহারী দত্ত, সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীর সুবিখ্যাত গায়ক হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (দেবনাথপুরা) প্রভৃতি কৃতবিদ্য ও স্বনামখ্যাত সঙ্গীতাচার্যদের কাছে। ধ্রুপদগানেরই প্রধানত ইনি একনিষ্ঠ পথচারী। এঁর সঙ্গীতের প্রথম শিক্ষা লাভ হয় অগ্রজ সঙ্গীতাচার্য শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। ইনি স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর কাছে খেয়ালও শিক্ষা করেন। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিভিন্ন সঙ্গীতশাস্ত্র ইনি অধ্যয়ন করেন এবং ভারতীয় সঙ্গীত ছাড়া পাশ্চাত্য সঙ্গীতগ্রন্থও যথেষ্টভাবে অনুশীলন করেছেন। ঔপপত্তিক ও ব্যবহারিক এই উভয় সঙ্গীতের বিচক্ষণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নিয়ে স্বামিজী ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস-প্রণয়নে ব্রতী হয়েছেন। এই বিষয়ের ইনি যে পথিকৃৎ সে'বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। স্বামিজীর রচিত 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি'-র প্রথম বা পূর্বভাগ ইংরাজী ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে নারদীশিক্ষার সময় (খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী) পর্যন্ত সঙ্গীতের ক্রমবিকাশের ইতিহাস পূর্বভাগে তিনি সুনিপুণভাবে আলোচনা করেছেন। বর্তমান খণ্ডটি তারই উত্তরভাগ—খৃষ্টপূর্ব ৬০০ থেকে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় সঙ্গীতের বিচিত্র বিকাশ ও বিবর্তনের চাক্ষুষ ও তুলনামূলক ইতিহাস। এ'দুটি গ্রন্থ (পূর্ব ও উত্তরভাগ) তাঁর বিরাট পরিকল্পনার প্রথম অর্ঘ্য। ভবিষ্যতে পরবর্তী যুগগুলির ইতিহাস রচনা করারও তাঁর একান্ত ইচ্ছা আছে। বর্তমানে সঙ্গীত-সাধনার জগতে নবজাগরণের সূচনা হয়েছে। ব্যবহারিক শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার বিজ্ঞানসম্মত ও ঐতিহাসিক আলোচনার একান্ত প্রয়োজন। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গীতের

অনুশীলন হ'লে তার সুষ্ঠু ও স্বাস্থ্যবান রূপ শুধু আমাদেরি দেশে নয়, বিশ্বের সকল নরনারীকে সৌন্দর্য-উপলব্ধির পথে নতুনভাবে প্রেরণা যোগাবে ব'লে আমরা বিশ্বাস করি।

পরিশেষে মহামান্য ভারত-সরকার ও প্রাদেশিক পশ্চিমবঙ্গ-সরকার এই সাংস্কৃতিক গ্রন্থটির মুদ্রণ ও প্রকাশের জন্য কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠকে যে অর্থ সাহায্য করেছেন তার জন্য মঠের কর্তৃপক্ষ তাঁদের কাছে চিরকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬
১৫ই আগষ্ট, ১৯৫৬

॥ ভূমিকা ॥

'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি'-র পূর্বভাগে খৃষ্টপূর্বাব্দ ৪০০০-৩৫০০ থেকে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী তথা প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুসভ্যতা থেকে নারদীশিক্ষা পর্যন্ত সঙ্গীতের বিচিত্র রূপ ও বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি। বর্তমান উত্তরভাগে খৃষ্টপূর্ব ৬০০ থেকে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী তথা ক্ল্যাসিক্যাল যুগের স্থচনা থেকে গুপ্তযুগ পর্যন্ত সঙ্গীতের ক্রমবিবর্তনের ইতিকাহিনীর পরিচয় দেবার প্রয়াস পেয়েছি। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস এতই বিরাট, বিপুল ও বিচিত্র যে এক একটি যুগের পরিধিকে অবলম্বন ক'রে এক একটি বা কয়েকটি বিশাল গ্রন্থ রচিত হ'তে পারে। তবে এ'কথাও ঠিক যে যথার্থভাবে সঙ্গীতের ইতিহাস রচনা করার সময় এখনো হয়নি। ইতিহাস অতীতের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির নিরপেক্ষ পরিচয় দেবার অগ্রদূত, কোন জিনিষই তার চোখে অবহেলার জিনিষ নয়। সঙ্গীতের ইতিহাস-রচনার ক্ষেত্রে দৈন্য ও বাঁধা এই যে, অসংখ্য প্রমাণপঞ্জী ও পাণ্ডুলিপি এখনো অপ্রকাশিত, মানুষের দৃষ্টিপথের অন্তরালে তারা একরকম অবহেলিত হ'য়ে এখনো পড়ে আছে। সকলগুলির প্রকাশ ও যথাযথ অনুশীলন না হ'লে ভারতীয় সঙ্গীতের সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনা করা কারু পক্ষে সম্ভব নয়। আমার এই প্রচেষ্টা সিন্ধু থেকে বিন্দু আহরণ করা, তবে পরিপূর্ণতারই দিকনির্দেশ মাত্র! তাই ত্রুটি-বিচ্যুত থাকবে পদেপদে এর অগ্রগতিতে!

ভারতীয় সঙ্গীতের ধারাবাহিক ইতিহাসের পরিচয় দেওয়াই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। গ্রন্থের নাম 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' দিয়েছি এ'জন্য যে ললিতকলা হিসাবে সঙ্গীত ভারতীয় সংস্কৃতির একটি অমূল্য অবদান। সংস্কৃতির আলোক-বর্তিকাই মানুষকে অজ্ঞানান্ধকারে পথ দেখাতে সাহায্য করে। সঙ্গীত মানুষের সকল-কিছু দুঃখ, কষ্ট ও বেদনার মালিন্যকে অপসারিত করে তার সুরের অপরূপ লাবণ্য বা রঞ্জনাশক্তি দিয়ে। রাগের অনবদ্য অঞ্জলি সাজিয়ে সে হৃদয়দেবতার ও বিশ্বপিতার করে অর্চনা, তাতে পার্থিব ও অপার্থিব উভয় শান্তিধারাই হয় উৎসারিত। সঙ্গীতের শ্রুতি, স্বর, স্বরনক্সা তথা ঠাট্ বা মেল, অংশ, গ্রহ, ন্যাস, স্বর, রাগ ও অলংকার প্রভৃতির অভ্যুদয়-কাল ও পুরাতনের বুকে নতুনের

বিকাশ ও বিবর্তন—শুধু এ'গুলির যথাযথ বিবরণ দেওয়াই সঙ্গীতের ইতিহাস নয়। সঙ্গীতের ইতিহাস চিরদিনই সরস, সচ্ছল, সাবলীল ও প্রাণবান। তাই নিরস গাণিতিক জন্মতারিখ, জিনিসের উত্থান-পতন ও পরিবর্তনের কাহিনীর অনুলিখনই সঙ্গীতের ইতিহাস নয়। মানুষের সমাজেই যখন সঙ্গীতের জন্ম, সামাজিক মানুষের নিরীক্ষাবৃত্তি, প্রতিভা ও গভীর অনুশীলনই যখন সঙ্গীতের সৌষ্টব ও সংগঠনকে গড়ে তুলেছে ও তোলে তখন সমাজকে কিংবা সমাজের মানুষকে বাদ দিয়ে কেবলই সাঙ্গীতিক মালমশলা দিয়ে ইতিহাসের প্রাসাদ রচনা করায় সত্যকারের কোন সার্থকতা আছে ব'লে মনে হয় না। প্রতিটি যুগে প্রতিটি মানুষ তার চেতনা—তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও অনুরাগের প্রেরণা দিয়ে সঙ্গীতের রূপ সৃষ্টি করেছে এই দুঃখ, বেদনা ও অশ্রুভরা পৃথিবীর মাটিতে বাস ক'রে,—এই কোলাহলপূর্ণ মানুষের সমাজের অঙ্গীভূত হ'য়ে। সমাজের উত্থান ও পতনের—সামাজিক মানুষের চিন্তাধারার বিচিত্র ব্যাহৃতি ও প্রগতির দ্বন্দ্বস্রোতের মাঝখানেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ-রূপে ভারতীয় সঙ্গীত জন্ম ও পরিপুষ্টি লাভ করেছে ধীরে ধীরে—সেই সুপ্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত। তাই সঙ্গীতের ইতিহাস-রচনার ক্ষেত্রে মানুষের সমাজকে কিংবা যুগে যুগে সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার সৃষ্টি-উন্মুখী চিন্তাধারা ও বিচিত্র অবদানকে বাদ দেওয়া যায় না। 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি'-র কাঠামো রচনায় তাই ভারতের বাস্তব ইতিহাসের কাহিনীকে আমি বাদ দিই নি, কেননা সকল বিষয়ক ইতিহাসের ধারা ও প্রকৃতি একই রকম—কেবল উপাদান বা বিষয়বস্তুতেই পার্থক্য। বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজ, রাজনীতি, সঙ্গীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য এই সকল বিষয়ের ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতি একই রকমের, একে অন্যের সঙ্গে পার্থক্য সৃষ্টি করে কেবল আলোচ্য বিষয়বস্তু বা উপাদানকে নিয়ে। তাই সাংস্কৃতিক পরিবেশের নির্মাল্য সাজিয়ে ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস রচনার চেষ্টা করেছি প্রচলিত ইতিহাসের ঘটনাপারম্পর্যকে অনুসরণ ক'রে। প্রতিটি যুগে প্রতিটি জাতি, রাজ্য, সমাজ, সংগঠন প্রভৃতির উত্থান-পতনে যে'ভাবে বিভিন্ন সামগ্রীর বিকাশ ও প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতেরও সৃষ্টি ও অনুশীলন হয়েছে তারই প্রত্যক্ষ কাহিনীর আলেখ্য রচনা করার চেষ্টা করেছি সেই সেই সময়ের প্রমাণপঞ্জী তথা গ্রন্থ, শিলালিখন ও তাম্রলিপি, ভাস্কর্যশিল্প, চিত্র ও ধ্বংসস্তূপ থেকে আবিষ্কৃত প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক বিভিন্ন সময়ের সামগ্রী বা উপাদান থেকে তথ্য সংগ্রহ ক'রে। কাজেই কেউ যেন না মনে করেন যে

জাতি ও বংশ-পরিচয়ের ইতিকাহিনী সঙ্গীতের আলোচনায় মধ্যে প্রাসঙ্গিকতার পথ অতিক্রম করেছে। বরং সঙ্গীতের খুঁটিনাটির বিবরণ দেবার চেষ্টা করেছি প্রামাণিকতার যতটুকু উপাদান সংগ্রহ করতে পেরেছি তারই ওপর ভিত্তি ক'রে।

'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' গ্রন্থের পূর্বভাগ ও উত্তরভাগ সম্পূর্ণ হ'ল প্রাচীন সঙ্গীতের তথা প্রাগৈতিহাস থেকে গুপ্তযুগ (খৃষ্টপূর্ব ৪০০০ কিংবা ৩৫০০ থেকে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী) পর্যন্ত সাঙ্গীতিক বিকাশের বিবরণ নিয়ে। পূর্বভাগে প্রধানত বৈদিক সাহিত্যগুলিকে নিয়েই আলোচনা করেছি ও সাঙ্গীতিক উপাদানের পরিচয় দিয়েছি সিন্ধু-সভ্যতার কাল থেকে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী বা নারদীশিক্ষার যুগ পর্যন্ত। উত্তরভাগে খৃষ্টপূর্ব ৬০০ শতক থেকে আরম্ভ ক'রে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর ভারতীয় সমাজে সঙ্গীত তথা নৃত্য, গীত ও বাদ্য এবং নাট্যের বিকাশ ও বিস্তৃতির পরিচয় দিয়েছি। গ্রন্থের পূর্বভাগের সঙ্গে সঙ্গতি ও যোগসূত্র রাখার জন্য উত্তরভাগে সংযোজিত হয়েছে একটি পূর্বানুবৃত্তি ও তাতে আলোচিত হয়েছে বৈদিক সমাজে সঙ্গীতের গঠন, বিবর্তন ও প্রকাশভঙ্গির কিছুটা চাক্ষুষ বিবরণ। গ্রন্থের সমগ্র আলোচনাতেই প্রায় তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও নিরপেক্ষতা রক্ষিত হয়েছে ও বিশেষ ক'রে পরবর্তী গ্রন্থালোচনার আলোক-বর্তিকায় পূর্ববর্তী সঙ্গীত-উপাদানগুলির নির্দিষ্ট রূপ ও প্রকাশভঙ্গির স্বরূপ হয়েছে নির্ণীত।

বিরাট বিপুল বৈচিত্র্যপূর্ণ এই ভারতীয় সঙ্গীতের অধিকাংশ উপাদান রয়েছে এখনো অপ্রকাশিত ও চারিদিকে ছড়ানো, আবার অনেকগুলি কালের কবলে হয়েছে বিনষ্ট। কাজেই সীমায়িত অভিজ্ঞতা ও উপাদান নিয়ে বিশাল বিস্তৃতির পরিচয় দেওয়ার সম্ভব নয়। অথচ সঙ্গীতানুশীলনের ক্ষেত্রে সঙ্গীতের কাব্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ব্যাকরণ, দর্শন, মনোবিজ্ঞান সব-কিছুরই জানার ও বোঝার একান্ত উপযোগিতা আছে। ঐতিহ্যবাহী সাধনাপ্রদীপ্ত আমাদের এই ভারতবর্ষ সংস্কৃতি ও সভ্যতার আদিভূমি! অসংখ্য ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'য়ে বৈদিক যুগ থেকে আজ-পর্যন্ত কত নিত্য-নতুনভাবে হয়েছে তার রূপায়ণ। আজও সে প্রাণবান ও গতিশীল। শুধুই মানুষের কেন, বিশ্বের প্রাণীমাত্রের হয়েছে সে শান্তি ও সান্ত্বনার সামগ্রী। তা'ছাড়া অতীতের প্রেরণা ও জয়যাত্রার উদ্দীপনা নিয়েই মানুষ বর্তমান কর্মক্ষেত্রে হয় অগ্রসর; বিগত দিনের গৌরব-কাহিনীই তার সুপ্ত শক্তিকে করে জাগ্রত ও অগ্রগতির

পথের দেয় সন্ধান। তাই সঙ্গীতের সাধক ও পথচারীমাত্রেরই অতীতের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত থাকা একান্ত প্রয়োজন।

পূর্বানুবৃত্তির কথা ছেড়ে দিলে 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি'-র উত্তরভাগের অভিযান শুরু হয়েছে খৃষ্টপূর্ব ৬০০ শতক থেকে—যেখানে বৈদিক যুগের সীমারেখা হয়েছে টানা। খৃষ্টপূর্ব ৬০০ থেকে ৫০০ শতকের মধ্যেই নবজন্ম লাভ করেছে গান্ধর্বসঙ্গীত। বৈদিক সঙ্গীতের উপাদান দিয়ে গান্ধর্বের কাঠামো তৈরী করেছেন ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাভরত-নামা জনৈক সঙ্গীতশাস্ত্রী। এই ব্রহ্মাভরতের 'ভরত' হ'ল উপাধি। আদি-নাট্যশাস্ত্রের রচয়িতা ও সম্ভবত নাট্য তথা অভিনয়-কুশলী ছিলেন ব'লে তাঁকে বলা হ'ত 'ভরত' বা ব্রহ্মাভরত (অনেকে ব্রহ্ম-ভরতও বলেন)। শাস্ত্রকার ও পুরাণকারেরা তাঁকে বিশ্বস্রষ্টার আসনও দিয়েছেন, আর তারি জন্য পরবর্তী সঙ্গীতশাস্ত্রীরা তাঁকে পদ্মভু, কমলজ দ্রুহিণব্রহ্মা প্রভৃতি আখ্যা দিতেও কসুর করেন নি। অবশ্য সঙ্গীত ও নাট্যশাস্ত্রী হিসাবে ব্রহ্মা ছিলেন একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। খৃষ্টীয় শতাব্দীর নাট্যশাস্ত্রকার 'মুনি' ভরত (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) সেই প্রাচীন ভরত (ব্রহ্মাভরত')-রচিত নাট্যশাস্ত্র থেকে উপাদান সংগ্রহ ক'রেই তাঁর নাট্যশাস্ত্র রচনা (সংকলন ?) করেছিলেন, আর তারি জন্য তাঁর নাট্যশাস্ত্র 'সংগ্রহ'-গ্রন্থ-রূপে আজও পরিচিত। ভরত নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখ করেছেন: "নাট্যশাস্ত্রং প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মণা যদুদাহৃতম্"। ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাভরত-রচিত আদি-নাট্যশাস্ত্রের নাম 'নাট্যবেদ': "শ্রূয়তাং নাট্যবেদস্য সংভবো ব্রহ্মনির্মিতম্"। সঙ্গীত ও নাট্যশাস্ত্রী ব্রহ্মা (দ্রুহিণ-ব্রহ্মা) চারবেদ থেকে সার সংগ্রহ ক'রে আদি-নাট্যশাস্ত্র বা নাট্যবেদ রচনা করেছিলেন: "নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতুর্বেদাঙ্গসংভবম্" (নাট্যশাস্ত্র ১।১৬)। সুতরাং সে'দিক থেকে ব্রহ্মা-রচিত নাট্যবেদও আদি-সংগ্রহগ্রন্থ। সেই নাট্যবেদ বা আদি-সংগ্রহগ্রন্থের নাম "ব্রহ্মভরতম্"। 'ব্রহ্মভরতম্' একটি অভিনয়ের গ্রন্থ, তাতে নাট্যের উপযোগী নৃত্য, গীত ও বাদ্য তথা সঙ্গীতের আলোচনা নিবদ্ধ ছিল। মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ-কবির কাছে 'ব্রহ্মাভরতম্' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির (নকল) কিছুটা অংশ (সঙ্গীতাংশ) নাকি রক্ষিত আছে। সেই সঙ্গীতের উপাদানকেই খৃষ্টীয় শতাব্দীর মুনি ভরত গ্রহণ করেছিলেন নাট্যাভিনয়ে প্রয়োগের জন্য। নাট্যশাস্ত্রী ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাভরত-রচিত 'ব্রহ্মাভরতম্' গ্রন্থটিকে বৈদিকগান তথা সামগানের পরবর্তী গান্ধর্বগানেরও গ্রন্থ (আসলে তা নাট্যগ্রন্থ, কিন্তু নাট্যোপযোগী সঙ্গীতের আলোচনাও তাতে ছিল) বলা যেতে পারে। গান্ধর্বগানে বৈদিকত্বের আভিজাত্য

ছিল এ'জন্য যে বৈদিক সামগানের মালমশলাই গান্ধর্বের কলেবরকে পরিপুষ্ট করেছিল। মুনি ভরত নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখ করেছেন : ঋগ্বেদ থেকে পাঠ্য (কথা বা সাহিত্য), সামবেদ থেকে গান (সুর তথা স্বর), যজুর্বেদ থেকে অভিনয় ও অথর্ববেদ থেকে রস সংগ্রহ ক'রে তিনি বৈদিকোত্তর 'ব্রহ্মভরতম্' নাট্যগ্রন্থটি রচনা করেছিলেন :

জগ্রাহ পাঠ্যমৃগ্বেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ।
যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসানাথর্বণাদপি ॥

তারি জন্য "চতুর্বেদাঙ্গসংভবম্" শব্দটির সার্থকতাও নিষ্পন্ন হয়েছে। ব্রহ্মা-ভরতের পর আর একজন নাট্যশাস্ত্রী সদাশিব 'ব্রহ্মভরতম্' গ্রন্থের অনুরূপ 'সদাশিবভরতম্' গ্রন্থ রচনা করেন। ব্রহ্মা ও সদাশিব এই নামানুসারে তাঁদের গ্রন্থের নামকরণও করা হয়েছিল দেখা যায়। শাস্ত্রী সদাশিবেরও উপাধি 'ভরত', আর তারি জন্য তাকে সদাশিবভরত আখ্যা দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী সঙ্গীত-শাস্ত্রীরা তাঁকে শিব-মহেশ্বরের গৌরব দিতেও কার্পণ্য করেন নি। মুনি ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রের প্রারম্ভ শ্লোকে ব্রহ্মার সঙ্গে সদাশিবেরও নামোল্লেখ করেছেন :

প্রণম্য শিরসা দেবৌ পিতামহমহেশ্বরৌ।

মোটকথা নাট্য ও সঙ্গীতশাস্ত্রী ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাভরত ও সদাশিব বা সদাশিবভরত বিশ্বের সৃষ্টি ও ধ্বংসের দেবতা নন, পৌরাণিকী দেবত্বারোপের ধারণা থেকে তাঁরা মুক্ত। তাঁরা ছিলেন ঐতিহাসিক ব্যক্তি।

তবে তাঁদের অভ্যুদয়-কাল নিয়ে মতদ্বৈততা কম নেই। এই গ্রন্থর প্রথম পরিচ্ছেদে (পৃঃ ৪৫-৪৮) শাস্ত্রী ব্রহ্মা ও সদাশিবের অভ্যুদয়-কাল আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৬০০ থেকে ৫০০ শতকের মধ্যে নির্ণয় করেছি ও সকল দিক দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করলে ঐ ধরণের নির্ধারণ বা সিদ্ধান্ত করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। তারপর তাঁরা নটসূত্রকার শিলালি ও কৃশাশ্বের পূর্ববর্তী অথবা পরবর্তী কিনা সে' সম্বন্ধেও গ্রন্থে কিছুটা আলোচনা করেছি।

'শিলপ্পধিকারম্' নামক তামিল নাটকটির রচনাকাল নির্ণয় করতে গিয়ে প্রথমে ডাঃ কৃষ্ণমাচারিয়ারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ("In the Tāmil epic *Silappadhikāram* now generally assigned not later the 4th century B.C., * *." — Vide *History of Classical Sanskrit Literature* [1937], p. 824) আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ-৩য় শতকে স্থির করেছিলাম ও তদনুযায়ী অষ্টাধ্যায়ীকার পাণিনি ও মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির

পরই সে'গ্রন্থ সম্বন্ধে সংক্ষেপে পরিচয় দিয়েছিলাম, কিন্তু পরে তার সঙ্গীতাংশের বিভিন্ন আলোচনা ও উপাদানের পরিচয়ভঙ্গি লক্ষ্য ক'রে আমাদের অনুমান যে অধিকাংশ গুণী 'শিলপ্পধিকারম্' গ্রন্থটির রচনাকাল খৃষ্টিয় ২য়-৩য় শতাব্দীতে নির্ধারণ করলেও তার আসল সময় নির্দিষ্ট হওয়া উচিত বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গের ঠিক পরে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর পরে কিংবা খৃষ্টীয় ৫ম ও ৭ম শতাব্দীর মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে এবং তদনুযায়ী বৃহদ্দেশীর আলোচনার পরই শিলপ্পধিকারমে সঙ্গীতাংশের কিছুটা পরিচয় দেবার পুনরায় চেষ্টা করেছি। বিচিত্র মতভেদের কুয়াশায় দিকভ্রান্ত হ'য়ে নতুন যাত্রীর পক্ষে পথভুল হওয়া কিছু বিচিত্র নয়, তাই এই ত্রুটির জন্য পাঠক-পাঠিকাদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি। এ'ছাড়া অপরাপর গ্রন্থকার, গ্রন্থ ও আলোচনার সন-তারিখ ও প্রমাণপঞ্জীর অকাট্য নির্ধারণের দাবীও আমি রাখিনি এ'জন্য যে, মতবাদ ও মতভেদ সকল জিনিসের ও সকল আলোচনার পিছনেই আছে ও থাকা স্বাভাবিক। তাই সকল-কিছুর সময় নির্ধারণ করেছি আনুমানিক সম্ভাব্যতার ওপর ভিত্তি ক'রে, আর আনুমানিকতার পরিমাপকে নিয়েই আমার ঐতিহাসিক আলোচনার যাত্রা শুরু ও সমাপ্ত হয়েছে।

গ্রন্থে বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়বস্তু থাকার জন্য সম্ভবত একই পাঠ, উদ্ধৃতি বা আলোচনার পুনরাবৃত্তি করতে বাধ্য হয়েছি। 'পূর্বে উক্ত' বা 'পূর্বে দেখ' সূত্রের অনুসরণ না ক'রে আমি বিষয়বস্তু অনুযায়ী একই জিনিসের পুনরায় আলোচনা করাকেই সুষ্ঠু রীতি ব'লে মনে করি। তা'ছাড়া খৃষ্টপূর্ব ও খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার সমাজের সঙ্গীতের-উপাদান ও আলোচনার সঙ্গে আমরা বিশেষ পরিচিত নই বল্লে অত্যুক্তি হয় না। অতীত পুরাতন উপাদান ও আলোচনা আমাদের কাছে একরকম দুর্বোধ্য ও obsolete হ'য়েই আছে। তাই প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্র ও সঙ্গীতের আলোচনায় পুনরাবৃত্তির পরিচয় দান অধিকাংশের কাছে দিকদর্শন ব'লে মনে হবে। সাতটি বা ছ'টি গ্রামরাগের প্রমাণশ্লোক, কুতপবিন্যাস, ঋক্, পাণিকা প্রভৃতি, ব্রহ্মগীতি, মূর্ছনা, শ্রুতি ও স্বরস্থান, চিত্রা ও বিপঞ্চীবীণা, মাগধী প্রভৃতি গীতি এ'ধরণের বিষয়বস্তুগুলিরই হয়তো পুনরাবৃত্তি ঘটেছে কিছু কিছু। কিন্তু আশা করি যে সে'গুলি প্রাসঙ্গিকতার গণ্ডী অতিক্রম করেনি কোথাও।

রামায়ণ, মহাভারত ও হরিবংশে সঙ্গীতের আলোচনা গান্ধর্ব বা মার্গ সঙ্গীতেরই অনুশীলন। রামায়ণ ও মহাভারত যে যুগে রচিত হয়েছিল (আনুমানিক ৪০০ এবং ৩০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ) সে'যুগের সে'রামও নাই, অযোধ্যাও নাই, কিংবা

কুরুপাণ্ডবদের রাজধানী হস্তিনাপুরও নাই। রামায়ণের রচয়িতা বাল্মিকী ও মহাভারত-হরিবংশের সংকলয়িতা বেদব্যাসও আজ আর নাই, কিন্তু আছে তাঁদের অমর লেখনীপ্রসূত রামায়ণ, মহাভারত ও হরিবংশের কীর্তিকাহিনী, আর আছে বৃহত্তর ভারতে জাভার মন্দিরগুলিতে—বরোবুদুরের প্রস্তর-প্রাচীরগাত্রে খোদাই করা বিশেষ ক'রে রামায়ণের জীবন্ত কাহিনী। আজও সেই প্রস্তর চিত্রগুলিতে রামায়ণগানের অমৃতবাহী সুরধারা যেন ঝঙ্কৃত। আজও সেই শিলাচিত্রগুলি সুদীর্ঘ বিগত দিনের রামায়ণগান ও নৃত্যের যেন সাক্ষ্য দান করছে। অতীতের জয়গাথা গানে যেন তারা আজিও মুখর ও গতিরুচ্ছল।

এইগ্রন্থে নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীতের আলোচনা সম্ভবত কিছুটা দীর্ঘস্থান অধিকার করেছে এবং করাও স্বাভাবিক। নাট্যপ্রয়োগের উদ্দেশ্যে নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত সঙ্গীত 'নাট্যগীতি' নামে পরিচিত হ'লেও ভারতীয় সঙ্গীতের তা মূল-উৎস ও আধার-স্বরূপ। মুনি ভরতের উল্লিখিত সঙ্গীতের উপাদান খৃষ্টপূর্বাব্দের সঙ্গীতশাস্ত্রী ব্রহ্মাভরতের প্রতিপাদিত উপাদানেরই প্রতিধ্বনি এবং ভরতোত্তর সঙ্গীতশাস্ত্রীরা সকলে নিঃসন্দেহে নাট্যশাস্ত্র-নির্দেশিত নাট্যসঙ্গীত ও নাট্যধারাকে অনুসরণ করেছেন বলা যায়। তবে যুগে যুগে কালস্রোতের বিবর্তনে পরিবর্ধন ও পরিবর্তন নাট্যে, সঙ্গীতে ও তাদের পদ্ধতিতে হয়েছে। ভরতের সময়ে (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) নাট্যপ্রয়োগে সঙ্গীত গান্ধর্বশ্রেণীভুক্ত হ'লেও তা ক্ল্যাসিক্যাল পর্যায়ের ছিল। বৈদিক যুগের সীমা অতিক্রম ক'রে সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে নিয়ে কালস্রোতের প্রবাহ যখন খৃষ্টপূর্ব ৬০০-৫০০ শতকের কোঠায় উপস্থিত হ'ল তখনি আরম্ভ হ'ল ক্ল্যাসিক্যাল যুগের অগ্রগতি। ঐতিহাসিকরা তাই ভারতবর্ষীয় সুবিস্তৃত কাল-পরিসরকে বৈদিক ও লৌকিক মোটামুটি দু'টি ভাগে ভাগ করেছেন। লৌকিক বিভাগই 'ক্ল্যাসিক্যাল'-নামে পরিচিত। ডাঃ কৃষ্ণমাচারিয়ার আরো সংক্ষেপে ও পরিস্ফুট ক'রে সংস্কৃত-সাহিত্যের বিভাগকে উপলক্ষ্য ক'রে সংস্কৃতি-বিভাগ সম্বন্ধে বলেছেন: "This history of the Sanskrit litrature divides itself into two great ages, Vaidika and Laukika—Sacred and Profane—Scriptural and Classical"। সঙ্গীতের বিষয়েও এই বিভাগ প্রযোজ্য। ভরতোত্তর অভিজাত দেশীসঙ্গীত তাই ক্ল্যাসিক্যাল শ্রেণীভুক্ত। শুধু ভরতোত্তর কেন, বর্তমান উচ্চাঙ্গ দেশীসঙ্গীতও ক্ল্যাসিক্যাল পর্যায়ভূক্ত, তা গান্ধর্ব বা মার্গ নয়। কাজেই ভরতোত্তর কেন, বর্তমান উচ্চাঙ্গ দেশীসঙ্গীতকে যে আমরা সচরাচর 'মার্গসঙ্গীত'

নামে অভিহিত করি, তা মোটেই ঠিক নয়। নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের পরবর্তী (অন্তত খৃষ্টীয় ১৭শ-১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত) সঙ্গীতশাস্ত্রী সকলেই একদিক দিয়ে ভরত-রচিত সঙ্গীতসূত্রেরই ভাষ্যকার ছিলেন।

নাট্যশাস্ত্রের শ্রুতি ও শ্রুতিস্থান নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। ভরত সমান আকারের দু'টি বীণা (ধ্রুববীণা ও চলবীণা) নিয়ে ষড়্জগ্রাম ও মধ্যমগ্রামের শ্রুতিসংখ্যা নির্ণয় করেছেন এবং স্বরসম্বাদ অনুসারে বিচার করলে সহজেই বোঝা যায় যে তিনি অন্ত্য তথা অন্তিম শ্রুতিতেই স্বরোস্থাপন (=স্বরস্থান নির্ণয়) করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন: "এবমনেন শ্রুতিদর্শনবিধানেন দ্বৈগ্রামিক্যো দ্বাবিংশাঃ শ্রুতয়ঃ প্রত্যবগন্তব্যাঃ। অত্র শ্লোকাঃ—ষড়্জশ্চতুঃ-শ্রুতির্জ্ঞেয় ঋষভস্ত্রিঃশ্রুতিঃ স্মৃতঃ" প্রভৃতি। তিনি ৪,৩,২,৪,৪,৩,২ ষড়্জাদি স্বরের শ্রুতিসংখ্যার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু নির্দিষ্ট স্বরস্থানের কোন কথা উল্লেখ করেন নি। রত্নাকরকার শার্ঙ্গদেবকে আমরা নাট্যশাস্ত্রের ভাষ্যকার হিসাবে গ্রহণ করতে পারি, কেননা নাট্যশাস্ত্রের বেশীর ভাগ সাঙ্গীতিক উপাদানকে তিনি আরো বর্ধিত ও সুপরিস্ফুটভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। শার্ঙ্গদেবও ভরতের মতো তুল্যপ্রমাণ দু'টি বীণায় শ্রুতির নির্ধারণ করেছেন। শার্ঙ্গদেব উল্লেখ করেছেন,

> দ্বে বীণে সদৃশৌ কার্যে যথা নাদঃ সমো ভবেৎ।
> তয়োর্দ্বাবিংশতিতন্ত্র্যঃ প্রত্যেকং তাসু চাদিমা॥
>
> *　　*　　*　　*
>
> স্বোপান্ত্যতন্ত্রীমানেয়াস্তস্যাং সপ্ত স্বরা বুধৈঃ।
>
> *　　*　　*　　*
>
> নমু শ্রুতিশ্চতুর্থাদিরস্বেবং স্বরকারণম্॥—প্রভৃতি

সিংহভূপাল টীকায় এ'সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন: "নিনু যস্যাং শ্রুতৌ স্বরঃ স্থাপ্যতে সা চতুর্থ্যাদিঃ শ্রুতিঃ। চতুর্থী সপ্তমী নবমী ত্রয়োদশী সপ্তদশী বিংশী দ্বাবিংশী চ শ্রুতিরভিব্যঞ্জকত্বেন পরিণামকত্বেন বা স্বরাণাং ষড়্জাদীনাং কারণমস্তু নাম * *"। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে শার্ঙ্গদেব পরিষ্কারভাবে বলেছেন ষড়্জাদি স্বর অন্ত্য শ্রুতিতে স্থাপন করা উচিত। ভরত এ'কথা উল্লেখ না করলেও ভরতের অন্ত্যশ্রুতিতে স্বরস্থাপন-রীতিকে আমরা ধরে নিতে পারি, কেননা শার্ঙ্গদেব বা শার্ঙ্গদেবের টীকাকাররা সকলেই অন্ত্যশ্রুতিতে স্বর-স্থাপনের কথা উল্লেখ করেছেন। মতঙ্গ অবশ্য "দ্বে বীণে তুল্যপ্রমাণে তন্ত্র্যুপপাদনং দণ্ডমূর্ছনা সমে

কৃত্বা" প্রভৃতি উপপাদন ভরতের মতোই উল্লেখ করেছেন। শার্ঙ্গদেব তাঁর বিশ্লেষণ-পদ্ধতির সুবিধার জন্য: বীণায় বাইশটি শ্রুতির জন্য বাইশটি তন্ত্রীর উপযোগিতা স্বীকার করেছেন: "তয়োর্দ্বাবিংশতিস্তন্ত্র্যঃ প্রত্যেকং তাসু * *" প্রভৃতি। শার্ঙ্গদেবের পরবর্তী শাস্ত্রীরা রত্নাকরের রীতিকে অনুসরণ করেছেন।

ভরতের পর কোহল, শাণ্ডিল্য, যাষ্টিক, শার্দূল, বিশ্বাবসু, বিশ্বাখিল, তুম্বুরু প্রভৃতি শাস্ত্রীদের অভ্যুদয়-কালের নির্ণয়-ব্যাপারে যথেষ্ট মতভেদ থাকলেও তাঁরা যে ভরতোত্তর নাট্যশাস্ত্রী ও সঙ্গীতাচার্য এ'বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পার্শ্বদেব, অভিনবগুপ্ত, নান্যদেব বা নান্যভূপাল, আঞ্জনেয়, সঙ্গীত-মকরন্দকার নারদ, রাজা ভোজ, সোমেশ্বর, সারদাতনয় প্রভৃতি গুণীরা খৃষ্টীয় ৭ম থেকে ১৩শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের নাট্য ও সঙ্গীতশাস্ত্রী। 'ভাবপ্রকাশ', রাজশেখর প্রণীত 'কাব্যমীমাংসা' প্রভৃতি গ্রন্থে নাট্যশাস্ত্রী ও বৃত্তিকার হিসাবে দ্রৌহিণির নাম উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্রৌহিণি নাকি সঙ্গীতকে পঞ্চমবেদ ব'লে উল্লেখ করেছেন: "বেদোপবেদাত্মা সার্ববর্ণিকঃ পঞ্চমো গেয়েবেদঃ ইতি দ্রৌহিণিঃ"। অনেকে খৃষ্টপূর্বাব্দের আদি-নাট্যশাস্ত্রী ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাভরতকেই দ্রৌহিণি আখ্যা দেন। ভরত ও ভরতোত্তর সকল শাস্ত্রীরাও 'ব্রহ্মভরতম্' নাট্যবেদ-প্রণেতা ব্রহ্মাকে 'দ্রুহিণ-ব্রহ্মা' ব'লে সম্বোধন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে দ্রৌহিণি ও দ্রুহিণ বা দ্রুহিণ-ব্রহ্মা এক ও অভিন্ন ব্যক্তি নন।

মৌর্য-চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের (খৃষ্টপূর্ব ৩০০) সময় সঙ্গীতের বিকাশ কি ধরণের ছিল তার পরিচয়ও সংক্ষেপে দেবার চেষ্টা করেছি। মৌর্য-চন্দ্রগুপ্তের সময়েই বিষ্ণুগুপ্ত বা কৌটিল্যের অভ্যুদয় হয়। সম্ভবত তিনি খৃষ্টপূর্ব ৩২১-২৯৬ শতকের মাঝামাঝি সময়ে 'অর্থশাস্ত্র' রচনা করেন,—অন্তত ডাঃ জে. এফ. ফ্লিটের তাই অভিমত ("The work accordingly claims to date from the period 321-296 B.C.")। শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্যামাশাস্ত্রী খৃষ্টপূর্ব ৩২১ থেকে ৩০০ শতকে অর্থশাস্ত্রের রচনাকাল নির্ণয় করেছেন ("From Indian epigraphical researches it is known beyond doubt that Chandragupta was made king in 321 B.C. and that Aśokavardhana ascended the throne in 296 B.C. It follows, therefore, that Kautilya lived and wrote his famous work, the Arthaśāstra, somewhere between 321 and 300 B.C.")। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সঙ্গীতশিল্পী ও বাদ্যযন্ত্র সম্বন্ধে কিছু বিধিনিষেধের উল্লেখ আছে। কৌটিল্য ২১শ

ও অফুরন্ত উৎসাহ যাঁরা আমায় দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে মাননীয় ডাঃ শ্রীধীরেন্দ্রমোহন সেন (সেক্রেটারী, শিক্ষাদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার) মহাশয়ের কথা। এই 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' গ্রন্থ-রচনার পিছনে তাঁর অজস্র প্রেরণা ও উৎসাহ-দানের কথা আমার অন্তরে চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে।

এর পর কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বামী ভবেশানন্দ মহারাজ, ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য, শ্রীমীরা মিত্র ও শ্রীউপেন্দ্রকুমার দত্ত, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়, বার-এ্যাট-ল প্রভৃতির উদ্দেশ্যে। শ্রদ্ধেয় শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় নানান্ ভাবে আমায় সাহায্য ও পরামর্শ দান ক'রে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন। স্বামী ভবেশানন্দ মহারাজের উৎসাহদান আমাকে এই গ্রন্থ-রচনার পথে অনুপ্রাণিত করেছে। ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্যের নানান্ প্রকারে ঐকান্তিকী সহায়তা ও উৎসাহদান এবং শ্রীমীরা মিত্র ও শ্রীউপেন্দ্রকুমার দত্তের বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য দান আমার উত্তরভাগ-রচনার পথকে সচ্ছল ও সুগম করেছে।

গ্রন্থের চিত্রসজ্জায় সহায়তা করেছেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার বসু, সুবিখ্যাত চিত্র ও রূপসজ্জাশিল্পী শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায় ও শ্রীবরেণ নিয়োগী। এণ্টালী সাংস্কৃতিক সম্মিলনের কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন রেখাচিত্রের কতকগুলি ব্লক দিয়ে সাহায্য করার জন্য তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। প্রতিভা-বান শিল্পী শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের ঋণ অপরিশোধ্য। এই গ্রন্থের প্রায় সকল রেখাচিত্রই তিনি অঙ্কন করেছেন এবং গ্রন্থের চিত্রসজ্জার সকল ভার গ্রহণ ক'রে ঐকান্তিকী চেষ্টা ও যত্নের দ্বারা গ্রন্থটিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন। প্রচ্ছদপদটির পরিকল্পনা এবং রূপায়ণও তাঁর। পরে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পুস্তক-প্রকাশনা-বিভাগকে (কলিকাতা) জানাই আমার কৃতজ্ঞতা, কেননা তাঁরাই পুস্তকটির প্রকাশ ও প্রচারের ভার গ্রহণ করেছেন। সুবিখ্যাত শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীবৃন্দের কাছেও আমি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। নানান্ অসুবিধার ভিতর দিয়ে যথাসময়ে এই গ্রন্থের মুদ্রণকার্য তাঁরা শেষ করেছেন সুনিপুণভাবে।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই সহৃদয় মহামান্য ভারত-সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের কাছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির অগ্রগতির কার্যে উৎসাহদানের জন্য তাঁরা কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠকে অর্থ সাহায্য করেছেন এই পুরোপুরি সংস্কৃতি ও শিক্ষামূলক গ্রন্থ 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি'-র মুদ্রণকার্যের জন্য। ঐতিহ্যবাহী ভারতের শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির তাঁরা ধারক, পরিপোষক ও উন্নতিবিধায়ক।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের কর্তৃপক্ষ তাঁদের সহানুভূতিসূচক দানের জন্য চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন।

পরিশেষে নিবেদন, এই গ্রন্থের মধ্যে নৃত্য, গীত, বাদ্য ও অভিনয় বিষয়ক আলোচনার সহায়ক রূপে চিত্রাবলীকে বিভিন্ন সময় অনুসারে ভাগ ক'রে গ্রন্থের শেষের দিকে সন্নিবেশিত হ'ল। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস রচনার বিরাট পরিকল্পনার মধ্যে 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি'-র পূর্বভাগ প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী পর্যন্ত ও উত্তরভাগ খৃষ্টপূর্ব ৬০০ শতক থেকে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী (গুপ্তযুগ) পর্যন্ত সঙ্গীতালোচনা দিয়ে আমার এই প্রথম অর্ঘ্য সমাপ্ত হ'ল।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬
১৫ই আগষ্ট, ১৯৫৬

প্রজ্ঞানানন্দ

॥ সূচীপত্র ॥

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

॥ মহাভারতের যুগ ॥

বিষয় পৃষ্ঠা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিষয় পৃষ্ঠা

॥ নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীত ॥

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

॥ শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকে সঙ্গীত ॥

॥ পঞ্চতন্ত্রে সঙ্গীত ॥

॥ মতঙ্গ ও বৃহদ্দেশী ॥

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

॥ মধ্য ও পূর্ব-এশিয়ায় ভারতীয় সঙ্গীত ॥ ... ৪৫০—৪৫৬

বিষয় পৃষ্ঠা

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সঙ্গীত ও সংস্কৃতি

(উত্তর ভাগ)

॥ পূর্বানুবৃত্তি ॥

॥ বৈদিক যুগ ॥
(৩০০০—৬০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ)

ভারতীয় সঙ্গীতের জয়যাত্রা ঠিক কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে তা নির্ণয় করা অতীব দুরূহ। তবে সুপ্রাচীন সিন্ধু-উপত্যকা তথা মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার ধ্বংসস্তূপ থেকে যে সব সঙ্গীতের উপাদান পাওয়া গেছে তা থেকে অনুমান করা যায় তখনকার সভ্য সমাজবাসীদের মধ্যে চারুকলা সঙ্গীতের চেতনা জাগ্রত ছিল; নৃত্য, গীত ও বাদ্যের তারা যথেষ্ট অনুরাগী ছিল। প্রাগ্বৈদিক তথা প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-উপত্যকার বয়স খৃষ্টপূর্ব ৩০০০—২৫০০। ইংরাজী ১৯২২ খৃষ্টাব্দে প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিন্ধু-উপত্যকার ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কার করেন। ১৯২২ থেকে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত খনন ও আবিষ্কারের কাজ চলতে থাকে। স্যর জন মার্শাল, রায়-বাহাদুর দয়ারাম সাহানী, আর্নেষ্ট ম্যাকে, রায়-বাহাদুর ননীগোপাল মজুমদার, রায়-বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ, রায়-বাহাদুর দীক্ষিত ও আরো অনেক বিচক্ষণ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা, ঝুকর বা চহ্নুদড়োর ধ্বংসস্তূপ থেকে প্রাগৈতিহাসিক ভারতীয় সভ্যতার বিচিত্র উপাদান আবিষ্কারে সহায়তা করেছেন। সঙ্গীতের উপাদানও কম পাওয়া যায় নি। পূর্বেই আলোচনা করা হ'য়েছে, সাতটি ছিদ্রযুক্ত একটি বাঁশী পাওয়া গেছে—যা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে সাতস্বরের বিকাশ তখন হয়েছে ও প্রাগৈতিহাসিক গানে সাতটি স্বরের ব্যবহার হ'ত। তন্ত্রীযুক্ত কয়েকটি বীণা (যে বীণার আকার বা অবয়ব অনেকটা আজকালকার রবাব বা স্বরোদের মতো দেখতে), মৃদঙ্গাদি চামড়ার বাদ্যযন্ত্র, খঞ্জনী বা করতাল, একটি ব্রোঞ্জের নৃত্যশীলা নারীর ও একটি নৃত্যরত নর্তকের ভগ্নমূর্তি পাওয়া গেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ও মনীষীরা বাদ্যযন্ত্রগুলির উল্লেখ ক'রে স্বীকার করেছেন সেই সুদূর

অতীত প্রাগৈতিহাসিক ভারতীয় সমাজে সঙ্গীতের অনুশীলন অব্যাহত ছিল। মাননীয় ষ্টুয়ার্ট পিগট সুপ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন দেখে বিস্মিত ও চমৎকৃত হয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন: আর্য-সঙ্গীতের চাক্ষুষ নিদর্শন আমরা পাই সিন্ধু-সভ্যতায়। নৃত্যের সঙ্গে করতালের সহযোগ থাকত। এ'ছাড়া ছিল মৃদঙ্গ, বেণু বা বাঁশী, তন্ত্রীযুক্ত বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র, হার্প বা লায়ার তথা রবাব-জাতীয় বাদ্যযন্ত্র, তাতে লীলায়িত হ'ত সাতটি স্বর।[১] রায়-বাহাদুর দীক্ষিত বলেছেন: নৃত্য ছাড়া কণ্ঠ-সঙ্গীতেরও যে অনুশীলন হ'ত সিন্ধু-উপত্যকার অধিবাসীদের ভেতর তা বেশ বোঝা যায়। তন্ত্রীযুক্ত বীণাদি ও চামড়ায় তৈরী মৃদঙ্গ-জাতীয় বাদ্য তো ছিলই। গান ও নাচের সঙ্গে তাল ও লয় রক্ষা করত বাদ্যযন্ত্রগুলি। ধ্বংসস্তূপ থেকে আবিষ্কৃত একটি মূর্তির গলায় একধরণের মৃদঙ্গ দেখা যায়। তাছাড়া দুটি শীলমোহরে আধুনিক ধরণের মৃদঙ্গের নিদর্শন পাওয়া যায়। সেই মৃদঙ্গের দুটি দিকই (মুখ) চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকত। কোন কোন শীলমোহরে অপরিণত আকারের হ'লেও অনেকটা বর্তমান কালের বীণার মতো এক প্রকার তন্ত্রীযুক্ত বাদ্যযন্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। করতাল-জাতীয় যুগল-বাদ্যযন্ত্রের প্রমাণও পাওয়া গেছে।[২] ডাঃ লক্ষণ-স্বরূপ উল্লেখ করেছেন: একটি শীলমোহরে স্পষ্টভাবে নৃত্যের প্রতিচ্ছবি খোদাই করা আছে। একজন বাদক একটি মৃদঙ্গ বাজাচ্চে, আর অন্য সকলে সেই মৃদঙ্গ-বাদ্যের তালে তালে নৃত্য করছে। হরপ্পার একটি শীলমোহরে পাওয়া গেছে—একটি বাঘের পাশে দাঁড়িয়ে একজন মৃদঙ্গ বাজাচ্ছে। আর একটি শীলমোহরে আছে একটি নৃত্যশীলা নারীমূর্তি। আর একটিতে দেখা যায় একজন পুরুষের গলায় একটি মৃদঙ্গ ঝোলানো আছে।[৩] রায়-বাহাদুর দয়ারাম সাহানী হরপ্পার ধ্বংসস্তূপ থেকে একটি ব্রোঞ্জের নারীমূর্তি আবিষ্কার করেছেন। নারীমূর্তি ভগ্ন। তার হাতে সারি সারি বড় বড় অলংকার (বালা) পরানো। নারী নৃত্যশীলা। স্যর জন মার্শাল, অর্নেষ্ট ম্যাকে-প্রমুখ প্রত্নতাত্ত্বিকেরা নারী-মূর্তিটিকে আদিম অধিবাসীদের শ্রেণীভুক্ত বলেন, কেননা মূর্তিটি দেখতে দক্ষিণ-বেলুচিস্তানের অধিবাসীদের মতো। নারীর বেশভূষা ও কেশ-পারিপাট্যও অনেকটা

১। Vide *Prehistoric India* (1950), p. 270.

২। Vide *Prehistoric Civilization of the Indus Valley* (Madras, 1939), p. 30.

৩। *The Rigveda and Mohenjo-daro* (published in Indian Culture, Vol. IV, Octo., 1937, No. 2, p. 153).

অনার্যোচিত। কিন্তু ব্রোঞ্জমূর্তিটিতে শিল্প-চাতুর্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। নৃত্যছন্দও মূর্তিটিতে সবল ও প্রাণবান। ডাঃ লক্ষণস্বরূপ ঐ নারীমূর্তি ছাড়া আর একটি নটমূর্তিরও পরিচয় দিয়েছেন। ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা গাঢ় পাংশুবর্ণ একটি পাথরের নটমূর্তির উল্লেখ করেছেন। নর্তক ডান পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর বাম পা সামনের দিকে উৎক্ষিপ্ত। কটিবন্ধ থেকে দেহের উপরিভাগ বামদিকে হেলানো ও ছুটি হাত একই দিকে প্রসারিত। মূর্তির ভঙ্গি ছন্দায়িত ও যেন জীবন্ত। মনে হয় মূর্তিটিতে তিনটি মুখ বা মস্তক ছিল। যৌবনোজ্জ্বল শিব-নটরাজের প্রতিচ্ছবিই তাতে সুস্পষ্ট।[৪]

খৃষ্টপূর্ব ২৫০০ বা ২০০০ অব্দে পাই ঋগ্বৈদিক সভ্যতার নিদর্শন। অবশ্য কেহ কেহ ঋগ্বৈদিক সভ্যতার কাল নির্ণয় করেন খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ১০০০ অব্দ। ঋকৃগুলিতে স্বর (প্রথমাদি বৈদিক স্বর) সংযোগ ক'রে গান করা হ'ত। গানের উপযোগী ঋকৃগুলিকে নিয়েই সামবেদ রূপায়িত। ঋগ্বেদের দশটি মণ্ডল বা বা অধ্যায়। প্রতিটি মণ্ডলে অনেকগুলি ক'রে সূক্তের সমাবেশ আছে ও সর্বশুদ্ধ ১০২৮টি সূক্ত দশটি মণ্ডলে স্থান পেয়েছে। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরাই ঐ সকল ঋকের রচয়িতা। অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, সোম, বিশ্বামিত্র, বামদেব, অত্রি, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি দেবতা ও ঋষিদের প্রশংসাসূচক মন্ত্রই আসলে 'ঋক্'। অষ্টম মণ্ডলে ৯২টি সূক্ত আছে। এ' মণ্ডলটিকে বিশেষভাবে 'প্রগাথ' বলা হয়। প্রকৃষ্টরূপে সূক্ত বা মন্ত্রগুলি গান করা হয় বলেই প্রগাথ বা প্রগাথা। কণ্ব ও অঙ্গিরাবংশের গায়কদের উদ্দেশ্যে এই সূক্ত বা গানগুলি রচিত। সুতরাং প্রগাথা তথা গাথা গানই। বৈদিক সাহিত্যের অনেক জায়গায় গান অর্থে গাথা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলটিতে ১১৪টি সূক্ত আছে। সেগুলি সোম-দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত। সোমলতা থেকে সোমরস আহরণ করার সময় সূক্তগুলি বৈদিক স্বরযোগে গান করা হ'ত। পরিশুদ্ধ সোমরসের নাম 'পবমান'। সোমরসের অধিপতি সোমদেব বা চন্দ্রদেবতা। সোম-পবমান বা সোমদেবতার উদ্দেশ্যেই প্রগাথা গান করা হ'ত। এই গানও বৈদিক যুগের গান তথা সামগান।

স্বরযুক্ত ঋক্ বা সামের সমষ্টিই সামবেদ। সামবেদ বা সাম-সংহিতা মোটামুটি দু'ভাগে বিভক্ত। (১) প্রথম ও ছোট ভাগটির নাম 'আর্চিক'। অধ্যাপক

৪। (ক) *Hindu Civilization* (2nd ed., 1950), p. 19 and (খ) *Mohenjo-daro and the Indus Valley Civilization* (in Indian Historical Quarterly, Vol. VIII, March, 1932, p. 143).

হুইট্নী বলেছেন ৫৮৫টি আর্চিকের সমষ্টি প্রথম ভাগে আছে। তাদের মধ্যে ৫৩৯টি আর্চিক বা ঋক্ ঋগ্বেদ থেকে নেওয়া। (২) সামবেদের দ্বিতীয় ভাগের নাম 'স্তৌভিক'। 'স্তোভ' অর্থে প্রশংসা করা, অর্থাৎ দেবতা ও ঋষিদের উদ্দেশ্যে প্রশংসাসূচক গানই স্তোভ। এ' ভাগটিতে ১২২৩টি সূক্ত আছে। এদের মধ্যে ৭৯৪টি সূক্ত ঋগ্বেদেই পাওয়া যায়। স্তৌভিকের কতকগুলি আবার আর্চিকের অন্তর্ভুক্ত। অনেকের মতে চার হাজার কেন, আট হাজার পর্যন্ত সামের সমাবেশ সামবেদে আছে ও সেগুলি পুরোপুরি ঋক্সংহিতা থেকেই নেওয়া। আউধ সংস্করণ সামবেদে পুনরাবৃত্তি নিয়ে প্রায় ১৬০৩টি মন্ত্রের সমাবেশ দেখা যায়; আর তাদের মধ্যে মাত্র ৯০টি সাম ঋক্-সংহিতার অন্তর্গত।

সামবেদকে আনুষ্ঠানিক বা যজ্ঞীয়-সংহিতাও বলা হয়। আগেই বলা হয়েছে সাম অর্থে স্বরযুক্ত ঋক্। একই সাম বিভিন্ন সূক্ত বা মন্ত্রগুলির ওপর প্রয়োগ ক'রে অথবা ভিন্ন ভিন্ন সাম একই মন্ত্রকে নিয়ে গান করা হ'ত। যে মন্ত্রগুলির ওপর সাম গাওয়া হ'ত তাদের 'যোনি' বা গানের কারণ তথা মূলগান বলা হয়। আর্চিক বা সামবেদে প্রায় ৫৮৫টি যোনির সমাবেশ থাকে। পূর্বার্চিক, আরণ্যক-সংহিতা ও উত্তরার্চিক এই তিনটি গান-ভাগকে নিয়ে সামবেদের কলেবর তথা পাঠভাগ পরিপুষ্ট। গ্রামগেয় বা গ্রামেগেয়, অরণ্যগেয় বা অরণ্যেগেয়, উহ্য ও উহ এই চারিটি গানভাগকে নিয়ে সামবেদের গাথা, গান বা সঙ্গীতাংশ রচিত।

পূর্বার্চিক কেবল গানের যোনি তথা মূলসূত্রের সমষ্টি। এক একটি যোনিকে নিয়ে এক একটি সামের রূপ সৃষ্টি হয়। পূর্বার্চিকের সামগুলি গ্রামেগেয় ও অরণ্যেগেয় এ'দুটি গানগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। পূর্বার্চিকের মন্ত্র, যোনি বা মূলগানকে প্রধান তিনভাগে বা কাণ্ডে ভাগ করা হয়েছে:

(১) ১— ১১৪টি যোনি অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে উৎসৃষ্ট,
(২) ১১৫—৪৬৬টি " ইন্দ্র " " "
(৩) ৪৬৭—৫৮৫টি " সোম-পবমানের " "

এ' তিনটি ভাগ বা কাণ্ডকে তাই বলা হয়েছে আগ্নেয়কাণ্ড, ঐন্দ্রকাণ্ড ও পবমান-কাণ্ড।[৫] কাণ্ডের অন্তর্গত যোনিগুলিই মূলগান। এই স্বরযুক্ত ঋক্গুলিকে নিয়ে অসংখ্য সামগান সৃষ্টি হয়েছে ও বিচিত্রভাবে তাদের গান করা হয়। তাই আচার্য সায়ন বলেছেন 'সহস্রং গীত্যুপায়াঃ'।

৫। প্রজ্ঞানানন্দ: 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' (১ম ভাগ), পৃ ৯২

উত্তরার্চিক প্রধানত ত্রিঋচ্ বা দ্বিঋচ্ (তিনটি বা দুটি ঋক্) নিয়ে রচিত। দ্বিঋচ্ বা দুটি ঋকের সমষ্টিকে বলা হয় 'প্রগাথ'। সাধারণত উত্তরার্চিকের প্রথম মন্ত্রের ত্রিঋচ্ পূর্বার্চিকের যে কোন একটি যোনির বা মূলগানের অন্তর্ভুক্ত দেখা যায়, আর যে পূর্বার্চিকের নির্দিষ্ট একটি যোনিতে যে সুর বা স্বরসমষ্টি থাকে তাকেই উত্তরার্চিকের অন্তর্ভুক্ত ত্রিঋচের অনুযায়ী গান করা হয়। কোন গানেই কোন মন্ত্র বা মূলগানের (যোনির) আসল রূপ অবিকৃতভাবে থাকে না, কিছু-না-কিছু তার পরিবর্তন হয়ই। কাজেই কোন্ মন্ত্র বা যোনি কোন্ সুরে তথা স্বরসমষ্টিতে গান করা হবে তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে তা ঠিক করা হয় উহগানের ধরণ বা পদ্ধতি থেকে, অর্থাৎ উত্তরার্চিকের ত্রিঋচ্-সমন্বিত সামগান আসলে কি আকারের বা কি রকমের হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করা হয় উহগানের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য দেখে, আর তা থেকেই গ্রামেগেয়গানের সুর বা স্বরসম্বাদ যাগ-যজ্ঞের উদ্দেশ্যে কি রকমের হবে তা নির্ণয় করা হ'ত। উহগানের সুর বা স্বর-প্রকৃতি আবার আদৌ আরণ্য বা অরণ্যেগেয়গানের সুর বা স্বর-সমষ্টির অনুযায়ী ছিল না।

গ্রামেগেয়গানকে 'গেয়' বা 'যোনিগান'-ও বলা হ'ত, কেননা উহ ও উহ্যগানের (রহস্যগানের) মূলসূত্র বা যোনি গ্রামেগেয়গান থেকেই সৃষ্টি হ'ত। একে 'বেয়গান' বা 'বেগান-দ্বিতীয়'-ও বলা হ'ত, কেননা আরণ্যগান বা অরণ্যেগেয়গানের পরই এ' গান শেখানো ও গাওয়া হ'ত। অরণ্যেগেয়গান অরণ্যবাসী ঋত্বিক্ ও সামগদের জন্য নির্বাচিত ছিল। আভ্যুদয়িক ছিল তার প্রয়োগ ও পদ্ধতি, তারই জন্য একে 'রহস্যগান'-ও বলা হ'ত। উপনিষৎ যেমন বিচারশীল ও নিবৃত্তিকামী অরণ্যচারীদের জন্যই প্রথমে নির্দিষ্ট ছিল আর তারই জন্য তাকে রহস্যবিদ্যা বলা হ'ত, অরণ্যেগেয়গানের বেলায়ও তাই। গ্রামেগেয়-গান নির্বাচিত ছিল গৃহবাসী, গোষ্ঠি বা সাধারণ শ্রেয়োকামীদের জন্য। কিন্তু এ' দুটি গানই ছিল বৈদিক। অরণ্যেগেয় ও গ্রামেগেয় গানদুটির ভেতর আবার কোন্‌টি প্রাচীন এ' নিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীদের ভেতর মতদ্বৈধ বড় কম নেই। গ্রামেগেয়গান উন্নত সভ্য-সমাজের ও বিশেষ ক'রে সোমযাগের জন্য নির্দিষ্ট ছিল বলে একেই অনেকে প্রাচীন বলেন। গ্রামেগেয়গান থেকেই নাকি বৈদিকোত্তর গান্ধর্ব বা মার্গ ও মার্গ থেকে ক্রমশঃ ক্ল্যাসিক্যাল অভিজাত দেশীগানের সৃষ্টি হয়েছে।[৬] অবশ্য এ'নিয়ে মতভেদ যথেষ্ট আছে। তবে

৬। বিস্তৃত আলোচনা 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' (১ম ভাগ), পৃঃ ১২৩—২২৭

লোকগীতির প্রচলন সকল দেশেই আদিম যুগ থেকে আবহমান কাল বর্তমান আছে।

বৈদিক গানই সামগান। সামগানের অবশ্য বিভিন্ন রূপভেদ ছিল। ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব এ' চারটি বেদকেই সংহিতা বলে। অনেকে বৈদিক গ্রন্থে 'ত্রয়ী' শব্দের উল্লেখ থাকায় ঋক্, সাম ও যজুঃ এ' তিনটিকে মাত্র প্রামাণিক বলেন। তাঁদের মতে অথর্ববেদ পরবর্তীকালে তিনটি বেদের পরিশিষ্ট হিসাবে রচিত বা সংকলিত। কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অধিকাংশ পণ্ডিতদের মতে ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব এ'চারটি বেদই সংহিতা-রূপে প্রামাণ্য।

বৈদিক যুগ বলতে শুধুই ঋকাদি চার বেদের প্রণয়ন বা প্রচলন-কালের পরিধি বা সমষ্টি নয়, উপনিষৎ, আরণ্যক, ব্রাহ্মণ ও সূত্র (কল্প ও গৃহ্য) সাহিত্যগুলির প্রনয়ন, সংকলন ও প্রচলন-কালকেও গ্রহণ করা হয়। শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যগুলির ভিত্তি বেদ। চতুর্বেদের নিয়ামক ও নির্দেশক বলে তারাও বৈদিক সাহিত্য-গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত। তাই বৈদিক যুগের পরিধি বা পরিসর ঋগ্বেদ থেকে শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যের কাল পর্যন্ত (খৃষ্টপূর্ব ৩০০০—খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী)। বৈদিক গান বা সামগানের প্রচলন পুরোপুরিভাবে এই কাল-ব্যবধানের মধ্যেই ছিল। অবশ্য ব্রাহ্মণ, সূত্র, উপনিষৎ ও শিক্ষা-প্রাতিশাখ্যগুলির রচনাকাল নিয়ে ঐতিহাসিক ও ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদের মধ্যে মতদ্বৈত আছে।

ঋকাদি চারটি সংহিতার মন্ত্রগুলি কর্মানুষ্ঠান তথা যাগ-যজ্ঞাদি ব্যাপারে প্রযুক্ত হ'য়ে ব্রাহ্মণাদি সাহিত্য সৃষ্টি করল। ভাষাতত্ত্বের বিচারের দিক থেকে ঋক্ ও সামবেদের পরই পাই আমরা কৃষ্ণযজুর্বেদের মন্ত্রভাগ। অথর্ববেদ সৃষ্টি হবার আগে বৈদিক সাহিত্যের কোঠায় পাই বাজসনেয়ি-সংহিতা, মৈত্রীয়ানী-সংহিতা। এ'সকল সংহিতা ঋক্ ও সামের মন্ত্রভাগগুলিকে নিয়ে শাখা হিসাবে গড়ে উঠেছে। ব্রাহ্মণাদির পর গৃহ্য ও শ্রৌত সূত্রাদির স্থান। আরণ্যক ও উপনিষদকে বেদের জ্ঞানকাণ্ড বলে। ঋকাদি সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও সূত্র-সাহিত্যগুলিতে উল্লিখিত যাগ-যজ্ঞের এবং আরণ্যক ও উপনিষদের উপাসনার সঙ্গে সামগান জড়িত। আভ্যুদয়িক ও আভিচারিক এই দু'রকমভাবে সামগানের প্রয়োগ ছিল। ভাষ্যকার সায়ণাচার্যের মতে সামবেদেই সামগানের অসংখ্য প্রকাশভঙ্গির উল্লেখ আছে—"সামবেদে সহস্রং গীত্যুপায়াঃ"। বৈদিকযুগে 'গান' বলতে কি বুঝাত তার উদাহরণ দিতে গিয়ে পূর্বমীমাংসাকার জৈমিনি বলেছেন গান একটি আভ্যন্তরিক প্রযত্ন বা কার্য। প্রাণবায়ু নাভি থেকে কণ্ঠে চালিত ও আহত হ'য়ে

শব্দের সৃষ্টি করে। স্বর রূপায়িত হয় কণ্ঠদেশে। কণ্ঠই উপায় বা মাধ্যম, আর প্রাণবায়ুই গানের উপযোগী শব্দ তথা নাদ সৃষ্টির কারণ। সামগানে ঋগক্ষর-বিশিষ্ট স্তোভগুলি দেবতা ও ঋষিদের প্রশংসাসূচক মন্ত্র বা স্তোত্র। স্তোভকে পুষ্পও বলা যেতে পারে, কেননা গানের জন্য ব্যবহৃত ঋগক্ষরগুলি ঋক্‌মন্ত্র-রূপ কাণ্ডে যুক্ত হলে তা কুসুমিত তথা অলংকৃত বলে গণ্য হ'ত।

প্রথমাদি স্বরযোগে স্তোভ গান করা হ'ত। স্তোভ ছিল তিন রকমের— বর্ণস্তোভ, পদস্তোভ ও বাক্যস্তোভ। বাক্যস্তোভ আবার ন'রকমের, যেমন— আশস্তি, স্তুতি, সংখ্যান, প্রলয়, পরিদেবন, প্রৈষ, অনুবেষণ, সৃষ্টি ও আখ্যান। পদস্তোভ পনেরোটি। স্তোভ বলতে ঋক্ বা পদপাঠের বর্ণদীর্ঘত্ব বোঝায়। যেমন ঔ, হো, বা। ইয়। ইহ। হুবে। য়ে দেব। অহা ব। ইহি উবা-ই। ইহ শ্রধি প্রভৃতি। স্তোভ প্রথম ও দ্বিতীয়খণ্ডে মোট ১২৯টি আছে। স্তোভে বৃদ্ধি, গতি, অগতি প্রভৃতির ব্যবহার হয়।

স্তোভে বর্ণের উচ্চারণ হ'ত সোজাসুজি বা বিপরীত ভাবে। যেমন মন্ত্র 'অগ্ন আয়াহী', স্তোভে গান করার সময় তা উচ্চারিত হবে 'ওগ্নায়ি'। অনেক সময় গানের সময় অক্ষরের ভিন্ন রকম (বিকৃত) উচ্চারণের মতো বর্ণলোপও হ'ত। গেয়গান, বেয়গান, যোনিগান প্রভৃতির সময় এই নিয়ম মেনে চলা হ'ত। স্তোভের অনুকরণে খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে নাটকে ব্যবহারের জন্য বহির্গীতের প্রচলন করেন। যন্ত্রসঙ্গীতকে তিনি বলেছেন 'নির্গীত'। বহির্গীতে তিনি কতকগুলি অর্থহীন বর্ণ বা শব্দেরও সমাবেশ করেছেন। দক্ষিণ-ভারতীয় বা কর্ণাটকী সঙ্গীতেও এ'ধরণের কতকগুলি অর্থহীন শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। এ'গুলি বৈদিক স্তোভেরই প্রতিকৃতি বা অনুকরণ বলে মনে হয়।

যাগ-যজ্ঞের সময় বিশেষভাবে বেদগান সামগানের রীতি ছিল। যজ্ঞের সময় অগ্নির সামনে যেমন গান করা হ'ত তেমনি যজ্ঞশালার বাইরেও গান করার রীতি ছিল। বিশ্বজিৎযাগই তার নিদর্শন। দেবতার উদ্দেশ্যে স্তুতিবাচক সামগানকে 'স্তোত্রিয়' অর্থাৎ স্তুতিনিষ্পাদক বলা হ'ত। গানে একটি বা একটির বেশীও ঋকের সমাবেশ থাকত। স্তোত্রিয়-গানে কথা হিসাবে একটি ঋক্ থাকত। তিনটি ঋক্-যোগে যে গান করার রীতি ছিল তার নাম স্তাত্রিয়। গানে ছন্দ ও লয়ের (সময়ের ব্যবধান) ব্যবহার ছিল। ছন্দ ও লয় এখনকার মতো সম ও বিষম-ভাবের হ'ত। কিন্তু সামগানের রূপ ও প্রকৃতিকে বিশেষভাবে জানতে গেলে বৈদিক যাগ-যজ্ঞ-রূপ কর্মানুষ্ঠানগুলির প্রকৃতি ও গঠন আমাদের জানা উচিত।

দেবতাদের উদ্দেশ্যে কোন দ্রব্য-ত্যাগের নাম যজ্ঞ। তাই দেবতা, দ্রব্য ও ত্যাগ যজ্ঞে অপরিহার্য অঙ্গ। দ্রব্য বলতে বোঝায় হব্য বা আজ্য—যথা পশুমাংস, সোমলতার রস, ঘৃত, চরু বা পায়সান্ন, দুধ, দই, পুরোডাশ বা রুটি প্রভৃতি। ত্যাগকর্মের নাম আহুতি। কোন একটি কামনা যাগ-যজ্ঞ-কর্মের পেছনে থাকতই—তা সে পরমার্থ ই হোক, দেশ ও দশের কল্যাণের জন্যই হোক বা নিজের মঙ্গলের জন্যই হোক। যার হিতের জন্য যাগানুষ্ঠান হ'ত তার নাম যজমান। বড় বড় যজ্ঞে তিন শ্রেণীর যাজক বা ঋত্বিক্ থাকতেন—ঋগ্বেদী, যজুর্বেদী ও সামবেদী। ঋগ্বেদী-যাজক ঋক্‌মন্ত্র স্পষ্টভাবে উচ্চৈঃস্বরে ও যজুর্বেদী-যাজক যজুর্মন্ত্র নিম্নস্বরে পাঠ করতেন। সামবেদী সামগান করতেন। হোতার কাজ ছিল ঋক্‌মন্ত্র পাঠ ক'রে যজ্ঞস্থলে দেবতাকে আহ্বান করা। যিনি অগ্নিমুখে আহুতি দিতেন তাঁকে বলা হ'ত অধ্বর্যু। অধ্বর্যু যজুর্বেদী ঋত্বিক্ হতেন। সামগানের জন্য প্রধান ঋত্বিকের নাম উদ্‌গাতা। সকল ঋত্বিক্ বা ব্রাহ্মণের প্রধানের নাম ছিল ব্রহ্মা। অনেকে বলেন তিনি হতেন ত্রিবেদজ্ঞ, আবার অনেকের মতে চতুর্বেদজ্ঞ।

যজ্ঞগুলি সাধারণত স্মার্তকর্ম ও শ্রৌতকর্ম এই দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। স্মার্তকর্ম যেমন বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা, জলাশয়প্রতিষ্ঠা, বিবাহ, উপনয়ন, বৃষোৎসর্গ প্রভৃতি ব্যাপারে যজ্ঞ। এর বিধানশাস্ত্রের নাম গৃহ্যসূত্র। শ্রৌতকর্ম যেমন অগ্নিহোত্র, অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, রাজসূয় প্রভৃতি যজ্ঞ। এর বিধানশাস্ত্রের নাম শ্রৌতসূত্র। যজ্ঞে শ্রৌত-অগ্নি-রূপে গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি স্থাপন করা হ'ত। চতুষ্কোণ বেদী তৈরী ক'রে তার তিন দিকে ঐ তিন অগ্নি স্থাপনের বিধি ছিল। বেদীর পশ্চিমে গার্হপত্য, পূর্বদিকে আহবনীয় ও দক্ষিণে দক্ষিণাগ্নি স্থাপিত হ'ত। মাটির বেড়া দিয়ে অগ্নির স্থান নির্মিত হ'ত। গার্হপত্য-অগ্নির স্থান ছিল চতুর্ভুজাকার, আহবনীয়ের বৃত্তাকার ও দক্ষিণাগ্নির অর্ধবৃত্তাকার। স্থানগুলির বিস্তৃতি ছিল এক হাত দীর্ঘ, এক হাত বিস্তৃত। গার্হপত্য-অগ্নি গৃহপতির প্রতিনিধি-রূপে কল্পিত হ'ত। আহবনীয়াগ্নি দেবতাদের ও দক্ষিণাগ্নি ছিল পিতৃগণের উদ্দেশ্যে।

শমীগাছের পরগাছা-রূপে যে অশ্বত্থগাছ জন্মাত তাই দিয়ে যজ্ঞের অরণি তৈরী হ'ত। অরণির ঘর্ষণে অগ্নি সৃষ্ট করা হ'ত। এই ঘর্ষণ করার নাম অগ্নিমন্থন। অগ্নিমন্থনের আগে একটি অশ্ব এনে রাখা হ'ত। যজমান একটি অরণি ধরে বসতেন ও আর একটি অরণি প্রথমে ধরতেন যজমানের পত্নী ও পরে অধ্বর্যু। মাটির খাপরায় গোবরের ঘুঁটেতে অগ্নি গ্রহণ করা হ'ত। যজমান

ফুৎকার দিয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত করতেন। অধ্বর্যু সেই অগ্নিতে যজ্ঞের জন্ম কাষ্ঠ জ্বালিয়ে গার্হপত্য-অগ্নি রাখতেন। ব্রহ্মা বা প্রধান ঋত্বিক্‌ সে সময়ে সামগান করতেন। গার্হপত্যের অগ্নি নিয়েই আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি স্থাপন করা হ'ত। ব্রহ্মা তিন অগ্নি স্থাপনের পর তিনবার সামগান করতেন।

ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে বিভিন্ন যাগের উল্লেখ আছে, যেমন জ্যোতিষ্টোম, গোষ্টোম, আয়ুষ্টোম প্রভৃতি। জ্যোতিষ্টোমকে সকল রকম সোমযজ্ঞের প্রকৃতি ও প্রধান বলা হ'ত—"এষ বাব প্রথমো যজ্ঞো যজ্ঞানাং যজ্জ্যোতিষ্টোমঃ"। জ্যোতিষ্টোম-যাগের সাতটি সংস্থা বা সংস্কার। তাদের মধ্যে জ্যোতিষ্টোম, উক্‌থ্য, ষোড়শী ও অতিরাত্র উল্লেখযোগ্য। এ' চারটির মধ্যে অগ্নিষ্টোম প্রত্যক্ষ শ্রুতির দ্বারা উপদিষ্ট হয় বলে 'প্রকৃতি' নামে কথিত, আর বাকী তিনটি বিকৃতি-যাগ। অগ্নিষ্টোমের আগে ঋত্বিক্‌ বরণ করতে হয়। কিন্তু ঋত্বিক্‌-বরণের আগে দীক্ষনীয়েষ্টি সম্পন্ন করার বিধি ছিল। চারজন ঋত্বিকের সাহায্যে সপত্নীক যজমান যে অনুষ্ঠান করেন তার নাম 'ইষ্টি'। আবার ইন্দ্রাদি দেবতাদের উদ্দেশ্যে পুরোডাশ-উৎসর্গের নামও ইষ্টি। ইষ্টিকর্মের দেবতা অগ্নি ও বিষ্ণু। যে ইষ্টি ও আহুতি দ্বারা দেবগণ যজমানের যজ্ঞে আবির্ভূত হন তার নাম উতি। অগ্নি দেবতাদের মুখ—"অগ্নিমুখং প্রথমো দেবতানাং"। অগ্নিমুখেই দেবতারা যজ্ঞভাগ ও দ্রব্যাদি গ্রহণ করেন। বিষ্ণু সকল দেবতার স্বরূপ। তিনি সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত করেন বলে বিষ্ণু—"ভূতানি বিষ্ণুর্ভুবনানি বিষ্ণুঃ"। অগ্নি ও বিষ্ণুর উদ্দেশে পুরোডাশ আহুতি দিতে হয়। অষ্টকপালে সংস্কৃত পুরোডাশ অগ্নির অংশ-স্বরূপ। গায়ত্রীর আটটি অক্ষরের অনুসারে অষ্টকপাল কল্পিত হয়। গায়ত্রী অগ্নির ছন্দ। বিষ্ণুর তিনটি পাদ কল্পনা করা হয়, তিনি ত্রিপাদেই ত্রিজগৎ অধিকার করেছিলেন। বিষ্ণুর ত্রিপাদের প্রতীক-স্বরূপ তাই তিনটি পুরোডাশ উৎসর্গ করা হ'ত। ইষ্টিকর্মে দেবতাদের উদ্দেশ্যে আহুতিদানের সময় দুটি মন্ত্র পাঠ করার বিধি ছিল: (১) অনুবাক্যা বা পুরোনুবাক্যা ও (২) যাজ্যা। অধ্বর্যু আহুতি দান করতেন ও হোতা ঐ আহুতি-দানের মন্ত্র দুটি পাঠ করতেন। যিনি আহুতি দিতেন তাকে বলা হ'ত হোতা। অধ্বর্যু হোতা নন, যিনি অনুবাক্যা ও যাজ্যা মন্ত্র দুটি পাঠ ক'রে দেবতাদের যজ্ঞে আহ্বান করতেন তিনিই আসলে হোতা। হোতার কর্মকে হৌত্রকর্ম বলে। হৌত্রকর্মের সময় ঘৃতাহুতি দেওয়া হ'ত ও হোতা তখন অধ্বর্যুর আদেশ অনুসারে দুটি মন্ত্র পাঠ করতেন। সেই মন্ত্রপাঠের নাম পুরোঽনুবাক্য-পাঠ। এর পর

হবিঃকর্ম। এই কর্মে যাজ্যা ও অনুবাক্যা-মন্ত্র পাঠ করা হ'ত। অনুবাক্যামন্ত্র যেমন—"অগ্নিমুখং প্রথমং দেবতাং * *", ও যাজ্যা যেমন—"অগ্নিশ্চ বিষ্ণো তপ উত্তমং মহঃ"। অবশ্য এই মন্ত্র ঋক্‌-সংহিতার শকলশাখার অন্তর্ভুক্ত নয়, এগুলি আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্রের (৪।২) মন্ত্র।

স্বিষ্টকৃৎযাগে তেজস্কাম ও ব্রহ্মবর্চসকাম—এ' ছুটি গায়ত্রী সংযাজ্যা-রূপে পাঠ করা হ'ত। সংযাজ্যা অর্থে যাজ্যা ও অনুবাক্যা-মন্ত্র। গায়ত্রীছন্দের পর উষ্ণিকছন্দের পাঠ। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের পাঠ করা হ'ত। এ' ভাবে অনুষ্টুপ, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুভ, জগতী, বিরাট প্রভৃতি ছন্দের পাঠের বিধি ছিল শ্রী ও যশকামী, যজ্ঞকামী, বীর্যকামী, পশুকামী ও অন্নপ্রার্থী অনুষ্ঠানকারীদের পক্ষে। এর পর অগ্নি, সোম, সবিতা ও অদিতির যজন করা হ'ত। যজনের পর সোম-আনয়ন। সোম-আনয়নের অন্য নাম সোমপ্রবহণ। অধ্বর্যু 'প্রৈষ'-মন্ত্র পাঠ করলে হোতা 'ভদ্রাদভিশ্রেয়ঃ প্রেহি' মন্ত্র পাঠ করতেন। গায়ত্রী বাক্‌-রূপিণী হ'য়ে স্বর্গলোক থেকে (?) সোম এনেছিলেন বলে সোমের ছন্দ গায়ত্রী। 'সোম যাস্তে ময়োভুবঃ' মন্ত্র পাঠ করার পর আটটি ঋক্‌ পাঠ করার রীতি ছিল। এর পর সোমের উপাবহরণ। উপাবহরণ বলতে আনীত সোমকে শকট থেকে নামানো। সোম গ্রহণের সময় একটি বলদ শকটে জোড়া থাকত।

তারপর আতিথ্যেষ্টির বিধান থাকত। পরে অগ্নিমন্থন ও তার মন্ত্রপাঠ। অধ্বর্যু হোতাকে অগ্নির উদ্দেশ্যে অনুবচন পাঠ করতে বলতেন। পাঁচটি ঋক্‌ ও রক্ষোঘ্ন-গায়ত্রী পাঠ করা হ'ত। পুনরায় আতিথ্যেষ্টি মন্ত্রের বিধান ও প্রবর্গ্যকর্ম। প্রতিদিন পূর্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে ছ'বার অনুষ্ঠানের নাম প্রবর্গ্যকর্ম। পরে তানূনপত্রের বিধান থাকত। অবশ্য এটি উপসদের অঙ্গ ছিল না। এরপর সোমক্রয়, অগ্নিপ্রণয়ন, হবির্বিধান-প্রবর্তন, অগ্নিষোম-প্রণয়ন, যূপ-নির্মাণ। উত্তর-বেদির সামনে প্রোথিত পশুবন্ধন-স্তম্ভের নাম যূপ। যূপ উর্ধ্বমুখে প্রথিত থাকত। যূপকে বজ্র-রূপে কল্পনা করা হ'ত। খদির, বিল্ব ও পলাশ প্রভৃতি কাঠে যূপ তৈরী হ'ত।

যজ্ঞশালা বা মণ্ডপের নাম সদঃ। মণ্ডপের দক্ষিণদিকে মার্জালীয় উত্তরদিকে আগ্নীধ্রীয় অগ্নিকুণ্ড থাকত। উভয় অগ্নির মধ্যে ছ'জন ঋত্বিকের জন্য নির্দিষ্ট ছ'টি ধিষ্ণ্য বা অগ্নিকুণ্ড নির্বাচিত থাকত। দক্ষিণ থেকে উত্তরে যথাক্রমে মৈত্রাবরুণ, হোতা, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, পোতা, নিষ্ঠা, অচ্ছাবাক—এই ছ'জন ঋগ্বেদী ঋত্বিকের জন্য ছ'টি ধিষ্ণ্য থাকত। অচ্ছাবাক সকলের পেছনে সদঃপ্রবেশ ক'রে ঐন্দ্রাগ্নশস্ত্র

পাঠ করত। সামগায়ীরা স্তোত্র গান করত। পরে হোতার পক্ষে শস্ত্রপাঠের বিধান ছিল। তবে প্রত্যেক শস্ত্রপাঠের আগে এক একবার স্তোত্র গীত হ'ত। পবমান-সোমের উদ্দেশ্যে উদ্গাতা, প্রস্তোতা ও প্রতিহর্তা তিনজন সামগায়ী ঋত্বিক্ সামগান করতেন। এই গানের নাম বহিষ্পবমান। পবমান-সোমের উদ্দেশ্যে গীত হ'ত বলে স্তোত্রের নাম ছিল পবমান, আর মহাবেদির বাইরে গান করা হ'ত বলে গানের নাম ছিল বহিষ্পবমান-স্তোত্র। বহিষ্পবমান-স্তোত্র গীত হ'লে আজ্যশস্ত্র ও আজ্যস্তোত্র গান করা হ'ত ও তার সঙ্গে প্রউগশস্ত্র-পাঠের বিধান থাকত। প্রউগশস্ত্র ধারাগ্রহের উদ্দেশ্যে দেবতাদের প্রশংসাসূচক গান। উক্‌থ ও শস্ত্র একার্থক। সামগায়ীরা যা গান করতেন তার নাম ছিল স্তোত্র বা স্তোম। বহিষ্পবমান-স্তোত্রে "উপাস্মৈ গায়তা" ইত্যাদি ন'টি মন্ত্র গীত হ'ত। তিনজন সামগায়ী স্তোত্র গান করত ও তাদের মধ্যে একজন হিংকার বা হুঁ-শব্দ উচ্চারণ করত।

যজ্ঞের দেবতা মোট ৩৩ জন, অর্থাৎ ৮ বসু + ১১ রুদ্র + ১২ আদিত্য + প্রজাপতি + বষট্‌কার = ৩৩ জন। এই ৩৩ জন মূল-দেবতা থেকে পরে ৩৩ কোটি দেবতা কল্পনা করা হয়েছে। প্রতিটি যাগে অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদের উদ্দেশ্যে সামগান করা হ'ত। 'সা' নামে ঋক্ ও 'অম' নামে সামের মিলনে সাম তথা সামগানের সার্থকতা। শস্ত্র ও সামের পাঁচটি অঙ্গ কল্পিত হ'ত। যেমন,

	শস্ত্র		সাম		
(১)	আহার	···	হিংকার	···	সকলে উচ্চারণ করতেন
(২)	প্রথম ঋক্	···	প্রস্তাব	···	প্রস্তোতা গান করতেন
(৩)	মধ্যম ঋক্	···	উদ্গীথ	···	উদ্গাতা " "
(৪)	অন্তিম ঋক্	···	প্রতিহার	···	প্রতির্হতা " "
(৫)	বষট্‌কার	···	নিধন	···	তিনজনে মিলে গান করতেন

ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে বিস্তৃতভাবে যজ্ঞানুষ্ঠান, স্তোত্র ও সামের বিবরণ দেওয়া আছে। শ্রদ্ধেয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁর 'যজ্ঞকথা' পুস্তকেও বিভিন্ন যাগানুষ্ঠানের পরিচয় দিয়েছেন। সামগানই আমাদের আলোচনার বিষয়, যজ্ঞকথা নয়, কিন্তু সামগান প্রত্যেকটি যাগ-যজ্ঞে গীত হ'ত বলে যজ্ঞানুষ্ঠান সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান আমাদের থাকা উচিত। যাগ-যজ্ঞ কর্ম ও কর্মের ফল স্বর্গলাভ। কর্মবাদী ও ফলকামীরা যাগ-যজ্ঞের পক্ষপাতী ছিলেন। জ্ঞানবাদীদের কথা স্বতন্ত্র। আরণ্যক ও উপনিষৎ-যুগের কথা ছেড়ে দিলে বৈদিক যুগের গোড়ার দিকে

সমাজবাসী মানুষ কর্ম ও তাদের ফল স্বর্গ ও শ্রেয়োলাভের পক্ষপাতী ছিল, আর তারই জন্য যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হ'ত। সামগান ছিল যাগ-যজ্ঞের অপরিহার্য অঙ্গ। সামগুলি ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞে ভিন্ন ভিন্ন দেবতা ও ঋষির উদ্দেশ্যে গান করা হ'ত। যেমন পঁচিশটি স্তোমযুক্ত বামদেব্যসাম গান করা হ'ত মহাব্রতযাগে। মাধ্যন্দিনযাগে গান করা হ'ত যৌধাজয় ও রৌরব-সাম দুটি। স্তোম ও স্তোত্রের মতো 'গাথা'-গানেরও প্রচলন ছিল। 'গাথা' বলতে গান বোঝালেও সে গান ছিল একটি উদ্দেশ্যমূলক। গাথার পরিচয় দিতে গিয়ে তৈত্তিরীয়-সংহিতাকার বলেছেন বিহিত বা বিধিবদ্ধ মন্ত্র-বিশেষের নাম গাথা। উচ্চ-নীচ ও মধ্যলয়ে গাথা গান করার প্রচলন ছিল।

সামগানে ঋক্ সুরে পাঠ ও গান করার জন্য দু'টি গ্রন্থ আছে—ছন্দ ও উত্তরা। (১) ছন্দগ্রন্থে সামের যোনিভূত ঋক্ গান করা হ'ত, আর (২) উত্তরাগ্রন্থে স্বাত্রিয়সামের মতো তিনটি ঋক্‌যুক্ত সূক্ত পাঠ বা গান করা হ'ত। বিভিন্ন স্বরযোগে পাঠ করা গান করারই শ্রেণীভুক্ত ছিল, তাই স্বরযোগে মন্ত্র বা সূক্তের কেবল পাঠ বা উচ্চারণ নয়, ছন্দ (তাল) ও লয়যোগে গান করার রীতি ছিল। ছন্দগ্রন্থের নাম 'যোনিগ্রন্থ', কেননা গানের মূল-উপাদান তাতে থাকত। 'উত্তরা' কর্মাঙ্গ-প্রকরণের গ্রন্থ। যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে উত্তরাগ্রন্থের ব্যবহার ছিল। স্তোমের যে পঞ্চদশ, সপ্তদশ প্রভৃতি নাম ছিল, সেগুলি উত্তরাগ্রন্থ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে।

ছন্দরূপ আর্চিককে পূর্বার্চিক বলে। পূর্বার্চিকের মতো উত্তরার্চিকের ছন্দও যজ্ঞের অনুষ্ঠানে গান করা হ'ত। তবে যজ্ঞের সময় যতগুলি স্তোত্র সুর ক'রে গান করা হ'ত তাদের সবগুলি প্রায় উত্তরার্চিকের সূক্তের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকত। সে সূক্তগুলিতে তিনটি ক'রে ঋক্ থাকত বলে তাদের ত্রিঋচ্ বলা হ'ত। ত্রিঋচে ঋগ্বেদের তিনটি ক'রে পদ থাকত। তবে গানে তিনটির বেশী পদেরও ব্যবহার ছিল। বৈদিকোত্তর ক্ল্যাসিক্যাল প্রবন্ধ ও নিবন্ধ গানগুলির বিকাশ বৈদিক ত্রিঋচ্ থেকেই হয়েছে বলে মনে হয়। বারোটি পদযুক্ত সামগানেরও প্রচলন ছিল। বৈদিক পদ-সম্বলিত গান খৃষ্টপূর্ব ও খৃষ্টীয় অব্দের জাতি বা জাতিগান প্রভৃতি ও নাটকে ব্যবহৃত ধ্রুবাগানের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রতিটি ত্রিঋচের প্রথম পদকে 'যোনি' ও দ্বিতীয়াদি অপরাপর পদকে 'উত্তরা' বলা হ'ত। যোনিই ছিল প্রধান অবয়ব, আর উত্তরা ছিল তার অংশ বা অঙ্গবিশেষ।

বিভিন্ন বেদের শাখা অনেকগুলি ক'রে। প্রত্যেক শাখায়ই সামগানের বিধি ছিল, তবে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। ভিন্ন ভিন্ন শাখার ঋত্বিক্ ও সামগরা ভিন্ন ভিন্ন স্বরে বিভিন্ন সাম গান করতেন। পুষ্পর্ষি সামপ্রাতিশাখ্য পুষ্পসূত্রে বৈদিক শাখাভেদে বিভিন্ন স্বরযুক্ত গানের প্রসঙ্গে বলেছেন,

এতৈর্ভাবৈস্তু গায়ন্তি সর্বাঃ শাখাঃ পৃথক্-পৃথক্।
পঞ্চস্বেব তু গায়ন্তি ভূয়িষ্ঠানি স্বরেষু তু॥
সামানি ষট্‌সু চান্যানি সপ্তসু দ্বে তু কৌথুমাঃ
ঊনানামন্যথাগীতিঃ পাদানামধিকাশ্চ যে॥

'প্রতিশাখায়ং ভব' বা 'শাখায়াং শাখায়াং প্রতিশাখম্। প্রতিশাখং ভব প্রাতিশাখ্যম্।' এর দ্বারা বোঝা যায় প্রতিটি বেদের শাখা ছিল ও একথা আগেও বলা হয়েছে। 'গায়ন্তি সর্বাঃ শাখাঃ পৃথক্-পৃথক্'—সকল শাখাই আলাদা আলাদা ভাবে গান করা হ'ত, আর তাদের গানের প্রকৃতি ও শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হ'ত স্বরসংখ্যার প্রয়োগে, কেননা কেউ পাঁচ স্বরে, কেউ ছয় বা সাত স্বরে সামগান করত। ঐ কথাটি আরো পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়েছেন নারদ (খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী) তাঁর নারদীশিক্ষায় (১।৯-১৪)। তিনি উল্লেখ করেছেন: "কঠকালাবপ্রবৃত্তেষু তৈত্তিরীয়াহ্বরকেষু চ, ঋগ্বেদে সামবেদে চ বক্তব্যঃ প্রথমঃ স্বরঃ। * * এতে বিশেষতঃ প্রোক্তা স্বরা বৈ সার্ববৈদিকাঃ * *।"[১] কঠ, তৈত্তিরীয়, আহ্বরক, ঋগ্বেদ ও সামবেদ আশ্রয়ীরা কেবলই প্রথম স্বরযোগে স্তোত্রাদি পাঠ ও গান করতেন। ঋগ্বেদীদের মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য ছিল, তাঁরা সামগানে দ্বিতীয়, তৃতীয় স্বরও ব্যবহার করতেন। অর্থাৎ ঋগ্বেদীরা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই তিন স্বরে সামগান করতেন। সামিক যুগের গান ছিল মাত্র তিনটি স্বরযোগে। আর্চিক যুগে ছিল একটি মাত্র স্বরের ব্যবহার। তেমনি আহ্বরকরা এক স্বরেও গান বা স্তোত্র পাঠ করতেন, আবার প্রথম, তৃতীয় ও ক্রুষ্ট স্বরেরও ব্যবহার করতেন প্রথম স্বরের সঙ্গে। তাতে বোঝা যায় তাঁরা ছিলেন স্বরান্তর-যুগের অনুবর্তী, কেননা স্বরান্তর-যুগের গানে (সামগানে) চারটি মাত্র স্বরে গান করার বিধি ছিল। তৈত্তিরীয়-শাখাশ্রয়ীরা গানে চারটি স্বর ব্যবহার করতেন, অর্থাৎ তাঁদের গানে ছিল দ্বিতীয়াদি বলতে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও মন্দ্র স্বরের সহযোগ। সুতরাং তাঁদের গানও ছিল স্বরান্তর শ্রেণীভুক্ত।

১। 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি', ১ম ভাগ, পৃঃ ২১২

সামগানের মধ্যে সাতটি স্বরেরই ব্যবহার ছিল—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র, ক্রুষ্ট ও অতিস্বার। তাণ্ডিভাল্লরা প্রথম ও দ্বিতীয় এই দুটি স্বরে গান করতেন ও এ' থেকে বোঝা যায় তাঁরা গাথিক যুগের অনুবর্তী ছিলেন। এ ছাড়া শতপথ, বাজসনেয়ি প্রভৃতি শাখাপন্থীদের গানের মধ্যেও স্বর-ব্যবহারের তারতম্য ছিল। পুষ্পসূত্র ও নারদীশিক্ষার আলোচনা থেকে বোঝা যায় বিভিন্ন বেদ, তাদের শাখা ও ব্রাহ্মণে সামগানের রূপ ভিন্ন ভিন্ন ছিল এবং তাদের বিকাশও ভিন্ন ভিন্ন যুগে হয়েছিল। বোধহয় শত শত বছর লেগেছিল তাদের বিচিত্র বিকাশের পথে। তাছাড়া স্বরের বিকাশও হয়েছিল মানুষের রুচি ও সৌন্দর্যবোধের বিকাশের স্তরে স্তরে। অবশ্য প্রাতিশাখ্য ও শিক্ষার যুগে আমরা সাত স্বরের ব্যবহার দেখতে পাই সামগানের ভেতর। কিন্তু আরো আশ্চর্য হই যখন প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতায় দেখি সাত স্বরের বিকাশ। মহেঞ্জো-দড়োয় পাওয়া প্রমাণগুলি ঐতিহাসিকদের স্বযত্ন মনোযোগের দাবী রাখে। ঐতিহাসিকদের এটা অনুসন্ধানের বিষয় যে বৈদিক যুগেই সাতস্বরের বিকাশ সম্ভব হয়েছিল—কি প্রাগ্‌বৈদিক যুগেই তার সার্থকতা দেখা গিয়েছিল, কিংবা বৈদিক যুগের পূর্ণ-বিকাশের প্রতিচ্ছবিই তথাকথিত প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতায় পরিস্ফুট হয়েছিল! ভিয়েনার ডাঃ ফেল্‌বার, হল্যাণ্ডের ডাঃ হুগ্, রিচার্ড সাইমন প্রভৃতি মনীষীদের অভিমত যে বৈদিক যুগের বিভিন্ন স্তরে নতুন নতুন শ্রেণীর গানের (সামগান) উদ্ভব হয়েছিল ও গোড়ার দিকে সামগানে স্বরমণ্ডলের প্রয়োগ না থাকলেও শেষের দিকে তার সমাবেশ হয়েছিল। স্বরমণ্ডলের পরিচয় দিতে গিয়ে শিক্ষাকার নারদ বলেছেন,

সপ্ত স্বরাস্ত্রয়ো গ্রামা মূর্ছ্‌নাস্ত্বেকবিংশতিঃ।
তানা একোনপঞ্চাশদিত্যেতৎ স্বরমণ্ডলম্‌॥

অর্থাৎ সাত স্বর, তিন গ্রাম (ষড়্‌জ, মধ্যম, গান্ধার), একুশ মূর্ছনা, একোনপঞ্চাশৎ তান প্রভৃতির সমবেত রূপই স্বরমণ্ডল। কিন্তু ভেবে দেখার বিষয় যে 'সপ্তস্বরাঃ' বলতে নারদ লৌকিক ষড়্‌জাদি সাত স্বরের কথাই বলেছেন, বৈদিক প্রথমাদির কথা বলেন নি। সামগানে কিন্তু লৌকিক স্বরের ব্যবহার হ'ত না। তাছাড়া একুশ মূর্ছনা, শ্রুতি, তান প্রভৃতির বিকাশও বৈদিকোত্তর যুগে। সুতরাং সামগানে স্বরমণ্ডলের ব্যবহার সম্বন্ধে ডাঃ ফেল্‌বার প্রভৃতির মতবাদ কতটুকু সমীচীন তা ভেবে দেখার বিষয়। তবে বৈদিকোত্তর যুগে (খৃষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দ থেকে তৎপরবর্তী সময়ে) প্রচলিত সামগানে স্বরমণ্ডলের

প্রয়োগ থাকা কিছু বিচিত্র নয়। কেননা রামায়ণে, মহাভারতে, হরিবংশে সামগানের উল্লেখ আছে। রামায়ণ খৃষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দে রচিত। মহাভারতের রচনা-কাল খৃষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দ ও হরিবংশ রচিত হয় খৃষ্টপূর্ব ২০০ অব্দে। রামায়ণের সময়ে গান্ধর্ব তথা মার্গ-সঙ্গীতের প্রচলন ছিল ও বৈদিক সামগানের অনুশীলন থাকলেও তা অধিক ছিল না। রামায়ণের বালকাণ্ডে ৪র্থ সর্গে উল্লিখিত দেখি—"তৌ তু গান্ধর্বতত্ত্বজ্ঞৌ", "মার্গবিধানসংপদা"। এখানে কুশী-লব যে গন্ধর্বদের মতো ('গন্ধর্বাবিব রূপিণৌ') গান্ধর্ব বা মার্গ-সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন তা উল্লিখিত হয়েছে। শুদ্ধ-জাতিগানের তখন অনুশীলন হ'ত— "জাতিভিঃ সপ্তভির্যুক্তং"। সেই জাতিগান তথা জাতিরাগ-গানে মন্দ্র, মধ্য ও তার এই তিন স্থান, মূর্ছনা, লয়, রস প্রভৃতির সমাবেশ থাকত—"তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্", "স্থানমূর্ছনকোবিদৌ", "রসৈঃ শৃঙ্গারকরুণ * *" প্রভৃতি। রামায়ণে কিংবা পরবর্তী মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতিতে সূক্ষ্মস্বর শ্রুতির বিভাগ বা নামের কোন কথাই কোন স্থানে উল্লেখ নাই। তাই মনে হয় খৃষ্টীয় শতাব্দীর শ্রুতি-বিভাজন-প্রণালী ও তাদের প্রয়োগ-বিজ্ঞানের তখন অনুশীলন হ'ত না। তবে গান্ধর্ব বা মার্গ জাতিগানে মূর্ছনা, মন্দ্রাদি স্থান, রস প্রভৃতির ব্যবহার ছিল ও তখনকার সময়ে লৌকিক গান্ধর্বগানের মতো উন্নততর সমাজের সামগানেও স্বরমণ্ডলের ব্যবহার হ'ত বলে মনে হয়।

সামগানে পাঁচ রকম ভাবে উচ্চারণ ভঙ্গির ব্যবহার হত, যেমন (১) কথা ও স্বরের ওপর জোর দেওয়া, (২) দুটি উচ্চারণ-রীতির ব্যবধান নির্ণয় করা ও তাদের পছন্দমতো সাজানো, (৩) স্বরের উচ্চতা ও দীর্ঘতা, (৪) কথা বা স্বরের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করা, (৫) বিভিন্ন উচ্চতা বা দীর্ঘতার মাঝে মাঝে সুর বা স্বরের পারস্পরিক পরিমাপ নির্ণয় করা। এ'ছাড়া সুরের (তথা স্বরের) বিরাম থাকত। দণ্ডচিহ্ন (।) থাকলেই সুরের সেখানে বিরাম বোঝাত। দুটি দণ্ডের মাঝখানে (ব্যবধানে) যে সুর তথা স্বর থাকত তাকে পর্ব বলা হ'ত। এক একটি গানে একাধিক পর্ব থাকত। এই পর্ব বা মধ্যবর্তী স্বর একবার কিংবা দু'বার অথবা অধিকবার গান করার নিয়ম ছিল। এক বা একাধিক পর্ব মিলে গানের এক একটি পাদ সৃষ্টি হ'ত। পাদের অংশকে বলা হ'ত বিধা। প্রত্যেকটি বিধায় আবার স্তোভের সমাবেশ থাকত বা নাও থাকত। বিধাযুক্ত অর্ধেক বা সম্পূর্ণ পাদগানের নাম 'বিধা-সাম' বা 'বৈধিক সাম'। অবৈধিক সামেরও প্রচলন ছিল, অর্থাৎ তার সামের পাদ বিধাযুক্ত হ'ত না। সামগানে প্রেঙ্খ, বিনত, কর্ষণ, অতিক্রম, অভিগীত প্রভৃতি স্বরোচ্চারণের নির্দেশ বা চিহ্নবিশেষ (নোটেশন)

থাকত। আর সে সকল নির্দেশ বা স্বরচিহ্ন অনুযায়ী সামগান গাওয়া হ'ত। সামগানে মন্ত্র তথা কথা ও স্বরের পুরোপুরি ও সকৃদ্‌ তথা আংশিক আবৃত্তিরও ব্যবস্থা থাকত। ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞে সামগানের প্রকৃতি ও পরিবেশন-প্রণালীও বিভিন্ন ভাবের হ'ত। সোমযজ্ঞে গায়ত্রীছন্দে ঋক্‌গুলি উদ্‌গাতা গান করতেন, আর হোতা কেবল সে ছন্দগুলি আবৃত্তি ক'রে যেতেন। অধ্যাপক জেকবি গান ও আবৃত্তির পার্থক্য দেখিয়ে বলেছেন: গানে তাল রাখা হ'ত করতালির সাহায্যে, আর আবৃত্তি ছিল কেবলই ছন্দের প্রকৃতিকে অনুসরণ ক'রে উচ্চারণ। আবৃত্তি প্রধানত গান্ধার ও মধ্যম অথবা ষড়্‌জ, ঋষভ ও গান্ধার স্বরগুলিকে নিয়ে হ'ত। কেহ কেহ আবার গান্ধার, পঞ্চম ও ধৈবত স্বর তিনটির সাহায্যেও আবৃত্তি করত। আবৃত্তি মন্দ্র, মধ্য ও তার এই তিনভাবেই হ'ত।

গানগ্রন্থ ও গানের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। গান প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত—পূর্বগান ও উত্তরগান। পূর্বগান হ'ল গ্রামেগেয়গান, আর উত্তরগান—অরণ্যেগেয়গান, উহগান ও উহ্যগান। মহর্ষি জৈমিনীর মতে গ্রামেগেয়গানের সংখ্যা ১২৩২টি, আরণ্যগান ২৯১টি, উহগান ১৮০২টি ও উহ্যগান ৩৫৬টি—মোট ৩৬৮১টি। কিন্তু কৌথুমশাখাবলম্বীদের অনুসারে এ'সব সংখ্যা আবার ভিন্ন। তাঁদের মতে গ্রামেগেয়গান ১১৯৭টি, আরণ্যগান ২৯৪টি, উহগান ১০২৬টি ও উহ্যগান ২০৫—মোট ২৭২২টি।

সামগানে প্রথমাদি স্বরের ব্যবহার ছিল। সামবিধানব্রাহ্মণের মতে স্বরনাম সন্নিবেশ একটু ভিন্ন। সামপ্রাতিশাখ্য-পুষ্পসূত্রের ভূমিকায় (জার্মাণ সংস্করণ, পৃঃ ৫২৫) অধ্যাপক সাইমন উল্লেখ করেছেন: সামগানে প্রথমে ক্রুষ্ট ও প্রথম স্বরের প্রচলন ছিল ও তাদের সংখ্যা-নাম ছিল একই রকমের—যথা ১। কৌথুমীয়রা সেভাবেই তাঁদের গানে ব্যবহার করতেন। সামপরিভাষাতেও এর অনুরূপ উল্লেখ আছে। আবার দেখা যায় ক্রুষ্টস্বরের সংখ্যা-নাম নির্দিষ্ট হয়েছে ২ এবং প্রচয়ের ১। কৌথুমীয়দের মধ্যে ক্রুষ্ট ও প্রচয় স্বরদুটির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাঁদের মতে প্রথমাদি সাত স্বরের সংখ্যা-সন্নিবেশ ১।১।২।৩।৪।৫।৬ অথবা ১।১।২।৩।৪।৫।৬॥ আর ৭ সংখ্যাটিকে তাঁরা ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করতেন। 'ভিন্ন অর্থ' বলতে তাঁরা অভিগীত অর্থে বুঝতেন। অভিগীত হ'ল দ্বিতীয় স্বরের অর্ধমাত্রার সঙ্গে প্রথম স্বরের অর্ধমাত্রার সংযোগ। 'সামপরিভাষা' গ্রন্থে এই সংযোগের চিহ্ন দেওয়া আছে ∧[৮]।

৮। Vide *The Music of the Most Ancient Nations* (1864), p. 2.

সামগানে প্রকৃতি ও বিকৃতি স্বরের ব্যবহার ছিল। প্রকৃতি বলতে প্রধান ও বিকৃতি অনুসঙ্গী। বিকৃতি-স্বর ছিল অনেকটা খৃষ্টীয় শতাব্দীর শ্রুতিস্বরের মতো, কিন্তু কোমল নয়। কেননা বিকৃতি তথা বিকৃত অর্থে কোমল স্বরের যে ব্যবহার তা খৃষ্টীয় শতাব্দীতেই প্রথম প্রচলিত হয় ও নাট্যশাস্ত্রে (২য় শতাব্দী) অন্তর-গান্ধার ও কাকলী-নিষাদই তার প্রমাণ। নারদীশিক্ষায়ও (১ম শতাব্দী) বিকৃত-স্বরের উল্লেখ নাই। মোটকথা বৈদিক গানে তথা সামগানে কোন কোমল স্বরের ব্যবহার ছিল না বলেই মনে হয়। তাছাড়া খৃষ্টপূর্বাব্দের ক্ল্যাসিক্যাল গান্ধর্ব বা মার্গ-সঙ্গীতেও কোমল স্বরের প্রয়োগ ছিল না মনে হয়। তবে ভরত জাতি তথা জাতিগানে (জাতিরাগ-গানে) দু'টি মাত্র কোমল তথা বিকৃত স্বরের (অন্তর-গান্ধার ও কাকলি-নিষাদ) ব্যবহার করেছেন তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। বাল্মীকি রামায়ণে (১।৪।৮-১০) কুশী-লবের কণ্ঠে লীলায়িত শুদ্ধ-সপ্তজাতি গানের কথা উল্লেখ করেছেন,

পাঠ্যে গেয়ে চ মধুরং প্রমাণৈস্ত্রিভিরন্বিতম্।
জাতিভিঃ সপ্তভির্যুক্তং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্ ॥

*　　*　　*　　*

তৌ তু গান্ধর্বতত্ত্বজ্ঞৌ-স্থান-মূর্ছনকোবিদৌ।
ভ্রাতরৌ স্বরসম্পন্নৌ গান্ধর্বাবিবরূপিণৌ ॥

রামায়ণে উল্লিখিত শুদ্ধ-জাতিগানে কোমল স্বরের ব্যবহার সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত শুদ্ধ-জাতিগানে কোমল (বিকৃত স্বর) হিসাবে অন্তর ও কৈশিক বা কাকলির ব্যবহার যে ছিল তা বোঝা যায়। অথচ রামায়ণে ও নাট্যশাস্ত্রের উল্লিখিত শুদ্ধ-জাতিরাগের নাম ও সম্ভবত স্বর-সংগঠন একই ছিল। তাছাড়া একথাও মনে করবার কারণ আছে যে স্বতন্ত্রতার কথা ছেড়ে দিলে পরবর্তী গ্রন্থকারেরা পূর্ববর্তীদেরই অনুসরণ করেন, সুতরাং শুদ্ধ-জাতিরাগের প্রচলন রামায়ণের যুগেই হয়েছিল এবং পূর্ববর্তী শাস্ত্রকারদের কাছ থেকেই ভরত শুদ্ধ-জাতিরাগের সংজ্ঞা লাভ করেন। এটি তাঁর যুগের নূতন সৃষ্টি নয়। মোটকথা ভরত রামায়ণ মহাভারতের যুগের গান্ধর্ব বা মার্গ-গানেরই অনুসরণ করেছেন। সঙ্গীত-রত্নাকরের টীকাকার কল্লিনাথও (১৪৪৬-১৪৬৫ খৃষ্টাব্দ) নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত জাতিরাগ ও গ্রামরাগকে গান্ধর্ব-সঙ্গীত বলে পরিচয় দিয়েছেন—"গান্ধর্বঃ মার্গঃ। গানং তু দেশীত্যবগন্তব্যম্।* * স্বরগতরাগ-বিবেকয়োর্জাত্যাত্মস্বরভাবান্তং যদুক্তং তদ্গান্ধর্বমিত্যর্থঃ।" তেরশ শতাব্দীর

সঙ্গীতের আলোচনার সময় আমরা এ' সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

যাই হোক বৈদিকগানে স্বর-সংখ্যার প্রচলন সম্বন্ধে অধ্যাপক সাইমন বলেছেন সামগানে ১।২।৩।৪ প্রভৃতি স্বর-সংখ্যার প্রচলন ছিল স্বরগুলির পারস্পরিক তথা আপেক্ষিক সম্পর্ক ও সংযোগ-সম্বন্ধকে বোঝাবার জন্য; স্বরের আন্দোলন, গতি বা ক্রমোচ্চতা নির্দেশ করার জন্য নয়। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন উত্তর-গান তথা আরণ্যক, উহ্য ও উহ্যগানের সংখ্যা-সন্নিবেশ ১।২।৩ এবং পূর্বগান তথা গ্রামেগেয়গানের সংখ্যা-সন্নিবেশ ৪।৫।৬-এর সঙ্গে সমপর্যায়ভুক্ত ছিল। অবশ্য প্রস্তাবের বেলায় এর ব্যতিক্রম ঘটত। অধ্যাপক ফক্স-ষ্ট্রাঙ্গয়েজ কিন্তু এ'বিষয়ে একমত নন। তিনি বলেছেন হিন্দুদের স্বর-সপ্তকের (অক্টেভ) গতি ও বিকাশের অর্থ হ'ল স্বরের ক্রমোচ্চতা, অর্থাৎ স্বর যত ওপরে যায় তত তা উচ্চ হয়। অধ্যাপক সাইমন একথা স্বীকার করেন না। ডাঃ ফেল্‌বার ষ্ট্র্যাঙ্গয়েজকেই সমর্থন করেছেন, কেননা তিনি বলেন মনোবৈজ্ঞানিকী নীতি অনুসারে বিচার করলে দেখা যায় সাতটি স্বরের ক্রম-আরোহণে একটির পর অপরটির উচ্চ অভিব্যক্তি বা প্রকাশ হওয়া স্বাভাবিক। বৈদিকের মতো বৈদিকোত্তর গান্ধর্ব ও দেশী-গানের স্বর-সপ্তকের গতি ও প্রকৃতিও তাই। তবে বৈদিক গান সামগানের গতি বা ক্রমসংসরণ উচ্চ (তার) থেকে নীচের (মন্দ্রের) দিকে (বর্তমানের অবরোহণ-গতিতে), আর বৈদিকোত্তর লৌকিক ষড়্‌জাদি স্বরের গতি উচ্চদিকে (আরোহণ-গতিতে)। প্রাচীন গ্রীসিয় সঙ্গীতে স্বর-সপ্তকের গতি ভারতের সামগানের মতো অবরোহী ছিল। মধ্যপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রায় সকল সভ্য জাতির সাঙ্গীতিক স্বরের গতি মধ্যযুগে আরোহণ-গতিবিশিষ্ট দেখা যায়। ডাঃ ফেল্‌বার এ'সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন সামগানের প্রকৃতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় তা তিন হাজার বছরেরও বেশী প্রাচীন, আর প্রাচ্যের তথা ভারতের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অবশ্যই ছিল।

বৈদিক যুগে গান ছাড়াও বিচিত্র বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন ছিল। বৈদিক সাহিত্য-গুলিতে তার বহু প্রমাণও আছে এবং ঋক্‌সংহিতার ৪।২০।২২, ৫।৩৩।৬, ১০।১৮।৩ প্রভৃতি সূক্তে নৃত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। অনেকে একটি মাত্র শব্দ বা সংস্কৃত শ্লোকের উল্লেখে কোন একটি বস্তুকে ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। কিন্তু যেখানে অবলুপ্ত অতীতের কোন চাক্ষুষ সামগ্রীক উপাদান পাওয়া সম্ভব নয় সেখানে সামান্য একটি জিনিস বা উপাদানই সামগ্রীক

জিনিসের প্রামাণ দিয়ে থাকে। সিন্ধু-উপত্যকার প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির আবিষ্কারের পক্ষে শ্রদ্ধেয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-কর্তৃক প্রাপ্ত সামান্য একটি ছুরির ফলকই তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। মধ্যপ্রাচ্যের ও ইউরোপীয় দেশগুলির প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রের আবিষ্কারের সহায়ক-রূপে সেখানকার বর্তমান যুগের চিত্রে আঁকা ও ভাস্কর্যে খোদাই করা প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রের ছবি ও প্রতিকৃতিগুলিই যে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন একথা উল্লেখ ক'রে পাশ্চাত্য মনীষী কার্ল এঙ্গেল বলেছেন :

"With the musical instruments of the ancient Egyptians especially we have become more intimately acquainted during the present century, by means of sculptures and frescoes, which not only furnish representations of instruments, but also show us their use in musical performances, and display the peculiar customs of the people among whom music was common."[১]

পাথরে খোদাই করা বা চিত্রে আঁকা প্রাচীনকালের বাদ্যযন্ত্রের প্রতিকৃতি বা ছবি শুধুই প্রাচীন যুগের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় না, তখনকার সঙ্গীতায়োজন ও সঙ্গীতবিলাসী লোকের নির্দিষ্ট আচার-ব্যবহারের কথাও আমাদের জানিয়ে দেয়। ভারতবর্ষীয় বাদ্যযন্ত্রগুলির বেলায়ও তাই। খৃষ্টপূর্বাব্দে ও খৃষ্টীয় অব্দের গোড়ার দিকে ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রগুলি কি ধরণের ছিল ও কত রকম ছিল তার আভাস আমরা পেতে পারি বাগ, অজন্তা, যোগীমারা, সাঁচী, বারহুত, ইলোরা, এলিফেন্টা প্রভৃতি গিরিগুহায় খোদাই করা ও আঁকা ভাস্কর্য ও ফ্রেস্কো-চিত্রের নিদর্শন থেকে। অতীতের সামান্য বা নগণ্য চাক্ষুষ উপাদানই ঐতিহাসিকের দৃষ্টিপথে মহান্ সত্যকে পরিস্ফুট করতে পারে, সন্দেহের অন্ধকার হ'তে নিশ্চয়তার আলোকে উদ্ভাসিত করতে পারে বহু অজ্ঞানাকে।

বৈদিক বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ক্ষোণী, অঘাটি (আঘাতি), ঘাটলিকা (ঘাতলিকা), কাণ্ড, বাণ, ঔদুম্বরী, কাত্যায়নী, পিচ্ছোরা (পিচ্ছোলা) প্রভৃতি বেণু ও বীণার নাম পাওয়া যায়। চামড়ার বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ছিল দুন্দুভি, ভূমিদুন্দুভি প্রভৃতি। এ'ছাড়া গর্গর, পিঙ্গ, নাড়ী, বনস্পতি, কর্করি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রেরও উল্লেখ আছে। বাণ-বীণায় একশোটি তন্ত্রী বা তার (তন্তু) থাকত—"বাণো মহতি বীণা, শতং তন্তবো

১। Vide *The Music of the Most Ancient Nations* (1865), p. 2.

মহত্যাঙ্গৌ শততন্তুঃ **। অস্মিন বাণে মৌঞ্জাস্তন্তবো বেতসবৃক্ষসম্বন্ধি বাত্থমিত্যর্থঃ।" অর্থাৎ ভাষ্যকার কর্কের বর্ণনায় বাণ একটি বড় আকারের বীণা। তার তন্তুর সংখ্যা ছিল একশো। সেই তন্তুগুলি মুঞ্জাঘাসে তৈরী হ'ত। দণ্ডটি মোটা বেত দিয়ে নির্মিত হ'ত। গোধাবীণা গো-সাপের চামড়ায় তৈরী হ'ত। কাণ্ডবীণার অবয়ব শর বা বেতে তৈরী হ'ত। অধ্বর্যুর পত্নীরা গোধা ও কাণ্ডবীণা (বেণু) বাজাতেন ও নৃত্য করতেন, আর অধ্বর্যুরা সাম গান করতেন। ধনুর্যন্ত্রের কথা বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায়। ধনুর জ্যায়ে শব্দ সৃষ্টি ক'রে (টংকার দিয়ে) আক্রমণকারী শত্রুদের মনে ভয়ের সঞ্চার করা হ'ত। এই ধনু তথা ধনুর্যন্ত্র থেকে পরবর্তী যুগে বেহালার (ভায়োলিন) সৃষ্টি হয়েছিল একথা সোনার্ট, ফেটিস, পিগট, গলপিন, এঙ্গেল প্রমুখ মনীষীরা স্বীকার করেন।[১০] বৈদিক বাদ্যযন্ত্রগুলির বিশদ পরিচয় ও আলোচনা 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে দেওয়া হয়েছে।

খৃষ্টপূর্ব ১৫০০—৬০০ অব্দ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ, সূত্র ও আরণ্যকাদি উপনিষৎ সাহিত্যগুলি রচিত বা সংকলিত হয়েছিল। শাকল ও বাস্কলভেদে ঋগ্বেদের দু'টি শাখা। ঋগ্বেদের উপকরণ নিয়ে ঐতরেয়, কৌষীতকী ও শাঙ্খ্যায়ন ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় ও শাঙ্খ্যায়ন আরণ্যক, ঐতরেয়, কৌষীতকী ও বাস্কল উপনিষদের সৃষ্টি হয়। সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদের শাখাগুলিকে অবলম্বন ক'রে পঞ্চবিংশ বা তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ, জৈমিনীয়, আর্ষেয়-ব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যকাদি উপনিষৎ,

১০। (a) *Voyage aux Indes Orientals,* par M. Sonnerat, Paris, 1806, Vol. I, p. 182.

(b) M. Fétis : *'Antonie Stradivari, précédé de les Transformations des Instruments à Achet',* Paris, 1856.

(c) Carl Engel : *The Music of the Most Ancient Nations* (1864), p. 18.

(d) F. W. Galpin : *A Text Book of European Musical Instruments* (1937).

(e) Schlesinger : *The Precursors of the Violin Family.*

(f) *The Journal of the Music Academy, Madras,* Vol. XIX, 1948, pts. I-IV, pp. 58.

(g) Dr. V. Raghavan : *The Indian Origin of the Violin* (an article)—Vide The Journal of the Music Academy, Madras, Vol. XIX, 1948, p. 65.

তৈত্তিরীয় প্রভৃতি আরণ্যক সংকলিত হয়েছিল। বেশীর ভাগ সত্র বা যজ্ঞগুলিকে মাধ্যম ক'রে যে সব যজ্ঞানুষ্ঠান হ'ত তাতে সামগানের প্রচলন ছিল একথা আগেই আলোচিত হয়েছে। সূত্র-সাহিত্যগুলির সৃষ্টি এ'সব ব্যাপার নিয়েই হয়েছিল। মহর্ষি আপস্তম্ব শ্রৌত ও গৃহ্য দু'রকম সূত্র-সাহিত্যের নামোল্লেখ করেছেন। বৈদিক সমাজে ছোট বড় বিভিন্ন রকমের যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হ'ত। যে সকল যাগ একদিনে সম্পন্ন হ'ত তাদের 'একাহ' বলা হ'ত, যেমন সোমযাগ। আর যেগুলি দীর্ঘকাল ধরে অনুষ্ঠিত হ'ত তাদের 'সত্র' বলা হ'ত। সে' সকল সত্রে ও যজ্ঞে যে সামগান হ'ত তাদের রৌরব, যৌধাজয় স্বুবর্মহা প্রভৃতি নামের মতো ঋক্‌গুলিরও অগ্নিমূর্ধা, ঘৃতবতী, শম্নম্ প্রভৃতি নাম ছিল। বিভিন্ন যজ্ঞে বিভিন্ন স্বরোচ্চারণের বিধি ছিল, যেমন প্রাতঃসবনযজ্ঞে সাধারণত মন্দ্র (খাদ) স্বরের প্রচলন ছিল। স্বিষ্টকৃদ্-যাগে ক্রুষ্ট (চড়া) স্বর, মাধ্যন্দিন-যাগে মধ্যস্বর বা স্বরিত, প্রাগাজ্যভাগ-যাগে মন্দ্রস্বর প্রভৃতির ব্যবহার ছিল।

শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যগুলি রচিত হয় সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব যুগের শেষে ও খৃষ্টীয় অব্দের গোড়ার দিকে। বেদ, শাখাশ্রেণী ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ যেমন বিভিন্ন সময়ে সংকলিত হয়েছিল, শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যের বেলায়ও তাই। নারদীশিক্ষা খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে রচিত বলে মনে হয়। অনেকে এটিকে খৃষ্টপূর্বাব্দে রচিত বলেন। অবশ্য তা হওয়াও একেবারে অসম্ভব বা অসমীচীন নয়। তবে যাঁরা এটিকে খৃষ্টীয় ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত বলতে চান তাঁদের সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয়। তবে নারদীতে বৈদিক ও লৌকিক এবং বিশেষ ক'রে স্বরমণ্ডলের আলোচনা থাকায় এটিকে ভরত-রচিত নাট্যশাস্ত্রের পূর্ববর্তী তথা খৃষ্টীয় অব্দের একেবারে গোড়ার দিকে (১ম শতাব্দী) রচিত বলে মনে করার অনেক কারণ আছে।

ব্রাহ্মণ, সূত্র, আরণ্যক, উপনিষৎ, শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যগুলিতে সঙ্গীতের আলোচনা 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি'র প্রথম ভাগে বিশদভাবে করা হয়েছে। ছান্দোগ্য-উপনিষদে সামগানের মধ্যে একটি বিশিষ্ট চিন্তাধারা ও ব্যবহারিক উপযোগিতার স্থান আছে। সেখানে গায়ত্র্য-সামকে প্রাণশক্তি বলা হয়েছে। রথন্তরসাম অগ্নি, বামদেব্য-সাম স্ত্রী-পুরুষমিথুন, বৃহৎসাম আদিত্য, বিরূপসাম মেঘ, বৈরাজসাম বসন্তাদি ঋতু, শাক্বরিসাম বিভিন্ন লোক, যজ্ঞযজ্ঞীয়সাম দেহের পেশীর মধ্যে প্রাণশক্তি। এ'ধরণের বাস্তব চিন্তা করা হয়েছে সাধকদের উপাসনার জন্য। কামনাযুক্ত ছিল গানগুলি। যেমন রোগশান্তির জন্য ঋক্‌মন্ত্র স্বরযোগে গান করা হ'ত। দীর্ঘজীবন

লাভের জন্য স্বরযুক্ত দুটি সাম গান করে প্রত্যহ তিন অঞ্জলি জলপান করার বিধি ছিল।

ছান্দোগ্যের মধুবিদ্যায়ও সামগানের একটি সার্থকতা আছে। সঙ্গীতের নাদ বা শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা ছান্দোগ্যে আলোচিত হয়েছে। ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীতে গানের ধাতু বা অংশ হিসাবে যেমন মেলাপক, ধ্রুব, অন্তরা, আভোগ অথবা স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ প্রভৃতির নাম আছে, ছান্দোগ্য-উপনিষদে তেমনি হিংকার, উদ্গীথ, প্রস্তাব, প্রতিহার ও নিধন এই পাঁচটি ভক্তির উল্লেখ আছে। ভক্তি বা অংশগুলি সামগানের অপরিহার্য উপাদান ছিল। ভক্তিকে বিভক্তিও বলা হ'ত। প্রধান গানেই অবশ্য ভক্তির ব্যবহার ছিল। কোন কোন সময়ে প্রণব ও উপদ্রব এই দুটি অধিক অংশকে নিয়ে সামগানে সাতটি ভক্তির ব্যবহার হ'ত। ঔপনিষদিক সামগানের বর্ণে বিশ্লেষণ, বিকার, বিরাম, অভ্যাস ও লোপেরও ব্যবহার ছিল। পাঁচটি ভক্তি বা পঞ্চবিধা দ্বারা সামগানকে গানের উপযোগী করা হ'ত ও তার জন্য অর্থশূন্য শব্দ বা অক্ষর যোজনা করা হ'ত। সেই অর্থশূন্য শব্দ বা অক্ষরগুলির নাম ''স্তোভ'। স্তোভের পরিচয় আমরা আগেই উল্লেখ করেছি ও কিছুটা উদাহরণও দিয়েছি। তবে বিশ্লেষণ, বিকারাদি দ্বারা গানে কিভাবে বর্ণোচ্চারণে প্রার্থক্য সৃষ্টি হ'ত তার উদাহরণ যেমন,

(১) বিশ্লেষণ দ্বারা 'অগ্নে'-মন্ত্রের উচ্চারণ হ'ত আঙ্গ,
(২) বিকার " " " " ওগ্নাই,
(৩) বিরাম " 'গৃণানো হব্যদাতয়ে' মন্ত্রের উচ্চারণ হ'ত গৃণানোহ··· ··· প্রভৃতি,
(৪) অভ্যাস " 'বীতায় শব্দের উচ্চারণ হ'ত 'তোয়াঈ তোয়াঈ' (২ বার),
(৫) লোপ " 'সৎসি' উচ্চারিত হ'ত 'ত' লোপ পেয়ে 'সাই' ও 'বর্হিষি' স্থানে 'ব'।

এই বৈদিক মন্ত্রটির পূর্ণ-রূপ যেমন "অগ্নে আ য়াহি বীতায়, গৃণানো হব্যদাতয়ে। নিহোতা সৎসি বর্হিষি"। বিশ্লেষণাদির প্রয়োগে মন্ত্রটি এভাবে উচ্চারিত হয়— ॥ওগ্নাই। আয়াহি। বোইতোয়া—ই। তোয়া—ই। গৃণানোহ। বাদাতোয়া —ই। নাই হোতাসা। ৎসা ইবা ঔহোবা। হী—ষী॥ বর্তমান যুগের গানেও বৈদিক স্তোভের অনুরূপ অক্ষর বা উচ্চারণ-দীর্ঘতার ব্যবহার আছে। যেমন গানের

কথায় আছে 'আদিদেব মহাদেব, ত্রিশূলপাণি জটাধর' প্রভৃতি। গানের সময় এর উচ্চারণ হবে এভাবে—॥ আ আ আ-দি দে এ এ ব। ম হা আ দে এ ব। ত্রি শূ উ-ল পা আ আ ণি। জ টা আ ধ অ অ র॥ কাজেই বর্ণ দীর্ঘতা, বর্ণলোপ বা বর্ণসংক্ষেপে গানের উচ্চারণে দীর্ঘতা ও হ্রস্বতা সৃষ্টির প্রণালী সকল সময়েই প্রচলিত ছিল, এখনো আছে।

শ্রদ্ধেয় লক্ষ্মণ-শংকর ভট্ট-দ্রাবিড় সামবেদীর *"The Mode of Singing Sama Gana"* প্রবন্ধ[১] থেকে তাঁরই স্বরলিপি করা পাঁচটি সামগানের নমুনা এখানে দেওয়া হ'ল :

॥ সামগান ॥

(১) ॥ ওঁ নমঃ সামবেদায় ॥ গায়ত্রম্ ॥

১ ২।৩ ১ ২র।৩ ১ ২। ৩ ১ ২।
॥ ঋচা ॥ ॥ ত ৎ স বি তু র্ব রে ণ্যং ভ র্গো দে ব স্য

১ ২ ৩ ১ ।২ ৩ ১ ২।
ধীমহী । ধি য়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ১ ॥

॥ সামন ॥ ॥ ও s ত ম্ ॥ ॥ ত ৎ স বি তু র্ব রো ণি-
(প্রচলিত গান) । সা - নী রে । । রে রে রে রে রে রে রে

য়ো s ম্ ॥ ভা র্গো দে ব স্য ধী মা হী s ২ ॥
রে - রে রে - রে - রে রে রে - রে - রে - সা - - ।

ধি য়ো য়ো নঃ প্র চো ১ ২ ১ ২ ॥ হিম্
সা রে - রে - রে রে সা - রে-সা-রে-সা- । রে রে রে -

আ ২ ॥ দায়ো ॥ আ s ৩ ৪ ৫ ॥ ১ ॥
সা - । রে - রে - সা - নী - ধ - প ।

॥ দীর্ঘ ৬ ॥ পর্ব ৬ ॥ মাত্রা ২ ॥

॥ ইতি প্রকৃতিসপ্তগানাংগভূতং গায়ত্রাণ্যং প্রথমং গানং সংপূর্ণম্ ॥

(২) ॥ ওঁ নমঃ সামবেদায় ॥ জ্যেষ্ঠসাম ॥ আজ্যদোহম্ ॥

৩১। ২। ৩ ১ ।২ ৩ ১ ।২ ৩ ১
॥ ঋচা ॥ ॥ মূর্দ্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা

২। ৩২৩২উ । ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩
বৈশ্বানরমৃত আজাতমগ্নিম্ ॥ কবিসম্রাজ-

১ ।২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২। ৩ ২
মতিথিংজনানামাসন্নঃ পাত্রে জনয়ন্ত দেবাঃ ॥ ২ ॥

২ ∧ ১ ২র ২র ২র
॥ সামন্ ॥ ॥ ও S ত ম্ ॥ হাউ, হাউ, হাউ ॥
। সা - নী রে । সা-সা সা-সা সা-সা।

২র ৩ ৪র ৫ ২র ৩ ৪র ৫ ২র ৩' ৪র ৫
আজ্যদোহম্ ॥ আজ্যদোহম্ ॥ আজ্যদোহম্ ॥
সা - নী ধ্ - প্ - । সা-নী-ধ্-প্ - । সা-নী-ধ্-প্ - ।

২র ১র ২ ∧ ১ ২ ৩ ৪র ৫
মূর্দ্ধানংদাহ ॥ বা S ৩ অর ॥ তিং পৃথিব্যাঃ ॥
সা-রে-রে-রে রে। সা - নী রে রে । সা নী ধ্ - প্ -

২র ১র ২ ১ র ২র ৩ ৪ ৫
বৈশ্বানরাম্ ॥ ঋ ত আ ॥ জা ত ম গ্নী ম্ ॥
সা-রে-রে-রে রে সা রে রে - সা - নী ধ্ প্ -

২ ১ ২∧ ১ ২র ৩ ৪ ৫
কবি সম্রা ॥ জা S ৩ ম তি ॥ থিং জনানাম্ ॥
সা রে রে রে রে - সা - নী রে রে সা - নী ধ্ প্ -

২র ১ ২∧ ১ ২ ৩ ৪ ৫
আ স ন্নঃ পা ॥ ত্রা S ৩ জ ন ॥ যংতদেবাঃ ॥
সা-রে রে রে - সা - নী ধ্-রে রে সা নী ধ্ প্ -

২র ২র ২র ২র ৩ ৪র ৫ ২র ৩ ৪র ৫
হাউ, হাউ, হাউ ॥ আজ্যদোহম্ ॥ আজ্যদোহম্ ॥
সা-সা, সা-সা, সা-সা সা - নী-ধ্ প্ - সা- নী -ধ্-প্

২র ৩ ৪ ২র ২র ১ ২
আজ্যদো ঽ ৫ হাউ ॥ বা ॥ এ ॥ আজ্যদোহম্ ॥
সা - নী ধ - প প প প সা সা-সা রে-সা

২র ২র ১ ২ ২র
এ ॥ আজ্যদোহম্ ॥ এ ॥
সা- সা-সা-রে-সা সা -

২র ১ ৩ ΛΛΛΛΛ
আজ্যদোহা ঽ ২ ৩ ৪ ৫ ম্ ॥ ২ ॥
সা-সা রে-নী সা - নী - ধ-প-

॥ দীর্ঘ ৩২ ॥ পর্ব ২১ ॥ মাত্রা ২৩

(৩) ॥ ওঁ নমঃ সামবেদায় ॥ মহাবামদেব্যম্ ॥

১ ২। ৩ ১ ২র। ৩ ২ ৩ ১।২ ৩
॥ ঋচা ॥ ॥ কয়ানঃ চিত্র আভুবদূতী সদাবৃধঃ

১ ২। ৩ ১।২ ৩ ২
স খা ॥ কয়াশচিষ্টয়াবৃতা ॥৩॥

৩ Λ ২ ৩ র
॥ সামন্ ॥ ॥ ও ঽ ৪ ম্ ॥ কা ঽ ৫ যা ॥
। সা — নী রে । সা — ধ ধ ।

৪ ২ ৪র ৫ ১
নশ্চা ঽ ৩ ই ত্রা ঽ ৩ আভূবাত ॥ উ ॥
ধ নী — সা — রে — সা নী-নী ধ - । গ- ।

র ২ ১র ২ ১ ১ ২ ব ২
তী স দা বৃ ধঃ সাঃ ॥ খা ॥ ও ঽ ৩ হো হা ই ॥
গ - রে গ - গ রে গ- । গ- । রে — সা সা- রে রে ।

১ Λ ১ ১ ২ ৩ র ২ ১ —Λ
ক য়া ঽ ২ ৩ শ চাই ॥ ষ্ঠ য়ো হো ঽ ৩ ॥ হি ম্মা ঽ ২ ॥
গ গ- রে সা — রে রে । সা সা- রে — সা । গ গ গ-রে।

১ΛΛ Λ ৭ ৭ ২
বা ঽ ২ তো ঽ ৩ ৫ হাই ॥৩॥
গ-রে রে রে সা — ধ —রে রে ।

॥ দীর্ঘ ৬ ॥ পর্ব ১০ ॥ মাত্রা ১৪ ॥

(৪) ॥ ওঁ নমঃ সামবেদায় ॥ গৌতমস্য পর্কম্ ॥

১ ৩ ১ ।২ ৩ ১ ২। ৩ ২।
॥ ঋচা ॥ ॥ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো

৩১ ২। ১ ২। ৩ ১২।
হব্যদাতয়ে ॥ নি হোতা সংসি বর্হিষি ॥৪॥

৪ ∧ ৩ ৪ ২র র ∧
॥ সামন্ ॥ ॥ ও S ৫ ম্ ॥ ও গ্নাই ॥ আয়াহি S
(প্রচলিত গান) । সা — নী রে । সা সা সা । গা-গা-গা —

১ —∧ ১ —∧ ১র ২র
৩ বো ই তো য়া S ২ ই ॥ তো য়া S ২ ই ॥ গৃণানোহ্ ॥
রে ম ম ম ম — গ গ । ম ম — গ গ । ম ম -গ -গ ।

১ —∧ ১ —∧ ১ ২র
ব্যাদাতোয়া S ২ ই ॥ তোয়া S ২ ই ॥ নাইহোতাসা
গ ম ম ম — গ গ । ম ম ম গ গ । ,ম ম গ-ম ম

∧ ১ ∧ ৩ ১ ১ ১ ৫র র
S ২ ৩ ॥ ২ সা S ২ ই বা S ২ ৩ ৪ ঔ হো বা ॥
— গ রে । ম — — গ গ রে — সা -নী—নী — নী— ।

৩ ∧ ১ ১ ১ ৫-
হী S ২ ৩ ৪ ষী ॥ ৪ ॥
রে — গ — রে-সা-নী (স্বর)

॥ দীর্ঘ ৭ ॥ পর্ব ৯ ॥ মাত্রা ৯ ॥

(৫) ওঁ নমঃ সামবেদায় ॥ তার্ক্ষ্যম্-প্রথমম্ ॥

৩ ৩ ২ ৩ ১ ২। ৩ ১ ।২
॥ ঋচা ॥ ॥ ত্যমূষু বাজিনং দেব জূতং

৩ ১ ২ ৩ ১ ৩ ২ ৩৮ ১ ২। ১ ২ । ৩ ১
সহোবানং তরুতারং রথানাম্ ॥ অরিষ্টনেমিং

।২ ১ ২ ২ ২৮ ১ ৩ ১ ।৩ ৩ ১ ২।
পৃত নাজমাশু স্বস্তয়েতার্ক্ষ্য মিহা হুবেম ॥৫॥

৫ ৪ ৫র ২র
॥ সামন্ ॥ ॥ ও S ৬ ম্ ॥ ত্যমূষু ॥ বাজি ॥
(প্রচলিত গান) । সা — নী রে । সা সা- । মা-মা

৩ ∧ ৭ ৭ ৭ ৭ ২র ২র ৩ ৭ ৭ ৭
না S ২ ৩ ৪ ৫ ম্ ॥ দে ব জ তা S ২ ৩ ৪ ম্ ॥
গ — ম -গ — রে -সা । ম - মম - গ — ম - গ - রে — ।

৫র ৩র ২ ১ ২ ∧ ২ ৩ ৪ ৫
স হো বা নং তা ॥ রুতা S ৩ ॥ রং৺র থা না ম্ ॥
সা সা — গ-মপ- । মম মগ । ম - গ — রে - সা- ।

২ ∧ ৩ ∧ ৭ ৭ ৭ ৫ ১ ২
আরিষ্ট S না S ২ ৩ ৪ ই মীম্ ॥ পৃতনা S ৩ ৪ ৩
ম মম — গ — ম -গ -রে — সা— । মমম ম গ রে গ

২ ৩র ৫ ২ ১ ১ র' ২ ৩ ২ ∧
জ মাশূম্ ॥ স্বস্ত ॥ যাই ॥ তার্ক্ষ্যমিহা S ৩ ৪ ৩ ॥
ম গ-সা- । মপ । পপ- । প — মগ ম-গ রে গ ।

২∧ ১ ৪ ∧ ৭ ৭ ৭ ∧ ৭ ৭ ৭
হু S ৩ বা S ৫ ই মা S ৬ ৫ ৬ ॥ ৫ ॥
ম — গ — রে — সা সা সা সা নী সা নী । (স্বর)

॥ দীর্ঘ ৮ ॥ পর্ব ১৩ ॥ মাত্রা ৮ ॥

সংকেত-প্রকাশ :

(১) সংখ্যা···৭ — ১ — ২ — ৩ — ৪ — ৫ — ৬
স্বর ···প — ম — গ — রে — সা — নী — ধ্ (মধ্যমগ্রাম)
রে — সা— নী — ধ্ — প্ — ম্ — গ্ (ষড়্জগ্রাম)

(২) ওপরে 'র' — স্বরে জোর (চাপ), (৩) 'উ' চিহ্ন — উচ্চস্বর, (৪) '—' চিহ্ন কম্পন, (৫) ∧ চিহ্ন—অবগ্রহ বা সংযোগ।[১১]

উপনিষদে সামগানের পরিচয় হ'ল : যে উদ্গাতা যজ্ঞে সামগান আরম্ভ করতেন তাঁকে 'প্রস্তোতা' ও তাঁর গানকে 'প্রস্তাব' বলা হ'ত। যে গানে স্তুতি

১১। Vide *The Poona Orientalist*, Vol. IV, April-July, 1939, Nos. 1 & 2, pp. 1-21.

থাকত তার নাম ছিল 'উদ্‌গীথ'। প্রণবের নাম ওঙ্কার তথা উদ্‌গীথ ছিল। স্তুতি-বাদে মন্ত্ররূপ দেবতাদের আবির্ভাব হ'ত। প্রতিহর্তার গানে দেবতার প্রতিহার বা প্রস্থান অর্থাৎ তিরোভাব হ'ত। নিধন দ্বারা প্রয়াণকারী দেবতাকে তাঁর দিব্যলোকে প্রতিষ্ঠিত করা হ'ত। সে সময়ে পাঁচজন উদ্‌গাতা সমবেতভাবে গান করতেন। প্রস্তাব ও উদ্‌গীথ এ'দুটির মধ্যে প্রণব বা ওঙ্কার এবং প্রতিহার ও নিধনের মধ্যে উপদ্রব এ' ধরণের বিভাগও ছিল। প্রণব গান ক'রে দেবতাদের আহ্বান করা ও উপদ্রব দ্বারা তাঁদের বিসর্জন দেওয়া হ'ত। আজকাল মুদ্রা-প্রদর্শনের দ্বারা দেবতাদের আহ্বান ও বিসর্জন দেওয়া হয়।

ছান্দোগ্যে পাঁচ রকম সামের বিশদ আলোচনা আছে। হিংকার, প্রস্তাব, উদ্‌গীথ, প্রতিহার ও নিধন এই পাঁচটি ভক্তির সাহায্যে পাঁচ প্রকার সাম গান করা হ'ত। গানগুলির ভেতর ঐক্য-চিন্তা ছিল। যেমন হিংকারে পৃথিবী জ্ঞান ক'রে গান করা হ'ত বলে পৃথিবীই হিংকার রূপে কল্পিত হ'ত। সে'রকম অগ্নিতে অনুষ্ঠেয় কর্ম তথা যাগ-যজ্ঞ সম্পন্ন হ'ত বলে অগ্নিই ছিল প্রস্তাব। অন্তরীক্ষে বা আকাশে গান ধ্বনিত হ'য়ে তবে শ্রুতিগোচর হয় বলে অন্তরীক্ষ ছিল উদ্‌গীথ। আদিত্য বা সূর্য তার অভিমুখী হ'য়ে উদিত হয় বলে 'প্রতি'-উপসর্গের যোগে আদিত্যকে প্রতিহার বলা হ'ত। পৃথিবী থেকে প্রস্থান ক'রে বা অন্তর্হিত হ'য়ে জীব স্বর্গে অবস্থান করে বলে দ্যুলোক বা স্বর্গ ছিল নিধন।

পশুতেও পঞ্চবিধ ভক্তির আরোপ ক'রে পঞ্চবিধ 'সাম'-গানের রীতি ছিল। সেই পঞ্চবিধ সামের (সামগান) অর্থ: শোনা যায় পশুর মধ্যে ছাগই প্রথমে আর্যদের গৃহপালিত পশুরূপে গণ্য ছিল, তাই যজ্ঞাদিতে ছাগ বলিদানের ব্যবস্থা ছিল, আর ছাগকে বলা হ'ত হিংকার। আর্যদের মধ্যে পূষণ (পূষা) ছিলেন আদি-দেবতা। এই প্রাচীন দেবতার রথের বাহন হিসাবেও আবার ছাগ কল্পিত হয়েছে। ছাগ অর্থে অজা। অজা ও মেষ সমজাতীয়। তাই মেষ প্রস্তাবরূপে কল্পিত হ'ত। গৃহপালিত পশুদের মধ্যে গোজাতির স্থান ছিল উচ্চে, তাই গোজাতিকে উদ্‌গীথ-রূপে চিন্তা করা হ'ত। মন্ত্রের মধ্যে উদ্‌গীথ তথা প্রণব শ্রেষ্ঠ; সামগান আরম্ভের প্রথমে তাই প্রণব যোগ করা হ'ত—"প্রণবং প্রাক্ প্রযুঞ্জীত"। প্রণবের উচ্চারণ ওম্ অর্থাৎ ও—ম্। বর্তমান লৌকিক স্বরে তাকে গান করতে হ'লে ষড়্‌জ-নিষাদ-ঋষভ এই তিনটি (ইউরোপীয় সি-বি-ডি) স্বরের সমাবেশে গান করা যায়। অশ্বকে বলা হয়েছে প্রতিহার। গাভীর (গো) পরই সাংসারিক কাজে অশ্বের উপযোগিতা দেখা যায়। প্রাচীন কালে কৃষিকার্যে

অশ্বের ব্যবহার ছিল। বৈদিক সাহিত্যে দেখা যায় অশ্ব ছিল ইন্দ্রের রথের বাহন। অবশ্য বৈদিক যুগে ও বিশেষ ক'রে প্রাগ্‌বৈদিক যুগে পশু হিসাবে অশ্ব ছিল কিনা প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের ভেতর যথেষ্ট মতদ্বৈত আছে। তবে বৈদিক যুগের শেষের দিকে আর্য-সমাজে অশ্বের ব্যবহার অবশ্যই ছিল। অশ্ব পুরুষদের প্রতিহরণ বা বহন করত বলে প্রতিহার। সকল পশুই গৃহপালিত, সুতরাং পশু মানুষ তথা পুরুষের আশ্রিত, আর তারই জন্য উপনিষদ্‌কার বলেছেন পুরুষ নিধন-স্বরূপ।

উপনিষদের যুগে সামগানে সাত রকম গায়কীভঙ্গির ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যেমন বিনর্দি, অনিরুক্ত, নিরুক্ত, মৃদু, শ্লক্ষ্ণ, ক্রৌঞ্চ ও অপধ্বান্ত। এগুলিকে অনেকে স্বর বলেন। কিন্তু স্বর বা গানের উচ্চারণ (ইন্‌টোনেশন) বা প্রকাশ-ভঙ্গি হ'ল বিনর্দি প্রভৃতি। এরা ঠিক স্বর নয়। পশু-পক্ষী, ধাতু ও প্রাকৃতিক বস্তুজাত ধ্বনি বা শব্দের অনুকরণে এই ধ্বনি বা ধ্বনির গতি তথা তরঙ্গগুলির নামকরণ করা হয়েছিল। শিক্ষাকার নারদ গান তথা সামগানের দশ রকম গুণ বা গুণবৃত্তির কথা উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী টীকাকার ভট্ট-শোভাকর গুণগুলি শুধুই বৈদিক গানের নয়, লৌকিক গানের সঙ্গেও সম্পর্কিত বলেছেন— "লৌকিকং চ বৈদিকং চ গানং দশগুণযুক্তং তু বৈদিককার্যমিত্যুচ্যতে"। শিক্ষাকার নারদ উল্লেখ করেছেন: "গানস্য তু দশবিধা গুণবৃত্তিস্তদ্‌যথারক্তং পূর্ণমলঙ্কৃতং প্রসন্নং ব্যক্তং বিক্রুষ্টং শ্লক্ষ্ণং সমং সুকুমারং মধুরমিতি গুণাঃ"। রক্ত, পূর্ণ প্রভৃতি ভেদে গুণ দশটি। নারদ তাদের প্রত্যেকটির পরিচয়ও দিয়েছেন। রক্তের লক্ষণ যেমন—"তত্র রক্তং নাম বেণুবীণাস্বরাণামেকীভাবে রক্তমিত্যুচ্যতে", অর্থাৎ বেণু ও বীণার মধুর স্বর-দুটি একীভূত হ'য়ে মানুষের মনকে যে রঞ্জিত করে তারই নাম রক্ত। ভট্ট শোভাকর এই রক্তকেই 'গান' বলেছেন—বংশবীণা-পুরুষস্বরাণামভেদে সতি যা রঞ্জনা তদ্‌রক্তং গানং"। টীকাকারের মন্তব্য একটু ভিন্ন। তিনি বেণু ও বীণার স্বরের সঙ্গে পুরুষের (মানুষের) কণ্ঠস্বরের সম্পূর্ণ একীকরণ বলেছেন। অর্থাৎ তিনি বলেন বেণু, বীণা ও কণ্ঠ যদি একত্রিত হয় তবেই তা সকলের মনকে রঞ্জিত তথা আকৃষ্ট করে, আর তাকেই বলে গান। এখানে গানের সঙ্গে 'রাগ' শব্দটিকেও আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। খৃষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দে রামায়ণের যুগে কুশী-লবের শুদ্ধ সাত জাতিরাগ গানেও আমরা রক্ত কথাটির সার্থকতা খুঁজে পাই। রামায়ণকার কুশী-লবের গীতি-মাধুর্যের মনোহারিত্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন—"সর্বশ্রুতিমনোহরম্‌" (১।৪।২৮)

ও "শ্রোত্রাশ্রয়সুখং গেয়ং" বা "হ্লাদয়ংসর্বগাত্রাণি মনাংসি হৃদয়ানি চ" (১।৪।৩৪)। এখানে 'রাগ' শব্দটি নেই, কিন্তু রাগের সার্থকতা আছে। শিক্ষাকার নারদ 'রক্তং' শব্দটি ব্যবহার করেছেন ও টীকাকার ভট্ট-শোভাকর তার রহস্তকথার পরিচয় দিয়ে বলেছেন "যা রঞ্জনা"। রাগের সার্থকতা হ'ল মানুষের মনকে রঞ্জিত করা—"রঞ্জয়তি শ্রোতৃচিত্তং ইতি রাগঃ"। অবশ্য এ' সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরে করবার চেষ্টা করব। তবে একথা ঠিক যে খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম শতাব্দীর সঙ্গীতগুণী মতঙ্গ তাঁর 'বৃহদ্দেশী' গ্রন্থে "যন্নোক্তং ভরতাদিভিঃ" বলে যে আক্ষেপ করেছেন তার বাস্তবতা কতটুকু প্রমাণিত হয় বিচক্ষণ গুণীমাত্রেই তা অনুসন্ধান করবেন। কেননা রাগের সার্থকতা রামায়ণ ও মহাভারতের যুগেই বা কেন, বৈদিক যুগের সামগানেও ছিল, তবে 'রাগ' শব্দটি প্রত্যক্ষভাবে কোথাও উল্লেখ করা নাই বটে।

অপরাপর গুণগুলির পরিচয় নারদ শিক্ষায় উল্লেখ করেছেন। পরিশেষে তিনি বলেছেন: "এবমেতৈর্দশভির্গুণৈর্যুক্তং গানং ভবতি, এতদ্বিপরীতা গীতিদোষা উচ্যন্তে"। গীতিদোষের উদাহরণে শঙ্কিত, কম্পিত, কাকস্বর তুল্য কর্কশ, অত্যন্ত উচ্চ ও তীক্ষ্ণ, বিরস, ব্যাকুলিত প্রভৃতি বিকৃত স্বরের তিনি আলোচনা করেছেন। গানের দোষগুণ-বিচার-প্রণালী পরবর্তী মার্গপ্রকৃতি-সম্পন্ন দেশীগানেও সংক্রামিত হয়েছিল দেখা যায়। পুরাণাদি সাহিত্যে এর উল্লেখ আছে। সুতরাং শিক্ষাকার নারদই এই বিচারশৈলীর পথপ্রদর্শক কিনা ঐতিহাসিকরা তা বিচার করবেন।

পরবর্তীকালে সামগানের লিখনে ১ ২ অথবা ১ ২ ৩ কিংবা ১ ২ ৩ ৪ ৫ প্রভৃতি সংখ্যার সন্নিবেশ করা হয়েছে গানের গতি নির্দেশ করার জন্য। যেমন গায়ত্রীসামের নিদর্শন—

১ ২।৩ ১ ২র।৩ ১ ২ ৩ ১ ২। ১
॥ গায়ত্রীসাম ॥ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহী ॥

২ ৩ ১ ২। ৩ ১।২
॥ ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥

অক্ষরের ওপর ১ ২ ৩ প্রভৃতি সংখ্যার সার্থকতা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতভেদ আছে। প্রথমত এগুলি অনুদাত্ত (মন্দ্র), স্বরিত (মধ্য) ও উদাত্তের (তার বা উচ্চস্বরের) চিহ্ন। যেমন ১ বলতে অনুদাত্ত, ২ বলতে স্বরিত ও ৩ বলতে উদাত্ত। সুতরাং অক্ষরের

ওপর ১ সংখ্যা থাকলে বুঝতে হবে মন্দ্রস্বরে উচ্চারিত তথা গীত হবে। বেদের বিভিন্ন শাখা অনুসারে অনুদাত্তাদি স্বরগুলির উচ্চারণভঙ্গি নানান্ রকমের হ'য়ে থাকে। শাখাভেদে প্রাতিশাখ্যগুলিও ভিন্ন ভিন্ন। শাখাভেদের মতো যাগ ভেদেও স্বরোচ্চারণ-ভঙ্গি বিভিন্ন রকমের হয়। তৈত্তিরীয় শাখা বা তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্য অনুযায়ী ১ ২ ৩ সংখ্যার উচ্চারণ হয়তো মন্দ্র, মধ্য, তার হবে, কিন্তু এককলা বা একমাত্রার (?) উচ্চারণই যে হবে তার কোন নিয়ম নেই। কেননা ১ সংখ্যার পর যদি ২ সংখ্যা থাকে তবে একমাত্রা-বিশিষ্ট অনুদাত্ত (মন্দ্র) ও স্বরিত (মধ্য) স্বর উচ্চারিত হ'তে পারে। আবার শাখা, প্রাতিশাখ্য বা যাগ অনুযায়ী অনুদাত্তের অর্ধমাত্রা স্বরিতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ১ সংখ্যায় অনুদাত্ত অর্ধমাত্রায় উচ্চারিত হবে ও স্বরিত নিজের একমাত্রা ও অনুদাত্তের অর্ধমাত্রা সমন্বিত হ'য়ে দেড়মাত্রা যুক্ত স্বরে উচ্চারিত হবে। উদাত্তের বেলায়ও তাই। সিকি, অর্ধ বা বারো আনা মাত্রা-যুক্ত (হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত) হ'য়েও অনুদাত্তাদি স্বরগুলি উচ্চারিত হ'তে পারে। বর্তমান সঙ্গীত-পদ্ধতিতেও ঐ ধারা অনুসৃত হয়েছে। ১ ২ ৩ প্রভৃতি সংখ্যাগুলি সম্বন্ধে আবার মতভেদ আছে। এক পক্ষ বলেন মন্ত্রের শব্দ বা অক্ষরগুলি আরোহণক্রমে কিভাবে উচ্চারিত বা গীত হবে তাই ঐ সংখ্যাগুলি বুঝিয়ে দেয়, আগাগোড়া গানের জন্য নয়। অন্য পক্ষ বলেন ১ ২ ৩ প্রভৃতি সংখ্যার দ্বারা স্বরমধ্যগত ব্যবধান বোঝায় ও তা থেকে কোন-না-কোন বৈদিক স্বর মূর্ছনাকেই (যদি অবশ্য তখন সামগানে মূর্ছনার প্রচলন ছিল ধরা যায়) ইঙ্গিত করে ও সেই মূর্ছনাগুলিকে বীণার তন্ত্রীতেও প্রকাশ করা যায়। টি. কে. রাজাগোপালনই অবশ্য এই অভিমত বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি ছান্দোগ্য-উপনিষৎ থেকে একটি মন্ত্রের নিদর্শন দিয়েছেন: "তস্মা ইমে বীণায়াং গায়ন্তি এবম্ তে গায়ন্তি তস্মাত্তে" প্রভৃতি। এ' থেকে বোঝা যায় যে কোন মন্ত্র তথা ঋক্ গান করলে তার সঙ্গে বীণার সহযোগ থাকতই। তাই থেকে একথাও অনুমান করা যেতে পারে যে গানের ১ ২ ৩ প্রভৃতি স্বরের ব্যবধানগুলি কোন-না-কোন মূর্ছনার অনুযায়ী ব্যবহার করা হ'ত ও সেই মূর্ছনাগুলি বীণাতেও লীলায়িত হ'ত।[১২] তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে স্পষ্ট উল্লেখও আছে যে ঋত্বিকেরা যখন

১২। "* * whatever sāmans are sung to the accompaniment of the Vinā invoked Him; from Him they receive wealth. It is evident therefore that the intervals between the svaras 1, 2, 3, etc. in the Gāna texts must always have corresponded to some one or other of the murchchanās which can be intoned on the Vinā."—*The Journal of the Music Academy,* Madras, Vol. XX, 1949, p. 145.

'রাজনসাম' গান করতেন, তাদের পুরনারীরা কাণ্ডবীণা (বংশ-নির্মিত বেণু) ও পিচ্ছোলা বা পিচ্ছোরা-বীণা কোণের (প্লেক্ট্রাম্) সাহায্যে বাজিয়ে সামগানকে সুর-সুষমায় মণ্ডিত করতেন।

এ'ছাড়া শতপথব্রাহ্মণে (৩।১।৫) সামগানে তিনটি স্বরস্থান অর্থাৎ মন্দ্র, মধ্য ও তারের উল্লেখ আছে ও তা থেকে তখনকার গান যে তিনস্থানেই লীলায়িত ছিল তা বোঝা যায়। যেমন সোমযাগে হোত্রীরা প্রাতরানুবাক্ গান করতেন রাত্রি বারোটার পর থেকে উষাকাল পর্যন্ত। ঋক্‌মন্ত্রগুলির গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত গান করার সময় পরিবর্তন হ'তে হ'তে সাতস্বরের (যম) ভেতর দিয়ে কণ্ঠস্বর ক্রমশ মন্দ্রস্থায়ী পর্যন্ত ধ্বনিত হ'ত। প্রাতঃকাল থেকে মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত কণ্ঠস্বর গানে আবার মধ্যস্থায়ী পর্যন্ত ও দ্বিপ্রহরের পর থেকে সায়ংকাল পর্যন্ত তার-স্থানে গিয়ে পৌঁছুত। গানে অনেক সময় সাতস্বরই লীলায়িত থাকত। গানে কণ্ঠস্বরের এরূপ পরিবর্তনের ধারা বর্তমান অভিজাত ক্ল্যাসিক্যাল তথা মার্গপ্রকৃতিসম্পন্ন দেশী-রাগগীতিতেও বর্তমান আছে। কেননা দেখা যায় পূর্বাহ্নের রাগগুলিতে যে ধরণের আরোহণ-অবরোহণগতির স্বর লাগে, মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্ন ও রাত্রিকালের রাগগুলিতে ব্যবহৃত স্বরগুলির গতি বা বর্ণ তাদের থেকে অনেক ভিন্ন। মনে হয় আরোহী, অবরোহী প্রভৃতি বর্ণগুলির ভিন্নতার জন্যই সূক্ষ্মদর্শী সঙ্গীতশাস্ত্রীরা রাগগুলির বিকাশে সময়-নির্ণয় বা কাল-নির্দেশ ক'রে গেছেন।

সামগানের সুরে অনেকে উত্তর-ভারতীয় ভৈরবী ও কর্ণাটকী খরহরপ্রিয়া বা তদনুরূপ রাগের সাদৃশ্য অনুভব করেন। এখনকার মতো বৈদিক গানে রাগ-নামের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু বিভিন্ন সংখ্যার স্বরকে (স্বর-সমাবেশ) নিয়ে তখনও যে সুরের একটি নক্সা বা কাঠামো তৈরী হ'ত একথা স্বীকার করতে হবে। সামগানের সুর বা স্বরসমষ্টি ও শ্রোতাদের চিত্তকে রঞ্জিত করত,—তাদের মনে আনন্দানুভূতি সৃষ্টি করত। কাজেই সামগানের যুগে 'রাগ' শব্দ বা নির্দিষ্ট কোন রাগ-রূপের নক্সার কথা আমাদের জানা নাই বটে, কিন্তু গানের চিত্তবিমোহন করার সার্থকতা ছিল।

প্রথম পরিচ্ছেদ

॥ সামগানোত্তর যুগ ॥

(৬০০— ৪০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ)

ঋগ্বেদের যুগে (২৫০০ বা ২০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ) বড় বড় যাগযজ্ঞের ও বিশেষভাবে সোমযাগের সমারোহপূর্ণ অনুষ্ঠান হ'ত। সামবেদ ও যজুর্বেদ-সংহিতার যুগে সত্র ও যজ্ঞগুলিকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সাজানো হয়েছিল। শ্রৌত বা শ্রুতিসম্মত বড় বড় যাগযজ্ঞগুলির পাশাপাশি গৃহ্য বা গৃহস্থদের জন্য যজ্ঞও সংহিতা ও ব্রাহ্মণগুলির নির্দেশ মতো গড়ে উঠেছিল। সকল যাগযজ্ঞেই সামগানের ব্যবস্থা ছিল। সামগানের সঙ্গে বীণাদি বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ও নৃত্যের সমাবেশ থাকত। পূষা, বরুণ, আদিত্য, বায়ু প্রভৃতি দেবতাদের পাশাপাশি বৈদিক দেবতা-রূপে রুদ্রেরও আবির্ভাব হয়েছিল। বৈদিক রুদ্রই পরবর্তীকালে শর্ব বা শিব নামে অভিহিত হন। তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে আবার নারায়ণ ও বিষ্ণুকেও একই সঙ্গে দেখা যায়। গন্ধর্ব, অপ্সরা, নাগদের আবির্ভাবও এই ব্রাহ্মণের যুগে হয়। গন্ধর্ব ও অপ্সরারা সঙ্গীতে (কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত) ও নৃত্যবিদ্যায় কৃতবিদ্য ছিল। নারদ, তুম্বুরু বিশ্বাখিল, বিশ্বাবসু, হাহা, হুহু প্রভৃতি গন্ধর্বশ্রেষ্ঠরা ব্রাহ্মণের যুগ থেকে পৌরাণিক যুগ পর্যন্ত অবাধে লীলাখেলা করেছেন দেখা যায়।

ঋগ্বেদের যুগে আর্যরা বর্তমান কাবুল থেকে আরম্ভ ক'রে গঙ্গার পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত সুবিস্তৃত স্থান জুড়ে বসবাস করত। গ্রাম থেকে আরম্ভ ক'রে ক্রমে বড় বড় রাজত্ব গড়ে উঠলো। বৈদিক যুগের শেষদিক পর্যন্ত উপরি উক্ত উর্বর ভূমি অধিকার ক'রে আর্যরা তাদের রাজ্য বৃদ্ধি করতে লাগলো। যমুনা, আপ্তি, গণ্ডক প্রভৃতি নদীর ধারে ধারেও তাদের রাজত্ব বিস্তৃত হ'য়ে পড়লো। ক্রমে গোষ্ঠীবৃদ্ধি ও বিস্তারের জন্য বিন্ধ্য-অরণ্যের ভেতর দিয়ে তাদের অনেকগুলি দল দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলো। তখন আর্য-বসতির পরিধি হ'ল সরস্বতী ও গঙ্গার মধ্যবর্তী স্থানগুলি। ক্রমে সে সকল জায়গায় কুরু, পাঞ্চাল ও অন্যান্য জাতিদের রাজত্ব গড়ে উঠলো ও বিশেষভাবে ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা বিকাশ লাভ করলো। কতকগুলি আর্যজাতির দল সরযূ ও বরণাবতীর তীরবর্তী প্রদেশ কোশল ও কাশী-অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করে। বিদেহরা গণ্ডকের পূর্বতীরে বসবাস করলো ও

বিদর্ভেরা তাদের রাজ্যবিস্তার করলো পশ্চিম তীরে। শংকর বা মিশ্রজাতি হিসাবে পূর্ববিহার-অঞ্চলে অঙ্গ, দক্ষিণ-বিহারে মগধ ও আদিম অধিবাসী হিসাবে উত্তর-বাঙ্গালায় পুণ্ড্র ও বিন্ধ্য-অরণ্যে পুলিন্দ, শবরাদি জাতিরা বাস করত।

কুরু-পাঞ্চালেরাই প্রথমে আসন্দীবত ও কাম্পিল (কাম্পিল্য) দেশে রাজ্য বিস্তার করে। কুরুরা সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যে কুরুক্ষেত্রে, দিল্লী ও মিরাট জেলার অঞ্চলগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। কুরুরা সম্ভবত পুরু ও ভরতজাতিদের সংমিশ্রণে সৃষ্ট। পাঞ্চালরা ঋগ্বৈদিক জাতি থেকে উৎপন্ন হ'য়ে ক্রিবিজাতি নামে পরিচিত হয়। দক্ষিণদেশে ভোজ-রাজত্ব ছাড়া গোদাবরীর তীরে অন্ধ্র ও অন্যান্য আদিম অধিবাসীদের বসবাসের সন্ধান পাওয়া যায়।

উপনিষদের যুগেই পাঞ্চালদেশ ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির কেন্দ্র-রূপে পরিণত হয়েছিল। বিদেহরাজ জনক, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি বিজ্ঞানী জনপদপতি ও মনীষীরা পাঞ্চাল তথা ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির মুখোজ্জ্বল করেছিলেন। কুরু ও পাঞ্চালের সকল রকম সাংস্কৃতিক ধারার সমন্বয়-সাধন করেছিলেন বিদেহরাজ জনক।

অবন্তি, বৎস, কোশল ও মগধ এই চারটি রাজ্যেই বিশেষ বিস্তার লাভ ঘটে। অবন্তির রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী (বর্তমান মালোয়া)। রাজা চণ্ড প্রদ্যোত মহাসেন সেখানে রাজত্ব করতেন। এলাহাবাদের কাছে কৌশাম্বী বা কোশম জেলায় বৎসরাজ্যের অধিপতি ছিলেন ভরত-বংশের উদয়ন। কোশলে রাজত্ব করতেন রাজা মহাকোশল ও পরে তাঁর পুত্র প্রসেনজিৎ। সরযূনদীর তীরে অযোধ্যায় এঁদের রাজধানী ছিল। মগধ বিহারের দক্ষিণভাগে। পাটনা ও গয়াজেলা পর্যন্ত মগধরাজ্যের বিস্তৃতি ছিল। খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ—৫ম অব্দে পৌরাণিক শিশুনাগ রাজাদের দ্বারা মগধের সিংহাসন অধিকৃত হয়। চেদি বা চেটি, মৎস্য, শৌরসেন, অশ্বক, গান্ধার, কাম্বোজ প্রভৃতি দেশের বিস্তারও এ'সময়ে শোনা যায়। চেদিরা নেপালের পর্বতাঞ্চল ও কৌশাম্বীর কাছে বুন্দেলখণ্ড এই দুটি জায়গায় বাস করত। বর্তমান পেশোয়ার (পুরুষপুর) ও রাওলপিণ্ডি জেলায় গান্ধার বা গন্ধর্বদেশ অবস্থিত ছিল। গান্ধারের সঙ্গে কাম্বোজের ছিল যোগসূত্র। এ'সমস্তই ৬ষ্ট—৫ম খৃষ্টপূর্বাব্দের কথা। এ'সময়ের সমাজে সঙ্গীত ও অন্যান্য শিল্প-সৌন্দর্যের কোন কাহিনীই সঠিকভাবে জানা যায় না। তখনকার ঐতিহাসিকরা এ'সব বিষয়ে উদাসীন ছিলেন বলে মনে হয়। প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্য থেকে আমরা জানতে পারি গৌতম বুদ্ধের সময়ে ভাগলপুরের কাছে চম্পা, পাটনা-জেলায় রাজগৃহ, শ্রাবস্তি, সাকেত বা অযোধ্যা

(আউধ), কৌশাম্বী ও বারাণসী (কাশী) এই ছ'টি অঞ্চল সকল দিক দিয়ে বিশেষ উন্নত ছিল। গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয় খৃষ্টপূর্ব ৫৬৬ অব্দে কপিলাবস্তুর কাছে লুম্বিনীগ্রামে। তখনকার সমাজে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের আয়োজন ও অনুশীলন যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে হ'ত বৌদ্ধ-জাতকাদি কথা বা কাহিনী-সাহিত্য তা প্রমাণ করে। সংহিতা, ব্রাহ্মণ, সূত্র, আরণ্যক, উপনিষৎ প্রভৃতির যুগে ভারতীয় সমাজে সঙ্গীতের যে অনুশীলন ও সমাদর ছিল ইতিহাসই তা সাক্ষ্য দেয়। ভাষা ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে আলোচনা করলে দেখা যায় কৃষ্ণযজুর্বেদের মৈত্রায়নী ও অথর্ববেদের মাণ্ডুক্য উপনিষৎ বৌদ্ধযুগেই রচিত বা সংকলিত হয়েছিল। শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যগুলি বৈদিক সাহিত্য ও সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা করেছে বটে, কিন্তু তাদের বেশীর ভাগই বৌদ্ধযুগের প্রভাবে পরিবর্ধিত বলে মনে হয়।

খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতকে পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ রচনা করেন। অষ্টাধ্যায়ীতে তিনি যে ভিক্ষু ও নটসূত্রের উল্লেখ করেছেন তা থেকে তদানীন্তন সমাজে নাট্যাভিনয়ের ব্যাপারে নৃত্য-গীতের যে প্রচলন ছিল তা সহজেই বোঝা যায়। পাণিনি ৪।৩।১১০ সূত্রে উল্লেখ করেছেন: "পারাশর্য-শিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ।" ভট্টোজি-দীক্ষিত সূত্রটিতে আলোকপাত ক'রে টীকায় বলেছেন: "পারাশর্যেণ প্রোক্তং ভিক্ষুসূত্রমধীয়তে পারাশরিণো ভিক্ষবঃ। শৈলালিনো নটাঃ।" আবার অষ্টাধ্যায়ীর ৪।৩।১১১ সূত্রে উল্লিখিত হয়েছে: "কর্মন্দকৃশাশ্বাদিনিঃ।" ভট্টোজি-দীক্ষিত টীকামুখে এর অর্থ করেছেন: "কর্মন্দেন প্রোক্তমধীয়তে কর্মন্দিনো ভিক্ষবঃ। কৃশাশ্বিনো নটাঃ।" এ' থেকে বোঝা যায় পাণিনির আগে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতকেরও আগে কৃশাশ্ব ও শিলালি নটসূত্র (নাটক) রচনা করেছিলেন। অধ্যাপক হিলেব্রাণ্ড এই নটসূত্রকে প্রাচীন বাত্মাদি-নাটক বলে মন্তব্য করেছেন। পাশ্চাত্য মনীষী ষ্টেন কনো বলেন এক পাণিনি ছাড়া কৃশাশ্ব ও শিলালির নটসূত্রের কথা আর কোন গ্রন্থকার উল্লেখ না করলেও মনে হয় ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে (সেই প্রাচীন নটসূত্রের) অনুসরণ করেছেন। কিন্তু এ' নিয়ে যথেষ্ট মতদ্বৈততা আছে। পাণিনি অষ্টাধ্যায়ীর ৪র্থ অধ্যায়ে বাদ্যশিক্ষাকে শিল্পের অন্তর্ভুক্ত ক'রে মৃদঙ্গাদি বাদ্যযন্ত্রেরও নাম উল্লেখ করেছেন: (১) "শিল্পম্" (৪।৪।৫৫)। টীকাকার ভট্টোজি-দীক্ষিত এ' প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন: "মৃদঙ্গ-বাদনং শিল্পমস্য মার্দঙ্গিকঃ।" (২) "মড্ডুকঝর্ঝরাদন্যতরস্যাম্" (৪।৪।৫৬)। টীকাকার বলেছেন: "মড্ডুকবাদনং শিল্পমস্য মাড্ডুকং। মাড্ডুকিকঃ। ঝার্ঝরঃ

ঝার্ঝরিকাঃ।" মড্ডুক ডমরুর চেয়ে কিছু বড় চর্মবাদ্য-বিশেষ। জৈন 'রায়পসেনিয়' গ্রন্থে মড্ডুকের উল্লেখ আছে। ঝর্ঝর ঝাঁঝরের নামান্তর। এটি কাংস্যবাদ্য-বিশেষ। জৈন রায়পসেনিয়সূত্রে 'তুম্ববীণা'-রও উল্লেখ আছে। ডাঃ ভি. এস. আগরওয়ালা এই তুম্ববীণাকেই তম্বুরা, তুম্বুরা, তুম্বুরুবীণা বলে মন্তব্য করেছেন।[১]

খৃষ্টপূর্ব ৩য়-২য় শতকে অষ্টাধ্যায়ী পাণিনির ভাষ্যকার পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে উল্লেখ করেছেন তাঁর সময়ে অভিনয়-মঞ্চ ও নাটকাভিনয়ের রীতি বর্তমান ছিল। তিনি অন্যান্য শিল্পের মতো রঙ্গ, আরম্ভক, নট, গ্রন্থিক, শোভনিক প্রভৃতি শব্দের দ্বারা নাটকাভিনয়ের কথাই প্রকাশ করেছেন। তখনকার লোকে আমোদ-প্রমোদের অঙ্গ-রূপে অভিনয়াদি দর্শন করত, সমাজে তার জন্য বিশেষ কোন বিধিনিষেধ ছিল না। পতঞ্জলি নাটকের নিদর্শন-রূপে 'কংসবধ' ও 'বালিবধ' নামে দুটি নাটকের ঘটনার উল্লেখও করেছেন ও সঙ্গে সঙ্গে কংস ও কৃষ্ণের ভূমিকা যারা গ্রহণ করত সেই নটদের মুখে কিভাবে লাল রঙ ও কালো রঙ্ মাখানো হ'ত তারও বর্ণনা করেছেন।[২] এ' ছাড়া সঙ্গীতের উপাদান হিসাবে মৃদঙ্গ, পিথর, বীণা, দুন্দুভি প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। নৃত্য ও নর্তকীর উল্লেখও তিনি বাদ দেন নি। অবশ্য বাদ্যযন্ত্রগুলির নির্মাণ ও অনুশীলন-পদ্ধতির সুনির্দিষ্ট কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু ললিতকলার প্রতি তখনকার সমাজবাসীদের যে অনুরাগ ছিল ও তারা নৃত্য, গীত ও বাদ্যের রীতিমত অনুশীলন করত একথা বেশ বোঝা যায়।

খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ-৩য় শতকে দক্ষিণ-ভারতে যে সঙ্গীতের যথেষ্ট অনুশীলন ছিল তার চাক্ষুষ নিদর্শন পাওয়া যায় 'শিলপ্পদিকারম্' নামে তামিল নাটক থেকে। মতঙ্গের

১। Vide Dr. V. S. Agrawala: *Some Early References to Musical Rāgas and Instruments* (in Journal of the Music Academy, Madras, Vol. XXIII, Pts. I-IV, 1952, pp. 113-14).

২। শ্রদ্ধেয় প্রবোধচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর ইংরাজী 'পতঞ্জলি' নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন: "There were both theatrical stage and performance, and people used to go there for amusement. * * Patanjali has clearly shown how the incidents of *Kaṁsa-badha* and *Bāli-badha* formed the subject of theatrical representations; and he particularly states how the actors representing the sides of *Kaṁsa* and *Krishna* besmeared their faces with black and reddish tinge respectively."—*The Indian Historical Quarterly*, Vol. II, December, 1926, p. 751.

'বৃহদ্দেশী' গ্রন্থে (খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম শতাব্দী) 'দাক্ষিণাত্য' নামক দেশীরাগটি দক্ষিণ-ভারতেরই অবদান। ভৌগলিক সীমারেখা হিসাবে উত্তর-ভারত, মধ্যভারত ও দক্ষিণ-ভারত প্রভৃতির অস্তিত্ব থাকলেও খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে কেন—খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর ভারতেও উত্তর ও দক্ষিণ বলে সঙ্গীতের মধ্যে কোন ভেদ ছিল না। নাট্যশাস্ত্র, দত্তিলম, বৃহদ্দেশী, সঙ্গীত-মকরন্দ, সঙ্গীতসময়সার, সঙ্গীত-রত্নাকর প্রভৃতি শাস্ত্র-নির্দেশিত এক অখণ্ড সঙ্গীতধারারই প্রচলন ছিল সমগ্র ভারতবর্ষে। 'দাক্ষিণাত্য' আঞ্চলিক রাগটি থেকে বোঝা যায় দক্ষিণ তথা তামিল-ভারতে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের অনুশীলন অব্যাহত ছিল। 'শিলপ্পদিকারম্' একখানি তামিল নাটক, এটি রচনা করেন ইলাঙ্গের আদিগল।[৩] এই গ্রন্থে যে 'ইসই' বা সঙ্গীতের একটি অধ্যায় আছে—তাতে গান্ধর্ব বা মার্গশ্রেণীভুক্ত নৃত্য, গীত ও বাদ্যের আলোচনা আছে। পরবর্তী সময়ে আদিয়ার্কুনল্লার ও অরুম্পদবুরৈয়ার এ' নাটকটির দুটি ভাষ্য রচনা করেন ও বিশেষ ক'রে আদিয়ার্কুনল্লার-রচিত ভাষ্যে 'পঞ্চভারতীয়ম্' শব্দের উল্লেখ আছে। মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ-কবি অনুমান করেন শাস্ত্রকার হিসাবে পঞ্চভরত বা পাঁচজন ভরত ছিলেন ও তাঁদের নাম সম্ভবত আদি-ভরত, নাট্যশাস্ত্রকার ভরত, দত্তিল-ভরত, কোহল-ভরত ও যাষ্টিক-ভরত। মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ-কবি আদি-ভরত বলতে সদাশিব-ভরতের নাম উল্লেখ করেছেন। অনেকের মতে ব্রহ্মাভরতই আদি-ভরত, আবার অনেকের মতে ব্রহ্মাভরতের নাম বৃদ্ধভরত। নাট্যশাস্ত্রের প্রসঙ্গে আমরা এ' সম্বন্ধে কিছু বিশেষভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করব। আদিয়ার্কুনল্লার-রচিত ভাষ্যে উল্লিখিত 'পঞ্চভারতীয়ম্' শব্দটি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ডাঃ রাঘবন বলেছেন 'পঞ্চভারতীয়ম্' একটি গ্রন্থ, তা পঞ্চভরতের বোধক নয়। তাই পাঁচজন ভরতের ধারণাকে তিনি নিছক অনুমান বলেছেন। 'ভরত' বা 'ভরতম্' আসলে নারদ, ইন্দ্র প্রভৃতির মতো একটি উপাধি মাত্র। তা ছাড়া নট-মাত্রকেই তখন ভরত আখ্যা দেওয়া হ'ত। তবে একথা ঠিক যে 'শিলপ্পদিকারম্' প্রভৃতি তামিল নাট্যগ্রন্থ থেকে নিঃসংশেয় জানা যায় প্রাচীন তামিল-সঙ্গীত কি ধরণের ছিল ও তার প্রভাবও সমগ্র দক্ষিণ-ভারতে কিভাবে বিস্তৃত ছিল। তখনকার সঙ্গীতে স্বর-সপ্তক প্রায় বারোটি সমান অংশে ভাগ

৩। মহামহোপাধ্যায় স্বামিনাথ আয়ারের সম্পাদিত একটি তামিল সংস্করণ ও ভি. আর. আর. দীক্ষিত-অনূদিত ও অক্সফোর্ড প্রেস (১৯৩৯) থেকে প্রকাশিত ইংরাজী সংস্করণ পাওয়া যায়।

করা ছিল ও সেই প্রাচীন ধারার সঙ্গে আধুনিক কর্ণাটকী সঙ্গীত-পদ্ধতির বিশেষ মিল না থাকলেও মূলসূত্রের দিক থেকে উভয় ধারার মধ্যে বেশ একটি সামঞ্জস্যের ভাব লক্ষ্য করা যায়। বিবর্তনময় মনুষ্য-সমাজে পরিবর্তন সকল জিনিসেরই হয়েছে ও ভবিষ্যতেও হবে। বর্তমান দক্ষিণ-ভারতীয় কর্ণাটকী-ধারা হয়তো বিদ্যারণ্য-প্রবর্তিত পনেরোটি মেলরাগ (জনকরাগ) ও পঞ্চাশটি জন্যরাগ অথবা গোবিন্দ-দীক্ষিত ও বেঙ্কটমুখী-প্রবর্তিত বাহাত্তরটি মেলরাগ-পদ্ধতি থেকে বেশ কিছুটা আলাদা হ'য়ে পড়েছে, কিন্তু প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে অনুস্যূত একটি মূল-যোগসূত্র মোটেই নষ্ট হয়নি। 'শিলপ্পদিকারম্' প্রভৃতি তামিল গ্রন্থ ও তাদের সপ্তক-বিভাগের প্রসঙ্গে এন. এস. রামচন্দ্রনের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য।[৪]

৪। "Between the Śilappaḍikâram and the commentaries by Aḍiyârkunallâr and Arumpadavuraiyâr few works have survived to-day. But these three works are sufficiently explanatory and homogeneous to give a coherent idea of Tamil music and its influence. The one most striking feature of this system was the division of the octave into 12 almost equal divisions or 12 degrees. We find this division to be a vital aspect of the division of the octave in Karnâtic music to-day. Such a division may be made in several ways by the varied use of microtones but the principle of the division matters and is universally accepted. It may be said that this division in Tamil music is only incidental to the astrological parallel employed in the consideration of the octave and its śrutis; and the hypothesis may be proposed that since the Pañca (or Catuś) Śruti Ri was identified with Śuddha Ga, and Satśruti Ri with Sâdhâraṇa Ga, since the lower tetrachord Sa to Ma was taken to be divided only by Śuddha Ri, Śuddha Ga, Sâdhâraṇa Ga and Antara Ga, since Śuddha Ma and Pa were taken to be separated by a sharp Ma and since the upper tetrachord Pa to Sa was considered a replica of the lower, the division of the octave into 12 Sthânas or degrees was evolved as a matter of development, when these notions about these notes were accepted about the time of Veṅkatamakhin. But as against this proposition, it must be noted that the ancient Tamils reckoned a fourth as the fifth note and a fifth as the seventh note respectively from the keynote, and this would not be possible if the octave was not divided into 12 degrees. This is most remarkable since it dates from the time before the Christian era. The influence of this division and also of music of the Nâyanârs and Âlvârs should have been persistently active in settling the form of Karnâtic music, though we have not got any book on theory in Tamil after Aḍiyârkunallâr which explicitly says this."—N. S. Râmachandran: *The Rāgas of Karnātic Music* (1838), pp. 3-4.

শিলপ্পদিকারম্ এবং অদিয়ার্কুনল্লার ও অরুমপদবুরৈয়ার রচিত ছুটি টীকা-গ্রন্থের মাঝখানে খুব কম তামিল-গ্রন্থই আজ পর্যন্ত বেঁচে আছে। প্রাচীন তামিল-সঙ্গীত ও তার প্রভাব কি ধরণের ছিল বোঝার জন্য এ' তিনটি গ্রন্থই যথেষ্ট।

সিংহলী মহাবংশ থেকে জানা যায় নন্দ-রাজাদের আগে শিশুনাগবংশের বিম্বিসার (খৃষ্টপূর্ব ৫৪৪—৪৯৮) ও অজাতশত্রু (খৃষ্টপূর্ব ৪৯৩—৪৬২) এবং উদয়ভদ্র, অনুরুদ্ধ, মুণ্ড, নাগদাসক, কালাশোক (খৃষ্টপূর্ব ৪৬২—৩৬৪) প্রভৃতি ও পরে নন্দ-রাজাগণ (খৃষ্টপূর্ব ৩৬৪—৩২৪) রাজত্ব করেন। নন্দ-রাজাদের সময়ে ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করার আগে (খৃষ্টপূর্ব ৩২৪) গ্রীকরাজ আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন (খৃষ্টপূর্ব ৩২৬) হিন্দুকুশ-পর্বত অতিক্রম ক'রে। আলেকজাণ্ডারের অভিযান নিষ্ফল হলেও তাঁর ভারত-আক্রমণে গ্রীস ও ভারতের মধ্যে যে একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল ও ভারতের ভাবধারা গ্রীসদেশে সংক্রমিত হয়েছিল একথা নিশ্চিত। গ্রীক-ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে জানা যায় চম্পা, রাজগৃহ, কোশল, বৈশালী, কৌশাম্বী, পাটলিপুত্র, দক্ষিণ-উড়িষ্যায় কলিঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চলে ও বিশেষ ক'রে অজাতশত্রুর রাজত্বকালে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মহিমময়ী ভাবধারা ভারতের বাইরের দেশগুলিতে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে। বিচিত্র রকমের শিল্প, আমোদপ্রমোদ ও বিশেষ ক'রে অন্তঃপুরচারিণীদের ভেতর নৃত্য, গীত ও বাদ্যের অবাধ অনুশীলনের বিকাশ ছিল। প্রত্যেক রাজপ্রাসাদের সঙ্গে একটি ক'রে নাট্যমন্দির বা নৃত্যগৃহ (ডানসিং হল) থাকত। অধিকাংশ লোকই নৃত্য ও গীতে অনুরক্ত ছিল। শাস্ত্রসম্মত নৃত্যকলায় পারদর্শিনী দেবদাসীরাও নৃত্য-গীতের অনুশীলন করত। ললিতকলার শ্রীবৃদ্ধি-সাধনের জন্য রাজদরবারের সহানুভূতি ও অকুণ্ঠ অর্থদান ছিল। কাজেই খৃষ্টপূর্ব ৫ম-৪র্থ শতকের ভারতীয় সমাজে সঙ্গীতের যথেষ্ট সমাদর ছিল। বৈদিক সঙ্গীত সামগানের অনুশীলন তখন মন্থর হলেও রাজদরবারে ও সাগ্নিক ব্রাহ্মণদের সমাজে তার অনুশীলন বেঁচে ছিল। স্তোম, স্তোত্র, ঋক্, সাম, গাথা প্রভৃতি গানের পাশাপাশি সামগানের অনুকরণে ও নূতন ধারায় প্রবর্তিত আভ্যুদয়িক ও নিঃশ্রেয়সমূলক গান্ধর্ব বা মার্গ-সঙ্গীতের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। গান্ধর্বের মান ও কৌলিন্য তখন বৈদিক গানের মতোই সমুন্নত ছিল।

মগধরাজ বিম্বিসারের সময়ে (খৃষ্টপূর্ব ৫৪৪—৪৯৮) পুরুষপুর বা পেশোয়ার ও রাওলপিণ্ডির চতুঃপার্শ্বস্থ অঞ্চল তথা গান্ধারদেশ পুক্কুসাতি রাজার অধীনে ছিল। প্রাচীন গান্ধাররাজ্য সিন্ধুনদ দিয়ে দু'ভাগে বিভক্ত ছিল: সিন্ধুর পশ্চিমতীরে

ছিল পুষ্কলাবতী (বর্তমান পেশোয়ার জেলায়) ও পূর্বতীরে তক্ষশীলা (বর্তমান রাওলপিণ্ডি জেলায়)। কবি কালিদাস তাঁর 'রঘুবংশ' মহাকাব্যে উল্লেখ করেছেন ভরতের দুই পুত্র তক্ষ ও পুষ্কলের নামানুসারে ঐ দুটি স্থানের তথা রাজধানীর নাম হয়েছিল তক্ষশীলা ও পুষ্কলাবতী—"স তক্ষপুষ্কলৌ পুত্রৌ রাজধান্যোস্তদাখ্যয়ো" (১৫।৮৯)। তখন মধ্য-এশিয়া থেকে ভারতের মধ্যে একটি বাণিজ্যিক রাস্তা ছিল। বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থী ও মনীষীরা ঐ পথ দিয়ে ভারতে আসতেন বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভের জন্য। উত্তরাপথে কাম্বোজ ও মগধের সঙ্গে গান্ধারের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কও স্থাপিত হয়েছিল। গান্ধার ছিল গন্ধর্বজাতির প্রধান কেন্দ্রস্থল। গন্ধর্বরা ছিল অত্যন্ত সঙ্গীতকুশল। তাদের প্রিয় ও প্রীতিকর সঙ্গীতকেই নাট্যশাস্ত্রকার ভরত বলেছেন 'গান্ধর্ব'—"তথা প্রীতিকরং পুনঃ, গন্ধর্বাণামিদং যস্মাং তস্মাদ্ গান্ধর্বমুচ্যতে" (২৮।৯)। দেবলোক-বাসীদেরও গান্ধর্বসঙ্গীত ছিল বিশেষ মঙ্গলপ্রদ—"অত্যর্থমিষ্টং দেবানাং" (২৮।৯)। গান্ধারের পর তক্ষশীলা ছিল তখন ভারতের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রস্বরূপ। তক্ষশীলার ধ্বংসস্তূপ থেকে শীলমোহর ও কয়েকটি ভাস্কর্যমূর্তি যে আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের মধ্যে নৃত্যভঙ্গিতে একটি নটীর মূর্তিও পাওয়া গেছে। নটীর হস্তের মুদ্রা খৃষ্টীয় ২য়-৩য় শতকের নন্দিকেশ্বর-প্রণীত 'অভিনয়দর্পণ' ও ভরত-প্রণীত 'নাট্যশাস্ত্র' প্রভৃতিতে উল্লিখিত মুদ্রার সঙ্গে মেলে। এ' থেকে প্রমাণ হয় যে নন্দিকেশ্বর ও ভরতের অনেক আগেই খৃষ্টপূর্ব অব্দে ভারতীয় সমাজে শাস্ত্রীয় মুদ্রাযোগে নৃত্যের পরিবেশন করা হ'ত। ব্রহ্মা, সদাশিব, কোহল প্রভৃতি আচার্যদের রচিত নাট্যগ্রন্থের উল্লেখও আমরা পেয়েছি। ব্রহ্মা ও সদাশিব ভরত, দত্তিল, নন্দিকেশ্বর, কোহলাদির পূর্ববর্তী গ্রন্থকার। অধ্যাপক ফিনোট উল্লেখ করেছেন বৌদ্ধগ্রন্থ 'মঞ্জুশ্রীমূলকল্প' গ্রন্থটিতে হস্তমুদ্রার উল্লেখ আছে ও বৌদ্ধ-দেব-দেবীদের হস্তে মুদ্রার পরিস্ফুট রূপের প্রকাশ পেয়েছে। বৌদ্ধ বজ্রবারাহীদেবী হেরুকার প্রথম পত্নীরূপে কল্পিত। তাঁর নামও মহামুদ্রা। অধ্যাপক পৃজিলাস্কি উল্লেখ করেছেন যে, 'রামপূজাসরণি' ও বিশেষভাবে খৃষ্টপূর্বাব্দের পাঞ্চরাত্র-সংহিতা-গুলিতেও মুদ্রার উল্লেখ আছে। খৃষ্টীয় অব্দের 'নারদপঞ্চরাত্র' গ্রন্থে ২৪ রকম মুদ্রার পরিচয় দেওয়া আছে। বিশেষ ক'রে তান্ত্রিক ক্রিয়ানুষ্ঠানে মুদ্রার প্রয়োগ অপরিহার্য। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন বাজসনেয়-প্রাতিশাখ্যে ও পাণিনীয় শিক্ষায় 'হস্তেন' শব্দটি মুদ্রারই প্রকাশক। মনে হয় হস্তের বিচিত্র ভঙ্গি ও প্রয়োগের দ্বারা অন্তরের অভিপ্রায় জানাবার কৌশল বৈদিক যুগ থেকেই ভারতে

প্রচলিত ছিল। তবে খৃষ্টীয় অব্দের গোড়ার দিকে নন্দিকেশ্বর, ভরত প্রভৃতি নৃত্যকলাকুশলীরা আরো বৈজ্ঞানিকভাবে এগুলিকে তাঁদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন মাত্র। নচেৎ খৃষ্টপূর্ব ৫ম-৪র্থ শতকে নৃত্যে মুদ্রার যে প্রয়োগ ও প্রচলন ছিল তখনকার ইতিহাসই সেকথা প্রমাণ করে। বিশেষ ক'রে গান্ধার ও পুরুষপুরের (পেশোয়ার) অধিবাসীরা নৃত্য-গীত-বাদ্যে যথেষ্ট পারদর্শী ছিল।

শোনা যায় গান্ধারবাসী গন্ধর্বরা ছিল সঙ্গীতের আজন্ম-সাধক। তারা দেবতাদের কাছেও যেমন সমাদরের আসন পেত, তেমনি মনুষ্যসমাজেও ছিল তাদের অব্যাহত গতি। গন্ধর্বদের প্রবর্তিত তৌর্যত্রিক বিদ্যাই ছিল গান্ধর্ব তথা বৈদিকোত্তর মার্গ-সঙ্গীত। আচার্য ভরতও (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) একথা উল্লেখ করেছেন। গান্ধর্ব সামগানোত্তর অথচ সামগানের গুণ ও প্রকৃতিধর্মী সঙ্গীত। খৃষ্টীয় শতাব্দীর নাট্যশাস্ত্রে জাতিরাগ ও গ্রামরাগ তথা গান্ধর্বগানের[৫] পরিচয় পাওয়া গেলেও তার পরিপূর্ণ ইতিহাস আমাদের কাছে একরকম অপরিজ্ঞাত। ভরত নাট্যশাস্ত্রের প্রারম্ভে উল্লেখ করেছেন: "নাট্যশাস্ত্রং প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মণা যদুদাহৃতম্"; অর্থাৎ ব্রহ্মা নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধে পূর্বে যা আলোচনা ক'রে গ্রন্থ রচনা করেছেন তাকে অনুসরণ করেই খৃষ্টীয় অব্দের গোড়ার দিকে ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্র রচনা করেন। নাট্যশাস্ত্রকে নাট্যবেদ বা পঞ্চমবেদও বলা হয়েছে। ভারতীয় সংগীত যে সুপ্রাচীন বেদের কৌলিন্য ও আভিজাত্য পাবার যোগ্য একথা ভরত স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন,

নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতুর্বেদাঙ্গসম্ভবম্ ॥
জগ্রাহ পাঠ্যমৃগ্বেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ।
যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসানাথর্বণাদপি ॥
বেদোপবেদৈঃ[৬] সম্বদ্ধো নাট্যবেদো মহাত্মনা।
এবং ভগবতা সৃষ্টো ব্রহ্মণা ললিতাত্মকম্ ॥
উৎপাদ্য নাট্যবেদং তু ব্রহ্মোবাচ সুরেশ্বরম্।
ইতিহাসো ময়া দৃষ্টঃ স সুরেষু নিযুজ্যতাম্ ॥[৭]

৫। অবশ্য মাগধী, অর্ধমাগধী, পৃথুলা, সম্ভাবিতা প্রভৃতি দেশীগীতির প্রচলনও খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে হয়েছিল।

৬। উপবেদ প্রধানত চারটি ও তারা ঋগাদি চারবেদের সঙ্গে সম্পর্কিত। যেমন আয়ুর্বেদ ঋগ্বেদের সঙ্গে, ধনুর্বেদ যজুর্বেদের সঙ্গে, গন্ধর্ববেদ সামবেদের সঙ্গে ও স্থাপত্যবেদ অথর্ববেদের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত।

৭। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং), ১।১৬-১৮

ভগবান ব্রহ্মা তথা ব্রহ্মাভরত আদি-নাট্যবেদ রচনা করেছিলেন। তিনি চারটি বেদ থেকে উপকরণ আহরণ করেন। এই ব্রহ্মাকেই পরবর্তী সঙ্গীতশাস্ত্রীরা দ্রুহিন বা দ্রুহিন-ব্রহ্মা আখ্যা দিয়েছেন—"ভগবান্ দ্রুহিনঃ সর্বদৈবতৈঃ", কিংবা "দ্রুহিণেন যদম্বিষ্টং প্রযুক্তং ভরতেন চ"। শার্ঙ্গদেব সঙ্গীতরত্নাকরে (১।২২) এই অন্বেষক, আদি-সংগ্রাহক ও গান্ধর্ব-স্রষ্টা দ্রুহিন-ব্রহ্মাকে বিরিঞ্চি বলেছেন—"যো মার্গিতো বিরিঞ্চ্যাদ্যৈঃ। এই বিরিঞ্চিই পিতামহ[৮]—যিনি সামবেদাদি থেকে গান্ধর্বগান সংগ্রহ করেছিলেন—"সামবেদাদিদং গীতং সংজগ্রাহ পিতামহঃ" (১।২৫)। শার্ঙ্গদেব প্রাচীন সঙ্গীত-গ্রন্থকারদের স্মারক-শ্লোকেও আদি-সংগ্রাহক ব্রহ্মার নামোল্লেখ করেছেন—"সদাশিবঃ শিবা ব্রহ্মা" (১।১৫)। এই ব্রহ্মা সামগীতিরসে দিবানিশি মগ্ন থাকতেন—"সামগীতিরতো ব্রহ্মা" (১।২৬)। সারদাতনয় (খৃষ্টীয় ১১৭৫-১২৫০) তাঁর 'ভাবপ্রকাশন' গ্রন্থেও ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাভরত সম্বন্ধে উল্লেখ ক'রে বলেছেন: "তানব্রবীৎ নাট্যবেদং 'ভরত' ইতি পিতামহঃ" বা "নাট্যবেদমিদং যস্মাৎ"। এই পিতামহই ব্রহ্মা। 'গীতসিদ্ধান্তভাস্কর'-গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন: "প্রথমং মার্গরূপেণ প্রাপ্তবন্তো মহর্ষয়ঃ, দ্রুহিণাত্তাশ্চ তাম্বেব" প্রভৃতি। এই দ্রুহিন-ব্রহ্মা-রচিত আদি-নাট্যশাস্ত্রের সারসংকলনই আচার্য ভরত-প্রণীত নাট্যশাস্ত্র। ব্রহ্মার গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ ক'রে ভরত পঞ্চমবেদ-রূপ নাট্যবেদ তথা নাট্যশাস্ত্র রচনা করেন ও তাঁর একশত পুত্রকে শিক্ষা দিয়েছিলেন—"বিদিতাহং নাট্যবেদং পিতামহাৎ, পুত্রানধ্যাপয়ামাস"। এই একশত পুত্র সকলেই ভরত অর্থাৎ নট।

এখন প্রশ্ন হ'ল এই পিতামহ বা দ্রুহিণ-ব্রহ্মা প্রকৃতপক্ষে কে? সঙ্গীতের ঐতিহাসিক আলোচনায় ঘটনাবলীর পূর্বাপর আলোচনা ও পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়ের একটি রীতি আছে। সারদাতনয় তাঁর 'ভাবপ্রকাশন' গ্রন্থের ১০ম অধ্যায়ে গুরুপরম্পরার যে তালিকা দিয়েছেন তাতেও শিব-নন্দী-ব্রহ্মার নাম পাওয়া যায়। সুতরাং খৃষ্টীয় অব্দের নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের পূর্বপুরুষ দ্রুহিন-ব্রহ্মা কে তা নিরূপণ করার চেষ্টা করব গুরু-পারম্পরা ধারার অনুসরণ ক'রে।

শোনা যায় ব্রহ্মা ৩৬০০০ হাজার শ্লোকপূর্ণ একটি নাট্যশাস্ত্র বা নাট্যবেদ রচনা করেছিলেন। অনেকে এই ব্রহ্মাকে বৃদ্ধভরত নামে অভিহিত করেন। বিশেষ ক'রে রাঘবভট্ট ও সারদাতনয় আদি-ভরত তথা সদাশিব-ভরত ছাড়াও

৮। পিতামহ বিশেষণটি এখানে বিশেষ প্রাচীন গ্রন্থকার 'ব্রহ্মা' অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

বৃদ্ধভরতের নামোল্লেখ করেছেন দেখা যায়। 'ব্রহ্মভরতম্' গ্রন্থখানির সারসংকলন ক'রে আদি-ভরত বা সদাশিব-ভরত নাকি শিব-পার্বতী-সংবাদের ভণিতায় ১২০০০ শ্লোকযুক্ত 'সদাশিবভরতম্' গ্রন্থখানি রচনা করেন। আচার্য অভিনবগুপ্ত নাট্যশাস্ত্রের প্রসঙ্গে সদাশিব, ব্রহ্মা ও ভরত এই তিনজনের মতের উল্লেখ করেছেন :—"এতেন সদাশিবব্রহ্মভরতমতত্রয়বিবেচনেন ব্রহ্মমতসারতাপ্রতিপাদনায় মতত্রয়ীসারাসারবিবেচনং তদ্‌গ্রন্থখণ্ডপ্রক্ষেপেণ বিহিতমিদং শাস্ত্রং, ন তু মুনিরচিতমিতি * *"। ডাঃ এম. কৃষ্ণমচারিয়ার তাঁর 'হিষ্টরী অব ক্ল্যাসিক্যাল সাংস্কৃট্ লিটারেচার' (১৯৩৭) গ্রন্থে পিতামহ ব্রহ্মা-রচিত নাট্যবেদ 'ব্রহ্মভরতম্' গ্রন্থখানির প্রসঙ্গে বলেছেন ঐ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি নাকি মাদ্রাজে মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ-কবির কাছে রক্ষিত আছে। বইখানিতে ৩৬০০০ হাজার শ্লোক ছিল, কিন্তু বর্তমানে যতটুকু অংশ পাওয়া গেছে তাতে মাত্র অভিনয় সম্বন্ধে পাঁচটি অঙ্গ বা অধ্যায়ের সমাবেশ আছে। পাঁচটি অঙ্গের মধ্যে তিনটি অঙ্গ অভিনয়-বিষয়ক ও দুটি কণ্ঠসঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্র সম্বন্ধে।[৯] 'ব্রহ্মভরতম্' গ্রন্থটিতে আর কোন প্রাচীন ও প্রামাণিক নাট্যগ্রন্থের উল্লেখ না থাকায় এবং বিষয়বস্তুর আলোচনা সংক্ষেপ বলে বইখানিকে প্রাচীন বলেই সকলে অনুমান করেন। ডাঃ কৃষ্ণমাচারিয়ারের অভিমতও তাই।[১০]

সরদাতনয় ভাবপ্রকাশনে (৪৭ শ্লোক) পদ্মভূ-ব্রহ্মার নামোল্লেখ করেছেন ও পদ্মভূ-ব্রহ্মাই যে নাট্যশাস্ত্রের আদি-রচয়িতা একথা স্পষ্ট স্বীকারও করেছেন। যেমন,

পরিণেতুং ন শক্নোতি তস্মাচ্ছাস্তস্য নোদ্ভবঃ।
তস্মান্নাট্যরসা অষ্টাবিতি পদ্মভুবো মতম্ ॥

আচার্য দামোদরগুপ্ত তাঁর 'কুট্টনীমতম্' গ্রন্থে (৮ম শতাব্দী) জনৈক ভট্টপুত্রের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন সেই ব্যক্তি ব্রহ্ম-নাট্যশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন :

ব্রহ্মোক্তনাট্যশাস্ত্রে গীতে মুরজাদিবাদনে চৈব।
অভিভবতি নারদাদীন্ প্রাবীণ্যং ভট্টপুত্রস্য ॥

এই ব্রহ্মোক্ত নাট্যশাস্ত্রই নাট্যের আদিগ্রন্থ 'ব্রহ্মভরতম্'।

৯। নাট্যশাস্ত্র, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায় (বরোদা সংস্করণ), পৃঃ ২৬৫ দ্রষ্টব্য।

১০। There is no mention in it of any earlier work and from the scantiness of the details the book forms probably the earliest record of the science."—*History of Classical Sanskrit Literature* (1949), p. 825.

ব্রহ্মার মত প্রামাণ্য হিসাবে মতঙ্গ, শার্ঙ্গদেব প্রভৃতি গ্রন্থকাররা তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। মতঙ্গের 'বৃহদ্দেশী'-গ্রন্থে ব্রহ্মার প্রমাণ-বাক্যটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উদ্ধৃতিটি ভরতের নাট্যশাস্ত্র থেকে দেওয়া হয়েছে—যদিও বর্তমান সংস্করণ নাট্যশাস্ত্রে পাঠাংশের যথেষ্ট বিকৃতি বা পরিবর্তন আছে। বৃহদ্দেশীতে উদ্ধৃত প্রমাণ-শ্লোকটি যেমন,

তথাচাহ ভরতঃ,
মুখে তু মধ্যমগ্রামঃ ষড়্জঃ প্রতিমুখে ভবেৎ।
গর্ভে সাধারিতশ্চৈব বিমর্শে * * তু পঞ্চম ॥
সংহারে কৈশিকঃ প্রোক্তঃ পূর্বরঙ্গে তু ষাড়বঃ।
চিত্রস্যাতাষ্টাদশাঙ্গস্য ত্বন্তে কৈশিকমধ্যমঃ।
শুদ্ধানাং বিনিয়োগোঽয়ং ব্রহ্মণা সমুদাহৃতঃ ॥[১১]

১১। বর্তমান সংস্করণের সঙ্গে বৃহদ্দেশীর উদ্ধৃতির অমিল যথেষ্ট আছে ; কিন্তু বর্তমান কাশী ও কাব্যমালা সংস্করণ দুটিতেও পাঠভেদ কম নেই। এথেকে মনে হয় কালের স্রোতে আসল অনেক জিনিসেরই বিকৃতি এসেছে, যার জন্য হয়তো সত্য-নির্ধারণের পথও অনেকটা রহস্যাবৃত হয়েছে।

(১) এটির পাঠ নাট্যশাস্ত্রে (কাশী-সংস্করণ) :

মুখে তু মধ্যমগ্রামঃ ষড়্জং প্রতিমুখে স্মৃতঃ।
সাধারিতং তথা গর্ভে মর্শে কৈশিকমধ্যমঃ ॥
কৈশিকশ্চ তথা কার্যং গানং নির্বহণে বুধৈঃ।
সন্ধিবৃত্তাশ্রয়শ্চৈব রসভাবসমন্বিতঃ ॥

(২) (কাব্যমালা-সংস্করণ) :

মুখে তু মধ্যমগ্রামঃ ষড়্জঃ প্রতিমুখে ভবেৎ।
সাধারিতং তথা গর্ভে বিমর্শে চৈব পঞ্চমম্ ॥
কৈশিকং চ তথা কার্যং গান নির্গ্রহণে বুধৈঃ।
সন্ধিবৃত্তাশ্রয়ং চৈব রসভাবসমন্বিতম্ ॥

আধুনিক কাশী ও কাব্যমালা-সংস্করণ-নাট্যশাস্ত্রে ব্রহ্মার কোন উল্লেখই করা হয়নি বটে, কিন্তু সঙ্গীত-রত্নাকরের দ্বিতীয় রাগবিবেকাধ্যায়ে ৩০-৩২ শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে কল্লিনাথ ভরতের শুদ্ধ বা পূর্ণপাঠের (?) পরিচয় দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন : "ভরতবচনাদেব লভ্যতে। তথা চাহ ভরতঃ—

পূর্বরঙ্গে তু শুদ্ধাস্যাত্তিন্না প্রস্তাবনাঽথবা।
বেসরা মুখয়োঃ কার্যা গর্ভে গৌড়ী বিধীয়তে।

প্রশ্ন হ'তে পারে 'মুখে তু মধ্যমগ্রামঃ' শ্লোকগুলি ব্রহ্মার নামাঙ্কিত হলেও ইনি প্রকৃতপক্ষে আদি-নাট্যবেদ তথা পঞ্চমবেদ-প্রণেতা পিতামহ বা দ্রুহিণ-ব্রহ্মা কিনা? অবশ্য শ্লোকগুলির বক্তব্য বা বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ নাটকোপযোগী। রাগগুলিও গ্রামরাগ, ধ্রুবাদি গানের মতো নাটকের জন্যই অভিপ্রেত। 'মুখে তু মধ্যমগ্রামঃ' —মুখে অর্থে প্রস্তাবনা। নাটকের পাঁচটি সন্ধির মধ্যে মুখসন্ধি অন্যতম ও এটি নাটকের বহিরঙ্গ হিসাবে গণ্য। সঙ্গীত-রত্নাকরের (২।২২) টীকা-প্রসঙ্গে কল্লিনাথও উল্লেখ করেছেন: "নাটকেষু মুখং প্রতিমুখং গর্ভে বিমর্শে উপসংহৃতিরিতি পঞ্চ সন্ধয়ঃ।" ভরত আসারিত-গীতির প্রসঙ্গে মুখ, প্রতিমুখ, দেহ ও সংহার অঙ্গগুলির উল্লেখ করেছেন। আসারিতও নাটকের জন্য অভিপ্রেত গান বা গীতি —"আসারিতেষু গীতেষু" (নাট্যশাস্ত্র ৩১।২২৪)। ভরত উল্লেখ করেছেন,

মুখং প্রতিমুখং চৈব দেহ-সংহরণং তথা ॥
অঙ্গান্যেতানি চত্বারি সর্বেষ্বাসারিতেষ্বিহ।[১২]

মতঙ্গ বৃহদ্দেশীতে যে 'মুখে প্রতিমুখে' প্রভৃতি উল্লেখ ক'রে গ্রামরাগের প্রসঙ্গ এনেছেন তা থেকে বোঝা যায় মুখে বা নাটকের প্রস্তাবনা-গীতি হিসাবে মধ্যমগ্রামরাগ, প্রতিমুখে ষড়্‌জগ্রামরাগ, গর্ভে সাধারিতরাগ, অবমর্শে পঞ্চমরাগ (গ্রামরাগ), সংহারে কৈশিক-গ্রামরাগ ও পূর্বরঙ্গে ষাড়ব-গ্রামরাগ প্রভৃতি গান করা হ'ত। এখানে ছ'টি অঙ্গের বা সন্ধির উল্লেখ করা হয়েছে, আর ছ'টি সন্ধিতে ছ' রকম গ্রামরাগ গাওয়ার রীতি ছিল ও এই রীতি ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাভরত-রচিত আদিনাট্যগ্রন্থ 'ব্রহ্মভরতম্‌' থেকে গ্রহণ করা হয়েছিল।

'ব্রহ্মভরতম্‌' গ্রন্থখানি কোন্‌ সময়ে রচিত হয়েছিল সঠিকভাবে নির্ধারণ করা কঠিন। তবে একথা ঠিক যে তাঁর সময়ে গান্ধর্ব বা মার্গ-সঙ্গীতেরই অনুশীলন ছিল। অভিজাত দেশী-রাগগীতির প্রচলন তখনও হয়নি। ভরত ব্রহ্মার নাট্যবেদকে অনুসরণ ক'রে তাঁর নাট্যশাস্ত্র রচনা করেন। ভরত উল্লেখ করেছেন প্রাচীন

শুদ্ধানাং বিনিযোগোঽয়ং ব্রহ্মণা সমুদাহৃতঃ ॥"

এ'থেকে বোঝা যায় বর্তমান সংস্করণের নাট্যশাস্ত্রে পাঠলোপ বা পাঠবিকৃতি অবশ্যই ঘটেছে ও সেদিক দিয়ে যথার্থ অর্থ নিরূপণ করার পক্ষেও যথেষ্ট বাধা আসা স্বাভাবিক।

১২। নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা সং) ৩১।৮০;

কাশী সংস্করণে (৩১।১৯৩) পাঠভেদ যেমন—

"* * দেহঃ সংহরণস্তথা।
* * সর্বেষ্বাসারিতেষু চ ॥"

সঙ্গীতশাস্ত্রী স্বাতি ও নারদ নাট্যবেদকে প্রচারের জন্য ব্রহ্মাকে সাহায্য করেছিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা ইন্দ্রধ্বজ-মহোৎসবে স্বাতিকে ভাণ্ডবাদক ও নারদকে গানে নিযুক্ত করেছিলেন।[১৩] নারদের গানকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছিল বীণা ও বেণু। প্রাচীনকালে ইন্দ্রধ্বজ-মহোৎসব ভারতের প্রায় সর্বত্রই বিশেষ সমাদৃত ছিল। খৃষ্টপূর্ব ১০০ অব্দে বৌদ্ধাচার্য নাগার্জুনও তাঁর কাব্যগ্রন্থে 'মহ' বা 'ধ্বজমহ' শব্দে ইন্দ্রধ্বজ-উৎসবের উল্লেখ করেছেন। ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হ'ত। ভরত উল্লেখ করেছেন (১।৫০-৫১),

স্বাতিভাণ্ডনিযুক্তস্তু সহ শিষ্যৈঃ স্বয়ংভুবা ॥
নারদাদ্যাশ্চ গন্ধর্বা গানযোগে নিয়োজিতাঃ।

স্বাতি বাদক। তিনি সম্ভবত মৃদঙ্গাদি বাদ্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। নারদ যে শিক্ষাকার নারদ নন তা অনুমিত হয়, কেননা গন্ধর্বনায়ক নারদের পরিচয় আমরা খৃষ্টীয় অব্দের পুরাণগুলিতে তো বটেই, খৃষ্টপূর্বাব্দের বৌদ্ধগ্রন্থ, রামায়ণ, মহাভারতেও কম পাই না। কাজেই ইন্দ্র, ব্রহ্মা, ভরত প্রভৃতির মতো নারদও একটি উপাধি-বিশেষ। গান্ধর্ব শাস্ত্র ও বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিমাত্রকেই আবার 'নারদ' নামে অভিহিত করা হ'ত, যেমন ভরতের স্বীকৃতি থেকে পাওয়া যায় নটমাত্রকেই 'ভরত' আখ্যা দেওয়া হ'ত। যাইহোক ব্রহ্মাভরতের সমসাময়িক সঙ্গীতবিদ্যা-পারগ নারদ যে মহাকাব্য ও পুরাণাদিতে বর্ণিত নারদ থেকে প্রাচীন একথা অনুমান করা যেতে পারে।

এখন নানান্ দিক থেকে ব্রহ্মা-রচিত 'ব্রহ্মভরতম্' গ্রন্থের রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দেরও আগে, অর্থাৎ মোটামুটিভাবে ৬০০-৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের কোন এক সময়ে অনুমান করা যায়। সেদিক থেকে আদি-নাট্যকার পিতামহ ব্রহ্মা (ব্রহ্মা উপাধিযুক্ত কোন সর্বশাস্ত্রবিৎ শিল্পী) অষ্টাধ্যায়ীকার পাণিনির পূর্ববর্তী বলে মনে হয়। তবে পাণিনি-উল্লিখিত নটসূত্রকার কৃশাশ্ব ও শিলালির তিনি পূর্ববর্তী কি সমসাময়িক তা সঠিক নির্ণয় করা কঠিন। তবে একথা ঠিক যে ভরত ব্রহ্মার নাট্যশাস্ত্র বা নাট্যবেদকেই একমাত্র অনুসরণ করেছিলেন আর কৃশাশ্ব বা শিলালির কোন উল্লেখই তিনি তাঁর গ্রন্থে করেন নি। এ'থেকে মনে হয় ব্রহ্মা

১৩। অয়ং ধ্বজমহঃ শ্রীমান্মহেন্দ্রস্য প্রবর্ততে ॥
অত্রেদানীময়ং বেদো নাট্যসংজ্ঞঃ প্রযুজ্যতাম্।
—নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা সং), ১।৫৪-৫৫

কৃশাশ্ব ও শিলালির কিছু পূর্ববর্তী গুণী, কেননা তিনি সমসাময়িক বা পরবর্তী হ'লে অবশ্যই কৃশাশ্ব বা শিলালির নটসূত্রের উল্লেখ তাঁর 'ব্রহ্মভরতম্' গ্রন্থে করতেন এবং ভরতও ব্রহ্মার অনুসরণকারী হিসাবে তাঁদের কিছু-না-কিছু আলোচনা তাঁর নাট্যশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করতেন। তাছাড়া পরবর্তী গ্রন্থকার ও ভাষ্যকারগণ মিথিলারাজ নান্যদেব, সরদাতনয়, অভিনবগুপ্তও এ' সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নি, বরং একবাক্যে তাঁরা ব্রহ্মাকেই আদি-নাট্যশাস্ত্রী হিসাবে স্বীকার করেছেন।

'ব্রহ্মভরতম্' গ্রন্থখানির পর প্রামাণিক ও প্রাচীন নাট্যগ্রন্থ হিসাবে 'সদাশিব-ভরতম্'-এর* নাম উল্লেখযোগ্য। শাস্ত্রী সদাশিব এটির রচয়িতা। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত তাঁর গ্রন্থের আরম্ভে ব্রহ্মার পরেই সদাশিবের নাম উল্লেখ করেছেন—"প্রণম্য শিরসা দেবৌ পিতামহ-মহেশ্বরৌ"। এই মহেশ্বর সদাশিব কিন্তু উমাপতি পঞ্চানন শিব নন। এঁর উপাধিও ভরত, কেননা ব্রহ্মার পরই নট ও নাট্যশাস্ত্রী হিসাবে ইনি বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি ভাষ্যকার এঁকে 'আদি-ভরত' নামে অভিহিত করেছেন। ডাঃ কানেও তাঁর 'দি হিষ্ট্রী অব সাংস্কৃট্ পোয়েটিক্স' গ্রন্থে সদাশিবের নামোল্লেখ করেছেন। সরদাতনয় 'ভাবপ্রকাশন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,

প্রোক্তস্সদাশিবেনাস্য স্বরূপাশ্রয়নির্ণয়ঃ।
'রসস্স এব স্বাদ্যত্বাদ্রসিকস্যৈব বর্তনাৎ ॥
নানুকার্যস্য বৃত্তত্বাৎকাব্যস্যাতৎপরত্বতঃ।
দ্রষ্টুঃ প্রমোদব্রীড়েৰ্য্যারাগদ্বেষপ্রসঙ্গতঃ ॥
লৌকিকস্য স্বরমণীসংযুক্তস্যৈব দর্শনাৎ।'

পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে বর্তমান আকারের নাট্যশাস্ত্রে প্রায় ১২০০০ হাজার শ্লোক আছে। সম্ভবত অধুনালুপ্ত ব্রহ্মা-রচিত নাট্যবেদ ও সদাশিব-রচিত নাট্যগ্রন্থ থেকে ভরত অনেক কিছু বিষয়বস্তু তাঁর নাট্যশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ডাঃ মনোমোহন ঘোষের অভিমতও তাই।[১৪] পরবর্তী সঙ্গীত গ্রন্থগুলিতেও ব্রহ্মা ও

*Vide *Mys.* 309, also *MS* No. 1298 noted at page 308 though catalogue at Adibharatam.

১৪। The present NS. contains about 12,000 *granthas* and it is supposed to include the views of the authors of the now extinct Nātyaveda (composed by Brahman) as well as of the Adibharata.

সদাশিবের নাম উল্লিখিত হয়েছে—"মহাদেবস্থ পুরতস্তস্মার্গাখ্যং বিমুক্তিদম্।" 'সদাশিবভরতম্' গ্রন্থখানি সম্ভবত 'ব্রহ্মভরতম্'-এর পরে খৃষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দের কিছু আগে রচিত। ডাঃ কৃষ্ণমাচারিয়ারও এটিকে 'ব্রহ্মভরতম্' গ্রন্থের মতো প্রামাণিক ও প্রাচীন বলেছেন।[১৫]

ব্রহ্মা-রচিত নাট্যবেদের প্রসঙ্গে স্বাতির উল্লেখ আছে। অভিনবগুপ্ত স্বাতিকে ঋষি বলে উল্লেখ করেছেন—"স্বাতিঃ ঋষিবিশেষঃ"। নাট্যশাস্ত্রে তিনি ভাণ্ডবাদক-রূপে উল্লিখিত হয়েছেন—"স্বাতি ভাণ্ডনিযুক্তস্তু"। অভিনবগুপ্ত বলেন স্বাতি 'পুষ্কর' নামে মৃদঙ্গ-জাতীয় বাদ্যের আবিষ্কারক। আর একটি অবনদ্ধ-জাতীয় বাদ্যযন্ত্রও তিনি নাকি সৃষ্টি করেছিলেন। স্বাতি বৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্কিত নক্ষত্র-বিশেষও বটে। তাই অভিনবগুপ্ত কল্পনার বশবর্তী হ'য়ে কাব্যছন্দে স্বাতি-উদ্ভাবিত পুষ্করবাদ্যের ধ্বনির সঙ্গে মেঘের শব্দের তুলনা ক'রে বলেছেন: "স্বাতিঃ ঋষিবিশেষঃ যেন জলধরসময়নিপতৎসলিলধারাবৈচিত্র্যাভিহন্যমানপুষ্করদলবিলসিত-রচিতবিচিত্রবর্ণানুহরণযোজনয়া যথাস্বং বৃত্তিনিয়মেন পুষ্করবাদ্যনির্মাণং কৃতমিত্যর্থঃ"। অভিনবগুপ্তের ঐ কল্পনা ভরতের বর্ণনাকে অনুসরণ ক'রেই জন্মলাভ করেছিল। স্বাতির প্রতিভা-সৃষ্ট পুষ্করের জন্মকাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে ভরত নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখ করেছেন,

অনুবৃত্ত্যা তথা স্বাতেরাতোদ্যানাং সমাসতঃ।
পৌষ্করাণাং প্রবক্ষ্যামি নির্বৃত্তিং সম্ভবং তথা॥
অনধ্যায়ে কদাচিত্তু স্বাতির্বৈ দুর্দিনে দিনে।
জলাশয়ং জগামাথ সলিলানয়নং প্রতি॥

*　　*　　*　　*

গত্বা সৃষ্টং মৃদঙ্গানাং পুষ্করানসৃজত্ততঃ।[১৬]

স্বাতির কোন গ্রন্থের উল্লেখ অবশ্য পাওয়া যায় না।

প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রী হিসাবে স্বাতির পর কশ্যপের[১৭] নাম উল্লেখযোগ্য।

১৫। It may be placed on a line with Brahmabharata for its merit and antiquity.

১৬। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সংস্করণ), ৩৩।৪-১০

১৭। কাশ্যপ নামও কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। যেমন মহাভারতের আদিপর্বে আছে: "কাশ্যপো ধর্মপত্নীভ্যাম্" (১১।৭), "দদর্শ কাশ্যপং তত্র" (২২।৬), "কাশ্যপস্ত দ্বিজাতেশ্চ" (২৩।২), "কাশ্যপোঽভ্যাগমৎ (৩৪।৩৪) প্রভৃতি। কিন্তু কাশ্যপ ও কশ্যপ দু'জন ভিন্ন ব্যক্তি।

নারদীশিক্ষায় কৈশিক-গ্রামরাগের স্রষ্টা হিসাবে কশ্যপের নাম পাওয়া যায়—"কশ্যপঃ কৈশিকং প্রাহ মধ্যমগ্রামসম্ভবম্"। কশ্যপ যে একজন প্রামাণিক প্রাচীন গ্রন্থকার তা শিক্ষাকার নারদের উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যায়। কৈশিকরাগ তথা গ্রামরাগের উল্লেখ রামায়ণে পাওয়া যায়—"চরিতে কৈশিকাচার্যৈরৈরাবত-নিষেবিতে" (রামায়ণ, সুন্দরকাণ্ড ১।১৬৩)। মহাভারত ও হরিবংশেও কৈশিকরাগাদির উল্লেখ আছে—"ষড়গ্রামরাগেষু চ তত্র কার্যম্" (৮৯।৮৮) প্রভৃতি। কল্লিনাথ কৈশিকরাগ তথা গ্রামরাগ সম্বন্ধে বলেছেন—"কৈশিকীনাম শুদ্ধপঞ্চমস্য ভাষারাগঃ" (৪।২৯৭)। মঙ্গল বা কল্যাণজনক ব্যাপারে এই রাগের প্রয়োগ হয়—"কৈশিক্যা মঙ্গলাচারঃ" (৪।২৯৭), বা "কৈশিক্যাং বোট্টরাগে বা মঙ্গলং মঙ্গলৈঃ পদৈঃ" (৪।৩০৩); অর্থাৎ মঙ্গলাচার ও মঙ্গল-প্রবন্ধগান মঙ্গলপদযুক্ত ক'রে গান করতে হ'লে কৈশিকরাগের প্রয়োজন হয়। শিক্ষাকার নারদ (খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী) কৈশিক-গ্রামরাগের স্বর-রূপ বা রাগ-নক্সার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন,

> কাকলির্দৃশ্যতে যত্র প্রাধান্যং পঞ্চমস্য তু।
> কশ্যপঃ কৈশিকং প্রাহ মধ্যমগ্রামসংভবম্ ॥

বিকৃত স্বর হিসাবে কাকলি-নিষাদ ও অন্তর-গান্ধারের বিকাশ নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের সময়েই (খৃঃ ২য় শতাব্দী) নয়, শিক্ষা-সাহিত্যের যুগেই প্রথম হয়েছিল তা নারদীশিক্ষা দেখলে বোঝা যায়। মধ্যমগ্রাম থেকে সৃষ্ট কাকলি-নিষাদ ও পঞ্চম-স্বরের প্রাধান্য অর্থে কৈশিকরাগে পুনঃপুনঃ উচ্চারণ বা আবৃত্তি থাকে।[১৮] শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকরে কৈশিকের বিভিন্ন মিশ্ররূপের পরিচয় দিয়েছেন, যেমন ভিন্নকৈশিকমধ্যম, ভিন্নকৈশিক, গৌড়কৈশিকমধ্যম, গৌড়কৈশিক, ষড়্জ-কৈশিক, মালবকৈশিক। তিনি শুদ্ধকৈশিকমধ্যম প্রভৃতি ও শুদ্ধকৈশিক-গ্রামরাগকে কার্মারবী ও কৈশিকী জাতিদুটি থেকে উৎপন্ন বলেছেন: "কামারব্যাশ্চ কৈশিক্যাঃ সংজাত শুদ্ধকৈশিকঃ"। পঞ্চম ন্যাস, কাকলি-নিষাদযুক্ত ও অবরোহণে প্রসন্নান্ত অলংকার থাকে। ভরতও নাট্যশাস্ত্রে জাতিরাগ হিসাবে কৈশিকের পরিচয় দিয়েছেন মধ্যমগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কিত ক'রে। কৈশিকী-গ্রামরাগও মধ্যমগ্রামের

১৮। টীকাকার ভট্টশোভাকর ঐ 'শ্লোকের বিবৃতি প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন: "মধ্যমগ্রামাদুৎপন্নস্য কাকলিরেব শ্রুতিকো নিষাদো ভবতি পঞ্চমস্য প্রাধান্যং পুনঃপুনরুচ্চারণং শেষানি স্বরান্তরানি সামান্যেন বর্ত্ততে"।

সঙ্গে সম্পর্কিত। রামায়ণে 'কৈশিকী' জাতিরাগ-রূপে বিকাশলাভ করেনি বলে মনে হয়, কেননা শুদ্ধ-সপ্ত জাতিরাগ-গানেরই প্রচলন ছিল, বিকৃত জাতিরাগের তখন সৃষ্টি হয় নি। মোটকথা রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে যে কৈশিক-গ্রামরাগের প্রচলন ছিল তার রূপের পরিচয় আমরা অবশ্যই অনুমান করতে পারি পরবর্তী সঙ্গীতগ্রন্থগুলির বর্ণনা থেকে। পূর্বেই উল্লিখত হয়েছে যে কৈশিক-গ্রামরাগটি মধ্যমগ্রাম-সম্পর্কিত ক'রে ঋষিকল্প শিল্পী ও শাস্ত্রী কশ্যপ আবিষ্কার করেছিলেন।

কশ্যপ নামেও আমরা সাধারণত দু'জন আচার্যের নাম পাই, যেমন বৃদ্ধ-কশ্যপ ও কশ্যপ। কাশ্যপ নামধারী একজন ঋষির উল্লেখ পাণিনিসূত্রে (৪।৩।১০৩) পাওয়া যায়—"কাশ্যপকৌশিকাভ্যামৃষিভ্যাং ণিনিঃ"। কাশ্যপ ও কৌশিক দু'জন ঋষি ছিলেন। পাণিনি আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৫০০অব্দে অষ্টাধ্যায়ী রচনা করেন, সুতরাং সূত্রে উল্লিখিত ঋষি কাশ্যপ খৃষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দের বা তার আগেকার গুণী। তাছাড়া মহাভারতে কাশ্যপের নাম উল্লিখিত হয়েছে পূর্বেই বলেছি (সভাপর্ব ১১।৭, ২২।৬, ২৩।২, ৩৪।৩৪ প্রভৃতি)। এ'ছাড়া খৃষ্টীয় ৬১-৬৭ অব্দে বৌদ্ধ-প্রচারক কাশ্যপ-মতঙ্গের নাম পাওয়া যায়। তিনি মধ্য-পূর্ব-এশিয়ায় বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রচার করেছিলেন। কিন্তু একথা ঠিক যে এঁরা সঙ্গীতগুণী কশ্যপ থেকে পৃথক গুণী। শ্রদ্ধেয় ডাঃ ষ্টেন কনো উল্লেখ করেছেন নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের পরেই কাশ্যপ নামধারী একজন মুনির উল্লেখ পাওয়া যায় ও অভিনবগুপ্ত তাঁর 'অভিনবভারতী' ভাষ্যে প্রামাণিক সঙ্গীতগুণী হিসাবে তাঁর নামোল্লেখ করেছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে শ্রদ্ধেয় কনো কাশ্যপের সঙ্গে কশ্যপ-নামকে অভিন্নভাবে দেখেছেন। অবশ্য কাশ্যপ নামে একজন ঋষি ছিলেন। হরিবংশ (বিষ্ণুপর্ব ৬৯।২৮) কশ্যপ নামের উল্লেখ আছে—"কশ্যপেণ মহাত্মনা"। ভরত পূর্বচার্যদের নামোল্লেখ করতে গিয়ে এই কাশ্যপের নামও করেছেন—"কাশ্যপোধ্রুবঃ" (৩৬।২)। অগ্নিপুরাণেও (৩৩৬।২২) কাশ্যপের উল্লেখ আছে। রাজশেখর (খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দী) তাঁর 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থে শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতির সঙ্গে কাশ্যপের নাম উল্লেখ করেছেন। কাব্যাদর্শের টীকা হৃদয়াঙ্গমে কাশ্যপ ও বররুচিকে দণ্ডির পূর্ববর্তী বলা হয়েছে। কাব্যাদর্শের আর একটি ভাষ্য শ্রুতানুপালিনীতেও কাশ্যপ, ব্রহ্মদত্ত ও নন্দিস্বামীকে দণ্ডির পূর্ববর্তী ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। মোটকথা বৃদ্ধ-কশ্যপ ও সঙ্গীতজ্ঞানী কশ্যপ ভিন্ন ভিন্ন গুণী। ডাঃ রাঘবন উল্লেখ করেছেন পুণায় ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল ইনষ্টিটিউট গ্রন্থাগারে রক্ষিত নান্যদেবের 'ভরতভাষ্য' বা 'সরস্বতীহৃদয়ালংকার'-পাণ্ডুলিপির

১১১-বি ও ১১৪-এ পৃষ্ঠায় কাশ্যপ বা বৃহৎ-কাশ্যপের নাম উল্লেখ আছে ও তা' থেকেও বোঝা যায় পৌরাণিক বৃদ্ধ-কাশ্যপ ও সঙ্গীতশাস্ত্রী কশ্যপ বা বৃহৎ-কশ্যপ মোটেই অভিন্ন ব্যক্তি নন। কশ্যপ বা বৃহৎ-কশ্যপ নাকি 'লঘু-কশ্যপ' ও 'বৃহৎ-কশ্যপ' নামে দু'খানি সঙ্গীতগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। দুটির মধ্যে 'বৃহৎ-কশ্যপ' গ্রন্থটি নাকি মতঙ্গের 'বৃহদ্দেশী' [১৯] গ্রন্থের মতো আয়তনে বড়। শিক্ষাকার নারদ, মতঙ্গ, অভিনবগুপ্ত, শার্ঙ্গদেব, কল্লিনাথ, সিংহভূপাল প্রভৃতি সঙ্গীতগুণীরা সঙ্গীতশাস্ত্রী হিসাবে কশ্যপের নামই উল্লেখ করেছেন। যেমন (১) "কশ্যপঃ কৈশিকং প্রাহ" (নারদীশিক্ষা); (২) "ভরতঃ কশ্যপো মুনিঃ" (সঙ্গীত-রত্নাকর)[২০]; (৩) "তথা চাহ কশ্যপঃ" (কলানিধি-টীকা), প্রভৃতি। তবে একথা ঠিক যে, কশ্যপের রচিত সঙ্গীতগ্রন্থ ছিল ও তার যথেষ্ট প্রমাণও পাওয়া যায়। অন্যান্য গ্রন্থের কথা ছেড়ে দিলে এক 'সঙ্গীত-রত্নাকর', কল্লিনাথের 'কলানিধি' ও সিংহভূপালের 'সুধাকর' প্রভৃতি টীকা থেকে প্রমাণের অভাব নাই।

বর্ণের রঞ্জকত্ব ধর্ম থাকার জন্য তাদের রাগ-পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা সে সম্বন্ধে কশ্যপ বলেছেন :

চতুর্ণামপি বর্ণনাং যো রাগঃ শোভনো ভবেৎ।
স সর্বো দৃশ্যতে যেষু তেন রাগা ইতি স্মৃতাঃ।
স্বরাঃ সরন্তি যদ্বেগাত্তস্মাদ্বেসরকা স্মৃতাঃ ॥

এথেকে বোঝা যায় শুদ্ধা, ভিন্না বা ভিন্নকা, গৌড়ী বা গৌড়িকা ও রাগগীতি, সাধারণী, ভাষা, বিভাষা, অন্তরভাষা প্রভৃতি গীতির প্রচলন মতঙ্গের সময়ে (খৃষ্টীয় ৫ম—৭ম শতাব্দী) ছিল। যাষ্টিক, শার্দূল, দুর্গাশক্তি, কোহল প্রভৃতি আচার্যেরাও ঐ সকল গীতির উল্লেখ করেছেন। কশ্যপ রাগ ও গীতের পার্থক্যের কথাও বলেছেন। যেমন, কল্লিনাথ রাগ ও গীতের ভিন্নতা দেখাতে গিয়ে বলেছেন : "দশলক্ষণলক্ষিতং গীতং রাগশব্দেনাভিধীয়তে। গীতং চতুরঙ্গোপেতং ধ্রুবাযোগাৎ পঞ্চবিধম্। কুত এতদ্বিজ্ঞায়তে? আপ্তবচনাৎ।"

১৯। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ত্রিবান্দ্রম থেকে মতঙ্গের যে 'বৃহদ্দেশী' গ্রন্থটি ছাপা হয়েছে, সেটি অসম্পূর্ণ। তার সম্পূর্ণ ও বিস্তৃত পাণ্ডুলিপিটি নাকি ডাঃ ভি. রাঘবন প্রকাশের জন্য সম্পাদন করছেন।

২০। অবশ্য আডেয়ার থেকে মুদ্রিত সঙ্গীত-রত্নাকরের টীকায় কোথাও কোথাও 'কাশ্যপ' নামও পাওয়া যায়, যা মুদ্রাকর-প্রমাদ।

অর্থাৎ অংশ, ন্যাস, প্রভৃতি দশলক্ষণযুক্ত হ'লে গীত রাগ-পর্যায়ভুক্ত হয়, আর গীত সর্বদাই চারটি ও কখনো কখনো ধ্রুবাধাতুর যোগে পাঁচটি অঙ্গযুক্ত হয়। কিন্তু এর প্রমাণ কি? কল্লিনাথ কশ্যপের উক্তিকে আপ্তবাক্য হিসাবে উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

তথা চাহ কশ্যপঃ —

ক্বচিদংশঃ ক্বচিন্ন্যাসঃ ষাড়বৌড়ুবিতে ক্বচিৎ।
অল্পত্বং চ বহুত্বং চ গ্রহাপন্যাসসংযুতম্॥
মন্দ্রতারৌ তথা জ্ঞাত্বা যোজনীয়া মনীষিভিঃ।
গ্রামরাগাঃ প্রযোক্তব্যা বিধিবদ্দশরূপকাঃ॥
প্রবেশাক্ষেপনিষ্ক্রামপ্রাসাদিকমথান্তরম্।
গীতং পঞ্চবিধং যত্তদ্রাগৈরেভিঃ প্রযোজয়েৎ॥[২১]

শাস্ত্রী কশ্যপ যে পঞ্চবিধ গীতকে রাগের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে বলেছেন, ভরত তাদের ধ্রুবাগীতি-রূপে পরিচয় দিয়েছেন। ভরত উল্লেখ করেছেন,

ধ্রুবাশ্চ পঞ্চ বিজ্ঞেয়া নানাবৃত্তসমুদ্ভবাঃ।

* * * *

প্রাবেশিকী তু প্রথমা দ্বিতীয়াক্ষেপিকী স্মৃতা।
প্রাসাদিকী তৃতীয়া চ চতুর্থী চান্তরা ধ্রুবা॥
নৈষ্ক্রামিকী চ বিজ্ঞেয়া পঞ্চমী চ ধ্রুবা বুধৈঃ।

এথেকে বোঝা যায় কশ্যপের সময় নাট্যগীতি ধ্রুবার প্রচলন ছিল ও তিনি তার রূপভেদ, শ্রেণীভেদ, লক্ষণ, প্রকৃতি ও প্রয়োগ-রহস্য জানতেন। তাছাড়া, গ্রামরাগ হিসাবে কশ্যপ ষাড়ব, মধ্যমগ্রাম, পঞ্চম, ককুভ, ষড়্জ, সাধারিত ও কৈশিকমধ্যমেরও পরিচয় দিয়েছেন।[২২] এক ককুভ ছাড়া অপর গ্রামরাগগুলির উল্লেখ আমরা নারদীশিক্ষায় ও নাট্যশাস্ত্রে পাই। মতঙ্গ ককুভকে গ্রামরাগের আশ্রিত 'ভাষারাগ' আখ্যা দিয়েছেন। যাষ্টিকের অভিমতও তাই। সুতরাং

২১। বৃহদ্দেশীতেও (পৃঃ ১০৪) কশ্যপের এ' উদ্ধৃতিটি আছে।

২২। মতঙ্গ তাঁর বৃহদ্দেশীতে (পৃঃ ৮৭) উল্লেখ করেছেন,

তথা কাশ্যপেনাপ্যুক্তম্—
ষাড়বে মধ্যমগ্রামে পঞ্চমঃ ককুভস্তথা।
ষড়্জে সাধারিতশ্চৈব তথা কৈশিকমধ্যমঃ

কশ্যপ গ্রামরাগ থেকে উৎপন্ন ভাষারাগেরও পরিচয় দিয়েছেন, কেননা ঠক্করাগের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন এ' রাগটি লক্ষ্মীদেবীর প্রীতিকর বলে মুখ্য বা প্রধান—"কশ্যপমতে তু ঠক্করাগ এব মুখ্যঃ লক্ষ্মীপ্রীতিকরত্বাৎ" (বৃহদ্দেশী, পৃঃ ৯৫)। ঠককৈশিক বা ঠক্কৈশিকের পরিচয় দিতে গিয়ে কশ্যপ বলেছেন রাগটি নিষাদ ও গান্ধার-বর্জিত ঔড়ুবজাতির। নর্তরাগের প্রসঙ্গে কশ্যপের প্রমাণ দিয়ে মতঙ্গ বৃহদ্দেশীতে উল্লেখ করেছেন: "নন্থ কাশ্যপ (?)[২৩] মুনিনা নর্তরাগস্য কিমিত্যাদৌ নির্দেশঃ কৃতঃ? উচ্যতে। উদ্ভটচারিমণ্ডলাদৌ বিনিযুজ্যমানত্বাদ্ মুখ্যত্বমিতি কশ্যপমতে"। পুনরায় নর্তরাগের প্রসঙ্গে বলেছেন: "বর্ণঃ সঞ্চারী ইতি কশ্যপ মতে"।

কশ্যপ মূর্ছনাদির আলোচনাও করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন: "জ্ঞাত্বা জাত্যংশবাহুল্যং নির্দেশ্যা মূর্ছনা বুধৈঃ।"[২৪] এছাড়া গ্রামরাগগুলির ঔড়ব-ষাড়বাদি জাতির নির্ণয়-প্রসঙ্গে কশ্যপ উল্লেখ করেছেন,

> কীদৃশী তু ভবেদ্ ভাষা সংকীর্ণা দেশজাতরে (?)।
> ছায়ামাত্রানুগাঃ প্রোক্তা গ্রহাংশন্যাসসংযুতাঃ ॥
> কতমা ষাড়বা তত্র কতমৌড়ুবিতা ভবেৎ।
> পূর্ণা তু কতমা জ্ঞেয়া সাধারণকৃতা তু সা ॥
> গ্রামরাগেষু কা কুত্র কীদৃশী গীয়তে জনৈঃ।
> কতমা প্রাপ্যতে ভাষা বিভাষা কতমা ভবেৎ ॥
> কতমান্তরভাষা বৈ কতমা স্যাদনুক্রমাৎ।
> এতন্মে ব্রুহি তত্ত্বেন মহৎ কৌতূহলং হি মে ॥

এখন কশ্যপ কোন্ সময়ের সঙ্গীতগুণী তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন। প্রথম—নারদীশিক্ষায় কশ্যপের উল্লেখ থাকায় তিনি খৃষ্টপূর্বযুগের বলে অনুমান হয়, কিন্তু ভাষা, বিভাষা, অন্তরভাষা প্রভৃতি রাগের সঙ্গে পরিচিত থাকায় তাঁকে ভরতোত্তর কালের আচার্য বলেই ধারণা হয়। তবে যদি বলা যায় ভরত নাটকের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু সঙ্গীত-সামগ্রী নিয়েই আলোচনা করেছেন তাঁর পূর্বগদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে, সঙ্গীতগ্রন্থ রচনা করা তাঁর অভিপ্রায় ছিল না, তা'হলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু তিনি মাত্র জাতিরাগের ও ধ্রুবাগীতির

২৩। ভ্রমবশতই 'কাশ্যপ' এই পাঠ-বিকৃতি হয়েছে।

২৪। বৃহদ্দেশী, পৃঃ ১০৩

এবং তাদের আনুসঙ্গিক সঙ্গীত-উপাদানের আলোচনা করেছেন, গ্রামরাগের বা গ্রামরাগ থেকে সৃষ্ট ভাষারাগগুলির কোন পরিচয়ই দেন নি। কশ্যপ সে সম্বন্ধেরই আলোচনা করেছেন। কাজেই তাঁর সঠিক অভ্যুদয়-কাল নিরূপণ করা নানান্ দিক দিয়ে কঠিন। তবে যোগসূত্র রাখার সুবিধার জন্য আমরা সঙ্গীতশাস্ত্রী স্বাতির পরই খৃষ্টপূর্বযুগের আলোচনায় কশ্যপকে স্থান দিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

॥ রামায়ণ ও মহাভারত-হরিবংশের যুগ ॥
(৪০০—২০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ)

রামায়ণ ও মহাভারতাদি মহাকাব্যের যুগে দেখি যে বৈদিক যাগ-যজ্ঞের মতো রাজসূয় ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান হ'ত। বাজসনেয়ি-সংহিতায় পুরুষমেধ-যজ্ঞের উল্লেখ আছে। পুরুষমেধযজ্ঞে ১৮৪টি পর্যন্ত নরবলী দেওয়া হ'ত। রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞাদিতে গাথা-নারাশংসী ও আখ্যান সুরে পাঠ ও গান করা হ'ত। গাথা-নারাশংসী বীর্-পুরুষদের প্রশংসাসূচক স্তুতিগান। নৃপতি ও ঋষি-মুনিদের চরিতাবলী ও ক্রিয়াকলাপকে অবলম্বন ক'রে রচিত আখ্যানও সুরে আবৃত্তি বা গান করা হ'ত। যজ্ঞানুষ্ঠানের ঐগুলি ছিল অপরিহার্য অংশ। অশ্বমেধযজ্ঞে একজন পুরোহিত পরিপ্লব-আখ্যান ও প্রাচীন নৃপতিদের চরিত-কথা আবৃত্তি করতেন, আর একজন বীণাগাথী ক্ষত্রিয় মুখে মুখে যাজ্ঞিকের জয়সূচক গাথা রচনা ক'রে বেণু বা বাঁশীর সঙ্গে গান করতেন। কুরু ও কোশল-রাজত্বের নৃপতিবর্গ সে সকল যজ্ঞে উপস্থিত থাকতেন। রাজসূয়যজ্ঞেও নৃত্য ও গীতের আয়োজন থাকত। ইক্ষ্বাকু ও কুরুবংশের অনেক আখ্যানই স্বরযোগে গান করা হ'ত। এগুলিই গাথা বা আখ্যান-গান।

শতপথব্রাহ্মণে 'পুরূরবা ও উর্বশীর আখ্যান ঋগ্বেদীয় সামগদের কাছে সুপরিচিত। গন্ধর্বরা পুরূরবার কাছ থেকে উর্বশীকে হরণ করে। উর্বশী গন্ধর্বদের কাছে 'অগ্নিযাগ' নামে একপ্রকার যাগক্রিয়া শিক্ষা করে। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে (৭।১৩-১৪) বর্ণিত শুনশেপের আখ্যানও যাজ্ঞিকদের কাছে আদরণীয়। সেখানেও গন্ধর্বশ্রেষ্ঠ নারদের আবির্ভাব দেখা যায়। রাজসূয়যজ্ঞে এ' ধরণের গাথা বা আখ্যান গান করা হ'ত। বাক্ (কথা) সে সকল আখ্যানের প্রাণস্বরূপ ছিল। বাক্‌কে নারী ব'লে ব্যাখ্যা বা কল্পনা করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে বাক্ বা সরস্বতী সোম-রূপে কল্পিত হয়েছেন। বাক্ স্বর্গলোকে থাকেন। গায়ত্রী পক্ষী-রূপে বাক্ বা সোমকে পৃথিবীলোকে হরণ ক'রে নিয়ে আসে। গন্ধর্বরা সুযোগ বুঝে আবার সোমকে হরণ করে। সোমই নারী-রূপিণী বাক্। গন্ধর্বরা সোমকে বেদ শিক্ষা দেয়। তখন দেবতারা একটি

বীণা তৈরী ক'রে বীণাবাদ্যের সঙ্গে এই ব'লে গান ও নৃত্য করে: 'হে বাক্, তোমার জন্য আমরা গান করছি ও তোমাকে আনন্দ দান করছি'। বাক্ বা সোম তখন দেবতাদের দিকে ফিরে তাকালেন। তিনি দেবতাদের নৃত্য, গীত ও বাদ্যের প্রশংসা করা ছাড়া আর কিছুই করলেন না। শতপথব্রাহ্মণেও (১।৪।৫।৮-১২) সোমহরণের আখ্যানটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

খৃষ্টপূর্ব অব্দে মহাকাব্য হিসাবে আমরা ঋষি বাল্মিকী-রচিত 'রামায়ণ' পাই ও তার পরেই পাই ব্যাস-সংকলিত 'মহাভারত'। রামায়ণ ও মহাভারত সঙ্গীত-শাস্ত্রের অন্তর্গত নয়, কিন্তু তাদের প্রতিটি সর্গে বা অধ্যায়ে নৃত্য, গীত ও বাদ্য তথা সঙ্গীতের পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকে এ'দুটি মহাগ্রন্থকে পুরাণ-কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করলেও এরা যে কথা ও কাহিনীর মাধ্যমে খৃষ্টপূর্ব ৪০০ থেকে ৩০০ অব্দের ও খৃষ্টীয় পূর্বাব্দের শেষের দিকের পর্যন্ত ভারতীয় সমাজের একটি তথ্যপূর্ণ ইতিহাস জানিয়ে দেয় একথা সকল মনীষী ও ঐতিহাসিকই স্বীকার করেন। ক্রমিক দিন তারিখের সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে ইতিহাস লেখার প্রথা তখন ছিল না বটে, কিন্তু মহাকাব্যগুলি খৃষ্টপূর্ব যুগের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সভ্যতার পরিপূর্ণ ইতিকথারই পরিচয় দেয়।

ডাঃ রায়চৌধুরী পরীক্ষিতোত্তর ও বিম্বিসার-পূর্ব যুগকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। অথর্ববেদের শেষাংশ, ঐতরেয়াদি ব্রাহ্মণ ও বৃহদারণ্যক উপনিষৎ প্রভৃতি প্রধান প্রধান উপনিষদ্‌গুলি প্রথম ভাগের অন্তর্গত, আর রামায়ণ, মহাভারত, মহাপুরাণ ও উপপুরাণগুলি দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্গত। বর্তমানে রামায়ণের যে সংস্করণ পাওয়া যায় তাতে প্রায় ২৪,০০০ হাজার শ্লোকের সমাবেশ আছে। কিন্তু খৃষ্টীয় ১ম অথবা ২য় শতাব্দীতে সম্ভবত ১২,০০০ হাজার মাত্র শ্লোক ছিল ও তার প্রমাণ কাত্যায়নীপুত্র-রচিত 'জ্ঞানপ্রস্থান' গ্রন্থের 'মহাবিভাষা' নাম বৌদ্ধভাষ্য থেকে পাওয়া যায়। এই ভাষ্যে তথাগতবুদ্ধের নাম ছাড়াও হিন্দুদের সঙ্গে যবন (গ্রীক) ও শকজাতির (সীথিয়ান) যুদ্ধের সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়—"শকান্ যবনমিশ্রিতান্" (১।৫৪।২১)। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে দেখা যায়, বানররাজ সুগ্রীব যবনদের দেশ ও শকদের সহরের মাঝামাঝি কুরু, মদ্র ও হিমালয়ের দেশগুলির অবস্থান নির্দেশ করেছেন। তাথেকে প্রমাণ হয় যবন (গ্রীক) ও শকেরা (সীথিয়ান) এক সময়ে পঞ্জাব-অঞ্চলের অধিবাসী ছিল। ভারতীয় সঙ্গীতে গ্রীক ও সীথিয়ানদের প্রভাব সুস্পষ্ট। তা'ছাড়া খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ থেকে ৩য় শতক পর্যন্ত পারস্য ও ম্যাসিডোনিয়ার অভিযানও সুবিদিত। খৃষ্টপূর্বাব্দের না হলেও

খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়াকার দিকে মতঙ্গ প্রভৃতি সঙ্গীতশাস্ত্রীরা সামান্যভাবে সঙ্গীতে এই বিদেশী প্রভাবের কথা রাগনামের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তেরোশো শতাব্দীর গ্রন্থকার শার্ঙ্গদেব সে প্রভাবের কথা আরো সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন তুরুষ্ক-তোড়ী, তুরুষ্ক-গৌড়, শক প্রভৃতি রাগের উল্লেখ ক'রে।

রামায়ণ আগে রচিত হয়েছিল—কি মহাভারতের রচনা আগে এ'নিয়েও মতভেদের অন্ত নেই। এস. ভীমশংকর রাও পুরাণের প্রসঙ্গে ডাঃ কৃষ্ণস্বামী আয়াঙ্গারের মতের উল্লেখ ক'রে বলেছেন ডাঃ কৃষ্ণস্বামীর অভিমতে রামায়ণের কাহিনী রূপায়িত হয়েছিল মহাভারতের যুদ্ধের পরে।[১] কিন্তু পণ্ডিত হপকিন্স, হার্মান জেকবী, ডাঃ উণ্টারনিজ প্রভৃতি মনীষীরা বিভিন্নভাবে বিচার ক'রে রামায়ণের প্রাচীনতাকেই স্বীকার করেছেন।

বর্তমান ঐতিহাসিকদের অধিকাংশের মতে রামায়ণ রচিত বা সংকলিত হয়েছিল খৃষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দে; অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে রামায়ণের সংকলনের কাজ শুরু হ'য়ে শেষ হয় খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে।[২] পণ্ডিত হোলট্‌ম্যান অনুমান করেন বর্তমান আকারের রামায়ণ-মহাগ্রন্থটি কবি বাল্মীকি রচনা করেন তখনকার যুগে গায়ক-সম্প্রদায়ের মুখে মুখে প্রচলিত গীত একটি রামায়ণ-গানের কাহিনীকে ('on the basis of ancient 'ballads') অবলম্বন ক'রে। ডাঃ উইণ্টারনিজের অভিমতও তাই। রামায়ণের কুশীলব ভ্রাম্যমান গীতশিল্পী—রাম-চরিত ও রাম-গুণগাথা সুর ও তান সহযোগে দেশে দেশে গান ক'রে বেড়াতেন। সূত সঞ্জয়ও অনেকটা সেই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ডাঃ উইণ্টারনিজের মতে সঞ্জয় ছিলেন একজন সভাগায়ক। তিনি অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে মহাভারত-যুদ্ধের আখ্যান মুখে মুখে গান ক'রে শোনাতেন।[৩] অধ্যাপক পার্জিটার উল্লেখ করেছেন ঐ বিচরণশীল

১। Vide *The Quarterly Journal of the Andhra Historical Research Society*, Vol. II, Octo., 1927, No. 2, pp. 81-90.

২। অনেকের মতে সংকলনের কাজ শেষ হয় খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর আগে নয়— 'The Mahābhārata cannot have received its present form earlier than the 4th century B.C. and not later than the 4th century A.D."

শ্রদ্ধেয় হপকিন্স তাঁর 'এপিক্ মাইথোলজি' গ্রন্থে (পৃ • ১-২) উল্লেখ করেছেন: "For the Mahābhārata the time from 300 B.C. to 100 B.C. appears now to be the most probable date, though excellent authorities extend the limits from 400 B.C. to 400 A.D."

৩। "Thus in the Mahābhārata itself, it is the Sūta Sañjaya who

গায়ক-সম্প্রদায় বা সূতদের সঙ্গে বর্তমান রাজপুতানায় ভাটদের তুলনা করা যায়। অধ্যাপক উইণ্টারনিজ মনুস্মৃতির (১০।১১,১৭) নজির উল্লেখ ক'রে বলেছেন সূতেরা মিশ্রজাতি: ব্রাহ্মণ-কন্যাদের গর্ভে ও ক্ষত্রিয়-যোদ্ধাদের ঔরসে জন্ম। এ' ছাড়া ঐতিহাসিক প্রমাণও পাওয়া যায় যে মাগধ ও সূতেরা সাধারণভাবে গায়ক-শ্রেণীভুক্ত ছিল। কারু মতে মাগধ ও সূতদের উৎপত্তি ক্ষত্রিয়ানীর গর্ভে ও বৈশ্যের ঔরসে। এদের অনেক সময় সমাজের বাইরে বাস করতে হ'ত। এরা রাজাদের বা রাজন্যবর্গের সারথিরও কাজ করত। মাগধরা ছিল মগধের অধিবাসী, আর সূতেরা মগধের পূর্বদেশে বাস করত।

নাট্যশাস্ত্রকার ভরত কুশী-লব শব্দের অর্থ সম্বন্ধে বলেছেন,

নানাতোত্ত্ববিধানে প্রয়োগযুক্ত প্রবাদনে কুশলঃ।
আতোত্ত্বোঽপ্যতিকুশলো যস্মাৎ স কুশীলবস্তস্মাৎ ॥[৪]

এখানে নাটকের উপযোগী গীত-বাদ্যের শিল্পীমাত্রকেই কুশীলব বলা হয়েছে।

আসলে আখ্যান বা গাথা সুর-সহযোগে যারা গান করত তাদেরই বলা হ'ত 'গায়ক', অর্থাৎ 'story teller with tune' বা 'court-singer' (আখ্যান-কথক বা সভাগায়ক)। রামায়ণের যুগে তো বটেই, প্রাচীন ভারতে বংশানুক্রমে মুখে মুখে গান করার রীতি প্রচলিত ছিল। এছাড়া রাজন্যবর্গ, ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত, গন্ধর্ব ও ঋষি-মুনিরাও বিশেষভাবে সঙ্গীতের চর্চা করতেন। রাজ-দরবারে চারণদলের পক্ষে সঙ্গীত-পরিবেশন অপরিহার্য ছিল। দেবদাসীরা ছাড়া সম্ভ্রান্তবংশীয়া নারীরাও নৃত্যগীতে স্বাধীনভাবে যোগ দিতেন। তখনকার নৃত্য

---

describes to King Dhritarāstra the events on the battlefield. These court-singers formed a special caste, in which the epic songs were transmitted from generation to generation. Epic poetry probably originated in the circle of such bards, who certainly were very closely related to the *warrior class*. Besides there were also travelling singers, called *Kuśi-lavas,* who memorised the songs and publicly sang them to the accompaniment of the lute, * *. Thus it is related in the Rāmāyaṇa, though in a late interpolated song, how the two sons of Rāma, Kuśa and Lava, travelled about as wandering singers and recited in public assemblies the poem learned from the poet Vālmiki".—*A History of Indian Literature,* Vol. I, p. 315.

৪। নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা সংস্করণ) ৩৫।৩৭

সম্পূর্ণভাবে শাস্ত্রীয় ধারার অনুযায়ী ছিল। বাল্মীকি নৃত্যের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন,

এতে গন্ধর্বরাজানো ভরতস্যাগ্রতো জগুঃ।

*　　*　　*

উপনৃত্যস্তং ভরতং ভরদ্বাজস্য শাসনাৎ॥

রামায়ণের আধুনিক টীকাকার রাম তাঁর তিলক-টীকায় 'ভরতং' শব্দটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন: "পূর্বাচার্যেন ভরতেন নির্মিতম্", অর্থাৎ পূর্বাচার্য ভরতের অনুযায়ী নৃত্যের অনুশীলন ছিল। কিন্তু এই ভরত কে? অবশ্যই ইনি নাট্যশাস্ত্রকার ভরত নন, কেননা নাট্যশাস্ত্রকার ভরত খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর গুণী। তাছাড়া একথা ঠিক যে একমাত্র রামায়ণের উত্তরকাণ্ড ছাড়া ("উপনৃত্যস্তং ভরতং" ৭।১৬।৩৩-৩৭) আর কোথায় ভরতের নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। অনেকের মতে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডটি খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে লেখা হয়েছিল,[৫] কাজেই পরবর্তী রচয়িতা বা সংকলয়িতার পক্ষে আচার্য ভরতের নাম নাট্য বা নৃত্যের প্রসঙ্গে রামায়ণের অন্তর্ভুক্ত করা কিছু বিচিত্র নয়। তারপর রামায়ণ ও মহাভারতের রচনায় ক্রমপরিবর্ধনের ধারাও যে অনুসৃত হয়েছিল একথা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন।[৬] কাজেই উভয় মহাকাব্যের পূর্ব-অধ্যায়গুলির বিষয়বস্তুর সঙ্গে উত্তর-অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য বিধান করা অনেক সময় দুরূহ হওয়াও স্বাভাবিক। তারপর রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে উল্লিখিত ৯৬।৪৬-৪৭ শ্লোকগুলি থেকে সাধারণতই মনে হয় যে ভরত ছিলেন ঋষি ভরদ্বাজের প্রায় সমসাময়িক, আর "উপনৃত্যস্তং ভরতং ভরদ্বাজস্য শাসনাৎ" শ্লোকাংশ থেকে একথাও অনুমান হয় ভরতের মতো ঋষি ভরদ্বাজও ছিলেন নাট্য ও নৃত্যশাস্ত্রের একজন প্রামাণিক আচার্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভরদ্বাজের

৫। "The mention of this sage in the Uttarakānda of the *Rāmāyaṇa* does not however help us very much, for this part of the *Rāmāyaṇa* has been placed in the second century after Christ—a time which is much later than the upper limit to which the date of the *Nātyaśāstra* can be shifted."—*The Indian Historical Quarterly*, Vol. VI, March, 1930, p. 72.

৬। "Both epics have received long additions."—*Epic Mythology*, p. 1.

নামাঙ্কিত নাট্যগ্রন্থ বা নৃত্যশাস্ত্রের কোন সন্ধান এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

ঋষি ভরদ্বাজের নাম মহাভারতের অনেক স্থানে পাওয়া যায়। যেমন— 'ভরদ্বাজো মহাপ্রাজ্ঞো' (আদি। ১২৭।৮), 'ভরদ্বাজপ্রিয়ং কর্তুম্' (আদি। ১৩১।৪৩), 'ভরদ্বাজস্য শিষ্যার্থং' (আদি।১৩৩।১৬),। কাশ্যপ, যাজ্ঞবল্ক্য, শাণ্ডিল্য প্রভৃতির নামও মহাভারতে পাওয়া যায়। সুতরাং রামায়ণের উল্লিখিত ভরত ও ভরদ্বাজ যে খৃষ্টপূর্বাব্দের গুণী সে বিষয়ে সন্দেহ কি! তাই মনে হয়, রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে উল্লিখিত ভরত সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব ৫ম-৪র্থ শতকের 'ব্রহ্মভরতম্' গ্রন্থ-প্রণেতা ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাভরত অথবা 'সদাশিবভরতম্'-প্রণেতা সদাশিবভরত। 'ভরত' একটি সাধারণ উপাধি-বিশেষ। তাছাড়া নাট্যশাস্ত্রবিৎ নটমাত্রকেই তখন 'ভরত' নামে অভিহিত করা হ'ত। সুতরাং খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর নাট্যশাস্ত্রকার ভরত যে রামায়ণে উল্লিখিত ভরত থেকে পৃথক গুণী তা তাঁর নাট্যশাস্ত্রের ৩৬ অধ্যায়ের (কাশী সংস্করণ) উল্লিখিত আচার্য-স্মরণ-তালিকা থেকে স্পষ্ট অনুমান করা যায়। তিনি উল্লেখ করেছেন,

> আত্রেয়োঽথ বশিষ্ঠশ্চ পুলস্ত্য পুলহঃ ক্রতুঃ।
> অঙ্গিরা গৌতমোঽগস্ত্যো মনুরায়ুস্তথাত্মবান্ ॥
> বিশ্বামিত্রঃ স্থূলশিরাঃ সংবর্তঃ প্রতিমর্দনঃ।
> উশনা বৃহস্পতির্বৎসশ্চ্যবনঃ কাশ্যপো ধ্রুবঃ ॥
> দুর্বাসা জমদগ্নিশ্চ মার্কণ্ডেয়োঽথ গালবঃ।
> ভরদ্বাজোঽথ রৈভ্যশ্চ বাল্মীকি ভর্গবাংস্তথা ॥

ঋষি ভরদ্বাজের সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণকার মুনি বাল্মীকির নামও নাট্যশাস্ত্রকার ভরত উল্লেখ করেছেন। এঁরা পূর্বগ আচার্য বলেই এঁদের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রন্থশেষে উল্লেখ করা হয়েছে।

সঙ্গীতের উপাদান আমরা যেভাবে রামায়ণ থেকে পাই তারই উপস্থাপন করার চেষ্টা করব প্রথমে ও পরে রামায়ণের যুগে সঙ্গীতের নির্দিষ্ট রূপ ও ধারা সম্বন্ধে আলোচনা করব। রামায়ণের যুগে বৈদিক গান বা সামগান সঙ্গীতানুশীলনের সমগ্র ক্ষেত্রকে অধিকার ক'রে না বসলেও তখনকার সমাজ থেকে তা একেবারে লোপ পায় নি, সামগ ও যাগবিলাসী ব্রাহ্মণ বা ঋত্বিকদের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ ছিল। তাছাড়া স্তুতিবাচন, আশীর্বচন, অভিষেকোৎসব প্রভৃতি

পুণ্য-অনুষ্ঠানে সামগানের প্রচলন রামায়ণের যুগে (খৃষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দে) ছিল। উত্তরকাণ্ডে (৭।১৬।৩৩-৩৪) উল্লিখিত হয়েছে,

> স্তুতিভিঃ প্রণেতা ভূত্বা তমেব শরণং ব্রজ।
> কৃপালুঃ শংকরস্তুষ্টঃ প্রসাদং তে বিধাস্যতি ॥
> এবমুক্তস্তদামাত্যৈস্তুষ্টাব বৃষভধ্বজম্।
> সামভির্বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ প্রণম্য স দশাননঃ ॥

লঙ্কাধিপতি দশানন শক্তির উপাসক ছিলেন, অথচ শিবও তাঁর উপাস্য ও প্রণম্য ছিলেন। তিনি দেবাদিদেব শংকরের স্তুতি করেছেন সামগানের[৭] মাধ্যমে। তিনি তথাকথিত অনার্য-গোষ্ঠিভুক্ত বলে পরিচিত হ'লেও আর্য-সংস্কার ও সংস্কৃতি যে তাঁর নিজের ও রাজ্যের মধ্যে বিশেষভাবে ছিল একথা সহজেই অনুমান করা যায়। তারপর সামগানের অনুপ্রবেশ থাকায় রক্ষকুলাধিপ যে বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির একান্ত অনুরাগী ছিলেন তা প্রমাণ হয়। তদানীন্তন কালে চন্দ্র ও সূর্য বংশে বিশেষভাবে বৈদিক সংস্কারের প্রভাব ছিল।

ঋষি বাল্মীকি ছিলেন রামায়ণ-মহাকাব্যের রচয়িতা। তাঁর মহাকাব্যকে একটি গান্ধর্ব বা গানগ্রন্থ বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। কুশী-লবের অমৃতস্রাবী কণ্ঠে তার জীবন্ত রূপের প্রকাশ হয়েছিল। শুধু কুশী-লবই বা কেন, সকল শ্রেণীর লোকের কাছেই রামায়ণগান ছিল প্রাত্যহিক সাধনার জিনিস। সুরশিল্পীদের মতো তখন সুর-মর্মজ্ঞদেরও অভাব ছিল না। শুধু সুর-রসিকরাই গানের শ্রোতা ও বোদ্ধা ছিলেন না, পুরাণতত্ত্ববিদ্, বৈয়াকরণিক জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ্, চিত্রশিল্পী এই সকল শ্রেণীর গুণীরাই গান শুনতে ভালোবাসতেন, গানের বিচার করতেন ও এভাবেই রামায়ণগানের তথা সঙ্গীতের মাধ্যমে সকল শাস্ত্রসেবী মনীষীদের মধ্যে ভাব ও সৌহার্দ্যের বিনিময় হ'ত। শিল্প ও শিল্পীর জগতে কোন জাতি ও সম্প্রদায়-ভেদ বা গুণবৈষম্য ছিল না। যেমন রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে (৭।৯৪।৪-১১) দেখা যায় রামচন্দ্র অশ্বমেধযজ্ঞের আয়োজন করেছেন। সেই যজ্ঞে সুরে, তালে ও শাস্ত্রীয় ধারা অনুসারে অভিজাত রামায়ণগান হবে। সকল শাস্ত্রের পারগ ও নৃত্য-গীত-বিশারদদের সভায় নিমন্ত্রণ ক'রে এনে কুশী-লবকে গান আরম্ভ করতে

৭। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সামগদের উল্লেখ আছে—"সামগানামুপস্থিতম্"। ২৮।৫৪

আদেশ দিলেন। সেই গান ছিল মধুর ও আনন্দসঞ্চারী। রামায়ণকার এ' সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন,

পৌরাণিকাঞ্ শব্দবিদো যে বৃদ্ধাশ্চ দ্বিজাতয়ঃ।
স্বরাণাং লক্ষণজ্ঞাংশ্চ উৎসুকান্ দ্বিজসত্তমান্॥
লক্ষণজ্ঞাংশ্চ গান্ধর্বান্নৈগমাংশ্চ বিশেষতঃ।
পাদাক্ষরসমাসজ্ঞাংশ্ছন্দঃসু পরিনিষ্ঠিতান্॥
কলামাত্রাবিশেষজ্ঞাঞ্জ্যোতিষে চ পরং গতাম্।
ক্রিয়াকল্পবিদশ্চৈব তথা কার্যবিশারদান্॥
হেতুপচারকুশলান্ হৈতুকাংশ্চ বহুশ্রুতান্।
ছন্দোবিদঃ পুরাণজ্ঞান্ বৈদিকান্ দ্বিজসত্তমান্॥
চিত্রজ্ঞানং বৃত্তসূত্রজ্ঞান্ গীতনৃত্যবিশারদান্।
এতান্ সর্বান্ সমানীয় গাতারৌ সমবেশয়ৎ॥
তেষাং সংবদতাং তত্র শ্রোতৃণাং হর্ষবর্ধনম্।
গেয়ং প্রচক্রতুস্তত্র তাবুভৌ মুনিদারকৌ॥
ততঃ প্রবৃত্তং মধুরং গান্ধর্বমতিমানুষম্।
ন চ তৃপ্তিং যয়ুঃ সর্বং শ্রোতারো গেয়সংপদা॥

রামায়ণের যুগে গান্ধর্ব-সঙ্গীতের প্রচলন ছিল। খৃষ্টীয় ২য় অব্দে ভরত উল্লেখ করেছেন: যে গান দেবতাদের অত্যন্ত ইষ্ট বা কল্যাণজনক, গন্ধর্বদের প্রীতিকর এবং স্বর, তাল ও পদযুক্ত তাকেই গান্ধর্ব বলে।[৮] গান্ধর্বগান পবিত্র, অধ্যাত্মভাবের উদ্বোধক ও আভ্যুদয়িক অনুষ্ঠানের উপযোগী বলে মার্গ-সঙ্গীত নামেও অভিহিত। শিক্ষাকার নারদ ও নাট্যশাস্ত্রকার ভরতোত্তর সঙ্গীতশাস্ত্রীরা সেজন্য মার্গকে স্বর্গলোকের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন ও এর অপ্রচলন হ'লে বলেছেন—"মার্গঃ স্বর্গলোকে"। গান্ধর্ব বা মার্গ-গীতিকে রামায়ণকার 'সংগীত' নামে অভিহিত করেছেন—"সংগীতমিব প্রবৃত্তম্" (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ২৮।৩৬-৩৭)। 'সংগীত' বলতে বোঝায় নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সমবেত মূর্তি। কিন্তু ঠিক এ'ধরণের অর্থ এক সঙ্গীত-মকরন্দকার নারদই (খৃষ্টীয় ৭ম—১১ শতাব্দী ?) প্রথম স্পষ্টভাবে বলেছেন বলে মনে হয়। পরবর্তী শাস্ত্রকারেরা মকরন্দকার নারদকে

৮। অত্যর্থমিষ্টং দেবানাং তথা প্রীতিকরং পুনঃ।
গন্ধর্বানামিদং যস্মাৎ তস্মাদ্ গান্ধর্বমুচ্যতে॥

অনুসরণ করেছেন। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) 'সংগীত'-শব্দটির উল্লেখ নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। কেননা চৌখম্বা সংস্করণে (কাশী) কোন অধ্যায়েই এর কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু কাব্যমালা-সংস্করণে (বোম্বাই) দু'এক জায়গায় এ'শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—"সংগীতমরিক্লেশো নিত্যং" (২৬।৯), "যত্র সংগীতবাদিতম্ (৩৬।২২) ও গ্রন্থের শেষে আছে—"সমাপ্তশ্চায়ং (গ্রন্থঃ) নন্দিভরত-সংগীত-পুস্তকম্ (?)"। ভরত নাট্যশাস্ত্রে গান্ধর্বগানের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন: "গান্ধর্বমিতি বিজ্ঞেয়ং স্বরতালপদাশ্রয়ম্" (২৮।৮) বা "গান্ধর্বং ত্রিবিধং বিদ্যাং স্বরতালপদাত্মকম্" (২৮।১২)। মনে হয় মকরন্দকার নারদ ভরতের "গান্ধর্বং ত্রিবিধাং বিদ্যাং স্বরতালপদাত্মকম্" শ্লোকাংশের অনুকরণেই 'সঙ্গীত'-শব্দটির স্বার্থকতা নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন: "গীতং বাদ্যং চ নৃত্যং চ ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে" (১।৩)। পরবর্তী শাস্ত্রকাররা নারদকেই অনুসরণ করেছেন। অবশ্য টীকাকার রাম 'তিলক'-টীকায় 'ষট্পাদতন্ত্রীমধুরাভিধারং' প্রভৃতি শ্লোকগুলিতে উল্লিখিত 'সংগীত' তথা ত্রৌর্যত্রিকের একটি সার্থকতা দেখাবার চেষ্টা করেছেন। রামায়ণকার উল্লেখ করেছেন (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ২৮। ৩৬-৩৭)।—

ষট্পাদতন্ত্রীমধুরাভিধারং
প্লবংগমোদীরিতকণ্ঠতালম্।
আবিষ্কৃতং মেঘমৃদঙ্গনাদৈ—
বনেষু সংগীতমিব প্রবৃত্তম্॥
ক্বচিৎপ্রনৃত্তৈঃ ক্বচিদুন্নদদ্ভিঃ
ক্বচিচ্চ বৃক্ষাগ্রনিষণ্ণকায়ৈঃ।
ব্যালম্ববর্হাভরণৈর্ময়ূরৈ—
র্বনেষু সংগীতমিব প্রবৃত্তম্॥

টীকাকারের বিবৃতি হ'ল: "ষট্পদো ভ্রমরস্তদ্ধ্বনিরূপং তন্ত্রীণাং মধুরমভিধানং গীতং যস্মিন্। প্লবংগমানাং ভেকানামুদীরিতমেব কণ্ঠতালং সূত্রধারমুখশব্দতালো যস্মিন্। মেঘশব্দো এব মৃদঙ্গনাদাস্তৈরাবিষ্কৃতং প্রকটিতং সংগীতং বনেষু প্রবৃত্তমিব ।৩৬। প্রবৃত্তৈরারব্ধনৃত্তৈঃ। উন্নদন্তো গায়কাস্তৈঃ। বৃক্ষাগ্রনিষণ্ণকায়াস্তে সংগীতোপলক্ষিতনৃত্যদ্রষ্টারঃ।" এ'অর্থ টীকাকারের নিজস্ব নয়, টীকাকার মাত্র রামায়ণকারের বক্তব্যকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সমাবেশ দিয়ে সংগীতের আভিধানিক অর্থকে ফুটিয়ে তোলার জন্য। এ'ছাড়া

"গীতং নৃত্যং চ বাদ্যং চ লভ মাং প্রাপ্য মৈথিলি" (সুন্দরকাণ্ড ২০।১০), "গায়ন্ত্যো নৃত্যমানাশ্চ বাদয়ন্ত্যস্তু রাঘব" (বালকাণ্ড ৩২।১৩), প্রভৃতি শ্লোকাংশও 'সংগীত'-শব্দের দ্যোতক।

রামায়ণের যুগে গান্ধর্ব হিসাবে জাতিরাগ ও গ্রামরাগ-গানেরই প্রচলন ছিল বলে মনে হয়, কেননা বালকাণ্ডে (৪র্থ অধ্যায়ে) সাতটি শুদ্ধ-জাতিগান ও সুন্দর-কাণ্ডে (১ম অধ্যায়ে) "চরিতে কৈশিকাচার্যৈরৈরাবতনিষেবতে" (১৬৩ শ্লোঃ) শ্লোকে 'কৈশিক' শব্দ কৈশিকরাগই প্রমাণ করে। কৈশিক (কৈশিকং) রাগ বা গ্রামরাগই। এর উল্লেখ আমরা মহাভারত, হরিবংশ ও পুরাণাদিতে এবং খৃষ্টীয়াব্দের নারদীশিক্ষা, নাট্যশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে পেয়ে থাকি। কৈশিক সম্বন্ধে টীকাকার উল্লেখ করেছেন: "কৈশিকং গাননৃত্যবিদ্যা তদাচার্যৈস্তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্বৈশ্চরিতে সেবিতে"। শিক্ষাকার নারদ বলেছেন 'কৈশিক' গ্রামরাগটি ঋষি বা মুনি কশ্যপের উদ্‌ভাবিত—"কৈশিকং কশ্যপং প্রাহ"। সাতটি শুদ্ধ-জাতিগান বা জাতিরাগ-গানেরই তখন প্রচলন ছিল, কেননা বিকৃত জাতি বা জাতিগানের উল্লেখ আমরা ভরতের নাট্যশাস্ত্রেই প্রথম উল্লেখ দেখি। জাতিরাগ ও গ্রামরাগগুলি ষড়্‌জাদি সাতটি লৌকিক স্বর, মূর্ছনা, মন্দ্রাদি তিন স্থান, তাল, লয় ও বিচিত্র রসে গান করা হ'ত। বাল্মীকি উল্লেখ করেছেন,

পাঠ্যে গেয়ে চ মধুরং প্রমাণৈস্ত্রিভিরন্বিতম্।
জাতিভিঃ সপ্তভির্যুক্তং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্॥
রসৈঃ শৃঙ্গারকরুণহাস্যরৌদ্রভয়ানকৈঃ।
বীরাদিভি রসৈর্যুক্তং কাব্যমেতদগায়তাম্॥
তৌ তু গান্ধর্বতত্ত্বজ্ঞৌ স্থানমূর্ছনকোবিদৌ।
ভ্রাতরৌ স্বরসম্পন্নৌ গন্ধর্বাবিব রূপিণৌ॥
রূপলক্ষণসংপন্নৌ মধুরস্বরভাষিণৌ।

স্বর-স্থান সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ কুশী-লব রামায়ণ-রূপ মহাকাব্য ('কাব্যং রামায়ণং কৃৎস্নং সীতায়াশ্চরিতং মহৎ'—বালকাণ্ড ৪।৭) গান্ধর্বশাস্ত্রানুযায়ী গান করেছিলেন। "পাঠ্যে গেয়ে"—এখানে গানোপযোগী পাঠ্য তথা কাব্য ('কাব্যং রামায়ণং') বা সাহিত্য শব্দটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৈদিকগান তথা সামগানের সৃষ্টি যেমন ঋক্‌ ও প্রথমাদি স্বরের সমবেত মূর্তি থেকে বৈদিকোত্তর গান্ধর্ব বা মার্গগানও তেমনি পাঠ্য বা সাহিত্যের সঙ্গে লৌকিক ষড়্‌জাদি স্বরের সমাবেশ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। টীকাকার পাঠ্যকে গান বলেছেন—"তেন পাঠে গানে

চেত্যর্থঃ"। ভরত নাট্যশাস্ত্রে (কাশী সংস্করণ ১৮শ অধ্যায়, কাব্যমালা ও বরোদা সংস্করণ ১৭শ অধ্যায়) পাঠ্য-শব্দটি বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। পাঠ্য, ভাষা, কাব্য ও সাহিত্য শব্দগুলি অভিন্ন অর্থের বোধক। পাঠ্য গুণান্বিত অর্থাৎ ছয়টি অলংকার যুক্ত হলেই গানের উপযোগী হয়। আচার্য অভিনবগুপ্ত (খৃষ্টীয় ৯৫০–৯৬০ অব্দ) 'অভিনবভারতী'-টীকায় উল্লেখ করেছেন : "অত এবাহ পাঠ্যগুণানিতি গুণাঃ উপকারকাঃ, যদুপকৃতং কাব্যং পাঠ্যং ভবতীত্যর্থঃ। * * যদি হি স্বরগতা রক্তিঃ পাঠ্যে প্রাধান্যেনাবলম্ব্যেত তদা গানক্রিয়াসৌ স্যাৎ, ন পাঠঃ। পূর্ণস্বরত্বাভাবাদঙ্গানাং ভেদ ইতি চেৎ, ন, অপূর্ণস্বরত্বেঽপি গানত্বপ্রতিজ্ঞানাৎ, ষাড়বৌড়ুবিতয়োঃ ত্রিচতুরস্বরত্বেঽপি গানপ্রতীতিভবত্যেব * *।" সাত স্বর তো বটেই, তিন, চার, পাঁচ বা ছয়টি স্বরযুক্ত পাঠ্য বা কাব্য হলেই তা গেয় বা গানের উপযোগী হয়। মতঙ্গের 'চতুঃস্বরাৎ প্রভৃতি ন মার্গঃ' কথাগুলির আলোচনা করা এখানে নিরর্থক, কেননা ভরত-পূর্বযুগে এবং ভরতের সময় (২য় শতাব্দী) তিন ও চার স্বরযুক্ত গানও অভিজাত সমাজে আদরণীয় ছিল। যেমন ভরত উল্লেখ করেছেন (২৮।৯৫),

ষট্স্বরস্য প্রয়োগোঽয়ং তথা পঞ্চস্বরস্যচ।
চতুঃস্বরপ্রয়োগোঽপি দেশাপেক্ষঃ প্রযুজ্যতে ॥

যদিও ভরত নাট্যশাস্ত্রে পাঠ্যকে প্রধান দু'ভাগে ভাগ করেছেন : 'সংস্কৃতং প্রাকৃতং চৈব যত্র পাঠ্যং প্রযুজ্যতে', তবু পুরুষ ও স্ত্রী এবং বিভিন্ন জাতিভেদে ভাষারও বিভেদ সম্বন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন। মোটকথা ষড়্জাদি সাত স্বর, মন্দ্রাদি তিন স্থান, আরোহাদি চার বর্ণ, সাকাংক্ষা ও নিরাকাংক্ষা দুটি কাকু, শৃঙ্গারাদি রস ও উচ্চ দীপ্ত মন্দ্র নীচ প্রভৃতি ছয়টি অলঙ্কার বা গুণযুক্ত হলেই তা পাঠ্য বা গেয় (গানের উপযোগী) হয়। ভরত তাই উল্লেখ করেছেন,

এবং ভাষাবিধাং তু জ্ঞাত্বা কর্মান্যশেষতঃ।
ততঃ পাঠ্যং প্রযুঞ্জীত ষড়লঙ্কারসংযুতম্ ॥[১]

আচার্য অভিনবগুপ্ত এ'সম্বন্ধে তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন : "স্বরস্থানবর্ণকাকুলংকারাঙ্গানি ষট্ অত্রালংকারশব্দেন বিবক্ষিতানি, এতৈর্হি ভূষিতং কাব্যং পাঠ্যমুচ্যতে"।

পাঠ্যের আভিধানিক সার্থকতা নির্ণয় করতে গিয়ে আচার্য অভিনবগুপ্ত দু'তিন-

১। নাট্যশাস্ত্র (বরোদা সংস্করণ) ১৭।১০২

বার উল্লেখ করেছেন : "স্বরাণাং যদ্রক্তিপ্রধানত্বমনুরণনময়ং তত্ত্যাগেনোচ্চনীচমধ্যম-স্থানস্পর্শিতমাত্রং পাঠোপযোগীতি দর্শিতম্। যদি হি স্বরগতা রক্তিঃ" প্রভৃতি। স্বরসমূহ রক্তিজনকত্ব-ধর্মবিশিষ্ট হলেই তারা 'রাগ' নামে অভিহিত হয়। এই রাগের মধ্যে থাকে অনুরণন-বৃত্তি ও সেই বৃত্তির দ্বারাই রাগ মানুষ ও পশুপক্ষীর চিত্তকে রঞ্জিত, সংস্কারযুক্ত বা আকৃষ্ট করে। অভিনবগুপ্ত এজন্যই 'রক্তি প্রধানত্বমনুরণনময়ং' বলেছেন। রঞ্জনাশক্তি আরো প্রবুদ্ধ ও প্রাণময়ী হয় যদি স্বরের সঙ্গে কথা, কাব্য বা সাহিত্যের সমাবেশ থাকে। গান্ধর্বতত্ত্বজ্ঞ রামায়ণকার একথা ভালভাবেই জানতেন, তাই 'পাঠ্যে গেয়ে' শব্দগুলি জাতিগানের প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছেন। স্বর ও সাহিত্যের যুগ্ম-বিকাশই রঞ্জনাপ্রবাহ সৃষ্টি ক'রে সঙ্গীতের চিত্তাবগাহী ভাব ও রূপকে সার্থক ক'রে তোলে।

বাল্মীকি যে নিজে বৈদিক ও লৌকিক উভয় সঙ্গীতেই কৃতবিদ্য ছিলেন বালকাণ্ডের এ' শ্লোকগুলি থেকে আমরা বেশ বুঝতে পারি। জাতি> জাতিরাগ> রাগ গুণযুক্ত না হ'লে সে পরিপূর্ণ আবেগ সৃষ্টি করতে পারে না। তাই শিক্ষাকার নারদ ও পরবর্তী সঙ্গীতশাস্ত্রী শার্ঙ্গদেবাদি পূর্ণ, প্রসন্ন, মধুর, শ্লক্ষ্ণ, সম, রক্ত, বিকৃষ্ট, সুকুমার, অলংকৃত ও ব্যক্ত এই দশটি গুণের উপযোগিতা স্বীকার করেছেন।[১০] বিশেষভাবে রাগের বিকাশে মাধুর্য-রূপ লাবণ্যগুণ[১১] থাকা চাই, তাই রামায়ণকার 'মধুরং' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আবার বালকাণ্ডের ১৯শ শ্লোকে রামায়ণকার উল্লেখ করেছেন : "সহিতৌ

১০। সঙ্গীত-রত্নাকরে (৪।৩৭৩—৩৭৮) এই দশবিধগুণের বিশেষভাবে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। শার্ঙ্গদেব উল্লেখ করেছেন :

> ব্যক্তং সুরক্তং শ্লক্ষ্ণং চ বিকৃষ্টং মধুরং তথা।
> দশৈতে সুগুণা গীতে তত্র ব্যক্তং স্ফুটৈঃ স্বরৈঃ।
> প্রকৃতিপ্রত্যয়শ্চোক্তং ছন্দোরাগপদৈঃ স্বরৈঃ।
> পূর্ণং পূর্ণাঙ্গগমকং প্রসন্নং প্রকটার্থকম্।
> সুকুমারং কণ্ঠভবং ত্রিস্থানোত্থমলংকৃতম্।
> সমবর্ণলয়স্থানং সমমিত্যভিধীয়তে॥
> সুরক্তং বল্লকীবংশকণ্ঠধ্বন্যৈকতাযুতম্।
> নীচোচ্চদ্রুতমধ্যাদৌ শ্লক্ষ্ণত্বে শ্লক্ষ্ণমুচ্যতে॥
> উচ্চৈরুচ্চারণাদুক্তং বিকৃষ্টং ভরতাদিভিঃ।
> মধুরং ধূর্যলাবণ্যপূর্ণং জনমনোহরম্।

১১। "মধুরং ধূর্য-লাবণ্যপূর্ণম্"—অর্থাৎ মাধুর্য ও লাবণ্যযুক্ত হ'য়ে যে স্বর লোকের চিত্তকে মুগ্ধ করে ('জনমনোহরম্') তারই নাম 'মধুর'। এই মাধুর্য ও লাবণ্য শুধু গানে নয়, যে কোন শিল্প ও বস্তুমাত্রে থাকলে তবে তা সুন্দর ও লোকের চিত্তাকর্ষক হয়।

মধুরং রক্তং সংপন্নং স্বরসংপদা"। 'রক্ত' বলতে বীণা, বংশী ও মনুষ্য-কণ্ঠ এই তিনটি থেকে সৃষ্ট চিত্তবিমুগ্ধকর ধ্বনি। বর্ণ প্রভৃতিরও তাতে সামঞ্জস্য থাকবে। তারপর রাগকে লীলায়িত ও পরিস্ফুট করার জন্য যে যে সাঙ্গীতিক উপাদান-গুলির প্রয়োজন রামায়ণকার শিল্পী কুশী-লবের মাধ্যমে তাদের সকলগুলির পরিচয় দিয়েছেন। প্রমাণ অর্থে দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত লয়: 'প্রমাণানি দ্রুত-মধ্যবিলম্বিতানি', শৃঙ্গারাদি আটটি রস, মন্দ্র, মধ্য, তার তিনটি স্থান, মূর্ছনা ও বীণাদি বাদ্যযন্ত্রের সমাবেশ—এ' সমস্তেরই শুদ্ধ-সপ্তজাতিরাগ-গানে ব্যবহার ছিল। শুদ্ধ-সপ্তজাতি হ'ল ষাড়্জী, আর্ষভী, গান্ধারী, মধ্যমা, পঞ্চমী, ধৈবতী ও নৈষাদী বা নিষাদবতী। এরা ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধার এই তিন গ্রামেই লীলায়িত ছিল কিনা বলা দুরূহ। কিন্তু একথা ঠিক যে গান্ধারগ্রামের তখন (রামায়ণের যুগে) প্রচলন ছিল। মহাভারতের (মহাভারত ও হরিবংশ) যুগে ও এমন কি মহাকবি কলিদাসের সময়েও গান্ধারগ্রামের প্রয়োগ ছিল।[১২] কিন্তু রামায়ণে গান্ধারগ্রাম ব্যবহারের কোন উল্লেখ ঠিক পাওয়া যায় না। তবে ভরত নাট্যশাস্ত্রে শুদ্ধজাতি>জাতিগান>জাতিরাগগুলিকে ষড়্জ ও মধ্যমগ্রাম দুটিরই অন্তর্ভুক্ত করেছেন: "সপ্ত স্বরনামধেয়াঃ সপ্তস্বরাঃ। জাতয়ো দ্বিবিধা শুদ্ধা বিকৃতাশ্চ। তত্র শুদ্ধা ষড়্জগ্রামে ষাড়্জী আর্ষভী সধৈবতী নিষাদবতী। গান্ধারী মধ্যমা পঞ্চমী মধ্যমগ্রামে।" ভরতের সময়ে (২য় শতাব্দী) বিকৃত জাতিরাগেরও সৃষ্টি হয়েছিল ও তারা সংখ্যায় এগারটি। কিন্তু খৃষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দে—কি তার পরে মহাভারতের সময়ে (খৃষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দ) আমরা বিকৃত জাতিরাগের কোন উল্লেখ পাই না। বিকৃত স্বরের বেলায়ও মনে হয় তাই, তখন শুদ্ধ স্বরেরই মাত্র প্রচলন ছিল।

এখন প্রশ্ন যে রামায়ণের সময়ে রক্তিজনক ও অনুরণনযুক্ত সাত স্বর ছিল, কিন্তু 'রাগ' বস্তুটি ছিল কিনা? আমরা মুনি ভরতের নাট্যশাস্ত্রে 'রাগ'-শব্দটির পাঁচবার উল্লেখ পাই ও তা যে রক্তিদায়ক বা রঞ্জনধর্মবিশিষ্ট ও দশ লক্ষণযুক্ত 'রাগ' তা বুঝতে কষ্ট হয় না। আর তারই জন্য বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গের (খৃষ্টীয়

১২। 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি', ১ম ভাগে (পৃঃ ২২২) "উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে * * মূর্ছনাং বিস্মরন্তী" প্রভৃতি শ্লোকের টীকায় মল্লিনাথ উল্লেখ করেছেন: " * * দেবযোনিত্বাদ্গান্ধারগ্রামেণ গাতুকামেত্যর্থঃ। তদুক্তম্—'ষড়্জমধ্যমনামানৌ গ্রামৌ গায়ন্তি মানবাঃ। ন তু গান্ধারনামানং, স লভ্যো দেবযোনিভিঃ' ইতি।"

৫ম-৭ম শতাব্দী) আক্ষেপোক্তি 'রাগমার্গস্য' প্রভৃতি শ্লোকের সার্থকতা কতটুকু তা বিচারের বিষয়। মতঙ্গ বলেছেন,

রাগমার্গস্য যদ্ রূপং যন্নোক্তং ভরতাদিভিঃ।
নিরূপ্যতে তদস্মাভির্লক্ষ্যলক্ষণসংযুতম্ ॥

নাট্যশাস্ত্রকার ভরত মার্গ-রাগের লক্ষণ আভিধানিক অর্থে নিরূপণ করেন নি, অর্থাৎ রাগ কাকে বলে সে বিষয়ে কোন কথা বলেন নি সত্য, কিন্তু তিনি সকল লক্ষণযুক্ত রাগের (জাতিরাগ, গ্রামরাগ) পরিচয় দিয়েছেন। এখানে মার্গরাগ অর্থে মার্গপ্রকৃতিসম্পন্ন অভিজাত দেশীরাগ বুঝতে হবে। মতঙ্গ রাগের আভিধানিক অর্থ সর্বপ্রথম দিয়েছেন এই মাত্র, কিন্তু রাগ-বস্তুটি তিনি সৃষ্টি করেন নি। তিনি উল্লেখ করেছেন,

স্বরবর্ণবিশেষেণ ধ্বনিভেদেন বা পুনঃ।
রজ্যতে যেন যঃ কশ্চিৎ স রাগঃ সংমতঃ সতাম্ ॥
অথবা—
রঞ্জকো জনচিত্তানাং স চ রাগ উদাহৃতঃ।
*   *   *   *
রঞ্জনাজ্জায়তে রাগো ব্যুৎপত্তিঃ সমুদাহৃতা ॥

আসলে মতঙ্গ রাগ শব্দটির ব্যুৎপত্তিই নির্ণয় করেছেন। কিন্তু রামায়ণে ব্যুৎপত্তিসূচক কোন কথার উল্লেখ না থাকলেও আমরা শ্রোতৃচিত্ত-মনোরঞ্জনকারিণী শক্তির উল্লেখ দেখি। যেমন,

তৌ চাপি মধুরং রক্তং স্বচিত্তায়তনিঃস্বনম্ ॥
তন্ত্রীলয়বদত্যর্থং বিশ্রুতার্থমগায়তাম্।
হ্লাদয়ৎসর্বগাত্রানি মনাংসি হৃদয়ানি চ ॥
শ্রোত্রাশ্রয়সুখং গেয়ং তদ্বভৌ জনসংসদি।

এখানে 'মধুরং', 'রক্তং', 'হ্লাদয়ৎ সর্বগাত্রানি মনাংসি হৃদয়ানি চ' ও 'শ্রোত্রাশ্রয়সুখং', 'শ্রোতৃনাং হর্ষবর্ধনম্', কথাগুলি মতঙ্গ-কর্তৃক উল্লিখিত ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'রজ্যতে যেন যঃ কশ্চিৎ', 'রঞ্জকো জনচিত্তানাং' বা 'রঞ্জনাজ্জায়তে রাগঃ' প্রভৃতির যে সমানার্থক একথা অবশ্যই স্বীকার্য। এ' ছাড়া আবার শুদ্ধ জাতিরাগ-গানগুলিকে বলা হয়েছে : "আয়ুষ্যং পুষ্টিজননং সর্বশ্রুতিমনোহরম্" (১।৪।২৮)। সুতরাং রাগের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্ধারিত না হ'লেও রঞ্জনধর্মবিশিষ্ট 'রাগ' যে রামায়ণের যুগে ছিল এ' বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

রামায়ণকার আবার কুশী-লবের প্রশংসা ক'রে বলেছেন "গান্ধর্বতত্ত্বজ্ঞৌ", "গন্ধর্বাবিব রূপিণৌ", অর্থাৎ গন্ধর্বরা যেমন সঙ্গীতে পারদর্শী, কুশী-লবও তেমনি সঙ্গীতবিদ্যাসম্পন্ন ছিলেন। তাদের গান গান্ধর্ব বা মার্গ শ্রেণীভুক্তই ছিল: "অগায়তাং মার্গবিধানসংপদা"। টীকাকারও উল্লেখ করেছেন: "মার্গবিধানসংপদা। গানং দ্বিবিধম্। মার্গো দেশী চেতি। তত্র প্রাকৃতাবলম্বি গানং দেশী। সংস্কৃতাবলম্বি তু গানং মার্গঃ। তয়োর্মধ্যে মার্গাখ্যগানমার্গাবলম্বনসামগ্র্যা অগায়তাম্।" গ্রন্থকার 'মার্গবিধানসংপদা'—মার্গকে পদের গুণ হিসাবে (কাব্যে) অর্থ করতে চান। ভোজরাজ তাঁর 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: "বৈদর্ভাদিকৃতঃ পন্থাঃ কাব্যে মার্গ ইতি স্মৃতঃ"। কিন্তু আমাদের মনে হয় এখানে কাব্য-অর্থের পরিবর্তে গান-অর্থেই মার্গ-শব্দ প্রযুক্ত হবে; কেননা উত্তরকাণ্ডের ৯৪ সর্গে "ততঃ প্রবৃত্তং মধুরং গান্ধর্বমতিমানুষম্" শ্লোকাংশে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কুশী-লব রাজসভায় শ্রোতাদের আনন্দোৎপাদক ('শ্রোতৃণাং হর্ষবর্ধনম্') জনচিত্তহারী গান্ধর্বগানই গেয়েছিলেন।

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ৯৩-৯৪ সর্গে দেখা যায়, ঋষি বাল্মীকি সশিষ্যে রামচন্দ্রের অশ্বমেধযজ্ঞে এসে কুশী ও লবকে বল্লেন: 'বৎস, তোমরা মুনি-ঋষিদের আশ্রমে, ব্রাহ্মণের গৃহে, রাজমার্গে, অভ্যাগত রাজাদের গৃহে, রামচন্দ্রের প্রাসাদের দ্বারে, যজ্ঞস্থানে ও ঋত্বিকদের কাছে রামায়ণ-কাব্য গান ক'রে বেড়াও। * * যদি রামচন্দ্র সমবেত ঋষিগণের মধ্যে তোমাদের আহ্বান করেন তবে আদেশ পালনের জন্য সেখানে গান করবে। ধন-সম্পদের লোভ কিছুমাত্র যেন তোমাদের মনে স্থান না পায়, কেননা তোমরা আশ্রমবাসী ও ফলমূলভোজী, ধনের তোমাদের প্রয়োজন কি? * * সুমধুর বীণাযন্ত্রে মূর্ছনা সহকারে প্রতিদিন কুড়িটি সর্গ গান করবে। রামচন্দ্র ধর্মতঃ সকলের পিতা, তাঁর প্রতি সর্বদা সম্মান প্রদর্শন করবে'। প্রকৃতপক্ষে কুশী-লব তাঁদের পরমারাধ্য আচার্যের কথা রক্ষা করেছিল। তারা শুদ্ধ উচ্চারণ-সহকারে বীণার সঙ্গে দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত লয়ে রামায়ণ গান ক'রে রামচন্দ্রকে কৌতূহলাবিষ্ট ক'রেছিল। যজ্ঞের শেষে রামচন্দ্র ও সমবেত ঋষি, মুনি ও পণ্ডিতগণ মহামুনি বাল্মীকি ও অপরূপদর্শন কুশী-লবকে আহ্বান করেছিলেন।[১৩]

১৩। "সশিষ্য আজগামাশু বাল্মীকির্ভগবানৃষিঃ॥

* * *

স শিষ্যা বব্রবীদ্‌হৃষ্টৌ যুবাং গত্বা সমাহিতৌ।

কৃৎস্নং রামায়ণং কাব্যং গায়তাং পরয়া মুদা॥

রামায়ণে কাব্য বা পাঠ্যগীতির প্রসঙ্গে অনেকবারই 'মূর্ছনা' শব্দটির উল্লেখ আছে। যেমন 'স্থানমূর্ছনকোবিদৌ' (১।৪।১০), 'মূর্ছয়িত্বা সুমধুরং গায়তাং' (৭।৯৩।১৩) প্রভৃতি। এ' থেকে মূর্ছনার সৃষ্টি ও ব্যবহার যে রামায়ণের যুগে ছিল একথা স্পষ্ট বোঝা যায়। 'মূর্ছয়িত্বা'-শব্দটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিলক-টীকাকার রাম উল্লেখ করেছেন : 'বীণাদণ্ডোপরি কল্পিতশিরাধারকাষ্ঠপঙ্‌ক্তিরূপং তচ্চ মূর্ছয়িত্বা তত্রাপি নাদব্যাপ্তি কৃত্বা সুমধুরং গায়তাম্।" 'মূর্ছনা' শব্দটি বীণার সঙ্গে সম্পর্কিত দেখা যায় ও মনে হয় বীণাই মূর্ছনা-শব্দটি সৃষ্টি করেছে। এ' অনুমানকে অবলম্বন ক'রে একথা বল্লেও বোধহয় অসমীচীন হবে না যে বৈদিক যুগে পিচ্ছোরা, ঔডুম্বরী, কাশ্যপী প্রভৃতি বীণার সঙ্গে সামগানেও সম্ভবত মূর্ছনার ব্যবহার হ'ত। ভরত নাট্যশাস্ত্রে চলবীণা ও অচলবীণার মাধ্যমে শ্রুতিস্বর নির্ণয়ের সময় মূর্ছনা শব্দের ব্যবহার করেছেন দেখা যায়। যেমন "এতেষাং স্বরাণাং মূর্ছনাধিকারত্বং তু তন্ত্র্যুপপাদনদণ্ডেন্দ্রিয়বৈগুণ্যাদুপজায়তে" কিংবা "দ্বে বীণে তুল্যপ্রমাণতন্ত্র্যুপপাদনদণ্ডমূর্ছিতে ষড়্‌জগ্রামাশ্রিতে কার্যে"। তবে একথা ঠিক যে মূর্ছনার মধ্যে তখন (রামায়ণের যুগে) প্রকারভেদ দেখা দেয় নি।

'ক্রমযুক্ত সাতটি স্বরের নাম মূর্ছনা' একথাই অন্তত ভরত উল্লেখ করেছেন। শাণ্ডিল্য বলেছেন : "যত্রৈব স্যুঃ স্বরাঃ পূর্ণা মূর্ছনা সেত্যুদাহৃতা", অর্থাৎ যাতে

ঋষিবাটেষু পুণ্যেষু ব্রাহ্মণাবসথেষু চ।
রথ্যাসু রাজমার্গেষু পার্থিবানাং গৃহেষু চ॥
রামস্য ভবনদ্বারি যত্র কর্ম চ কুর্বতে।

* * *

দিবসে বিংশতিঃ সর্গা গেয়া মধুরয়া গিরা।

* * *

ইমাস্তন্ত্রীঃ সুমধুরাঃ স্থানং বাপূর্বদর্শনম্।
মূর্ছয়িত্বা সুমধুরং গায়তাং বিগতজ্বরৌ॥

* * *

গায়তাং মধুরং গেয়ং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্॥

* * *

সংদিষ্টৌ মুনিনা তেন তাবুভৌ মৈথিলীসুতো।

* * *

বালাভ্যাং রাঘবঃ শ্রুত্বা কৌতুহলপরোঽভবৎ।
অথ কর্মান্তরে রাজা সমাহূয় মহামুনী।" প্রভৃতি

সাতটি স্বর থাকে তাকেই মূর্ছনা বলে। মতঙ্গ বলেছেন: যাতে রাগ মূর্ছিত অর্থাৎ আরোহণ-অবরোহণ ক্রমে বিকাশপ্রাপ্ত হয় তাকেই মূর্ছনা বলে:

মূর্ছতে যেন রাগো হি মূর্ছনেত্যভিসংজ্ঞিতা।
আরোহণাবরোহণক্রমেণ স্বরসপ্তকম্॥

অথবা বলেছেন: "মূর্ছনাব্যুৎপত্তিঃ—মূর্ছা মোহসমুচ্ছ্রায়য়োঃ"।

উত্তরকাণ্ডের ৯৪ সর্গেও কুশী-লবকে উপলক্ষ্য ক'রে গান্ধর্ব-সঙ্গীতের আলোচনা করা হয়েছে। যেমন,

তাং স শুশ্রাব কাকুৎস্থঃ পূর্বাচার্যবিনির্মিতাম্।
অপূর্বাং পাঠ্যজাতিং চ গেয়েন সমলংকৃতাম্॥
প্রমাণৈর্বহুভির্বদ্ধাং তন্ত্রীলয়সমন্বিতাম্।

মনের ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকাশের জন্য কণ্ঠের ধ্বনির যে ভিন্নতা বা বিচিত্রতা তার নাম 'কাকু'। আচার্য অভিনবগুপ্ত অভিনবভারতী-টীকায় কাকুর পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন: "তথা বর্ণা উদাত্তাদয়োঽলংকারাশ্চোচ্চনীচদীপ্তাদয়োঽপরিসমাপ্তা অর্ধস্পৃষ্টতয়ৈব ত্যক্ত্বা যত্রেতি ক্রিয়াবিশেষণম্। এবংভূতো যঃ ক্রিয়াবিশেষণত্বেন বাক্যে পাঠ্যমানে ধ্বনিধর্মবিশেষঃ সা কাকুঃ।" সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ উল্লেখ করেছেন: "ভিন্নকণ্ঠধ্বনির্ধীরৈঃ কাকুরিত্যভিধীয়তে"; কণ্ঠ তথা উচ্চারণভেদে ধ্বনির যে ভেদ বা ভিন্নতা হয় তার নাম কাকু। ভোজরাজ বলেছেন: "ভিন্নকণ্ঠধ্বনির্ধীরৈঃ স কাকুরিতি কথ্যতে"। এ' সম্বন্ধে সঙ্গীত-রত্নাকরের টীকাকারের বিবৃতি ক্ষুদ্র ও স্পষ্ট। তিনি বলেছেন: "কাকুর্ধ্বনৈর্বিকারঃ"। ভানুজী-দীক্ষিত অমরকোষে কাকুর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন: "কাকুঃ স্ত্রিয়াং বিকারো যঃ শোকভীত্যাদিভির্ধ্বনেঃ"; অর্থাৎ স্ত্রীলোকদের শব্দ, শোক ও ভয়জনিত শব্দ বা ধ্বনিভেদের নাম কাকু।

কাকুর প্রকারভেদে আবার ক্রমবিকাশ আছে। যেমন নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের মতে সাকাঙ্ক্ষা ও নিরাকাঙ্ক্ষা ভেদে কাকু দু'রকম। অনিযুক্ত-বাক্য সাকাঙ্ক্ষ ও নিযুক্ত-বাক্য নিরাকাঙ্ক্ষ। কিন্তু শার্ঙ্গদেব (১৩শ শতাব্দী) সঙ্গীত-রত্নাকরে স্বর-কাকু, রাগ-কাকু, অন্য-কাকু, দেশ-কাকু, ক্ষেত্র-কাকু ও যন্ত্র-কাকু এই ছ' রকম কাকুর পরিচয় দিয়েছেন। সিংহভূপাল সুধাকরটীকায়ও এই ছয় প্রকার কাকুর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। কাকুর দ্বারা ধ্বনির বা গানের স্নিগ্ধতা, অভিব্যঞ্জনা, মাধুর্য ও রস সৃষ্টি হয়। নাট্যশাস্ত্রে ভরত উল্লেখ করেছেন বিলম্বিত-কাকুতে হাস্য, শৃঙ্গার ও করুণ, উচ্চ ও দীপ্তা-কাকুতে বীর, রৌদ্র ও

অদ্ভুত, নীচু ও দ্রুত-কাকুতে ভয়ানক ও বীভৎস রসাদির প্রকাশ পায়।[১৪] উরঃ, শির ও কণ্ঠ এই তিন স্থান থেকেই কাকু-স্বর নির্গত হয়।[১৫] মহামুনি বাল্মীকি কাকু-স্বরের রহস্য ও প্রয়োগ জানতেন। তিনি কুশী-লবকে গীতি-প্রয়োগে এই কাকুস্বর শিক্ষা দিয়েছিলেন, আর তারই জন্য জাতিগান বা রামায়ণগান সুমিষ্ট হ'ত: "তাং স শুশ্রাব কাকুৎস্থঃ"। তবে টীকাকার যে পূর্বাচার্যকে ভরত বলে পরিচয় দিয়েছেন ('পূর্বাচার্যেণ ভরতেন নির্মিতাম্') সেই ভরত নিশ্চয়ই খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর নাট্যশাস্ত্রকার মুনি ভরত নন, তিনি আদি বা বৃদ্ধ-ভরত সদাশিব-ভরত বা ব্রহ্মা-ভরত হবেন। এ' সম্বন্ধে পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

পুনরায় উত্তরকাণ্ডের ৭১ সর্গে যে জাতিরাগসহ কাব্যগানের আলোচনা করা হয়েছে তাতে রক্তি ও লাবণ্য, মন্দ্রাদি তিন স্থান, লয়, বীণাদির সমাবেশ ও তালযুক্ত রাম-চরিতগানের পাঠ্যকে বলা হয়েছে সংস্কৃত-লক্ষণসম্পন্ন ও বৃত্তিযুক্ত। যেমন,

স ভুক্তবান্নরশ্রেষ্ঠো গীতমাধুর্যমুত্তমম্।
শুশ্রাব রামচরিতং তস্মিন্‌কালে যথাকৃতম্॥
তন্ত্রীলয়সমাযুক্তং ত্রিস্থানকরণান্বিতম্।
সংস্কৃতং লক্ষণোপেতং সমতালসমন্বিতম্॥

* * *

তান্যক্ষরাণি সত্যানি যথাবৃত্তানি পূর্বশঃ॥

* * *

তস্মিন্‌গীতে যথাবৃত্তং বর্তমানমিবাশৃণোৎ।
পদানুগাশ্চ যে রাজ্ঞস্তাং শ্রুত্বা গীতিসংপদম্॥

রামায়ণকাব্য-গানে কাকুস্বর ব্যবহারের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। পাঠ্যে বা পদ-রচনায় ভাষার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট আছে। মুনি ভরত পাঠ্যভাষার উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

১৪। হাস্যশৃঙ্গারকরুণেম্বিষ্টা কাকুর্বিলম্বিতা।
বীররৌদ্রাদ্ভুতেষূচ্চা দীপ্তা চাপি প্রশস্যতে।
ভয়ানকে সবীভৎসে দ্রুতা নীচা চ কীর্তিতা।
এবং ভাবরসোপেতা কাকুর্যোজ্যা প্রযোক্তৃভিঃ।
—নাট্যশাস্ত্র ১৯।৫৭-৫৮

১৫। উরসঃ শিরসঃ কণ্ঠাৎ স্বরঃ কাকুঃ প্রবর্ততে।

ভাষাচতুর্বিধা জ্ঞেয়া দশরূপে প্রয়োগতঃ ॥
সংস্কৃতং প্রাকৃতং চৈব যত্র পাঠ্যং প্রযুজ্যতে।
অতিভাষার্যভাষা চ জাতিভাষা তথৈব চ ॥

*　　*　　*

জাতিভাষাশ্রয়ং পাঠ্যং দ্বিবিধং সমুদাহৃতম্ ॥

ভাষা চার রকমঃ অতিভাষা, আর্যভাষা, জাতিভাষা ও যোন্যন্তরীভাষা। এদের মধ্যে অতিভাষা দেবতাদের, আর্যভাষা নৃপতিবর্গের, ভারতের বিভিন্ন জাতির ও ম্লেচ্ছ-উপলক্ষিত ভাষা জাতিভাষা ও যোন্যন্তরী গ্রাম ও অরণ্যচারী পশু-পক্ষীদের ভাষা।[১৬] এদের মধ্যে রামায়ণ-রূপ পাঠ্য বা কাব্যগীতির ভাষা ছিল সংস্কৃত। ভাষ্যকার উবট ঋক্‌প্রাতিশাখ্যের ১।৬ শ্লোকের বিবৃতি-প্রসঙ্গে ভাষা সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেনঃ "দ্বিবিধা হি ভাষা। লৌকিকী বৈদিকী চ। যা বৈদিকী সা ছন্দোভাষেত্যুচ্যতে। যথা চোক্তম্। লোকবেদয়োঃ (পা° শি° ১) ইতি।" এখন প্রশ্ন হ'তে পারে বৈদিকযুগের কথা স্বতন্ত্র, কেননা বৈদিকযুগের ভাষা সংস্কৃত হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু পৌরাণিক (রামায়ণিক) যুগে ভাষার ব্যবহার নিশ্চয়ই আলাদা ছিল। কিন্তু তা ঠিক নয়। যদিও রামায়ণগান সূর্যবংশজাত ক্ষত্রিয়রাজ রামচন্দ্রের কাহিনীকে অবলম্বন ক'রে রচিত হয়েছিল তাহলেও আর্যভাষার পরিবর্তে স্বরভেদাদিযুক্ত মার্জিত সংস্কৃত-ভাষায় রচিত ছিল। তা ছাড়া কুশী-লব ক্ষত্রিয়বংশজাত হলেও আশৈশব লালিত-পালিত হ'য়ে শিক্ষালাভ করে-ছিল অরণ্যবাসী তপঃক্লিষ্ট মুনি-ঋষিদের আশ্রমে। তপস্যাময় ও সংযমসম্পন্ন ছিল তাদের জীবন। মহামুনি বাল্মীকির ছিল তারা যেন মানসপুত্র। তাই তাদের গানের ভাষায় বৈদিক শব্দের বাহুল্য ছিল আর ছিল সুরনিষ্ণাত ছন্দ। আচার্য অভিনবগুপ্ত তাঁর অভিনবভারতী-টীকায় সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষাদুটির

১৬। অতিভাষার্যভাষা চ জাতিভাষা তথৈব চ।
তথা যোন্যন্তরী চৈব ভাষা নাট্যে প্রকীর্তিতা ॥
অতিভাষা তু দেবানামার্যভাষা তু ভূভুজাম্।

*　　*　　*

দ্বিবিধা জাতিভাষা চ প্রয়োগে সমুদাহৃতা ॥
ম্লেচ্ছশব্দোপচারা চ ভারতং বর্ষমাশ্রিতা।
অথ যোন্যন্তরীভাষা গ্রাম্যারণ্যপশূদ্ভবা ॥
নানাবিহঙ্গজা চৈব নাট্যধর্মী প্রতিষ্ঠিতা ॥

পরিচয়-প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন: "সংস্কৃতৈব ভাষা স্বরভেদাদিপূর্ণসংস্কারোপেতা, সংস্কৃতভাষা ভাষাভেদানামুক্তা বৈদিকশব্দবাহুল্যাদার্ষভাষাতো বিলক্ষণত্বমস্যা ইত্যন্যে।" 'ইত্যন্যে' বলতে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষাদুটির ভেদ অভিনবগুপ্ত ছাড়া অন্যান্য আচার্যরাও স্বীকার করেন।

রামায়ণকার উল্লেখ করেছেন: "তস্মিন্ গীতে যথাবৃত্তং * * পদানুগাশ্চ * * গীতিসংপদম্"। গানের ভাষায় অক্ষর, অক্ষরযুক্ত পদ, বৃত্তি, রীতি প্রভৃতি থাকা চাই, তবেই তা স্বরযুক্ত হ'লে গেয় বা গানের উপযোগী হয়। নাট্যশাস্ত্রে জাতিগান বা জাতিরাগগানের প্রসঙ্গে ভরতও ঠিক এই কথা বলেছেন: "বৃত্তাক্ষরপ্রমাণং হি জাতিরিত্যভিসংজ্ঞিতাঃ" (কাশী সং ৩২।৩৩১)। অর্থাৎ জাতিগানে বৃত্তি, অক্ষর ও প্রমাণ অবশ্যই থাকবে, অন্যথা তাকে গান বলা যেতে পারে না। আসলে বৃত্তি নাটকাভিনয়ে প্রযুক্ত হয় ও সঙ্গে সঙ্গে নাটকের জন্য অভিপ্রেত যে ধ্রুবাদি গান তাতেও ব্যবহৃত হয়। নাটকে প্রধানত চারটি বৃত্তির প্রয়োগ বা ব্যবহার হয়। বৃত্তিসম্বন্ধে ভরত উল্লেখ ক'রেছেন,

ভারতী সাত্বতী চৈব কৈশিক্যারভটী তথা।
চতস্রো বৃত্তয়ো হ্যেতা যাসু নাট্য-প্রতিষ্ঠিতা ॥[১৭]

অর্থাৎ ভারতী, সাত্বতী, কৈশিকী ও আরভটী ভেদে নাটকীয়া বৃত্তি চার রকম। এদের আবার শ্রেণীভাগ আছে, যেমন উত্তম ও মধ্যম। ভোজরাজ 'সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ' গ্রন্থে বৃত্তি সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। যা মনের বা চিত্তের বিকাশ, বিক্ষেপ, সংকোচ ও বিস্তার সাধন করে তাই বৃত্তি। তাই বৃত্তি মনের ধর্ম বা স্বভাব-বিশেষ। সঙ্গীত-রত্নাকরের টীকায় 'তত্র বৃত্তির্নাম' বলে বৃত্তির আভিধানিক অর্থ নির্ণয় করেছেন কল্লিনাথ: "বাঙ্মনঃকায়জা চেষ্টা পুরুষার্থোপযোগিনী";—অর্থাৎ পুরুষের প্রয়োজনীয় সমস্ত মন, বাক্য ও শরীরের চেষ্টার নাম বৃত্তি। কাজেই বৃত্তি শুধুই মনের নয়, শরীরেরও চেষ্টা-রূপ ধর্ম। কল্লিনাথ বৃত্তির সামান্যলক্ষণের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন,

অত্যর্থসুকুমারার্থসংদর্ভা কৈশিকী মতা।
অত্যুদ্ধতার্থসংদর্ভা বৃত্তিরারভটী স্মৃতা ॥
ইষন্মৃদ্বর্থসংদর্ভা ভারতীবৃত্তিরিষ্যতে।
ইষৎপ্রৌঢ়ার্থসংদর্ভা সাত্বতীবৃত্তিরিষ্যতে ॥

কিন্তু সরস্বতীকণ্ঠাভরণকার বৃত্তি ছ'রকম বলেছেন: কৈশিকী, আরভটী, ভারতী,

১৭। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সংস্করণ), ৬।২৪-২৫

সাত্বতী, মধ্যমারভটী ও মধ্যমকৈশিকী। যে বৃত্তি প্রৌঢ় অর্থরাশি ব্যক্ত করে তার নাম আরভটী। যে বৃত্তি সুকুমার অর্থ-সন্দর্ভের প্রকাশক তার নাম কৈশিকী। যে বৃত্তি কোমল-প্রৌঢ় ও কোমল অর্থ প্রকাশ করে তার নাম ভারতী। যা প্রৌঢ় ও কোমল-প্রৌঢ় অর্থের প্রকাশক তার নাম সাত্বতীবৃত্তি। যে বৃত্তি কোমলতার মধ্যে প্রৌঢ় অর্থের দ্যোতক তার নাম মধ্যমকৈশিকী ও প্রৌঢ়ের মধ্যে কোমলতা-প্রকাশক বৃত্তির নাম মধ্যমারভটী।[১৮] এই ছ'টি বৃত্তির অনুকৃতি বা ছায়াবৃত্তি আবার ছ'টি, যেমন লোকোক্তিচ্ছায়া, ছেকোক্তিচ্ছায়া, অর্ভকোক্তিচ্ছায়া, উন্মত্তোক্তিচ্ছায়া, পোটোক্তিচ্ছায়া* ও মত্তোক্তিচ্ছায়া।[১৯] গেয় কাব্য-রচনার ক্ষেত্রে ভাব ও অভিব্যক্তি-ব্যঞ্জনার জন্য ভাষা, ছন্দ, অক্ষর, গতি, বৃত্তি, রীতি প্রভৃতির প্রায়াজনীয়তা আছে। 'রীতি' বলতে কল্লিনাথ বলেছেন গুণযুক্ত পদের সমাবেশ বোঝায়: "রীতির্নাম গুণাশ্লিষ্টপদসংঘটনা মতা"। মোটকথা রীতি কাব্য বা পদ-রচনার গুণপ্রকাশক। ভরত, ভোজরাজ ও অন্যান্য আলঙ্কারিকেরা কাব্যে ভাষা ও ছন্দ-সৌকর্যের জন্য বৈদর্ভী, মাগধী, পাঞ্চালী, গৌড়ী, অবন্তিকা ও লাটিকা এই ছ'টি রীতির উল্লেখ করেছেন।[২০] দেশীরাগের মতো রীতিগুলি বিভিন্ন দেশ বা অঞ্চল থেকে উৎপন্ন

১৮। যা বিকাশেঽথ বিক্ষেপে সংকোচে বিস্তরে তথা।
চেতসো বর্তয়িত্রী স্যাৎ সা বৃত্তিঃ সাপি ষড়্‌বিধা॥
কৈশিক্যারভটী চৈব ভারতী সাত্বতী পরা।
মধ্যমারভটী চৈব তথা মধ্যমকৈশিকী॥
সুকুমারার্থসন্দর্ভা কৈশিকী তাসু কথ্যতে।
যা তু প্রৌঢ়ার্থসন্দর্ভা বৃত্তিরারভটীতি সা॥
কোমলপ্রৌঢ়সন্দর্ভাং কোমলার্থাথ ভারতী।
প্রৌঢ়ার্থাং কোমলপ্রৌঢ়সন্দর্ভাং সাত্বতীং বিদুঃ॥
কোমলে প্রৌঢ়সন্দর্ভা ত্বর্থে মধ্যমকৈশিকী।
প্রৌঢ়ার্থা কোমলে বন্ধে মধ্যমারভটীষ্যতে॥

—সরস্বতীকণ্ঠাভরণম্ ২।৩৪-৩৮

১৯। অন্বেতৈনামনুকৃতিশ্ছায়া সাপীহ ষড়্‌বিধা।
লোকচ্ছেকার্ভকোন্মত্তপোটামত্তোক্তিভেদতঃ॥

—সরস্বতীকণ্ঠাভরণম্ ২।৩৯

২০। পাঞ্চালী রীতির্বৈদর্ভী গৌড়ীরিত্যুভয়াত্মিকা।
লাটী সমাসানুপ্রাসপ্রায়া তাৎপর্যভেদভাক্।
ওজঃকান্তিগুণোপেতা গৌড়ীয়া রীতিরিষ্যতে॥
বন্ধপারুষ্যরহিতা শব্দকাঠিন্যবর্জিতা,
নাতিদীর্ঘসমাসা চ বৈদর্ভীরীতিরিষ্যতে॥

* * পাঞ্চালাদিরীতিনাং শব্দগুণাশ্রিতানামর্থবিশেষনিরপেক্ষতয়া কেবলসংদর্ভসৌকুমার্যপ্রৌঢ়ত্ব-মাত্রবিষয়ত্বাৎ কৈশিক্যাদিভ্যো ভেদোঽনবগন্তব্যঃ। —কল্লিনাথ

হয়েছে বলে মনে হয়। সঙ্গীতশাস্ত্রীরাও বিভিন্ন রীতি, গতি, বৃত্তি ও ভাষা প্রভৃতির উপযোগিতা সঙ্গীতে স্বীকার করেছেন। খৃষ্টপূর্ব গান্ধর্ব-সঙ্গীতেও যে এদের প্রয়োগ ও অনুশীলন ছিল তা রামায়ণ, মহাভারত ও ক্ল্যাসিক্যাল কাব্যগ্রন্থগুলি দেখলে বোঝা যায়।

অযোধ্যাকাণ্ডের ৬৫ সর্গে পাণিবাদক সূত, আশীর্গান ও গাথাগানের উল্লেখ পাই। এখনকার মতো রামায়ণের যুগেও সুরশিল্পীদের 'গায়ক' বলা হ'ত। রামায়ণকার উল্লেখ করেছেন: "গায়কাঃ শ্রুতিশীলাশ্চ নিগদন্ত পৃথক-পৃথক"। টীকাকার 'শ্রুতিশীলাঃ' অর্থে তন্ত্রীনাদ-বিভাজনশীল বলেছেন: "তন্ত্রীনাদবিভাজনশীলা গায়কাঃ"। বীণাদির তার বা তন্ত্রী থেকে ধ্বনিত স্বরের যে সূক্ষ্মাদি ভাগ তা সূক্ষ্মস্বর শ্রুতিরই নামান্তর। সাতটি শুদ্ধ স্বরের ব্যবহার রামায়ণের যুগে ছিল, সপ্তকের অন্তর্গত বিভিন্ন সূক্ষ্মস্বর তথা শ্রুতির অস্তিত্বও ছিল সত্য, কিন্তু সেই সূক্ষ্মস্বর শ্রুতির আবিষ্কার (উদ্ভাবন নয়) ও অনুশীলন-রীতির প্রচলন ছিল কিনা সন্দেহ। বিজ্ঞানসম্মত ও বিধিবদ্ধভাবে শ্রুতির নির্ধারণ বা বিভাজনপ্রণালীর নিদর্শন পাই সম্ভবত সর্বপ্রথম আমরা ভরতের নাট্যশাস্ত্রে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে, আর বৈদিক স্বর অনুযায়ী শ্রুতিনামের উল্লেখ দেখি নারদীশিক্ষাতে (খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী)। শিক্ষাকার নারদ উল্লেখ করেছেন,

দীপ্তায়তাকরুণানাং মৃদুমধ্যময়োস্তথা।
শ্রুতীনাং যোঽবিশেষজ্ঞো[২১] ন স আচার্য উচ্যতে ॥
দীপ্তা মন্দ্রে দ্বিতীয়ে চ প্রচতুর্থে তথৈব তু।
অতিস্বারে তৃতীয়ে চ ক্রুষ্টে তু করুণা-শ্রুতিঃ ॥
শ্রুতয়োঽন্যা দ্বিতীয়স্থ মৃদুমধ্যায়তাঃ স্মৃতাঃ।

* * * *

দীপ্তামুদাত্তে জানীয়াদ্দীপ্তাং চ স্বরিতে বিদুঃ।
অনুদাত্তে মৃদুর্জ্ঞেয়া গান্ধর্বাশ্রুতিসম্পদঃ ॥

শিক্ষাকার নারদের স্বরানুগত শ্রুতি-নির্ধারণপ্রণালী একটু অভিনব এজন্য যে তিনি বৈদিক প্রথমাদি সাত স্বরের ও উদাত্তাদি তিন স্থানস্বরের শ্রুতি নির্ণয় করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন: বৈদিক শ্রুতি মোট পাঁচটি—দীপ্তা, আয়তা, করুণা, মৃদু ও মধ্যমা বা মধ্যা। যিনি এরূপ শ্রুতির বিশেষজ্ঞ নন, তিনি আচার্য-পদবাচ্য

২১। চৌখম্বা সংস্করণ নারদীশিক্ষায় 'যো বিশেষজ্ঞো' পাঠ আছে। এটি অশুদ্ধ; শুদ্ধপাঠ হবে যোঽবিশেষজ্ঞো"।

নন : "শ্রুতীনাং যোঽবিশেষজ্ঞো ন স আচার্য উচ্যতে"। টীকাকার ভট্টশোভাকর উল্লেখ করেছেন : বিশেষজ্ঞানবিহীন আচার্যের অজ্ঞতার জন্য যে অত্যন্ত দোষ হয় তাই নয়, তাঁর নিজের প্রত্যবায় তো হয়ই, তিনি অন্যকেও প্রত্যবায়ভাগী করেন ("অবিশেষজ্ঞস্যাচার্যস্যাধিকো দোষঃ ন কেবলমজ্ঞত্বাৎ স্বয়ং প্রত্যবেতি অন্যান্যাপি প্রত্যবায়েন যোজয়তীত্যাচার্যগ্রহণম্")। ঋকপ্রাতিশাখ্যে "পদক্রম-বিভাগজ্ঞো বর্ণাক্রমবিচক্ষণঃ" প্রভৃতি সূত্রে[২২] (১।৮) আচার্য সম্বন্ধেও ঠিক একথাই বলা হয়েছে। ভাষ্যকার উবট উল্লেখ করেছেন : "আচার্যসংপদম্। আচার্যত্বং কুর্যাদিত্যর্থঃ। অন্যথাধিকার্যেব ন ভবতি। * * * তথা চোক্তম্। বটবঃ পণ্ডিতা তে মূর্খা অন্যোন্যাধ্যাপকাশ্চ যে, দোষং কুর্বন্তি তে মূঢ়াস্তস্মাদ্ বৃদ্ধং তু সেবয়েৎ।"

দেখা যায় যে শিক্ষাকার নারদ বৈদিক স্বরগুলিতে শ্রুতি নির্দেশ করেছেন এভাবে : মন্দ্র, দ্বিতীয় ও চতুর্থ এই স্বর তিনটির শ্রুতি দীপ্তা। অতিস্বার্য, তৃতীয় ও ক্রুষ্ট স্বর তিনটির শ্রুতি করুণা। এছাড়া দ্বিতীয় স্বরের অন্য শ্রুতি হিসাবে মৃদু, মধ্যা ও আয়তাও নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু এর মধ্যে আবার বিপর্যয় তথা স্বর-পরিবর্তনের প্রশ্নও আছে। তাই তিনি উল্লেখ করেছেন,

> আয়তাত্বং ভবেন্নীচে মৃদুত্বং তু বিপর্যতে।
> স্বে স্বরে মাধ্যমত্বং তু তৎ সমীক্ষ্য প্রযোজয়েৎ ॥

অর্থাৎ তৃতীয় স্বরের পূর্ববর্তী দ্বিতীয় স্বরের আয়তা-শ্রুতি হয়, আর চতুর্থ স্বরের পূর্ববর্তী তৃতীয় স্বরের মৃদু-শ্রুতি হয়। তাছাড়া অন্যান্য স্বরের পূর্ববর্তী স্বরগুলির মধ্যমা বা মধ্যা-শ্রুতি হয়। টীকাকার ভট্টশোভাকর এর বিবৃতি প্রসঙ্গে একথাই উল্লেখ করেছেন।[২৩] এর পর আবার উল্লেখ করা হয়েছে ক্রুষ্টের পরবর্তী দ্বিতীয় স্বরে অবস্থিত শ্রুতিকেই দীপ্তা বলে।[২৪] প্রথম স্বরে মৃদু-শ্রুতি যদি বিপরীতক্রমে

২২। সম্পূর্ণ সূত্রটি হ'ল :

> পদক্রমাবিভাগজ্ঞো বর্ণক্রমবিচক্ষণঃ।
> স্বরমাত্রাবিশেষজ্ঞো গচ্ছেদাচার্যসংপদম্ ॥

২৩। টীকাকার ভট্টশোভাকর এ'শ্লোকটির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন : "নীচে তৃতীয়ে স্বরে পরতঃ স্থিতে দ্বিতীয় স্বরস্যায়তা শ্রুতিঃ বিপর্যয়ে চতুর্থ স্বরে পরে ভূতে মৃদুভূতা স্বে স্বরে স্বরান্তরে অপরভূতে মধ্যমা শ্রুতিঃ এবমবধার্য সামস্বরপ্রয়োগঃ কর্তব্যঃ, স ন ইন্দ্রঃ শিবঃ সখা, উদ্বদেত্তি-শ্রুতামরং বর্তোহা ইত্যুদাহরণানি, দ্বিতীয়ে দীপ্তা পূর্বোক্তা কদা ভবতীত্যাহ।"

২৪।
> দ্বিতীয়ে বিরতা যা তু ক্রুষ্টস্য পরতো ভবেৎ।
> দীপ্তাং তাং তু বিজানীয়াৎ প্রথমে ন মৃদু স্মৃতাঃ ॥

থাকে অর্থাৎ সেটি চতুর্থ স্বরে অবস্থান করে ও সেটি যদি স্বরান্তরের তথা অন্য স্বরের অনুগত হয় তাহলে মৃদু-শ্রুতিই থাকে, অন্যথা দীপ্তা হয়। উদাহরণ যেমন উ আ ইত্যাদি। পুনরায় মন্দ্রস্বরের দীপ্তা-শ্রুতি হয়, আর যদি সেই মন্দ্র স্বরান্তর অর্থাৎ অন্য একটি স্বরের সঙ্গে যুক্ত হয় তবে সামগানের সমাপ্তির সময় সেই স্বরের অন্তর্গত শ্রুতিও দীপ্তা হয়।[২৫]

এছাড়া সন্ধি দু'রকম: প্রথম তালব্য ইকারের 'আ ই' ভাব অথবা 'আ উ' ভাব। এদের জন্য কোন শ্রুতির প্রয়োজন নাই। পদান্তের অন্তর্গত সন্ধিও তিন প্রকার। তারা শ ষ স এই তিনটি শকারের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে তিন রকম। এখানে দীপ্তা প্রভৃতি শ্রুতির প্রবর্তন হয় না। এদের নামই ঘুটসংজ্ঞা।[২৬] আবার স্বরান্তর বা অন্য স্বরের যেখানে বিরতি হয় না এরূপ হ্রস্ব, দীর্ঘ ও ঘুটসংজ্ঞিত যে স্বর তাদেরও শ্রুতির আবশ্যক হয় না, কিন্তু শ্রুতির মতো কোন স্বরের ব্যবহার হয়।[২৭] উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত স্থানস্বর তিনটির বেলায় দীপ্তা উদাত্তের ও স্বরিতের এবং মৃদু-শ্রুতি অনুদাত্তের নির্দিষ্ট। নারদ শিক্ষায় স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন গান্ধর্ব বা গানের সম্পদই শ্রুতি, শ্রুতি ছাড়া গানের কোন সার্থকতা থাকে না—"গান্ধর্বা শ্রুতিসম্পদঃ"। ভট্টশোভাকর শ্রুতি-সম্পদের অর্থ করেছেন 'স্বরসম্পদ': "গান্ধর্বে গানে শ্রুতেরভাবেঽপি তৎসদৃশঃ স্বরঃ কার্য ইত্যাহ স্বরসম্পদঃ"; অর্থাৎ গানে যদি নির্দিষ্ট দীপ্তা, আয়তা, করুণা, মৃদু ও মধ্যা এই পাঁচটি শ্রুতির অভাব ঘটে তবে শ্রুতির অনুরূপ স্বরের ব্যবহার করা উচিত। মিথিলারাজ নান্যদেব তাঁর 'ভরতভাষ্য' বা 'সরস্বতীহৃদয়ালঙ্কার' গ্রন্থে নারদীশিক্ষার 'বিবরণ' নামে একটি টীকার কথা উল্লেখ করেছেন। শ্রুতি সম্বন্ধে বিবরণ-টীকাকার নিশ্চয়ই অভিনবভাবে বিচার করেছেন। কিন্তু সে টীকা এখন ছাপার আকারে পাওয়া যায় না।

এখন বিচারের বিষয় বৈদিক সামগানে ও রামায়ণ-মহাভারতের যুগে সপ্তকের অন্তর্বর্তী সূক্ষ্মস্বর হিসাবে শ্রুতির ব্যবহার ছিল কিনা। আমাদের অনুমান

২৫। অত্রৈব বিরতা যা তু চতুর্থেন প্রবর্ততে।
তথা মন্দ্রে ভবেদ্দীপ্তা সাম্নশ্চৈব সমাপনে॥

২৬। দ্বিবিধা গতিঃ পদান্তঃ স্থিতসন্ধিঃ সহোষ্মভিঃ।
পঞ্চস্বেতেষু স্থানেষু বিজ্ঞেয়ং ঘুটসংজ্ঞিকম্॥

২৭। স্বরান্তরাবিরতানি হ্রস্বদীর্ঘঘুটানি চ।
শ্রুতিস্থানেষশেষাণি শ্রুতিবৎস্বরতো ভবেৎ॥

বৈদিক সামগানে শ্রুতির কোন ব্যবহার ছিল না, কিংবা নারদীশিক্ষাকার নারদ যে দীপ্তা, আয়তা প্রভৃতি পাঁচটি শ্রুতির কথা বলেছেন ('দীপ্তায়তাকরুণানাং মৃদুমধ্যময়োস্তথা, শ্রুতিনাং যো * *') সেগুলির কোন নামোল্লেখ আমরা বৈদিক সাহিত্যে পাই না। শ্রুতির সংখ্যা বিষয়ে প্রাচীন আচার্যদের মধ্যেই মতভেদ আছে, সুতরাং পাঁচটি শ্রুতি ছিল—কি তার বেশী বা কম ছিল তা সম্পূর্ণ অবান্তর কথাই। বরং আশ্চর্যের বিষয় নারদ যে দীপ্তা, আয়তা প্রভৃতি পাঁচটি মাত্র শ্রুতির কথা বলেছেন তা খৃষ্টীয় অব্দের বাইশ শ্রুতির 'জাতি' হিসাবে গণ্য হয়েছে। বাইশ শ্রুতি ও দীপ্তাদি পাঁচটি জাতি তখন জাতি-ব্যক্তি, সামান্য-বিশেষ বা জেনাস্-স্পেসিস্ (genus-species) তথা জন্য-জনক বা কার্য-কারণ রূপে দেখা দিয়েছে। এর কারণ কি সে সম্বন্ধে পরে আমরা আলোচনা করব। খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে আচার্য ভরতই প্রথমে (যতদুর ছাপা বই বা সংগৃহীত পুঁথি পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায়) বৈজ্ঞানিকভাবে বাইশটি শ্রুতি তথা সূক্ষ্মস্বরের আবিষ্কার করেছেন। একটি সপ্তকের মধ্যে সাত স্বর নিরীক্ষণ করার পর তিনি স্বরগুলির পারস্পরিক একটি সম্বন্ধের আবিষ্কার করেন—যার ফলে সপ্তকের মধ্যে অংশ বা বাদী, সংবাদী, অনুবাদী ও বিবাদী এই চারটি স্বর হ'ল নির্ণীত। আবার এদের একটির সঙ্গে অপরটির সম্বন্ধ ও পরিমাণ (দূরত্ব) নির্ধারণের জন্য সূক্ষ্মস্বর-সংখ্যার হ'ল আবিষ্কার। এই আবিষ্কৃত শ্রবণযোগ্য সূক্ষ্ম স্বরগুলির নামই দেওয়া হয় 'শ্রুতি'।

ভরতের পর মতঙ্গ (খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম শতাব্দী) শ্রুতির আলোচনা করেছেন বিশদভাবে। শ্রুতির প্রসঙ্গে শ্রুতি এক বা অনেক 'ইতি মামকীয়ং মতম্' বলে তিনি নিজের বা স্বসম্প্রদায়ের মত উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ মতঙ্গের মতে শ্রুতি একটি, তবে বাতাসের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হ'য়ে নাভি থেকে কণ্ঠে ব্যক্ত হ'তে গেলে সোপানবৎ ক্রমশঃ উর্ধে অভিব্যক্ত হওয়ার জন্য সূক্ষ্মস্বরের তথা শ্রুতির ভেদ হয়, এই ভিন্নতা প্রতিভাস বা আপাতভিন্নতার মতো প্রতীত বা মনে হয় মাত্র। স্বর ও অন্তরভেদে শ্রুতি কারু মতে দুটি, কারু মতে তিনটি, চারটি, ন'টি অথবা ছেষট্টিটি (৬৬টি)।[২৮] ভরত (?) শ্রুতির প্রসঙ্গে বলেছেন বংশে বা

২৮। শ্রূয়ন্ত ইতি শ্রুতয়ঃ। সা চৈকানেকা বা। তত্রৈকৈব শ্রুতিরিতি। * * শ্রুত্যাদি-ভেদভিন্নঃ প্রতিভাস ইতি মামকীয়ং মতম্। অন্যে পুনর্দ্বিপ্রকারাঃ শ্রুতীর্মন্যন্তে। কথম্। স্বরান্তরবি-ভাগাৎ। * * কেচিৎ স্থানত্রয়ং যোগাৎ ত্রিবিধাং শ্রুতিং প্রতিপদ্যন্তে। অপরে ত্রিগুণবৈগুণ্যাৎ ত্রিবিধাং শ্রুতিং মন্যন্তে। * * অপরে তু বাতপিত্তকফসন্নিপাতভেদভিন্নাং চতুর্বিধাং শ্রুতিং

বেণুতে ছিদ্র-সংখ্যা অনুসারে বিভিন্ন সংখ্যার শ্রুতি প্রতীত হওয়া সম্ভব।[২৯] আচার্য কোহলের অভিমতও তাই।[৩০] বিশ্বাবসু একটিমাত্র শ্রুতি স্বীকার করেছেন।[৩১] পরিশেষে মতঙ্গ উল্লেখ করেছেন; তবে ইদানীং বাইশ শ্রুতি স্বীকার করা হয় দুটি তুল্যপ্রমাণ বীণার মাধ্যমে শ্রুতিস্থান নির্ণয় ক'রে: "ইদানীং দ্বাবিংশতিপ্রকারতায়া নিদর্শনং যথা—দ্বে বীণে তুল্যপ্রমাণে * *"।

নারদীশিক্ষার সময়ে (খৃঃ ১ম শতাব্দী) শ্রুতির ব্যবহার ছিল, কিন্তু বাইশ শ্রুতির ত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। শিক্ষাকার উল্লেখ করেছেন,

তান-রাগ-স্বর-গ্রাম-মূর্ছনানাং তু লক্ষণম্।
পবিত্রং পাবনং পুণ্যং নারদেন প্রকীর্তিতম্॥

তান, রাগ, স্বর, গ্রাম, মূর্ছনা প্রভৃতির প্রচলন ছিল ও এগুলি পুণ্য ও পবিত্র তথা মাঙ্গলিক ও কল্যাণময় উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হ'ত। সাত স্বর, তিন গ্রাম, একুশ মূর্ছনা, একোনপঞ্চাশ তান এগুলি নিয়েই স্বরমণ্ডল রচিত হয়েছে।[৩২] মধ্যম-গ্রামের কুড়িটি, ষড়্‌জগ্রামে চৌদ্দ ও গান্ধারগ্রামে পনেরটি তানের সমাবেশ।[৩৩] একুশটি মূর্ছনা সাতটি সাতটি ভাগে পিতৃ, যক্ষ ও ঋষিদের উদ্দেশ্যে উৎসৃষ্ট হয়েছে। এই তিন ভাগ বৈদিক সমাজে অগ্নি, বরুণ, পৃথিবী—লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণ—

প্রতিপদিরে। * * অপরে তু……নবধা শ্রুতিং প্রতিপদ্যন্তে। তথাহি—'দ্বিশ্রুতিস্ত্রিশ্রুতিশ্চৈব চতুঃশ্রুতিক এব চ, স্বরপ্রয়োগঃ কর্তব্যো বংশেছিদ্রগতো বুধৈঃ'॥"

২৯। ভরতেনাপ্যুক্তং—

দ্বিকত্রিক চতুষ্কাস্ত জ্ঞেয়া বংশগতাঃ স্বরাঃ।
ইতি তবেন্ময়া প্রোক্তাঃ সবংশশ্রুতয়ো নব॥

এখানে উল্লেখযোগ্য যে বর্তমান সংস্করণের নাট্যশাস্ত্রে (কাশী ও কাব্যমালায়) এই শ্লোকটির এখানে উল্লেখ নাই। সুতরাং এটি আর কোন ভরত উপাধিনামা নাট্যশাস্ত্রীর হওয়া স্বাভাবিক।

৩০। তথাচাহ কোহলঃ—

দ্বাবিংশতিং কেচিদুদাহরন্তি শ্রুতিজ্ঞানবিচারদক্ষাঃ।
ষট্‌ষষ্টিভিন্নাঃ খলু কেচিদাসামানন্ত্যমেব প্রতিপাদয়ন্তি॥

৩১। শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বাদ্ ধ্বনিরেব শ্রুতির্ভবেৎ।
সা চৈকাপি দ্বিধা জ্ঞেয়া স্বরান্তরবিভাগতঃ॥

৩২। সপ্তস্বরাস্ত্রয়ো গ্রামামূর্ছনাস্ত্বেকবিংশতিঃ।
তানা-একোনপঞ্চাশদিত্যেতৎ স্বরমণ্ডলম্॥

৩৩। বিংশতি মধ্যমগ্রামে ষড়্‌জগ্রামে চতুর্দ্দশ।
তানান্ পঞ্চদশেচ্ছন্তি গান্ধারগ্রামমাশ্রিতান্॥

রাণায়িনীয়, কৌথুমী, জৈমিনীয়—ঋষি, পিতৃ, যক্ষ বা গন্ধর্ব এই ত্রিভাগের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় সমাজের সনাতনী ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যই শিক্ষাকার নারদ এ'ভাবে মূর্ছনাগুলিকে ভাগ করেছিলেন। তাছাড়া বৈদিক যুগে শাখাভেদে যেমন স্বর-সংখ্যা ও গায়কীভঙ্গির প্রার্থক্য ছিল, শিক্ষার যুগেও সমাজে তেমনি তিনটি প্রধান কুল বা বংশ-সম্প্রদায়ের মধ্যে গানে তান-প্রয়োগেরও ভিন্নতা ছিল। তখন জাতিরাগ ও গ্রামরাগের যুগ। কল্লিনাথ উল্লেখ করেছেন: "গ্রামরাগাদীনাং মূর্ছনাবিশেষপরিজ্ঞানে বিনিয়োগ * *"। রাগগুলিকে কিভাবে মূর্তিমান ক'রে রূপায়িত করা উচিত তা নির্দেশ ও নির্ধারণ করে মূর্ছনা। রাগের বিকাশে মূর্ছনার তাই এত সমাদর। পরবর্তীকালের ঠাট বা মেল তো প্রাচীন মূর্ছনারই ভিন্ন রূপায়ণ মাত্র। গানে শ্রুতির উপযোগিতাও কম নয়। সাতস্বরের পরিজ্ঞান থেকেই তাদের নির্দিষ্ট স্থানকে (অবস্থিতি-স্থান) জানার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। সুনির্দিষ্ট স্বরস্থান সম্বন্ধে জ্ঞান হ'তে গেলে একটি স্বর থেকে অপরটির দূরত্ব বা ব্যবধানকে অবশ্যই জান্‌তে হবে। তারপর স্বরসাম্য ও স্বরসম্বাদও দূরত্ব-জ্ঞানের পক্ষে অন্যতম সহায়ক ও উদ্বোধক। এই স্বরসম্বাদ ও স্বর-ব্যবধানের সুষ্ঠু পরিচয় লাভের জন্যই সঙ্গীত-বিজ্ঞানীদের মনে শ্রুতি-আবিষ্কারের ঔৎসুক্য জাগ্রত হয়েছিল বলে মনে হয়। শ্রুতিগুলি অবশ্য শ্রবণযোগ্য স্বরই। পূর্বেই উল্লেখ করেছি শিক্ষাকার নারদ বৈদিক সাতস্বরের বেলায় কেবল দীপ্তা, আয়তা, করুণা, মৃদু ও মধ্যমা বা মধ্যা এই পাঁচটি শ্রুতি স্বীকার করেছেন। প্রাচীন আচার্যেরা কিন্তু সাত স্বরে এক থেকে অসংখ্য শ্রুতি বা সূক্ষ্মস্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। পরেকার যুগে সাতটি স্বরের কম্পন-সংখ্যার অনুযায়ী বিচিত্র শ্রুতির কথা স্বীকার করলেও বাইশটি মাত্র শ্রুতির উপযোগিতাকে মেনে নেওয়া হয়েছে। বাইশটি-মাত্র কানে শোনা যায়—মন ও বুদ্ধি দিয়ে ধরা যায় বলে বাইশটি শ্রুতির প্রামাণ্য স্বীকৃত। দীপ্তা, আয়তা, করুণা প্রভৃতি শ্রুতি-নামগুলির ব্যাকরণ বা অভিধানগত কোন অর্থের সার্থকতা আছে কিনা জানি না, তবে জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুসারে পরবর্তীকালে অনেকে তাদের অর্থগত নামের সার্থকতা দেখাবার চেষ্টা করেছেন। সে যাই হোক, দার্শনিকী বা গাণিতিক চিন্তার কথা ছেড়ে দিলেও নারদীশিক্ষার সময়ে দীপ্তা, আয়তাদি পাঁচ শ্রুতি কিভাবে পরবর্তী কালের বাইশ শ্রুতির জাতিশ্রেণীভুক্ত হয়েছিল তা নির্ণয় করা দুরূহ। দেখা যায় তীব্রাদি বাইশটি শ্রুতির কারণ হিসাবে দীপ্তাদি পাঁচ আদিশ্রুতিই জাতির স্থান অধিকার করেছে। নিদর্শন যেমন,

সংখ্যা	পরবর্তী বাইশ শ্রুতি	শিক্ষার সময়ে শ্রুতি পাঁচ জাতিতে রূপান্তরিত	স্বরস্থান	শ্রুতি-সংখ্যা	ষড়্জগ্রাম অনুযায়ী
১	তীব্রা	(১) দীপ্তা			
২	কুমুদ্বতী	(২) আয়তা			
৩	মন্দা	(৩) মৃদু			
৪	ছন্দোবতী	(৪) মধ্যা	ষড়্জ	৪	স
৫	দয়াবতী	(৫) করুণা			
৬	রঞ্জনী	(৪) মধ্যা			
৭	রতিকা	(৩) মৃদু	ঋষভ	৩	রি
৮	রৌদ্রী	(১) দীপ্তা			
৯	ক্রোধা	(২) আয়তা	গান্ধার	২	গ
১০	বজ্রিকা	(১) দীপ্তা			
১১	প্রসারিণী	(২) আয়তা			
১২	প্রীতি	(৩) মৃদু			
১৩	মার্জনী	(৪) মধ্যা	মধ্যম	৪	ম
১৪	ক্ষিতি	(৩) মৃদু			
১৫	রক্তা	(৪) মধ্যা			
১৬	সন্দিপনী	(২) আয়তা			
১৭	আলাপিনী	(৫) করুণা			
১৮	মদন্তী	(৫) করুণা	পঞ্চম	৪	প
১৯	রোহিনী	(২) আয়তা			
২০	রম্যা	(৪) মধ্যা	ধৈবত	৩	ধ
২১	উগ্রা	(১) দীপ্তা			
২২	ক্ষোভিণী	(৪) মধ্যা	নিষাদ	২	নি

এখানে দেখা যায়, জাতি (জেনাস্) ও ব্যক্তি (স্পিসিস্), কার্য ও কারণ বা জন্য ও জনক ধারার অনুসরণ করা হয়েছে ও লক্ষ্য করার বিষয় যে, শিক্ষার যুগে (অবশ্য নারদীশিক্ষায়ই মাত্র শ্রুতির পরিচয় দেওয়া হয়েছে) দীপ্তাদি পাঁচটি শ্রুতি জাতি শ্রেণীভুক্ত হ'য়ে পর পর তীব্রা, কুমুদ্বতী, মন্দা, ছন্দোবতী ও দয়াবতী এই পাঁচটি পরবর্তীকালের (খৃষ্টীয় অব্দের) শ্রুতির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েছে এবং এই জাতি ও ব্যক্তির (কারণ ও কার্য) মধ্যে একটি আভিধানিক অর্থেরও সাদৃশ্য পাওয়া যায়। যেমন,

দীপ্তা............তীব্রা

আয়তা .... কুমুদ্বতী

মৃদু... .... মন্দা

মধ্যা ···· ······ ছন্দোবতী

করুণা·· ·········দয়াবতী

বাইশটি শ্রুতির মধ্যে দীপ্তা তিনবার, আয়তা পাঁচবার, মৃদু চারবার, মধ্যা ছ'বার ও করুণা তিনবার সম্পর্কিত হয়েছে। অর্থগত সাম্যের আলোচনা করলে দেখা যায়, দীপ্তাজাতি ও তীব্রাশ্রুতি সমান অর্থের দ্যোতক। আয়তা তথা বিস্তৃতিমাত্রেই অনন্তের প্রকাশক ও অনন্ত প্রশান্তির নামান্তর। কুমুদ্বতী—কুমুদ বা শ্বেতোৎপল শুভ্রতা ও শুচিতা তথা শান্তির প্রকাশক। মৃদু ও মন্দা মন্থরতার প্রকাশক হলেও স্থিতিশীলতার সূচক। মধ্যা তথা মধ্যস্থা সমতা ও সংগতির প্রকাশক। ছন্দোবতীও শৃঙ্খলা ও সাম্যের দ্যোতক। করুণা ও দয়াবতী সমানার্থক। মনে হয় প্রাচীন দীপ্তাদি পাঁচটি শ্রুতিই পরবর্তী বাইশ শ্রুতির জনক বা কারণ এবং জনক হিসাবেই তারা জাতির স্থান অধিকার করেছে।

এখন রামায়ণে উল্লিখিত "গায়কাঃ শ্রুতিশীলাশ্চ"—শ্রুতিশীল শব্দটি প্রকৃতপক্ষে সূক্ষ্মস্বরকে বোঝাচ্ছে কিনা বিচারের বিষয়। কারণ খৃষ্টীয় শতাব্দীর সূচনায় যখন সাতটি স্বরের মধ্যে মাত্র পাঁচটি শ্রুতির অন্তর্বিকাশ দেখা যায়, তখন রামায়ণের যুগে বাইশ শ্রুতির কল্পনা সৃষ্টি হয়নি বলেই আমাদের ধারণা। অনেকে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের প্রমাণ-বাক্যের নজিরে খৃষ্টপূর্বাব্দে শ্রুতির প্রচলন ভারতীয় সমাজে ছিল একথা বলতে চান। প্রমাণ-বাক্যটি হ'ল :

বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞঃ শ্রুতি-জাতিবিশারদঃ।
তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিযচ্ছতি ॥
গীতজ্ঞো যদি গীতেন নাপ্নোতি পরমং পদম্।
রুদ্রস্যানুচরো ভূত্বা তেনৈব সহ মোদতে ॥

শ্লোকদুটি যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার ৩য় অধ্যায়ের ১১৫-১১৬ শ্লোক। বীণার প্রচলন বৈদিকযুগেও ছিল। যাজ্ঞবল্ক্যের টীকাকার শ্রুতি অর্থে বাইশ শ্রুতি ও জাতি অর্থে শুদ্ধ ও বিকৃতভেদে আঠার জাতির উল্লেখ করেছেন। কথাও স্বাভাবিক। কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতের যুগে শুদ্ধ-সপ্তজাতির মাত্র প্রচলন ছিল, বিকৃত বা সংকীর্ণ এগারটি জাতির উদ্ভব তখনো সমাজে হয়নি বলেই মনে হয়। তবে যাজ্ঞবল্ক্যের সময় বাইশ শ্রুতি ও আঠার জাতির প্রচলন অবশ্যই হয়েছিল। কেননা সংহিতা তথা সমাজ-শাসনশাস্ত্র স্মৃতিগুলির রচনাকাল শ্রদ্ধেয় জলি (Jolly), ডাঃ কানে (Dr. Kane) ও অন্যান্য মনীষী ও ঐতিহাসিকগণ খৃষ্টীয় অব্দের ১ম থেকে ৪র্থ-৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে বলেছেন। যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ,

বৃহস্পতি ও কাত্যায়ন এ' চারজন সংহিতাকারদের অভ্যুদয়-কাল নির্ণয় প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় জলি ও ডাঃ কানে উল্লেখ করেছেন,

সংহিতাকার	জলির মতে	ডাঃ কানের মতে
যাজ্ঞবল্ক্য	খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী	১০০—৩০০ খৃষ্টাব্দ
নারদ	" ৫ম "	১০০—৪০০ "
বৃহস্পতি	" ৬ষ্ঠ বা ৭ম "	৩০০—৫০০ "
কাত্যায়ন	বৃহস্পতির পরে	৪০০—৬০০ "

ডাঃ কানের অভিমত গ্রহণ করলেও যাজ্ঞবল্ক্যকে আমরা খৃষ্টীয় অব্দের একেবারে গোড়ার দিকের সংহিতাকার বলতে পারি। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে নারদীশিক্ষায় শ্রুতির উন্মেষ ও খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে ভারতের নাট্যশাস্ত্রে পরিপূর্ণ বিকাশ ও অনুশীলন দেখতে পাই। তাই নানান্ দিক দিয়ে অনুধাবন ক'রে মনে হয় শ্রুতির ধারণা বা তার উপযোগিতার অনুভব বরং খৃষ্টপূর্ব অব্দের একেবারে শেষভাগেই শিল্পী ও শাস্ত্রী সমাজে দেখা দিয়েছিল। যদি তা না হ'ত তবে নারদ কখনই তার শিক্ষাগ্রন্থে শ্রুতি ও তার প্রয়োগের অন্তর্নিবেশ করতে পারতেন না। তারপর নারদীশিক্ষাকার শ্রুতি-নির্দেশ করেছেন লৌকিক ষড়্জাদির নয়, বৈদিক প্রথমাদি সাম-স্বরের। অবশ্য নারদের "যঃ সামগানাং প্রথমঃ স বেণোর্মধ্যমঃ স্বরঃ" এই বীজমন্ত্র বা নির্দেশক-মন্ত্রের মাধ্যমে সামশ্রুতিগুলিকে অনায়াসেই লৌকিক ষড়্জাদি স্বরেও আমরা সন্নিবেশ করতে পারি। তবে কথা হ'ল খৃষ্টপূর্বাব্দে সপ্তকের মধ্যে স্বরসম্বাদ তথা বাদী, সংবাদী স্বরগুলির প্রচলন ছিল কিনা তা ভেবে দেখার বিষয়।

সুতরাং "গায়কাঃ শ্রুতিশীলাশ্চ নিগদন্তঃ পৃথক্ পৃথক্" শ্লোকাংশে 'শ্রুতিশীলা' শব্দটি যে সাঙ্গীতিক শ্রবণযোগ্য সূক্ষ্মস্বরের দ্যোতক নয় একথা ঠিক। শ্রুতি অর্থে এখানে বেদ ও এর আভিধানিক অর্থ বাচস্পত্য-অভিধানকার দিয়েছেন: 'শ্রু-কর্মাদৌ-ক্তিন্। বেদস্য সর্বৈঃ শ্রূয়মাণত্বাৎ শ্রুতিত্বম্।' সুতরাং শ্রুতিশীল অর্থে বেদজ্ঞ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ এ' অর্থ করলে শ্লোকাংশের সংগতিও থাকে যে গায়কগণ ও বেদজ্ঞ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণেরা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে রাজার স্তুতিগান করেছিলেন: "রাজানাং স্তবতাং তেষাম্"। এই স্তুতিগানের আবার রূপভেদ ছিল। সূত ও ভাট-জাতীয় ব্রাহ্মণেরা রাজাদের পূর্ব-কীর্তিকলাপের কথা অবলম্বন ক'রে মুখে মুখে গান রচনা ক'রে গাইত: "অপদানান্যুদাহৃত্য পানিবাদান্যবাদয়ন্"। টীকাকার উল্লেখ

করেছেন : "রাজ্ঞা বৃত্তাদ্ভুতকর্মাণ্যুদাহৃত্য তদনুগতং পানিবাদাস্তবাদয়ন্"। সূত ও ভাটজাতীয় পানিবাদকেরা (হাততালি দিয়ে যারা গান করত) সমাজে একরকম পতিত ব্রাহ্মণ হিসাবে গণ্য ছিল। অবশ্য তারা রাজাদের কাছ থেকে বৃত্তি পেত ও তাদের কাজই ছিল স্তুতিগান করা। তাদের গানে সুর ও তাল অটুট থাকত। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা বীণাদি বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে আশীর্গান ও গাথা গান করতেন। রাজাদের গৌরবময় ও পুণ্য চরিত্র-বর্ণনাসূচক গানও গাথা ও আশীর্গান শ্রেণীভুক্ত ছিল : "গাথানাং কেবলগায়কানামাশীর্গেয়মাশীর্বাদপ্রধানং গানম্। যদ্বা গাথা রাজ্ঞাং চরিত্রাদিপ্রতিপাদিকাস্তাসামাশীর্বাদঘটিতং গানমিত্যর্থঃ"। এই আশীর্বাদসূচক মাঙ্গলিক তথা আভ্যুদয়িক গানই গান্ধর্ব। ভরত নাট্যশাস্ত্রে ধ্রুবাগানের প্রসঙ্গে ঋক্, পাণিকা, গাথা প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন : "যা ঋচঃ পাণিকা গাথা" (৩২।২)। এ'গুলি ছন্দযুক্ত হ'য়ে জয়, স্তুতি, আশীর্বাদ অর্থে গীত হয়। যেমন,

বিধানং ছন্দসামেষাং ময়া পূর্বমুদাহৃতম্।
জয়াশীর্বাদযুক্তানি কার্যাণ্যেতানি দৈবতে ॥
ঋগ্গাথাপাণিকা হ্যেষাং বোদ্ধব্যাস্তু প্রমাণতঃ।[৩৪]

এই ঋক্, গাথা, পাণিকা প্রভৃতি আভ্যুদয়িক গান অঙ্গযুক্ত তথা সপ্তাঙ্গযুক্ত হলেই 'ধ্রুবা' নামে অভিহিত হয় ও ধ্রুবাগান গান্ধর্বেরই অন্তর্ভুক্ত : "গান্ধর্বমেতৎ" (৩২।৪৮৪)।[৩৫] এই গান্ধর্বই গেয় বা গান। এর সঙ্গে বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গাদির সমাবেশ থাকত। শিক্ষাকার নারদ গান্ধর্বের আভিধানিক অর্থের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন,

গেতি গেয়ং বিদুঃ প্রাজ্ঞা ধেতি কারুপ্রবাদনম্।
বেতি বাদ্যস্য সংজ্ঞেয়ং গান্ধর্বস্য বিরোচনম্ ॥

গানের সঙ্গে বেণু বা বাঁশীর সহযোগ অপরিহার্য ছিল। আর বাদ্য অর্থে বেণু বা মৃদঙ্গাদিকেও ধরা যায়। রামায়ণে আশীর্গানের বা গাথার সঙ্গে বেণুর পরিবর্তে বীণার উল্লেখ দেখা যায় : "বীণানাং চাপি নিঃস্বনাঃ"। সুতরাং গাথা ও আশীর্বাদ-সূচক গানও তখনকার (রামায়ণের) সমাজে গান্ধর্ব-শ্রেণীভুক্ত ছিল।

৩৪। নাট্যশাস্ত্র ৩২।৪১৫-১৬

৩৫। ধ্রুবাবিধানঞ্চ ময়া স্বরতালপদাত্মকম্।
গান্ধর্বমেতৎ কথিতং ময়া হি
পূর্বং যদুক্তং ত্বিহ নারদেন।

রামায়ণের যুগে বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান হ'ত তা আগেই উল্লেখ করেছি। ক্রিয়ানুষ্ঠানের সঙ্গে সামগানের বিধি ছিল। সামগানের পাশাপাশি স্নিগ্ধ ও মধুর গান্ধর্বগানেরও প্রচলন ছিল। তাছাড়া খৃষ্টপূর্বাব্দ তো গান্ধর্ব বা মার্গ-সঙ্গীতেরই যুগ। বালকাণ্ডের ১৪শ সর্গে দেখা যায় বেদজ্ঞ যাজক বা ঋত্বিকেরা ঋষ্যশৃঙ্গকে পুরোভাগে রেখে শাস্ত্রসঙ্গত প্রাতঃসবন, ঐন্দ্র, মাধ্যন্দিন, তৃতীয়সবন প্রভৃতি যজ্ঞে ব্যাপৃত; দেবতাদের উদ্দেশ্যে তাঁরা অগ্নিতে হবির্ভাগ দান করছেন ও সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাশাস্ত্রনির্দিষ্ট উচ্চারণযুক্ত স্নিগ্ধতা ও লাবণ্যপূর্ণ গানে দেবতাদের সন্তুষ্ট করছেন। রামায়ণকার উল্লেখ করেছেন,

ঋষ্যশৃঙ্গং পুরস্কৃত্য কর্ম চক্রুর্দ্বিজর্ষভাঃ।
অশ্বমেধে মহাযজ্ঞে রাজ্ঞোঽয়ং সুমহাত্মনঃ॥

* * * *

প্রাতঃসবনপূর্বাণি কর্মাণি মুনিপুঙ্গবাঃ॥
ঐন্দ্রশ্চ বিধিবদ্দত্তো রাজা চাভিষুতোঽনঘঃ।
মাধ্যন্দিনং চ সবনং প্রবর্তত যথাক্রমম্॥
তৃতীয়সবনং চৈব রাজ্ঞোঽস্য সুমহাত্মনঃ।

* * * *

ঋষ্যশৃঙ্গাদয়ো মন্ত্রৈঃ শিক্ষাক্ষরসমন্বিতৈঃ॥
গীতিভির্মধুরৈঃ স্নিগ্ধৈর্মন্ত্রাহ্বানৈর্যথার্হতঃ।

টীকাকার 'গীতিভিঃ' বলতে 'সামভিঃ' অর্থ করেছেন। অবশ্য সামগানের মতো গান্ধর্বগানেও স্নিগ্ধ ও মধুরাদি গুণ, শিক্ষাশাস্ত্রবিহিত অক্ষরের যে বিধান ছিল তা নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত: "বৃত্তাক্ষরপ্রমাণং হি জাতিরিত্যভিসংজ্ঞিতাঃ" (৩২।৩৩১) শ্লোকাংশ থেকেই প্রমাণ হয়। নারদীশিক্ষায় গানের এই গুণগুলির কথা উল্লিখিত হয়েছে। সাম, গান্ধর্ব ও অভিজাত দেশী এই তিন রকম গানেই গুণ হিসাবে স্নিগ্ধতা ও মাধুর্য তথা লাবণ্যের সমাবেশ ছিল।

রামায়ণের যুগে গানে মাধুর্যের বা মধুর স্বরের দিকে যে বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া হ'ত তা বেশ বোঝা যায়। ঋষ্যশৃঙ্গকে অভিনন্দন দেওয়ার সময় বরাঙ্গনারা যখন গান করছে তখন তাদের দৃষ্টি সর্বদা সুমধুরভাবে গানকে প্রকাশ করার দিকে নিবদ্ধ দেখা যায়: "তাশ্চাপশ্যদ্বরাঙ্গনাঃ, তাশ্চিত্রবেষাঃ প্রমদা গায়ন্তো মধুরস্বরম্" (বালকাণ্ড ১০।১০-১১)। তাছাড়া গানের কথার প্রকাশভঙ্গির দিকেও বেশ মনোযোগ দেওয়া হ'ত: "মধুরস্বরভাষিণৌ" (বালকাণ্ড ৪।১১)। শিল্পী অর্থাৎ

গায়ক ও বাদকরাও যাতে শ্রীসম্পন্ন ও সুবেশিত হ'ত তার দিকে লক্ষ্য রাখা হ'ত —"রূপলক্ষণসংপন্নৌ" (৩।৪।১১)। গানের সুর যাতে বাদ্যযন্ত্রকে অনুসরণ ক'রে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে রামায়ণে তারও উপদেশ দেওয়া হয়েছে: "তন্ত্রীগীতসমাকীর্ণং সমতালপদাক্ষরম্" (কিষ্কিন্ধাকাণ্ড ৩৩।২১)। শিল্পীকে বলা হ'ত 'গায়ক'— "কদাচিত্তত্র গায়কৌ" (১।৪।২৭) ও গানকে বলা হ'ত 'গেয়': "পাঠ্যে গেয়ে" (১।৪।৮) অথবা "গায়ন্তাং মধুরং গেয়ম্" (উত্তরাকাণ্ড, ৯৩।১৫)। রামায়ণে বাদ্যযন্ত্রকে বলা হয়েছে 'আতোদ্য': "আতোদ্যানি বিচিত্রানি" (সুন্দরকাণ্ড, ১০।৪৯)। বীণাকে বলা হয়েছে 'তন্ত্রী: "তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্" (বালকাণ্ড, ৪।৮)। বাদ্যযন্ত্রকে বাদিত্রও বলা হয়েছে: "বাদিত্রাণি চ সর্বাণি" (অযোধ্যাকাণ্ড, ১৫।১২)।

রামায়ণে বিপঞ্চীবীণার উল্লেখ আছে: "বিপঞ্চীং পরিগৃহ্যান্যা নিয়তা নৃত্যশালিনী" (সুন্দরকাণ্ড, ১০।৪০-৪১)। নাট্যশাস্ত্রে বিপঞ্চীবীণার বর্ণনা আছে। বিপঞ্চী ন'টি তারযুক্ত বীণা-বিশেষ: "বিপঞ্চী নবতন্ত্রিকা" (২৯।১১৪)। বীণা কি দিয়ে বাজানো হ'ত তারও উল্লেখ আছে: "মম চাপময়ী বীণাং শরকোণৈঃ প্রবাদিতা" (যুদ্ধকাণ্ড, ২৪।৪২)। শর দিয়ে তৈরী কোণ দিয়ে বীণা বাজানো হ'ত। তিলক-টীকাকার উল্লেখ করেছেন: "শরকোণৈঃ শররূপবাদনদণ্ডৈঃ প্রবাদিতাম্"। কোণ (plectrum) ও অঙ্গুলি এই দু'এর সাহায্যে বীণা বাজাবার রীতি ছিল। ভরত নাট্যশাস্ত্রে চিত্রা ও বিপঞ্চীর বাদনপ্রণালীর পরিচয় দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন: "বিপঞ্চী কোণবাদ্যা স্যাৎ চিত্রা চাঙ্গুলিবাদনা" (২৯।১১৪)। চিত্রা তথা সাতটি তারযুক্ত বীণার উল্লেখ না থাকলেও রামায়ণের যুগে বিপঞ্চী ছাড়া যে অন্যান্য বীণার প্রচলন ছিল একথা বোঝা যায়। তাছাড়া রামায়ণে যেখানে 'বীণা' শব্দের উল্লেখ আছে সেখানে চিত্রাবীণা হওয়াই স্বাভাবিক।

এখন প্রশ্ন হ'তে পারে বৈদিক যুগে বিভিন্ন রকমের বীণার প্রচলন ছিল, কিন্তু রামায়ণে তাদের উল্লেখ না থাকার কারণ কি? রামায়ণের কথা ছেড়ে দিলে খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে নারদীশিক্ষায়ও আমরা বিচিত্র রকমের বীণাদি ততযন্ত্রের উল্লেখ পাই না। নারদীশিক্ষাকার মোটে দারবী ও গাত্রবীণা এই দুটি বীণারই বাদন ও গঠনপ্রণালীর পরিচয় দিয়েছেন: "দারবী গাত্রবীণা চ দ্বে বীণে গানজাতিষু"। এদের মধ্যে গাত্রবীণা সামিক বা সামগানে বাজানো হ'ত: "সামিকী গাত্রবীণা তু * *; গাত্রবীণা তু সা প্রোক্তা যস্যাং গায়ন্তি সামগাঃ"। নাট্যশাস্ত্রে (২য় শতাব্দী) ভরত চলবীণা ও অচলবীণার সাহায্যে

শ্রুতি বিভাগ করেছেন (২৮।২৩), চিত্রা ও বিপঞ্চীর পরিচয় দিয়েছেন (২৯।১১৪) এবং দারবী, কচ্ছপী ও ঘোষকার নামোল্লেখ মাত্র করেছেন (৩৩।১৫) ততযন্ত্রের প্রসঙ্গে। সুতরাং এ'কথা সুস্পষ্ট যে মানুষের রুচি ও উদ্ভাবনীশক্তির ক্রমবিকাশ অনুসারে পুরাতনের স্থানে নতুনের সৃষ্টি হওয়া বা পুরাতনের কঙ্কালে নতুনের আত্মপ্রকাশ করা অসম্ভব নয়, বরং স্বাভাবিকই। তাছাড়া প্রাচীন অনেক বাদ্যযন্ত্রই কিছুটা বা বেশীর ভাগ বেশ ও নাম পরিবর্তন ক'রে পরবর্তীকালে সমাজে প্রচলিত ছিল ও আজও আছে। বৈদিক যুগে অনেকগুলি বীণার পরিচয় পাওয়া যায়, ক্ল্যাসিক্যাল যুগে তাদের অনেক পরিবর্তন ও বিলোপও ঘটেছে, খৃষ্টীয় ৭ম—১১শ শতাব্দীতে সঙ্গীত-মকরন্দকার নারদের সময়ে বিভিন্ন রকমের বীণা আবার বিচিত্র রূপ ও নাম নিয়ে সমাজে দেখা দিয়েছে। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর সমাজে তাদের প্রয়োগ ও বর্ণনা আবার আরও সুস্পষ্ট এবং শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীত-রত্নাকরই তার প্রমাণ।

বাদিত্র বা আতোদ্যকে সঙ্গীতশাস্ত্রে চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে : তত, আনদ্ধ, সুষির ও ঘন। এই চাররকম বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখই মোটামুটিভাবে রামায়ণে পাওয়া যায়। যেমন তন্ত্রী বা বীণার নিদর্শন তো দেওয়াই হয়েছে। সুষির হিসাবে বেণু বা বংশ (৪।৩০।৫১, ৫।১০।৪০), শঙ্খ (৬।৫০।৬), তূর্য (৪।১৩।২২, ৪।৩০।৫১)। আনদ্ধ হিসাবে ভেরী (৬।৫০।৬০), মৃদঙ্গ (৬।৫০।১৬), মড্ডুক (৫।১০।৪৪), ডিণ্ডিম (৫।১০।৪৪), দুন্দুভি (৬।৫৭।২৮), মুরজ (২।৩৯।৪১), পণব (৬।৫৯।৮), পটাহ (৬।২৬।৩৫)। ঘনযন্ত্র হিসাবে স্বস্তিক (৬।১৩১।৩৯), ঘণ্টা (৬ ১২৪।১২৫) তাল (করতাল ? ৬।৫২।২৪)।

অযোধ্যা, কিষ্কিন্ধা[৩৬] ও লঙ্কায় [৩৭] রামায়ণের যুগে সকল ক্ষেত্রেই সঙ্গীতের অনুশীলন ছিল অপ্রতিহত। সে যুগে সমাজের সকল অনুষ্ঠানেই সঙ্গীতের অনুশীলন ছিল অব্যাহত। নিদ্রা থেকে জাগ্রত করায়, আরাধনায়, যুদ্ধাভিযানে, অভিসারে, উৎসবে, শবানুগমনে, শিকারকার্যে, যুদ্ধযাত্রায়—সকল আয়োজনেই নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সমাবেশ দেখা যায়। স্ত্রী, পুরুষ, ব্রাহ্মণ, স্তাবক, বন্দী, যোদ্ধা সকলেই ছিল সঙ্গীতের অনুরাগী। তার কারণ মনে হয় তখনকার দেশনায়ক ও নৃপতিরা ছিলেন সঙ্গীতের একান্ত পৃষ্ঠপোষক। নর্তক, গায়ক, নট, শৈলূষ, দেবদাসী

৩৬। রামায়ণ, কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ২৭।২৬

৩৭। ঐ, সুন্দরাকাণ্ড, ৬।১২, ১০।৩৭

সকলেরই রাজ-দরবারে ও সমাজে ছিল সমাদর। অযোধ্যাকাণ্ডে দেখা যায় পরিশ্রান্ত ভরত নৃত্য, গীত, বাদ্য ও নাটকে আনন্দ লাভ করছেন,

আয়াসং বিনয়িষ্যন্তঃ সভায়াং চক্রিরে কথাঃ ॥
বাদয়ন্তি তদা শান্তিং লাসয়ন্ত্যপি চাপরে।
নাটকান্যপরে স্মাহুর্হাস্যানি বিবিধানি চ ॥
স তৈর্মহাত্মা ভরতঃ সখিভিঃ প্রিয়বাদিভিঃ।

রাজা যে রাজ্যের নট, গায়ক, নর্তক ও উৎসবকারীদের রক্ষক ও উৎসাহদাতা, তাঁর অভাবে রাজ্য শ্রীহীন হয় একথা রামায়ণকার অযোধ্যাকাণ্ডের ৬৭ অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। রাজা দশরথের মৃত্যুর পর একজন ন্যায়বান ও সর্বপ্রতিপালক নৃপতিকে নির্বাচন করার জন্য অমাত্যেরা সমবেতভাবে ঋষি বশিষ্ঠকে অনুরোধ জানালেন। একজন গুণবান ও গুণগ্রাহী নৃপতি নির্বাচনের পক্ষে তাঁরা যতগুলি কারণ দেখিয়েছিলেন তাদের মধ্যে একটি হ'ল রাজাবিহীন রাজ্যে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে নৃত্য, নাটক, উৎসব ও সমাজ কোনটাই পরিপুষ্টি লাভ করতে পারে না :

নারাজকে জনপদে প্রহৃষ্টনটনর্তকাঃ।
উৎসবাশ্চ সমাজাশ্চ বর্ধন্তে রাষ্ট্রবর্ধনাঃ ॥

মোটকথা তখনকার সময়ে নৃত্য, গীত ও বাদ্য-বিরহিত কোন রাজ্যের কল্পনাই করা যেত না। তাই দশরথের মৃত্যু-সংবাদের কথা না জেনে ভরত অযোধ্যা-নগরীতে প্রবেশ ক'রে যখন দেখলেন মৃদঙ্গ, বীণা ভেরী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ঝঙ্কার ও শব্দ স্তব্ধ, কোন স্থানেই সঙ্গীতের লেশমাত্র নাই তখন বুঝলেন নিশ্চয়ই কোন অমঙ্গল ঘটেছে :

ভেরীমৃদঙ্গবীণানাং কোণসংঘট্টিতঃ পুনঃ।
কিমদ্য শব্দো বিরতঃ সদাদীনগতিঃ পুরা ॥

এ' থেকে বোঝা যায় প্রাচীন ভারতীয় সমাজ সঙ্গীতকে কি শ্রদ্ধার আসনই না দিয়েছিল। তখন শুদ্ধ-জাতিরাগের ব্যবহার ছিল ও তাদের স্বর-রূপ আমরা নাট্যশাস্ত্র থেকে জানতে পারি। বীণায় ও মনুষ্য-কণ্ঠে রাগ মূর্ছনা, তান, লয়, রস প্রভৃতির সমাবেশ নিয়ে প্রকাশিত হ'ত ও সেই গায়কীভঙ্গি ও বাদনপ্রণালীর যে একটি পরিস্ফুট রূপ ও ধারা ছিল, মানুষের মনে যে গান সুরের নক্সা সৃষ্টি ক'রে রস ও আনন্দানুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত ধারাকে অব্যাহত রেখেছিল, নাটকে, নৃত্যে ও বিভিন্ন রকম বিদ্যার অনুশীলনে জাতি ও শ্রেণী-নির্বিশেষে সকল

মানুষ যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করত একথা স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়।

॥ মহাভারতের যুগ ॥

রামায়ণের পর সঙ্গীতের রূপ ও বিকাশভঙ্গি মহাভারতের যুগে (খৃষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দ) কি ধরণের ছিল তাই এখন আলোচনার বিষয়। মহাভারত প্রধানত ভরত-রাজাদের বা ভরতরাজবংশের উত্তরাধিকারীদের ঐতিহাসিক কাহিনী। সেই কাহিনীর মধ্যে ভরতরাজবংশের সামাজিক রীতিনীতি, রাজনীতি, যুদ্ধকাহিনী, ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। রাজা ভরত মহারাজ দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পুত্র। ভরতরাজার নামানুসারে এই পূর্বখণ্ডের নামকরণ হয়েছে ভারতবর্ষ। কৌরব ও পাণ্ডবেরা ভরতরাজারই বংশধর। ভরতের বংশধরদের তাই 'ভারত' নামেও অভিহিত করা হয়েছে। তাদের বাসভূমি ছিল বেশীর ভাগ গঙ্গা ও যমুনানদীর ধারে।

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের অভিমত মহাভারত সংকলিত হয়েছিল খৃষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দে। অনেকে বলেন বিভিন্ন শীলা ও তাম্রলিপির প্রমাণপঞ্জী নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় খৃষ্টীয় ৫০০ শতকের আগে মহাভারত ঠিক বর্তমান আকার নিয়ে ছিল না, ছিল ক্ষুদ্র আকারে ধর্ম ও দার্শনিকী আলোচনার গ্রন্থ হিসাবে। আবার দেখা যায় প্রায় খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে কুমারিল ও খৃষ্টীয় ৬০০—৬৫০ শতাব্দীর মধ্যে কবি সুবন্ধু ও বাণভট্ট মহাভারতের অনেক অংশ তাঁদের রচনায় উদ্ধৃত করেছেন। সুতরাং এখন যে আকারে ও যে বিষয়বস্তু নিয়ে মহাভারত আমরা পাই তা সংকলিত হয়েছিল বিভিন্ন সময়ে খৃষ্টপূর্ব ৪ শতক থেকে খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যে। ঐতিহাসিক হপ্‌কিন্সের অভিমতও তাই।[১]

১। Vide *Epic Mythology* (Strassburg, 1915), pp. 1-2.

মহাভারতের রচনা বা সংকলন-কাল সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিও দ্রষ্টব্য:

(ক) ডাঃ রাধাকৃষ্ণ: *Indian Philosophy*, Vol. I (1940), pp. 479-81; (খ) *The History and Culture of the Indian People* (Vedic Age), Vol. I, p. 304; (গ) হপ্‌কিন্স: *The Great Epic of India*, pp. 397-98, 402; (ঘ) *The Calcutta Review*, Feb. 1946, p. 88 (ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়ার প্রবন্ধ—*Trends in Ancient Indian History*); (ঙ) 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'-য় (৪র্থ বর্ষ, সন ১৩৩২, পৃঃ ১৯৮-৯৯) প্রকাশিত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রবন্ধ।

মহাভারত মহাগ্রন্থটি রচনা করেন বেদবিভাগকর্তা ব্যাসদেব। কিন্তু এই ব্যাসদেব নির্দিষ্ট কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা তা নির্ণয় করা দুরূহ। আমাদের মনে হয় 'ব্যাস' একটি উপাধি-বিশেষ, তিনি বেদবিভাগকর্তা বেদব্যাস নামে পরিচিত ছিলেন। মহাভারত, হরিবংশ, আঠার পুরাণ, অসংখ্য উপপুরাণ, এমন কি শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভাগবত গ্রন্থগুলির রচয়িতা নাকি ব্যাসদেব। বিভিন্ন যুগে একই প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের নাম দিয়ে বিভিন্ন রচয়িতা মহাকাব্য ও পুরাণগুলি রচনা করেছিলেন বলে মনে হয়। তা ছাড়া কোন প্রথিতযশা লেখকের নামাঙ্কিত ক'রে রচনা লেখার ও প্রকাশ করার রীতি বহুদিন থেকেই ভারতীয় সমাজে প্রচলিত ছিল একথা ইতিহাসও সাক্ষ্য দেয়। যেমন 'অদ্ভুতরামায়ণ' গ্রন্থখানি যে মহর্ষি বাল্মীকির রচিত নয় একথা বিষয়বস্তুর উপাদান ও আলোচনাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ ক'রে। পরবর্তী যুগে বৈজুবাওরা, তানসেন, স্বামী হরিদাস প্রভৃতির রচিত নয়, অথচ তাঁদের নামাঙ্কিত হ'য়ে বহুগান সমাজে প্রচলিত দেখা যায়। এ' ধরণের অনেক নিদর্শনই দেওয়া যেতে পারে।

রামায়ণের পর মহাভারতের যুগে সঙ্গীত কি ধরণের ছিল তা আলোচনা করলে দেখি সঙ্গীতের বিকাশ ও রূপের যতটুকু সুস্পষ্ট পরিচয় আমরা রামায়ণে পাই—মহাভারতে তা পাই না। তার কারণ নির্ণয় করা দুরূহ। রামায়ণের চেয়ে মহাভারতের সমাজ ও চিন্তাধারা যে উন্নততর ছিল একথা স্বীকার করা অসঙ্গত নয়। অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও সমাজতত্ত্ববিদ্ স্বীকার করেন রামায়ণের চেয়ে মহাভারতের সমাজ বেশ বিস্তৃত ও জটিল ছিল। মহাভারতের রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাও যথেষ্ট পরিমাণে সংঘাত ও দুর্যোগপূর্ণ ছিল। কাজেই শিল্পকলার রুচি তখন কিছুটা ব্যাহত হয়েছিল বলে মনে হয়। তবে কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় নিশ্চয়ই রামায়ণের যুগের চেয়ে মহাভারতের সমাজে যথেষ্ট উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত ছিল।

আবার ভারতীয় সভ্যতার উত্থান-পতনের নজির দেখিয়ে অনেকে বলতে চান যে মহাভারতের যুগের চেয়ে রামায়ণের সমাজ ছিল যথেষ্ট উন্নত ও বিকাশশীল, কেননা যুধিষ্ঠিরের রাজধানী হস্তিনাপুর ও অন্যান্য প্রাসাদাদির শিল্প-চাতুর্যে ময়দানবের তথা অনার্য অবদান গৌরবময় হলেও রামরাজ্য অযোধ্যার শিল্প-সম্পদ ও সংস্কৃতির পাশাপাশি দানব-সভ্যতার চরম নিদর্শন স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী তথা আর্য ও অনার্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমান্তরাল বিকাশ মহাভারতের চেয়ে রামায়ণের যুগেই সম্ভব হয়েছিল। বিশেষ ক'রে বানররাজ বালি ও দানবরাজ

সাধক ও শাস্ত্রজ্ঞ রাবণের সুরুচি, সৌজন্য ও সৌন্দর্যবোধ অনার্য-প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে ম্লান করেছিল। ক্ষত্রিয় সংস্কৃতির কথার তো তুলনাই নাই। অবশ্য এ'সব যুক্তি ও তুলনা হ'ল তাঁদের পক্ষে প্রযোজ্য যাঁরা রামায়ণ-মহাকাব্যকে মহাভারতের পরবর্তী রচনা হিসাবে প্রমাণ করতে চান। মহাভারতের পাতায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক উপাদান ও কাহিনী মহাভারতকেই রামায়ণের পরবর্তী রচনা হিসাবে সপ্রমাণ করে। ডাঃ উইণ্টারনিজ[২], জেকবী[৩] প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বিভিন্ন যুক্তি ও প্রমাণের নিদর্শন দিয়ে রামায়ণকেই মহাভারতের চেয়ে প্রাচীন বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে রামায়ণ ও মহাভারতের অসংখ্য ঘটনা ও কুশী-লবদের নাম প্রভৃতি নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করলে রামায়ণ মহাভারতের চেয়ে যে প্রাচীন এটাই সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। সামাজিক জটিলতা, যুদ্ধ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে কূটনীতির প্রয়োগ, স্থাপত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে সূক্ষ্মদৃষ্টি ও চিন্তাশীলতার পরিচয়, বৃহত্তর পরিকল্পনা ও ধর্মের নিগূঢ় ব্যাখ্যা ও উদারতা প্রভৃতি বিষয়গুলি যে সমাজের পরিচয় দেয় সে (মহাভারতের) সমাজ রামায়ণের সমাজকে পেছনে রেখে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে বলে মনে হয়। রামায়ণের সরল জীবনধারার সন্ধান তখন পাওয়া যায় না। অতিশয় উন্নত হলেও মানব-সভ্যতার বহুল সমস্যাপূর্ণ রূপই প্রমাণ করে মহাভারত যে যুগ ও যে সমাজ-পরিবেশের কথা বর্ণনা করেছে সে যুগ ও সমাজ রামায়ণের পরবর্তী।

নৃত্য-গীত-বাদ্যের সমবেত রূপ যে সঙ্গীত ও এমনকি 'সঙ্গীত' শব্দটিরও উল্লেখ আমরা রামায়ণে পেয়েছি তা আগেই আলোচনা করেছি। অথচ আশ্চর্যের

২। Nevertheless it is more likely that the Mahâbhârata borrowed motives from the Râmâyana than the reverse. For while the Râmâyana shows no kind of acquaintance with the Pândava legend or the heroes of the Mahâbhârata, the Mahâbhârata, as we have seen, knows not only the Râmâyana legend, but Râmâyana itself. In the Harivamsha there is even already a mention of a dramatic representation of the Râmâyana. It is still more important, however, that the Mahâbhârata (VII. 143. 66) quotes a 'sloka once sung by Vâlmiki', which is actually to be found in our Râmâyana (VI. 81. 28).—*A History of Indian Literature,* Vol. I, p. 502.

৩। '* * (Râmâyana) has been generally familiar as an *ancient* work, before Mahâbhârata had reached its final form.'

বিষয় যে নারদীশিক্ষা, নাট্যশাস্ত্র[৪], দত্তিলম্‌, বৃহদ্দেশী, সঙ্গীতসময়সার প্রভৃতি খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকের সঙ্গীতগ্রন্থগুলিতে 'সঙ্গীত' শব্দটির ও তার তিনটি উপাদান নৃত্য, গীত ও বাদ্যের একত্র উল্লেখ আমরা পাই না। তৌর্যত্রিকের সুস্পষ্ট উল্লেখ ও পরিচয় পাই একেবারে খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর গ্রন্থ সঙ্গীত-রত্নাকরে। মহাভারতে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের একত্র সমাবেশ যেমন: 'ততো বাদিত্রনৃত্তাভ্যাম্‌ * * 'গীতৈশ্চ স্তুতিসংযুক্তৈঃ' (আদি, ২০০।৯৯), 'বাদিত্রাণি চ * * ননৃতুর্নর্তকাশ্চৈব জগুর্গীতানি গায়কাঃ' (আদি, ২০৬।৪), সুনৃত্তগীতবাদিত্রৈঃ' (আদি, ২০৭।১১৪), নৃত্যবাদিত্রগীতৈশ্চ' (সভা, ৫।২৪), 'বাদিত্রং নৃত্তগীতং' (সভা, ৮।৩৬), 'নৃত্তং গীতং চ বাদ্যং চ চিত্রসেনাদবাপ্নুহি' (আরণ্য, ৪০।৬), 'নৃত্যামি গায়ামি চ বাদয়াম্যহং' (বিরাট, ৯।১৭), 'গীত-বাদিত্রসংবাদৈঃ তালনর্তনলাসিতৈঃ' (দ্রোণ, ৭৪।৩৮), 'নৃত্যবাদিত্রগীতানাম্‌' (শান্তি, ২৯৭।২৮), 'নৃত্তৈর্বাদ্যৈশ্চ গান্ধর্বৈঃ' (অনুশাসনী, ১২৮।৩২৪), 'নৃত্যবাদিত্র-গীতানি' (আশ্বমেধিক, ৪০।১৩) প্রভৃতি।

রামায়ণ ও মহাভারতের সমাজে গান্ধর্ব বা গান্ধর্বগানেরই প্রচলন ছিল। গান্ধর্ব 'মার্গ' নামেও প্রচলিত ছিল ও রামায়ণে 'মার্গবিধানসংপদা' শব্দগুলি তার প্রমাণ। মার্গ-শব্দটি বৈদিক সামগানের মতো মঙ্গলবাচী ছিল; অর্থাৎ যে গান বা সঙ্গীত আভ্যুদয়িক, অধ্যাত্ম উন্নতিকারক, পবিত্র বা অপার্থিব ছিল তাকেই মার্গ বলা হ'ত। তবে 'মার্গ' অভিধানটি বৈদিক সঙ্গীতের পরবর্তী গান্ধর্বের বিশেষ বোধক 'যো মার্গিতো বিরিঞ্চাদ্যৈঃ' শব্দগুলি থেকেই তা বোঝা যায়। শার্ঙ্গদেব বলেছেন এই মার্গিত বা অন্বেষিত তথা চারবেদ থেকে সংগৃহীত গানই মার্গ: "সামবেদাদিদং গীতং সংজগ্রাহ পিতামহঃ"। স্মার্ত যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন এই গান্ধর্বগান মুক্তির দিশা দেখায় বলে মার্গ: "মোক্ষমার্গে স গচ্ছতি।" গান্ধর্ব তথা মার্গগানের যুগেও নৃত্য, গীত ও বাদ্য বা বাদিত্র অঙ্গগুলির সহযোগে সঙ্গীত পরিপূর্ণভাবে সমাজে বিকশিত ছিল।

মহাভারতে গায়ক, নর্তক, বাদক, দেবদুন্দুভি, অপ্সরাদের নৃত্য-গীত, গাথাগান, শঙ্খ, বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ, স্তুতি, স্তোম, তাল, লয়, মূর্ছনা প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু গান্ধর্বগানের রূপ কি রকম ছিল, কোন্‌ কোন্‌ গ্রামে তা লীলায়িত ছিল, কোন রাগের সমাবেশ ছিল কিনা, কি রীতিতে বাদ্যযন্ত্র তৈরী করা হ'ত

৪। কাব্যমালা-সংস্করণ নাট্যশাস্ত্রে অবশ্য দু'জায়গায় 'সঙ্গীত' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু কাশী সংস্করণে (চৌখাম্বা সংস্কৃত-সিরিজ) এ' শব্দটির কোন উল্লেখ নাই।

ও তাদের বাজানো হ'ত, গানে কি তাল, কি মূর্ছনার বিকাশ থাকত, এ' সকলের সুনির্দিষ্ট কোন পরিচয় আমরা পাই না। সেজন্য পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে বরং রামায়ণে সাঙ্গীতিক রূপ ও ভাবের কিছুটা উল্লেখ আমরা পাই, কিন্তু মহাভারতে তার যথেষ্ট অভাব আছে। মহাভারতকার তদানীন্তন কালের সমাজ, শিল্প ও সংস্কৃতির নিরাবরণ কাহিনী রচনা করেছেন সত্য, কিন্তু সঙ্গীতের বর্ণনায় বিশেষ কার্পণ্য দেখিয়েছেন।

তখনকার গানে যে লৌকিক ষড়্জাদি সাত স্বরের ব্যবহার ছিল একথা অজ্ঞাত নয়। মহাভারতকার আশ্বমেধিক পর্বে এই সাত স্বরের উল্লেখ ক'রে বলেছেন তারা শব্দেরই গুণ—আকাশ তথা বায়ুর সংঘাত থেকে উৎপন্ন। যেমন,

তত্রৈকগুণ আকাশঃ শব্দ ইত্যেব স স্মৃতঃ।
তস্য শব্দস্য বক্ষ্যামি বিস্তরেণ বহূন গুণান্॥
ষড়্জর্ষভঃ গান্ধারো মধ্যমঃ পঞ্চমঃ স্মৃতঃ।
অতঃ পরং তু বিজ্ঞেয়ো নিষাদো ধৈবতস্তথা॥
ইষ্টশ্চানিষ্টশব্দশ্চ সংহতঃ প্রতিভানবান্।
এবং বহুবিধো জ্ঞেয়ঃ শব্দ আকাশসম্ভবঃ॥[৫]

বৈদিকোত্তর গান্ধর্বগানে যে লৌকিক ষড়্জাদি সাত স্বরের প্রবর্তন করা হয়েছিল তা বৈদিক প্রথমাদি সাত স্বরের অনুরূপই হয়েছিল। সঙ্গীত-রত্নাকরের টীকাকার কল্লিনাথ (১৪৪৬-৬৫ খৃঃ) এর উল্লেখ ক'রে বলেছেন: "তৎ সংগ্রহরূপত্বং চ গীতস্যাপি সপ্তস্বরাত্মকত্বাৎ। সামানি হি ক্রুষ্টপ্রথমদ্বিতীয়চতুর্থ-মন্দ্রাতিস্বার্যাখ্যাঃ সপ্ত স্বরাঃ, ইহ তু ত এব যথাযোগ্যং ষড়্জাদিব্যপদেশভাজ ইতি। ব্রহ্মণাহপি বেদানুদ্ধৃত্য সংগ্রহণে সার্ববর্ণিকত্বং প্রয়োজনমিতি ভাবঃ।" বৈদিক যুগে সামগানের পাশাপাশি গ্রাম্য দেশী তথা লোক-সঙ্গীতের প্রচলন অবশ্যই ছিল ও তাতে যে ষড়্জাদি সাত স্বরেরই প্রচলন ছিল এতে আর সন্দেহ কি! তবে বিভিন্ন আদিম গানে ও পদ্ধতিতে স্বর-সংখ্যার অবশ্য তারতম্য ছিল।

মহাভারতে ষড়্জাদি সাত স্বরের উল্লেখ প্রসঙ্গে সংকলনকার তার একটা দার্শনিক রূপেরও পরিচয় দিয়েছেন দেখা যায় ও তা থেকে অনুমান করা মোটেই অসমীচীন হবে না যে নারদীশিক্ষাকার নারদ বা নাট্যশাস্ত্রকার ভরত সাত স্বরের কোন দার্শনিক ভিত্তির পরিচয় না দিলেও তাঁদের অনুসরণকারী মতঙ্গ (খৃষ্টীয়

৫। মহাভারত, আশ্বমেধিকপর্ব, ৫৩।৫২-৫৪

৫ম-৭ম শতাব্দী) বৃহদ্দেশীতে স্বর-সৃষ্টির মর্মকথায় যেখানে পরিচয় দিয়েছেন সেখানে তিনি যে মহাভারতের বর্ণনাকে অনুসরণ করেন নি তা কে বলতে পারে। মহাভারতকার উল্লেখ করেছেন,

আকাশমুত্তমং ভূতম্ অহংকারস্ততঃ পরঃ।
অহংকারাৎ পরা বুদ্ধিঃ বুদ্ধেরাত্মা ততঃ পরঃ ॥[৬]

সাংখ্যীয় যুক্তির মাধ্যমে সাঙ্গীতিক ষড়্‌জাদি স্বরের কারণ যে আত্মা একথাই বোঝা গেল। পরবর্তী সঙ্গীতশাস্ত্রীরা গীত বা গানকে নাদময় বলেছেন: "গীতং নাদাত্মকম্"। সিংহভূপাল এর ওপর আলোকপাত ক'রে বলেছেন: "নাদাত্মকং নাদ আত্মাস্বরূপং যস্ত"। বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গ নাদতত্ত্ব আত্মাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বলতেও কসুর করেন নি: "নাদরূপঃ স্মৃতো ব্রহ্মা নাদরূপো জনার্দনঃ, নাদরূপা পরাশক্তির্নাদরূপো মহেশ্বরঃ"। মহাভারতে যে ধারণা বীজাকারে ছিল তাই বৃহদ্দেশীতে ও তার পরবর্তী সঙ্গীতগ্রন্থগুলিতে ফল-ফুল-শোভিত বৃক্ষে পরিণত হ'য়েছে।

মহাভারতকার গানকে বলেছেন 'গান্ধর্ব'। তবে তিনি বেশীর ভাগ সময়ে 'গীত' শব্দই ব্যবহার করেছেন গান্ধর্বকে লক্ষ্য ক'রে। কোন কোন জায়গায় আবার গীত ও গান্ধর্ব এই দুটি শব্দই তিনি পাশাপাশি ব্যবহার করেছেন দেখা যায়: "রুবন্তি মধুরং গীতং গান্ধর্বস্বনমিশ্রিতম্" (১।১৫২।৩২)। তবে গীত বা গান অর্থে যে তিনি গান্ধর্বকে বুঝিয়েছেন একথা স্পষ্টভাবেই জানা যায়; যেমন "নৃত্তৈর্বাদৈশ্চ গান্ধর্বৈঃ" (অনুশাসনপর্ব, ১২৮।৩২৪)। এছাড়া 'গান্ধর্বশাস্ত্রং', "গীতগন্ধর্বঘৈশ্চ"। গান্ধর্ব সঙ্গীতপারগ গন্ধর্বদের প্রিয় ছিল একথা নাট্যশাস্ত্রকার ভরত বলেছেন। মহাভারতকার বলেছেন: "গন্ধর্বা গীতকুশলা নৃত্তেষু চ বিশারদাঃ" (আশ্বমেধিক, ৯৪.৪৩)। গীতিকলাবিদ্ তুম্বুরু, নারদ, পর্বত, বিশ্বাবসু, চিত্রসেন, হাহা, হুহু প্রভৃতি গন্ধর্বশ্রেষ্ঠদের নামোল্লেখও তিনি করেছেন:" হাহা-হুহুশ্চ গন্ধর্বৈ তুম্বুরুর্নারদাস্তথা"।

মহাভারতাকার যদিও উল্লেখ করেছেন: "বৈদিকানি চ কর্মাণি ভবন্তি বিগুণান্যুত" (৬।৩।১১৫), তাহলেও সে যুগে যাগ-যজ্ঞের যথেষ্ট প্রচলন ছিল ও তাতে গাথা স্তোমাদি সামগানের অনুশীলন হ'ত। অনুশাসনপর্বের ১২৮ অধ্যায়ে যাগ-যজ্ঞাদির যথেষ্ট প্রশংসাও করা হয়েছে। সত্র ও যাগ-যজ্ঞ হিসাবে অগ্নিষ্টোম,

৬। আশ্বমেধিকপর্ব ৫৩।৫৫

বাজপেয়, অশ্বমেধ, রাজসূয়, গোসব প্রভৃতির প্রচলন ছিল।[৭] নরমেধযজ্ঞেরও উল্লেখ আছে। মহাভারতকার উল্লেখ করেছেন,

ঋগ্‌ভির্যমনুশংসন্তি নামকর্মাণি বহ্বৃচাঃ।
যজুর্ভির্যং হবির্বৈশ্যাং জুহ্বুরধ্বর্যবোঽধ্বরে।
সামভির্যে চ গায়ন্তি সামগাঃ শুদ্ধবুদ্ধয়ঃ॥[৮]

ঋক্‌ছন্দে স্বর যোজনা ক'রে গীতি-রূপ সামের সৃষ্টি হয়। যজুর্বেদ যাগ-যজ্ঞ তথা কর্মানুষ্ঠানের বিধান করে। যাঁরা সাম গান করতেন তাঁদের সামগ বা সামগায়ী বলা হ'ত। তাঁরা শুদ্ধবুদ্ধির প্রেরণা লাভ করেই গানকে আত্মমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় প্রয়োগ করতেন, আর তারই জন্য সামগান ছিল বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আভ্যুদয়িক ও মঙ্গলবাচী। 'যম' অর্থে স্বর। স্বর সাতটি। কোমল বা বিকৃত স্বরের তখন ব্যবহার ছিল না। তবে অক্ষরের বিকার বা লোপের জন্য উচ্চারণ ভেদ হ'ত। তাতে ক'রে স্বরে তথা স্বরোচ্চারণে অনেক বিকৃতভাব দেখা দিত: "তে চাবান্তরভেদৈর্বহুধা ভিন্নাঃ"। সেই ভেদ অবশ্য চ্যুত-অচ্যুত বা অন্তর-কাকলির সঙ্গে কোন সম্পর্কযুক্ত ছিল না। ঋগ্বেদ-প্রাতিশাখ্যকার শৌনক বলেছেন: "সপ্তযমানি বাচঃ"। ভাষ্যকার উবট প্রশ্ন করেছেন: "কে তে যমা নাম?" সূত্রকার যেন উত্তরে বলেছেন: "সপ্ত স্বরা যে যমাস্তে"। উবট ভাষ্যে আরো পরিষ্কার ক'রে উল্লেখ করেছেন: "যে তে সপ্তস্বরাঃ—ষড়্‌জ-ঋষভ-গান্ধার-মধ্যম-পঞ্চম-ধৈবত-নিষাদাঃ স্বরাঃ, ইতি গান্ধর্ববেদে সমাম্নাতাঃ। তথা সামসু ক্রুষ্ট-প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ-মন্দ্রাতিস্বার্যঃ ইতি তে যথা নাম বেদিতব্যাঃ"। সুতরাং যম বল্‌তে বৈদিক সাত স্বর প্রথমাদি ও লৌকিক সাত স্বর ষড়্‌জাদি বোঝায়।

৭। (ক) অগ্নিষ্টোমেন চ তথা যে যজন্তি তপোধনাঃ।
* * *
বাজপেয়ং ক্রতুবরং তথা বহুসুবর্ণকম্।
* * *
যজন্তে পৌণ্ডরীকেন রাজসূয়েন চৈব যে।
দ্বাদশাহৈশ্চ সত্রৈশ্চ যজন্তেবিবিধৈর্নৃপ।

—শল্যপর্ব, ৪১।৩১-৩৫

(খ) অশ্বমেধেন বাঽপীষ্ট্বা গোসবেনাথ বা পুনঃ।
মরুৎসোমেন বা সম্যগ্‌ ইহ প্রেত্য চ পূয়তে॥

—শান্তিপর্ব, ১৪৪।৫২

৮। অনুশাসনপর্ব, ২৩।৪৯-৫০

তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্যে (২৩।১২) বলা হয়েছে : "মন্দ্রাদিষু ত্রিষু স্থানেষু সপ্ত-সপ্ত যমাঃ"। ভাষ্যকার সোমাচার্য এ' সূত্রটির দু'রকম অর্থ করেছেন : (১) ষড়্জাদি বা প্রথমাদি সাত স্বর এবং মন্দ্র, মধ্য ও তার তিনটি স্থানভেদে একুশটি স্বর (৭×৩=২১) ও (২) উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিন স্বর।[৯] অবশ্য শিক্ষাগুলিতে উদাত্তাদি তিনটি স্থানস্বর থেকে ষড়্জাদি সাত স্বরের সৃষ্টির কথা উল্লিখিত হয়েছে।[১০] মহাকাব্য মহাভারতে উল্লিখিত "ঋগ্‌ভির্নমনুশংসন্তি" (?) শব্দগুলি ঋক্‌ছন্দ ও সাত স্বর—কথা ও সুরের সম্বন্ধেই যে উল্লেখ করা হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

"ঋচো যজুংসি সামানি স্তোমাশ্চ বিধিচোদিতাঃ" (শান্তি, ২৫৩।৩৯) শ্লোকাংশে তখনকার যাগ-যজ্ঞে বৈদিক যুগের মতো সামগানে স্তোমের ব্যবহার ছিল প্রমাণ হয়। মহাভারতকার স্তোমের পরিচয়ও দিয়েছেন। যেমন,

ঋক্‌সামানি তথোঙ্কারং আহুস্ত্বাং ব্রহ্মবাদিনঃ ॥
হায়িহায়ি হুবাহায়ি হাবুহায়ি যথাঽসকৃৎ।
গায়ন্তি ত্বাং সুরশ্রেষ্ঠ সামগাঃ ব্রহ্মবাদিনঃ ॥
যজুর্ময়ো ঋঙ্‌ময়শ্চ ত্বমাহুতিময়স্তথা।
পঠ্যসে স্তুতিভিশ্চৈব বেদোপনিষদাং গণৈঃ ॥[১১]

পূর্বানুবৃত্তি-প্রসঙ্গে যজ্ঞানুষ্ঠানে সামগানের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। স্তোভ বলতে সামগানে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ বা স্বর, বর্ণ ও কখনো কখনো সমগ্র বাক্য বা পদকে অন্তর্নিবিষ্ট করা বোঝায়। আচার্য সায়ন স্তোভ অর্থে বলেছেন : "কালক্ষেপমাত্র-হেতুং শব্দরাশিং স্তোভ ইত্যাচক্ষতে", অর্থাৎ সামগানে কালক্ষেপের জন্য ব্যবহৃত শব্দরাশির নাম স্তোভ, আর 'অধিকত্বে সতি ঋগ্বিলক্ষণবর্ণঃ স্তোমঃ'। মহাভারতকার তার উদাহরণ দিয়েছেন : "হায়িহায়ি হুবাহায়ি হাবুহায়ি" প্রভৃতি।

সামগানে কি কি 'সাম' গান করা হ'ত তারও পরিচয় মহাভারতে পাওয়া যায়। যেমন,

রথন্তরং যচ্চ বৃহচ্চ গীয়তে
যত্র বেদিঃ পুণ্যজনৈর্বৃতা চ।
যত্রোপযাতি হরিভিঃ সোমপায়ী

৯। প্রজ্ঞানানন্দ : 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' (১ম ভাগ), পৃঃ ১৬৪

১০। উচ্চৌ নিষাদগান্ধারৌ নীচাবৃষভধৈবতৌ।
শেষাস্তু স্বরিতা জ্ঞেয়াঃ ষড়্জমধ্যমপঞ্চমাঃ ॥

১১। শান্তিপর্ব, ১২৫-১২৭ (অধিক পাঠ)।

বৃহদ্‌ ও রথন্তর সাম দু'টি সম্বন্ধে পূর্বানুবৃত্তিতে আলোচিত হয়েছে। আচার্য সায়ন বলেছেন গীতিরূপ মন্ত্রই সাম: "গীতিরূপাঃ মন্ত্রাঃ সামানি"। বিভিন্ন ছন্দের মধ্যে সমতা রক্ষা ক'রে গান করার নামই 'সাম'। সামবিধানব্রাহ্মণে (১।১।৫) উল্লেখ করা হয়েছে সামগ উদ্‌গাতা যখন ঋক্‌ছন্দের ঋকে উৎপন্ন সাম জগতীছন্দের ঋকে অথবা জগতীছন্দের ঋকে (স্বরযোগে) উৎপন্ন সাম ত্রিষ্টুপ্‌-ছন্দের ঋকে গান করেন তখন বিপরীত ছন্দের সমাবেশ থাকলেও পরস্পরের মধ্যে একটি সাম্য থাকে। আর সেই সাম্য বা সমতার নামই 'সাম'।[১২] সেই সমতা সম্বন্ধে সামগায়ীর জ্ঞান থাকা উচিত। অনেকে অনুমান করেন প্রাচীনকালে ষড়্‌জ ও মধ্যম এই উভয় গ্রামে (দুটি পদ্ধতিতে) সামগান করা হ'ত। এই গ্রাম দুটির আদি-অক্ষর স+ম থেকেই 'সাম' শব্দের সৃষ্টি হয়েছে।[১৩] অবশ্য এ' অনুমান কতটুকু যে বাস্তব তা বিচারের বিষয়। তবে একথা ঠিক যে ষড়্‌জ, মধ্যম ও গান্ধার গ্রাম তিনটি অতীব প্রাচীন। এদের মধ্যে অনেকের মতে মধ্যমগ্রাম ও অনেকের মতে গান্ধারগ্রাম প্রাচীন।[১৪] এ'ছাড়া কারো কারো অভিমত যে বৈদিক গান (সামগান) বিশেষ ক'রে গান্ধারগ্রামেই গাওয়া হ'ত। কিন্তু এ'মতের যুক্তিযুক্ত কোন কারণ এখনো পর্যন্ত আমরা পাইনি। মনে হয় আধারগ্রাম (basic ancient scale) হিসাবে ষড়্‌জগ্রামই অধিকতম প্রাচীন ও সামগানের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল।[১৫] বৈদিক যুগে গ্রামগুলির স্বর-সমাবেশ ছিল অবরোহণ-গতিতে।

১২। স যদা গায়ত্রং বৃহত্যাং গায়তি বার্হতং জগত্যা জাগতং ত্রিষ্টুভি সমতাং চাপদ্যতে তস্মাদেতৎ সামেত্যাহ সমা উ হ বা অস্মিংশ্ছন্দাংসি সাম্যাদিতি (সাম্যাদিতি বা) তৎসাম্য সামত্বম্ * *।

১৩। Incidentally, there seem to have been two distinct systems of Vedic chant—the Sa-type and the Ma-type and hence the term *Sāman*. Vide *The Bulletin of the Deccan College* (1956), Vol. 14, No. 4, p. 311.

১৪। Vide *The Journal of the Music Academy*, Madras, Vol. XVII, 1946, p. 84.

১৫। "Whereas in the present day musicology and music we do not recognize any grāmas, it is well-known that in ancient musicology they had three standard scales : Sā-grāma, Mā-grāma and Gā-grāma. The last was obsolete even in the time of Bharata. * * * The oldest defined scale that we know of is that of Sāman chant and it closely corresponds to Sā-grāma. Hence it is safe to assume that this grāma is the oldest of the three and the other two are later development."—B. Chaitanya Deva : *Drone in Indian Music* (The Journal of Music Academy, Madras, Vol. XXIII, pts. I-IV., 1952).

রথন্তর ও বৃহদ্ সাম দুটির পরিচয়-প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে রথন্তরসামে স্বরস্তোভ ছাড়া তিনটি ঋকেরও গান করা হ'ত। রথন্তর বৃহদ্‌সাম থেকে প্রাচীন। তবে দুটির মধ্যে মিলও যথেষ্ট, পার্থক্য কেবল শব্দপ্রয়োগ বা স্বরোচ্চারণে। যেমন বৃহদ্‌সামে যেখানে 'ইরা' উচ্চারিত হ'ত, রথন্তরে সেখানে বলা হ'ত 'ইড়া'। সামবেদভাষ্যোপক্রমণিকায় ও পঞ্চবিংশ বা তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে এ' দু'টি সামের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া আছে।[১৬] সায়ন বলেছেন অতিদেশের স্বরূপ নিশ্চয় করে বলেই 'রথন্তর'-শব্দের সার্থকতা। বামদেব্যসাম পাঠ করা হোক্ এ'ধরণের নির্দেশ থাকলেও তার পরিবর্তে রথন্তরসাম গান করা হ'ত। এরই নাম অতিদেশ। রথন্তর ও বৃহদ্ এ'দুটি সাম গান হিসাবে তাই পরিচিত ছিল।

মহাভারতের যুগে এ'দুটি সামের বিশেষ প্রচলন ছিল বোঝা যায়। মহাভারতকার বলেছেন পবিত্রচেতা সামগ প্রভৃতি ঋত্বিক্‌রা যজ্ঞবেদীর চতুর্দিকে বসে রথন্তর ও বৃহদ্‌সাম গান করতেন: "রথন্তরং যচ্চ বৃহচ্চ গীয়তে, যত্র বেদিঃ পুণ্যজনৈর্বৃতা চ"। তাঁরা স্বর ও অক্ষর প্রয়োগে বিশেষজ্ঞ ছিলেন: "শিক্ষাক্ষরবিশেষজ্ঞঃ" এবং স্তুতি-স্তোম, গ্রহস্তোম বেদের পদ ও ক্রম সম্বন্ধে সুশিক্ষিত ছিলেন।[১৭] তাঁরা বিবিধ লক্ষণ, স্তোভ ও নিরুক্তের প্রয়োগ বিশেষভাবে জানতেন। ওঙ্কার ও গায়ত্রী প্রভৃতি বৈদিক ছন্দের নিগ্রহ ও প্রগ্রহ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন।[১৮] সায়ন বলেছেন: "স্তোমঃ স্তবনাৎ"—স্তুতিগানই স্তোম। স্তুতিস্তোম স্তুতিগানেরই নামান্তর। সায়ন তাঁর ভাষ্যে উল্লেখ করেছেন: "গানেন সংস্কৃতৈ ঋগাক্ষরৈঃ স্তুতিসম্ভবাৎ"।

১৬। (ক) সায়ন: 'বেদভাষ্যভূমিকাসংগ্রহঃ' (কাশী সংস্করণ, ১৯৩৪), পৃঃ ৬৭—৬৯;

(খ) ডাঃ কালাণ্ড:

Pañcaviṁśa-Brāhmaṇa (English Trans., 1937), pp. 145-152;

(গ) প্রজ্ঞানানন্দ: 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি', ১ম ভাগ, পৃঃ ৮২-৮৩

১৭। স্তুতিস্তোম-গ্রহস্তোম-পদ-ক্রম-বিভাগবিৎ ॥

* * * *

শিক্ষাক্ষরবিশেষজ্ঞঃ পুরাকল্পবিশেষবিৎ ॥

* * * *

নৃত্তগান্ধর্ববেদী চ সর্বত্রাপ্রতিমস্তথা ॥

—সভাপর্ব, ৫।৩-১০

১৮। ঋগ্বেদোঽথর্ববেদশ্চ পদক্রমবিভূষিতঃ।

লক্ষণানি স্বরাস্তোভা নিরুক্তাঃ স্বরপঙ্‌ক্তয়ঃ ॥

ওঙ্কারশ্ছন্দসাং নেতা নিগ্রহপ্রগ্রহৌ তথা।

—অনুশাসনপর্ব, ৭৪।১৪৯-১৫০

সাম, স্তুতি, স্তোত্র ও গাথা প্রভৃতি গানের তখন যথেষ্ট প্রচলন ছিল। মহাভারতকার উল্লেখ করেছেন,

(১) গাথামপ্যত্র গায়ন্তি * *। { —আদি, ১০৮।৪৯ / —সভা, ৩৫।২১৬ }

(২) গীতৈশ্চ স্তুতিসংযুক্তৈঃ * *। — „ ২০০।৯৯

(৩) সামানি স্তুতিগীতানি গাথাশ্চ বিবিধা অপি। —সভা, ১১।৩৫

(৪) সামানি গায়ন্ যাম্যানি * *। —সভা, ৭১।২১

(৫) গায়ন্তি গাথা গন্ধর্বাং * *। —উদ্যোগ, ৯৬।৯-১০

(৬) সামানি সামগাস্তস্য গায়ন্তি যমসাদনে।
হবির্ধানং তু তস্যাহুঃ পরেষাং বাহিনীমুখম্॥ —শান্তি, ৮৯।৫২

বিহিত মন্ত্রবিশেষের নাম 'গাথা': 'বিহিতা মন্ত্রবিশেষাগাথাঃ'। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।১।৮।২) আছে: "যমগাথাভিঃ পরিগায়তি"। কল্যাণবাচক বা আশীর্বাচক স্তুতিগানের নামও গাথা। টীকাকার কল্লিনাথ অশ্বমেধ-প্রকরণে ধর্মসাধনমূলক মঙ্গলগানের উদ্দেশ্যে গাথা-শব্দের প্রমাণ দিয়েছেন দেখা যায়: "ব্রাহ্মণৌ বীণাগাথিনৌ গায়ত * * ইতি শ্রুতের্দেবার্চনাদিষু গীতাদেস্তদঙ্গত্বেন পরিগ্রহাচ্চ সিদ্ধম্"। বৈদিক স্তুতি, স্তোম, গাথা প্রভৃতি সামগানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সায়নও উল্লেখ করেছেন বিচিত্র প্রকারে সামগান গাওয়া হ'ত। তাদের রূপও ছিল বিভিন্ন রকমের ও সেগুলি দেবতাদের স্তুতির উদ্দেশ্যেই গাওয়া হ'ত।[১৯] রামায়ণ ও মহাভারতের সময়ে সামাজিক পরিবেশ, কার্যকলাপ ও মানুষের রুচির অনেক পরিবর্তন হলেও গানে পবিত্র ও অধ্যাত্ম ভাবের কোন বৈলক্ষণ্য ছিল না। তবে গায়কেরা দেবতাদের গাথা ও স্তুতিগানের সঙ্গে সঙ্গে প্রজাপালক ধার্মিক রাজাদেরও পুণ্যকার্য ও শৌর্য-বীর্যের প্রশংসাসূচক স্তুতিগান বা গাথাগান গাইত। নৃত্য গীত বাদ্যও তখন পার্থিব ও অপার্থিব এই উভয় ব্যাপারে নিয়োজিত হ'ত। সঙ্গীত-রত্নাকরের "ধর্মার্থকামমোক্ষাণাম্" প্রভৃতি শ্লোকটির[২০] টীকায় কল্লিনাথ এ'সম্বন্ধে উল্লেখ ক'রে বলেছেন: "* * ইতি শ্রুতের্দেবার্চনাদিষু গীতাদেস্তদঙ্গত্বেন পরিগ্রহাচ্চ সিদ্ধম্। অর্থসাধনত্বং লোকতো দৃষ্টম্। কামসাধনত্বং

১৯। বহুভিঃ প্রকারৈর্গানাত্মকং যৎ সামস্বরূপং নিরূপিতম্, তস্যৈব দেবতাস্তুতিহেতুত্বং * *।

২০। তস্য গীতস্য মাহাত্ম্যং কে প্রশংসিতুমীশতে।
ধর্মার্থকামমোক্ষাণামিদমেবৈকসাধনম্॥
—সঙ্গীতরত্নাকর ১।১।৩০

তু * * । মোক্ষসাধনম্বং চ * * ।" সিংহভূপাল উল্লেখ করেছেন ধর্ম ও মোক্ষসাধনের মতো উপজীবিকার সাধন হিসাবেও গান তথা সঙ্গীতকে লোকে ক্রমশঃ গ্রহণ করেছিল : "গীতোপজীবিনামর্থসাধনম্"। আর তারি জন্য রামায়ণ ও মহাভারতাদিতে দেখা যায় পুরাণবিদ্, আখ্যানবিদ্, নট, নটী, বৈতালিক, বন্দী, সূত, মাগধ, পাণিবাদক, গন্ধর্ব, অপ্সরা, কিন্নর প্রভৃতিরা দেবতা, রাজা, যুদ্ধবীরগণের বা বংশের স্তুতিগান করছে। যেমন,

(১) গীতবাদিত্রকুশলাঃ শম্যাতালবিশারদাঃ।
প্রমাণে চ লয়ে স্থানে কিন্নরাশ্চ কৃতাশ্রমাঃ॥
তে চোদিতাস্তুম্বুরুণা গন্ধর্বাঃ কিন্নরৈঃ সহ।
দিব্যগানেষু গায়ন্তি গাথাদিব্যাশ্চ ভারত॥
শম্যাতালেষু কুশলাঃ গীতবাদ্যবিশারদাঃ।
* * * *
দিবীব দেবা দেবেন্দ্রঃ যুধিষ্ঠিরমুপাসতে॥[২১]

(২) নৃত্যবাদিত্রগীতৈশ্চ ভাবৈশ্চ বিবিধৈরপি।
রময়ন্তি মহাত্মানং দেবরাজং শতক্রতুম্॥[২২]

(৩) বন্দিপ্রবাদাঃ পণবাদিকাশ্চ তথৈব বাদ্যানি চ বংশশব্দাঃ।
সকাংস্যতালং মধুরং চ গীতং,
আদায় নার্যো নগরান্নিরীয়ুঃ॥[২৩]

(৪) গায়নাখ্যানশীলাশ্চ নটা বৈতালিকাস্তথা।
স্তুবন্তস্তানুপাতিষ্ঠন্ সূতাশ্চ সহ মাগধৈঃ॥[২৪]

(৫) অত্র গাথা ব্রহ্মগীতাঃ কীর্তয়ন্তি পুরাবিদঃ।[২৫]

(৬) ততঃ পুণ্যাহঘোষেণ আশীর্বাদস্বনেন চ।
সূত-মাগধ-বন্দীনাং সংস্তবৈর্গীতমঙ্গলৈঃ॥[২৬]

(৭) পঠন্তি পাণিধ্বনিকা মাগধাঃ স্তবগায়কাঃ।
বৈতালিকাশ্চ সূতাশ্চ স্তুবন্তি পুরুষর্ষভম্॥

২১। মহাভারত, সভাপর্ব, ৪।৪৪-৪৭
২২। " " ৫।২৪
২৩। " বিরাটপর্ব, ৬১।৩৩
২৪। " " ৬৭।৩৬
২৫। " শান্তিপর্ব, ১২৬।১
২৬। মহাভারত, দ্রোণপর্ব, ৫।৪১

নর্তকাশ্চাপি নৃত্যন্তি গান্তি গীতানি গায়কাঃ।
কুরুবংশস্তবার্থানি মধুরং রক্তকণ্ঠিনঃ ॥[২৭]

(৮) সংস্তূয়মানঃ সূতৈশ্চ বন্দ্যমানশ্চ বন্দিভিঃ।
উদ্‌গীয়মানো গন্ধর্বৈঃ * * ॥[২৮]

(৯) সূতাঃ স্তুতিপুরাণজ্ঞা রক্তকণ্ঠাঃ সুশিক্ষিতাঃ।
* * * *
পঠন্তি পাণিস্বনিনো গাথা গায়ন্তি গায়কাঃ।
* * * *
ততো যুধিষ্ঠিরস্যাপি রাজ্ঞো মঙ্গলসংযুতাঃ।
উচ্চৈরুর্মধুরা বাচো গীতবাদিত্রবৃংহিতাঃ ॥[২৯]

শার্ঙ্গদেব (১৩শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ) সঙ্গীত-রত্নাকরে গাথার পরবর্তী প্রবন্ধ-রূপের পরিচয় দিয়ে বলেছেন,

আর্যৈব প্রাকৃতে গেয়া স্যাৎ পঞ্চরণাথ বা ॥
ত্রিপদী ষট্‌পদী গাথেত্যপরে সূরয়ো জগুঃ।[৩০]

আর্যার মতো লক্ষণযুক্ত হ'লে প্রাকৃতপদে গাথা গান করা হয়। আর্যার পদ সংস্কৃতে রচিত। তার পদের শেষে ষড়্‌জাদি স্বর থাকে। আর্যার প্রথমার্ধ দু'বার ও উত্তরার্ধ কিছুটা গান করা হয়। প্রথমার্ধ উদ্‌গ্রাহ ও উত্তরার্ধ বা দ্বিতীয়ার্ধ ধ্রুবধাতু। আভোগে গায়ক ও নিয়ন্তার নাম যুক্ত থাকে। আর্যা-প্রবন্ধের মতো গাথা-প্রবন্ধ সংস্কৃতের পরিবর্তে প্রাকৃতপদে গান করা হয়। গাথা সম্বন্ধে মতান্তরও আছেঃ গাথা কারু কারু মতে তিনটি অথবা ছ'টি পদযুক্ত হয়। মহাভারতের যুগে গাথার রূপ কি ধরণের ছিল তা নির্ণয় করা দুরূহ, কিন্তু শার্ঙ্গদেব গাথার যে সংস্কৃত প্রবন্ধ-রূপের পরিচয় দিয়েছেন তা প্রাচীনকে অনুসরণ ক'রে রচিত বলে মনে হয়। মহাভারতে 'দিব্যগান' ও 'দিব্যগাথা'—গান ও গাথাকে আবার পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।[৩১] দিব্যগান অর্থে গান্ধর্ব বা মার্গসঙ্গীত।

২৭। " " ৭৫।২-৪
২৮। " " ৭৫।২৮
২৯। " শান্তিপর্ব ৪৮।৩-৬
৩০। সঙ্গীত-রত্নাকর ৪।২৩২-৩৩
৩১। দিব্যগানেষু গায়ন্তি গাথাদিব্যাশ্চ ভারত।

শান্তিপর্বে 'গাথা-ব্রহ্মগীতাঃ'—গাথা-রূপ ব্রহ্মগীত বা ব্রহ্মগীতি শব্দটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভরত নাট্যশাস্ত্রে (৩১।১৯৮) ব্রহ্মগীত বা গীতির কথা উল্লেখ করেছেন: "তান্যক্ষরাণি বক্ষ্যে যানি পুরা ব্রহ্মগীতানি"। ভরত 'আসারিতা-নামুপোহন' প্রসঙ্গে প্রাচীনকালে ব্রহ্মা-কর্তৃক গীত গানের উদাহরণ দিয়েছেন। সঙ্গীত-রত্নাকরে তালাধ্যায়ে শার্ঙ্গদেব ব্রহ্মগীতির উল্লেখ ক'রে বলেছেন: (ক) "তান্যত্র ব্রহ্মগীতানি নির্দিশ্যন্তেঽধুনা যথা" (৫।২২৫), (খ) "স্তোভভঙ্গীং বিজানীয়াৎ সাম্নো বৈদিকসামবৎ, ব্রহ্মণা চ পুরা গীতিং" (৫।২৩০)। কল্লিনাথ ব্রহ্মগীতির প্রসঙ্গে বলেছেন: "ব্রহ্মণা চ পুরা গীতমিত্যত্র সামেত্যধ্যাহর্তব্যম্"। অক্ষর ও পদযুক্ত দেবস্তুতিগানের উল্লেখ ক'রে শার্ঙ্গদেব আরো বলেছেন: "ব্রহ্মপ্রোক্তপদৈঃ সম্যক্প্রাগুক্তাঃ শংকরস্তুতৌ" (১।৬।১১৩)। কল্লিনাথ বলেছেন: "প্রাক্পূর্বং শংকরস্তুতৌ শংকরস্তুতিং বিষয়ীকৃত্য ব্রহ্মপ্রোক্তপদৈঃ, ব্রহ্মণা চতুর্মুখেণ প্রোক্তৈর্গ্রথিতৈঃ পদৈঃ"। আমরা দ্রুহিণ-ব্রহ্মার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। তিনি অবশ্যই তাঁর 'ব্রহ্মভরতম্' গ্রন্থে স্তুতিগানের নিদর্শন দিয়েছেন। কিন্তু তিনি বিশ্বস্রষ্টা চতুর্মুখ ব্রহ্মা যে নন তা ঐতিহাসিকমাত্রেই স্বীকার করবেন। গান্ধর্বগানের স্রষ্টা হিসাবে পরবর্তী গ্রন্থকারেরা তাঁকে বিশ্বস্রষ্টার সম্মান দিয়েছেন বলে মনে হয়। কল্লিনাথ ব্রহ্মা-রচিত পদের উল্লেখ ক'রে বলেছেন: 'তং ভবললাট' ইত্যাদিভির্যোজয়িত্বা সম্যগন্যূনতিরেকেণোক্তা গীতাশ্চেদমূঃ ষাড়্জ্যাদয়ো * *।" এ'থেকে বোঝা যায় ব্রহ্মা-রচিত গীতিপদগুলি জাতিরাগ সংযুক্ত ক'রে গাওয়া হ'ত, আর তারি জন্য জাতিগান বা জাতিরাগগানও পবিত্র ও পাবন-প্রকৃতিসম্পন্ন ছিল। শার্ঙ্গদেব বলেছেন জাতি বা জাতিরাগগুলি সামগান থেকে সৃষ্ট হয়েছিল, সেজন্য ঋক্ যজুঃ ও সামবেদে বিহিত মন্ত্রগুলির মতো তারা পবিত্র। বেদগুলির অপপ্রয়োগে প্রত্যবায় সৃষ্টির মতো জাতিগানগুলিও যথাযথ স্বর, তাল ও পদযুক্ত ক'রে গান না করলে অমঙ্গল সৃষ্টি হয়।[৩২] শার্ঙ্গদেব তাই উল্লেখ করেছেন,

ঋচো যজুংষি সামানি ক্রিয়ন্তে নান্যথা যথা।
তথা সামসমুদ্ভূতা জাতয়ো বেদসংমিতাঃ ॥

৩২। (ক) সঙ্গীত-রত্নাকর ১।৭।১১৪

(খ) অনেন সম্যগ্জাতিগানস্য মহাপাতকপ্রায়শ্চিত্তত্বমুক্তং ভবতি। এবং সামর্থ্যং জাতীনামুক্ত-নিয়মযুক্তানামৃগাদিমন্ত্রসাদৃশ্যহেতুত্বেনাভিসংধায় তাসামনিয়মযোগং নিষেধতি—ঋচ ইতি। ঋচো যজুংষি সামানি যথাঽন্যথা ন ক্রিয়ন্তে স্বরবর্ণোচ্চারণাদিবৈপরীত্যেন ন প্রযুজ্যন্তে, তথা সামসমুদ্ভূতাঃ

বর্ণ ও অলংকারযুক্ত ব্রহ্মপদবিশিষ্ট গানের নাম ব্রহ্মগীতি।[৩৩] শুদ্ধজাতি (জাতি বা জাতিরাগগান) থেকে উৎপন্ন সাতটি কপাল প্রাচীনকালে (খৃষ্টপূর্ব শতাব্দীতে) ব্রহ্মপদ নামে কথিত : "ইতি সপ্ত কপালানি গায়ন্ ব্রহ্মোদিতৈঃ পদৈঃ, স্বরৈশ্চ পার্বতীকান্তস্তৌ কল্যাণবাগ্ ভবেৎ"।[৩৪] কম্বলপদগীতির মর্মকথাও তাই।[৩৫] সঙ্গীতশাস্ত্রী কম্বলের নামাঙ্কিত ব্রহ্মগীতিই কম্বলগীতি নামে পরিচিত। কম্বল নগরাজ অশ্বতরের ভ্রাতা। শার্ঙ্গদেব ব্রহ্মা-কথিত কপাল-পদাবলীর পরিচয় প্রসঙ্গে[৩৬] ষাড়্জীকপাল, আর্ষভীকপাল, গান্ধারীকপাল, মধ্যমাকপাল, পঞ্চমী-কপাল, ধৈবতীকপাল ও নৈষাদীকপাল এই সাতটি পদগীতির কথা বলেছেন। এই ব্রহ্মা-কথিত পদগীতি তথা ব্রহ্মগীতি শুদ্ধজাতিরাগ থেকে সৃষ্ট বলে জন্য-রাগগীতি নামে কথিত। কল্লিনাথ বলেছেন রাগান্তর জাতিরাগের অবয়ব বলে 'রাগাংশ' নামেও খ্যাত : "রাগান্তরস্যাবয়বো রাগাংশঃ"। এরা জন্যরাগ বা রাগাংশ বলে অনেকটা গ্রামরাগের শ্রেণীভুক্ত, কেননা গ্রামরাগগুলিও জাতিরাগ থেকে উৎপন্ন : "জাতিসম্ভূতত্বাৎ গ্রামরাগানি"। ব্রহ্মগীতির 'কপাল' নাম হবার কারণ, কপাল (কানা) দিয়ে যেমন ঘটের প্রতীতি হয় তেমনি ব্রহ্মপদগীতি দিয়ে তার জনক শুদ্ধ-জাতিরাগের অনুভব হয়।[৩৭] শার্ঙ্গদেব শঙ্করস্তুতি-রূপ সাতটি কপাল বা ব্রহ্মপদের (ব্রহ্মগীতি) যে উদাহরণ দিয়েছেন তাদের মাধ্য ষাড়্জীকপালের নিদর্শন যেমন,

॥ ঝণ্টুং ঝণ্টুং ॥১॥ খট্বাঙ্গধরং ॥২॥ দ্রংষ্ট্রাকরালং ॥৩॥ তড়িৎসদৃশজিহ্বং ॥৪॥ হো হো হো হো হো হো হো হো ॥৫॥ বহুরূপবদনং ঘনঘোরনাদং ॥৬॥ হো হো হো হো হো হো হো হো ॥৭॥ উঁ উঁ হাং রেঁাং হোঁ হোঁ হোঁ হোঁ ॥৮॥ নৃমুণ্ডমণ্ডিতম্ ॥৯॥ হূং হূং কহ কহ হূং হূং ॥১০॥ কৃতবিকটমুখম্ ॥১১॥ নমামি দেবং ভৈরবম্ ॥১২॥

নাট্যশাস্ত্রকার ভরতও এর কিছুটা পরিচয় দিয়েছেন,

দেবং দেবৈঃ সংস্তুতমীশং দৈত্যের্ষক্ষৈঃ প্রণমিতচরণম্।
ত্রৈলোক্যহিতং হরং শং শরণমহমুপগতঃ ॥

সামভ্যঃ সমুৎপন্না অতএব বেদসংমিতা বেদসদৃশা জাতয়োঽন্যথা ন ক্রিয়ন্তে, স্বরপদতালাদিবৈপরীত্যেন ন প্রযোক্তব্যা ইত্যর্থঃ।—কল্লিনাথ

৩৩। বর্ণালংকারকৃতা গানক্রিয়া পদলয়ান্বিতা গীতিরুচ্যতে।

৩৪। সঙ্গীত-রত্নাকর ১।৮।১০

৩৫। „ ১।৮।১১—১৩

৩৬। কপালানাং ক্রমাদ্ ব্রূমো ব্রহ্মপ্রোক্তাং পদাবলীম্।

৩৭। যথা ঘটৈকদেশত্বেন কপালানি ঘটপ্রতীতিজনকান্যেবমেতান্যপি রাগৈকদেশত্বেন রাগপ্রতীতি-জননানাৎকপালানীব কপালানীতি তেষাং সংজ্ঞাঽবগন্তব্যা।—কল্লিনাথ

শার্ঙ্গদেব আরো উল্লেখ করেছেন যে, তালপ্রধান মন্ত্রকাদি সাতটি ও ছন্দকাদি সাতটি এই চৌদ্দটি গীতি শিবস্তুতি হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত। কপালাদি যেমন ব্রহ্মপদ, তেমনি শিবপদও বটে : "পুরা ভিক্ষাঽটনসময়ে শম্ভূনা ষড়্‌জ্যাদিষু গীয়মানাসু"। এগুলিও মানুষের মোক্ষলাভের কারণ।[৩৮] পাণিকা, ঋক্, গাথা, সাম প্রভৃতি গান বা গীতি বৈদিক সামগানেরই ভিন্নরূপ,—পরবর্তীকালে গান্ধর্বগানে ব্রহ্মা, শিব (ব্রহ্মাভরত, শিবভরত) প্রভৃতি সাধক-শিল্পী এদের নিবন্ধ-গান হিসাবে সমাজে প্রবর্তন করেছিলেন। শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকরে এদের বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন।[৩৯] যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যও এই শঙ্করস্তুতিগানের পরিচয় দিয়েছেন,

অপরান্তকমুল্লোপ্যং মদ্রকং প্রকরীস্তথা।
ঔবেণকং সরোবিন্দুমুত্তরং গীতকানি চ ॥
ঋগ্‌গাথাপাণিকাদক্ষবিতা ব্রহ্মগীতিকাঃ।
জ্ঞেয়মেতত্তদভ্যাসকরণান্মোক্ষসংজ্ঞিতম্ ॥[৪০]

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। ঐতিহাসিকেরা সংহিতা-গুলিকে (সমাজশাসনতন্ত্র) খৃষ্টীয় অব্দের রচনা বলেছেন, অথচ খৃষ্টপূর্বাব্দে রচিত মহাভারতের অনেক জায়গায়ই যাজ্ঞবল্কের নাম পাওয়া যায়—বিশেষ ক'রে শান্তিপর্বে। যেমন "যাজ্ঞবল্কস্য সংবাদং জনকস্য চ ভারত" (শান্তি, ২৯৩।৩), "যাজ্ঞবল্ক্যেন জনকং প্রতি" (শান্তি, ২৯৮–৩০১ অধ্যায়), "যাজ্ঞবল্ক্যঃ সশিষ্যশ্চ" (আশ্বমেধিক, ৭৭।১৭)। একথা ঠিক যে মহাভারত-সংকলনের কাজ খৃষ্টপূর্ব ৩০০ শতকে আরম্ভ হলেও তার সম্পূর্ণ কলেবর পূর্ণসমাপ্ত হয়েছিল খৃষ্টীয় ৩য়—৪র্থ শতাব্দীতে (?)। কাজেই পরবর্তীকালে (খৃষ্টীয় অব্দে) ঋষি যাজ্ঞবল্কের নাম মহাভারতের অন্তর্গত হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয় বলে মনে হয়।

৩৮। শিবস্তুতি-রূপ চৌদ্দটি মার্গগীতি হ'ল : মদ্রক, অপরান্তক, উল্লোপ্যক, প্রকরী, ওবেণক, রোবিন্দক, উত্তর-আসারিত, ছন্দক, আসারিত, বর্ধমানক, পাণিকা, ঋক্, গাথা ও সাম। * * "গীতানীতি চতুর্দশ ; শিবস্তুতৌ প্রযোজ্যানি মোক্ষায় বিদধে বিধিঃ"।—সঙ্গীত-রত্নাকর, তালাধ্যায় ৫৩—৫৬

৩৯। সঙ্গীত-রত্নাকর, তালাধ্যায়।

৪০। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ৩।১১৩—১১৪

যাজ্ঞবল্ক্য অপরান্তক, ওবেণক, গাথা, সাম প্রভৃতিকেও ব্রহ্মগীতি বলেছেন। সঙ্গীত-রত্নাকরে এদের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। অপরান্তকগীতি তিন রকম: এককল, দ্বিকল ও চতুষ্কল। এককল-অপরান্তকে চারটি গুরু ও লঘু বস্তু থাকে। বস্তু অর্থে শাখা, অঙ্গ বা পদ। গানে একের অধিক বস্তুও থাকত। অনেকে গানে একটি, পাঁচটি, ছ'টি বা সাতটি বস্তু বা পদের উপযোগিতা স্বীকার করেন। গানে একটি বস্তু বা পদের পরিবর্তে অন্য বস্তু বা পদেরও ব্যবহার হ'ত। বস্তু বলতে যেখানে শাখা বোঝায় কল্লিনাথ সেখানে শাখার অর্থ করেছেন অন্তর্নিবেশ, অর্থাৎ কতকগুলি পদের মধ্যে অন্য পদের অন্তর্ভুক্তি। এ' অনেকটা সজাতীয় ও বিজাতীয় পদের মিশ্রণ। বিশ্বাখিল ও ভরত এ'সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেন। বিশ্বাখিল পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধ হিসাবে বস্তু বা শাখার দু'টি ভাগ স্বীকার করেন। অন্যান্য সঙ্গীতশাস্ত্রীরা একটি মাত্র পদের পক্ষপাতী। শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকরে বিভিন্ন অপরান্তক-পদগীতির ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাবের নিদর্শন দিয়েছেন।[৪১]

উল্লোপ্য-পদগীতিও অপরান্তকের মতো তিন রকম: এককল, দ্বিকল ও চতুষ্কল।[৪২] মাত্রাসমষ্টির দ্বারা এর প্রত্যেক পদের স্বরূপ নির্ণয় করা হয়। এ'সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। প্রকরী-পদগীতি চার রকম।[৪৩] ওবেনকাদিও তাই। প্রত্যেকটি পদগীতির মাত্রাসমষ্টি ভিন্ন ভিন্ন। ওবেণক বারোটি বস্তু বা অঙ্গবিশিষ্ট পদগীতি। বারোটি অঙ্গ নিয়ে সে পাদ, প্রতিপাদ, মাষঘাত, উপবর্তন, সন্ধি, চতুরস্র, বজ্র, সংপেষ্টিক, বেণী, প্রবেণী, উপপাত ও অন্তাহরণ এই বারোটি ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিকশিত।[৪৪] অনেকের মতে ওবেণকগীতি সাতটি অঙ্গযুক্ত।[৪৫] মদ্রকগীতি অপরান্তকের মতো এককল, দ্বিকল ও চতুষ্কল তিন শ্রেণীর। অনেকে মদ্রককে দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত বলেন।[৪৬] হরিবংশপুরাণে মদ্রকগীতির পরিচয় পেয়েছি ও সেদিক থেকে মদ্রক যে খৃষ্টপূর্বাব্দের 'পদগান' একথা অনুমান করা যায়। অপরান্তকাদি চৌদ্দটি পদগীতি জাতিরাগ থেকেই সৃষ্ট, সুতরাং জাতিরাগের

৪১। সঙ্গীত-রত্নাকর, তালাধ্যায় ৫।৮৮–১০৪
৪২। " " ৫।১০৫–১৩৩
৪৩। " " ৫।১৩৪–১৪২
৪৪। " " ৫।১৪৩
৪৫। " " ৬।১৬৪
৪৬। " " ৫।৫৯–৬০

মতো এই গানগুলির অলংকার অংশ গ্রহ, ন্যাসাদি দশলক্ষণ, বর্ণ, ধাতু, মূর্ছনা প্রভৃতি সবই আছে। জাতিরাগের অঙ্গ বলে অপরান্তকাদি চৌদ্দটি পদগীতি গ্রামরাগ বা উপরাগের অন্তর্গত: "অনেন মদ্রকাদিনি গ্রামরাগোপরাগেষেকতমেন রাগেণ গাতব্যানীতি সূচিতং ভবতি"।

ভরত নাট্যশাস্ত্রে ব্রহ্মগীতি হিসাবে ঋক্, গাথা, সাম, পাণিকা প্রভৃতির পদগীতির উল্লেখ করেছেন। তিনি ৩১শ অধ্যায়ে (কাশী সংস্করণ) আবেণক, ওবেণক বা ঔবেণক রোবিন্দক, উল্লাপ্য (?), উত্তর প্রভৃতি পদগীতির পরিচয় দিয়েছেন। যেমন,

সর্বেষামেব গীতানাং বস্তুষবয়বেষু চ।
বিবিধৈকৈকবৃত্তানি ত্রীণ্যঙ্গানি ভবন্তি হি ॥

* * * *

রোবিন্দতোত্তরাভ্যাং তু বৃত্তমুল্লাপ্যকস্য হি।
পাণিকায়াং বহির্গীতে লাস্যে চৈব প্রকীর্তিতে ॥
প্রবৃত্তমবগাঢ়ং চ দ্বিবিধং বৃত্তমুচ্যতে।
আরোহিত্বাত্বগাঢ়ং তু প্রবৃত্তমবরোহি চ ॥

এ'ছাড়া ঋক্, পাণিকা, গাথা প্রভৃতি গীতির সম্বন্ধে ভরত বলেছেন,

(১) যা ঋচঃ পাণিকা গাথা সপ্তরূপাঙ্গমেব চ।
সপ্তরূপং প্রমাণং হি সা ধ্রুবেত্যভিসংজ্ঞিতা ॥[৪৭]

(২) জয়াশীর্বাদযুক্তানি কার্যান্যেতানি দৈবতে ॥
ঋগ্‌গাথাপাণিকা হ্যেষাং বোদ্ধব্যাস্তু প্রমাণতঃ।
বিশ্রাব্যশ্চৈব যস্মাত্তু তস্মাদ্গীতেষু যোজয়েৎ ॥[৪৮]

ভরত এই পদগীতিগুলিকে নানা ছন্দযুক্ত ('নানাছন্দঃকৃতানি চ') ধ্রুবগীতি আখ্যা দিয়েছেন ('ধ্রুবেত্তিসংজ্ঞিতানি স্যুঃ' অথবা 'সা ধ্রুবেত্যভিসংজ্ঞিতা')। ধ্রুবাগীতি ন্যাট্য-সঙ্গীত, নাটকের জন্যই বিচিত্র ভাবে ও রূপে রচিত। শার্ঙ্গদেব মদ্রকাদি ও ঋক্, গাথা ও পাণিকাদিকে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের মতো ব্রহ্মগীতি আখ্যাই দিয়েছেন: "তান্যত্র ব্রহ্মগীতানি" (তালাধ্যায় ২২১)। সিংহভূপাল উল্লেখ করেছেন: "তান্যেব ব্রহ্মণা গীতানি স্তোভাক্ষারাণি প্রতিজ্ঞায় নির্দিশতি"।

৪৭। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সংস্করণ) ৩২।২

৪৮। নাট্যশাস্ত্র ৩২।৪:৫-৪১৬

গাথার কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। সামগানোত্তর প্রবন্ধ ঋক্ ও সাম-পদগীতির পরিচয় সম্বন্ধে শার্ঙ্গদেব উল্লেখ করেছেন,

আরভ্যানুষ্টুভং বৃত্তৈর্জগত্যন্তৈঃ পদৈরপি ॥
লৌকিকৈর্বৈদিকৈর্বাপি গাতব্যামৃচমূচিরে।
একাক্ষরাঃ কলা অষ্টাচত্বারিংশদিহোদিতাঃ ॥
কলাণাং পূরণং মন্ত্রপদৈঃ স্তোভাক্ষরৈরপি।
তান্যত্র ব্রহ্মগীতানি নির্দিশ্যন্তেঽধুনা যথা ॥
ঝণ্টুংজগতিযবলিকিতকুচঝলতিতিঝলপশুপতি-দিগি-
দিগিবাদির্গোগণপতিতিতিধা, ইত্যেতান্ ব্রবীদ্‌ব্রহ্মা।
ওঙ্কারশ্চ হকারোঽপি স্বরব্যঞ্জনসংযুতঃ।
ত্রিকলঃ ষট্‌কলো বাত্র স্তোভঃ স্যান্মুনিসংমতঃ ॥
প্রস্তাবাদীনি সপ্তাপি সামাঙ্গান্যত্র চাবদন্।
যথাশোভং বিদারী চ বর্ণাশ্চ রচয়েদিহ ॥[৪৯]

অনুষ্টুপছন্দ আটটি অক্ষরপাদযুক্ত, জগতী বারোটি অক্ষরপাদযুক্ত। অনুষ্টুভ থেকে আরম্ভ ক'রে জগতীর বারোটি অক্ষর পর্যন্ত বৈদিক সংস্কৃতে বা লৌকিক প্রাকৃতভাষায় ঋক্ গান করা হ'ত। এক একটি কলায় এক একটি অক্ষর যোজনা ক'রে আটচল্লিশটি কলার কতকগুলি বৃত্তি ও অক্ষর দিয়ে ও অবশিষ্ট স্তোভাক্ষর দিয়ে ঋক্‌গানের পাদপূরণ করা হ'ত। ওঙ্কার ও হকার ব্যঞ্জনস্বরের সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে যে স্তোভের সৃষ্টি হ'ত তাদের তিনটি বা ছ'টি কলা (কাল) পর্যন্ত গান করা হ'ত। প্রস্তাব, উদ্‌গীথ, প্রতিহার, উপদ্রব, নিধন, হিংকার ও হুংকার এই সাতটি সামের অঙ্গ। এদের স্তোভও বলে। ইচ্ছানুযায়ী বর্ণ রচনা ক'রে ঋক্ গান করা হ'ত। আর 'সাম' হ'ল,

স্তোভভঙ্গী বিজানীয়াৎ সাম্নো বৈদিকসামবৎ ॥
ব্রহ্মণা চ পুরা গীতং প্রস্তাবোদ্‌গীথকৌ তথা।
প্রতিহারোপদ্রবৌ চ নিধনং পঞ্চমং মতম্ ॥
ততো হিংকার ওঙ্কারঃ সপ্তাঙ্গানীতি তত্র তু।
উদ্‌গ্রাহঃ স্যাদনুদ্‌গ্রাহঃ সংবোধো ধ্রুবকস্তথা ॥
আভোগশ্চেতি পঞ্চাণামাখ্যানামভিধাঃ ক্রমাৎ।
হিংকারোংকারয়োস্তত্র কলাপূরকতা মতা ॥

৪৯। সঙ্গীত-রত্নাকর, তালাধ্যায় ৪।২২৩-২২৭

গায়ত্রীপ্রভৃতিচ্ছন্দঃ সংকৃত্যন্তমিহেষ্যতে।
ঋগ্‌ব্যূঢ়মিতি সাম্নোক্তং গন্থে ষণ্ণাবতিঃ কলাঃ॥
একাক্ষরাঃ সামগানে তদর্ধমপরে জগুঃ।
অত্রাপি মন্ত্রস্তোভানামৃচাং চ ত্রিকলাদিকম্॥

বৈদিক সামগান ও বৈদিকোত্তর সামগীতি ঠিক এক নয়। গাথা, স্তোভ, ঋক্ তথা গাথাগীতি, স্তোভগীতি, ঋক্‌গীতি প্রভৃতির কথাও তাই। তবে বৈদিকের অনুকরণ বা অনুসরণ ক'রেই এ'সকল গীতির সৃষ্টি হয়েছিল। বৈদিকোত্তর সামগীতির প্রসঙ্গে কল্লিনাথ বলেছেন: "সাম্নঃ সামাখ্যগীতস্য বৈদিক-সামবৎ ঋগাদিবাক্যবিশেষস্য গীতবৎ। যথোক্তম্—'গীতিষু সামাখ্যা' * * ব্রহ্মণা চ পুরা গীতমিত্যত্র সামেত্যধ্যাহর্তব্যম্"। বৈদিক সামগানের (অন্ততঃ ঔপনিষদিক যুগে তো বটেই) প্রস্তাব, উদ্‌গীথ, প্রতিহার, উপদ্রব ও নিধন এই পাঁচটি অঙ্গ বৈদিকোত্তর সামগীতির উদ্‌গ্রাহ, অনুদ্‌গ্রাহ, সম্বন্ধ, ধ্রুবক ও আভোগ ধাতু-রূপে সংজ্ঞা লাভ করেছিল। সময়ের পূরক হিসাবে হিংকার প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার হত। সামগীতিতে গায়ত্রী থেকে আরম্ভ ক'রে সংকৃতি পর্যন্ত ছন্দগুলির[৫০] প্রয়োগ ছিল। সামগীতির গানে এক থেকে ছিয়ানব্বুইটি কলার সমাবেশ থাকত। অনেকে সামগীতিতে অর্ধ-আটচল্লিশটি কলা স্বীকার করেন। স্তোভা-ক্ষরের ব্যবহার তো থাকতই। রামায়ণে উল্লেখ আছে গাথা প্রভৃতি গীতি-গায়কেরা স্বরের লক্ষণ, পাদ, অক্ষর, সমাস, ছন্দ, কলা, মাত্রা প্রভৃতিতে বিশেষজ্ঞ ছিলেন,

স্বরাণাং লক্ষণজ্ঞাংশ্চ উৎসুকান্ দ্বিজসত্তমান্॥
লক্ষণজ্ঞাংশ্চ গান্ধর্বান্নৈগমাংশ্চ বিশেষতঃ।
পাদাক্ষরসমাসজ্ঞাং শ্ছন্দঃসু পরিনিষ্ঠিতান্॥
কলামাত্রা বিশেষজ্ঞা * * *।[৫১]

৫০। ছন্দগুলির নাম গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ, জগতী, অতিজগতী, শক্করী, সাতিপূর্বা, অষ্ট্যত্যষ্টী, ধৃতি, অতিধৃতি, কৃতি, প্রকৃতি, আকৃতি, নিকৃতি ও সংকৃতি। সিংহভূপাল তাঁর 'সুধাকর'-টীকায় উল্লেখ করেছেন—

গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুপ্ চ বৃহতী পঙ্‌ক্তিরেব চ।
ত্রিষ্টুপ্ চ জগতী-চৈব তথাতিজগতী মতা।
শক্করী সাতিপূর্বা স্যাদষ্ট্যত্যষ্টী ততঃ স্মৃতে।
ধৃতিশ্চাতিধৃতিশ্চৈব কৃতিঃ প্রকৃতিরাকৃতিঃ।
বিকৃতিঃ সংকৃতিশ্চৈব"। ইতি।

৫১। রামায়ণ, উত্তরাকাণ্ড ৯৪।৪-১১

মহাভারতেও উল্লেখ আছে : "শিক্ষাক্ষর বিশেষজ্ঞ" (২।৫।১০)। মোটকথা বৈদিকোত্তর গান্ধর্ব গাথা, ঋক্, স্তোভ, স্তোম, সাম, পাণিকা, প্রভৃতি গীতি-রূপের মাধ্যমে আমরা রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে প্রচলিত গীতিরূপের ও তার প্রকাশভঙ্গির কিছুটা পরিচয় অবশ্যই পাই, আর ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে একথাও আমরা জানতে পারি যে বর্তমান মার্গপ্রকৃতিসম্পন্ন দেশীগানে ব্যবহৃত রাগাদির স্বররূপ বা তাদের সুরের নক্সার মতো তখনকার গান্ধর্বগানের একটি সুরের নক্সাও (কাঠামো) অবশ্যই ছিল ও তা মানুষের চিত্তকে রঞ্জিত ক'রে আনন্দ দান করতো। রঞ্জনাশক্তিবিশিষ্ট স্বররূপ তথা সুরই তো রাগের রস ও ভাবময় মূর্তি।

রামায়ণে গান্ধর্বগানের প্রসঙ্গে অনেক জায়গায় 'পাণিবাদকাঃ', 'পাণিধ্বনিকা', 'পাণিস্বনিনঃ' প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ আছে। গানের সঙ্গে করতালির (হাততালি) প্রচলন বিশেষ ক'রে সূত, মাগধ প্রভৃতি স্তাবক ও ভাটশ্রেণীর গায়কদের ভেতর ছিল। মহাভারতের অনুশাসনপর্বে উল্লেখ পাওয়া যায় গানে বিভিন্ন রকম তালের প্রচলন ছিল ও হাতে তালি দিয়ে তাল রক্ষা করা হ'ত। তাল দেওয়ার রীতি সম্বন্ধে মহাভারতকার বলেছেন,

পাণিতালসতালৈশ্চ শম্যাতালৈঃ সমৈস্তথা।
সম্প্রহৃষ্টৈঃ প্রনৃত্যাদ্ভিঃ শর্বস্তত্র নিষেব্যতে ॥[৫২]

শার্ঙ্গদেব বলেছেন নৃত্য, গীত ও বাদ্য এ' তিনটি ললিতকলা তালের ওপর প্রতিষ্ঠিত : "গীতং বাদ্যং তথা নৃত্তং যতস্তালে প্রতিষ্ঠিতম্"।[৫৩] গীত বা গানকে পরিমাপ করার জন্য যে কাল-পরিমাণের ব্যবহার হয় তাকে 'তাল' বলে।[৫৪] লঘু, গুরু, প্লুত, বিলম্বিত, মধ্য, দ্রুত প্রভৃতি ভেদে তালের পরিমাপ বিভিন্ন রকম। শব্দ করা বা না করা (তাল রক্ষা করা বা না-করা) গায়কের ইচ্ছাধীন। মার্গ ও দেশীভেদে তাল প্রধান দু'ভাগে বিভক্ত। মার্গতাল আবার নিঃশব্দ (নিঃশব্দক্রিয়া) ও সশব্দ (সশব্দক্রিয়া) ভেদে দু'রকম। নিঃশব্দ তালের নাম 'কলা'।[৫৫] নিঃশব্দ-তাল বা কলা আবাপ, নিষ্ক্রাম, বিক্ষেপ ও প্রবেশক ভেদে চার

৫২। মহাভারত, অনুশাসনপর্ব ২৫।১৯

এ'ছাড়া সভাপর্বে (৪।৪৪) আছে : "গীতবাদিত্রকুশলঃ শম্যাতালবিশারদাঃ" বা "শম্যাতালেষু কুশলাঃ" (২।৪।৪৬)। দ্রোণপর্বে (৬৯।১১) আছে : "বীণা ন সাধু বাদ্যন্তে শম্যাতালরবৈঃ সহ"।

৫৩। সঙ্গীত-রত্নাকর, তালাধ্যায় ১।২

৫৪। 'গীতাদেঃ মিতির্মাণং বিদধৎ কুর্বন্ কালঃ তাল ইত্যুচ্যতে।'—সিংহভূপাল

৫৫। 'নিঃশব্দক্রিয়া তু কলাসংজ্ঞয়েবোচ্যতে'।—কল্লিনাথ

রকম। সশব্দ-তাল ধ্রুব, শম্যা, তাল ও সন্নিপাত ভেদে চার রকম।[৫৬] সশব্দ ক্রিয়া বা সশব্দ-তাল 'পাত' শব্দের দ্বারা 'কলা' নামে পরিচিত।[৫৭] সশব্দ-তাল শম্যা বলতে দক্ষিণহস্তে তালি দেওয়া বোঝায়: "দক্ষিণহস্তেন তালিকোৎপাতনং শম্যা"। শম্যা বা দক্ষিণহস্তের তালি আবার লঘু গুরু প্রভৃতি ভেদে বিভিন্ন রকম।

ভরত নাট্যশাস্ত্রে তালের প্রসঙ্গে নিঃশব্দ ও সশব্দ তালের কথা উল্লেখ করেছেন: "দ্বিপ্রকারস্ত্বয়ং তালো নিঃশব্দঃ শব্দবাংস্তথা" (৩১।২৯)।[৫৮] শম্যা ও তালের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "শম্যা দক্ষিণহস্তঃ স্যাত্তালঃ পাতস্তু বামতঃ" (৩১।৩৮)। সুতরাং মহাভারতকার যে উল্লেখ করেছেন: "পাণিতাল সতালৈশ্চ শম্যাতালৈঃ সমৈস্তথা", তার অর্থ বেশ পরিস্ফুট। এ'থেকে বোঝা যায়, রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ অনুযায়ী গান্ধর্বগানের অনুশীলন হ'ত ও এখনও সেই ধারা অক্ষুণ্ণ আছে।

মহাভারতে মঙ্গলগীতিরও উল্লেখ আছে। যেমন (ক) "সূতমাগধবন্দীনাং সংস্তবৈর্গীতমঙ্গলৈঃ" (দ্রোণপর্ব, ৫।৪১), (খ) "মঙ্গলানি চ গীতানি নাম্ন গান্তি পঠন্তি চ" (দ্রোণপর্ব, ৬৯।১১)। 'মঙ্গলগীতি' বল্‌তে সাধারণভাবে বুঝি কল্যাণ বা আশীর্বাদবাচক গান। রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে সম্ভবত এই অর্থের সার্থকতা নিয়ে মঙ্গলগান গীত হ'ত স্তাবক, ব্রাহ্মণ, বৈতালিক, সূত প্রভৃতিদের কণ্ঠে। শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকরে নিবদ্ধ প্রবন্ধগানের পর্যায়ে মঙ্গল, ধবলাদি গীতির উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন,

৫৬। মার্গদেশীগতত্বেন তত্রাদ্যস্য ক্রিয়া দ্বিধা।
নিঃশব্দা শব্দযুক্তা চ নিঃশব্দা তু কলোচ্যতে॥
আবাপোঽথ নিষ্ক্রামো বিক্ষেপশ্চ প্রবেশকঃ।
নিঃশব্দেতি চতুর্ধোক্তা সশব্দাপি চতুর্বিধা॥
ধ্রুবঃ শম্যা ততস্তালঃ সংনিপাত ইতিরিতা।
—সঙ্গীত-রত্নাকর, তালাধ্যায় ৫।৪-৬

৫৭। সা সশব্দক্রিয়া পাতশব্দেন কলাশব্দেন বোচ্যতে। —সিংহভূপাল
নাট্যশাস্ত্রকার ভরত 'কলা' অর্থে বলেছেন মন্দ-লয়: "মন্দোঽথ লয়স্তৎপ্রমাণকলা ভবেৎ" (৩১।২)। কলা তিন রকম ('ত্রিভিধা কলা') এবং কলা ও কালের প্রমাণে 'তাল' সৃষ্টি হয়: "কলাকালপ্রমাণেন তাল ইত্যভিধীয়তে" (৩১।१)।

৫৮। অত্রাবাপোঽথ নিষ্ক্রামো বিক্ষেপশ্চ প্রবেশকঃ।
চতুর্বিকল্পং ইত্যেবং নিঃশব্দঃ কথিতো বুধৈঃ।
শম্যাতালো ধ্রুবশ্চেতি সন্নিপাতস্তথা পরঃ॥
—নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ৩১।৩০-৩১

কৈশিক্যাং বোট্টরাগে বা মঙ্গলং মঙ্গলৈঃ পদৈঃ।
বিলম্বিতলয়ে গেয়ং মঙ্গলছন্দসাথবা ॥[৫৯]

বেশীর ভাগ সময় শিবের স্তুতির উদ্দেশ্যে এই মঙ্গলগান গাওয়া হ'ত। মহাভারতে সূত, মাগধ ও বন্দীদের মুখে মঙ্গলগান ধ্বনিত হ'ত প্রজাপ্রতিপালক রাজাদের ও বীরশ্রেষ্ঠদের কল্যাণ ও বিজয়গাথা ঘোষণার জন্য। এই গীতমঙ্গল বা মঙ্গলগীতির বিশদ আলোচনা আমরা পরে করব।

মহাভারতের যুগে গানের সঙ্গে বাদ্যের ও নৃত্যের সমাবেশ থাকত। আবার গান ছাড়াও বাদ্য ও নৃত্য এ'দুটির অনুশীলন দেখা যায়। বাদ্যযন্ত্র হিসাবে সপ্ততন্ত্রীবীণা, বেণু, মৃদঙ্গ, শঙ্খ, ঝর্ঝর, আনক, গোমুখ, আড়ম্বর, পণব, তুরী, ভেরী, পুষ্কর, ঘণ্টা, গজঘণ্টা, বল্লকী, নুপুর, শিঞ্জির, পটাহ, বারিজ, দুন্দুভি, দেবদুন্দুভি প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন,

(ক) দেবদুন্দুভয়ো নেদুঃ ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।[৬০]
(খ) বীণেয়ং মধুররাবা গান্ধারস্বরমূর্ছিতা।[৬১]
(গ) মধুরেণ স গীতেন বীণাশব্দেন চানঘ।[৬২]
(ঘ) বেণুবীণামৃদঙ্গানাং মনোজ্ঞানাং চ সর্বশঃ।[৬৩]
(ঙ) ভেরীশঙ্খমৃদঙ্গাংস্তে ঝর্ঝরানকগোমুখান্।[৬৪]
(চ) ভেরীপণবশঙ্খানাং মৃদঙ্গানাং চ নিঃস্বনঃ।[৬৫]
(ছ) ভেরীমৃদঙ্গপণবৈঃ শঙ্খবৈণবনিঃস্বনৈঃ।[৬৬]
(জ) ততো ভেরীশ্চ শঙ্খাংশ্চ শতশশ্চৈব পুষ্করান্।[৬৭]

৫৯। সঙ্গীত-রত্নাকর ৪।৩০৩
৬০। মহাভারত, আদিপর্ব
৬১। " " ১৯১।৫
৬২। " " ২০৭।৩৩
৬৩। " " ২১৪।৯
৬৪। " সৌপ্তিকপর্ব, ৮।৩২
৬৫। " আরণ্যপর্ব, ১৩২।১৯
৬৬। " উদ্যোগপর্ব, ৭৮।১৬
৬৭। " " ১৪২।২৭

(ঝ) ভেরীমৃদঙ্গপটহান্ নাদয়ন্তশ্চ বারিজান্।[৬৮]

(ঞ) হ্লাদয়শ্চ গজঘণ্টানাং শঙ্খানাং * *।[৬৯]

(ট) সপ্ততন্তুন্ বিতন্বানা হ্যুপাসন্তি যাজকাঃ।[৭০]

(ঠ) মুরজানাং মহাশব্দং * *।[৭১]

(ড) বীণাপণববেণুনাং স্বনশ্চাপি মনোরমঃ।[৭২]

(ঢ) বীণানাং বল্লকীনাং চ নূপুরাণাং চ শিঞ্জিতৈঃ।[৭৩]

রামায়ণ ও মহাভারতে 'বাদিত্র' শব্দের দ্বারা তত, শুষির, আনদ্ধ বা বিতত ও ঘন এই চার রকম বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ করা হয়েছে। বীণা ও বেণুর উল্লেখ প্রায় পাশাপাশি পাওয়া যায়ঃ "বেণুবীণামৃদঙ্গানাম্"। বীণা ও বেণু পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র। বেণু ও বংশ একার্থক, কিন্তু পরবর্তীকালে ধাতু প্রভৃতি উপাদানভেদে সমশ্রেণী হিসাবে পরিচিত থাকলেও দু'টির অবয়ব ও গঠনে ক্রমশঃ পার্থক্য দেখা দিয়েছিল। ফুৎকার (ফুঁ দিয়ে বাজানোর) বাদ্যযন্ত্রগুলির নাম ছিল বাঁশী। গোড়ার দিকে বাঁশের পাব থেকেই বাঁশী (বেণু) তৈরী হ'ত। পরে বেণু বা বাঁশী তৈরী করা ও বাজাবার রীতিতে বৈচিত্র্য দেখা দিল। ছিদ্র-সংখ্যায়ও অনেক সময় বিভিন্নতা সৃষ্টি হ'ল ও তার জন্য একই বেণু বা বাঁশীর আকার বা দীর্ঘতাও ভিন্ন ভিন্ন হয়েছিল। পরে বাঁশের পরিবর্তে খদির, রক্তচন্দন প্রভৃতি কাঠে এবং লোহা, রূপা, তামা প্রভৃতি ধাতুতে বাঁশী তৈরী হ'তে আরম্ভ হয়। এমন কি হাতির দাঁত ও স্ফটিক প্রভৃতি মূল্যমান উপাদানেও বাঁশী তৈরী হ'তে লাগল। বেণু বা বাঁশীর দীর্ঘতা আট বা নয় অঙ্গুলি থেকে এক হাত বা তার বেশী হ'ত। এখনো প্রায় তাই হয়। মুরলীও বংশীশ্রেণীভুক্ত। শ্রীকৃষ্ণের হাতে বাঁশীর নাম ছিল 'মুরলী'। তবে মুরলীর ছিদ্রসংখ্যা ও গঠন কিছুটা ভিন্ন রকমের। মুরলীর নীচে (মুখ থেকে তিন অঙ্গুলি) একটি ছিদ্র থাকে, তার নাম ফুৎকার-রন্ধ্র। ঐ ছিদ্রের নীচে প্রায় চার অঙ্গুলি (বা তার বেশী) নীচে ছ'টি ছিদ্র থাকে, তাদের তাররন্ধ্র বলে। উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির

৬৮। " ভীষ্মপর্ব, ১৫।১৭

৬৯। " দ্রোণপর্ব, ৭৫।৩০

৭০। " " ৭৭।১৮

৭১। " কর্ণপর্ব ৪১।১৪

৭২। " শান্তিপর্ব, ৪৮।৫

৭৩। " অনুশাসনপর্ব, ৬৫।৫১

মাঝখানে টিপ দিয়ে ধরে বাম হাতের তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলি দিয়ে মুরলীর শিরোভাগের তিনটি ছিদ্রের মুখে ও ডান হাতের তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকায় নীচের তিনটি ছিদ্রের ওপর বাজাবার নিয়ম। এই বাঁশীই ইউরোপীয় ফ্লুটশ্রেণীভুক্ত। কিন্তু বেণু সর্বদাই বাঁশের পাব থেকে তৈরী হয়। বেণু বাঁশী থেকে কিছুটা দীর্ঘ হয়। বেণুর সামনের দিকে ছ'টি ও পেছনের দিকে একটি ছিদ্র থাকে। বৈদিক সাহিত্যে কেন, প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-উপত্যকার ধ্বংসস্তূপ থেকেও বেণু ও বীণার নিদর্শন পাওয়া গেছে।

মহাভারতের যুগে বীণা কত রকমের ছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না। রামায়ণে বিপঞ্চীবীণার উল্লেখ আছে ('বিপঞ্চীং পরিগৃহ্যানো'—সুন্দরকাণ্ড, ১০।৪০-৪১)। বিপঞ্চীতে ন'টি তন্ত্রী (তার) থাকত। মহাভারতে বিপঞ্চীবীণার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, তবে "সপ্ততন্তুন্ বিতন্বানা" (দ্রোণপর্ব ৭৭।১৮) শ্লোকাংশ থেকে সাতটি তন্তুযুক্ত চিত্রাবীণার কথাই বোঝা যায়।[৭৪] এই চিত্রাবীণাই মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে 'সেতার' বাদ্যযন্ত্র-রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল বলে মনে হয়। বেশীর ভাগ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীদেরও তাই অভিমত।

মহাভারতের আদিপর্বে (১৯১।৫) আছে: "বীণেয়ং মধুরারাবা গান্ধার-স্বরমূর্ছিতা"। মহাভারতে ষড়্জাদি গ্রামের কোন স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না, অথচ ষড়্জাদি স্বরসপ্তকের উল্লেখ আছে (আশ্বমেধিকপর্ব ৫৩।৫৩)। আদিপর্বের 'গান্ধারস্বরমূর্ছিতা' শব্দটির অর্থ দু'রকমভাবে করা যেতে পারে: (১) গান্ধার-স্বরের মূর্ছনা ও (২) গান্ধারগ্রামের স্বর-মূর্ছনা। মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবংশে উল্লেখ আছে: "আগান্ধারগ্রামরাগম্"। 'আগান্ধার' বল্‌তে গান্ধারগ্রাম পর্যন্ত; অর্থাৎ গান্ধার-শব্দটি গান্ধারগ্রামেরই দ্যোতক বা প্রকাশক। কাজেই 'গান্ধারস্বরমূর্ছিতা' শব্দটির অর্থ উপরিউক্ত দ্বিতীয় প্রকারে অনুমান করা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে রামায়ণ-মহাভারতের সময়কে গান্ধর্বগানের স্বর্ণযুগ বলা যায়। তখন ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধার এ'তিনটি গ্রামের অনুশীলনই অব্যাহত ছিল। কাজেই গান্ধারগ্রামের স্বর-মূর্ছনা বলতে নন্দা, বিশাখা, সুমুখী, চিত্রা, চিত্রবতী, সুখা ও আলাপা মূর্ছনাগুলিকেও বোঝাতে পারে। অথবা যদি গান্ধারস্বরের

৭৪। চিত্রাবীণার বর্ণনা নাট্যশাস্ত্রে পাওয়া যায়,

সপ্ততন্ত্রী ভবেচ্চিত্রা বিপঞ্চী নবতন্ত্রিকা।
বিপঞ্চী কোণবাদ্যা স্যাৎ চিত্রা চাঙ্গুলিবাদনা॥

—নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ২৯।১১৪

মূর্ছনা অর্থ করা যায় তবে নারদীশিক্ষার তথা নারদের মতে গান্ধারের মূর্ছনা হয় অশ্বক্রান্তা: "অশ্বক্রান্তা তু গান্ধারে তৃতীয়া মূর্ছনা স্মৃতা" (৩) আর ভরতের মতে হয় উত্তরায়তা: "আদ্যা হ্যুত্তরমন্দ্রা স্যাদ্ রজনী চোত্তরায়তা" (২৮।২৭)। শার্ঙ্গদেব কেন, ভরতের পরবর্তী শাস্ত্রী ও শিল্পী সকলেই ভরতের মতকে অনুসরণ করেছেন। সিংহভূপাল অশ্বক্রান্তার স্বর-সপ্তকের উদাহরণ দিয়েছেন: গ্ ম্ প্ ধ্ নি্ স রি এবং উত্তরায়তার—ধ্ নি্ স রি গ ম প। অবশ্য এই স্বর-বিস্তার হ'ল ষড়্জগ্রামের অনুযায়ী। মধ্যমগ্রামের মূর্ছনা-সংস্থান ও তাদের নাম আবার আলাদা। তবে ষড়্জই আদি ও প্রধান গ্রাম: "ষড়্জগ্রামস্ত্রিষুত্তমঃ" বা "ষড়্জঃ প্রধানমাদ্যত্বাদ্" (সঙ্গীত-রত্নাকর ১।৪৬)। বেশীর ভাগ অনুশীলকদের মতে বৈদিক সামগান ষড়্জগ্রামেই প্রধানভাবে গীত হ'ত। টীকাকার মল্লিনাথ উল্লেখ করেছেন গান্ধারগ্রাম নির্দিষ্ট ছিল দেবযোনি গন্ধর্বদের জন্য ও সাধারণ মনুষ্যসমাজে ষড়্জ ও মধ্যমগ্রাম দুটিরই প্রচলন ছিল।[১৫]

বীণা ও বেণুর পর মহাভারতে মৃদঙ্গ ও পুষ্কর বাদ্যযন্ত্রের প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য। মৃদঙ্গ আতোদ্য বা আনদ্ধযন্ত্রের শ্রেণীভুক্ত। পরবর্তীকালের ঢোল, ঢোলক, তবল (তল-মৃদঙ্গ), খোল প্রভৃতি আনদ্ধগোষ্ঠীভুক্ত। মৃদঙ্গের সৃষ্টি সম্বন্ধে বিভিন্ন রকমের পৌরাণিক আখ্যান আছে। যেমন মহাদেব ত্রিপুরাসুরকে বধ করার পর ব্রহ্মা শোণিতাক্ত মৃত্তিকা নিয়ে ও চর্মের আচ্ছাদন দিয়ে যে বাদ্যযন্ত্র তৈরী করেছিলেন তার নামই মৃদঙ্গ। মোটকথা মৃত্তিকা বা মাটি থেকে তৈরী বলেই বাদ্যযন্ত্রের নাম মৃদঙ্গ (মৃদ্+অঙ্গ): "মৃৎ মৃন্ময়ং অঙ্গং যস্য স মৃদঙ্গঃ"। সঙ্গীত-রত্নাবলীকার বলেছেন: "মৃত্তিকানির্মিতশ্চাপি মৃদঙ্গঃ পরিকীর্তিতঃ"। মৃদঙ্গ যে অতীব প্রাচীন আনদ্ধজাতীয় বাদ্যযন্ত্র তা প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-সভ্যতা থেকে আরম্ভ ক'রে রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, বিভিন্ন পুরাণ ও ক্ল্যাসিক্যাল কাব্যগ্রন্থগুলি থেকে প্রমাণ হয়। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর ভাষ্যকার বিনয়-বিজয়োপাধ্যায় জৈন ভদ্রবাহুর 'কল্পসূত্র' গ্রন্থের আলোচনা-প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন: "পণবো মৃৎপটহঃ। মুরজো মর্দলঃ। মৃদঙ্গ মৃন্ময়ঃ স এব"।[১৬]

১৫। ষড়্জমধ্যমনামানৌ গ্রামৌ গায়ন্তি মানবাঃ।
ন তু গান্ধারনামানং স লভ্যো দেবযোনিভিঃ॥

১৬। Vide (a) Bhadrabāhu: *Kalpasūtra* (Jaina Pustakoddhāra Fund Series, No. 61); (b) *Journal of the Music Academy*, Madras, Vol. IX, p. 41.

শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকরে মৃদঙ্গ অর্থে (তিনটি) পুষ্কর বলেছেন,

নিগদন্তি মৃদঙ্গং তং মর্দলং মুরজং তথা।
প্রোক্তং মৃদঙ্গশব্দেন মুনিনা পুষ্করত্রয়ম্ ॥[১৭]

মর্দল ও মৃদঙ্গের নির্মাণপ্রণালী সম্বন্ধেও শার্ঙ্গদেব বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করেছেন। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত "আতোদ্যানাং প্রবক্ষ্যামি" (কাশী সং ৩৩।২) ও "পৌষ্করাণাং প্রবক্ষ্যামি" (৩৩।৪) আলোচনা প্রসঙ্গে মৃদঙ্গ ও পুষ্কর উভয়ের কথাই উল্লেখ করেছেন। তা ছাড়া উল্লেখযোগ্য যে শার্ঙ্গদেব বলেছেন: "প্রোক্তং মৃদঙ্গশব্দেন মুনিনা পুষ্করত্রয়ম্", অর্থাৎ মৃদঙ্গ শব্দের দ্বারা মুনি ভরত তিনটি পুষ্করের কথা বলেছেন, কিন্তু তা থেকে একথা বুঝব না যে মৃদঙ্গ ও পুষ্কর অভিন্ন আতোদ্য-বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ঋষি ভরত উল্লেখ করেছেন স্বাতি জলাশয়ের সলিলধারার গম্ভীর শব্দের অনুকরণ ক'রে নদীকূল থেকে মৃত্তিকা আহরণ করেছিলেন[১৮] এবং তা দিয়ে মৃদঙ্গ ও পুষ্কর তৈরী করেন: "গত্বা সৃষ্টং মৃদঙ্গানাং পুষ্করানসৃজত্ততঃ" (কাশী সং ৩৩।১০)। সেরকম দেবতাদের দুন্দুভির অনুকরণে তিনি আবার মুরজ সৃষ্টি করেন: "দেবানাং দুন্দুভিং দৃষ্ট্বা চকার মুরজং ততঃ" (৩৩।১১)। ভরত পুষ্করের গঠনপ্রণালীর পরিচয় দিয়েছেন ৩৩শ অধ্যায়ের ৩৭-৩৯ শ্লোকগুলিতে। তিনটি পুষ্কর সম, বিষম ও সম-বিষম ভেদে তিন রকম আকৃতিবিশিষ্ট ছিল। মায়ূরী, অর্ধমায়ূরী ও কর্মারবী (কার্মারবী ?) এই তিন রকম মার্জনা তিনটি পুষ্করে ব্যবহৃত হ'ত। 'মার্জনা' অর্থে স্বর-স্থাপনা।

১৭। সঙ্গীত-রত্নাকর, বাদ্যাধ্যায় ৬।১০২৪

১৮। অনধ্যায়ে কদাচিত্তু স্বাতির্বৈ দুর্দিনে দিনে।
জলাশয়ং জগামাথ সলিলানয়নং প্রতি ॥
* * * *
ধারাভির্মহতীভিশ্চ কর্তুমেকার্ণবং জগৎ ॥
পতন্তীভিশ্চ ধারাভির্বায়ুবেগাজ্জলাশয়ে।
পুষ্করীণাং কলরবঃ পত্রিনামভবত্তদা।
তেষাং ধীরং কলং শব্দং নিশম্য সহসা মুনিঃ।
আশ্চর্যমিতি সম্প্রাপ্তং অবধারিতবান্ স্বয়ম্ ॥
* * * *
গম্ভীরমধুরং হৃদ্যমাজগামাশ্রমং ততঃ।
গত্বা সৃষ্টং মৃদঙ্গানাং পুষ্করানসৃজত্ততঃ ॥
—নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ৩৩।৫-১০

ইংরাজীতে একে tunning process বলা যেতে পারে। আজকাল তানপুরার (তম্বুরা, তুম্বুরা, তুম্বরবীণা বা তুম্বুরুবীণা) চারটি তারে যেমন ষড়্জাদি স্বরের স্থাপনা করা হয়, তেমনি খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রথমে তিনটি পুষ্করে লৌকিক সাতস্বর-স্থাপনের (বাঁধার) নিয়ম ছিল। এ'সম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্র আলোচনার সময় আমরা বিশদভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

মৃদঙ্গ ও পুষ্কর উভয়ই মৃত্তিকা দিয়ে তৈরী হ'ত।[৭৯] কালে খদির, রক্তচন্দন, গাম্ভার, পনস প্রভৃতি কাঠে তৈরী হ'তে থাকে। ঠিক কখন্ থেকে মৃদঙ্গ মৃত্তিকার পরিবর্তে কাঠে তৈরী হ'তে আরম্ভ হয় তা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা কঠিন। তবে ভরত (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) ও শার্ঙ্গদেবের (খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দী) মাঝামাঝি সময়ে যে এই বিবর্তন দেখা দিয়েছিল একথা মনে করা যেতে পারে। সঙ্গীত-রত্নাকরে আমরা উল্লেখ দেখি: "রক্তচন্দনজো যদ্বা খাদিরোঽন্যৈরয়ং মতঃ"। মৃদঙ্গ সাধারণত দৈর্ঘ্যে দেড় হাত ও যন্ত্রের নির্মাণোপযোগী কাঠের দল দেড় আঙুল-পরিমিত হয়। মৃদঙ্গের বামমুখ বারো বা তেরো অঙ্গুলি-ব্যাসবিশিষ্ট ও দক্ষিণমুখ বামের চেয়ে এক বা অর্ধ-অঙ্গুলি কম হয়। শার্ঙ্গদেবও উল্লেখ করেছেন,

ত্রিংশদঙ্গুলদৈর্ঘ্যশ্চ পিণ্ডে ত্র্যঙ্গুলসংমিতঃ ॥
এতস্য বামং বদনং দ্বাদশাঙ্গুলসংমিতম্ ॥
দক্ষিণং তু মিতং সার্ধৈরেকাদশভিরঙ্গুলৈঃ ॥[৮০]

পুষ্কর তিনটি তিন রকমের হ'ত, আর দুটি ঋজুভাবে (দাঁড় করিয়ে) ও একটি মাটিতে শয়ানভাবে রেখে দু'হাত বাজানো হ'ত। মৃদঙ্গশ্রেণীর আতোদ্য-বাদ্যযন্ত্র পুষ্করের অনুশীলন শার্ঙ্গদেবের সময় থেকেই মনে হয় ধীরে ধীরে লোপ পেতে আরম্ভ হয়, কেননা তিনি উল্লেখ করেছেন: অত্যন্ত অব্যবহার্য হওয়ায় তিনি আর এ'সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে কিছু উল্লেখ করলেন না: "অত্যন্তব্যবহার্যত্বান্নিঃ-শঙ্কো ন তনোতি তৎ" (৬।১০২৮)।

নৃত্যের কথা মহাভারতে অনেকবারই উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু তার শ্রেণী, রূপ বা কোন পদ্ধতির কথা আলোচিত হয়নি। অথচ "গায়নৃত্যং বহুশো" (আদি ৬০।২৫), "ননৃতুর্নর্তকাশ্চৈব জগুর্গীতানি গায়কাঃ" (আদি, ২০৬।৪),

৭৯। Vide Dr. Raghavan: *Why is the Mridanga so-called* (—The Journal of the Music Academy, Madras, Vol. XXIV, pp. 135-136).

৮০। সঙ্গীত-রত্নাকর, বাদ্যাধ্যায় ১০৩১-৩২

"নৃত্যবাদিত্রগীতৈশ্চ ভাবৈশ্চ বিবিধৈরপি" (সভা, ৫।২৪), নৃত্তগীতং চ হাস্যং লাস্যং চ সর্বশঃ" (সভা, ৮।৩৬), "নৃত্তং গীতং বাদ্যং চ" (আরণ্য, ৪০।৬), "নৃত্যামি গায়ামি" (বিরাট, ২।৮) প্রভৃতি। সভাপর্বে "নৃত্যবাদিত্রগীতৈশ্চ ভাবৈশ্চ বিবিধৈরপি, রময়ন্তি মহাত্মানং" শ্লোকটিতে 'বিবিধ ভাব সহ নৃত্যের দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রকে আনন্দ দান' কথাগুলি থেকে বিশেষভাবে বোঝা যায় নাট্যশাস্ত্রে যে বিবিধ রস ও ভাবের উল্লেখ আছে সে সকল রামায়ণ ও মহাভারতের সমাজে অব্যাহত ছিল। 'নৃত্তগীতং চ হাস্যং লাস্যং'—এই হাস্য, লাস্য, কটাক্ষ, অঙ্গহার, মুদ্রার সমাবেশই নৃত্যের রূপ ও মাধুর্যকে পরিস্ফুট করে। কাজেই মহাভারতকার নৃত্যের নির্দিষ্ট কোন রূপ, নাম বা ভঙ্গির উল্লেখ না করলেও আমরা অনুমান করতে পারি যে খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভরত যখন খৃষ্টপূর্বাব্দে (আনুমানিক ৬০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ) ব্রহ্মা (ব্রহ্মাভরত) ও সদাশিব (সদাশিবভরত) রচিত নাট্যগ্রন্থের অনুসরণ ক'রে তাঁর অভিনব নাট্যশাস্ত্রে গীত, বাদ্য, নৃত্য ও অভিনয়ের প্রসঙ্গে বিভিন্ন নৃত্যের লক্ষণ, অঙ্গহার, রসবিকল্প, ভাবব্যঞ্জনা, অভিনয়ের উপাঙ্গবিধান, হস্তাভিনয়, সংযুত ও অসংযুত হস্ত, নৃত্যসমাশ্রয় হস্ত, শরীরাভিনয় চারীবিধান, মণ্ডল, গতিপ্রচার প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন, তখন মনে করা যেতে পারে যে রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে নৃত্যে ও অভিনয়ে এসকল উপাদানের ব্যবহার ছিল এবং তখনকার নর্তক, নর্তকী ও অভিনেতাদের নৃত্য ও অভিনয়-প্রচেষ্টায় সেগুলি প্রকাশ পেত।

এ'সকল ছাড়া কাহিনীর প্রসঙ্গে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের কথা মহাভারতের বিভিন্ন পর্বে বা অধ্যায়েই পাওয়া যায়। যেমন, বৃহস্পতির পুত্র কচ নৃত্য, গীত ও বাদ্য দ্বারা প্রাপ্তযৌবনা দেবযানীর মন হরণ করেছিলেন। দেবযানীও নৃত্যপরায়ণা ছিলেন। তিনি নির্জন স্থানে কচের কাছে গান শিক্ষা করতেন, গান করতেন ও তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করতেন। পাঞ্চালরাজের সভায় নৃত্য ও গীতের বিশেষ সমাদর ছিল। খাণ্ডবদাহ-পর্যায়ে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন তাঁদের বন্ধু-বান্ধব ও পুরনারীদের নিয়ে যমুনায় জলবিহারের সময় যমুনার তীরে খাণ্ডববনে পান-ভোজন, নৃত্য গীত প্রভৃতি করেছিলেন। বনপর্বে অর্জুন অমরাবতীতে উপনীত হ'লে গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ তাঁকে সম্বর্ধনা জানালেন। তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্বরথীরা বীণা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র-সহযোগে গান করতে লাগলেন, আর ঘৃতাচী, মেনকা, রম্ভা, উর্বশী প্রভৃতি অপ্সরারা নৃত্য করলেন। অর্জুন পাঁচ বছর অমরাবতীতে অতিবাহিত করেছিলেন। ইন্দ্রের আদেশে বিশ্বাবসুর পুত্র

চিত্রসেন তাঁকে নৃত্য, গীত ও বাদ্য শিক্ষা দিয়েছিলেন। অজ্ঞাতবাসের সময় অর্জুন বৃহন্নলা এই ছদ্মনাম নিয়ে নপুংসক সাজে বিরাটরাজের কন্যা উত্তরা ও রাজপুর-নারীদের নৃত্য, গীত ও বীণাদি বাদ্যযন্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলেন। বৃহন্নলাবেশী অর্জুনের প্রসঙ্গে মহাভারতকার বিরাটপর্বে উল্লেখ করেছেন,

স তত্র রাজানমমিত্রহাঽব্রবীদ্
বৃহন্নলাঽহং নরদেব নর্তকী ॥[৮১]

*　*　*　*

নৃত্যামি গায়ামি চ বাদয়াম্যহং
প্রনর্তনে কৌশলনৈপুণ্যং মম।
তদুত্তরায়াঃ পরিধ্যস্ব নর্তনে।
ভবামি দেব্যা নরদেব নর্তকী ॥

বিরাট—

দদামি তে তং হি বরং বৃহন্নলে
সুতাং হি মে নর্তয় যাশ্চ তাদৃশী ॥

*　*　*

স শিক্ষয়ামাস চ গীতবাদিতং
সুতাং বিরাটস্য ধনঞ্জয়ঃ প্রভুঃ।
সখীশ্চ তস্য পরিচারিকা শুভাঃ
প্রেয়শ্চ তাসাং স বভূব পাণ্ডবঃ ॥

বৃহন্নলা—

নৃত্যং বা যদি বা গীতং বাদিত্রং বা পৃথগ্বিধম্।
তৎ করিষ্যামি ভদ্রং তে সারথ্যং তু কুতো মম ॥

এ' থেকে বোঝা যায়, মহাভারতের যুগে পুরুষদের মতো নারীদের ও এমন কি অসূর্য্যাম্পশ্যা অন্তঃপুরচারিণীদের পক্ষেও সঙ্গীত তথা নৃত্য, গীত ও বাদ্য নিষিদ্ধ ছিল না। তাছাড়া সামন্তরাজা ও সম্রাটদের দরবারে চারুশিল্প ও শিল্পীদের বিশেষ সম্মান ও সমাদর ছিল।

৮১। পাঠভেদ—'নর্তনং ভবামি দেহহং নরদেব নর্তনাম্'?

॥ হরিবংশে সঙ্গীত ॥

মহাভারতের পর খিল-হরিবংশে সঙ্গীতের উপাদান বড় কম নেই, বরং মহাভারতের চেয়ে অনেকাংশে বেশী ও সুস্পষ্ট। হরিবংশ-অংশটি মহাভারত রচনার পরে তার অঙ্গীভূত করা হয়, তাই হরিবংশের নাম 'খিল-হরিবংশ'। 'খিল' অর্থে পরিশিষ্ট। মহাভারতের আঠারটি অধ্যায় বা পর্ব ও হরিবংশের তিনটি পর্ব। মহাভারত ও হরিবংশ এ'দুটি মিলেই আসলে মহাভারতের বিরাট কলেবরকে সম্পূর্ণ করেছে। হরিবংশকে অনেকে পুরাণের শ্রেণীভুক্ত বলেন। অন্তত শ্রদ্ধেয় হপ্‌কিন্স[১] ও ডাঃ উণ্টারনিজ[২] তো বটেই। হরিবংশ সংকলিত হয় প্রায় ২০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে। ৭০৫ শকে জিনসেন হরিবংশের অনুযায়ী একটি জৈন-হরিবংশ সংকলন করেন ও তাতে পুরাণের অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে। হরিবংশ তথা হরিবংশপুরাণ সংকলন করেন ব্যাস-উপাধিধারী কোন মনীষী।

হরিবংশে প্রধানভাবে গান্ধর্বগানের বর্ণনা থাকলেও সামগানের প্রসঙ্গও বাদ যায় নি। বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে, অভিষেকাদি পুণ্য-রাজকর্মে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান হ'ত ও সে সকল অনুষ্ঠানে সামগানের আয়োজন থাকত। হরিবংশকার উল্লেখ করেছেন,

গানপ্রভাষং সঞ্চক্রে গন্ধর্বাণামশেষতঃ।
অনেষাং চৈব বিপ্রাণাং গানং ব্রহ্ম-প্রভাষিতম্ ॥[৩]

এখানে বৈদিক সামগান ও লৌকিক গান্ধর্বগানের কথাই বলা হয়েছে। টীকাকার নীলকণ্ঠ উল্লেখ করেছেন: "গানং প্রভাষ্যতে ব্যুৎপাদ্যতেঽনেনেতি গানপ্রভাষং গান্ধর্বশাস্ত্রং, তথা ব্রহ্মণি বেদে প্রভাষিতং গানং সামাখ্যম্"। অবশ্য বৈদিক ও লৌকিক সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাভরত কিভাবে বৈদিক সামগানের মতো লৌকিক গান্ধর্বগান সৃষ্টি করেছিলেন সেকথা পূর্বে কিছু আলোচিত

১। "Important is the fact for the mythologists that the Harivaṁśa is more closely in touch with Purâṇic than with epic mythology. It is in fact a Purâṇa, and 'epic mythology' may properly exclude it, as it may exclude the Uttara in Râmâyaṇa, though both are valuable here and there to complement epic material."—*Epic Mythology* (Strassburg, 1915), p. 2.

২। "* * Harivaṁśa, a work which in reality a Purāṇa and also occasionally called 'Harivaṁśa-Purāṇa' as part of the Mahābhārata."

৩। হরিবংশ, ভবিষ্যপর্ব ২০।৯

হয়েছে। ভরত গান্ধর্বকে বলেছেন স্বর-তাল-পদবিশিষ্ট গন্ধর্বজাতির প্রিয় গান। ভরত উল্লেখ করেছেন,

গান্ধর্বং যন্ময়া প্রোক্তং স্বরতালপদাত্মকম্।
পদং তস্য ভবেদ্বস্তু স্বরতালানুভাবকম্॥[৪]

স্বর, তাল ও পদ নিয়েই গান্ধর্বের রূপ ও গঠন সার্থক। গান্ধর্বগানের স্বর লৌকিক ষড়্জাদি সাতটি। তালের সার্থকতা যে গানে, বাদ্যে ও নাট্যে আছে সে কথা ভরত স্পষ্টভাবেই বলেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যার তাল সম্বন্ধে জ্ঞান নাই তাকে গায়ক বা বাদক বলা যায় না: "যস্তু তালং ন জানাতি ন স গাতা ন বাদকঃ" (৩১।৫৩০)। গান বা গীতে তালের উপযোগিতা আছে: "গীততালবিকল্পনম্" (৩১।৫২৫)। নাট্যেও তাই: "নাট্য তালে প্রতিষ্ঠিতঃ" (৩১।৫২৬)। তাল কালপ্রমাণ-বিশেষ: "ততঃ কালেন সংযুক্তো ভবেন্নিত্যং প্রমাণতঃ, * * গানং তালেন ধার্যতে" (৩১।৫২৭)। তালের অঙ্গ হ'ল যতি, পাণি ও লয়: "অঙ্গভূতা হি তালস্য যতিপাণিলয়াঃ স্মৃতাঃ" (৩১।৫৩০)। কাল বা সময়ের অন্তর অর্থাৎ ব্যবধানের নাম 'লয়': "কলাকালান্তরকৃতং স লয়ো নাম সংজ্ঞিতঃ" (৩১।৫৩৫)। দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত ভেদে লয় তিন রকম: "ত্রয়ো লয়াশ্চ বিজ্ঞেয়া দ্রুতমধ্যবিলম্বিতাঃ" (৩১।৫৩১)। স্বর ও তালের অনুভাবক বা নির্দেশক 'পদ': "পদং তস্য ভবেদ্‌বস্তু স্বরতালানুভাবকম্" (৩২।২৫)। 'বস্তু' অর্থে শাখা বা অঙ্গ। সুতরাং 'পদ' অর্থে স্বর ও তালের (অপরিহার্য) অঙ্গ। গানের (গান্ধর্ব) নিদর্শন দিতে গিয়ে ভরত আরো বলেছেন যে ছন্দ ও প্রমাণযুক্ত হলেই লীলায়িত স্বরসন্দর্ভকে 'গান' বলা হয়, আর কেবল স্তুতিমূলক গানের নাম 'সংকীর্তন'।[৫]

এখন 'পদ' কাকে বলে। ভরত বলেছেন অক্ষরযুক্ত যে কোন-কিছু পদ নামে অভিহিত হয়: "যৎকিঞ্চিদক্ষরকৃতং তৎসর্বং পদসংজ্ঞিতম্" (৩২।২৬)। অবশ্য

৪। (ক) নাট্যশাস্ত্র (কাশী সংস্করণ) ৩২।২৫

(খ) নাট্যশাস্ত্রের (কাশী সং) ২৮শ অধ্যায়ে গান্ধর্বের প্রসঙ্গে ভরত দু'বার উল্লেখ করেছেন (১) 'গান্ধর্বমিতি বিজ্ঞেয়ং স্বরতালপদাশ্রয়ম্' (২৮।৮) ও (২) 'গান্ধর্বং ত্রিবিধং বিদ্যাৎ স্বরতালপদাত্মকম্' (২৮।১২)।

৫। ছন্দঃপ্রমাণসংযুক্তং দিব্যানাং গানমিষ্যতে।
স্তুত্যাশ্রয়েণ তৎকার্যং কর্ম সংকীর্তনাদপি॥
—নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ৩২।৪১৩

রামায়ণে পদ ও অক্ষর আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে পাঠ বা গানের বেলায় : "পাদাক্ষরসমাসজ্ঞাংশ্ছন্দঃসু পরিনিষ্ঠিতান্, কলামাত্রাবিশেষজ্ঞান্" (উত্তরকাণ্ড ৯৪।৩)। নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ ভেদে পদ আবার দু'রকম।[৬] নিবদ্ধ পদ সতাল ও অতাল ভেদে দু'রকম তা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। নিবদ্ধ পদে নানা ছন্দ ও যতি থাকে, যতি ও পাদ স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল হয় এবং অক্ষর নিয়ত বা সমব্যবধানযুক্ত হয়, আর অনিবদ্ধ পদেও তাল, লয় ও অক্ষরের সমাবেশ থাকে।[৭] মোটকথা গান্ধর্বগানে স্বর, তাল ও পদ থাকেই। বৈদিক সামগানের বেলায়ও তাই।

শিক্ষাকার নারদ গান্ধর্বের অর্থ করেছেন বেশ অভিনবভাবে। তিনি বলেছেন,

গেতি গেয়ং বিদুঃ প্রাজ্ঞা ধেতি কারুপ্রবাদনম্।
বেতি বাদ্যস্য সংজ্ঞেয়ং গান্ধর্বস্য বিরোচনমিতি।

গ-শব্দে গান, ধ + ব-শব্দ দুটিতে কারু অর্থাৎ বেণু বা বংশের বাদ্য। সুতরাং কণ্ঠসঙ্গীত ও বেণুস্বরের সমবেত মূর্তিই গান্ধর্ব। ভট্টশোভাকরের টীকায় নারদের শ্লোকটির অর্থ আরো পরিস্ফুট। তিনি উল্লেখ করেছেন : "গন্ধর্বেভ্য আগতং গান্ধর্বং তস্যাক্ষরোপলক্ষিতার্থপ্রতিপাদনেন বিরোচনং বিশেষতো রোচনমুদ্দীপনং ভবতি। গ শব্দেন গানং লক্ষ্যতে, ধকারেণ বকারেণ বৈণিকস্য প্রবাদনং, চাতুর্যেণ হস্তাঙ্গুলিধারণং প্রবাদনপদেন কথিতে বকারেণ বাদনং লক্ষিতম্।"[৮] অক্ষর অনুযায়ী গান্ধর্ব শব্দের সার্থকতা দেখানো হয়েছে। 'ধ'-শব্দে সুনিপুণভাবে হাতের-আঙুল দিয়ে বেণু ধারণ ও ব-শব্দে বাজানো। এখানে গান্ধর্ব বা গান্ধর্বগানের সঙ্গে বাদ্য হিসাবে বেণু বা বংশকে সম্পর্কিত করা হয়েছে। তবে বৈদিক সামগানে বেণুর সহযোগ থাকলেও বীণার সমাবেশই বেশীর ভাগ সময় থাকত। শিক্ষায় নারদ "যঃ সামগানাং প্রথমঃ স বেণোর্মধ্যমঃ স্বরঃ" শ্লোকাংশ দিয়েও তা স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন সামগানে ব্যবহৃত প্রথম স্বরই বেণুর মধ্যম স্বর। এখানে 'বেণু' শব্দে অবশ্য লৌকিক গান বা গান্ধর্ব। বৈদিক গান বোঝাবার প্রয়োজন হ'লে অবশ্যই তিনি 'বীণা' শব্দ ব্যবহার করতেন। আর তারি জন্য বেণুর সঙ্গে লৌকিক গান্ধর্বের ও বীণার

৬। নিবদ্ধঞ্চানিবদ্ধঞ্চ তৎপদং দ্বিবিধং স্মৃতম্। ৩২।২৬

৭। নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ৩২।২৭-৩০

৮। শিক্ষাসংগ্রহঃ (কাশী), পৃঃ ৪১০

সঙ্গে বৈদিক সামগানের সম্পর্ক এত বেশী। বিশেষভাবে অনুশীলন ক'রে দেখলে এই অর্থই ঠিক।

এখন হরিবংশকারের "গানপ্রভাষং সঙ্ক্রে" প্রভৃতি (ভবিষ্যপর্ব ২০।৯) শ্লোকটি থেকে বোঝা যায় যে রামায়ণ ও মহাভারতের মতো হরিবংশের সমাজেও লৌকিক ও বৈদিক—গান্ধর্ব ও সাম এই উভয়বিধ গানের অনুশীলন অব্যাহত ছিল। তবে বৈদিক সামগানের চেয়ে গান্ধর্বের বা মার্গ-সঙ্গীতেরই অনুশীলন বেশী হ'ত। সামগান যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ ছিল।

হরিবংশের বিষ্ণুপর্বে বিষ্ণু-নারায়ণের স্বরূপ বোঝাবার জন্য বলা হয়েছে সবন, হবন, হব্য, হোতা, পাত্র, পবিত্র বেদী, দীক্ষা, চরু, স্রুব, স্রুক্, সোম, প্রোক্ষণ, অধ্বর্যু, সামগ, ঋত্বিক্, সদন বা যজ্ঞশালা, যূপ, সমিৎ, কুশ, চমস। এ' সমস্তের মূল বিষ্ণু, বিষ্ণুই সকলের তথা যজ্ঞ ও যজ্ঞফলের কারণ।[৯] যজ্ঞে ব্রাহ্মণ বা ঋত্বিক্‌রা পবমান-সাম গান করছেন দেখা যায়। যেমন,

গায়ন্তি বিপ্রাঃ পবমানসংজ্ঞং
সমাগতাঃ পর্বাণি চাপ্যুদারম্।[১০]

পর্ব শব্দে যজ্ঞ। পবমানস্তোত্র। পবমানসোমের উদ্দেশ্যে এই পবমানস্তোত্র বৈদিক প্রথমাদি স্বরযোগে গীত হ'ত। পবমানস্তোত্র যজ্ঞবেদীর পাশে গান করা হ'ত। ঋত্বিক্‌রা বেদীর পাশে বসে এই স্তোত্র গানের উপযোগী ক'রে তালে ও লয়ে গান করতেন। মহাবেদীর বাইরেও স্তোত্র গান করার বিধি ছিল। সেই স্তোত্রের নাম বর্হিষ্পবমানস্তোত্র। এ' সম্বন্ধে অবশ্য পূর্বানুবৃত্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ'ছাড়া বিষ্ণুপর্বের ১০৯।৬৭, ভবিষ্যপর্বের ২৪।১১ প্রভৃতিতে সামগানের উল্লেখ আছে।[১১] তখনকার ব্রাহ্মণ ও সাগ্নিক সামগ-সমাজ যে বেদের

৯। সবনং হবনং চৈব হব্যং হোতারমেব চ।
পাত্রাণি চ পবিত্রাণি বেদীং দীক্ষাং চরুং স্রুবম্॥
স্রুক্‌সোমং শর্পমুসলং প্রোক্ষণং দক্ষিণায়নম্।
অধ্বর্যুং সামগং বিপ্রং সদস্যং সদনং সদঃ॥
যূপং সমিৎকুশং দর্বীং চমসোলূখলানি চ॥
প্রাগ্বংশং যজ্ঞভূমিঞ্চ হোতারং চয়নঞ্চ যৎ॥
—হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব, ৪১।৫-৭

১০। বিষ্ণুপর্ব ৯৬।৩০

১১। তখনকার সময়ে ব্রাহ্মণেরা যে বৈদিক শাস্ত্রে ও গানে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন হরিবংশের ভবিষ্যপর্বে ব্রহ্মার সভা-বর্ণনায় ৬৭।১৯-২৪ শ্লোকগুলি থেকে তা বোঝা যায়।

ক্রিয়াকাণ্ড বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন তা বেশ বোঝা যায়। হরিবংশে বিষ্ণু-উপাসনার প্রাধান্য থাকলেও শৈবমতেরও যথেষ্ট প্রচলন ছিল। যেমন সামগ ব্রাহ্মণেরা সামগানের মাধ্যমে হরি তথা বিষ্ণু-নারায়ণ বা কৃষ্ণ-বাসুদেবের স্তব-স্তুতি ও উপাসনা করলেও বিদ্যাধর, নৃত্যশীলা দেবদাসী ও অপ্সরাদের শংকরের স্তুতিগান করতে দেখা যায় :

(ক) উদ্‌গীয়মানং বিপ্রৈশ্চ সামভিঃ সামগৈর্হরিম্।[১২]

(খ) নৃত্যন্তি নৃত্যকুশলা গায়ন্তি স্ম চ কন্যকাঃ।
বিদ্যাধরাস্তথান্যত্র স্তুবন্তঃ শংকরং শিবম্॥[১৩]

কপালাদি ব্রহ্মগীতি তথা ব্রহ্মপদগীতিও শংকর বা শিবস্তুতিগানের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের সময়ে এ' সকল গীতির অনুশীলন ছিলই। ভরতের সময়েও (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) এদের প্রচলন ছিল তা আগেই আলোচনা করেছি। হরি, নারায়ণ বা কৃষ্ণ-বাসুদেবের উপাসনাপদ্ধতি সাধারণত অভিজাত মহলেই প্রচলিত ছিল। শিবকে (বেদের রুদ্র নয়, কিন্তু শিব-পশুপতি) পৌরাণিকী দৃষ্টিতে অনার্য দেবতা-রূপে গণ্য করা হয়। তিনি ছিলেন নাকি অনার্যগোষ্ঠিরই অধিপতি। তাই ভূত, প্রেত, দানা দৈত্য প্রভৃতি সংস্কৃতিবিহীন সম্প্রদায় ছিল তাঁর সহচারী। অথচ ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাভরত-রচিত ব্রহ্মগীতি শংকরস্তুতি-রূপেই নিবেদিত হ'ত।[১৪] পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে কল্লিনাথ উল্লেখ করেছেন : "প্রাক্‌পূর্বং শংকরস্তুতৌ শংকরস্তুতিং বিষয়ীকৃত্য ব্রহ্মপ্রোক্তপদৈঃ, ব্রহ্মণা চতুর্মুখেন প্রোক্তৈর্গ্রথিতৈঃ পদৈঃ 'তং ভবললাট' ইত্যাদিভির্যোজয়িত্বা সম্যগন্যূনানতিরেকেণোক্তা গীতাশ্চেদমূঃ ষাড়্‌জ্যাদয়ো জাতয়ো * * ভবতি।" খৃষ্টীয় শতাব্দীর ধ্রুবাগানে যেমন জাতিরাগ-গুলির ব্যবহার ছিল, সপ্ত-কপাল ও কম্বলাদি পদগান তথা ব্রহ্মগীতির সঙ্গেও শুদ্ধ জাতিরাগ অথবা শুদ্ধ ও বিকৃত আঠারো জাতিরাগের সহযোগ ছিল। আর ছিল বৈদিক সামগানের অনুকরণে নিবদ্ধ প্রবন্ধ গান হিসাবে সৃষ্ট বা উদ্ভাবিত ঋক্, গাথা, সাম, পাণিকা প্রভৃতি পদগীতির প্রচলন। সিংহভূপাল

১২। হরিবংশ, ভবিষ্যপর্ব ১১৫।৫

১৩। " " ৮৬।১৪

১৪। (ক) ব্রহ্মপ্রোক্তপদৈঃ সম্যক্‌প্রোক্তাঃ শংকরস্তুতৌ।
(খ) ইতি সপ্ত-কপালানি গায়ন্ ব্রহ্মোদিতৈঃ পদৈঃ॥
—সঙ্গীত-রত্নাকর ১।৭।১১৩ ; ১।৮।১০

শংকরস্তুতিমূলক কপালাদি ব্রহ্মগীতিকে জাতি-প্রস্তারের (জাতিরাগ-গান-প্রস্তার) অন্তর্ভুক্ত করেছেন: "ইতি ব্রহ্মপ্রোক্তৈর্জাতিপ্রস্তারে কথিতৈঃ পদৈরুক্তৈঃ স্বরৈশ্চ সপ্ত কপালানি গায়ন কল্যাণং ভজতে"। মঙ্গলময় শিবস্তুতি কল্যাণই দান করে। তাই হরিবংশে বিদ্যাধর ও অপ্সরারা কল্যাণ কামনায় শংকরের স্তুতিগান করতেন দেখা যায়: "স্তুবন্তঃ শংকরং শিবম্"। সামগরা হরির স্তুতিগানে ঋকাদি সামেরই গান করেছিলেন মনে হয়। বিদ্যাধরদের শংকরের স্তবগানে ঋক্, গাথা,[১৫] পাণিকা প্রভৃতির সঙ্গে বেদসম্মত জাতিরাগেরও ("বেদসংমিতা বেদসদৃশা জাতয়:") সম্পর্ক ছিল। গান্ধর্বগানের পূজারী গান্ধর্বশ্রেণীভুক্ত বিদ্যাধর, কিন্নর, যক্ষ, অপ্সরা প্রভৃতিদের পক্ষে জাতিরাগের ব্যবহার করাই সম্ভব ও সে হিসাবে শংকরের উদ্দেশ্যে স্তোত্র, স্তুতি বা পদগানের সঙ্গে আর্য-অনার্যের প্রশ্ন অবান্তর বলে মনে হয়। তাছাড়া হরিবংশকার গান্ধর্ব অর্থে গানকে ও নৃত্যকে দেবাদিদেব মহাদেবের পূজার উদ্দেশ্যে নিবেদিত বলেছেন: "পূজার্থং দেবদেবস্য গান্ধর্বং নৃত্যমেব চ" (বিষ্ণুপর্ব ৬৮।৫২)।

নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সমবেত রূপ যে সঙ্গীত হরিবংশকার তারও পরিচয় দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন,

(১) নটানাং নৃত্যগেয়ানি বাদ্যানি চ সমন্ততঃ।[১৬]

(২) মধুরৈর্বাদ্যগীতৈশ্চ নৃত্যৈশ্চাপিনদ্গতৈঃ।[১৭]

(৩) নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা দেবসঙ্গীতযোনিনঃ।[১৮]

গন্ধর্বশ্রেষ্ঠ নারদকে দেবতাদের আরাধ্য গান্ধর্বসঙ্গীতের কারণ বলা হয়েছে। মোটকথা 'সঙ্গীত' শব্দটির অনুপ্রবেশ রামায়ণ মহাভারতের মতো হরিবংশ পুরাণেও (খৃষ্টপূর্ব ২০০) পাওয়া যায়।

হরিবংশে সঙ্গীতের উপকরণ হিসাবে হল্লীসকনৃত্য, ছালিক্যগান, উগ্রসেন ও

১৫। 'গাথা'-গানের প্রচলনও হরিবংশে পাওয়া যায়। যেমন (১) "তস্য যজ্ঞে পুরা গীতা গাথাঃ প্রীতৈর্মহর্ষিভিঃ" (১।১৯।৬২); (২) "যস্য যজ্ঞে জগৌ গাথাং গন্ধর্বো নারদস্তথা" (১।৩৩।১৯); (৩) "গীয়মানাসু গাথাসু দেবসংস্তবনাদিষু" (১।৪৭।৪৬); (৪) "গাথা অপ্যত্র গায়ন্তি যে পুরাণবিদো জনাঃ" প্রভৃতি। ঋক্ ও সাম প্রভৃতি গানেরও প্রচলন ছিল: "ঋচশ্চ সক্বয়ঃ পূর্বঃ সামগানাং চ ভারত" (৩।২৪।১১)।

১৬। হরিবংশ, হরিবংশপর্ব ৫৫।১৯

১৭। " ভবিষ্যপর্ব ২৭।১৩

১৮। " বিষ্ণুপর্ব ২৪।৭৫

যাদবদের জলক্রীড়া, ভদ্রনটের সহায়তায় যাদবদের রামায়ণ-অভিনয়াদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত-সাহিত্যে প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত অসংখ্য রকমের ক্রীড়ার উল্লেখ আছে ও তাদের সংখ্যা প্রায় ছিয়াত্তরটি। বিভিন্ন বেদ থেকে আরম্ভ ক'রে, ব্রাহ্মণ, সূত্র, রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, বিভিন্ন পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, নিরুক্ত, নীতিমঞ্জরী, গর্গসংহিতা, পাণিনীসূত্র, পাতঞ্জলমহাভাষ্য, অর্থশাস্ত্র, কাশিকা, তত্ত্ববোধিনী, দশকুমারচরিত, বাসবদত্তা, মালবিকাগ্নিমিত্র, শকুন্তলা নাটক, পঞ্চতন্ত্র, কুমারসম্ভব, অমরকোষ, নৈষধচরিত, শিশুপালবধ, কিরাতার্জুনীয়, কাদম্বরী, পুরুষার্থচিন্তামণি, নির্ণয়সিন্ধু, ভোজপ্রবন্ধ, চতুরঙ্গদীপিকা, মানসোল্লাস প্রভৃতি গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন রকমের ক্রীড়ার উল্লেখ আছে। হরিবংশ-পুরাণে এ ধরণের কয়েকটি কৌতুক-ক্রীড়ার ও উৎসবের উল্লেখ আছে ও তাদের মধ্যে সঙ্গীতের ও নাটকের সমাবেশ দেখা যায়। সঙ্গীত সম্পর্কিত প্রাচীন ভারতের কয়েকটি ক্রীড়ার নাম যেমন জলক্রীড়া, রাসক্রীড়া, ছালিক্যক্রীড়া, নৃত্যক্রীড়া, নাট্যক্রীড়া, বংশনৃত্য, ইন্দ্রধ্বজোৎসব, দেবযাত্রাদি মহোৎসব, হোলিকামহোৎসব, বসন্তোৎসব প্রভৃতি। হরিবংশপুরাণের বিষ্ণুপর্বে (৮৮।২৫-২৭) ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে (৪অ° ২৮।১৩৩-১৩২) জলক্রীড়ার বর্ণনা আছে। তাছাড়া কিরাতার্জুনীয় (৯ম সর্গ), শিশুপালবধ (৮ম সর্গ) প্রভৃতি নাট্যসাহিত্যেও এর উল্লেখ আছে। (২) রাসক্রীড়ায় নৃত্যগীতের সমারোহ ছিল। পণ্ডিত শাস্ত্রী ফার্কে[১৯] রাসক্রীড়া সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন: "* * বাদ্যাদিনা হস্তমিতকাষ্ঠদণ্ডদ্বয়েন বাঘাতপুরঃসরং মণ্ডলাকারং নৃত্যন্তো গায়ন্তি।" শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৯।৪৫) আছে: "নদ্যাঃ পুলিনমাবিশ্য গোপীভির্হিমবালুকম্, রেমে তত্তরলানন্দকুমুদামোদবায়ুনা।" (৩) ছালিক্যক্রীড়ার উল্লেখ হরিবংশে (বিষ্ণুপর্ব ৮৯।৬৬-৬৭) আছে। ছালিক্য নৃত্যবিশেষ। স্ত্রীগণপরিবৃত হ'য়ে নৃত্যের সঙ্গে এই ক্রীড়া প্রচলিত ছিল। এ' সম্বন্ধে পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব। (৪) নৃত্যক্রীড়ায়ও নৃত্য ও বাদ্যের সমাবেশ থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৮।৯-১১) আছে।

রামকৃষ্ণাদয়ো গোপা ননৃতুর্যুযুধুর্জগুঃ।
কৃষ্ণস্য নৃত্যতঃ কেচিজ্জগুঃ কেচিদবাদয়ন্॥

১৯। Pt. A. S. Pharke: *Sports and Games as Referred to in Sanskrit Literature* (Vide The Journal of the Princess of Wales Sarasvati Bhabana Studies, Vol. X, 1938, pp. 64-98.

বেণু-পাণিতলৈঃ শৃঙ্গৈঃ প্রশশংস্তুরথাপরে।
গোপজাতিপ্রতিচ্ছন্নদেহা গোপালরূপিণঃ ॥
ইড়িরে কৃষ্ণরামৌ চানটা ইব নটান্ নৃপ।

গর্গসংহিতায় (২খ° ১২।৩৭-৩৮) শ্রীরাগ, হিন্দোল প্রভৃতির উল্লেখ আছে। গর্গসংহিতা খৃষ্টীয় অব্দে লিখিত, সুতরাং অভিজাত দেশী-রাগের উল্লেখ তাতে থাকা সম্ভব। নৃত্যক্রীড়ার প্রসঙ্গে গর্গসংহিতায় উল্লেখ আছে,

শ্রীরাগং চাপি হিন্দোলং রাগমেবং পৃথক্ পৃথক্।
অষ্টতালস্ত্রিভির্গ্রামৈঃ স্বরৈঃ সপ্তভিরগ্রতঃ ॥
নৃত্যৈর্নানাবিধৈরম্যৈর্হাবভাবসমন্বিতৈঃ।
তোষয়ন্ত্যো হরিং রাধাং কটাক্ষৈর্ব্রজগোপিকাঃ।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে সংহিতাকার শ্রীরাগ ও হিন্দোলে সাত স্বর ও তিন গ্রামের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু খৃষ্টীয় অব্দের গোড়ার দিকে ষড়্‌জ ও মধ্যম গ্রাম দু'টিরই প্রচলন ছিল, গান্ধারগ্রাম ছিল না। রাগ-রূপে নক্সার বৈচিত্র থাকা অসম্ভব নয়। সুতরাং সংহিতাকারের বর্ণনায় রূপকের বা অতিশয়োক্তির ছোঁয়াচ থাকলেও ক্রীড়ার নিদর্শন যতটুকু প্রকাশ পেয়েছে তা থেকে আমরা বুঝি যে প্রাচীন সমাজে খেলা ও কৌতুকের সঙ্গে সঙ্গীতের মিতালী চিরদিনই ছিল।

এরপর (৫) হল্লীসকক্রীড়া। হরিবংশে এর বিস্তৃত বর্ণনা আছে। পূর্বোক্ত নাট্যক্রীড়া সম্বন্ধে গর্গসংহিতায় (২।২৫।২২-২৩) আরো বর্ণিত হয়েছে: "নৃত্যন্তঃ কৃষ্ণপুরতঃ শ্রীকৃষ্ণ ইব মৈথিল, রাধাবেষধরা গোপ্যঃ শতচন্দ্রাননপ্রভাঃ"। নৃত্যক্রীড়া সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে কৌমুদী-মহোৎসবে বর্ণিত হয়েছে: "গায়ন্ত গায়কাশ্চৈব নৃত্যন্তু নটনর্তকাঃ"। শোনা যায় (৬) বংশনৃত্য নরমেধযজ্ঞে অনুষ্ঠিত হত। শুক্লযজুর্বেদসংহিতায় (৩০।২১) আছে: "অগ্নয়ে পীবানং পৃথিব্যৈপীঠসর্পিণং বায়বে চাণ্ডালমন্তরিক্ষায় বংশনর্তিনম্"। ভাষ্যকর মহীধর উল্লেখ করেছেন: "অন্তরিক্ষায় বংশনর্তিনম্ বংশেন নর্তনশীলম্। তথা ব্রাহ্মণাদীনাং পর্যগ্নিকরণানন্তরমিদং ব্রহ্মণে ইদং ক্ষত্রায়েত্যেবং সর্বেষাং যথা স্বস্বদেবতোদ্দেশেন ত্যাগঃ। ততঃ সর্বাণ ব্রাহ্মণাদীন্ যূপেভ্যো বিমুচ্যোৎস্জতি।" (৭) ইন্দ্রধ্বজোৎসবের বিবরণ বিষ্ণুধর্মোত্তরে আছে। এই উৎসব ভিন্ন আকারে এখনো বর্তমান আছে। বিষ্ণুধর্মোত্তরকার উল্লেখ করেছেন: "নটনর্তকসংকীর্ণং তথা পূজিতদৈবতম্। * * * উৎসবং চ তদা কার্যং জলতীর-

গতৈর্মহৎ।"[২০] সঙ্গীত-দামোদরে (৩য় স্তবকে) ইন্দ্রোত্থান-উৎসবের উল্লেখ আছে। মানসী (মালশী তথা মালশ্রী?) রাগ কখন্ গান করা হবে তার নির্দেশ দিতে গিয়ে দামোদরকার শুভঙ্কর উল্লেখ করেছেন,

ইন্দ্রোত্থানাৎ সমারভ্য যাবৎ দুর্গামহোৎসবং।
গেয়া তাবদ্বুধৈর্নিত্যং মালসী (?) সা মনোহরা॥

(৮) দেবযাত্রামহোৎসব সম্বন্ধে ব্রহ্মপুরাণে বর্ণনা আছে। গর্গসংহিতায়ও (৪।১২।১৫-১৯) এর বিবরণ আছে। যেমন: "রক্তহস্তাঃ পীতবস্ত্রাঃ কূজন্-নূপুরমেখলাঃ, গায়ন্ত্যো হোলিকাগীতির্গালীভির্হাস্যসন্ধিভিঃ" প্রভৃতি। এটিও হোলির মতো একটি আবিরোৎসব—নৃত্যে ও গীতে পরিপূর্ণ। এছাড়া হোলি এবং বসন্তোৎসবে নৃত্য গীত ও বাদ্যের সমারোহে থাকত ও এখনো আছে। ভবিষ্যপুরাণে হোলি-উৎসবের অপরূপ বর্ণনা আছে: "* * ততঃ কিলকিলাশব্দৈস্তালশব্দৈর্মনোরমৈঃ, তমগ্নিং ত্রিঃপরিক্রম্য গায়ন্তু চ হসন্তু চ"। বসন্তোৎসব মাঘমাসে শুক্ল-পঞ্চমীতে অনুষ্ঠিত হয়। এটিতে আদিরস শৃঙ্গারের বিকাশ থাকে। এই উৎসবে বিশেষভাবে বসন্তরাগ গীত হয়। সঙ্গীত-দামোদরকার শুভঙ্কর বসন্তরাগের সময় নির্দেশ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন,

শ্রীপঞ্চম্যাং সমারভ্য যাবৎ স্যাচ্ছয়নং হরেঃ।
তাবদ্ বসন্তরাগস্য গানমুক্তং মনীষীভিঃ॥

এ'সকল ক্রীড়া ও মহোৎসব বিভিন্ন সময়ের সাহিত্যে উল্লিখিত থাকলেও হরিবংশে উল্লিখিত জলক্রীড়া, হল্লীসকনৃত্য, ছালিক্যগান, রামায়ণ-অভিনয় প্রভৃতির প্রসঙ্গে সেগুলি একসঙ্গে এখানে উল্লিখিত হ'ল ভারতবর্ষীয় সমাজে ক্রীড়া-কৌতুকের মাধ্যমে সঙ্গীত তথা নৃত্য, গীত, বাদ্যের কিভাবে অনুশীলন ছিল দেখাবার জন্য। সামান্যভাবে "গায়ন্তু গায়কাশ্চৈব নৃত্যন্তু নটনর্তকাঃ" শব্দগুলি সঙ্গীতের নির্দিষ্ট বা বিস্তৃত রূপ ও বিকাশের পরিচয় না দিলেও তদানীন্তন সমাজে প্রচলিত শিল্পদৃষ্টি ও অনুশীলনের কথা আমাদের জানিয়ে দেয়। তাই নগণ্য বলে মনে হলেও ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে তাদের মূল্য মোটেই কম নয়।

২০। পণ্ডিত অনন্তশাস্ত্রী এই ইন্দ্রধ্বজোৎসবের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন: "ইন্দ্রকেতু-সংজ্ঞকমিন্দ্রদেবতাকং মহান্তং ধ্বজমুত্থাপ্য তস্য পূজনং বিধায় নটনর্তকাদিভিরনেকখেলনং বিধায় পঞ্চমে দিবসে রাজ্ঞা চতুরঙ্গবলযুতো হস্তিভির্ধ্বজং নদীতীরে নীত্বা তং তত্র প্রবাহয়েৎ। তদা জলে পৌরা জানপদা অনেকপ্রকারিকাং ক্রীড়াং কৃত্বা জলতীরে মহান্তমুৎসবং কুর্বন্তি।" —Vide *Sarasvati Bhavan Studies*, Vol. X, 1928, p. 93.

হরিবংশকার বলেছেন ছালিক্যগান ছিল যাদবদের অতীব প্রিয়। বিষ্ণুপর্বের ৮৮—৮৯ অধ্যায় দু'টিতে উল্লেখ আছে: মহারাজ উগ্রসেন বসুদেবকে রাজ্যভার দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও যাদবগণের সঙ্গে সমুদ্রযাত্রা করেন। রেবতী, সত্যভামা প্রভৃতি ছাড়া ষোলশো রমণী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ছিলেন এবং অন্যান্য যাদবগণ তাঁদের পত্নী-গণকেও সঙ্গে নিয়েছিলেন। অপ্সরা প্রভৃতি নর্তকীরাও সঙ্গে ছিল। তীর্থে জলক্রীড়ার অবসরে বিভিন্ন নৃত্য-গীতের আয়োজন হয়েছিল। অপ্সরারা জল-দর্দুরের তালে তালে করতালি দিয়ে নৃত্য করছিল। তাদের মনোমুগ্ধকর বেশভূষায় সকলেই আনন্দিত হয়েছিলেন। বলদেব রেবতীর সঙ্গে আনন্দে করতালি দিয়ে নৃত্য করছিলেন। সত্যভামাও নৃত্য-গীতে যোগ দিয়েছিলেন। অর্জুন সমুদ্রযাত্রার জন্য সেখানে উপস্থিত হ'য়ে সুভদ্রার সঙ্গে নৃত্য-গীতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। নারদও সেই আনন্দোৎসবের মধ্যে ছিলেন। রাত্রে শ্রীকৃষ্ণ সমবেত সকলকে ছালিক্যগীত গান করার জন্য আদেশ করেছিলেন।[২১] সঙ্গে ছিল মৃদঙ্গাদি বাদ্য। অপ্সরারা নৃত্য-গীত-বাদ্যে যোগদান করেছিল। আস্সারিত-নৃত্য হবার পর নর্তকী রম্ভা নৃত্য-নৈপুণ্যে সমাগত সকলকে মুগ্ধ করেছিল।

২১। (ক) উগ্রসেনো নরপতির্বসুদেবশ্চ ভারত।
নিক্ষিপ্তৌ নগরাধ্যক্ষৌ শেষাঃ সর্বে বিনির্গতাঃ ॥৫॥

* * * *

চিক্রীড় সাগরজলে রেবত্যা সহিতো বলঃ ॥
ষোড়শস্ত্রীসহস্রাণি জলে জলজলোচনঃ।
রময়ামাস গোবিন্দো বিশ্বরূপেণ সর্বদৃক্ ॥১২-১৩॥

* * * *

গীতনৃত্যবিধিজ্ঞানাং তাসাং স্ত্রীণাং জনেশ্বর ।৩৭॥

* * * *

দর্শয়ধ্বং গুণান্ সর্বান্ নৃত্যগীতৈরহঃসু চ।
তথাভিনয়যোগেষু বাদ্যেষু বিবিধেষু চ ॥৪২॥

* * * *

হেলাভির্হাস্যভাবৈশ্চ জহ্রুর্ভৈমমনাংসি তাঃ ॥
কটাক্ষৈরিঙ্গিতৈর্হাস্যৈঃ কেলিরোষৈঃ প্রসাদিতৈঃ ।৪৭-৪৮॥

* * * *

আক্রীড়গরুড়চ্ছন্দাশ্চিত্রাঃ কনকরীতিভিঃ।
ক্রৌঞ্চচ্ছন্দাঃ শুকচ্ছন্দা গজচ্ছন্দাস্তথাপরে ।৬১॥

—বিষ্ণুপর্ব ৮৮।৫-৮১

অভিনয়ের যে অনুষ্ঠান হয় তাতে চারুদর্শনা ও বিশালনেত্রা উর্বশী, মিশ্রকেশী, তিলোত্তমা, মেনকা প্রভৃতি যোগদান করেছিল। নারদ বীণাযোগে ছ'টি গ্রামরাগ আলাপ করেছিলেন ও সে গ্রামরাগদের মূর্ছনা-মাধুর্যে শ্রীকৃষ্ণ ও সকলে বিমোহিত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজে হল্লীসকনৃত্য করেছিলেন। টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেছেন: "ঝল্লীসকমিতি পাঠে তদাখ্যবাদ্যবিশেষম্", অর্থাৎ হল্লীসকের জায়গায় ঝল্লীসক পাঠ গ্রহণ করলে অর্থ হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ সপ্তস্বরের অনুযায়ী সপ্ততারযুক্ত ঝল্লীসক-বাদ্য বাজিয়েছিলেন ও তাঁর সঙ্গে বেণুতে সহযোগিতা করেছিলেন অর্জুন।

(খ) তাং রেবতীং চাপ্যথ বাপি রামং সর্বা নমস্কৃত্য বরাঙ্গযষ্ট্যঃ।
বাদ্যানুরূপং ননৃতু সুগাত্র্যঃ সমন্ততোঽন্যা জগিরে চ সম্যক্ ॥৫॥

* * * *

সহস্ততালং ললিতং সলীলং বরাঙ্গনা মঙ্গলসম্ভৃতাঙ্গ্যঃ॥
সঙ্কর্ষণাধোক্ষজনন্দনানি সংকীর্তয়ন্ত্যোঽথ চ মঙ্গলানি ।৭-৮॥

* * * *

গীতানি তদ্বেষমনোহারিণি স্বরোপপন্নান্যথ গায়মানাঃ ॥৪১॥

* * * *

আজ্ঞাপয়ামাস ততঃ স তস্যাং নিশিপ্রহৃষ্টো ভগবানুপেন্দ্রঃ।
ছালিক্যগেয়ং বহুসন্নিধানং যদেব গান্ধর্বমুদাহরন্তি ॥
জগ্রাহ বীণামথ নারদস্তু ষড়্গ্রামরাগাদিসমাধিযুক্তাম্।
হল্লীসকং তু স্বয়মেব কৃষ্ণঃ সবংশঘোষং নরদেব পার্থঃ॥
মৃদঙ্গবাদ্যানপরাংশ্চ বাদ্যান্ বরাপ্সরাস্তা জগৃহুঃ প্রতীতাঃ।
আসারিতান্তে চ ততঃ প্রতীতা রম্ভোত্থিতা সাভিনয়ার্থতজ্জ্ঞা ॥৬৭-৬৯॥
তা বাসুদেবেঽপ্যনুরক্তচিত্তাঃ স্বগীতনৃত্যাভিনয়ৈরুদারৈঃ। ৭২॥ প্রভৃতি

* * * *

ছালিক্যগান্ধর্বমুদারকীর্তির্মেনে কিলৈকং দিবসং সহস্রম্।
চতুর্যুগানাং নৃপ রেবতোঽথ ততঃ প্রবৃত্তা চ কুমারজাতিঃ ॥৭৮॥
গান্ধর্বজাতিশ্চ তথাপরাপি দীপাদ্যথা দীপশতানি রাজন্ ।৭৯॥

* * * *

শক্যং ন ছালিক্যমতে তপোভিঃ স্থানে বিধাতুথ মূর্ছনাসু॥
ষড়্গ্রামরাগেষু ন তত্র কার্যং তস্যৈকদেশাবয়বেন রাজন্ ।৮১-৮২॥

* * * *

ছালিক্যগান্ধর্বগুণোদয়েষু যে দেবগন্ধর্বমহর্ষিসঙ্ঘাঃ।
নিষ্ঠাং প্রয়ান্তীত্যবগচ্ছ বুদ্ধ্যা ছালিক্যমেবং মধুসূদনেন ।৮৩॥

—বিষ্ণুপর্ব ৮৯।১-৮৮

ছালিক্যগীতি গান্ধর্ব বা গান্ধর্বগান-শ্রেণীভুক্ত ছিল: "ছালিক্যগেয়ং বহুসন্নিধানং যদেব গান্ধর্বমুদাহরন্তি"। 'গেয়' বলতে বিভিন্ন লক্ষণযুক্ত গান। পূর্বে বিভিন্ন প্রাচীন ভারতীয় ক্রীড়ার প্রসঙ্গে ছালিক্যের কথা আমরা উল্লেখ করেছি। ছালিক্য ছিল তখনকার নিবদ্ধগান: "গীতবিশেষমিদং গন্ধর্বেষু প্রসিদ্ধতমম্"। অনেক স্ত্রী-পুরুষ মিলে একসঙ্গে নৃত্য ও বাদ্যাদির সহযোগে এই গান করত। ছালিক্যগানযুক্ত খেলার নামও ছিল ছালিক্যক্রীড়া। বিশেষ ক'রে ছালিক্যগানে ছ'টি গ্রামরাগের ও বিভিন্ন তালের সমাবেশ থাকত। এ'গান অনেকটা এখানকার রাগমালার মতো ছিল। বিভিন্ন ধাতু ও মাতুর তথা রাগের (গ্রামরাগের) সমাবেশ থাকত। 'ধাতু' অর্থে গীতের অবয়ব ও 'মাতু' বলতে রাগাদি: "গীতস্যবয়বো ধাতু রাগাদির্মাতুরুচ্যতে"। এই ধাতু বা উদ্‌গ্রাহ-ধ্রুবাদি অবয়ব ও মাতু বা রাগের সহযোগই গানকে রঞ্জকগুণবিশিষ্ট করে: "গীতং রঞ্জকং ধাতুমাতুসহিতমিতি"। 'গীতপ্রকাশ' (১৬শ শতাব্দী) গ্রন্থে গীত বা গানের জন্য স্বরকে ধাতু ও গানের কথা বা সাহিত্যকে মাতু বলা হয়েছে। বিচিত্র রাগ ও তালের সমাবেশ নিয়ে নিবদ্ধ ছালিক্যগান অভিনব রূপে ও ভঙ্গিতে বিকাশ লাভ ক'রে শ্রোতাদের চিত্তকে বিমুগ্ধ করত। অনেকের মতে খৃষ্টপূর্বযুগের ছালিক্যগানই খৃষ্টীয় শতাব্দীতে (মাঝামাঝি সময়ে) 'রূপক' নামে আত্মপ্রকাশ করেছে। রাগসংখ্যায় ছালিক্য ও রূপকের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও বিচিত্র মাতু (রাগ), ধাতু (কলি বা গানের অবয়ব), তাল, লয় প্রভৃতির বিচিত্রতার সঙ্গে উভয়ের মধ্যে আবার মিল আছে। শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নকারের চতুর্থ প্রবন্ধাধ্যায়ে রূপকের নিদর্শন দিয়েছেন। তিনি দোষহীন ব্যক্ত, সুরক্ত, শ্লক্ষ্ণ, বিকৃষ্ট, মধুর, পূর্ণ, প্রসন্ন, সুকুমার প্রভৃতি দশগুণযুক্ত[২২] অভিনব ও উত্তম রূপকগীতি বা রূপক-প্রবন্ধের পরিচয়-প্রসঙ্গে বলেছেন,

গুণান্বিতং দোষহীনং নবং রূপকমুত্তমম্।
রাগেণ ধাতুমাতুভ্যাং তথা তাললয়োড়ুবৈঃ ॥[২৩]

কল্লিনাথ বলেছেন: "নূতনরাগাদিনির্মিতত্বাদ্রূপকং নবং ভবতীত্যর্থঃ"। নূতন নূতন বা ভিন্ন ভিন্ন রাগের শুধু কেন, তাল, ছন্দ, লয়, গ্রহ, রস, ভাব, অলংকার প্রভৃতির সমাবেশ থাকাটাই রূপকগানের বৈশিষ্ট্য। রূপকের মাতু (রাগ), ধাতু

২২। এই দশটি গুণের পরিচয় আগে দেওয়া হয়েছে।

২৩। সঙ্গীত-রত্নাকর ৪।৩৬১

(অংশ), তাল, লয় প্রভৃতির নতুন নতুন রূপ-পরিগ্রহ করার কথা উল্লেখ ক'রে শার্ঙ্গদেব বলেছেন,

নূতনৈ রূপকং নূত্নং রাগঃ স্থায়ান্তরৈর্ণবঃ।
ধাতু রাগাংশভেদেন মাতোস্তু নবতা ভবেৎ॥
প্রতিপাদ্যবিশেষেণ রসালংকারভেদতঃ।
লয়গ্রহবিশেষেণ তালানাং নবতা মতা॥

শার্ঙ্গদেব জাতি, তাল, লয় প্রত্যেকটির সম্বন্ধেই 'নবতা মতা' বা 'নবতাং ব্রজেৎ' শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন।

আলাপ-পর্যায়ে আর একটি রূপকের আমরা উল্লেখ পাই। এই রূপকালাপেও (রূপকালপ্তি) ভিন্ন ভিন্ন পদ পৃথকভাবে গান করার রীতি আছে। কল্লিনাথ এর পরিচয়ে বলেছেন: "অপন্যাসেষ্ববিরম্যৈকাকারেণ প্রবৃত্ত আলাপঃ। স এব অপন্যাসেষু বিরম্য প্রবৃত্ত রূপকমিতি"। পণ্ডিত পার্শ্বদেবও তাঁর সঙ্গীতসময়াসরে রূপকের সুষ্ঠু পরিচয় দিয়েছেন।[২৪] শার্ঙ্গদেব উল্লেখ করেছেন মতঙ্গাদি সঙ্গীত-শাস্ত্রীদের মতে 'রূপক' ভাষা, বিভাষা ও অন্তরভাষা রাগগুলির সঙ্গেই সম্পর্কিত, কাজেই কল্লিনাথ অনুমান করেন গ্রামরাগে বা রাগাঙ্গে রূপকের ব্যবহার হয় না। হরিবংশপুরাণে উল্লিখিত ছালিক্যগানে গ্রামরাগেরই ব্যবহার ছিল, তাই ছালিক্যের পরবর্তী বিকাশ মোটেই আলাপ-পর্যায়ের রূপক তথা রূপকালপ্তি নয়, তা বিচিত্র ধাতু, মাতু (রাগ) ও তালের সমাবেশযুক্ত প্রবন্ধজাতীয় রূপকগান, যার উল্লেখ শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকরের ৪র্থ অধ্যায়ে (৩৬১ শ্লোক) করেছেন।

ছালিক্যগানে রাগমালার আকারে ব্যবহৃত ছ'টি গ্রামরাগ ('ষড়্‌গ্রামরাগাদি-সমাধিযুক্তাম্') সম্বন্ধে টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেছেন: "ষট্‌গ্রামাঃ স্থানানি যেষাং রাগাণাং তৈর্যঃ সমাধিঃ চিত্তৈকাগ্র্যং তদ্‌যস্যাং তাম্। তে চ মধ্যশুদ্ধভিন্নগৌড়-মিশ্রগীতরূপাঃ"। অর্থাৎ নীলকণ্ঠ মধ্যা, শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়ী, মিশ্রা ও গীতরূপা ভেদে ছ'রকম গ্রামরাগের কথা উল্লেখ করেছেন। বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গ (খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম শতাব্দী) ও শার্ঙ্গদেব বিস্তৃতভাবে গীতির আশ্রয় গ্রামরাগগুলির উল্লেখ করেছেন, কিন্তু নীলকণ্ঠ যে ছ'টি সংখ্যা বা মধ্যা, মিশ্রাদি গীতির নামোল্লেখ করেছেন তাদের বর্ণনায় মিল পাওয়া যায় না। শার্ঙ্গদেব পাঁচটি গীতির আশ্রয়ভূত পাঁচটি গ্রামরাগের কথা বলেছেন: "পঞ্চধা গ্রামরাগাঃ স্যুঃ পঞ্চগীতিসমাশ্রয়াৎ" (২।২)। কল্লিনাথ উল্লেখ করেছেন: "তত্রাদৌ গ্রামরাগাঃ পঞ্চবিধগীতভেদাশ্রয়ণেন

২৪। সঙ্গীতসময়সার (ত্রিবান্দ্রম সংস্করণ) ২।২৮-৩৩

পঞ্চধা ভিত্যস্ত"। সেই পাঁচটি গীতি হ'ল শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়ী, বেসরা ও সাধারণী। মতঙ্গ সাতটি গীতির নাম করেছেন, যেমন শুদ্ধা, ভিন্নকা, গৌড়ীকা, রাগগীতি, সাধারণী, ভাষা ও বিভাষা। সুতরাং মতঙ্গের মতে সাতটি গীতির আশ্রয়ে গ্রামরাগ সাতটি। এই গীতিগুলির নামের সার্থকতাও দেখানো হয়েছে, যেমন রাগের আশ্রয়ভূত গীতির নাম রাগগীতি, বেগ বা শীঘ্রপ্রযুক্ত স্বরসম্পন্ন গীতির নাম বেসরা প্রভৃতি। ভরত নাট্যশাস্ত্রে চারটি মাত্র গীতির নাম করেছেন, যেমন মাগধী, অর্ধমাগধী, সম্ভাবিতা ও পৃথুলা। এই গীতিগুলি দেশী তথা দেশসম্ভবা হ'লেও ধ্রুবাগানে প্রযুক্ত হ'ত। তাই ধ্রুবাকেও অনেকে দেশীগান বলেন। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে ধ্রুবায় জাতিরাগ ও গ্রামরাগের ব্যবহার হ'ত, সুতরাং তারা দেশীগান নয়—গান্ধর্বই।

ভরতের মতে চারটি গীতির আশ্রয়ভূত বারটি গ্রামরাগ হওয়া উচিত, কিন্তু ৩২শ অধ্যায়ে (কাশী-সংস্করণ) তিনি "মুখেতু মধ্যমগ্রামঃ ষড়্‌জং প্রতিমুখে স্মৃতঃ" (৩২।৪৫৩-৪৫৪) প্রভৃতি শ্লোকে পাঁচটি গ্রামরাগের নামোল্লেখ করেছেন।[২৫] রাগনামেও শিক্ষাকার নারদের সঙ্গে তাদের মিল আছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে মতঙ্গ, যাষ্টিক, শার্দুল প্রভৃতি যে অর্থে গীতি-শব্দ ব্যবহার করেছেন, নাট্যশাস্ত্রে গীতির সার্থকতা তাঁদের থেকে একটু ভিন্ন—যদিও মতঙ্গ রাগলক্ষণাধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন: "প্রথমা মাগধী জ্ঞেয়া * * ইতি ভরতমতে"।[২৬] কল্লিনাথ সঙ্গীত-রত্নাকরের টীকায় (২।১।৬-৭) এদের পার্থক্যের কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন: "নম্নু পূর্বোক্তাভ্যো মাগধ্যাদিগীতিভ্যোঽধুনোক্তানাং শুদ্ধাদিগীতানাং কো ভেদ ইতি চেৎ; উচ্যতে। মাগধ্যাদয়ঃ প্রাধান্যেন পদতালাশ্রিতাঃ, শুদ্ধাদয়স্তু প্রাধান্যেন স্বরাশ্রিতা * * "। অর্থাৎ দুর্গাশক্তি যে শুদ্ধাদি পাঁচটি গীতির কথা বলেছেন, ভরত-কর্তৃক উল্লিখিত মাগধী-আদি গীতির সঙ্গে তাদের পার্থক্য হ'ল: মাগধী প্রভৃতি চারটি গীতিতে পদ ও তালের প্রাধান্য থাকে, কিন্তু শুদ্ধাদি পাঁচটি গীতিতে স্বরেরই প্রাধান্য।

কিন্তু হরিবংশে যে ছ'টি গ্রামরাগের উল্লেখ আছে তারা বেশ প্রাচীন। শিক্ষাকার নারদের মতেও গ্রামরাগ আসলে ছ'টি, কেননা কৈশিক-গ্রামরাগটি শাস্ত্রী কশ্যপ পরবর্তীকালে (নারদীশিক্ষার আগে তো বটেই) সৃষ্টি করেছেন। তবে কৈশিকরাগ যে বেশ প্রাচীন রামায়ণ-মহাভারতে উল্লেখই তা

২৫। সম্ভবত শিক্ষাকার নারদের মতো সাতটি গ্রামরাগই ভরত স্বীকার করতেন।

২৬। বৃহদ্দেশী (ত্রিবান্দ্রম সংস্করণ), পৃঃ ৮২

প্রমাণ ক'রে। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে কাঞ্চিরাজ মহেন্দ্রবর্মণ-কর্তৃক উৎকীর্ণ পাদুকট্টাইরাজ্যের অন্তর্গত কুডিমিয়ামালাই-প্রস্তরলিপিতেও সাতটি গ্রামরাগের উল্লেখ আছে। সাতটি গ্রামরাগের নাম ষাড়ব, পঞ্চম, মধ্যমগ্রাম, ষড়্‌জগ্রাম, সাধারিত, কৈশিকমধ্যম ও কৈশিক। নারদীশিক্ষায় উল্লিখিত রাগনামের সঙ্গে এদের মিল আছে। নারদ উল্লেখ করেছেন: "* * ষাড়বং বিদ্যাৎ" (৩৷৫), "* * পঞ্চমমীদৃশং বিদ্যাৎ" (৩৷৬), "* * মধ্যমগ্রামমুচ্যতে" (৩৷৭), "* * ষড়্‌জগ্রামং তু নির্দিশেৎ" (৩৷৮), "* * তং তু সাধারিতং (৩৷৯), "তস্মাৎ কৈশিকমধ্যমঃ" (৩৷১০), "কশ্যপঃ কৈশিকং প্রাহ মধ্যমগ্রামসম্ভবম্‌" (৩৷১১)। তৃতীয় কণ্ডিকার ৫ম থেকে ১১শ শ্লোকগুলিতে নারদ সাতটি প্রাচীন গ্রামরাগের নামোল্লেখ করেছেন। হরিবংশে উল্লিখিত ছ'টি গ্রামরাগের গঠন ও প্রকাশভঙ্গি সম্ভবত নারদীশিক্ষায় বর্ণিত গ্রামরাগগুলির মতো ছিল। টীকাকার নীলকণ্ঠ-কর্তৃক গ্রামরাগ অনুযায়ী শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়ী, মিশ্রা ও গীতির উল্লেখ মনে হয় ঠিক নয়, কেননা এগুলি অনেক পরবর্তীকালের তথা খৃষ্টীয় শতাব্দীর।

হরিবংশে উল্লিখিত ছালিক্যগানের ক্রমবিকশিত ছ'টি গ্রামরাগ যদি নারদী-শিক্ষায় বর্ণিত ষাড়ব, পঞ্চম, মধ্যমগ্রাম, ষড়্‌জগ্রাম, সাধারিত, কৈশিকমধ্যম ও কৈশিক হয়[২৭] তো তাদের গঠন বা স্বরূপ কি ধরণের ছিল তার কিছুটা অনুমান করা অসম্ভব নয়। নারদীশিক্ষাকার এদের মোটামুটি স্বরমূর্তির পরিচয় দিয়েছেন[২৮] সেই রূপগুলি প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল ও তাদের অনুসরণ ক'রেই যে নারদ তাঁর শিক্ষায় উল্লেখ করেছেন একথা অনুমান করলে অসমীচীন হবে না। মন্দ্র, মধ্য ও

২৭। (ক) অধ্যাপক শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন: "* * which seem to correspond to the grāmarāgas given in the *Nāradiyā-Sikṣā* the text of which should therefore, be considered as earlier than the seventh century".—*Rāgas and Rāginis* (1948), p. 15.

(খ) প্রজ্ঞানানন্দ: *Some Musical Features in Nāradi-Sikṣā and Nātya-Śāstra* (Vide the Souviner of Entally Cultural Conference, 9th Annual Session, 1956, pp. 7-8).

২৮। (ক) ঋষভোত্থিতঃ ষড়্‌জহতো ধৈবতসহিতশ্চ পঞ্চমো যত্র।
নিপতন্তি মধ্যমরাগে তন্নিষাদং ষাড়বং বিদ্যাৎ।

(খ) যদি পঞ্চমো বিরমতো গান্ধারশ্চান্তরস্বরো ভবতি।
ঋষভো নিষাদসহিতস্তং পঞ্চমমীদৃশং বিদ্যাৎ।

(গ) গান্ধারস্যাধিপত্যেন নিষাদস্য গতাগতৈঃ।
ধৈবতস্য চ দৌর্বল্যান্ মধ্যমগ্রামমুচ্যতে।

তার এই তিন স্থানে লীলায়িত ক'রে ছালিক্যগানে গ্রামরাগগুলির বিকাশ-সাধন করা হ'ত। বিচিত্র রাগ, তাল, মূর্ছনা, লয় প্রভৃতি উপাদানসমন্বিত ছালিক্যগান শুনে যদুবংশের অভিজ্ঞ ও সাধারণ সকল ব্যক্তিই চমৎকৃত ও স্তব্ধ হয়েছিলেন: "সমাধিযুক্তান্"। ভৈমরা পরে এই গান শিক্ষাও করেছিলেন গন্ধর্বদের কাছ থেকে ও তাঁরাই নাকি ভারতে এ'গান প্রচার করেন।

হল্লীসক একপ্রকার নৃত্য। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে মিলে এই নৃত্যের রূপ দান করত। অভিনবগুপ্ত মণ্ডলীকৃত নৃতকে হল্লীসক বলেছেন: "মণ্ডলেন তু যৎ নৃত্যং হল্লীসকমিতি স্মৃতম্"। নীলকণ্ঠ বলেছেন: "হল্লীসকং বহুভিঃ স্ত্রীভিঃ সহ নৃত্যম্"। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে প্রাচীন ভারতে ক্রীড়া হিসাবে একে হল্লীষক্রীড়া বলা হ'ত। হরিবংশে এই নৃত্য সম্বন্ধে উল্লেখ আছে,

তাস্ত পঙ্‌ক্তীকৃতাঃ সর্বাঃ রময়ন্তি মনোরমম্।
গায়ন্ত্যঃ কৃষ্ণচরিতং দ্বন্দয়ো গোপকণ্যকাঃ।
কৃষ্ণলীলানুকারিণ্য কৃষ্ণপ্রণিহিতেক্ষণাঃ ॥[২৯]

পণ্ডিত অনন্ত শাস্ত্রী ফার্কে এসে রাসক্রীড়াবিশেষ বলেছেন: "রাসক্রীড়াবিশেষ এব"। রাসক্রীড়া বা রাসনৃত্যে ও হল্লীসকক্রীড়া বা হল্লীসকনৃত্যে পার্থক্য হ'ল রাসনৃত্যে এক একজন বালক বা পুরুষের পর এক একজন বালিকা বা প্রাপ্তবয়স্কা নারী থাকতেন, কিন্তু হল্লীসকে একজন বালক বা পুরুষ মাঝখানে ও তাকে মণ্ডলাকারে ঘিরে নারীরা নৃত্য, গীত ও বাদ্য করতেন।[৩০]

(ঘ) ইষৎস্পৃষ্টো নিষাদস্তু গান্ধারশ্চাধিকো ভবেৎ।
ধৈবতঃ কম্পিতো যত্র ষড়্‌গ্রামং তু নির্দিষেৎ।

(ঙ) অন্তরঃ স্বরসংযুক্তা কাকলির্যত্র দৃশ্যতে।
তং তু সাধারিতং বিদ্যাৎ পঞ্চমস্থং তু কৈশিকম্।

(চ) কৈশিকং ভাবয়িত্বা তু স্বরৈঃ সর্বৈঃ সমন্ততঃ।
যস্মাৎ তু মধ্যমে ন্যাসস্তস্মাৎ কৈশিকমধ্যমঃ।

(ছ) কাকলির্দৃশ্যতে যত্র প্রাধান্যং পঞ্চমস্য তু।
কশ্যপঃ কৈশিকং প্রাহ মধ্যমগ্রামসম্ভবম্।

ভট্টশোভাকার টীকাতে এদের রূপ আরো সুস্পষ্ট করেছেন।

২৯। হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব ২০।২৫-২৬

৩০। রাসক্রীড়ায়াং কন্যাকামন্তরা বালকস্তমন্তরা চ কন্যকা। অত্র চ মধ্য এক এব বালকস্তিষ্ঠতি, তমভিতো মণ্ডলাকারং বিধায় গায়ন্ত্যো নৃত্যন্ত্যো বালিকাঃ পরিভ্রমন্তি।—Vide *Sarasvati Bhavan Studies*, Vol. X, p. 80.

নীলকণ্ঠ উল্লেখ করেছেন 'হল্লীসক' শব্দের জায়গায় যদি 'ঝল্লীসক' পড়া যায় তো তার অর্থ হয় সাতটি তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ: "ঝল্লীসকমিতি পাঠে তদাখ্যবাদ্য-বিশেষম্। ঝল্লীসকমিতি পাঠে নিষাদর্ষভাদিসপ্তস্বরযুতং ঝল্লীসকং বাদ্যবিশেষম্"। 'ঝল্লীসক' সাতটি তন্ত্রী বা তারযুক্ত হ'লে সেটি নাট্যশাস্ত্রে বা বৌদ্ধজাতকে উল্লিখিত সাত তারযুক্ত চিত্রাবীণা ও বর্তমানের সেতারের মতো বাদ্যযন্ত্র ছিল মনে করা যায়। ঝল্লীসক শব্দ গ্রহণ করলে "ঝল্লীসকং তু স্বয়মেব কৃষ্ণ, সবংশঘোষং নরদেব পার্থ" শ্লোকাংশের অর্থ হয় কৃষ্ণ সাততারযুক্ত কোন বাদ্যযন্ত্র বা বীণা ও অর্জুন বংশ বা বেণু আর অপরের মৃদঙ্গ বাজিয়েছিলেন ('মৃদঙ্গবাদ্যানপরাংশ্চ বাদ্যান্')। মনে হয় নৃত্য হিসাবে 'হল্লীসক' পাঠ গ্রহণ করাই সমীচীন, কেননা হল্লীস বা হল্লীসক একটি প্রসিদ্ধ নৃত্যবিশেষ।

হরিবংশকার উল্লেখ করেছেন: "আসারিতান্তে চ ততঃ প্রতীতা"। টীকাকার নীলকণ্ঠ 'আসারিত' অর্থে অভিনয়ের অঙ্গ হিসাবে নৃত্যক্রিয়াবিধি বলেছেন। আসারিতক্রিয়ায় প্রথম নর্তকীপ্রবেশ, তারপর অভিনয়-প্রদর্শন, পরে তাল ও ছন্দের অনুযায়ী অঙ্গহার-প্রয়োগ ও পরিশেষে দেবতা চিহ্নরূপে নৃত্য প্রদর্শন বোঝায়।[৩১] এ'চারটি ক্রিয়া অভিসার-অনুষ্ঠানে প্রয়োগ করা হ'ত। ভরত নাট্যশাস্ত্রে আসারিত-নৃত্যক্রিয়া সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন,

কৃত্বা কুতপবিন্যাসং যথাবদ্দ্বিজসত্তমাঃ ॥
আসারিতঃ প্রয়োগস্তু ততঃ কার্যঃ প্রযোক্তৃভিঃ।
তত্র চোপোহনং কৃত্বা তন্ত্রীভাণ্ডসমন্বিতম্ ॥
কার্যঃ প্রবেশো নর্তক্যা ভাণ্ডবাদ্যসমন্বিতঃ।
বিশুদ্ধকরণায়াং তু জাত্যাং বাদ্যং প্রযোজয়েৎ ॥
গীত্যা বাদ্যানুসপিণ্যা ততশ্চারীং প্রযোজয়েৎ।
বৈশাখস্থালকেনেহ সর্বরেচকচারিণী ॥
পুষ্পাঞ্জলিধরা ভূত্বা প্রবিশেদ্রঙ্গমণ্ডপম্।
পুষ্পাঞ্জলিং বিসৃজ্যাথ রঙ্গপীঠং পরীত্য চ ॥
প্রণম্য দেবতাভ্যস্তু ততোঽভিনয়মাচরেৎ।
তত্রাভিনেয়গীতং স্যাৎ তত্র বাদ্যং ন যোজয়েৎ ॥

৩১। "আসারিতান্ ইতি। ভরতো মুনিশ্চতুর্বিধমাসারিতং নৃত্যবিধাবুপদিদেশেতি। প্রথমং নর্তকীপ্রবেশঃ, ততশ্চাসারিতার্থাভিনয়ং নাট্যং, ততস্তালানুগত্যাঙ্গহরণং, ততো দেবতাচিহ্নরূপেণ নৃত্যম্। এবং চতুর্ষ্প্যাভিসারেষুক্তম্। এবমেষ নর্তকীপ্রবেশো ভরতস্যানুমতঃ।" —নীলকণ্ঠ

অঙ্গহারপ্রয়োগে তু ভাণ্ডবাদ্যং প্রযোজয়েৎ।
সমং রক্তং বিভক্তং চ স্ফুটং শুদ্ধপ্রহারজম্ ॥[৩২]

কুতপ-বিন্যাসের পর নর্তকী (বা নর্তক) আসারিতনৃত্যের অনুষ্ঠান করত। 'কুতপ' অর্থে আসন বা আসর বিছানো বা চার রকম বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে ভরত নিজেই 'কুতপ' শব্দের অর্থ দু' তিন রকমভাবে করেছেন। যেমন: (১) 'কুতপমিতি চতুর্বিধাতোদ্যভাণ্ডাণি'. (২) 'চতুর্বিধাতোদ্যং কুতপম্', (৩) 'কুতপঃ সংফেট-গায়নবাদকসমূহঃ' প্রভৃতি।[৩৩] আমাদের মনে হয় কুতপ অর্থে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রাদির সমাবেশ ক'রে নাট্যোপযোগী বা নৃত্যোপযোগী অভিনয়মঞ্চে আসর তৈরী করা (আসন বিছানো) বোঝায়। আসরসজ্জার পর মৃদঙ্গ (ভাণ্ডবাদ্য)[৩৪] ও বীণাদি বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে উপোহন শেষ হ'লে একজন নর্তকী অভিনয়মঞ্চে প্রবেশ ক'রে ভাণ্ডবাদ্যের তালে তালে নৃত্য করত। সেই নৃত্যে বিশুদ্ধ করণের[৩৫] অনুসরণ ও বাদ্যযন্ত্রে জাতিরাগের বিকাশ থাকত। তারপর সঙ্গীতের সঙ্গে চারীর[৩৬] সমাবেত থাকত। নর্তকী অঞ্জলীতে ফুল নিয়ে বৈশাখভঙ্গিতে মঞ্চে প্রবেশ ও পদ, হস্ত, কটিদেশ ও গ্রীবা এই চার রকম রেচক প্রদর্শন করত। পরে হাতের ফুল ছড়াতে ছড়াতে অভিনয়মঞ্চ পরিভ্রমণ ও দেবতাদের নমস্কার ক'রে অভিনয় আরম্ভ করত। আকার-ভঙ্গির সঙ্গে যখন কোন গানের পরিবেশন করা হ'ত তখন বাদ্যযন্ত্রের সহযোগ থাকত না, কিন্তু অঙ্গহার[৩৭] প্রদর্শনের সময় মৃদঙ্গ (ভাণ্ডবাদ্য) বাজানো হ'ত। মৃদঙ্গের সুস্পষ্ট

৩২। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সংস্করণ] ৪।২৬৮-২৭৪

৩৩। অধ্যাপক শ্রীমনোমোহন ঘোষ-অনূদিত ইংরাজী *The Nāṭyaśāstra*, Vol. I (1951), p. 30 দ্রষ্টব্য।

৩৪। ভাণ্ডবাদ্য মৃত্তিকা-নির্মিত মৃদঙ্গবিশেষ। দক্ষিণ-ভারতে এখনো এর প্রচলন আছে।

৩৫। একটি 'করণ' সম্বন্ধে ভরত নাট্যশাস্ত্রের (কাশী সং) চতুর্থ অধ্যায়ে ৫৭ শ্লোকে উল্লেখ করেছেন: "প্রায়েণ করণে কার্যো বামো বক্ষঃস্থিতঃ করঃ, চরণস্যানুগশ্চাপি দক্ষিণস্তু ভবেৎ করঃ। হস্তপাদপ্রচারং তু কটিপার্শ্বোরুসংযুতম্। উরঃ পৃষ্ঠোদরোপেতং নৃত্তমার্গে নিবোধত' প্রভৃতি। শুভঙ্কর-কৃত 'সঙ্গীত-দামোদর' ৩র্থ স্তবক দ্রষ্টব্য।

৩৬। ভরত উল্লেখ করেছেন: "এবং পাদস্য জঙ্ঘায়া উর্বোঃ কট্যাস্তথৈব চ। সমানকরণাচ্চেষ্টা সা চারীত্যভিধীয়তে ॥ * * একপাদপ্রচারো যঃ সা চারীত্যভিসংজ্ঞিতা। দ্বিপাদক্রমণং যত্তু করণং নাম তদ্ভবেৎ ॥"—নাট্যশাস্ত্র (কাশী] ১১।১-৩

৩৭। 'অঙ্গহার' বলতে বোঝায় অঙ্গবিক্ষেপ: "অঙ্গাহারোঽঙ্গবিক্ষেপ ইতি"। অঙ্গ বলতে উপাঙ্গ, প্রত্যঙ্গ প্রভৃতিও বুঝতে হবে। মুনি তণ্ডু বত্রিশটি অঙ্গহারের উল্লেখ করেছেন: "দ্বাত্রিংশদেতে

আঘাতে সম, রক্ত, বিভক্ত প্রভৃতি যোজনার অভিব্যঞ্জনা হ'ত ও তখন নৃত্যের বিভিন্ন ভঙ্গি শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করত। অভিনয়ের উদ্দেশ্যে আসারিতনৃত্যের বিধি ও প্রয়োগ মনে হয় মহাভারত-হরিবংশের সময়ে (৩০০—২০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ) এভাবেই প্রচলিত ছিল ও যদুবংশের অভিজ্ঞগণ, গন্ধর্ব ও অপ্সরা (নর্তকীরা) নিশ্চয়ই এই প্রয়োগবিধি অনুসরণ করেই আসারিতনৃত্য করেছিলেন। উল্লিখিত হয়েছে "আসারিতান্তে"—আসারিতনৃত্যের পর অভিনয়চতুরা রম্ভা নৃত্যের জন্য অভিনয়মঞ্চে প্রবেশ করলো।

আসারিতনৃত্যের প্রসঙ্গে আসারিতগান বা গীতির কথাও উল্লেখযোগ্য। পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে (৪৫ পৃষ্ঠা) 'আসারিত' নাটকের জন্য অভিপ্রেত গান। এই গানে মুখ, প্রতিমুখ, দেহ ও সংহার-রূপ অঙ্গগুলির প্রয়োজন হয়। ভরত উল্লেখ করেছেন: "মুখং প্রতিমুখং চৈব দেহ-সংহরণং তথা, অঙ্গান্যেতানি চত্বারি" (৩১।১৯৩)। তাছাড়া ষাড়বাদি গ্রামরাগের সমাবেশও এই নাটকীয় আসারিত-গানে থাকত। নাট্যশাস্ত্রের (কাশী সং) ৩১শ অধ্যায় আসারিতগানের ("আসারিতেষু গীতেষু" ৩১।২২৪; "গীতেষ্বারিতেষু চ" ৩১।২২৪, ১৭) রূপ বা গঠনের পরিচয় দেওয়া আছে। আসারিতগান মোটামুটি তিন রকম: "আসারিতানাং সর্বেষাং ত্রয়ো ভেদাঃ প্রকীর্তিতাঃ" (৫১।২০৮)।[৩৮] আসারিত-নৃত্যকে 'চিত্রতাণ্ডব'ও বলে ও এ'সম্বন্ধে আগেই পরিচয় দিয়েছেন একথা ভরত ৩১শ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন: "নৃত্যমুৎপাদিতং পূর্বং চিত্রতাণ্ডবসংজ্ঞিতম্" (৩১।২২৬)। চিত্রতাণ্ডব বা আসারিতনৃত্যকে নিয়ন্ত্রিত ও ছন্দায়িত করার জন্য বিশুদ্ধ করণ ও বাদ্যযন্ত্রের সহযোগ থাকত: "বিশুদ্ধকরণায়াং তু জাত্যাং বাদ্যং প্রযোজয়েৎ"। বাদ্যযন্ত্রে 'জাতি' বলতে শুদ্ধ সপ্ত-জাতিরাগের আলাপ করা হ'ত। হরিবংশে উল্লেখ আছে,

> গান্ধর্বজাতিশ্চ তথাপরাপি
> দীপাদ্‌যথা দীপশতানি রাজন্।
> বিবেদ কৃষ্ণশ্চ সনারদশ্চ
> প্রদ্যুম্ন মুখৈর্নৃপ-ভৈমমুখ্যোঃ॥

গান্ধর্ব বলতে গান। জাতিরাগও জাতিরাগ থেকে সৃষ্ট গ্রামরাগ প্রভৃতি সামগানোত্তর

সংপ্রোক্তাস্ত্বঙ্গহারাস্তু নামতঃ" (নাট্যশাস্ত্র, কাশী সং ৪।১৭-২৭)। একশত আটটি অঙ্গহারের বিবরণ নাট্যশাস্ত্রে, কাশী সং ৪র্থ অধ্যায় ও সঙ্গীত-দামোদর, ৪র্থ স্তবক দ্রষ্টব্য।

৩৮। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সংস্করণ) ৩১।২০৮—২২৫

গান গান্ধর্বেরই অন্তর্ভুক্ত। ভরত উল্লেখ করেছেন আসারিতনৃত্যকে ছন্দান্বিত ও সুষমাযুক্ত করার জন্য যে সকল বাদ্যযন্ত্রের সমাবেশ থাকত তাদের মধ্যে জাতিরাগের অনুরণন থাকত : "তু জাত্যাং বাদ্যং প্রযোজয়েৎ"। হরিবংশকার বলেছেন : "বাদ্যানুরূপং ননৃতুঃ সুগাত্র্যঃ"; সুতরাং বাদ্যের সঙ্গে নৃত্যছন্দের সম্পূর্ণ মিতালী ছিল ও তার পেছনে বহুদিনের শিক্ষা ও সাধনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নৃত্যে ও অভিনয়ে হাব-ভাবাদির পূর্ণ-বিকাশ ছিল। ভরত বলেছেন চিত্ত বা মন থেকে ভাবের সৃষ্টি হয় : "ভাবশ্চিত্তসমুত্থিতঃ" (২৪।১০)। ভাব রসেরই পরিণতি। ভরতের অভিমতে আদিরস শৃঙ্গারই সকল ভাবের মূল : "য এব ভাবাঃ সর্বেষাং শৃঙ্গাররসসংশ্রয়াঃ" (২৪।১১)। হরিবংশকার উল্লেখ করেছেন আয়তনেত্রা নর্তকী ও ভৈমস্ত্রীরা গন্ধ, মাল্য, দিব্যবস্ত্র, হেলা, হাস্য, কটাক্ষ, ইঙ্গিত, বিভিন্ন খেলা, রোষ, মনের অনুকূল প্রসাদ বা প্রসন্নতা প্রভৃতি ভাব দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের মনহরণ করেছিল এবং শ্রীকৃষ্ণ তাদের প্রীতি সম্পাদন করেছিলেন। যেমন,

> গন্ধৈর্মাল্যৈশ্চ তা দিব্যৈর্বস্ত্রৈশ্চায়তলোচনাঃ
> হেলাভির্হাস্যভাবৈশ্চ জহ্রুর্ভৈমমনাংসি তাঃ ॥
> কটাক্ষৈরিঙ্গিতৈর্হাসৈঃ কেলিরোষৈঃ প্রসাদিতৈঃ।
> মনোঽনুকূলৈর্ভৈমানাং সমাজহ্রুর্মনাংসি তাঃ।
>
> *　　　　*　　　　*
>
> কৃষ্ণোঽপি তেষাং প্রীত্যর্থং বিজহ্রে বিয়তি প্রভুঃ।

ভরত নাট্যশাস্ত্রের ৭ম অধ্যায়ে ভাবব্যঞ্জনা ও ২৪ অধ্যায়ে সামান্যাভিনয় প্রসঙ্গে রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, লীলা, বিলাস প্রভৃতির পরিচয় দিয়েছেন। অভিনয় ও নৃত্যের এগুলি অঙ্গ বা অলংকার। তিনি বলেছেন ললিতাভিনয়াত্মিকা হেলা, লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত ও বিহৃত এগুলি স্ত্রীলোকদের স্বাভাবিক ভাব।[৩৯]

বিষ্ণুপর্বের ৯২-৯৩ অধ্যায় দু'টি সঙ্গীতের ঐতিহাসিক উপাদানের পক্ষে

৩৯। সমাখ্যাতা বুধৈর্হেলা ললিতাভিনয়াত্মিকা।
লীলাবিলাসোবিচ্ছিত্তিবিভ্রমঃ কিলকিঞ্চিতম্।
মোট্টায়িতং কুট্টমিতং বিব্বোকো ললিতং তথা ॥
বিহৃতং চেতি সংযুক্তা দশ স্ত্রীণাং স্বভাবজাঃ।
—নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ২৪।১১-১৩, কাব্যমালা সং ২২।১১-১৩

বিশেষ প্রয়োজনীয়। হরিবংশকার বজ্রনাভবধ-উপাখ্যানে উল্লেখ করেছেন ভদ্র নামক নট বাসুদেবের যজ্ঞে প্রবেশ ক'রে মুনিদের কাছ থেকে বর লাভ করেন ও শ্রীকৃষ্ণের আদেশ অনুসারে যাদবদের সঙ্গে বজ্রপুরে গমন করেন। তিনি বজ্রপুরে বজ্রনাভ নামক দৈত্যকে বধ করার জন্য একটি নাটক অভিনয় করেন। বজ্রনাভের প্রতি হংসীদের উক্তি থেকে জানা যায় শ্রীকৃষ্ণ দৈবীমায়াকে আশ্রয় ক'রে বজ্রনাভের বধের জন্য ভৈমগণকে নটবেশে পাঠিয়েছিলেন:

> দৈবীং মায়াং সমাশ্রিত্য সংবিধায় হরির্নটম্।
> নটবেশেন ভৈমানাং প্রেষয়ামাস ভারত ॥
> প্রত্যুম্নং নায়কং কৃত্বা সাম্বং কৃত্বা বিদুষকম্।
> পারিপার্শ্বে গদং বীরমন্যান্ ভৈমাংস্তথৈব চ ॥
> বারমুখ্যা নটীং কৃত্বা তত্তুর্যসদৃশাস্তদা।
> তথৈব ভদ্রং ভদ্রস্য সহায়াংশ্চ তথাবিধান্ ॥[৪০]

শ্রীকৃষ্ণ প্রদ্যুম্নকে নায়ক, শাম্বকে বিদুষক, গদকে পারিপার্শ্বিক ও অপর ভৈমগণকে অনুরূপ সাজসজ্জায় শোভিত করেছিলেন। প্রধানা বারনারীদের জন্য সেই সেই তুর্যের অনুরূপ নটীর (গীত-নৃত্যনিপুনা বারনারী) এবং ভদ্র নামক নট ও তাঁর সহচর ও সহায়ক যাঁরা ছিলেন তাঁদের তদনুরূপ রূপসজ্জার কল্পনা করা হয়েছিল।

বিষ্ণুপর্বের ৯৩ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে যে তারপর ভদ্র নট গীত ও নৃত্য প্রদর্শন ক'রে সকলের আনন্দ উৎপাদন করলেন। তিনি রাক্ষসরাজকে বধের জন্য রামায়ণ-মহাকাব্যকে উদ্দেশ্য ক'রে আর একটি নাটক রচনা করলেন:

> রামায়ণং মহাকাব্যমুদ্দেশ্যং নাটকীকৃতম্।
> জন্ম বিষ্ণোরমেয়স্য রাক্ষসেন্দ্রবধেপ্সয়া ॥

সেই নাটকের অভিনয় দর্শন ক'রে বৃদ্ধ দানবেরা বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়েছিল। দৈত্যরাজ বজ্রনাভ আগে থেকেই ভৈমদের অভিনয়-চাতুর্যের কথা শুনেছিলেন। তিনি তাঁর রাজসভায় অভিনয় করার জন্য ভৈমগণকে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠালেন। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলে তিনি ভৈমগণকে বিশেষ সমাদর ক'রে তাঁর রাজধানীতে গ্রহণ করলেন। ভৈমরা রাজাজ্ঞায় গঙ্গাবতরণ-নৃত্যনাট্য কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করলো। তত, ঘন, সুষির,—মুরজ, বীণা, মৃদঙ্গ, আনক প্রভৃতি আতোদ্য-বাদ্যযন্ত্রের সমাবেশ করা হয়েছিল। রঙ্গমঞ্চকে পুষ্পে, পত্রে ও বিভিন্ন পতাকায় ও চিত্রে সুসজ্জিত করা হয়েছিল। ভৈমরা নৃত্য, গীত ও বাদ্যে বিশেষভাবে নিপুণ ছিলেন। নটদের

৪০। হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব ৯২।৫৮-৬০

মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন এবং সাম্বও ছিলেন। নৃত্যনাট্যের প্রস্তাবনায় বিচিত্র বাদ্যযন্ত্রে আলাপের সঙ্গে নান্দী বা আশীর্বচন সম্পন্ন করা হ'ল। পরে প্রদ্যুম্ন ও গদ গঙ্গাবতরণের শ্লোক আবৃত্তি করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে 'দেবগান্ধার'-রাগ ও ছালিক্যগান গীত হ'ল। ভৈমস্ত্রীরা গঙ্গাবতরণের বিষয়বস্তু বর্ণনাচ্ছলে গান্ধারগ্রাম পর্যন্ত লীলায়িত ক'রে ছালিক্যগান করলেন। স্বরসম্পদে, সুরে, তালে, লয়ে সকলে ও বিশেষ ক'রে অসুররাজ ও অসুরেরা চমৎকৃত হলেন। তাঁরা দণ্ডায়মান হ'য়ে বারবার হর্ষধ্বনি ক'রে অভিনেতাদের সম্বর্ধনা জানাতে লাগলেন। হরিবংশে এই বর্ণনাটি অতি সুন্দর ও সুনিপুণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে,

রামলক্ষ্মণশত্রুঘ্না ভরতশ্চৈব ভারত।
ঋষ্যশৃঙ্গশ্চ শান্তা চ তথারূপৈর্নটৈঃ কৃতাঃ॥
তৎকালজীবিনো বৃদ্ধা দানবা বিস্ময়ং গতাঃ।
আচচক্ষুশ্চ তেষাং বৈ রূপতুল্যত্বমচ্যুত॥
সংস্কারাভিনয়ৌ তেষাং প্রস্তাবনাং চ ধারণম্।
দৃষ্ট্বা সর্বে প্রবেশং চ দানবা বিস্ময়ং গতাঃ॥

* * * *

পুরা শ্রুতার্থো দৈত্যেন্দ্রঃ প্রেষয়ামাস ভারত।
আনীয়তাং বজ্রপুরং নটোঽসাবিতি হর্ষিতঃ॥

* * * *

ভৈমাপি বদ্ধনেপথ্যা নটবেষধরাস্তথা।
কার্যার্থং ভীমকর্মাণো নৃত্যার্থমুপচক্রমুঃ॥
ততো ঘনং সসুষিরং মুরজানকভূষিতম্।
তন্ত্রীস্বরগণৈর্বিদ্ধান্নতোদ্যানন্ববাদয়ন্॥
ততস্তু দেবগান্ধারং ছালিক্যং শ্রবণামৃতম্।
ভৈমস্ত্রিয়ঃ প্রজগিরে মনঃশ্রোত্রসুখাবহম্॥
আগান্ধারগ্রামরাগং গঙ্গাবতরণং তথা।
বিদ্ধমাসারিতং রম্যং জাগিরে স্বরসম্পদা॥
লয়তালসমং শ্রুত্বা গঙ্গাবতরণং শুভম্।
অসুরাংস্তোষয়ামাস উত্থায়োত্থায় ভারত॥
নান্দিং বাদয়ামাস প্রদ্যুম্নো গদ এব চ।
সাম্বশ্চ বীর্যসম্পন্নঃ কার্যার্থং নটতাং গতঃ

নান্দ্যন্তে চ তদা শ্লোকং গঙ্গাবতরণাশ্রিতম্।
রৌক্মিণেয়স্তদোবাচ সম্যক্ স্ববিনয়ান্বিতম্॥
রম্ভাভিসারং কৌবেরং নাটকং ননৃতুস্ততঃ।

*　　*　　*　　*

পাদোদ্ধারেণ নৃত্যেন তথৈবাভিনয়েন চ।
তুষ্টুবুর্দানবা বীরা ভৈমানামতিতেজসাম্॥[৪১]

নৃত্য, গীত, বাদ্য ও অভিনয়ের বিধি বা নিয়মকানুন বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ("গীতনৃত্যবিধিজ্ঞানাং") ভৈম ও ভৈমস্ত্রীদের নৃত্য ও অভিনয় দেখে অসুররাজ তাদের সকলকে নানা রত্ন-অলংকারাদি উপহার দিয়েছিলেন। প্রেক্ষাগারে যে সকল দানব দর্শকেরা ছিল ("প্রেক্ষাসু তাসু বহ্বীষু") তারাও অভিনেতা ও নর্তকীদের উপঢৌকন দিয়েছিল।

উপরি-উক্ত শ্লোকগুলিতে উল্লিখিত 'দেবগন্ধর্বগেয়ানি' (বিষ্ণুপ° ৯২।৫০), 'দেবগান্ধারং' (বিষ্ণুপ° ৯৩।২৩), 'আগান্ধারগ্রামরাগং' (৯৩।২৪), 'গঙ্গাবতরণং' (৯৩।২৪-২৫), নান্দিং' (৯৩।১৬), 'পাদোদ্ধারেণ নৃত্যেন তথৈবাভিনয়েন' (৯৩।৩২) শব্দগুলি বিশেষভাবে আলোচনার বিষয়। 'দেবগান্ধর্বগেয়ানি নৃত্যানি চ' শ্লোকাংশ থেকে জানা যায় মহাভারত ও হরিবংশের যুগে গেয় বা গান হিসাবে দেবগেয় বৈদিক সামগান ও গন্ধর্বগেয় গান্ধর্ব বা মার্গগান এই উভয়েরই প্রচলন ছিল। অথবা 'দেবগন্ধর্বগেয়' বল্‌তে একমাত্র সামগানোত্তর ক্ল্যাসিক্যাল গান্ধর্ব বা মার্গগানও অর্থ করা যায়, কেননা ভরত স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন গান্ধর্বগান দেবতাদেরও ইষ্ট এবং গন্ধর্বদেরও প্রীতিকর বা আনন্দদায়ক ছিল: "অত্যর্থমিষ্টং দেবানাং তথা প্রীতিকরং পুনঃ, গন্ধর্বাণামিদং যস্মাৎ তস্মাদ্‌গান্ধর্বমুচ্যতে" (২৮।৯)। "নৃত্যানি বিবিধানি চ" (৯২।৫০)—নানাবিধ নৃত্যে ভৈমস্ত্রীগণ, যাদবেরা, গন্ধর্বেরা ও অপ্সরানামধেয়া নর্তকীরা অভিজ্ঞ ছিলেন। এই বিবিধ নৃত্য কি কি শ্রেণীর ছিল তাদের পরিচয় আমরা নিশ্চয়ই নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত তাণ্ডবলক্ষণ (৪র্থ অধ্যায়) থেকে পেতে পারি। ভরত বত্রিশ রকম অঙ্গহার[৪২] ও একশো আট রকম করণ বা নৃত্যের[৪৩] কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন: "হস্তপাদসমাযোগো নৃত্তস্য

৪১। হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব ৯৩।৮-২৮

৪২। (ক) নাট্যশাস্ত্র (কাশী সংস্করণ) ৪।১৯-২৭

(খ) *The Nātyaśāstra* (Eng. Ed., edited by Dr. M. M. Ghose) Vol. I, pp. 60-65.

৪৩। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ৪।৩১-১৬৮

করণং ভবেৎ" (৪।৩০),—অর্থাৎ নৃত্যের 'করণ' বলতে হস্ত ও পদের সহযোগ বা প্রয়োগ বোঝায়। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন : "অষ্টোত্তরশতং হ্যেতৎ করণানাং ময়োদিতম্" (৪।১৬৯)। সেগুলির নাম যেমন : তলপুষ্পপুট, বর্তিত, বলিতোরু, অপবিদ্ধ, সমনখ, লীন, উন্মত্ত, অলাত, কটীসম, গঙ্গাবতরণ প্রভৃতি। নাট্যশাস্ত্রের তাণ্ডব বা নৃত্যের তালিকায় 'গঙ্গাবতরণ' শেষ করণ বা নৃত্য : "গঙ্গাবতরণং চৈবেত্যুক্তমষ্টাধিকং শতম্" (৪।৫৫)। এই গঙ্গাবতরণ-নৃত্যের কথাই হরিবংশে তিনবার উল্লিখিত হয়েছে।[৪৪] হরিবংশের টীকাকার নীলকণ্ঠ গঙ্গাবতরণ শব্দটি সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নি। গঙ্গাবতরণ অভিনয়াঙ্গ নৃত্য, সুতরাং হরিবংশে অভিনয়ের বিষয়বস্তু হিসাবে গঙ্গাবতরণকে 'নৃত্যনাট্য' বলা যেতে পারে। গঙ্গাবতরণ-করণটির পরিচয় দিতে গিয়ে ভরত বলেছেন,

> ঊর্ধ্বাঙ্গুলিতলৌ পাদৌ ত্রিপতাকাবধোমুখৌ।
> হস্তৌ শিরঃ সন্নতং চ গঙ্গাবতরণং চ তৎ ॥[৪৫]

গঙ্গাবতরণ-নৃত্যের করণে পদতল ও পায়ের আঙুলি ঊর্ধদিকে প্রসারিত ও হাতে ত্রিপতাক প্রদর্শিত হয়, কিন্তু অঙ্গুলিগুলি নিম্নভাগে নমিত ও মস্তক সম্মত বা সম্যকভাবে উন্নত থাকে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই এই নৃত্য করতে পারে : "প্রযোক্তব্যঃ স্ত্রীপুংসাভিনয়ে করঃ" (৯।২৬)। ত্রিপতাক হস্তমুদ্রাবিশেষ। পতাকহস্তের অনামিকা অঙ্গুলিকে বক্র করলে 'ত্রিপতাক' হয়।[৪৬] পতাকহস্তে হাতের অঙ্গুলিগুলির অগ্রদেশ প্রসারিত ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কুঞ্চিত হয়।[৪৭] হস্তমুদ্রাগুলি মনের ভাব বা চিত্তবৃত্তির প্রকাশক। ত্রিপতাকহস্ত আবাহন, অবতরণ, বিসর্জন, নিষেধ, প্রবেশ, প্রণাম, বিদায় দেওয়া, অন্য কোন ইঙ্গিত বোঝানো, কোন সন্দিগ্ধ ব্যাপারে মস্তকে হাত দেওয়া, মাথার উষ্ণিষ বা পাগড়ী অথবা মুখ বা চোখ বোঝানো প্রভৃতি ব্যাপারে প্রদর্শিত হয়। ত্রিপতাকের মধ্যমাঙ্গুলি অশ্রুজল, তিলকদান বা পত্রলেখা প্রভৃতি

৪৪। (১) "গঙ্গাবতরণং তথা" (৯৩।২৪), (২) "গঙ্গাবতরণং শুভম্" (৯৩।২৫) ও (৩) "গঙ্গাবতরণাশ্রিতম্" (৯৩।২৭)।

৪৫। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সংস্করণ) ৪।১৬৮

৪৬। পতাকে তু যদা বক্রাঽনামিকা ত্বঙ্গুলির্ভবেৎ।
ত্রিপতাকঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কর্ম চাস্য নিবোধত ॥ ৯।২৭

৪৭। প্রসারিতাগ্রাঃ সহিতা যস্যাঙ্গুল্যো ভবন্তি হি।
কুঞ্চিতশ্চ তথাঙ্গুষ্ঠঃ স পতাক ইতি স্মৃতঃ ॥ ৯।১৮

বিষয় বুঝিয়ে থাকে।[৪৮] মহাভারত ও হরিবংশের যুগে অভিনেতা ও বিশেষ ক'রে নর্তক ও নর্তকীরা অবশ্যই এই শাস্ত্রীয় ধারা অনুসরণ ক'রে তাঁদের অভিনয় ও নৃত্যাদি অনুষ্ঠান করতেন।

হরিবংশে উল্লেখ করা হয়েছে: "আগান্ধারগ্রামরাগম্"। নীলকণ্ঠ টীকায় বলেছেন: "আগান্ধারমিতি। নিষাদর্ষভগান্ধারষড়্জমধ্যমধৈবতাখ্যান্ সপ্ত স্বরান্ বাপ্য গ্রামঃ কতিপয়স্বরসঙ্ঘঃ। তে চ ত্রয়ঃ"। সাত স্বর নিয়েই গ্রামের কাঠামো তৈরী হয়। ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধার এই তিনটি গ্রাম। রামায়ণ, মহাভারত ও হরিবংশের যুগে গান্ধর্বগানে গান্ধারগ্রামেরও প্রচলন ছিল বোঝা যায়। তবে ষড়্জগ্রামই সকলের চেয়ে প্রাচীন আর তার জন্যই ষড়্জগ্রামকে আধারগ্রাম বলে।

ছ'টি গ্রামরাগের আলোচনা আগেই করা হয়েছে। নারদীশিক্ষায় উল্লিখিত কৈশিককে নিয়ে সাতটি গ্রামরাগের কথাও আমরা জানি।[৪৯] অনেকের মতে ষাড়ব, সাধারিতাদি সাতটি গ্রামরাগ সাতটি প্রচলিত গ্রামের (প্রাচীন ঠাট বা স্কেল) কথা প্রমাণ করে। শার্ঙ্গদেবও সঙ্গীত-রত্নাকরে সাতটি গ্রামরাগের কথা উল্লেখ করেছেন। নাট্যশাস্ত্রে[৫০] "মুখে তু মধ্যমগ্রামঃ" (কাশী সং ৩২।৪৫৩-৪৫৪) প্রভৃতি শ্লোকে পাঁচটি গ্রামরাগের উল্লেখ থাকলেও ভরত যে নারদীশিক্ষার সাতটি

৪৮। আবাহনমবতরণং বিসর্জণং বারণং প্রবেশশ্চ।
উন্নামনং প্রণামো নিদর্শনং বিবিধবচনম্ চ॥
মাঙ্গল্যদ্রব্যাণাং স্পর্শঃ শিরসোঽথ সন্নিবেশশ্চ।
উষ্ণীষমুকুটধারণাসাঙ্গশ্রোত্রসংবরণম্॥
অস্যৈব চাঙ্গুলীভ্যামধোমুখপ্রস্থিতৌ স্থিতচলাভ্যাম্।
লঘুচটপবনস্রোতোভুজগতভ্রমণাদিকান্ কুর্যাৎ॥
অশ্রুপ্রমার্জনতিলকবিরোচনলোচনালম্ভনকং চ।
ত্রিপতাকানামিকয়া দর্শনমলকস্য কার্যঞ্চ॥ —নাট্যশাস্ত্র ৯।২৮-৩১

৪৯। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ কুডিমিয়ামালাই-লিপিও সাতটি গ্রামরাগের কথা স্বী[illegible] দান করে।

৫০। মুখে তু মধ্যমগ্রামঃ ষড়্জং প্রতিমুখে স্মৃতঃ।
সাধারিতং তথা গর্ভে মর্শে কৈশিকমধ্যমঃ॥
কৈশিকঞ্চ তথা কার্যং গানং নির্বহণে বুধৈঃ।
সন্ধিবৃত্তাশ্রয়শ্চৈব রসভাবসমন্বিতঃ॥
মতঙ্গের বৃহদ্দেশীতেও (পৃঃ ৮৭) ভরতের এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করা হয়েছে।

গ্রামরাগের কথা জানতেন তা ধ'রে নেওয়া অসমীচীন হবে না। শার্ঙ্গদেব ভরত, দত্তিল, কোহল, যাষ্টিক, মতঙ্গ প্রভৃতি সঙ্গীতশাস্ত্রীদের মতের অনুগামী ছিলেন, সুতরাং তিনি যে রাগ-তালিকার শিরোদেশে শুদ্ধ-গ্রামরাগগুলিকে স্থান দিয়েছেন তা থেকে মনে করা যেতে পারে ষাড়বাদি সাতটি গ্রামরাগ বেশ প্রাচীন ও প্রামাণিক। হরিবংশেও উল্লেখ থাকায় তাদের প্রাচীনতা প্রমাণ হয়।

সাতটি গ্রামরাগের নাম থেকে সাধারণভাবে ষড়জ্‌গ্রাম ও মধ্যমগ্রামই 'গ্রাম' তথা প্রাচীন ঠাট-শ্রেণীভুক্ত বলে মনে হয়। তারপর কৈশিক ও কৈশিক-মধ্যম গ্রামরাগ দু'টির প্রসঙ্গেও বলা যেতে পারে যে এ'দুটির স্বরসজ্জা বা গঠন প্রায় একই রকমের ও তারা মধ্যমগ্রাম থেকে উৎপন্ন। নারদ উল্লেখ করেছেন,

> কৈশিকং ভাবয়িত্বা তু স্বরৈঃ সর্বৈঃ সমন্ততঃ।
> যস্মাৎ তু মধ্যমে ন্যাসস্তস্মাৎ কৈশিকমধ্যমঃ॥
> কাকলিদৃশ্যতে যত্র প্রাধান্যং পঞ্চমস্য তু।
> কশ্যপঃ কৈশিকং প্রাহ মধ্যমগ্রামসম্ভবম্‌॥[৫১]

অর্থাৎ যখন মধ্যমস্বরকে ন্যাস করা হয় তখনই কৈশিকমধ্যম ও যখন পঞ্চমকে প্রধান স্বর হিসাবে গ্রহণ করা হয় তখনই কৈশিক, আর সমস্ত স্বরের সমাবেশই দু'টি গ্রামরাগে এক। একমাত্র মধ্যম ও পঞ্চম স্বর-দু'টির ন্যাস ও প্রাধান্যের জন্য একই গ্রাম (মধ্যমগ্রাম) থেকে সৃষ্ট ও একই স্বরসজ্জার রাগকে দু'টি পৃথক রাগ বলে অনুভূত হয়, নচেৎ কৈশিকমধ্যম ও কৈশিকের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। সাধারিত-গ্রামরাগ যেমন 'ষড়্‌জসাধারণ' নামে পরিচিত, কৈশিকও তেমনি 'মধ্যম-সাধারণ' নামে অভিহিত হয়, আর তারি জন্য হরিবংশে উল্লিখিত : 'ষড়্‌গ্রামরাগেষু' বা ছ'টি গ্রামরাগের মধ্যে কোন অসঙ্গতি দেখা যায় না। অনেকে ঋষি কশ্যপ-উদ্‌ভাবিত কৈশিক-গ্রামরাগের গঠন বা রূপ শার্ঙ্গদেব সমর্থিত-সাধারণগ্রামের (সাধারণ-গ্রামরাগ) অনুরূপ বলেন। অর্থাৎ তাঁদের মতে কৈশিক-গ্রাম ও সাধারণগ্রাম সমপর্যায়ভুক্ত। শার্ঙ্গদেবের মতে সাধারণগ্রামই শুদ্ধগ্রাম

৫১। 'পূর্বোক্তকৈশিকং যদা সর্বৈঃ স্বরৈর্ভাব্যতে যোজ্যতে মধ্যমাদুপক্রম্যতে মধ্যমে চ ন্যস্যতে তত্র স্থাপ্যতে তদা কৈশিকমধ্যমো গ্রামরাগো ভবতীতি মধ্যমগ্রামাদুৎপন্নস্য কাকলিরেব শ্রুতিকো নিষাদো ভবতি পঞ্চমস্য প্রাধান্যং পুনঃপুনরুচ্চারণং শেষাণি স্বরান্তরাণি সামান্যেন বর্ত্তন্তে। তদা মধ্যমগ্রাম-সংভবং কৈশিকং কশ্যপঋষিরাহ।—ভট্টশোভাকর

(standard scale)। প্রাচীন দক্ষিণ-ভারতীয় শুদ্ধগ্রাম মুখারীও[৫২] নাকি প্রাচীন (খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর) উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীতের শুদ্ধগ্রাম সাধারণ-গ্রামের সমশ্রেণীভুক্ত ছিল। অনেকের অভিমত যে বর্তমান হিন্দুস্থানীপদ্ধতির কাফীঠাট ছিল প্রাচীন ও মধ্যভারতীয় সঙ্গীতপদ্ধতির শুদ্ধমেল। সেদিক থেকে মুখারী, বর্তমান কাফী ও সাধারণগ্রামের স্বর-রূপ বা স্বরের নক্সা একই রকমের ছিল। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে লেখা কবি লোচন পণ্ডিতের 'রাগতরঙ্গিণী' ও রাজা হৃদয়নারায়ণদেবের 'হৃদয়কৌতুক' ও 'হৃদয়-নারায়ণ' গ্রন্থগুলির শুদ্ধঠাটের রূপ ও গঠনও বর্তমান উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীতের কাফীঠাটের অনুরূপ ছিল। পণ্ডিত অহোবলের (সঙ্গীত-পারিজাত) শুদ্ধঠাটের রূপও ছিল এখনকার কাফীমেলের মতো। অহোবলের শুদ্ধঠাট ও দক্ষিণী খরহরপ্রিয়ার স্বরগঠনও একই রকমের ছিল।

শার্ঙ্গদেব যে সাধারণগ্রামের কথা উল্লেখ করেছেন মৃদঙ্গে (পুষ্করবাদ্যে) স্বর-নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত তিনটি মার্জনার (the process of tuning) মধ্যে 'মায়ূরী'-মার্জনা নাকি ঐ সাধারণগ্রামের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আচার্য ভরতও একথা নাট্যশাস্ত্রে স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে তিনটি মার্জনার মধ্যে মায়ূরী মধ্যমগ্রামে, অর্ধমায়ূরী ষড়্জগ্রামে ও কর্মারবী (কার্মারবী ?) সাধারণগ্রামে প্রতিষ্ঠিত। যেমন,

'মায়ূরীমধ্যমে গ্রামেঽপ্যর্ধা ষড়্জে তথৈব চ।
কর্মারবী চৈব কর্তব্যা সাধারণসমাশ্রয়াঃ ॥[৫৩]

তাহলে সাধারণগ্রামের ব্যবহার ভরতের সময়েও (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) ছিল, অথচ ভরত সুস্পষ্টভাষায় উল্লেখ করেছেনঃ "অথ দ্বৌ গ্রামৌ ষড়্জো মধ্যমশ্চেতি" (২৮।২২)। মনে হয় নারদীশিক্ষার সময়ে (খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী) কেন, খৃষ্টপূর্ব সমাজে ছ'টি বা সাতটি গ্রামরাগের অনুযায়ী ছ'টি বা সাতটি গ্রামেরই প্রচলন

৫২। এখানে উল্লেখযোগ্য যে প্রাচীন দক্ষিণ-ভারতীয় মুখারী-ঠাট কিন্তু লোচনের রাগতরঙ্গিণীতে বারো ঠাটের অন্তর্গত মুখারী নয়, কেননা লোচন পণ্ডিত তাঁর মুখারীর স্বররূপে কোমল-ধৈবত ব্যবহার করেছেনঃ "শুদ্ধাঃ সপ্তস্বরাস্তেষু ধৈবতঃ কোমলো ভবেৎ"। পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডেজীও উল্লেখ করেছেনঃ "There is a Mukhāri scale in the Southern system also but it materially differs from Lochana's Mukhāri".—*A Comparative Study of some of the Leading Music Systems*, p. 20.

৫৩। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সংস্করণ) ৩৩।৯৭

ছিল, খৃষ্টীয় অব্দে বা তার কিছু আগেই তাদের প্রচলন লোপ পায়, ষড়্জ ও মধ্যম গ্রাম-দু'টির মাত্র প্রচলন থাকে। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে শার্ঙ্গদেব সম্ভবত শুদ্ধঠাট হিসাবে আবার সাধারণগ্রামের প্রচলন করেন ও সেই সাধারণগ্রাম মনে হয় বর্তমান কাফীঠাটের সমশ্রেণীভুক্ত ছিল।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে 'আগান্ধারগ্রামরাগং' শব্দ থেকে প্রমাণ হয় যে মহাভারত-হরিবংশের সমাজে গান্ধর্বে (গানে) গান্ধারগ্রামের ব্যবহার ছিল। 'আগান্ধার গ্রামরাগং' শব্দটির অর্থ: গ্রামরাগ—এমন কি গান্ধারগ্রাম পর্যন্ত লীলায়িত ছিল। গ্রামের সঙ্গে গান্ধার যোগ থাকার জন্য অনেকে এটিকে গান্ধারদেশ (বর্তমান ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল) থেকে আমদানী বলেন। কিন্তু ঐ অভিমতের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ এখনো পাওয়া যায় নি। গান্ধারস্বর থেকে সপ্তকের আরম্ভ বলে গান্ধারগ্রাম বলা হয় এ'মতেরও কোন যুক্তিযুক্ত প্রমাণ নাই। গ্রাম সাতটি, পাঁচটি কি ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধার তিনটি এ'সম্বন্ধে এবং গ্রামের ঐতিহাসিক বিকাশ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করার চেষ্টা করব। দেখা যায় ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধার গ্রাম-তিনটির স্বর-সন্নিবেশের প্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন, সুতরাং তাদের শ্রুতিসন্নিবেশ, শ্রুতিসংখ্যা ও স্বরগুলির অন্তর তথা মধ্যবর্তী ব্যবধানও পৃথক্ পৃথক্। যেমন,

(১) ষড়্জগ্রাম	নি		স		রি		গ		ম		প		ধ		নি
অন্তর		বৃহদন্তর		মধ্যান্তর		ক্ষুদ্রান্তর		বৃহদন্তর		বৃহদন্তর		মধ্যান্তর		ক্ষুদ্রান্তর	
শ্রুতিভাগ		৪		৩		২		৪		৪		৩		২	
(২) মধ্যমগ্রাম	নি্		স		রি		গ		ম		প		ধ		নি
অন্তর		বৃহদন্তর		মধ্যান্তর		ক্ষুদ্রান্তর		বৃহদন্তর		মধ্যান্তর		বৃহদন্তর		ক্ষুদ্রান্তর	
শ্রুতিভাগ		৪		৩		২		৪		৩		৪		২	
(৩) গান্ধারগ্রাম	নি্		স		রি		গ		ম		প		ধ		নি
অন্তর		মধ্যান্তর		ক্ষুদ্রান্তর		বৃহদন্তর		মধ্যান্তর		মধ্যান্তর		মধ্যান্তর		বৃহদন্তর	
শ্রুতিভাগ		৩		২		৪		৩		৩		৩		৪	

ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় খৃষ্টপূর্বাব্দের প্রায় শেষের দিক পর্যন্ত ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধার গ্রাম-তিনটির প্রচলন ছিল। খৃষ্টীয় অব্দের কিছু আগেই গান্ধার

গ্রামের প্রচলন ভারতীয় সমাজ থেকে লোপ পায়। তখন থেকে ষড়্জ ও মধ্যম গ্রাম-দু'টিরই প্রয়োগ ও ব্যবহার চল্‌তে থাকে। গান্ধারগ্রামের প্রচলন কেন লোপ পায় তার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রীরা দেন নি, মাত্র বলেছেন: "স্বর্গাম্নাত্যত্র গান্ধারঃ" (—নারদীশিক্ষা), "প্রবর্ততে স্বর্গলোকে" (—সঙ্গীত-রত্নাকর ১।৫)। অবশ্য গান্ধারগ্রামের প্রচলন স্বর্গলোকে নিবদ্ধ একথার প্রমাণ দিয়েছেন একমাত্র নারদই ("গান্ধারগ্রামমাচষ্ট তদা তং নারদো মুনিঃ")। পরবর্তী (নারদী-শিক্ষার) গুণীরা নারদকেই অনুসরণ করেছেন দেখা যায়।[৫৪] মধ্যমগ্রামের প্রচলনও লোপ পেয়েছিল সম্ভবত পণ্ডিত রামামত্যের (১৫৫০ খৃষ্টাব্দ) পর পণ্ডিত পুণ্ডরিক বিঠ্‌ঠলের (১৫৯০ খৃষ্টাব্দ) সময়, অর্থাৎ ১৬শ শতাব্দীর শেষকাল থেকে, কেননা পুণ্ডরিক একমাত্র ষড়্জগ্রামের ব্যবহারই স্বীকার করেছেন। পণ্ডিত সোমনাথের সময়ে (১৬০৯ খৃষ্টাব্দ) ও বিশেষ ক'রে পণ্ডিত শ্রীনিবাস, পণ্ডিত অহোবল (১৭শ শতাব্দীর মাঝামাঝি) ও রাগতরঙ্গিণীকার লোচনের সময়ে (১৭শ শতাব্দীর মাঝামাঝি) মধ্যমগ্রামের ব্যবহার একেবারেই অচল হয়েছিল, ষড়্জগ্রামের অনুশীলনই ছিল অব্যাহত ও এখন পর্যন্ত তাই আছে।

হরিবংশে গান্ধারগ্রামের উল্লেখের সঙ্গে গান্ধাররাগের অবতারণাও দেখা যায়: "ততস্ত দেবগান্ধারম্"। নাট্যশাস্ত্রে শুদ্ধজাতিরাগ হিসাবে গান্ধারী ও বিকৃত জাতিরাগ হিসাবে রক্তগান্ধারী, গান্ধারপঞ্চমী, গান্ধারোদীচ্যবার উল্লেখ পাই। রামায়ণ, মহাভারত ও হরিবংশে শুদ্ধ জাতি > জাতিগান > জাতিরাগগানের প্রসঙ্গ থাকায় নাট্যশাস্ত্রের মাধ্যমে বুঝতে পারি যে সেই সব যুগে শুদ্ধ জাতিরাগ হিসাবে গান্ধারীরও প্রচলন ছিল। কিন্তু গান্ধার, গান্ধারী বা দেবগান্ধার নামে কোন দেশীরাগের তখন প্রচলন ছিল না বলে মনে হয়। দেশ ও জাতির নামানুসারে রাগগুলি মার্গপ্রকৃতিসম্পন্ন অভিজাত দেশীশ্রেণীভুক্ত হয়েছিল নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের পরবর্তী ও বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গের পূর্ববর্তী অর্থাৎ খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী ও

৫৪। বি, চৈতন্যদেব তাঁর *The Emergence of the Drone in Indian Music* নিবন্ধে গান্ধারগ্রামের প্রচলন অচল হওয়ায় অন্যতম একটি কারণ দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন: "Now, in Ga-grāma the madhyama—which shown to be a very important note in ancient music—has only *one* consonant. Further, the panchama has no consonant note at all. Sa has only one consonant. Neither are the two tetrachords balanced. These reasons might have contributed to the gradual disappearance of this scale". —*The Journal of Music Academy*, Madras, Vol. XXIII, 1952.

খৃষ্টীয় ৫ম কিংবা ৭ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। মতঙ্গের 'বৃহদ্দেশী' অভিজাত দেশী রাগগুলিরই সংকলন ও পরিচিতি-গ্রন্থ। নাট্যশাস্ত্রে শুদ্ধজাতিরাগ হিসাবে গান্ধারীর পর অভিজাত দেশীরাগ হিসাবে গান্ধারীর পরিচয় পাই আমরা বৃহদ্দেশীতে। মতঙ্গ উল্লেখ করেছেন,

ধৈবতান্ত্যন্তরসংযুক্তা গান্ধারস্বরভূষিতা।
গান্ধারো ধৈবতাশ্চাত্র গমনং দৃশ্যতে ঘনম্।
ভাষাহ্যা * * তু সংকীর্ণা গান্ধারী সমুদাহৃতা॥

উদাহরণ : ধাধাগাগাগারি রিগমগা মাধারিরিরি রিগামাপামা। মাপামাপা-মাপা সগারিরিগাগাগা ধাপাধাধাগাগারীসাসাসা প্রভৃতি। গান্ধারস্বর অন্তর-সংজ্ঞাযুক্ত বলতে বোঝায় অন্তরগান্ধার তথা চ্যুত বা বিকৃত গান্ধার (আজকাল যাকে আমরা অনেকটা কোমল-গান্ধার বলি)। ভাষারাগ ও সংকীর্ণ বা মিশ্র এই দু'রকম রাগ। সঙ্গীত-রত্নাকরে (১৩শ শতাব্দী) গান্ধারী, গান্ধারবল্লী, গান্ধারপঞ্চম, নাগগান্ধার প্রভৃতি গান্ধারশ্রেণীর রাগের উল্লেখ পাই। এই রাগগুলি ভাষা বা ছায়া- (আর একটি থেকে উৎপন্ন) রাগ নামে পরিচিত। সঙ্গীত-রত্নাকরের দ্বিতীয় রাগবিবেকাধ্যায়ে শার্ঙ্গদেব ভাষারাগ হিসাবে গান্ধারীর পরিচয় দিয়ে বলেছেন,

গান্ধারপঞ্চমে ভাষা গান্ধারী স-গ-ভূষিতা।
ধান্ত্যস্তা সর্বলোকস্য হৃদ্যা স্ত্রীণাং বিশেষতঃ॥

এই গান্ধারীরাগ গান্ধারপঞ্চমের ভাষা বা ছায়ারাগ, অর্থাৎ গান্ধারপঞ্চম থেকে সৃষ্ট। শার্ঙ্গদেব বলেছেন বিশেষ ক'রে এই রাগটি স্ত্রীলোকদের বিশেষ প্রিয়। রত্নাকরে দেবগান্ধার বা দেবগান্ধারী নামে কোন রাগের ঠিক উল্লেখ নাই।

গান্ধারীকে আবার ভিন্নষড়্জরাগের ভাষা ও ভাষাঙ্গ এই দু'টি রাগ-রূপে পেয়ে থাকি। ভিন্নষড়্জের ভাষারাগ হিসাবে গান্ধারীর পরিচয় হ'ল,

গান্ধারাংশো মধ্যমান্তা গান্ধারী মধ্যমোজ্ঝিতা।
গেয়ৈকান্তে ভিন্নষড়্জভাষা শার্দুলসংমতা॥

প্রাচীন সঙ্গীতগুণী হিসাবে আঞ্জনেয়, কশ্যপ, দুর্গাশক্তি, কোহলাদির মতো শার্দুলের মতবাদও প্রামাণিক। ভাষাঙ্গ হিসাবে গান্ধারীর রূপ হ'ল,

ষড়্জগ্রহাংশা গান্ধারী পঞ্চমান্তা সমস্বরা।
সংপূর্ণা তার-ষড়্জা চ স্বরেষল্পাদিবর্জিতা॥

এ'ছাড়া সৌবীরিকা বা সৌবীর-রাগের ভাষা বা অঙ্গরাগ হিসাবে গান্ধারীর

(গান্ধার ?) আর একটি পরিচয়ও শার্ঙ্গদেব দিয়েছেন : "গান্ধারী করুণে সান্তা সংপূর্ণা নিগ্রহাংশিকা। সৌবীরিকাজা * *" ॥

সঙ্গীত-মকরন্দে (৭ম-১১শ শতাব্দী ?) গান্ধারের সঙ্গে সঙ্গে আবার দেবগান্ধার-রাগের উল্লেখ পাই। মকরন্দকার নারদ "দেশীরাগরহস্যং চ সাম্প্রতং শৃণু যত্নতঃ" কথাগুলি প্রস্তাবনা-রূপে বলে সম্পূর্ণ রাগের পর্যায়ে গান্ধাররাগের উল্লেখ করেছেন : "সম্পূর্ণো গান্ধারাদি প্রকীর্তিতঃ" (৩৷৩৮) ও ষাড়বরাগের পর্যায়ে দেবগান্ধারের কথা বলেছেন : "ষাড়বো দেবগান্ধারো গাদির্বর্জো নিষাদকঃ" (৩৷৪০)। মকরন্দকার নারদ ছ'রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর পক্ষপাতী। তিনি বঙ্গাল (বাঙ্গালী ?)-রাগের যোষিত বা স্ত্রী (রাগিণী) হিসাবে গান্ধারীর নামোল্লেখ করেছেন (৩৷৭১) ও অন্যের মতবাদের নজির দিয়ে ("অন্যেষট্কং") শ্রীরাগের স্ত্রী বা রাগিণী হিসাবে দেবগান্ধারীর[৫৫] নামোল্লেখ করেছেন (৩৷৭৫)। মোটকথা 'দেবগান্ধার' রাগটির প্রথম উল্লেখ পাই আমরা সঙ্গীত-মকরন্দে। রাগ-রাগিণী ও পুরুষ-স্ত্রী বিভাগ প্রভৃতির আলোচনা সুস্পষ্টভাবে থাকার জন্য সঙ্গীত-মকরন্দকে সঙ্গীত-রত্নাকরের তথা খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর অনেক পরবর্তী গ্রন্থ বলে মনে হয়। এ'সম্বন্ধে পরে বিশেষভাবে আলোচনা করতে চেষ্টা করব।

১৭শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের সঙ্গীতশাস্ত্রী পণ্ডিত লোচনের 'রাগতরঙ্গিণী' গ্রন্থেও গান্ধার, গান্ধারী ও দেবগান্ধারের উল্লেখ ও পরিচয় পাই ও তা থেকে মনে হয় মকরন্দকারের মতো তিনি এ' তিনটিকে পৃথক রাগ হিসাবে গণ্য করেছেন। তরঙ্গিণীকার লোচন গান্ধাররাগের পরিচয় দিয়েছেন,

গোর্যা-(গৌর্যা ?)-সাবরী দেবগিরিভির্ভৈরবাদপি।
সিন্ধুসংযোগতঃ প্রোক্তো গান্ধারঃ পৃথিবীতলে ॥

গৌরী, আসাবরী, দেবগিরি, ভৈরব ও সিন্ধু রাগগুলির মিশ্রণে গান্ধাররাগের সৃষ্টি। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর 'সেকশুভোদয়া' গ্রন্থে হলায়ুধ মিশ্র জয়দেব-ঘরণী পদ্মাবতীর প্রসঙ্গে গান্ধাররাগের উল্লেখ করেছেন দেখা যায় : "ততঃ পদ্মাবতী জয়দেবস্য ব্রাহ্মণী গান্ধারনামা ধ্বনিরুদ্গরিতা চ"। 'ধ্বনি' শব্দে এখানে 'রাগ'। ১২শ শতাব্দীতে গান্ধাররাগের গঠনপ্রণালী বা স্বররূপ ১৩শ শতাব্দীর গ্রন্থ সঙ্গীত-রত্নাকরে উল্লিখিত গান্ধাররাগের স্বররূপ অনুযায়ী হওয়াই স্বাভাবিক। অনেকে 'রাগতরঙ্গিণী' (১৭শ শতাব্দী) ও তার পথচারী পণ্ডিত হৃদয়নারায়ণের (১৭শ

৫৫। মকরন্দকার 'অ'কারান্ত গান্ধার ও দেবগান্ধারকে কথনো কথনো 'ঈ'কারান্ত গান্ধারী ও দেবগান্ধারী বলেছেন।

শতাব্দী) 'হৃদয়নারায়ণ' ও 'হৃদয়কৌতুক' বইগুলিতে উল্লিখিত রাগগুলির রূপের মাধ্যমে ১২শ শতাব্দীর গ্রন্থ 'গীতগোবিন্দ' ও 'সেখশুভোদয়া'-য় বর্ণিত রাগের স্বর-রূপ নির্ণয় করার পক্ষপাতী। পণ্ডিত লোচন দেবগান্ধারকে গৌরী-সংস্থানের (গৌরীমেলের) রাগ বলেছেন : "আসাবরী তথা গেয়া দেবগান্ধার এব চ, * * গৌরীসংস্থানমধ্যে তু এতে রাগা ব্যবস্থিতাঃ"। গৌরীসংস্থানের পরিচয় হ'ল,

এবং সতি চ গান্ধারো দ্বে শ্রুতীমধ্যমস্য চেৎ।
গৃহ্লাতি কাকলী নিঃস্যাত্তদা গৌরী প্রবর্ততে ॥

অর্থাৎ তোড়ীঠাটের যে রূপ বর্ণনা করা হয়েছে (=ঋষভ ও ধৈবত কোমল), তার দু'টি শ্রুতি যদি মধ্যমস্বরে যোগ করা যায় ও নিষাদ কাকলী-নিষাদ-রূপে ব্যবহৃত হয় তাহলেই গৌরী-সংস্থান বা গৌরীঠাটে রূপায়িত হয়। এ' থেকে বোঝা যায় ১৭শ শতাব্দীতে দেবগান্ধারের স্বররূপ ছিল সম্পূর্ণজাতি (সাতস্বরযুক্ত) ও বর্তমান ভৈরবঠাটের অনুযায়ী। পণ্ডিত অহোবল (১৭শ শতাব্দী) দেবগান্ধারীর (?) পরিচয় দিয়েছেন দ্বিতীয় প্রহরের পরে গেয় রাগিণী হিসাবে। তিনি উল্লেখ করেছেন,

তদা তু দেবগান্ধারী পূর্ণশ্চেদ্ভৈরবো যদা।
গান্ধারাদিস্বরোদ্গ্রাহা স-স্বরাংশেন শোভিতা।
সা সদা রি-স্বরোদ্গ্রাহা তদারোহে গ-বর্জিতা ॥

এই দেবগান্ধারী ষাড়ব-সম্পূর্ণ জাতির রাগিণী ; তার ধৈবত কোমল। বর্তমান উত্তর-ভারতীয় হিন্দুস্থানী-পদ্ধতিতে গান্ধারীকে আসাবরীমেলের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়। রাগবিবোধকার পণ্ডিত সোমনাথ (১৬০৯ খৃঃ) দেবগান্ধারকে 'ভৈরবীমেলের, হৃদয়নারায়ণদেব গৌরীমেলের ও রাগচন্দ্রোদয়কার পুণ্ডরীক মালবগৌলমেলের অন্তর্গত বলেছেন। তাছাড়া 'রাগমালা' গ্রন্থে দেবগান্ধারকে আবার শংকরাভরণ-মেলের ও 'রাগলক্ষণ' গ্রন্থে নটভৈরবীমেলের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে। একই গান্ধার, গান্ধারী ও দেবগান্ধার বা দেবগান্ধারী নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ ও তার বিকাশভঙ্গির সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য আমাদের আলোচনার বিষয় হ'ল হরিবংশে দেবগান্ধারের রূপ ও বিকাশ কি ধরণের ছিল। টীকাকার নীলকণ্ঠ উল্লেখ করেছেন : "রাগো বসন্তাদিঃ সাকল্যেন গান্ধারাদয়ো যত্র তৎ গঙ্গাবতরণং নাম গীতবিশেষবিদ্ধং রাগান্তরমিশ্রম্ আসারিতং মূর্ছিতং জগিরে গীতং কৃতবন্ত্যঃ"। কিন্তু প্রশ্ন এই যে তখন ভারতীয় সমাজে বসন্তরাগের আবির্ভাব হয়েছে কিনা। সঙ্গীতশাস্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখি খৃষ্টপূর্ব সমাজে কেন, এমন কি খৃষ্টীয়

৫ম-৭ম শতাব্দীতে বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গের সময়েও বসন্তের বিকাশ সঙ্গীত-সমাজে হয়নি। বসন্তের প্রথম পরিচয় পাই আমরা ৭ম-১১শ শতাব্দীর মাঝামাঝি 'সঙ্গীতসময়সার'-প্রণেতা পার্শ্বদেব ও মকরন্দকার নারদের (২য়) সময়ে। বরং বসন্তের সমগোত্রীয় হিন্দোলরাগের পরিচয় পাই মতঙ্গের বৃহদ্দেশীতে (৫ম-৭ম খৃঃ)। আসলে বসন্ত মার্গ-আভিজাত্যসম্পন্ন দেশীরাগ, ভারতীয় সমাজে সে বিকাশ লাভ করে খৃষ্টীয় ৮ম-৯ম শতাব্দীর বা ১১শ শতাব্দীর আগে নয়। সুতরাং হরিবংশে (খৃষ্টপূর্ব ২০০) উল্লিখিত দেবগান্ধার-রাগটি সম্ভবত জাতিরাগ গান্ধারীরই ভিন্ন (বিকৃত ?) একটি নাম,—দেবতাদের পর্যন্ত প্রিয় ও ইষ্ট ছিল বলে 'দেব-গান্ধার' নাম হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। দেবগান্ধারকে গান্ধারদেশজাত রাগ বা গ্রামরাগ হিসাবেও গণ্য করা যায় না। আর হরিবংশে উল্লিখিত দেবগান্ধারকে যদি জাতিরাগ গান্ধারীরই অভিন্ন রূপ হিসাবে গণ্য করার পরিবর্তে দেশীরাগ-রূপে গ্রহণ করা হয় তবে তাকে পরবর্তীকালের প্রক্ষিপ্ত রাগ বলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। গঙ্গাবতরণ-নৃত্যনাট্যের সঙ্গে গান্ধার তথা দেবগান্ধার-রাগ সম্পর্কিত। নাট্যশাস্ত্রে (৪।১৬৮) গঙ্গাবতরণনৃত্যের কথাও এ'প্রসঙ্গে করা হয়েছে, কিন্তু ভরত এই নৃত্যের সঙ্গে গান্ধাররাগের কোন সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন নি।

হরিবংশে যে 'নান্দি' শব্দটির উল্লেখ আছে ("নান্দিং চ বাদয়ামাস") তার অর্থ চর্মবাদ্য অথবা স্বস্তিবাচন। নীলকণ্ঠ উল্লেখ করেছেন: "নান্দিং নন্দিকেশ্বর-মুখং চর্মকোষময়ং বাদ্যবিশেষম্। দ্বাদশপটহশব্দো নন্দিরিত্যন্যে। নান্দীমিতি পঠেৎ নান্দীং দেবদ্বিজাদীনাং শুভশংসিনীম্ অষ্টাভির্দশভির্বা অবান্তরবাক্যযুক্তাং পূর্বরঙ্গপ্রধানাং বাক্যাবলীং বাদয়ামাস পপাঠেতি কেচিৎ। নান্দ্যন্তে মঙ্গলপদ্য-পাঠান্তে।" চামড়ার আচ্ছাদনযুক্ত বাদ্য-বিশেষকে নান্দি বলে। অনেকের মতে বারটি পটাহের একত্রীকৃত শব্দকে নন্দি বা নান্দি বলে। দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রশংসাসূচক আটটি বা দশটি অবান্তর-বাক্যে গঠিত পূর্বরঙ্গপ্রধান পদ্যাবলীর পাঠকেও নান্দি বলে। আবার মঙ্গলবাচক পদ্যের পাঠ বা উচ্চারণকেও নান্দি বলে।

শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকরের বাদ্যাধ্যায়ে মার্গ ও দেশীভেদে পটহকে দু'রকম শ্রেণীর বলেছেন: "মার্গদেশীগতত্বেন পটহো দ্বিবিধো ভবেৎ" (৬।৮০৫)। বাদ্য হিসাবে নান্দি পটহ-শ্রেণীভুক্ত। ভরত নাট্যশাস্ত্রে (৫।২৩-২৫) স্বস্তি বা মঙ্গলবাচন হিসাবে নান্দির উল্লেখ করেছেন,

পূর্বমেব তু রঙ্গেঽস্মিন্ তস্মাদুত্থাপনং স্মৃতম্।
যস্মাচ্চ লোকপালানাং পরিবৃত্য চতুর্দিশম্॥

বন্দনানি প্রকুর্বন্তি তস্মাত্তু পরিবর্তনম্।
আশীর্বচনসংযুক্তা নিত্যং যস্মাৎ প্রবর্ততে॥
দেবদ্বিজনৃপাদীনাং তস্মান্নান্দীতি সংজ্ঞিতা।

নান্দি বা মঙ্গলবাচন অভিনয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। হরিবংশে উল্লিখিত গঙ্গাবতরণ-নৃত্যনাটিকাটিতে চর্মপটহ-শব্দ ও মঙ্গলাচরণ এ'দুয়েরই সার্থকতা আছে। হরিবংশকার বলেছেন 'বাদয়ামস', সুতরাং এখানে নান্দিকে চর্মবাদ্য হিসাবে গ্রহণ করাই মনে হয় সমীচীন। জৈনগ্রন্থ রায়পসেনিয়সূত্তে যে ষাট রকম বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে 'নান্দীমৃদঙ্গ' তাদের অন্যতম। নান্দি ও নান্দিমৃদঙ্গ বোধহয় একই শ্রেণীর চর্মবাদ্য।

গান অর্থে গেয়। রামায়ণ ও মহাভারতে সঙ্গীতের আলোচনায় পাঠ্য ও গেয় সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। হরিবংশে উল্লেখ আছে: "নানাবিধানি তূর্যানি গেয়ানি মধুরাণি চ" (বিষ্ণুপর্ব ৭৬।৫৮)। নারদীশিক্ষায় "গেতি গেয়ং বিদুঃ প্রাজ্ঞা ধেতি কারুপ্রবাদনম্" প্রভৃতি শ্লোকেও 'গেয়' শব্দে নারদ 'গান' বলেছেন: "গ-শব্দেন গানং লক্ষ্যতে"। রাগের প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য ভরত দশলক্ষণের পরিচয় দিয়েছেন।[৫৬] শার্ঙ্গদেব জাতিপ্রকরণে দশলক্ষণ মেনে নিয়েও রাগ-নির্ণয়ের সুবিধার জন্য তেরোটি লক্ষণের উল্লেখ করেছেন।[৫৭] পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ 'সঙ্গীতসূর্যোদয়' গ্রন্থে শার্ঙ্গদেব উল্লিখিত জাতির তেরোটি লক্ষণ স্বীকার করেছেন। পণ্ডিত গোবিন্দ-দীক্ষিতের মতও তাই। স্বরমেলকলা-নিধিকার পণ্ডিত রামামত্য রাগ বা জাতিরাগের দশলক্ষণ স্বীকার করেও গ্রহ, অংশ ও ন্যাস এই তিনটি লক্ষণের ওপর বেশী জোর দিয়েছেন। পুণ্ডরীক এবং সোমনাথও তাই। শার্ঙ্গদেব অংশ ও গ্রহ-নির্ণয়ের প্রসঙ্গে 'গেয়' শব্দের উল্লেখ ক'রে বলেছেন: "যো রক্তিব্যঞ্জকো গেয়ে" প্রভৃতি।[৫৮] অর্থাৎ যে স্বরসন্দর্ভ

৫৬। গ্রহাংশৌ তারমন্দ্রৌ চ ন্যাসোপন্যাস এব চ
অল্পত্বং চ বহুত্বং চ ষাড়বৌড়বিতে তথা।

—নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ২৮।৭০

৫৭। গ্রহাংশতার মন্দ্রাশ্চ ন্যাসাপন্যাসকৌ তথা।
অপি সংন্যাসবিন্যাসৌ বহুত্বং চাল্পতা ততঃ॥
এতান্যন্তরমার্গেণ সহ লক্ষ্মাণি জাতিষু।
ষাড়বৌড়ুবিতে কাপীত্যেবমাহুস্ত্রয়োদশ॥

—সঙ্গীত-রত্নাকর ১।৭।২৯-৩১

৫৮। সঙ্গীত-রত্নাকর ১।৭।৩২

রক্তির অভিব্যঞ্জক তাই 'গেয়', গীত বা গান ('গীতগানলক্ষণঃ ইত্যর্থঃ')। কল্লিনাথ 'গেয়' শব্দটির অর্থ আরো পরিস্ফুট ক'রে বলেছেন: "যো রক্ত্যোত্যাদ্যংশ-লক্ষণম্। রক্তিব্যঞ্জকত্বাদিধর্মযুক্তো যঃ স্বরঃ স সংগীতভাগত্বাদংশ ইতি ব্যপদিশ্যতে গেয়ে। রক্তিব্যঞ্জকঃ ইত্যেতাবতুচ্যমানে স্বরগতরক্তিমাত্রব্যঞ্জকত্বং স্বরান্তরাণামপ্যবিশিষ্টমিতীহ স্বরসন্দর্ভভেদপ্রতিনিয়তরক্তিবিশেষব্যঞ্জকত্বস্য বিবক্ষিতত্বাদ্ গেয়ং ইতি বিশেষণম্ * *।"[৫৯] গেয় বা গানই রঞ্জকত্বধর্ম বিশিষ্ট হয় ও তা মানুষের মনে সুরের ও ভাবের স্পন্দন জাগিয়ে একটি সংস্কার সৃষ্টি করে। হরিবংশেও উল্লেখ আছে: "গেয়ানি মধুরাণি চ", অর্থাৎ রাগপ্রকৃতিবিশিষ্ট ও মনোরঞ্জনকারী গান বা গীতির প্রচলন ২০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ সমাজে প্রচলিত ছিল।

বাদ্যযন্ত্র হিসাবে হরিবংশের সময়ে আমরা তুম্বীবীণা, বল্লকী, মৃদঙ্গ, তূর্য, ভেরী, শঙ্খ, বেণু, বীণা, পণব, ঝর্ঝরী, ডিণ্ডিম প্রভৃতির উল্লেখ পাই। যেমন,

(১) পর্ণবাদ্যান্তরে বেণুং তুম্বীবীণাং চ তত্র হ।[৬০]
(২) বল্লকীং বাদ্যমানো হি সপ্তস্বরবিমূর্ছিতাম্।[৬১]
(৩) প্রতিষিদ্ধেষু তূর্যেষু মৃদঙ্গাদিষু তেষু বৈ।[৬২]
(৪) ভেরীশঙ্খমৃদঙ্গানাং পণবানাং সহস্রশঃ।[৬৩]
(৫) বেণুবীণামৃদঙ্গৈশ্চ পণবৈশ্চ সহস্রশঃ।[৬৪]
(৬) অনেকভেরীপণবঝর্ঝরীডিণ্ডিমাকুলম্।[৬৫]
(৭) গীতবাদিত্রবহুলং * * *।[৬৬]
(৮) বীণাং গৃহীত্বা মহতীং * * *।[৬৭]

৫৯। "In this passage Kallinātha explains that if 'aṁśa' is defined as manifesting sweetness without any qualification, its power to manifest sweetness would be applicable to all *svaras* without any distinction. Hence he points out that by the use of the specifying adjunct '*geya*' the aṁśa's function of manifesting the peculiar sweetness characteristic of the different groupings of *svaras* (in the musical piece) is indicated."—*The Rāgas of the Karṇātic Music* (1938), p. 77.

৬০। বিষ্ণুপর্ব ১১।২৭
৬১। " ২৯।১১১
৬২। " ৩০।৩৮
৬৩। " ৬৩।৮১
৬৪। " ১১৭।৪
৬৫। " ১২১।২৬
৬৬। " ১৩৩।১০
৬৭। হরিবংশপর্ব ৫৪।৮

পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে তুম্বীবীণা তম্বুরা>তুম্বুরা>তুম্বুরুবীণা বর্তমান তানপুরারই অভিন্ন নাম। জৈন রায়পসেনিয়সূত্তে তুম্বী বা তুম্বীবীণার উল্লেখ আছে। হরিবংশ-পুরাণে তুম্বী বা তুম্বীবীণা বা তুম্বুরুবীণার উল্লেখ থাকায় ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীতের অপরিহার্য বাদ্যযন্ত্র তানপুরার প্রচলন যে বেশ প্রাচীন (খৃষ্টপূর্ব ২০০) তা বোঝা যায়। তুম্বুরা বা তানপুরা বীণারই একটি রূপভেদ। পূর্বে (অন্তত খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে) যেমন পুষ্করবাদ্য বা মৃদঙ্গে স্বর-স্থাপনা করার বিধি (মার্জনা) ছিল তেমনি বর্তমানে তুম্বুরা বা তানপুরায় স্বরের স্থাপনা করা হয় ষড়্জ ও পঞ্চম স্বর-দু'টিকে কেন্দ্র ক'রে।[৬৮]

রায়পসেনিয়সূত্তে বল্লকী বাদ্যযন্ত্রটি বীণা-পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। মনে হয় বিপঞ্চী, মহতী, কচ্ছপী, চিত্রা প্রভৃতির মতো বল্লকী এক ধরণের বীণা হিসাবে প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল। হরিবংশে মহতীবীণারও উল্লেখ আছে। মহতীবীণার বাদনপ্রণালী বেশ কঠিন। কোহলীয়ে এই বীণার পরিচয় দেওয়া আছে,

> দণ্ডং বংশময়ং কান্তং (?) বর্তুলং তুম্বযুগ্মকং।
> নবমুষ্টি স্বরস্থানং চাত্র যত্নেন কারয়েৎ॥
> তস্মিন্ দণ্ডে সপ্তসংখ্যমোটনীং সন্নিবেশয়েৎ।
> দক্ষিণে বিন্যসেদন্যৎ ক্ষুদ্রতন্ত্রীদ্বয়ং ক্রমাৎ॥
> বৃক্ষবজ্রময়ী কার্যা মোটনী দণ্ডরঞ্জিকা।
> তাবচ্চ ভ্রাময়েৎ পূর্বাং মোটনীঞ্চ শনৈঃ শনৈঃ॥
> অস্যাস্বষ্টাদশ প্রোক্তাঃ সারিকাঃ পূর্বসূরিভিঃ।
> এতাস্তু তারবাদিন্যস্তিষ্ঠান্তু পদিকোপরি॥
> মদনস্য চ সিকৃথস্য (?) যোগেন সুদৃঢ়ীকৃতাঃ।
> মহত্যা নাম বীণায়া এতল্লক্ষণমুচ্যতে॥

মহতীবীণা মানুষের দেহের অনুকরণে তৈরী। মেরুদণ্ডের মতো মহতীতে একটি বংশদণ্ড থাকে। মানুষের দেহে নাভি ও মস্তক (কণ্ঠ) স্বরস্থানদের মধ্যে প্রধান, মহতীতে এ' দুটি স্থানের অনুকরণে দু'টি অলাবু সংযুক্ত থাকে।

হল্লীসক, আসারিত প্রভৃতি নৃত্যের কথা, তাদের রূপ ও প্রকাশভঙ্গির বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। হরিবংশের বিভিন্ন শ্লোকে নৃত্যের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। যেমন, উপগায়ন্তি নৃত্যন্তি (২।৫০।৬৮), নটানাং

৬৮। অবশ্য তানপুরায় মধ্যমস্বর বাদে ছ'টি স্বরই পাওয়া যায়। তাই মধ্যমযুক্ত রাগের বেলায় 'পঞ্চমের' স্থানে তারে 'মধ্যম' স্থাপনা করার নিয়ম আছে।

নৃত্যগেয়ানি বাদ্যানি (২।৫৫।১৯), নৃত্যন্তং রথমার্গেষু (২।৫৯।৬৩), ঈপ্সিতং গীতনৃত্যঞ্চ (২।৬৭।৬০), ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ (২'৮৭।৩৬), পাদোদ্ধারেণ নৃত্যেন (২।৯৩।৩২), নৃত্যন্তে চাপ্সরাস্তত্র (২।১১৮।৭), নৃত্যমানাঃ প্রগায়ন্তি (৩।১৯।১৭), নৃত্যৈশ্চাপি (৩।২৭।১৩) প্রভৃতি। অবশ্য 'নৃত্য' শব্দের উল্লেখ থাকলেই যে নৃত্যের রূপ বা তার উপস্থাপন-পদ্ধতি বোঝা যায় তা নয় কিন্তু একথাও সত্য যে নৃত্য তখনকার সমাজে প্রচলিত ছিল ও তার সমাদর চারুশিল্পবিলাসী লোকদের ভেতরও একান্তভাবে ছিল নৃত্যে, গীতে ও বাদ্যে তাল, লয়, সম (ছন্দোবদ্ধ সমতা) প্রভৃতি রক্ষা করা হ'ত : "লয়তালসমং শ্রুত্বা" (২।৯৩।২১)।

মহাভারত-হরিবংশের যুগে সঙ্গীত বা স্বরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বাক্ বা সরস্বতীর যথাযোগ্য আসন নির্বাচিত দেখা যায় : "সরস্বতী স্বরৈর্বক্তৈরধীতে ব্রহ্মবাদিনী" (৩।২৮।৬০)। নীলকণ্ঠ উল্লেখ করেছেন বাক্ তথা অক্ষর বা শব্দের (স্বরের) অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীকে তখন সকল-কিছুর কারণস্বরূপ প্রনব-রূপেই চিন্তা করা হ'ত : "অশরীরং সরস্বতীং প্রণবরূপাং ন তু দেবতা"। হরিবংশকার আবার বলেছেন : "বাণী-জিহ্বা দেবী সরস্বতী" (৩।৫২।৪৮)। সুতরাং সঙ্গীতে দর্শনচিন্তার বিকাশ মহাভারত-হরিবংশের অনেক আগেকার যুগেই হয়েছিল ও তার নিদর্শন বৈদিক যুগেও পাওয়া যায়। ভারতীয় সঙ্গীতের মূল তত্ত্বকথা বা মর্মকথাই তাই যে অক্ষর, বাণী বা স্বর জড় বা অচেতন নয়, চৈতন্যময় প্রণবেরই তারা অভিব্যাক্ত।

সূত, মাগধ, বৈতালিক, বন্দী এদের উল্লেখ রামায়ণ, মহাভারত ও হরিবংশে সমানভাবেই পাওয়া যায়। তারা ছিল স্তাবক ও স্তুতিশীল ; তারা নৃপতিবর্গ বা শাসকদের স্তুতিগান করত। রামায়ণে দেখি : "ততস্তু স্তুবতাং তেষাং সূতানাং পাণিবাদকাঃ", (অযোধ্যাকাণ্ড ৩৫।২); মহাভারতে : "স্তুবন্তস্তান্নু-পাতিষ্ঠন্ সূতাশ্চ সহ মাগধৈঃ" (বিরাটপর্ব ৬৭।৩৬) ও হরিবংশে : "সূতামাগধ-কল্পৈশ্চ স্তুবন্নপ্সরসাং গণাঃ" (বিষ্ণুপর্ব ১১৭।৫)। এই সূত ও মাগধরা এক সময়ে সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় হিসাবে গণ্য ছিল। অধ্যাপক উণ্টারনিজ মনুর অভিমত উল্লেখ করেছেন।[৬৯] সূতরা ছিল মিশ্রজাতি, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-কন্যাদের গর্ভে ও ক্ষত্রিয়-যোদ্ধাদের ঔরসে জন্ম। সূত ও মাগধরাই কিন্তু সাধারণভাবে গায়কশ্রেণীভুক্ত ছিল। অনেকের অভিমত যে সূত ও মাগধদের

৬৯। মনুস্মৃতি ১০।১১, ১৭

উৎপত্তি ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে ও বৈশ্যের ঔরসে, আর তারি জন্য অনেক সময় তাদের সমাজের বাইরে বাস করতে হ'ত। তারা রাজাদের বা রাজন্যবর্গের সারথির কাজও করত। মাগধরা মগধের অধিবাসী ছিল ও সূতরা মগধের পূর্বদেশে বাস করত। কিন্তু রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, অন্যান্য পুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে সূত, মাগধ, নট ও নটীদের সমাজভুক্ত হিসাবে গণ্য করা হয়েছে, যদিও জায়গায় জায়গায় 'বারমুখ্যা নটী' প্রভৃতি শব্দেরও উল্লেখ দেখা যায়। মহাভারতেও কোন কোন জায়গায় (অনুশাসনপর্ব ২৯।১৩ এবং অশ্বমেধিকপর্ব ১১১।৮১ ; ১১২।১৫-১৭) গায়ক, নর্তক, বাদক, কথক, শৈলূষ, সূত ও মাগধরা রাজাদের কাছ থেকে অসম্মান পেয়েছে দেখা যায়। আবার সম্মান-লাভেরও নিদর্শন যেমন,

সূতাঃ স্তুতিপুরাণজ্ঞা রক্তকণ্ঠাঃ সুশিক্ষিতাঃ।

*   *   *   *

পঠন্তি পাণিস্বনিনো গাথা গায়ন্তি গায়কাঃ।[৭০]

কিংবা—

ততঃ পুণ্যাহঘোষেণ আশীর্বাদস্বনেন চ।

সূতমাগধবন্দীনাং সংস্তবৈর্গীতমঙ্গলৈঃ ॥[৭১]

কিন্তু খৃষ্টীয় শতাব্দীর স্মৃতিগ্রন্থাদিতে নট, নটী, সূত ও মাগধদের নিন্দাও করা হয়েছে। 'প্রায়শ্চিত্তবিবেক' গ্রন্থে আচার্য শূলপাণি নৃত্য-গীতনিপুণা সাধারণ বারনারী-শ্রেণীভুক্ত নটীদের অবজ্ঞার চক্ষেই দেখেছেন, কেননা তারা নাকি অভিশপ্ত ভরতপুত্র বা জায়াজীব-জাতীয় নটদের পুরনারী ও পতি-পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে প্রকাশ্য রাজসভায় নৃত্য, গীত ও অভিনয় করত। শূলপাণি উল্লেখ করেছেন,

নটীং শৈলুষিকীঞ্চৈব রজকীং বেণুজীবিনীম্।

গত্বা চান্দ্রায়ণং কুর্যত্তথা চর্মোপজীবিনীম্ ॥

এই নট ও নটীরা কিন্তু একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল আর তাদেরই সাধারণত অন্ত্যজ নট ও নটী বলা হ'ত। অপরাপর নট ও নটীরা আবার অভিজাতবংশীয়ও হ'ত।[৭২] মহর্ষি মনু অভিনেতা নটকে 'রঙ্গাবতারক' বা 'রঙ্গজীব' হিসাবে সাধারণ নট বা নটী থেকে পৃথক করেছেন। কুল্লুকভট্ট উল্লেখ করেছেন:

৭০। মহাভারত, শান্তিপর্ব ৪৮।৩-৪

৭১। „ দ্রোণপর্ব ৫।৪১

৭২। যাত্রামোহন চক্রবর্তী: 'নটতত্ত্বসারসংগ্রহ' (ইং ১৯২৪) দ্রষ্টব্য।

"নটগায়নব্যতিরিক্তস্ত রঙ্গাবতরণজীবিনঃ"। রঙ্গজীবরা বারনারী-পুত্রও হ'ত, কিন্তু তাই বলে তারা সভ্যসমাজে পতিত ছিল না এবং এর নিদর্শন রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্য ও পুরাণ-সাহিত্যে পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৬-৭) দেখা যায় ঝল্ল, মল্ল, সূত, মাগধ প্রভৃতির মতো নটও এক শ্রেণীর জাতি হিসাবে গণ্য ছিল। ভাগবতকার উল্লেখ করেছেন: "তত্র মল্লা নটা ঝল্লা সূতা বৈতালিকস্তথা।" ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৭০ অধ্যায়ে (১৯-২১ শ্লোক) উল্লেখ আছে,

তত্রোপমন্ত্রিণো রাজন্ নানাহাস্যরসৈর্বিভুম্।
উপতস্থুর্নটাচার্যা নতক্যস্তাণ্ডবৈঃ পৃথক্ ॥
মৃদঙ্গবীণামুরজবেণুতালদরস্বনৈঃ।
ননৃতুর্জগুস্তুষ্টুবুশ্চ সূতমাগধবন্দিনঃ ॥
তত্রাহুর্বাহ্মণাঃ কেচিদাসীনা ব্রহ্মবাদিনঃ।
পূর্বেষাং পুণ্যং যশসাং রাজ্ঞাঞ্চাকথয়ন্ কথাঃ ॥

পরিহাসকারী নটাচার্যগণ বিচিত্র রকমের হাস্যরস ও নর্তকীরা তাণ্ডব দ্বারা বিভুর পরিচর্যা করত। সাধারণভাবে তাণ্ডব (নৃত্য) পুরুষদের জন্য ও লাস্য (নৃত্য) স্ত্রীলোকদের জন্য নির্বাচিত দেখা যায়। তাণ্ডবকে অভিজাত (ক্ল্যাসিক্যাল) শ্রেণীর নৃত্য বলা যেতে পারে, তাই গ্রাম্য বা দেশীয় নৃত্য থেকে এ' সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। কিন্তু ভাস্কর্যশিল্পে নারীদের তাণ্ডবনৃত্যরতাও দেখা যায়। তাই মনে হয় প্রাচীন ভারতে নারীদের জন্যও তাণ্ডবের বিধান ছিল। অনেকে মনে করেন তাণ্ডবের গতি উদ্দাম, ভাব সৃষ্ট্যুন্মুখী রাজসিক ও এর করণপ্রয়োগ দৃঢ় ও বলিষ্ঠ, সুতরাং পুরুষেরাই সাধারণভাবে তাণ্ডবনৃত্য শিক্ষা ও প্রদর্শন করেন, আর লাস্যের প্রতিফলন কমনীয় ও সাবলীল, তাই নারীদের পক্ষে লাস্য বিধেয়। কিন্তু ভরত ও টীকাকার অভিনবগুপ্তের অভিপ্রায় তা নয়। তাঁরা তাণ্ডব ও লাস্যকে অভিন্ন রূপেই গণ্য করেছেন। তাই পরবর্তী গুণীরা (খৃষ্টীয় ৮ম-১১শ শতাব্দী) যে স্ত্রীলোকদের পক্ষে তাণ্ডবের অনুশীলনকে অশাস্ত্রীয় হিসাবে উল্লেখ করেছেন তা সমীচীন হয়নি বলে মনে হয়।

নাট্যশাস্ত্রে নৃত্য ও নাট্যের প্রসঙ্গে (৪র্থ অধ্যায়) ভরত তাণ্ডবের পরিচয় দিয়ে বলেছেন,

সে গীতকাদৌ যুজ্যন্তে সম্যঙ্ নৃত্তবিভাগকাঃ।
দেবেন চাপি সম্প্রোক্তস্তণ্ডুস্তাণ্ডবপূর্বকম্ ॥

গীতপ্রয়োগমাশ্রিত্য নৃত্তমেতৎ প্রবর্ত্যতাম্।
প্রায়েণ তাণ্ডবর্বিধিদেবস্তুত্যাশ্রয়ো ভবেৎ ॥
সুকুমারপ্রয়োগশ্চ শৃঙ্গাররসসম্ভবঃ।
তস্য তণ্ডুপ্রযুক্তস্য তাণ্ডবস্য বিধিক্রিয়াম্ ॥

নৃত্য নাট্যের অঙ্গ। গীত বা গানের মতো নৃত্যেরও যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। শোনা যায় মুনি তণ্ডু তাণ্ডবনৃত্যের স্রষ্টা। ভরতের মতো কোহলাচার্যও একথা স্বীকার করেছেন। কোহল বলেছেন,

সন্ধ্যায়াং নৃত্যঃ শম্ভোর্ভক্তাদ্রৌ নারদ পুরা।
গীতবাংস্ত্রিপুরোন্মাথং তচ্চিত্তস্তথ গীতকে ॥
চকারাভিনয়ং প্রীতস্ততস্তণ্ডুঞ্চ সোঽব্রবীৎ।
নাট্যোক্তাভিনয়েনেদং বৎস যোজয় তাণ্ডবম্ ॥

'অভিনবভারতী' টীকায় অভিনবগুপ্ত উল্লেখ করেছেন 'লাস্য'-শব্দে সকল রকম নৃত্যই বোঝাতে পারে। তণ্ডু মুনির সৃষ্ট তাণ্ডবের প্রসঙ্গে অভিনবগুপ্ত নাট্য, কাব্য ও গীত এ'তিনটির বিশদ আলোচনা করেছেন। রাগকেও অনেক সময় কাব্য বলা হয়, কেননা রাগ স্বরেরই কাঠামো আর স্বরের আধার বা আশ্রয় হ'ল কাব্য : "অতএব রাগকাব্যানীত্যুচ্যন্তে এতানি রাগো গীত্যাত্মকত্বাৎ স্বরস্য তদাধারভূতং কাব্যমিতি"। তাণ্ডববিধি সম্বন্ধে আচার্য অভিনবগুপ্ত বলেছেন : "তাণ্ডববিধিরিতি সর্বং নৃত্যমুচ্যতে লাস্যশব্দেন সন্নিধৌ গোবলীবর্দন্যায়েন প্রবর্ততে তত্র বিধীয়তেঽস্মিন্ নৃত্তমিতিবিধিঃবিধীয়মানং কাব্যং সদেবস্তুতিং বর্ণনীয়ত্বেন চাশ্রয়তি। * * 'তণ্ডুনাপি ততঃ সম্যগ্গানভাণ্ডসমন্বিতঃ, নৃত্তপ্রয়োগ' ইত্যাদি গীতির্গানমিতি হ্যত্র ব্যুৎপত্তিরুক্তা"। ভগবান শংকর[৭৩] নাকি মুনি তণ্ডুকে অঙ্গহারসমেত নৃত্যের (তাণ্ডব) প্রয়োগবিধি শিক্ষা দিয়েছিলেন, আর তারি জন্য তাণ্ডব রেচকাদি অঙ্গহারযুক্ত, গীত ও অভিনয়ের উন্মুখ, বাদ্য ও তালের অনুসারি প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত নৃত্য। অভিনবগুপ্ত উল্লেখ করেছেন : "তথাহি—শুদ্ধমেব নৃত্তং রেচকাঙ্গহারাত্মকং ততো গীতকাদ্যভিনয়োন্মুখং ততোঽপি গানক্রিয়ামাত্রানুসারি বাদ্যতালানুসারি চ বাহুপ্রেঙ্খণোরঃকম্পপার্শ্বনমনোন্নমনচরণসরণস্ফুরিতকম্পিতভ্রূ-তারাপরিস্পন্দ-কটিচ্ছেদাঙ্গবলনমাত্ররূপম্"। তাণ্ডবনৃত্য

৭৩। এখানে শংকর শব্দে সম্ভবত পঞ্চানন শিব নন। তিনি 'সদাশিবভরতম্' নাট্যগ্রন্থপ্রণেতা আদিভরত সদাশিব বা সদাশিবভরত (আনুমানিক ২০০-৪০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ)।

বিশেষভাবে বর্ধমান বা বর্ধমানক গানের সঙ্গে সম্পর্কিত। বর্ধমানগীতির কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

ভরত তাণ্ডবের উল্লেখ ক'রে বলেছেন :

"সুকুমারপ্রয়োগশ্চ শৃঙ্গার রসসম্ভবঃ।"

শৃঙ্গার আদিরস ও বিশ্বসৃষ্টির কারণ। সত্ত্বগুণ থেকে সৃষ্টি, রজোগুণে পালন ও তমোগুণে ধ্বংস। তাই শৃঙ্গার কল্যাণের প্রতীক ও সত্ত্বগুণের পরিণতি বলে তাণ্ডবে সৃষ্টির উন্মাদনা ও রজোগুণের প্রকাশাধিক্য দেখা গেলেও সত্ত্বের তা পূর্ণপরিণতি। ঈশ্বর এক থেকে বহু হ'য়ে প্রজা সৃষ্টি করেছিলেন, মূলে রজঃসত্ত্বগুণই তার কারণ। শৃঙ্গাররস থেকে উদ্ভূত বলে তাণ্ডবনৃত্যে সত্ত্বের প্রসন্নতা ও সুকুমারতা নিহিত। এই প্রসন্নতার উদ্বোধক স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই। পুনরায় তাণ্ডবে সৃষ্টি ও সংহার দু'রকম বৃত্তিই থাকে। নটরাজ শংকর তাণ্ডবনৃত্যে নিখিলবিশ্ব সৃষ্টি ক'রে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে তার মহিমা নিজেই উপভোগ করেন ও পরে আবার প্রলয়-মূর্তিতে তাণ্ডবের উদ্দাম নৃত্যে বিশ্ব-সংসার ধ্বংসও করেন। তাই তাণ্ডবের দু'টি রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকের মতে শান্তরসের উদ্বোধক সৃষ্টিমুখী তাণ্ডব প্রসন্নতা ও কোমলতার প্রতিমূর্তি এবং 'প্রায়েণ * * দেবস্তুত্যাশ্রয়ো ভবেৎ'—দেবতাদের স্তুতির উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয় বলে কল্যাণময়, আর তারি জন্য শ্রীমদ্ভাগবতকার ও হরিবংশ-প্রণেতা কোমলস্বভাবা নারীদের পক্ষেও সেই নৃত্য বিহিত বলেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতকার পুনরায় উল্লেখ করেছেন : 'সূত, মাগধ ও বন্দীরা মৃদঙ্গ, বীণা, মুরজ ও বেণু প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে ও শঙ্খধ্বনির সঙ্গে নৃত্য, গীত ও স্তুতিপাঠ আরম্ভ করলো'। মহর্ষি মনু উল্লেখ করেছেন (মনুসংহিতা ১০।১২),

ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।[৭৪]
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ ॥

ঝল্ল, মল্ল প্রভৃতির মতো নটও ব্রাত্যক্ষত্রিয়। টীকায় কুল্লুকভট্ট উল্লেখ করেছেন : "ক্ষত্রিয়াৎ ব্রাত্যাৎ সবর্ণায়াং ঝল্লমল্লনিচ্ছিবিনটকরণখসদ্রবিড়খ্যা জায়ন্তে। এতান্যপ্যেকস্যৈব নামানি"। দেশভেদে একই জাতির নামভেদও দেখা যায়। ভাষ্যকার মেধাতিথি মহর্ষি মনুর উপরি-উক্ত শ্লোকটি সম্বন্ধে বলেছেন : "এতাভিঃ সংজ্ঞাভিঃ প্রসিদ্ধা এবং জাতীয়া বেদিতব্যাঃ", অর্থাৎ বিচিত্র সংজ্ঞা দ্বারা বিভিন্ন

৭৪। লিচ্ছিবি?

জাতিই বুঝতে হবে। সুতরাং এ'সব থেকে বোঝা যায় এক সময়ে নট ও নটীরা একশ্রেণীর জাতি হিসাবে গণ্য ছিল।

স্মার্ত পরাশর নটকে বর্ণসংকর হিসাবে গ্রহণ করেছেন। বৃহদ্ধর্মপুরাণে ছত্রিশটি জাতির মধ্যে নট মধ্যম-বর্ণসংকর ও বড়ুর অধম-বর্ণসংকর বলে উল্লিখিত হয়েছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও তাই। কিন্তু হরিবংশপুরাণে যে ছালিক্যনৃত্য, আসারিতনৃত্য বা গঙ্গাবতরণ-নৃত্যনাট্যের উল্লেখ আছে তাতে দেখা যায় মৃদঙ্গ, বীণা, বেণু প্রভৃতি বাদ্যের সঙ্গে যে নট ও নটীরা নৃত্য ও অভিনয়াদি করেছিলেন তাঁরা ছিলেন অভিজাত যাদববংশীয় পুরুষ ও নারী। শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামও নটবেশে নৃত্যে রত ছিলেন। বারনারীদের পক্ষেও অভিজাত নৃত্যে অবাধ অধিকার ছিল। সুতরাং নট, নটী বা বারনারীরা সকল সময়েই ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় বা বর্ণসংকর হিসাবে ভারতীয় সমাজে পরিত্যক্ত, নিন্দনীয় বা অপাঙ্‌ক্তেয় ছিল না।

অনেকের মতে 'নাটক' থেকে 'নট' শব্দটির উৎপত্তি। 'নট্'-ধাতুর অর্থ নৃত্য করা। সেই হিসাবে অভিনয়ে নৃত্য ও গীত যারা করে তারাই নট বা নটী নামে অভিহিত। অমরকোষে নটপর্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে,

শৈলালিনস্তু শৈলুষা জায়াজীবা কৃশাশ্বিনঃ।
চারণস্তু কুশীলবাঃ ভরতেত্যাপি নটাকৃতাঃ॥

নটসম্প্রদায় শৈলালী, শৈলুষ, জায়াজীব, কৃশাশ্বি, চারণ, কুশীলব ও ভরত এই সাত ভাগে (ও নামে) বিভক্ত। ভরত নাট্যশাস্ত্রে এই সাত শ্রেণীর নটকে এক জাতীয় বলে স্বীকার করেন নি, তবে নট হিসাবে সকলকেই গণ্য করেছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে দেখি খৃষ্টীয় ১৫শ-১৭শ শতাব্দীর বাঙ্গালাদেশে যে কোন নাটক বা গীতিনাট্যের মূলগায়ককে 'নট' বলা হ'ত, আর সেই নটের সহকারী হিসাবে যে গীতি ও নৃত্যকুশলা নারীরা থাকত তাদের বলা হ'ত 'নটী'। মঙ্গলকাব্যে 'নাট'-গান বা যাত্রাভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাঙ্গালার পল্লীসমাজে একসময়ে নাটগানের বিশেষ প্রচলন ছিল। নাটগানের পুরুষ-শিল্পীদের নাম ছিল 'নট' ও নারী শিল্পীদের নাম 'নটী'। নাটগানে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের বিশেষ সমারোহ থাকত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

॥ মৌর্যযুগ ও বৌদ্ধসাহিত্যে সঙ্গীত ॥

(খৃষ্টপূর্ব ৩২০—খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী)

৩২৪ খৃষ্টপূর্বাব্দেই মৌর্যরাজত্বের সূচনা বলা যায়, কেননা মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত-মৌর্য সে সময়ে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। মগধের রাজধানী ছিল গঙ্গা ও শোন নদীর সঙ্গমস্থলে পাটলিপুত্র-নগরে। অবশ্য জৈন, বৌদ্ধ ও পৌরাণিক প্রমাণপঞ্জী অনুসারে চন্দ্রগুপ্তের সন-তারিখ ব্যাপারে যথেষ্ট মতভেদ আছে। চন্দ্রগুপ্ত-মৌর্য অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্যের সহায়তায় ৩০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁর পুত্র বিন্দুসার ৩০০ থেকে ২৭৩ খৃষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত পাটলিপুত্র-নগরে রাজত্ব করেন। তাঁর সময়ে গ্রীস ও সুদূর প্রাচ্যের কয়েকটি দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল ও তার মাধ্যমে ভারতীয় সভ্যতা, শিক্ষা ও শিল্প-সংস্কৃতি যে বিদেশে বিস্তারলাভ করেছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়।

মহারাজ বিন্দুসারের পর প্রিয়দর্শী অশোক ২৭৩ খৃষ্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন ও ২৩৬ খৃষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সগৌরবে পাটলিপুত্রে রাজত্ব করেন। সম্রাট অশোকের জয়গাথা ভারতের ইতিহাসকে গৌরবান্বিত করেছে। অশোক তামিল-ভারত থেকে আফগানিস্তান পর্যন্ত সুবিশাল প্রদেশ জয় করেছিলেন। কম্বোজ, গান্ধার ও কাবুল-উপত্যকা, নেপাল ও কাশ্মীর এবং দক্ষিণে গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর ধারে ধারে অন্ধ্রদেশ পর্যন্ত দেশগুলি, কলিঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে পৌণ্ড্রবর্ধন পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল। তাঁর সময়ে পাটলিপুত্র-নগরে তৃতীয় বৌদ্ধ-মহাসঙ্গতীর অধিবেশন হয়। ভিক্ষু মোগ্‌গলিপুত্র তিসার বা উপগুপ্ত সেই অধিবেশনে অধিনায়কত্ব করেন। অশোক মজ্ঝাতিক, মহারক্ষিত, মজ্ঝিম, ধর্মরক্ষিত, মহাদেব প্রভৃতি প্রধান ভিক্ষুদের ও তাঁর পুত্র মহেন্দ্র প্রভৃতিকে কাশ্মির, গান্ধার, হিমালয়প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, সুবর্ণভূমি (বর্মা), লঙ্কা প্রভৃতি দেশে ও সমগ্র ইজিপ্ট গ্রীস, প্রভৃতি সুদূর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যেও ধর্ম-প্রচারের জন্য পাঠিয়েছিলেন। ফলে ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতি—শিল্প ও সঙ্গীত সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল।

অশোকের পর অন্যান্য মৌর্য-রাজারা অর্ধশতাব্দী ধরে রাজত্ব করেন। মৌর্য-যুগে বিভিন্ন ভাস্কর্য এবং বিভিন্ন ধর্ম, সামাজিক আচার-ব্যবহার ও প্রমোদ-অনুষ্ঠানে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের প্রচলন ছিল। খৃষ্টপূর্ব ৩য় থেকে ২য় শতকের মধ্যে মহাযান ও হীনযান সম্প্রদায়-দুটির মধ্যে অসংখ্য বৌদ্ধগ্রন্থ রচিত ও সংকলিত হয়। রামায়ণ ও মহাভারতের মতো বৌদ্ধ মারসম্যুত্ত, ভিক্ষুণীসম্যুত্ত, অঙ্গুত্তর-নিকায় প্রভৃতি গ্রন্থে থের ও থেরী গাথার বিবরণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ স্থবিরদের নামে যে সকল গাথা বা গান রচিত হয় তাদের নাম ছিল 'থেরগাথা' ও থেরী বা স্থবিরাদের উদ্দেশ ক'রে রচিত গাথা বা গানের নাম ছিল 'থেরীগাথা'। থেরগাথায় ১২৭৯টি গাথাযুক্ত ১০৭টি কবিতা ও থেরীগাথায় ৫২২টি গাথাযুক্ত ৭৩টি কবিতার উল্লেখ পাওয়া যায়। বিনয়পিঠক বা মহাবস্তুর অংশ বা গাথাও পাঁচ শত প্রত্যেক-বুদ্ধ গান করতেন। গাথাগুলি স্বরে অর্থাৎ ষড়্‌জাদি স্বরযোগে ও বিভিন্ন তালে গান করা হ'ত। অনেক সময় বীণা, মৃদঙ্গ, বেণু প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রেরও সহযোগ থাকত। বৌদ্ধ-জাতকমালায় দেখা যায় গানের সঙ্গে নৃত্যেরও সমাবেশ থাকত।

নির্দিষ্ট কতকগুলি থের বা স্থবির ও থেরী বা স্থবিরার নামে যে গাথাগানগুলি রচিত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথি ও খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে রচিত ধর্মপালের ভাষ্য থেকে। কতকগুলি থেরীগাথা আবার বৌদ্ধ-ভিক্ষুরা ও কতকগুলি থেরগাথা ভিক্ষুণীরা রচনা করেছিলেন। থের ও থেরী গাথা-দুটির প্রকৃতি ছিল পৃথক্‌ পৃথক্‌।[১]

১। "The Theragāthā and Therīgāthā are two collections, the first of which contains 107 poems with 1,279 stanzas (*gāthā*) and the second 73 poems with 522 stanzas, which are ascribed by tradition to certain Theras and Therīs mentioned by name. This tradition is guaranteed to us both by the manuscripts and the commentary of Dharmapāla, probably composed in the 5th century A.D., which also contains narratives in which a kind of life-history of each of these Theras and Therīs is told. * * Some of the songs which are ascribed to various authors may, of course, in reality be the work of only one poet, and, conversely, some stanzas ascribed to one and the same poet, might have been composed by various authors; there may also be a few songs among the 'Sons of the Lady Elders', composed by monks, and possibly a few songs among the 'Songs of the Elders', composed by nuns but in no case can these poems be the product of one brain. * *

"There can be no doubt that the great majority of the 'Songs of the Lady Elders' were composed by women. * * Mrs. *Rhys Davids*

খৃষ্টপূর্ব ২য় শতকে মনীষী বাৎস্যায়নের কামসূত্রও নিঃসন্দেহে তদানীন্তন সমাজে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের অবাধ প্রচলন ও অনুশীলনের কথা প্রমাণ করে। বাৎস্যায়ন ১।৩।১৬ সূত্রে নৃত্য, গীত, বাদ্য ও নাটকাখ্যায়িকা প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণনা থেকে বোঝা যায় তখনকার কুশীলবেরা বিভিন্ন দেবমন্দির থেকে এসে সরস্বতী-মন্দিরে নাটক অভিনয় করত। অভিনয়কে তিনি বলেছেন 'প্রেক্ষণক'। প্রেক্ষণক শব্দ থেকেই কালে অভিনয়-গৃহের নাম হয়েছে প্রেক্ষাগৃহ।

বাৎস্যায়নের সময়ে পুরুষদের মতো কুমারী ও বিবাহিতা নারীরাও সঙ্গীত অনুশীলন করত। তিনি "প্রাগযৌবনাৎ স্ত্রী" সূত্রে (১।৩।২) বলেছেন এমন কি পিতৃগৃহে থেকেই নারীরা কামসূত্র ও তদঙ্গবিদ্যা অধ্যয়ন করতে পারত। টীকায় যশোধরেন্দ্র উল্লেখ করেছেন: "প্রাগ্‌যৌবনাৎ স্ত্রী কামসূত্রং তদঙ্গবিদ্যাশ্চাধীয়ীত পিতুর্গৃহ এব তরুণ্যাঃ পরিণীতত্বাদস্বতন্ত্রায়াঃ" ইত্যাদি। 'তদঙ্গবিদ্যা' বলতে নৃত্য, গীত, বাদ্য ও অভিনয়াদি: "তদঙ্গবিদ্যাশ্চ গীতাদিকাঃ"। বাৎস্যায়ন আবার উল্লেখ করেছেন: "প্রত্তা পত্যুরভিপ্রায়াৎ" (১।৩।৪), অর্থাৎ প্রত্তা বা বিবাহিতা নারীরাও স্বামীর অনুমতি নিয়ে নৃত্য-গীতাদি শিক্ষা করতে পারত। বাৎস্যায়নের সময়ে (প্রায় খৃষ্টপূর্ব ২০০) নৃত্য, গীত ও বাদ্যের রূপ ও পদ্ধতি সম্ভবত মহাভারত-হরিবংশে উল্লিখিত গীতি ও নৃত্যধারার মতোই ছিল। বাৎস্যায়ন চৌষট্টি কলার নামোল্লেখ করেছেন। সেগুলি হ'ল: গীত, বাদ্য, নৃত্য, নাট্য, আলেখ্য, বিশেষকচ্ছেদ্য, তণ্ডুল-কুসুমাবলিবিকার, পুষ্পাস্তরণ, দশনবসনাঙ্গরাগ, মণিভূমিকাকর্ম, শয়নরচনা, উদকবাদ্য, উদকাঘাত, চিত্রাযোগ, মাল্যগ্রথনবিকল্প, শেখরাপীড়যোজন, নেপথ্যপ্রয়োগ, কর্ণপত্রভাঙ্গ, গন্ধযুক্তি, ভূষণযোজন, ইন্দ্রজাল,

has pointed out the difference in idiom, sentiment and tone between the 'Songs of the Elders' and the 'Songs of the Lady Elders'. One has only to read the two collections consecutively in order to arrive at the conviction that, in the songs of the nuns, a personal note is very frequently struck which is foreign to those of the monks, that in the latter we hear more of the inner experience, while in the former, we hear more frequently of external experiences, that in the monks' songs descriptions of nature predominate, while in those of the nuns, pictures of life prevail".—M. Winternitz: *A History of Indian Literature*, Vol. II (1933), pp. 101-102. Cf. also Mrs. Rhys Davids: *Psalms of the Sisters*, p. 59, and Prof. Oldenberg: *Literatur des alten Indien*, p. 101.

কৌচুমারযোগ, হস্তলাঘব, চিত্রশোকযূষভক্ষবিকারক্রিয়া, পানকরস-রাগাসবযোজন, সূচিজাপকর্ম, সূত্রক্রীড়া, প্রহেলিকা, প্রতিমালা, দুর্বচকযোগ, পুস্তকবাচন, নাটিকাখ্যায়িকাদর্শন, তকুর্কর্ম, কাব্যসমস্যা, পট্টিকাবেত্রবনিবিকল্প, তক্ষণ, বাস্তুবিদ্যা, রূপ্যরত্নপরীক্ষা, ধাতুবাদ, মণিরাগাকরজ্ঞান, বৃক্ষায়ুর্বেদ, মেষকুক্কুট-লাবকযুদ্ধবিধি, শুকশারিকাপ্রলাপন, উৎসাদনে-সংবাহনেকেশমর্দনকৌশল, অক্ষর-মুষ্টিকাকথন, পুষ্পশকটিকা, নিমিত্তজ্ঞান, ম্লেচ্ছিতবিকল্প, দেশভাষাজ্ঞান, যন্ত্রমাত্রিকা, ধারণমাত্রিকা, সংপট্ট, মানসীকাব্যক্রিয়া, দৃলিকতকযোগ, অভিধানকোষশব্দজ্ঞান, বস্ত্রগোপন, দ্যূতবিশেষ, আকর্ষক্রীড়া, বালকক্রীড়া, বৈয়ানিকীবিদ্যাজ্ঞান, বৈজয়িকীবিদ্যাজ্ঞান, ক্রিয়াকল্প, ছন্দোজ্ঞান, ব্যয়োমিকীবিদ্যাজ্ঞান।

খৃষ্টপূর্ব ৩য়-২য় অব্দে বৌদ্ধ-জাতকগুলি রচিত বা সংকলিত হয়। বারহুত-স্তূপে খোদিত জাতকাখ্যানের অসংখ্য শিলাচিত্র দেখা যায়। অনেকে মনে করেন ঠিক ঐ সময়ে—অর্থাৎ ৩য়-২য় খৃষ্টপূর্বাব্দে, আবার কারু কারু মতে ঐ সময়ের শেষে জাতকগুলি লেখা হয়। স্যর ওয়ালিস্ বাজ্ জাতকের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য।[২] জাতকগুলি ভগবান বুদ্ধের অতীত জন্ম-কাহিনীর পরিচয় দান করে। বৌদ্ধধর্মাবিলম্বীরা বলেন একজন্মে বোধিসত্ত্ব লাভ করা সুকঠিন, তাই গৌতম-বুদ্ধ বুদ্ধাঙ্কুর-বেশে কোটিকল্পকাল বিভিন্ন প্রাণীর রূপ ধারণ ক'রে জন্মগ্রহণ করেন ও পরে পূর্ণপ্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে অভিসম্বুদ্ধত্ব লাভ করেন।[৩]

জাতকগুলি থেরাবাদী বৌদ্ধদের পরিকল্পনা—বৌদ্ধধর্মে সর্বসাধারণের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা উৎপাদনের জন্য রচিত ও সংকলিত। অবদান-সাহিত্যগুলিও সমপর্যায়ভুক্ত।

২। "* * the orthodox Buddhists believe that this collection of Birth Stories was in existence some three or four centuries before the Christian Era. At the end of the 3rd century B.C. they were held to be sacred that they chosen as the subjects to be represented round the most sacred Buddhist buildings, *e.g.*, the relics shrines at Sānchi, Amarāvati and Bhārhut, and they were popularly known under the technical name of Jātakas."—*Baralam and Yewasef* (1923), pp. lxviii—lxix.

৩। The Jātakas, as one of the nine Aṅgas, referred to only some of the stories relating to the previous births of Buddha as found in the Mahāgovinda, Mahāsudassana, Makhādeva and other Jātakas traced by Dr. Rhys Davids in the *Nikāyas* and *Vinayas*, but they did not appear as yet as a separate collection depicting Bodhisattva's practice of the pāramitās."—*Aspects of Mahāyāna Buddhism and Its Relation to Hinayāna* (1930), pp. 4, 6-7.

'অবদান' সংস্কৃতভাষায় ও 'জাতক' পালিভাষায় রচিত হয়েছিল। অবদান-সাহিত্যে গৌতম-বুদ্ধ ছাড়াও অন্যান্য মহামানবদের জীবনী সংকলিত হয়েছিল, আর জাতক-গুলিতে বুদ্ধেরই মাত্র অতীত জন্মকাহিনী দেওয়া আছে। শ্রদ্ধেয় স্পেয়ার (J. S. Speyer) উল্লেখ করেছেন অবদান ও জাতকগুলির উদ্দেশ্য একই, মানুষের মনে বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করাই তাদের উদ্দেশ্য।[৪]

জাতক ন'টি অঙ্গের (নবাঙ্গ) অন্যতম। পরে নিদান, অবদান ও উপদেশ এই তিনটি অঙ্গ বা অংশযুক্ত ক'রে তাকে দ্বাদশাঙ্গ করা হয়। থেরাবাদীদের মতো সর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধরাও অবদান ও জাতকের প্রামাণ্য স্বীকার করেন।

জাতক 'বোধিসত্ত্বাবদান' নামেও পরিচিত। জাতকগুলির সংখ্যা কারু মতে ৫৫০। কিন্তু ডেনমার্কের পণ্ডিত ফৌসবোল-সম্পাদিত 'জাতকার্থবর্ণনা' নামক পালিগ্রন্থে ৫৪৭টি জাতকের উল্লেখ আছে। শ্রদ্ধেয় ঈশানচন্দ্র ঘোষ বলেছেন: মূল জাতকগুলির প্রকৃত সংখ্যা কত তা নির্দেশ করা কঠিন। উদীচ্য বৌদ্ধদের 'জাতকমালা' নামে একটি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। তাতে ৩৪টি মাত্র জাতক দেখা যায়।[৫] কেউ কেউ বলেন ঐ ৩৪টিই আদি-জাতক এবং ঐ আদি-জাতকগুলিকে জানতেন বলে গৌতম-বুদ্ধ 'চতুস্ত্রিংশজ্জাতকজ্ঞ' নামে পরিচিত হয়েছিলেন। বিশেষত উদীচ্য বৌদ্ধদের 'মহাবস্তু' নামে অপর একখানি গ্রন্থে প্রায় ৮০টি জাতকের উল্লেখ দেখা যায়। অধ্যাপক হজসনও বলেন তিব্বতদেশে নাকি ৫৬৫টি জাতকবিশিষ্ট একখানি 'বৃহদজাতকমালা' আছে।[৬]

শ্রদ্ধেয় ঈশানচন্দ্র ঘোষের উল্লিখিত উদীচ্য বৌদ্ধদের সংস্কৃত জাতকগুলির নাম আর্যসূর-কৃত 'জাতকমালা'। এই জাতকমালা পণ্ডিত হজ্‌সন আবিষ্কার করেন। ঐতিহাসিক লামা তারানাথ আর্যসূর বা আর্যসূরীকে অশ্বঘোষ, মাতৃকেত, পিতৃকেত, দুর্দর্শ, ধার্মিক-সুভূতি, মতিকিত্র প্রভৃতি নামেও অভিহিত করেছেন। তবে আর্যসূরই আচার্য অশ্বঘোষ কিনা তার সঠিক কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ এখনো পাওয়া যায় নি। মোক্ষমূলার, স্পেয়ার ও হজ্‌সনের মতে জাতকের সংখ্যা ৫৫০টি অথবা ৫৬৫টি। অধ্যাপক উণ্টারনিজের মতে ৫০০ খানির বেশী হলেও ৫৪৭ খানি

৪। Cf. *Avadāna-Satāka* (Bibliothica Buddhica), Preface, pp. V-VI. Vide also J. S. Speyer: *The Jātakamālā* (1895), Preface, p. XIII.

৫। যেমন ব্যাঘ্রী, শিবি, কুল্মাষপিণ্ডী, শ্রেষ্ঠী, অবিসহ্যশ্রেষ্ঠী, শশ, অগস্ত্য, মৈত্রীবল, বিশ্বন্তর, যজ্ঞ, শক্র, ব্রাহ্মণ, প্রভৃতি।

৬। শ্রদ্ধেয় ঈশানচন্দ্র ঘোষ: 'জাতক' (১ম খণ্ড, ১৩২৩), পৃঃ ৶৹.

জাতকমাত্র পাওয়া যায়।[৭] 'চুল্লনিদ্দেশ' নামক পুস্তকে (পৃঃ ৮০) নাকি ৫০০ খানি জাতকের উল্লেখ আছে। পরিব্রাজক ফা-হিয়েন লিখেছেন তিনি সিংহলে ৫০০ জাতকের চিত্র দেখেছিলেন।[৮] কিন্তু পণ্ডিত মোক্ষমূলার জাতকের সিংহলী অনুবাদ ও ভাষ্য সম্বন্ধে উল্লেখ ক'রে বলেছেন জাতকের পালি-সংস্করণ যা পাওয়া যায় তা সিংহলে সংরক্ষণ ক'রে রাখা হয়েছিল। প্রবাদ যে ৫৫০টি জাতক-কাহিনী পালিভাষায় রচনা করা হয় ও মহেন্দ্র সেগুলি প্রায় ২৫০ খৃষ্টপূর্বাব্দে সিংহলে নিয়ে যান। সিংহলীভাষায় তার আবার ভাষ্য রচনা করা হয় ও পরে সেই সিংহলী-সংস্করণ থেকে পালিভাষায় অনুবাদ করা হয়। পালিভাষায় অনুবাদ করেন বুদ্ধঘোষ খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে।[৯]

সুত্তপিটকাদি গ্রন্থে ও শ্যাম, তিব্বত প্রভৃতি দেশে নাকি আরো কয়েকটি জাতকের সন্ধান পাওয়া যায়। জাতক পদ্য ও গদ্য এই উভয় ছন্দে লিখিত। প্রত্যেকটি জাতক পূর্বজন্ম বা জন্মান্তরবাদ প্রমাণ করে। বৌদ্ধদের মধ্যে শাশ্বতবাদী ও উচ্ছেদবাদী এই দু'রকম সম্প্রদায় আছে। শাশ্বতবাদীদের মতে আত্মা বা অত্তা জন্মমৃত্যুহীন অবিনশ্বর। উচ্ছেদবাদীরা আত্মা স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁরা বলেন দেহের ধ্বংশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও নাশ হয়। মাধ্যমিক শূন্যবাদীরা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁদের মতে অনস্তিত্ব বা শূন্যই একমাত্র সত্য। অদ্বৈতবাদীরা এই শূন্যবাদ খণ্ডন করেছেন।

জাতকগুলি আখ্যানমূলক। অনেকগুলি জাতক তথা আখ্যান গৌতম-বুদ্ধের সময়েই প্রচলিত ছিল। শোনা যায় বুদ্ধ 'মহাধর্মপালজাতক' শুনিয়ে নিজের পিতাকে স্বধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন, 'চন্দ্রকিন্নরজাতক' পাঠ ক'রে যশোধরার পাতিব্রাত্যধর্ম যে পূর্বজন্মের সংস্কার থেকে সৃষ্ট তা প্রমাণ করেছিলেন, আর 'স্পন্দন', 'দদ্দভ', 'নটকিক', 'বৃক্ষধর্ম', 'সম্মোদমান' এই পাঁচটী জাতক পাঠ ক'রে তিনি শাক্য ও কোলিয়দের মধ্যে বিবাদ নিরসন করেছিলেন। গৌতম-কথিত জাতকগুলি নবাঙ্গের অন্তর্গত তা আগেই উল্লেখ করেছি। কতকগুলি আবার সুত্তপিটকের খুদ্দক-নিকায়ের শাখা। ধম্মপদ, থেরগাথা, থেরীগাথা, বুদ্ধবংস, চরিয়াপিটক পুস্তকগুলিও খুদ্দক-নিকায়ের ভিন্ন ভিন্ন অংশ।

৭। Cf. *A History of Indian Literature* (1933), Vol. II, pp. 123-124.

৮। Cf. *Record of the Buddhist Kingdoms*, translated by T. Legge, Oxford, 1886, p. 106, এবং ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়ার প্রবন্ধ (—*Indian Historical Quarterly*, II, 1926, p. 623).

৯। Vide *Preface to the Jātakamālā* (by J. S. Speyer), pp. XV-XVI.

সঙ্গীতে রাগের যেমন নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা নাই, জাতকেরও তেমনি। জাতক বল্লে কেবল বৌদ্ধজাতক বুঝাবে না, আখ্যানমাত্রেই জাতক, আখ্যানই জাতকের প্রাণ। এই আখ্যানের উৎপত্তি ভারতে বৌদ্ধযুগের অনেক আগেই হয়েছিল। জাতকের তিনটি ক'রে অংশ : প্রথম 'প্রত্যুৎপন্নবস্তু', অর্থাৎ গৌতম-বুদ্ধ কি উপলক্ষ্যে অথবা কোন্ প্রসঙ্গে আখ্যানটি বলেছিলেন তা বোঝানই প্রথম অংশের লক্ষ্য। দ্বিতীয় অংশই প্রাকৃত জাতক। এর নাম 'অতীতবস্তু', কেননা এই অংশেই বুদ্ধের অতীত জন্মকথার অবতারণা করা হয়েছে। তৃতীয় অংশের নাম 'সমবধান', অর্থাৎ অতীত বস্তুর বর্ণনায় যে সকল পাত্র বা কুশীলব থাকে তাদের সঙ্গে বর্তমান আখ্যায়িকায় বর্ণিত ব্যক্তিদের অভেদ প্রতিপন্ন করাই এই অংশের উদ্দেশ্য। ভারতের মতো সকল সভ্য দেশেই জাতকের মতো আখ্যান-গ্রন্থের সৃষ্টি হয়েছিল। তবে তিব্বতের 'বৃহজ্জাতকনামা' ও সিংহলের 'জাতকার্থ-বর্ণনা' এই দু'টি জাতকই বিশেষ প্রসিদ্ধ। ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে কে বড় এই নিয়ে বিবাদের একটি আখ্যান আছে। ঋগ্বেদেও আখ্যানের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ন্যায়শাস্ত্রে অন্ধ-গোলাঙ্গুল, লাজাবন্ধন, অর্ধজরতী, অন্ধহস্তী প্রভৃতি ন্যায়ের আখ্যান আছে। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের আখ্যানভাগকে অবলম্বন ক'রেই পরবর্তীকালে নাটকের উৎপত্তি হয়েছিল মনে হয়। ভারতে ও গ্রীসেই প্রাচীন আখ্যানগুলির প্রচলন দেখা যায়, তার কারণ এই দু'টী মহাদেশের সভ্যতাই সুপ্রাচীন ও এই দু'টী দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগও তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগের সময় থেকে ছিল। তবে গ্রীসের আখ্যানগুলির বীজ ভারতবর্ষ থেকেই প্রেরিত হয়েছিল বলে মনে হয়। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সিংহল থেকে বৌদ্ধ শ্রমণরা আলেকজান্দ্রিয়া নগরে ও সেখান থেকে মধ্যপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল দেশে ধর্ম ও শিক্ষা-প্রচারের জন্য গিয়েছিলেন, আর তাদের পরিভ্রমণকে উপলক্ষ্য ক'রেই জাতকের বীজও সেই সব দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভৃতিতেও আখ্যান তথা জাতকের আলোচনা আছে। শ্রদ্ধেয় ঈশানচন্দ্র ঘোষ উল্লেখ করেছেন : খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে অন্ধ্ররাজ হালের রাজত্বকালে গুণাঢ্য নামক এক ব্যক্তি 'বৃহৎকথা' নাম দিয়ে পৈশাচী-ভাষায় একটি 'বৃহৎকথাকোষ' রচনা করেছিলেন। গুণাঢ্যের গ্রন্থ কি ধরণের ছিল জানা অসম্ভব, কেননা তা এখন লুপ্ত হয়েছে। বাণের হর্ষচরিতে, দণ্ডীর কাব্যাদর্শে, ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরীতে এবং সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে

বৃহৎকথার নাম দেখা যায়। হর্ষচরিতে বৃহৎকথায় 'কৃতগৌরীপ্রসাধনা' এই বিশেষণ থেকে বোঝা যায় তার রচয়িতা ছিলেন সম্ভবত হিন্দু। কিন্তু সোমদেব যখন বৃহৎকথা অবলম্বন ক'রে তার 'কথাসরিৎসাগর' রচনা করেছিলেন তখন বৃহৎকথাতেও যে জাতকের প্রভাব ছিল একথা নিঃশংসয়ে বলা যেতে পারে।[১০]

খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে 'পঞ্চতন্ত্র' রচনা করা হয়। অনেকের মতে পঞ্চতন্ত্রের আখ্যানভাগ বৌদ্ধজাতক, বৃহৎকথা ও জনশ্রুতিকে অবলম্বন ক'রে লেখা হয়েছিল। পণ্ডিত বেন্‌ফি (Benfey) বলেছেন প্রাচীনকালে 'পঞ্চতন্ত্র' নাকি ১২টী বা ১৩টী অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল। তিনি সেটিকে বৌদ্ধগ্রন্থ বলেছেন, কারণ প্রধানতঃ জাতককে অবলম্বন ক'রেই বইটি লেখা হয়েছিল। অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেলের অভিমত সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি বলেন 'পঞ্চতন্ত্র' নিছক হিন্দুগ্রন্থ, এর রচয়িতাও ছিলেন একজন হিন্দু। অবশ্য পঞ্চতন্ত্র বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্যরাজ খস্রু নসীরবানের রাজত্বের সময় পহ্লবী-ভাষায় পঞ্চতন্ত্র অনুবাদ করা হয়। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে সিরিয়াক ও আরবী ভাষায় তার আবার অনুবাদ হয়েছিল। পঞ্চতন্ত্রের আখ্যান-ভাগের প্রধান কুশীলব দু'টি শৃগাল, নাম করটক ও দমনক। পারস্য ও আরব দেশ থেকে আখ্যানে তাদের নাকি ধার করা হয়েছিল। সিরিয়াক ভাষায় এদের নাম ছিল কলিলগ ও দমনগ ও আরবী-ভাষায় কালিলা ও দিমনা। কিন্তু এ' অনুমান সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে মনে হয়, কেননা ঐতিহাসিক প্রমাণপঞ্জী থেকে জানা যায় ভারতবর্ষে রচিত পঞ্চতন্ত্র থেকেই বরং সিরীয় ও আরবীয় নাম দু'টি গ্রহণ করা হয়েছিল। বার্লাম ও যোয়াসফের কাহিনীও[১১] সম্পূর্ণ ভারতীয়, খৃষ্টান-জগৎ পরে তা আত্মগত করেছিল। অধিকাংশ খৃষ্টান লেখকদের অভিমত যে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে দামাস্কাস নগরবাসী সেণ্ট্ জন্ গ্রীকভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থের ভেতর 'বার্লাম ও যোয়াসফ্' গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। ক্রমে লাটিন, ফরাসী, ইতালিয়ান, জার্মাণ, স্পেনিশ, সুইডিস, ওলন্দাজ, সিরিয়াক, আরব, পহ্লবী

১০। 'জাতক' ১ম খণ্ড (সন ১৩২৩), পৃ' ৸৹

১১। বার্লাম ও যোয়াসফের অর্থ 'ভগবান বোধিসত্ব'। স্যার ওয়ালিস বাজ্ উল্লেখ করেছেন: "A name suggested by Bar-Allaha, and substituted for Balauhar=the Sanskrit 'Bhagavān', a being who had attained Buddha-hood. Yewasaf=Joasaph, a corruption of Yodasaf, from the Pehlevi 'Bodasaf'=Sanskrit 'Bodhisattva'—'one who is destined to become a Buddha'.

প্রভৃতি ভাষায় সে'টি অনূদিত হয়।[১২] যোয়াসফ্>যোসাফট্>বোদিসৎ আসলে 'বোধিসত্ত্ব' শব্দটারই অপভ্রংশ। 'বোধিসত্ত্ব' গৌতম-বুদ্ধের নাম। বৌদ্ধ-শ্রমণরা ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে বুদ্ধের জীবন ও বাণী পাশ্চাত্য জগতে সর্বত্র প্রচার করেছিলেন। দামাস্কাসের (?) সেণ্ট জন্ তারই আখ্যানভাগকে গ্রহণ ক'রে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে তাঁর প্রসিদ্ধ 'বার্লাম ও যোয়াসফ্' গ্রন্থ রচনা করেন।[১৩] অধ্যাপক রলিনসন্-প্রমুখ পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের অভিমতও তাই। কারু মতে জন্ ছিলেন সিনাই মঠের আবার কারু মতে জেরুজালেমের কাছে সেণ্ট্ সাবের সন্ন্যাসী।

শ্রদ্ধেয় ঈশানচন্দ্র ঘোষ বলেছেন খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা'-কে অবলম্বন ক'রে কাশ্মীরদেশীয় ক্ষেমেন্দ্র 'বৃহৎকথামঞ্জরী' ও সোমদেব 'কথাসরিৎসাগর' রচনা করেন। ক্ষেমেন্দ্র 'মঞ্জরী' নামেও মহাভারতের একটি সংক্ষিপ্তসার সংকলন করেছিলেন। ন্যক্ক নামে একজন বৌদ্ধ বন্ধুর অনুরোধে তিনি নাকি 'বৃহৎকথামঞ্জরী' রচনা করেন। 'কথাসরিৎসাগর' গ্রন্থে পঞ্চতন্ত্রের তিনটি তন্ত্র বা অধ্যায়, বেতালপঞ্চবিংশতি, শিবিরাজার ও বাসবদত্তার কাহিনী আছে। এছাড়া সংস্কৃত ভাষায় আখ্যানমূলক গ্রন্থ 'সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা' 'শুকসপ্ততি' ও জৈন 'কথাকোষ' প্রভৃতি গ্রন্থের নাম সুপরিচিত। সুতরাং আখ্যান ও জন্তু-জানোয়ারদের মাধ্যমে কাহিনী রচনার রীতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল।

কথা-কাহিনীর আকারে ভারতীয় সাহিত্যের অভিযান কবে থেকে শুরু হয়েছিল অনুসন্ধান করলে দেখা যায় বৈদিক সাহিত্যেই তার বীজ নিহিত।[১৮]

১২। স্যার ওয়ালিজ বাজ্ উল্লেখ করেছেন: "More than sixty translations, versions or paraphrases of it have been enumerated."—Cf. also K. S. Macdonald: *The Story of Barlaam and Joasaph*: *Buddhism and Christianity* (Cal. 1895), Introduction (ii) H. T. Colebrooks: *Miscellaneous Essays*, Vol. II (1873), p. 148-149.

১৩। (*i*) স্যর ওয়ালিস বাজ্ বলেছেন: "These are not of Christian but Indian Origin".—Cf. *Baralam and Yewasef* (1923), p. XIX. Vide also (*a*) Jacobs: *Barlaam and Josaphat* (1895); (*b*) Rhys Davids: *Buddhist Birth-Stories or Jātaka-Tales* (1880), p. XXIX.

(*ii*) স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: "** the fables of Æsop and Pilpay originated in India. Indeed, these stories of animals, with their wonderful Hindu morals, have influenced the young minds of Europe and America for many centuries."—*India and Her People*, p. 232.

শৌর্যবান বীরদের প্রশংসাসূচক গাথা ও স্তুতিবাদ এবং রাজা, রাজন্যবর্গ ও মুনি-ঋষিদের কার্যকলাপের বিভিন্ন কাহিনীর নিদর্শন বৈদিক সাহিত্যগুলিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। 'গাথা-নারাশংসী' তথা বীরগাথা ও 'আখ্যান' রাজসূয় ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞের একটি প্রধান বিষয়ীভূত অংশ ছিল। অশ্বমেধযজ্ঞে একজন পুরোহিত 'পরিপ্লব-আখ্যান' ও প্রাচীন রাজাদের কীর্তিকাহিনী পাঠ করতেন, আর একজন ক্ষত্রিয় বীণাগাথী মুখে মুখে আখ্যান রচনা ক'রে বীণা ও বাঁশী সহযোগে গান করতেন। এই গান ও বাদ্যযন্ত্রবাদন যাগযজ্ঞগুলির একটি অপরিহার্য অংশ ছিল। পৌরাণিক যুগে যাগযজ্ঞগুলিতে কুরু ও কোশলরাজ্যের অনেক রাজা ও সামন্তবর্গ যোগদান করতেন। ইক্ষাকু হরিশ্চন্দ্রের আখ্যান পাঠ করা তখনকার বৈদিক অনুষ্ঠানের একটি অংশরূপে গণ্য ছিল। কুরুরাজগণের আখ্যানও প্রচলিত ছিল। এখনও শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে বিরাটপর্ব পাঠের প্রচলন আছে। মাঙ্গলিক কর্মে চণ্ডীপাঠ তো হিন্দুদের ঘরে ঘরে এখনো অবশ্য করণীয় হিসাবে গণ্য।

জেনারল কানিংহাম ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বারহুত-স্তূপটি আবিষ্কার ক'রে তার সময় নির্ধারণ করেন ২৫০—১৫০ খৃষ্টপূর্বাব্দ। মাননীয় ওয়াডেলের অভিমত যে বারহুত-স্তূপের পূর্ব-তোরণটি খৃষ্টপূর্ব ২য় বা ১ম শতকে নির্মিত হলেও অপরাংশ তৈরী হয়েছিল খৃষ্টপূর্ব ৩য় শতকে। শ্রদ্ধেয় বুলার বলেছেন বারহুত ও সাচী স্তূপ-দু'টি খৃষ্টপূর্ব ৩য় শতকের তৈরী। অধ্যাপক ভিন্সেন্ট স্মিথের অভিমত বারহুত নির্মিত হয়েছিল খৃষ্টপূর্ব ১৫০—১০০ শতকে।[১৪] পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে বারহুত-রচনার কাল থেকেই অনেকে জাতকমালার রচনাকাল নির্দিষ্ট করেন।

অনেকে জাতকগুলিকে রামায়ণ ও মহাভারতের সমসাময়িক বলে অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁদের যুক্তি হ'ল : আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রে মহাভারতীয় কাহিনীর উল্লেখ আছে। আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রটি সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতকে লেখা হয়। সুতরাং গৃহ্যসূত্রটি প্রায় গৌতম-বুদ্ধের জন্মের সমকালীন ও তদনুসারে রামায়ণ মহাভারতকেও বুদ্ধের সমসাময়িক বলা যায়। অধ্যাপক ম্যাকডনেলও অনেকটা এ' ধরণের অভিমত পোষণ করেন। কিন্তু তুলনামূলক ঐতিহাসিক প্রমাণপাঞ্জীর পরিপ্রেক্ষিত আলোচনা ক'রে দেখলে এ' অভিমতের কোন সার্থকতা দেখা যায় না।[১৫]

১৪। বিস্তৃত আলোচনা ভিন্সেন্ট স্মিথ : *Asoka* (2nd edition), pp. 112-113.

১৫। Vide ইণ্টারনিজ : *A History of Indian Literature* (1927), Vol. II, pp. 471-473, 508-509.

বৌদ্ধ জাতকের সকল-গুলিতেই সঙ্গীত তথা নৃত্য, গীত ও বাদ্যের আলোচনা নাই। জাতকগুলির মধ্যে নৃত্য-জাতক (৩২ নং), ভেরীবাদক-জাতক (৫৯ নং), শঙ্খ-জাতক (৬০ নং), মৎস্য-জাতক (৭৫ নং), অসদৃশ্য-জাতক (১৮১ নং), সর্বদংষ্ট্র-জাতক (২৪১ নং), গুপ্তিল-জাতক (২৪৩ নং), ভদ্রঘট-জাতক (২৯১ নং), বীণাস্থূণা-জাতক (২৩২ নং), চুল্ল-প্রলোভন-জাতক (২৬৩ নং), ক্ষান্তিবাদি-জাতক (৩১৩ নং), কাকবতী-জাতক (৩২৭ নং), পাদকুশল-জাতক (৪৩২ নং), শোণক-জাতক (৫২৯ নং), কুশ-জাতক (৫৩১ নং), বিদুরপণ্ডিত-জাতক (৫৪৫ নং), বিশ্বন্তর-জাতক (৫৪৭ নং) প্রভৃতি আরো কয়েকটীতে নৃত্য, গীত, বাদ্য ও অভিনয়ের প্রসঙ্গ আছে। তবে এদের মধ্যে মৎস্য-জাতক, গুপ্তিল-জাতক এবং এ' ধরণের দু' তিনটি জাতকে সঙ্গীতের আলোচনা একটু স্পষ্ট ও বিস্তৃত। জাতকের সময়ে বীণার বিশেষ প্রচলন ছিল, তবে রাগ-রাগিণীদের কোন নির্দিষ্ট রূপের পরিচয় জাতকের মাধ্যমে পাওয়া যায় না। বিশ্বন্তর-জাতকে (৫৪৭ নং) গীত ও বাদ্যের কিছুটা নির্দিষ্ট রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং জাতকে সঙ্গীতের বর্ণনা রামায়ণ ও মহাভারতেরই অনুরূপ, কিন্তু উপাদান রামায়ণ মহাভারতের চেয়ে কমই বলা যায়। অথচ বৌদ্ধযুগে যে রাগ-রাগিণী, অলংকার, শ্রুতি, তাল, মূর্ছনা প্রভৃতির প্রচলন ছিল না তাও বলা যায় না। একমাত্র মৎস্য-জাতকে 'মেঘগীতি' ও গুপ্তিল-জাতকে উত্তম ও মধ্যম মূর্ছনা-দু'টীর নামোল্লেখ পাওয়া যায় এবং জাতকের যুগে তথা খৃষ্টপূর্ব ৩য়-২য় শতাব্দীর মধ্যে অথবা শেষার্ধে ভারতীয় সঙ্গীতের মালমশলার পক্ষে ঐগুলি বড় কম মূল্যবান নয়।

নৃত্য-জাতকে (৩২ নং) মাত্র নৃত্যের প্রসঙ্গ আছে এবং নৃত্য যে বিশুদ্ধ ও দোষবর্জিত হওয়া উচিত একথারই ইঙ্গিত আছে। এই জাতকটির আখ্যানাংশ হ'ল : হংসরাজকন্যা রত্নোজ্জ্বলগ্রীব বিচিত্রপুচ্ছ ময়ূরকে পতি-রূপে নির্বাচন করল। ময়ূর নৃত্যকলা জানত, কিন্তু নৃত্য তার অসম ও ছন্দোহীন হওয়ায় রাজকন্যার বরমাল্য থেকে সে বঞ্চিত হয়েছিল।

নৃত্য-জাতকের এই উপাখ্যানটি বারহুত স্তূপে খোদিত করা হয়েছে। এর প্রসঙ্গে ডাঃ উণ্টারনিজ লিখেছেন : "The fable of the dancing peacock * * * is an ancient one. As the fable was already represented on a relief of the Stūpa of Bhārhut in the

3rd century B. C., it must already at that time have been a Jātaka." [১৬]

অনেকের অভিমত যে, নৃত্য-জাতকের এই কাহিনীটি পারস্য থেকে গ্রীসে ও পরে ব্যাক্‌ট্রিয়া যখন গ্রীকদের শাসনাধীনে ছিল তখন গ্রীস থেকে তাকে ভারতবর্ষে আমদানী করা হয়। কিন্তু মাননীয় টনী (C. H. Tawney)[১৭], পণ্ডিত বেন্‌ফী (Benfey)[১৮] ও ওয়ারেন্‌ (S. J. Warren)[১৯] প্রভৃতি মনীষীরা তা অস্বীকার করেছেন। আসলে ভারতবর্ষ থেকেই জাতক-কাহিনীটি পারস্যের ভেতর দিয়ে হেরোডোটাসের সময় গ্রীসদেশে গিয়েছিল।

ভেরীবাদক-জাতকে (৫৯ নং) আছে, বোধিসত্ত্ব ভেরীবাদকের কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বারাণসী-নগরে কোন উৎসব উপলক্ষ্যে ভেরী বাজাবার জন্য গমন করেন। ভেরী বাজিয়ে তিনি যে অর্থ উপার্জন করেছিলেন দস্যুরা তার সমস্তই অপহরণ ক'রে নিয়েছিল। এই জাতকে একমাত্র বাদ্য হিসাবে ভেরীর উল্লেখই পাওয়া যায়। তেমনি শঙ্খ-জাতকে বাদ্য হিসাবে শঙ্খের উল্লেখই আছে।

মৎস্য-জাতকের (৭৫ নং) বর্ণনাটি সুন্দর। মৎস্য-জাতক দু'টি। তার মধ্যে ৭৫ নং সংখ্যক মৎস্য-জাতকেই সঙ্গীতের বর্ণনা আছে। কোশলরাজ্যে একবার অনাবৃষ্টির জন্য তড়াগ পুষ্করিণী সমস্তই শুষ্ক হয়েছিল। জেতবনের দ্বারপ্রকোষ্ঠের কাছে একটি পুষ্করিণী ছিল, তাও জলশূন্য হয়েছিল। মৎস্য ও কচ্ছপেরা কাদার ভেতর লুকিয়ে থাকত। সেই দেখে বোধিসত্ত্বের হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হ'ল। তিনি বল্লেন: 'আমি আজই বারিবর্ষণ করাব'। রাত্রি প্রভাত হ'লে তিনি প্রাতঃকৃত্য শেষ করলেন ও অসংখ্য ভিক্ষু-পরিবৃত হ'য়ে ভিক্ষার জন্য শ্রাবস্তী-নগরে প্রবেশ করলেন।

ভিক্ষা শেষ হ'ল, অপরাহ্নে বিহারে ফিরে আসার সময় বোধিসত্ত্ব জেতবনের পুষ্করিণীর সোপানে দাঁড়িয়ে স্থবির আনন্দকে উদ্দেশ ক'রে বল্লেন: 'আনন্দ, আমার স্নানবস্ত্র নিয়ে এস, আমি পুষ্করিণীতে স্নান করব'। আনন্দ শুনে আশ্চর্যান্বিত হ'য়ে বল্লেন: 'প্রভু, পুষ্করিণীতো জলশূন্য, সুতরাং স্নান আপনি

১৬। Cf. *A History of Indian Literature* (1933), Vol. II, p. 127.

১৭। Vide. *The Journal of Philology*, Vol. XII, 1883, p. 121.

১৮। Vide. *The Panchatantra*, I, p. 280.

১৯। Vide. *Hermes*, Vol. 29 (1894), p. 476.

কিভাবে করবেন?' বোধিসত্ত্ব উত্তর করলেন: 'আনন্দ, বুদ্ধের অসীম শক্তি, তুমি দ্বিধা করো না, স্নানবস্ত্র নিয়ে এস'। আনন্দ তথাস্তু বলে বস্ত্র আনলেন। বোধিসত্ত্ব বস্ত্রের এক প্রান্ত দিয়ে কটি বেষ্টন করলেন ও অপর প্রান্তে দেহ আচ্ছাদিত ক'রে সোপানের দাঁড়িয়ে বল্লেন: 'আমি জেতবনের এই পুষ্করিণীতে স্নান করতে ইচ্ছা করি'। বোধিসত্ত্বের কথা শেষ হ'তে না হ'তে দেবরাজ ইন্দ্রের পাণ্ডুবর্ণ শিলাসন উত্তপ্ত হ'য়ে উঠলো। তিনি চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন ও পরে সমস্ত ঘটনা-রহস্য জানতে পারলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মেঘরাজকে ডেকে বল্লেন: 'বোধিসত্ত্ব জেতবনের পুষ্করিণীতে স্নানের জন্যে সর্বোচ্চ সোপানে দাঁড়িয়ে আছেন, তুমি শীঘ্র যাও এবং কোশলরাজ্যে মুশলধারে বারিবর্ষণ কর'। ইন্দ্রের আজ্ঞা শিরোধার্য ক'রে মেঘরাজ একখণ্ড মেঘ বহির্বাস ও অপরখণ্ড মেঘ অন্তর্বাস রূপে গ্রহণ করলেন ও 'মেঘগীতি' গান করতে করতে পূর্বদিকে চলে গেলেন। তিনি প্রথমে খণ্ডমেঘের আকারে পূর্বাকাশে দেখা দিলেন, তারপর শত-সহস্র গুণ আকারে বর্ধিত হ'য়ে বিদ্যুৎস্ফুরণ ও গর্জনের সঙ্গে বেগে বারিবর্ষণ করতে লাগলেন। মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র কোশলরাজ্য প্লাবিত হ'য়ে গেল। অবিশ্রান্ত ধারায় বারিবর্ষণ হওয়ায় জেতবনের পুষ্করিণী বৃষ্টির জলে পরিপূর্ণ হ'ল এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না সর্বোচ্চ সোপানে জল এসে পৌঁছুল ততক্ষণ বর্ষণের আর শেষ ছিল না।

বোধিসত্ত্ব পুষ্করিণীর সর্বোচ্চ সোপানেই দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি স্নান শেষ ক'রে তীরে উঠে কাষায় বস্ত্র ও কটিবন্ধ ধারণ করলেন এবং বুদ্ধোচিত রীতিতে একটি স্কন্ধ তাঁর অনাবৃত থাকল। ক্রমে ভিক্ষুগণ পরিবৃত হ'য়ে বিহারে প্রবেশ করলেন ও গন্ধকুটিরের কাছে উপস্থিত হ'য়ে বুদ্ধাসনে উপবেশন করলেন। ভিক্ষুরা মনি-সোপানে দাঁড়িয়ে বোধিসত্ত্বের অমৃত-উপদেশ গ্রহণ করলেন।

মৎস্যজাতকে 'মেঘগীতি' শব্দটি বেশ অর্থপূর্ণ। মেঘগীতিকে অনেকে 'মেঘরাগ' বলে স্বীকার করেন। তাঁদের যুক্তি হ'ল: নাট্যশাস্ত্রকার ভরত জাতির পরিচয় দিয়েছেন ও সেগুলি রাগ-পর্যায়ভুক্ত। ভরত নিজেই কোথাও বা জাতিগান ও কোথাও জাতিরাগ বলে জাতির পরিচয় দিয়েছেন। বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গ জাতিরাগের নাম স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন। ভরত উল্লেখ করেছেন: "জাতিরাগং শ্রুতিশ্চৈব" '(২৮।৩৫)', "দ্বৈগ্রামকীনাং জাতিনাং "(২৮।৭৫), "জাতিগানে প্রবর্ত্তিতঃ" (২৯।৪), "করুণে তু রসে কার্যো জাতিগানে প্রযোক্তৃভিঃ" (২৯।৬)। মতঙ্গ

উল্লেখ করেছেন: "ষড়্জস্থানে ধৈবতঃ প্রযুজ্যমানো ধৈবতস্থানে ষড়্জঃ প্রযুজ্যমানো জাতিরাগবিনাশকরো ন ভবতি"। মোটকথা ভরত (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) 'জাতি' শব্দে জাতিরাগ তথা জাতিরাগগানই বলতে চেয়েছেন। জাতি যে 'রাগ' তা নিঃশংসয়ে তাঁর 'দশবিধজাতিলক্ষণম্' ও 'বর্ণালংকারলক্ষণম্', রসবর্ণন ('জাতয়ো রসসংশ্রয়াঃ') প্রভৃতি শব্দগুলি প্রমাণ করে। ভরতের সময়ে নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ গান বা গীতির প্রচলন ছিল। দেখা যায় গান ও গীতি পরিভাষা দু'টি সেখানে একই অর্থের প্রকাশক। আবার 'রাগ' অর্থে গান (তথা গীতি) শব্দেরও ব্যবহার করা হ'য়েছে। সুতরাং খৃষ্টপূর্ব ৩য়-২য় শতক থেকে খৃষ্টীয় ২য়-৩য় শতাব্দীর সমাজে গীতি 'রাগগীতি' হিসাবেই পরিচিত ছিল ও সেদিক থেকে মৎস্যজাতকে মেঘগীতিকে মেঘরাগ তথা মেঘরাগগীতি বলে মনে হয়। অধ্যাপক শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় সুচিন্তিত একটি নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন: "বুদ্ধের সময় নাই হউক, অন্ততঃ এই জাতক (মৎস্যজাতক) রচনার সময় মেঘরাগ প্রচলিত ছিল। নাট্যশাস্ত্রে রাগের পরিবর্তে রাগগীতির উল্লেখ আছে। এখানেও মেঘরাগের পরিবর্তে মেঘগীতির উল্লেখ করা হইয়াছে।"[২০] তাহলে প্রশ্ন এই যে মেঘরাগকে আমরা আদিরাগ বলতে পারি কিনা, কেননা খৃষ্টপূর্বাব্দে এর অস্তিত্ব জাতকে পাওয়া যায়। সূক্ষ্ম ঐতিহাসিক দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় শুদ্ধজাতিরাগ ও ষাড়বাদি গ্রামরাগের প্রচলন খৃষ্টপূর্ব ভারতীয় সমাজে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু অভিজাত দেশী-শ্রেণীভুক্ত মেঘরাগের কোন প্রচলন তখন ছিল না। নাট্যশাস্ত্রেও জাতিরাগ, গ্রামরাগ, ব্রহ্মগীতি এবং মাগধী, অধর্মাগধী ও ধ্রুবা প্রভৃতি ছাড়া মেঘরাগের কোন উল্লেখ নাই। দত্তিলমেও তাই। বৃহদ্দেশী তো অভিজাত দেশীরাগেরই সংকলন-গ্রন্থ। বৃহদ্দেশীতে (খৃষ্টীয় (৫ম-৭ম শতাব্দী) মালবকৌশিক, হিন্দোলক (হিন্দোল), সৈন্ধবী, ককুভ, সৌরাষ্ট্রী, গান্ধারী, বরাটী, গুর্জরী প্রভৃতি দেশীরাগের উল্লেখ আছে, কিন্তু মেঘরাগের কোন প্রসঙ্গ নাই। পার্শ্বদেবের সঙ্গীত-সময়সারে (খৃষ্টীয় ৭ম-৯ম শতাব্দী) গৌড়, শংকরাভরণ, মধ্যমাদি, ধন্নাসি, (ধনেশ্রী), দেশী, দেশাখ্য, ভৈরব, ভৈরবী, বসন্ত, তোড়ী, শ্রী, বেলাউলী (বেলাবলী), গুর্জরী, ললিতা ও এমন কি তুরস্কগৌড় ও তুরস্কতোড়ী প্রভৃতি দেশীরাগের পরিচয় আছে, কিন্তু মেঘরাগের কোন উল্লেখ নাই, তবে মল্হারী ও মল্লারের বর্ণনা আছে। সঙ্গীতসময়সারে মল্হারী ও মল্লার এক জাতীয়

২০। 'বিশ্ববাণী' (শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ পরিচালিত), শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫৭, পৃঃ ১০

রাগ নয়, কেননা মল্‌হারী আন্ধালী বা আন্ধালিকার অঙ্গ বা অংশ, মধ্যম তার বাদী ও গ্রহ, ঋষভ মন্দ্র ও গান্ধার বর্জিত, আর মল্লাররাগ মল্‌হারি বা মল্‌হারিকার মতো হলেও তাতে গান্ধার ও নিষাদ-বর্জিত। শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীত-রত্নাকরে (১৩শ শতাব্দী) মেঘরাগের উল্লেখ পাই: "মেঘরাগো মন্দ্রহীনো গ্রহাংশন্যাসধৈবতঃ" (২।২।১৬৪)। নারদের সঙ্গীত-মকরন্দে "মেঘরাগস্য যোষিতঃ" শ্লোকের অবতারণায়ও আমরা মেঘরাগের উল্লেখ পাই। মকরন্দকার নারদের মতে মেঘ ছয়রাগের অন্যতম, আর মল্লারীর উল্লেখ থাকলেও তা কিন্তু মেঘরাগের সঙ্গে মোটেই সম্পর্কিত নয়। যাই হোক সঙ্গীতশাস্ত্র বা গ্রন্থের নজির হিসাবে আমরা 'মেঘরাগ'কে প্রথম পাই খৃষ্টীয় ১১শ-১২শ শতাব্দীর পর, তার আগে নয়। সুতরাং ৩য়-২য় খৃষ্টপূর্বাব্দের মৎস্য-জাতকে মেঘগীতিকে জাতিগান তথা জাতিরাগের মতো মেঘরাগের অভিধান দেওয়া যায় কিনা ঐতিহাসিকেরা তা বিচার করবেন। জাতকের পূর্ব-সাহিত্য রামায়ণ, মহাভারত ও হরিবংশ প্রভৃতিতে এবং পরবর্তী সাহিত্য নাট্যশাস্ত্র, দত্তিলম্‌, বৃহদ্দেশী ও সঙ্গীতসময়সারে আমরা মেঘরাগের কোন উল্লেখ পাই না। খৃষ্টপূর্ব ৩য়-২য় শতকে দেশীরাগ হিসাবে মেঘরাগের প্রচলন থাকলে পূর্ববর্তী না হলেও পরবর্তী সমাজে তার প্রচলন কোথাও না কোথাও অব্যাহত থাকতই। কিন্তু তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

গুপ্তিল-জাতকে (২৪৩ নং) সঙ্গীতের আলোচনা সামান্যভাবে থাকলেও ঐতিহাসিক উপাদানের পক্ষে তা মোটেই নগণ্য নয়। বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের[২১] সময়ে বোধিসত্ত্ব একটি গন্ধর্বকূলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম তখন গুপ্তিলকুমার। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গান্ধর্ব বা সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শীতা লাভ ক'রে গুপ্তিলকুমার 'গান্ধর্ব' নামে পরিচিত হয়। সে সময়ে জম্বুদ্বীপে তাঁর মতো আর কেউ গন্ধর্ববিদ্যায় শিক্ষা লাভ করেন নি। তিনি চিরকুমার ও ব্রহ্মচারী ছিলেন।

২১। ব্রহ্মদত্ত নামটি কল্পিত এবং এটি ইন্দ্র, নারদ, ব্রহ্মা প্রভৃতির মতো কোনো পদবী হওয়াও বিচিত্র নয়। সমস্ত জাতকেই বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের নাম পাওয়া যায়। শ্রদ্ধেয় ঈশানচন্দ্র ঘোষ এ-সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন: "বারাণসী বৌদ্ধদিগের একটি প্রধান তীর্থ—গৌতমের ধর্মচক্রপ্রবর্তনের স্থান। কাজেই আখ্যায়িকাগুলির সঙ্গে বারাণসীর সম্বন্ধ স্থাপন বৌদ্ধগ্রন্থকারের পক্ষে বিচিত্র নহে। অপিচ, কাশ্যপ-বুদ্ধের পিতা ব্রহ্মদত্ত রাজা ছিলেন না; তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। আমাদের বোধহয় 'বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত' একটি কল্পিত নাম মাত্র। * * পাশ্চাত্য কথাকারেরা 'একদা' (once upon a time) দ্বারা যে কাজ করেন, জাতককার বারাণসীরাজ (ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে) দ্বারাও তাহাই সিদ্ধ করিয়াছেন।"—জাতক ১ম খণ্ড, পৃঃ ।৶০

এক সময়ে কয়েকজন বণিক বাণিজ্যের জন্য উজ্জয়িনী নগরে যান। সেখানে কোন পর্বের উপলক্ষ্যে উৎসবের জন্য মাল্য-গন্ধবিলেপন ও খাদ্য-পানীয় ক্রয় ক'রে উৎসবক্ষেত্রে সমবেত হন। তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন যে, উপযুক্ত বেতন দিয়ে একজন গন্ধর্ব বা গায়ককে উৎসবে নিয়ে আসবেন। মুসিলের নাম তাঁরা জানতেন, সুতরাং বীণাবাদক মুসিলকে এনে উৎসবে আনন্দ-দানের জন্য নিযুক্ত করলেন।

বারাণসীর বণিকরা আগে থেকেই মুসিলের বীণবাদন-চাতুর্যের কথা জানতেন। মুসিল বণিকদের আনন্দ পরিবেশনের জন্য 'উত্তম-মূর্ছনা-'য় বেঁধে বীণা বাজাতে লাগলেন, কিন্তু সে বাজনাও বণিকদের তৃপ্তি দিতে পারল না। 'উত্তম-মূর্ছনা' বল্‌তে জাতককার কি বলতে চেয়েছেন তা বলা যায় না। মুসিল তাদের অসন্তোষের ভাব লক্ষ্য ক'রে বীণার তারগুলিকে মধ্যম-মূর্ছনায় বেঁধে বাজাতে লাগলেন। এই 'মধ্যম-মূর্ছনা' ষড়জগ্রামের, মধ্যমগ্রামের বা গান্ধারগ্রামের কিনা তার কোন উল্লেখ নেই, কাজেই মধ্যম-মূর্ছনা উত্তরায়তা বা কলোপনতা অথবা সুমুখী কিনা তা বলা কঠিন। যাইহোক তাতেও বণিকদের মধ্যে কিন্তু আনন্দের ভাব দেখা গেল না। তখন মুসিল সিদ্ধান্ত করলেন যে, বণিকরা গান্ধর্ববিদ্যায় জ্ঞানহীন ব'লে বাজনার রসগ্রহণ করতে পারছেন না। সুতরাং তিনি নিজেকে সঙ্গীত-বিদ্যায় অনভিজ্ঞ এ'রকম ভাণ ক'রে বীণার তারগুলিকে আরো খাদের দিকে শিথিল ক'রে (মন্দ্রে বেঁধে) বাজাতে লাগলেন। তাতেও বণিকদের মধ্যে কোন সন্তোষের ভাব প্রকাশ পেলো না। অগত্যা তিনি বণিকদের জিজ্ঞাসা করলেন—তাঁরা কেমন উপভোগ করছেন। বণিকরা বললেন: 'আপনি বীণা বাজাচ্ছিলেন—কি যন্ত্রে সুর বাঁধছিলেন তা আমরা বুঝতে পারছি না'। একথা শুনে মুসিল দুঃখিত হ'য়ে বললেন: 'আপনাদের আনন্দ বিতরণ করতে পারলাম না বলে দুঃখিত। আপনারা অর্থ ফিরিয়ে নিন। তবে আপনারা যখন আবার বারাণসীতে যাবেন তখন আমায় আপনাদের সঙ্গে নেবেন'। বণিকরা সম্মত হলেন ও মুসিল বারাণসীতে ফিরে গেলেন।

আখ্যানটির এখানেই শেষ নয়। এর পর মুসিল গান্ধারবিদ্যায় পারদর্শী গুপ্তিলের কাছে আবার যন্ত্রবিদ্যায় শিক্ষালাভ করেন। গুপ্তিল মুসিলকে সর্বশ্রেষ্ঠ বাদকে পরিণত করেছিলেন। কিন্তু মুসিল নানান্ কারণে আচার্য গুপ্তিলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে বীণাবাদনে তাকে পরাজিত করেন। শিষ্যের কাছে পরাজিত গুপ্তিল পরিশেষে মনের দুঃখে মৃত্যুবরণকেই শ্রেয় জ্ঞান করেন। তিনি মৃত্যুর জন্য বনে প্রবেশ করলেন, কিন্তু মৃত্যুকে বরণ করতে মনে ভয় পেলেন। অগত্যা

গৃহে ফিরে গেলেন, কিন্তু তাঁর যাতায়াতে পথের তৃণরাশি শুষ্ক হ'তে লাগল, আর স্বর্গে ইন্দ্র (শক্র) পর্যন্ত বিচলিত হ'য়ে উঠলেন। অবশেষে ইন্দ্র গুপ্তিলের সম্মুখে আবির্ভূত হ'য়ে বললেন : 'আচার্য, আপনি কি ধরণের সাহায্য চান, আমি তাই করতে প্রস্তুত আছি'। গুপ্তিল আশ্চর্যান্বিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন : 'আপনি কে'? ইন্দ্র নিজের পরিচয় দিলেন। তখন গুপ্তিল ইন্দ্রকে গাথায় বললেন,

সপ্ততন্ত্রী সুমধুরা মোহিনী বীণার,
বাদন শিখিল অন্তেবাসিক আমার।
রঙ্গভূমে সেই মোরে চায় পরাজিতে,
রক্ষা কর হে কৌশিক, এই বিপত্তিতে ॥

দেবরাজ ইন্দ্র শুনে অভয় দিয়ে গাথা-সহযোগে বললেন,

তারিব তোমায় সৌম্য, নাহি কোন ভয়,
আচার্য-গৌরব রক্ষা করিব নিশ্চয়।
আচার্যেরে পরাজিতে শিষ্যে না পারিবে,
বিজয়ী আচার্য তার গর্ব বিনাশিবে ॥

ইন্দ্র গুপ্তিলকে উপদেশ দিলেন : 'আপনি বীণা (সপ্ততন্ত্রী) বাজাবার সময় একটি তার ছিঁড়ে ছ'টা তারে বাজাবেন, তাতে বীণার স্বরে কোন দৈন্য আসবে না। আপনার দেখাদেখি গুপ্তিলও তার বীণার তার ছিঁড়ে ফেলবে। এই তারের নাম 'ভ্রমরতন্ত্র'।[২২] আপনি তারপর একটি দু'টি ক'রে অপর ছ'টি তারও ছিঁড়ে মাত্র বীণার দণ্ডটি বাজাবেন, অপ্সরারা স্বর্গ থেকে আবির্ভূত হ'য়ে আপনার সামনে নৃত্য করবে। মুসিলও আপনার দেখাদেখি তার বীণার সকল তার ছিঁড়ে ফেলবে এবং তাহলেই সে পরাজিত হবে'। হ'লও তাই। আচার্য গুপ্তিলের কাছে পরাজিত হ'ল ও লোকে অসন্তুষ্ট হ'য়ে মুসিলকে হত্যা করল।

গল্পটি যেমনই হোক, এতে কিন্তু সপ্ততন্ত্রীবীণা, তিনশত অপ্সরার বীণার ছন্দে নৃত্য, ভেরীবাদন প্রভৃতির বিবরণ পাওয়া যায়, আর তা থেকে একথাই বুঝা যায় যে, বৌদ্ধজাতকের সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ৩য়-২য় শতকের ভারতীয় সমাজে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের বিশেষ প্রচলন ছিল। তা ছাড়া "সপ্ততন্ত্রী সুমধুর মোহিনী বীণার"— সাতটি তারযুক্ত বীণার উল্লেখ ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের ইতিহাসে মূল্যবান।

২২। ভ্রমরের মতো তারের শব্দ হ'ত বলে 'ভ্রমরতন্ত্র' নাম হওয়া স্বাভাবিক

জাতকে উল্লিখিত সপ্ততন্ত্রীবীণায় সাতটি তন্ত্রী বা তার থাকত ও তা নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত চিত্রাবীণারই অনুরূপ ছিল অনুমান করা যায় ("সপ্ততন্ত্রী ভবেচ্চিত্রা" —২৯।১১৪)। বৈদিকযুগে ও বিশেষ ক'রে ব্রাহ্মণ-সংহিতার সময়ে বিচিত্র তন্ত্রীযুক্ত বীণা ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রাদির প্রচলন ছিল। বর্তমান তার ও তাঁতযুক্ত সকল বাদ্যযন্ত্রই প্রাচীন বীণার রূপভেদ। প্রতিটি যুগের ও মানুষের রুচির পরিবর্তনে তাদের গঠনে বা নির্মাণপ্রণালীতেও বিবর্তন সৃষ্টি হয়েছে। পঞ্চবিংশব্রাহ্মণে (১।৫।৬।৮) অপঘাতলিকা, লাট্যায়নসূত্রে (৪।২।৫।৭) ও দ্রাহ্যায়ণে (১১।২।৬।৮) পিচ্ছোরা বা পিচ্ছোলা ও জৈমনীয়ব্রাহ্মণে অলাবু, বক্রা, কপিশীরষি, কাশ্যপী (কচ্ছপী) প্রভৃতি বীণার উল্লেখ আছে। দ্রাহ্যায়ণের কাণ্ডবীণা অবশ্য বেণুজাতীয় বাদ্যযন্ত্র। পঞ্চবিংশব্রাহ্মণে (১।৫।৬।১৩) শততন্ত্রী-বীণার (প্রাচীন 'বাণ' ও পরবর্তী 'কাত্যায়ণী') বিবরণ আছে। এ'ছাড়া মহাব্রত প্রভৃতি যাগে কর্করি প্রভৃতি বাদ্যের উল্লেখ আছে। ঋক্ ও অথর্বসংহিতায় আঘাতি বা আঘাটি ও কর্করি প্রভৃতির নামোল্লেখ পাওয়া যায়। মোটকথা প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত গীত ও নৃত্যের সঙ্গে বিভিন্ন জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের সমাবেশ থাকত। অবশ্য শিল্পীর প্রতিভার বিকাশের ও শিল্পের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রগুলির গঠনে ও বাদনপ্রণালীতে পরিবর্তন এসেছে।

বেদ, ব্রাহ্মণ, শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্র, রামায়ণ, মহাভারত, জাতক ও পুরাণের যুগে কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গে যেমন বাদ্যযন্ত্রের ও কখনো কখনো নৃত্যের সহযোগিতা থাকত, তেমনি একক বা পৃথকভাবে বাদ্যযন্ত্রেরও অনুশীলন হ'ত। গুপ্তিলজাতকই তার প্রমাণ। গুপ্তিলজাতকে গুপ্তিল ও মুসিল উভয়েই 'সপ্ততন্ত্রী'-বীণা বাজাতেন। মোটকথা সঙ্গীত অর্থে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সমাবেশ বোঝালেও সকল সময়েই বা সকল পরিবেশে তিনটির একত্র যোগাযোগ থাকত না, আর তারি জন্য সঙ্গীতের ত্রৌর্যত্রিক রূপের পরিচয় থাকলেও[২৩] শাস্ত্রকাররা উল্লেখ করেছেন: "অতো গীতং প্রধানত্বাদত্রাদাবভিধীয়তে", অর্থাৎ নৃত্য, গীত ও বাদ্যের মধ্যে গীত (কণ্ঠসঙ্গীত) প্রধান ব'লে তাকেই সঙ্গীত বলা যেতে পারে। তবে শাস্ত্রকাররা একথাও বলেছেন: "নৃত্তং বাদ্যানুগং প্রোক্তং বাদ্যং গীতানুবর্তি চ"; অর্থাৎ নৃত্য বাদ্যকে অনুসরণ করে ও বাদ্য গীতের অনুসারী হয়। এথেকে বোঝা যায় নৃত্য ও গীত এ'দুটির সঙ্গে সমতা রক্ষা করে বাদ্য সুতরাং বাদ্য, নৃত্য ও গীত এই উভয়েরই সহচরী।

২৩। গীতং বাদ্যং তথা নৃত্তং ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে।—সঙ্গীত-রত্নাকর ১।১।২১

ভদ্রঘট-জাতকে (২৯১ নং) বোধিসত্ত্বের পুত্রকে উপলক্ষ্য ক'রে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের উল্লেখ আছে। বীণাস্থূণা-জাতকে (২৩২ নং) বীণার উল্লেখ আছে: "নিপতিত পথপার্শ্বে ছিন্নতন্ত্রী বীণাসম"। অবশ্য উপমাস্থলেই বীণার কথা বলা হয়েছে, নচেৎ সত্যকারের সেখানে কোন গান বা বাদ্যযন্ত্রের প্রসঙ্গ নাই।

চুল্লপ্রলোভন-জাতকে (২৬৩ নং) একটি নৃত্য-গীত-বাদ্যকুশলা যুবতী নর্তকীর উল্লেখ আছে। নর্তকী বারাণসীরাজের কুমারকে প্রলোভিত করার জন্য বীণাসংযোগে গান আরম্ভ করেন। সে এমনি মধুরভাবে গান করে যে বীণার স্বরের সঙ্গে গানের ও গানের স্বরের সঙ্গে বীণার ধ্বনি মিলে এক হ'য়ে যায় প্রভৃতি। এ' জাতকটিতে নৃত্য, বাদ্য ও গানের পরিচয় পাওয়া যায়।

ক্ষান্তিবাদি-জাতকে (৩১৩নং) নৃত্য, গীত ও বাদ্যের উল্লেখ আছে। এই জাতকে উল্লেখ আছে: একদিন রাজা কলাবু সুরাপানে মত্ত হ'য়ে নটগণের সঙ্গে সাড়ম্বরে প্রমোদোদ্যানে প্রবেশ করলেন। মঙ্গলশিলাপট্টের ওপর তাঁর শয্যা রচিত হ'ল। নৃত্য, গীত ও বাদ্যনিপুণা নর্তকীরা নিজেদের শিল্পচাতুর্য পরিবেশন ক'রে রাজা কলাবুর মনোরঞ্জন করতে লাগল।

কাকবতী-জাতকে (৩২৭নং) সুপর্ণরাজ ও কাকবতীর প্রসঙ্গে বীণা ও গাথাগানের উল্লেখ আছে। পদকুশলমানব-জাতকে (৪৩২নং) বারাণসীর কোন গ্রামে পাটল নামক নটের নৃত্য-গীতের প্রশংসা আছে। এই জাতকে 'মহাবীণা'-র উল্লেখ দেখা যায়। 'মহাবীণা' সম্ভবতঃ মহতীবীণারই নামান্তর। মহতীবীণা সম্বন্ধে আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। গীত ও বাদ্যের আখ্যানটি এ'জাতকে এভাবে গড়ে উঠেছে:

নৃত্যগীতবিশারদ পাটল আমার
চলিল ভাসিয়া পড়ি গর্ভেতে গঙ্গার।
এমন একটী গীত শিখাও আমায়,
গেয়ে যাহা জীবিকার হইবে উপায়।

এখানেও নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

শোণক-জাতকে (৫২৯নং) রাজা অরিন্দম ও বালক পঞ্চচূড়কের প্রসঙ্গে গানের উল্লেখ আছে। এখানে ভেরীর শব্দে ঘোষণা ক'রে বহুলোকের সমাবেশ করা হয়েছিল গান শোনার জন্য। গান এখানে গাথাগান। বৈদিকযুগের গাথা তথা

সামগান ও বৈদিকোত্তর ক্ল্যাসিক্যালযুগে বৈদিকের উপকরণ নিয়েই নিবদ্ধ গাথাগানের পরিচয় পূর্বে দেওয়া হয়েছে। কাহিনী হ'ল: রাজা প্রথমে উত্থান-গাথা গান করলেন ও বালক পঞ্চচূড়ক প্রতিগীত গান করল। এছাড়া এখানে তূর্যধ্বনিরও উল্লেখ আছে। চিত্রসম্ভূত-জাতকেও (৪৯৮নং) নৃত্য-গীতের এবং প্রতিগানের প্রসঙ্গ আছে।

কুশ-জাতকে (৫৩১নং) মহাসত্ত্ব ও প্রভাবতীর প্রসঙ্গে 'কোকনদ' নামে একটী বীণার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজা মহাসত্ত্ব গানে ও বীণা-বাদনে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ভূরিদত্ত-জাতকে (৫৪৩নং) গান তথা সঙ্গীতের উল্লেখ আছে, তবে তা পাখীর গানকে উপলক্ষ্য ক'রে বর্ণনা করা হয়েছে। বিদুরপণ্ডি-জাতকে (৫৪৫নং) গন্ধর্বদের নৃত্যের উল্লেখ ও ইরন্দতীর গানের প্রশংসা আছে। এছাড়া পূর্ণকের গাথায় বর্ণনা আছে,

> সূপকার-পাচক-নর্তক-নটগণ
> গায়ক—গাইছে যারা করতালি দিয়া।
> বাদক বাজাইতেছে যন্ত্র—কুম্ভস্থূণ,
> পণব দিণ্ডিম শঙ্খ ভেরী ও মৃদঙ্গ
> কাংস্য-করতাল বীণা। নৃত্য বাদ্য গীত
> সমধুর, লয়শুদ্ধ শ্রুতি সুখকর—
> হের এ'সকল এই মণিতে নির্মিত।

জাতকের টীকাকার উল্লেখ করেছেন: "গাইছে পাণিস্বর বাজাইয়া"। রামায়ণ, মহাভারত ও হরিবংশে পাণিবাদকদের উল্লেখ আছে। সূত, মাগধ, বন্দীরা হাততালি দিয়ে নৃপতিবর্গের স্তুতিগান করত। এই স্তুতিগানও গাথাগান নামে পরিচিত ছিল। 'পাণিস্বর' হাততালির শব্দ। হাতের তালিতে তাল রেখে গান করার রীতি এক রকম বৈদিকযুগ থেকেই চলে আসছে। কেননা ঋত্বিক্‌রা যখন সামগান করতেন তখন তাঁদের পত্নীদের কেহ কেহ বাজাতেন বিশেষ ক'রে পিচ্ছোরা-বীণা ও কেউ কেউ গানের তালে তালে হাততালি দিয়ে নৃত্য করতেন। জাতককারও উল্লেখ করেছেন: "* * গায়ক—গাইছে যারা হাততালি দিয়া"। 'কুম্ভস্থূণ' একপ্রকার আনদ্ধজাতীয়-বাদ্যযন্ত্র। মাটির কুম্ভের (কলসী) মুখে চামড়ার আচ্ছাদন দিয়ে এই বাদ্যযন্ত্র তৈরী করা হ'ত। কুম্ভস্থূণ বাদ্যযন্ত্র বর্তমানে দক্ষিণ-ভারতে প্রচলিত ঘটবাদ্যের অনুরূপ ছিল ব'লে মনে হয়। মাটির তৈরী মৃদঙ্গ এবং পণব, করতাল, বীণা এ'সকল বাদ্যযন্ত্রেরও

গানে সহযোগ থাকত। নৃত্য, গীত ও বাদ্যযন্ত্রে সুরের মাধুর্য (রাগের ধর্ম), শুদ্ধ লয়, তাল প্রভৃতির সমাবেশ থাকত।

বিদুরপণ্ডিত-জাতকে সঙ্গীতের পূর্ণপরিচয়ই বরং পাওয়া যায়। নটগণের পরিচয় থাকায় খৃষ্টপূর্ব ৩০০-২০০ অব্দের সমাজে নাটক বা অভিনয়ের যে বিশেষ প্রচলন ছিল তা বোঝা যায়। তাছাড়া ৬ষ্ঠ—৫ম খৃষ্টপূর্বাব্দে ব্রহ্মাভরত, সদাশিব-ভরত-রচিত নাট্যগ্রন্থের প্রচলন থাকায় জাতকের সমাজে অভিনয়ের যে সমারোহ থাকবে এতে আর আশ্চর্য কি। হরিবংশপুরাণে ভদ্র-নটের সহায়তায় যাদবদের গঙ্গাবতরণ-নৃত্যনাট্যের বর্ণনায়ও তা সমর্থিত হয়। খৃষ্টীয় ১০ম—১১শ শতাব্দীতে রচিত বৌদ্ধ-চর্যাপদের অনেকগুলিতে বীণা ও নাটকের উল্লেখ আছে। চর্যায় বীণাপদের একটি গাথায় বর্ণনা আছে সিদ্ধাচার্য সূর্যকে লাউ (তুম্বা) ও চন্দ্রকে তন্ত্রী (তার) ক'রে অনাহতদণ্ডের সাহায্যে বীণা সৃষ্টি করেছিলেন। সেই বীণার ঝঙ্কারে বুদ্ধনাটকের অভিনয় হয়েছিল। ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী তিনটির সাহায্যে যোগসাধন করার কথাই বীণা-সৃষ্টির বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে সিদ্ধাচার্যের অভিনীত 'বুদ্ধনাটক'-টিই বিশেষ অর্থপূর্ণ। তথাগত বুদ্ধের পবিত্র জীবনালেখ্যকে রূপায়িত করাই বুদ্ধনাটকের উদ্দেশ্য ছিল। সেই নাটকের সঙ্গে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের পূর্ণ-সহযোগ থাকত। বিদুরপণ্ডিত-জাতকে উল্লিখিত নাট্যাভিনয়েও নৃত্য-গীতাদির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

জাতকে বৈতালিকদেরও উল্লেখ আছে। তারা রাজসভায় উচ্চৈঃস্বরে রাজাদের গুণাবলী গান করতেন। নৃত্যশীলা দেবদাসী ও অন্তঃপুরচারিণীদেরও নৃত্য-গীতে যোগদান করতে দেখা যায়। যেমন,

নৃত্য করে গান করে মধুর বচনে
অভ্যাগতে সম্ভাষণ করে নারীগণ,

* * * *

নৃত্যের সৌন্দর্যে আর মাধুর্যে গানের
একে করে অতিক্রম অন্যে পর পর।

নৃত্যের সৌন্দর্য বিচিত্র ছন্দ, অঙ্গহার, ভাব, রস প্রভৃতির পরিপূর্ণ বিকাশ নিয়েই সার্থক। গানের মাধুর্য অর্থে সুর তথা স্বর-সন্দর্ভের মধুরতা ও লাবণ্য। শার্ঙ্গদেব 'মধুরং' শব্দটি সম্বন্ধে বলেছেন: "মধুরং ধুর্যলাবণ্যপূর্ণং জনমনোহরম্" (৩।৩৭৮)। গানের স্বর বা সুর লাবণ্যপূর্ণ ও জনচিত্তের রঞ্জক হলেই তা

রাগ-পর্যায়ভুক্ত হয়। নারদীশিক্ষাকার উল্লেখ করেছেন: "মধুরং নাম স্বভাবোপনীত ললিতপদাক্ষরগুণসমৃদ্ধং মধুরমিত্যুচতে" (৩।১১)। ললিত অর্থে লাবণ্যপূর্ণ, সুতরাং কাব্য ললিত পদ ও অক্ষরযুক্ত হলেই তা ভাব ও তালের প্রকাশক, সমনিয়ত বা সুসঙ্গত হয়, শ্রোতাদের মনকে সমরসে পরিপূর্ণ ক'রে সুরে নিবিষ্ট করে। সঙ্গীতে 'রাগ'-বস্তুটির স্বধর্মও তাই। তাই জাতকের (৩০০-২০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ) সমাজে সমনিয়ত সুললিত তথা লাবণ্যপূর্ণ স্বরসন্দর্ভ-সমাবেশের গান অথবা মানুষের চিত্তরঞ্জকধর্মবিশিষ্ট 'রাগ' ছিল না তা স্বীকার করা যায় কি?

জাতককার উল্লেখ করেছেন নৃত্যের সৌন্দর্যে ও গানের মাধুর্যে নর্তক-নর্তকীদের সঙ্গে গায়ক-গায়িকাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলত। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার পিছনে তাদের শাস্ত্রীয় ও সৌন্দর্য জ্ঞান ও দৃষ্টির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। শিল্প হিসাবে সঙ্গীতের মানও তখন বিশেষ সমুন্নত ছিল বুঝতে হবে।

বিশ্বম্ভর-জাতকে (৫৪৭নং) কিন্নরগণের গান ও ময়ূর-ময়ূরীদের নৃত্যের উল্লেখ আছে। এছাড়া উল্লিখিত আছে,

> পঞ্চাঙ্গিক তূর্যধ্বনি ভাবি সে নিনাদে,
> এ'রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

'পঞ্চাঙ্গিক' বলতে আতত, বিতত, আতত-বিতত, ঘন ও সুষির এই পাঁচরকম বাদ্যযন্ত্র। পালি-মহাবংসের 'বংসত্যপ্পকাসিনী' ভাষ্যেও ঠিক এই ধরণের আতত, বিতত, আতত-বিতত সুষির ও ঘন এই পাঁচ শ্রেণীর বাদ্যের উল্লেখ দেখা যায়। 'আতত' অর্থে যার একদিকের মুখ চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে। 'বিতত'—যার দু'টি মুখই চামড়ায় আবৃত থাকে। 'আতত-বিতত' বল্‌তে বীণা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বুঝায়। 'ঘন' অর্থে কাঁসর, করতাল প্রভৃতি এবং 'সুষির' বল্‌তে ছিদ্রযুক্ত শঙ্খ, বাঁশী, ডমরু প্রভৃতি। এছাড়া ১১৪নং গাথায় আছে: 'নৃত্য-গীতধ্বনি যারে বিনিদ্র করিত'। ৫৮০নং গাথায়—'মালাপরি শিবিরাজ, নাচুক তাহারা' ও ৫৮১নং গাথায়—'গাইতে গাইতে কৃষ্ণা আসিছে আশ্রমে'। ৭০৫-৭০৭নং গাথাগুলিতে পাওয়া যায়,

> পাচক মোদক নট নর্তক গায়ক,
> পাণিস্বর, কুম্ভস্থূণা বাজায় যাহারা,
> মন্দ্রক বাদকগণ মায়াকার আর,

* * * *

বাজুক সকল বীণা ভেরী ও ডিণ্ডিম ;
বাজুক বিবিধ শঙ্খ বাদ্যযন্ত্র আর,
এক মুখ মাত্র যার চর্মে আচ্ছাদিত।
মৃদঙ্গ পণব বীণা কুচুম্ব তিণ্ডিম—
একসঙ্গে এ'সকল উঠুক বাজিয়া।

বিদুরপণ্ডিত-জাতকেও (৫৪৩নং) ঠিক এ'ধরণের উল্লেখ আছে। 'গোধা' বলতে এখানে বীণার তারকে বুঝায়। 'কুচুম্ব' ও 'তিণ্ডিম' বাদ্যযন্ত্র দু'টীর ঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। শবানুগমণে ও শব সংকারের শেষে ভেরী বাদনের প্রচলন ছিল।

জাতকমালার সমসাময়িক (খৃষ্টপূর্ব ৩য়—২য় শতক) ক্ষেমেন্দ্র-রচিত 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা' গ্রন্থে সঙ্গীতকুশলী গন্ধর্বদের গান্ধর্বগানের উল্লেখ আছে। এই অবদান-সাহিত্যের ৮০তম পল্লবে 'সুভদ্রাবদান'-প্রসঙ্গে গন্ধর্বরাজের একটি সহস্র তন্ত্রীবিশিষ্ট বীণা বাজানোর কথা উল্লেখ আছে (২৪-২৬ শ্লোক)। বীণার দণ্ডটি বৈদুর্যমণি দিয়ে শোভিত। কাহিনীটি হল: গন্ধর্বরাজ ও সুপ্রিয়ের মধ্যে বাজনার প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হ'লে বীণার তন্ত্রীতে মূর্ছনার বিকাশ দেখিয়ে দু'জনেই সমান গুণী ব'লে প্রথমে প্রতিপন্ন হলেন। পরে আবার গন্ধর্বরাজ সহস্রতন্ত্রীর সকল তারে মূর্ছনার তরঙ্গ সৃষ্টি করলে সুপ্রিয় পরাজিত হলেন।

আখ্যানভাগটির বাস্তব রূপ যেমনই হোক না কেন, অবদান-সাহিত্যে বীণার উল্লেখ ও তার অনুশীলনের একটি সুষ্ঠু পরিচয় পাওয়া যায়। বোধিসত্ত্বাবদানে সহস্র তন্ত্রীবিশিষ্ট বীণার উল্লেখ একটু অভিনব ও আশ্চর্য রকমের। বৈদিক সাহিত্যে শততন্ত্রীবিশিষ্ট 'বাণ'-বীণা ও গৃহ্যসূত্রে 'কাত্যায়ণী'-বীণার পরিচয় আমরা পেয়েছি, কিন্তু সহস্র তন্ত্রীবিশিষ্ট বীণার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। মনে হয় শততন্ত্রী-বীণার মর্যাদাকে বড় ক'রে দেখার জন্য (গুণবাদ) বোধহয় ক্ষেমেন্দ্র 'সহস্রতন্ত্রী' শব্দটি বীণার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন। অথবা মনে করা যায় তাঁর সময়ে বীণার প্রধান তন্ত্রীগুলির সহকারী (চিকারী) তার হিসাবে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অসংখ্য (সহস্র ?) তন্ত্রীর সমাবেশ ছিল। আর তাই যদি হয় তো তার নির্মাণ ও তন্ত্রী-সমাবেশ-প্রণালী নিশ্চয়ই বিজ্ঞানসম্মত ও অদ্ভুত রকমের ছিল।

বৌদ্ধজাতক ও গাথাগুলির পর সঙ্গীতের উপাদান পাই 'মহাবস্তু', 'ললিত-বিস্তর', 'লঙ্কাবতারসূত্র' প্রভৃতি গ্রন্থে। 'মহাবস্তু' বা 'মহাবস্তু-অবদান' হীনযানী বৌদ্ধদের প্রামাণিক গ্রন্থ। তেমনি 'ললিতবিস্তর' মহাযান-সম্প্রদায়ের অমূল্য গ্রন্থ।

মহাসাঙ্ঘিক-সম্প্রদায়ের লোকোত্তরবাদীরা মহাবস্তুকে বিনয়পিঠকও বলেন। মহাবস্তুর অংশ বা গাথার সংখ্যা পাঁচশো। প্রত্যেক-বুদ্ধরা সেই গাথাগুলি সুললিত সুরে ও ছন্দে গান করতেন ও সে দিক থেকে জাতকমালার মতো মহাবস্তুর গাথাগানগুলি যে বেশ প্রাচীন তা বোঝা যায়। মহাবস্তুকে অনেকে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর সংকলন-গ্রন্থ বলেন। ডাঃ উন্টারনিজের মতে মহাবস্তুর আসল উপাদান সংকলিত হয় খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে। অনেক ঐতিহাসিক মহাবস্তু-অবদানকে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর রচিত গ্রন্থ বলেন।

॥ ললিতবিস্তরে সঙ্গীত ॥

ললিতবিস্তরের অপর নাম 'বৈপুল্যসূত্র', কেননা এতে বিষয়বস্তুর সমাবেশ বিপুল। গ্রন্থখানি মহাযান-সম্প্রদায়ের প্রামাণিক হিসাবে গণ্য হলেও এর আসল বা প্রাচীন সংস্করণ হীনযানী-সম্প্রদায়ের সর্বাস্তিবাদীদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ললিতবিস্তরের বিষয় বা আখ্যানবস্তু তথাগত বুদ্ধের জন্ম ও জীবন-কাহিনী। 'ললিত' অর্থে লীলা বা খেলা, সুতরাং বুদ্ধের জীবনী তথা লীলা-কাহিনীর বিপুল বিচিত্র সমাবেশই 'ললিতবিস্তর' গ্রন্থ। গ্রন্থের প্রারম্ভেই আছে: "এবং ময়া শ্রুতমেকস্মিন্ সময়ে ভগবান শ্রাবস্ত্যাং বিহরতি স্ম। জেতবনেঽনাথপিণ্ড-দস্যারামে মহতা ভিক্ষুসঙ্ঘেন সার্ধং দ্বাদশভির্ভিক্ষুসহস্রৈঃ"।[১] ভগবান বুদ্ধ ১২,০০০ হাজার শ্রমণ বা ভিক্ষু ও ৩২,০০০ হাজার প্রত্যেক-বুদ্ধ পরিবৃত হ'য়ে বিহার করতেন। তিনি যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন তখন ৮৪,০০০ হাজার দুন্দুভির শব্দে আকাশ-পাতাল মুখরিত হয়েছিল। ললিতবিস্তরকে অনেকে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে রচিত বলেন। অধ্যাপক উন্টারনিজ তা স্বীকার করেন না। স্যামুয়েল বিল্ তাঁর *The Romantic Legend of Sākya Buddha* (1875) বইখানি চীনা-সংস্করণ 'অভিনিষ্ক্রমণসূত্র' থেকে সংক্ষেপে তর্জমা করেন। চীনা-সংস্করণটি রচনা করেন প্রথমে নাই-তাও-চেন (Nie-Tāo-Tchen) খৃষ্টীয় ২৮০-৩১২ অব্দে ও পরে জিনগুপ্ত সেটি অনুবাদ করেন খৃষ্টীয় ৫৮৭ অব্দে।[২] অধ্যাপক উন্টারনিজের মতে তিব্বতী-সংস্করণই সংস্কৃত

১। Vide Dr. S. Lefmann: *Lalita-Vistara* (1902), p. 1.

২। শ্রদ্ধেয় বিল (S. Beal) মুখবন্ধে লিখেছেন: "These statements are in agreement with the opinion of the learned translator of *'Lalita-Vistara'*, from the Thebetan. * * 'This would give it an antiquity of two

অনুবাদের বিশুদ্ধ রূপ, কিন্তু মনে হয় খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর আগে তার অনুবাদ করার কাজ শুরু হয়নি ও সেকথা জাভার বরোবুদুর মন্দিরগাত্রে খোদিত ললিতবিস্তরে উল্লিখিত বুদ্ধ-জীবনীর চিত্রাবলী থেকেও প্রমাণ হয়। মোটকথা নানান্ দিক থেকে আলোচনা করলে একথাই মনে হয় যে আসল 'ললিতবিস্তর' গ্রন্থটি খৃষ্টীয় ১ম-২য় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রচিত হয়েছিল।

ললিতবিস্তরে নৃত্য, গীত ও বাদ্যযন্ত্রাদির যথেষ্ট নামোল্লেখ আছে, কিন্তু তাদের নির্দিষ্ট কোন রূপের পরিচয় পাওয়া কঠিন। তবে ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে তাদের উল্লেখ মোটেই নগণ্য নয়। কেননা গ্রন্থে উল্লিখিত বিষয়বস্তু যেমন গ্রন্থ-রচয়িতার জ্ঞান-সমৃদ্ধির পরিচয় দেয়, তেমনি রচয়িতার পূর্ব ও সমকালিন সমাজের রুচি অনুযায়ী অনুষ্ঠানের কথাও প্রকাশ করে। ললিতবিস্তরে গাথা, গান, নৃত্য ও বাদ্যযন্ত্রাদির উল্লেখ হ'ল :

(ক) এবং বহুপ্রকারা সংগীতিরবানুনিশ্চরা গাথা।
চোদেন্তি করুণামনসং অয়ং স কালো মা উপেক্ষস্ব ॥[৩]

(খ) * * অনেকাপ্সরঃশতসহস্রনৃত্যগীতবাদিতপরিগীতে * *।[৪]

(গ) ন তরঙ্গতুল্যকল্পাঃ সংগীতি চ অপ্সরোভি সংবাসঃ।[৫]

(ঘ) মহত্যন্তঃপুরে ভেরীমৃদঙ্গপণবতূণববীণাবেণুবল্লকীসংপতাড-
প্রভৃতয়স্তূর্যভাণ্ডাস্তে সর্বে স্বয়মঘট্টিতা এব * *।[৬]

(ঙ) সংগীতিতূর্যরচিতৈশ্চ সুবাদ্যকৈশ্চ
বর্ণাগুণাং কথয়তো গুণসাগরস্য।[৭]

(চ) * * দেবেভ্যশ্চতুরশীত্যপ্সরঃ শতসহস্রাণি নামাতূর্য-
সংগীতিবাদিতেন যেন বোধিসত্ত্বস্তেনোপসংক্রামণ
বোধিসত্ত্বস্য পূজাকর্মণে।[৮]

thousand years' he adds, although the original treatise must be attributed to an earlier date."—*The Romantic Legend of Buddha* (London, 1875), Introduction, p. vii.

৩। ললিতবিস্তর (১৯০২) edited by Dr. S. Lefmann, পৃঃ ১৩

৪। " পৃঃ ৩০

৫। " পৃঃ ৩৭

৬। " পৃঃ ৪০

৭। " পৃঃ ৪৭

৮। " পৃঃ ৫১

(ছ) তানি চাপ্সরঃ শতসহস্রাণি স্বাং স্বাং সংগীতিং সংপ্রযুজ্য
পুরতঃ পৃষ্ঠতো বামদক্ষিণেন চ স্থিত্বা বোধিসত্ত্বং
সংগীতিরুতস্বরেণাভিস্তুবন্তি স্ম।[৯]

(জ) বহুনি চাপ্সরঃশতসহস্রাণি শঙ্খভেরীমৃদঙ্গপণবৈঃ ঘণ্টাবসক্তৈঃ
প্রতীক্ষমাণান্যবস্থিতানি সংদৃশ্যন্তে স্ম।[১০]

(ঝ) রাজ্ঞঃ শুদ্ধোদনস্যান্তঃপুরেণ গীতবাদ্যসম্যক্তূর্যতাডাবচর-
সংগীতিসংপ্রবাদিতেন পরিবৃতা। * * নানাগীতবাদ্য-
বর্ণভাষিণীভিরনুগম্যমানা নির্যাতি স্ম। * * দেবসংগীত্যনুগীতঃ * *[১১]

(ঞ) * * শঙ্খভেরীমৃদঙ্গপণবতূণববীণাবল্লকিসম্পতাডকি-
পলনকুলসুঘোষমধুরবেণুনির্ণাদিতঘোষরুতনানাতূর্যসংগীতি-
সংপ্রয়োগপ্রতিবোধিতস্য যে চ নারীগণাঃ স্নিগ্ধমধুরমনোজ্ঞ-
স্বরবেণুনিনাদিতানির্ঘোষরুতেন বোধিসত্ত্বং * * তেভ্যো
বেণুতূর্যনিনাদনির্ঘোষরুতেভ্য ইমা বোধিসত্ত্বস্য সংচোদনা
গাথা নিশ্চরন্তি স্ম।[১২]

(ট) গীতবাদিতনৃত্যৈশ্চেনং সদেব যুবতয় উপতস্থুঃ।[১৩]

(ঠ) বীণাবল্লকিবংশতন্ত্রিরচিতা ছিন্যন্ত্যকস্মাত্তদা,
ভেরীশ্চৈব মৃদঙ্গং পাণ্যভিহতা ভিদ্যন্তি নো বাদ্যিষু॥

* * * *

নো নৃত্তে ন চ গায়িতে ন রমিতে ভূয়ো মনঃ কস্যচিৎ।[১৪]

এ'ধরণের নৃত্য, গীত ও বাদ্যের নামোল্লেখ থেকে একথাই বোঝা চায় যে ভগবান বোধিসত্ত্বের পবিত্র জীবন-কাহিনীকে মহিমামণ্ডিত করার জন্য রচয়িতা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের এবং অন্তঃপুরে অপ্সরা ও নৃত্যশীলা নারীদের নৃত্যছন্দের বর্ণনা করেছেন ও সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন সমাজের সঙ্গীত-রুচি ও অনুশীলনের পরিচয় দিয়েছেন। 'সংগীত' (সংগীতি) পরিভাষাটি ত্রৌর্যত্রিক রূপের (নৃত্য-গীত-বাদ্যের)

৯। ললিতবিস্তর পৃঃ ৫২
১০। " পৃঃ ৭৭
১১। " পৃঃ ৮২
১২। " পৃঃ ১৬৩
১৩। " পৃঃ ১৮৬
১৪। " পৃঃ ১৯৪

দ্যোতক হিসাবে সমাজে আদৃত দেখা যায়: "গীতবাদিতনৃত্যৈশ্চেনম্"।[১৫] বিশেষ ক'রে গান বা গীতিকে বোঝাবার জন্য ললিতবিস্তরে 'সংগীতি' (সংগীত) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

শ্রদ্ধেয় স্যামুয়েল বিল্ উল্লেখ করেছেন: গৌতম-বুদ্ধ যখন রাজকুমার তখন তাঁর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য রাজা শুদ্ধোধন বড় কম আয়োজন করেন নি। রাজপ্রাসাদের মধ্যে সঙ্গীতানুষ্ঠানের জন্য তিনি সহস্র সহস্র বাদ্যযন্ত্রের সমাবেশ করতেন।[১৬] বাদ্যযন্ত্রগুলির পরিচয় যেমন, বীণা, ৫টি তন্ত্রীযুক্ত হাজার বীণা (গীটার), এক হাজার ছোট ছোট মৃদঙ্গ, ১৩টি পর্দাযুক্ত হাজারটি বাদ্যযন্ত্র, বৃহদাকারের এক হাজার বীণা, হাজারটি ৭টি ছিদ্রযুক্ত বেণু। এ'রকম আরো বিচিত্র বাদ্যযন্ত্রের সমবেত শব্দে রাজ-অন্তঃপুর দিবারাত্র প্রপূরিত হ'য়ে থাকত। সেই বাদ্যযন্ত্রগুলির সঙ্গে গানের সমাবেশ থাকত এবং হস্ত-চালনার দ্বারা সেই সঙ্গীতকে নিয়ন্ত্রণ করা হত।[১৭]

ললিতবিস্তরে বিভিন্ন গাথার উল্লেখ আছে। গাথার মাধ্যমে সে যুগে উত্তর-প্রত্যুত্তর দেবার রীতি ছিল। গাথাগুলি বিভিন্ন স্বরযোগে বিভিন্ন ভিক্ষু, ভিক্ষুণী ও নগরবাসীরা গান করত। রাজপ্রাসাদে গানের যথেষ্ট সমাদর ছিল। রাজদরবারে সঙ্গীত-শিল্পীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হ'ত। রাজা ও অমাত্যেরা শিল্পীদের যথোচিতভাবে সম্মান দিতেন। দেবদাসী বা নর্তকীরা তো থাকতই,

---

১৫। ললিতবিস্তর, পৃঃ ১৮৬

১৬। Vide S. Beal: *The Romantic Legend of Sākya Buddha* (London, 1875).

১৭। Moreover, within the Palace he organised a performance of music of many thousand instruments; amongst which were the following :—A thousand flat-lutes of twenty-three strings (hong-han), a thousand harpsichords (ku-chang), a thousand five-stringed guitars (in), a thousand small drums, a thousand dulcimers with thirteen cords (chuk), a thousand large lutes (kàm), a thousand viols (pi pa), a thousand soft drums (sai ku), a thousand large drums, a thousand fifes (tik), a thousand organ-like instruments (shang), a thousand copper cymbals, a thousand pandean pipes (sin), a thousand dulcimers (pat chuk), a thousand bamboo flutes with seven holes (chî), a thousand conch trumpets (lo). All these musical instruments, producing different sounds, were played and accompanied by singing, and regulated by movements of the hand by day and night, within the royal apartments of the Prince's Palace * *"—*The Romantic Legend of Sākya Buddha* (London, 1875), p. 102.

তাছাড়া গায়ক, বাদক ও নর্তকরা রাজপ্রাসাদ, শোভাযাত্রা, বিচিত্র মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, আনন্দোৎসব প্রভৃতির শোভা বৃদ্ধি করত। বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গাদির বর্ণনা থেকে বোঝা যায় বাদ্যযন্ত্রনির্মাতারা (শিল্পীরা) কুশলী ছিল। যন্ত্রীরা নতুন নতুন পদ্ধতিতে বাজাবার শাস্ত্রীয় ধারা ও কৌশল সম্বন্ধে অবগত ছিল। অন্তঃপুরচারিণীদের পক্ষেও নৃত্য-গীতের অনুশীলন নিষিদ্ধ ছিল না। নৃত্যছন্দ সুনিয়ন্ত্রিত ও মাধুর্যপূর্ণ ছিল। রামায়ণ-মহাভারতের সময়ে (খৃষ্টপূর্ব ৪০০-৩০০) নৃত্য প্রাচীন নাট্যবেদীয় ধারা অনুযায়ী ছিল: "উপনৃত্যন্ত ভরতং ভরদ্বাজস্য শাসনাৎ" (অযোধ্যাকাণ্ড ৯৬।৪৬-৪৭)। এই নাট্যাচার্য ভরত কিন্তু খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর মুনি ভরত নন একথা আগেই উল্লেখ করেছি। এই ভরত সম্ভবত ব্রহ্মভরত বা আদিভরত তথা সদাশিবভরত। রামায়ণ-মহাভারতের যুগে এঁদের রচিত নাট্যবেদ তথা নাট্যশাস্ত্রেরই বিশেষ প্রচলন ছিল। ভরত, মতঙ্গ, সঙ্গীত-মকরন্দকার নারদ, শার্ঙ্গদেব ও কল্লিনাথাদি টীকাকার সকলেই এই প্রাচীন ও প্রামাণিক নাট্যাচার্যদের নাম ও তাঁদের মতের উল্লেখ করেছেন। সঙ্গীতশিল্পী ও শ্রোতারা বেশ মার্জিত রুচিসম্পন্ন ও বিচক্ষণ ছিলেন। দেশীয় (আঞ্চলিক) নৃত্যেরও তখন প্রচলন ছিল। নৃত্যশিল্পীরা মার্গ ও দেশী উভয় নৃত্যেই বিশেষ পারদর্শী ছিল।

॥ লঙ্কাবতারসূত্রে সঙ্গীত ॥

'ললিতবিস্তর' গ্রন্থের পর সঙ্গীতের উপাদান পাই 'লঙ্কাবতারসূত্র' গ্রন্থে। 'ললিতবিস্তর' ও 'লঙ্কাবতারসূত্র' কিংবা অবদানকল্পলতাদি কোনটিই সঙ্গীতগ্রন্থ নয়, কিন্তু সঙ্গীতের তথা সঙ্গীত-উপাদানের উল্লেখ এগুলিতে যতটুকু পাওয়া যায় সঙ্গীতের ইতিহাসের পক্ষে তা কম নয়। প্রধান প্রধান বৌদ্ধসূত্রগ্রন্থ হিসাবে 'অষ্টসাহস্রিকা-প্রাজ্ঞপারমিতা, 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক', 'ললিতবিস্তর', 'লঙ্কাবতার' বা 'সদ্ধর্ম-লঙ্কাবতার', 'সুবর্ণপ্রভাস', 'গণ্ডব্যূহ', 'তথাগতগুহ্যক' বা 'তথাগতগুণজ্ঞান', 'সমাধিরাজ' ও 'দেশভূমীশ্বর' এই ন'টির নামোল্লেখ পাওয়া যায়। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লঙ্কাবতারের রচনা-কাল খৃষ্টীয় ১ম-৪র্থ শতাব্দী বলেছেন।[১] মহামহোপাধ্যায়

১। ডাঃ দাশগুপ্ত: *A History of Indian Philosophy*, Vol. I (1951), p. 125.
ডাঃ দাশগুপ্ত লঙ্কাবতারের প্রাচীনত্ব স্বীকার করেও বলেছেন: "Trusting in Suzuki's identification of a quotation in Aśvaghoṣa's *Sraddhotpāda-Sūtra* as being made from *Laṅkāvatāra*, we should think of the *Laṅāvatārasūtra*

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্রাট কণিষ্কের (খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী) পূর্বে রচিত বলেছেন। অধ্যাপক উইণ্টারনিৎজের মতে প্রায় খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দী।[২] আমাদের মনে হয় লঙ্কাবতারসূত্রটি অশ্বঘোষের কিছু আগে রচিত বা সমসাময়িক। অধ্যাপক আপ্পা রাওয়ের অভিমতও তাই যে লঙ্কাবতারসূত্র খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে রচিত।[৩]

লঙ্কাবতারসূত্রে সঙ্গীতের প্রসঙ্গটি আরম্ভ হয়েছে ভগবান বুদ্ধ ও লঙ্কাধিপতি রাবণের প্রসঙ্গকে নিয়ে। ভগবান তথাগত সমুদ্র-সর্পদের রাজপ্রাসাদে ধর্ম প্রচারের জন্য উপস্থিত হ'লে ইন্দ্র, ব্রহ্মা ও নাগকন্যারা তাঁকে অভিনন্দন জানালেন। ভগবান মলয়-পর্বতের চূড়ায় দাঁড়িয়ে লঙ্কানগরীর দিকে চেয়ে বল্লেন তিনি লঙ্কার রাজধানীতে গিয়ে রাবণকে উপদেশ দিতে ইচ্ছা করেন। দৈবশক্তির প্রেরণায় রাবণ তথাগতের সে ইচ্ছা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনিও তথাগতের কাছ থেকে অধ্যাত্ম বিদ্যা ও উপদেশ গ্রহণ করার জন্য উদ্‌গ্রীব হলেন। স্বর্ণ-লঙ্কাপুরে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে তিনি বল্লেন: 'আমি নিশ্চয়ই লঙ্কাপুরে রাত্রি-যাপনের জন্য তথাগতকে অনুরোধ জানাব। তাতে দেবতা ও মনুষ্য সকলেই আনন্দিত হবেন'। তারপর রাবণ সপরিবারে একটি পুষ্পকরথে আরোহণ ক'রে ভগবান তথাগতের কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি রথ থেকে অবতরণ ক'রে তথাগতকে তিনবার বাম থেকে দক্ষিণ দিকে প্রদক্ষিণ করলেন ও ইন্দ্রনীলমণিতে তৈরী 'কোণ' (প্লেকট্রাম) দিয়ে বীণা বাজাতে লাগলেন। বীণার দণ্ড অবদান-সাহিত্যে বর্ণিত সহস্রতন্ত্রী-বীণার মতো বৈদুর্যমণিতে শোভিত ছিল। বহুমূল্য শ্বেত, হরিৎ প্রভৃতি বর্ণের বস্ত্রের দ্বারা বীণাগুলি সকলের দেহের একপাশে ঝোলানো ছিল। বীণার তন্ত্রীতে ষড়্‌জাদি সাত স্বর গ্রাম ও মূর্ছনাযুক্ত হ'য়ে ঝঙ্কৃত হচ্ছিল। বীণার সুর গাথার অনুগামী ক'রে বাঁধা ছিল। সুরের তরঙ্গে আকাশ-বাতাস পৃথিবী চতুর্দিক পরিপূর্ণ হয়েছিল। সূত্রকার ঘটনাটি সুললিত ভাষায় উল্লেখ ক'রে বলেছেন: "অথ রাবণো রাক্ষসাধিপতিঃ সপরিবারঃ পৌষ্পকং বিমানমধিরুহ্য যেন ভগবাংস্তেনোপজগাম; উপেত্য বিমানাদবতীর্য সপরিবারো ভগবন্তংস্ত্রিষ্কৃত্বঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য তূর্যতালাবচরৈঃ প্রবাদয়দ্ভিরিন্দ্রনীলময়েন দণ্ডেন বৈদূর্য মুসার প্রত্যুপ্তাং বীণাং প্রিয়ঙ্‌গু পাণ্ডুনানর্ঘ্যেণ বস্ত্রেণ পার্শ্বাবলম্বিতাং

as being one of the early works of the Vijñānavādins."—*A History of Indian Philosophy*, Vol. I, p. 128.

২। Vide *A History of Indian Literature*, Vol. II (1933), p. 30.

৩। Vide *The Journal of the Music Academy*, Madras, Vol. XVI, 1945, p. 37.

কৃত্বা, সহর্ষ্য-ঋষভ-গান্ধার-ধৈবত-নিষাদ-মধ্যম-কৈশিক-গীতস্বরগ্রামমূর্ছনাদি-যুক্তে-নানুসার্থং সলীলং বীণামনুপ্রবিশ্য গাথাভির্গীতৈরনুগায়তি স্ম"।[৪]

রাক্ষসরাজ রাবণের বীণাটির নির্দিষ্ট আকার জানা না গেলেও নবতন্ত্রীযুক্ত বিপঞ্চীবীণার মতো সেটিকে কোণ দিয়ে বাজানো হ'ত। শোনা যায় প্রাচীন বীণাগুলিতে স্বরসৃষ্টির জন্য বাঁধাধরা কোন পর্দা বা ঘাট থাকত না, এক একটি স্বরের জন্য এক একটি তার বা তাঁত নিবদ্ধ থাকত। লঙ্কাবতারসূত্রে উল্লিখিত বীণায় সহর্ষাদি (ষড়্‌জ?) সাতটি স্বরেরই বিকাশ দেখা যায়, সুতরাং বীণা সাতটি তন্ত্রীবিশিষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। নাট্যশাস্ত্রে রাবণের ব্যবহৃত সপ্ততন্ত্রী-চিত্রাবীণার উল্লেখ আছে, কিন্তু সেটিকে অঙ্গুলির সাহায্যে বাজানো হ'ত: "সপ্ততন্ত্রী ভবেচ্চিত্রা * * চিত্রা চাঙ্গুলিবাদনা" (২৯।১১৪), আর বিপঞ্চীবীণা বাজানো হ'ত কোণ দিয়ে: "বিপঞ্চী কোণবাদ্যা স্যাৎ" (২৯।১১৪)। বীণা তখন কণ্ঠসঙ্গীতেরও সহায়তা করত বোঝা যায়।

রাবণের বীণায় যে সাতটি স্বর লীলায়িত হ'ত তাদের নাম ও ক্রম-সন্নিবেশন ছিল একটু বিচিত্র রকমের। যেমন, সহর্ষ্য। ঋষভ। গান্ধার। ধৈবত। নিষাদ। মধ্যম। কৈশিক॥ সহর্ষ্য ষড়্‌জ হওয়াই স্বাভাবিক। কৈশিক সাধারণত কৈশিকনিষাদ বলেই মনে হয়, কিন্তু তা নয়! পঞ্চমস্বরের এখানে উল্লেখ নাই। সূত্রকারের উল্লিখিত কৈশিক আসলে কৈশিকপঞ্চম স্বর। শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকরে (স্বরাধ্যায়ে) উল্লেখ করেছেন: "পঞ্চমো মধ্যমগ্রামে ত্রিশ্রুতিঃ কৈশিকে পুনঃ" (১।৩।৪৩)। টীকায় সিংহভূপাল বলেছেন: "পঞ্চমস্য দ্বেধা বিকৃতত্বং কথয়তি—পঞ্চম ইতি। পঞ্চমে তৃতীয়শ্রুতিসংস্থিতে সতি মধ্যমগ্রাম ইতি বক্ষ্যতে। তস্মিন্ মধ্যমগ্রামে ত্রিশ্রুতিঃ পঞ্চমো বিকৃতো ভবতি। পুনশ্চ কৈশিকে মধ্যমসাধারণে মধ্যমস্যান্তিমাং শ্রুতিং প্রাপ্য চতুঃশ্রুতিঃ সন্ বিকৃতো ভবতি"। শার্ঙ্গদেব কৈশিকপঞ্চম ও কৈশিকনিষাদ এই দু'রকম কৈশিকের কথা বলেছেন। শুদ্ধ-পঞ্চমের এক শ্রুতি নীচে অর্থাৎ কম হলেই কৈশিকপঞ্চম ও শুদ্ধ-নিষাদের এক শ্রুতি ওপরে অর্থাৎ বেশী হলেই কৈশিকনিষাদ হয়। ভরত নাট্যশাস্ত্রে চল ও অচল (অধ্রুব ও ধ্রুব) এই দু'টি বীণার মাধ্যমে শ্রুতি ও তাদের সংখ্যা নির্ণয় করেছেন। তিনি বলেছেন: "মধ্যমগ্রামে তু শ্রুত্যপকৃষ্টঃ

৪। (a) Vide *Laṅkāvatāra-Sūtra* edited by Bunyi Nanjo, M.A. (Oxon.), D.Litt. and printed at the Otani University Press, Kyoto in 1923.

(b) Vide *Studies in the Laṅkāvatāra-Sūtra* translated in English by Prof. D. T. Suzuki (London, 1930), pp. 66-67.

পঞ্চমঃ কার্যঃ। পঞ্চমস্য শ্রুত্যুৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাং যদন্তরং মার্দবাদায়তত্বাদ্বা তাবৎ-প্রমাণশ্রুতিঃ" (২৮।২৩)। অর্থাৎ মধ্যমগ্রামের পঞ্চম শুদ্ধ-পঞ্চম থেকে এক শ্রুতি কম ও এরই নাম 'প্রমাণশ্রুতি'। সুতরাং শার্ঙ্গদেবের মতে বিকৃত বা কৈশিকপঞ্চম হ'ল ভরতের উল্লিখিত মধ্যমগ্রামের পঞ্চমস্বর।[৫] মোটকথা লঙ্কাবতারসূত্রে উল্লিখিত কৈশিকস্বর মধ্যমগ্রামের বিকৃত-পঞ্চম বা কৈশিকপঞ্চম তথা পঞ্চমস্বরেরই নামান্তর।

পঞ্চমস্বরের বিকৃতভাব আমাদের কাছে হয়তো নতুন বা বিচিত্র বলে মনে হ'তে পারে, কেননা বর্তমান উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীতধারায় ষড়্জ ও পঞ্চমের বিকৃত রূপ মোটেই স্বীকার করা হয় না, বিকৃতভাব গ্রহণ করে ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, ধৈবত ও নিষাদ। কিন্তু খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়া থেকে প্রায় খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত ষড়্জ ও পঞ্চমের বিকৃতভাব অর্থাৎ চ্যুত-ষড়্জ ও কৈশিকপঞ্চম স্বর দু'টি স্বীকার করা হ'ত। বরং তখন মধ্যমস্বরই ছিল অবিকৃত ও প্রধান। ভরত উল্লেখ করেছেন,

সর্বস্বরাণাং নাশস্তু বিহিতস্ত্বথ জাতিষু।
ন মধমস্য নাশস্তু কর্তব্যো হি কদাচন॥
সপ্তস্বরাণাং প্রবরো হ্যনাশী চৈব মধ্যমঃ।
গান্ধর্বকল্পে বিহিতঃ সামগৈরপি মধ্যমঃ॥[৬]

৫। অধ্যাপক আপ্পা রাও তাঁর *A Note on Musical Refercnce in the Lankā-vatāra-Sūtra* নিবন্ধে কৈশিকপঞ্চম ও শুদ্ধ-নিষাদের স্বর-বিভাগের উল্লেখ ক'রে বলেছেন: "Pa=3/2, Kaiśika Pa=3/2×80/82=40/27=M_4 in the present notation. The Chyuta-Pañchama or Chyuta Pañchama-Madhyama which is common lower than Pa. Śuddha Ni=16/9, Kaiśika Ni=16/19×81×80=9/5 a comma higher than Śuddha Ni."

"Śuddha Ri=10/9, 10/9×16/15=32/27=Śuddha Ga : Suddha Dha=5/3, 5/3×16×15=16/9=Śuddha Ni."—Vide *The Journal of the Music Academy*, Madras, Vol. XVI, 1945, p. 38. Vide also this Journal, Vol. XVI, pp. 57-58.

৬। নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা সংস্করণ) ২৮।৭২-৭৩; কিন্তু কাশী সংস্করণ নাট্যশাস্ত্রে এই শ্লোক দু'টির মধ্যে পাঠভেদ যেমন,

সর্বস্বরাণাং বিহিতো বিনাশস্ত্বথ জাতিষু।
মধ্যমস্ত বিনাশস্তু কর্তব্যো ন কদাচন।
সর্বস্বরাণাং প্রবরো হ্যবিনাশী তু মধ্যমঃ।
গান্ধর্বকল্পেহভিমতঃ সামগৈশ্চ মহর্ষিভিঃ। (২৮।৩৮-৩৯)

মধ্যমস্বরকে সাতটি স্বরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা হ'ত ও মধ্যম ছিল অবিনাশী অর্থাৎ অচ্যুত বা অবিকৃত। এমন কি সামগানেও মধ্যমকে প্রধান ও অচ্যুত-স্বর হিসাবে গ্রহণ করা হ'ত। সামগানোত্তর ক্ল্যাসিক্যাল গান্ধর্বগানে তো কথাই নাই। সামগায়ীরা মধ্যমস্বরকে অবিনাশী বলায় হয়তো প্রশ্ন হ'তে পারে যে মধ্যম ছাড়া সামগানের আর কোন স্বর তাহলে বিকৃত ছিল কিনা, অথচ সামগানে বিকৃত স্বরের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। মধ্যম সম্বন্ধে ভরতও উল্লেখ করেছেন 'সামগৈরপি মধ্যমঃ'—মধ্যমকে সামগরাও প্রধান (প্রবর) ও অবিকৃত (অনাশী) ব'লে স্বীকার করতেন।

প্রাচীন সঙ্গীতধারায় ষড়্জ ও পঞ্চম বিকৃত (অচ্যুত-ষড়্জ ও চ্যুত-ষড়্জ; শুদ্ধ-পঞ্চম ও বিকৃত-পঞ্চম বা কৈশিকপঞ্চম) হওয়ায় বোঝা যায় তখন ষড়্জকে আধার-ষড়্জ হিসাবে গ্রহণ করা হ'ত না, কেননা ষড়্জের নির্দিষ্ট ও অবিকৃত কোন স্থিতিনির্দেশক স্থান ছিল না। অনেকে বলেন প্রাচীন চ্যুত-ষড়্জ ও বিকৃত-পঞ্চম বর্তমান সঙ্গীতধারায় কাকলিনিষাদ ও প্রতিমধ্যম নামে পরিচিত।[৭] রামামত্যও তাঁর স্বরমেলকলানিধিতে অনেকটা এই মত সমর্থন করেছেন (২।৫০)। অনেকে প্রতিমধ্যমকে খৃষ্টীয় শতাব্দীর অন্তরগান্ধার স্বর থেকে উৎপন্ন বলতে চান। শেষোক্ত সিদ্ধান্ত নাকি মূর্ছনা-বিশ্লেষণেরই ফলস্বরূপ। অবশ্য রূপান্তর গ্রহণ করা অসম্ভব না হলেও একথা ঠিক যে বর্তমান সঙ্গীতপদ্ধতিতে ষড়জ্‌ ও পঞ্চমের বিকৃতভাব মোটেই স্বীকার করা হয় না। তাছাড়া মধ্যগ্রামেরও বিলোপ ঘটেছে।

নাট্যশাস্ত্রে মধ্যমকে অনাশী বা অবিকৃত (?) বলা হয়েছে, কিন্তু খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকরে মধ্যমের বিকৃতভাব স্বীকার করেছেন দেখা যায়: "মধ্যমঃ ষড়্জবদ্ দ্বেধাঽন্তরসাধারণাশ্রয়াৎ" (১।৩।৪৩)। সুধাকর-টীকায় সিংহভূপাল বলেছেন: "মধ্যমস্য দ্বৌ বিকৃতৌ ভেদৌ কথয়তি—মধ্যম ইতি। ষড়্জো যথা চ্যুতত্বেনাচ্যুতত্বেন চ দ্বেধা বিকৃতঃ কথিতঃ স্বরসাধারণে নিষাদস্য চ কাকলীত্বে, তদ্বন্মধ্যমসাধারণে গান্ধারস্যান্তরত্বে চ মধ্যমোঽপি দ্বেধা বিকৃতো ভবতি। 'মধ্যমস্যাপি গপয়োরেবং সাধারণং মতম্' ইতি, '** মধ্যমস্য

৭। শ্রদ্ধেয় টি. ভি. সুব্বা রাও তাঁর *The Rāgas of the Sangita-Sārāmrita* নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন: "In other words, employing modern terminology we should say assuming that saḍja even in the altered scale is the fundamental, *panchama* disappears and *prati-madhyama* emerges".—*JMA*, Vol. XVI, p. 58.

গান্ধারবন্তরঃ স্বরঃ'। ইতি চ মধ্যমসাধারণং গান্ধারস্যান্তরত্বং চ বক্ষ্যতে" ॥ শার্ঙ্গদেব স্বরাধ্যায়ে ৪০-৪৫ শ্লোকগুলিতে প্রায় সকল স্বরেরই বিকৃতভাব উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে শুদ্ধস্বর ৭ + বিকৃত ১২ = ১৯টি স্বর।[৮] এই ধারার ব্যতিক্রম দেখা যায় পণ্ডিত রামামত্যের 'স্বরমেলকলানিধি' গ্রন্থে (খৃষ্টীয় ১৫৫০ শতাব্দী)। তিনি চ্যুত-ষড়্জ ও বিকৃত-পঞ্চমকে যথাক্রমে চ্যুত-ষড়্জ-নিষাদ ও চ্যুত-পঞ্চম-মধ্যম বলেছেন, অর্থাৎ ষড়্জ ও পঞ্চমের পরিবর্তে নিষাদ ও মধ্যমেরই বিকৃতভাব। তিনি উল্লেখ করেছেন,

নামান্তরাণি কেষাংচিদ্ব্যবহারপ্রসিদ্ধয়ে।
চ্যুতষড়্জস্তু লোকেঽস্মিন্নিষাদত্বেন কীর্তিতঃ ॥
চ্যুতষড়্জনিষাদাভিধানং তস্য বিধীয়তে।
চ্যুতস্য মধ্যমস্যাপি গান্ধারব্যবহারতঃ ॥

* * * *

অস্মাভিঃ কথ্যতে সোঽতশ্চ্যুতপঞ্চমমধ্যমঃ।
লক্ষ্যে তু কুত্রচিচ্ছুদ্ধগান্ধারস্থানমাশ্রয়ন্ ॥[৯]

পণ্ডিত রামামত্যের সময় মধ্যমের বিকৃতভাব ছিলঃ "চ্যুতমধ্যমগান্ধারঃ" (৩।২৯) ও "শুদ্ধমধ্যমসিদ্ধার্থং" (৩।৩০)। পণ্ডিত সোমনাথও (খৃষ্টীয় ১৬০৯) 'রাগবিবোধ' গ্রন্থে চ্যুত-ষড়্জ ও বিকৃত-পঞ্চমকে নিষাদ ও মধ্যমেরই রূপান্তর বলেছেন। প্রথম বিবেকের ২৩-২৪ শ্লোক-দু'টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেনঃ "যদ্যপি স্বস্বচতুর্থশ্রুতিত্যাগেন স্বস্বতৃতীয়শ্রুতিস্থানাং ষড়্জমধ্যম-পঞ্চমানামেব প্রাচীনৈর্বিকৃতত্বমুক্তম্, তথাপি দেশীলক্ষ্যে ষড়্জপঞ্চময়োঃ স্বস্বচতুর্থ-শ্রুতিত্যাগাদর্শনাৎ স্বতৃতীয়স্থানামপি ষড়্জমধ্যমপঞ্চমানাং লক্ষ্যে নিষাদত্বগান্ধারত্ব-মধ্যমত্বমেব ব্যবহারদর্শনাচ্চ নিগমনাদেব বিকৃতত্বমিহোক্তম্। এবমাদিপ্রাচীন-বিরোধং তু গ্রন্থকৃদেবাগ্রেসসংমতি পরিহরিষ্যতি"। তাছাড়া তিনি আরো বলেছেন যদিও ষড়্জ ও পঞ্চমের ভেদ তথা বিকৃতভাব নিয়ে মতভেদ দেখা যায়, তবুও লোক-ব্যবহারে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাদের ভেদ স্বীকার করা হয় নাঃ "লক্ষ্যে লোকপ্রযোজ্যে গানে ভিন্তেদো ন। যদ্যপি শাস্ত্রে ভেদঃ প্রতীয়তে তথাপি প্রয়োগ ইত্যর্থং"। সুতরাং সোমনাথের সময়ে (খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দী) শাস্ত্রীয়

৮। প্রাপ্নোতি বিকৃতো ভেদো দ্বাবিতি দ্বাদশ স্মৃতাঃ।
তে শুদ্ধৈঃ সপ্তভিঃ সার্ধং ভবন্ত্যেকোনবিংশতিঃ।—সঙ্গীত-রত্নাকর ১।৩।৪৫-৪৬

৯। Cf. *Svarmelakalānidhi* edited by M. E. Rāmaswāmi Aiyar (The Annamalai University, 1932), p. 12.

প্রয়োগের চেয়ে লোক-ব্যবহারে মান বেশ উন্নত হয়েছিল ও সামাজিক রুচি অনুযায়ী সঙ্গীতধারার কিছুটা পরিবর্তনও হয়েছিল বলা যায়। বেঙ্কটমুখীর সময়ে (১৬২০খৃঃ) বিকৃত-স্বর হিসাবে পাঁচ স্বরই নির্ধারিত ছিলঃ "সর্বমেতৎ সমালোচ্য * * স্বরাঃ পঞ্চৈব বিকৃতা ইতি সিদ্ধান্তিতং ময়া" (২।৫-৬)।

লঙ্কাবতারসূত্রে উল্লিখিত বীণার সাত স্বরের অন্যতম কৈশিকের আলোচনায় বিকৃত-স্বরের ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তন ও নব-রূপায়ণের কিছুটা বাস্তব পরিচয় দেওয়া হ'ল। লঙ্কাবতারে কৈশিক-স্বরটি বিকৃত-পঞ্চম বা কৈশিকপঞ্চমেরই নামান্তর, আর তারি জন্য সূত্রকার বীণার ঝঙ্কারে লৌকিক সাত স্বরের সমাবেশ দেখিয়েছেন বলে মনে হয়। কিন্তু সাত স্বরের ক্রমিকধারার এখানে কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন ষড়্জ (সহর্ষ্য), ঋষভ ও গান্ধারের পারস্পরিক স্থিতি ঠিকই আছে। ধৈবত ও নিষাদ এবং মধ্যম ও কৈশিক তথা পঞ্চমেরও তাই। কিন্তু গান্ধারের পর মধ্যম ও পঞ্চমের পরিবর্তে ধৈবত ও নিষাদের উল্লেখ দেখা যায়। স্বরনামে বিকৃতি নাই, কিন্তু ক্রমিকধারায় ব্যতিক্রম আছে, আর সেজন্য অনেকে লঙ্কাবতারে উল্লিখিত সাত স্বরকে মধ্যমগ্রামের অন্তর্ভুক্ত বলেন। তখনো গান্ধর্বগানের যুগ, গান্ধারগ্রামের প্রচলন লোপ পেলেও মধ্যমগ্রামের অনুশীলন অব্যাহত ছিল এবং খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর নাট্যশাস্ত্রই তার প্রমাণ।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে এক গুণভদ্র-সংকলিত প্রাচীন চীনা-সংস্করণ-'লঙ্কাবতারসূত্র' ছাড়া আর প্রায় সকল সংস্করণেই রাবণের এই কাহিনীটি পাওয়া যায়। অধ্যাপক ডি. টি. সুজুকি উল্লেখ করেছেন সহর্ষ্য বা ষড়্জাদি সাত স্বরের কথা বোধিরুচি কিংবা শিক্ষানন্দ তাঁদের সংকলিত লঙ্কাবতারসূত্রে উল্লেখ করেন নি।[১০] অপরাপর সংস্করণে এই স্বরগুলির নাম দেওয়া আছে।

লঙ্কাবতারসূত্রের উপক্রমণিকায় আরো উল্লেখ আছে যে ভগবান তথাগত লঙ্কেশ্বর রাবণকে জ্ঞান দান করলে রাবণ রত্নময় পর্বতের চূড়ায় আরোহণ করেছিলেন। তখনি বাদ্যযন্ত্রগুলিও বেজে উঠেছিল। বাদ্যযন্ত্রের সুরতরঙ্গ দেবতা, মানুষ, যক্ষ, নাগ, রাক্ষস, গন্ধর্ব, কিন্নর প্রভৃতিদের সঙ্গীতকেও ম্লান করেছিল। বাদ্যযন্ত্রগুলির সৌন্দর্যের তুলনা ছিল না।[১১] কিন্তু তাদের নাম বা গঠন-প্রকৃতির নির্দিষ্ট কোন উল্লেখ সূত্রের বর্ণনায় পাওয়া যায় না।

১০। 'Neither Bodhiruchi nor Śikṣānanda refers to specifically to these various notes'.—*Studies in Laṅkavatāra-Sūtra* (1930), p. 67.

১১। c * *music was played surpassing anything that could be had

॥ বিভিন্ন বৌদ্ধসাহিত্যে সঙ্গীত ॥

পরবর্তী পালি-সাহিত্য 'মিলিন্দাপহ' গ্রন্থে (১৬) আঠার রকম শাস্ত্র: চারবেদ, ছয় বেদাঙ্গ ও উপবেদ হিসাবে ধনুর্বেদ, গান্ধর্ববেদ, স্থাপত্য প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ আছে। এই বিষয়গুলি বৌদ্ধ-শ্রমণ ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়া হ'ত। মিলিন্দাপহ-গ্রন্থকে 'নাগসেনসূত্র'ও বলে। মিলিন্দাপহে নাগসেনের সঙ্গে গ্রীকরাজ মিনাণ্ডারের কথোপকথনে সঙ্গীতের বিষয়ও ছিল ও তা থেকে জানা যায় গ্রীকরাজ সঙ্গীতশাস্ত্রেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

বারাণসীতে তখন একটি প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র (ইউনিভার্সিটি) ছিল। তার সংলগ্ন একটি সঙ্গীত-বিদ্যালয়ও ছিল। ডাঃ শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁর সুবিখ্যাত *Ancient Indian Education* ('প্রাচীন ভারতের শিক্ষা') গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: বারাণসীর সেই সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন একজন সঙ্গীতবিদ্যাবিদ্। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সঙ্গীত-বিষয়ে তিনি শ্রেষ্ঠ গুণী ছিলেন বল্লেও অত্যুক্তি হয় না।[১] সেই সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে কমপক্ষে পাঁচশত শ্রমণ ও অন্যান্য শিক্ষার্থী সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করতেন। নালন্দা-বিশ্ববিদ্যায়ে ছিল দশ হাজার শ্রমণ শিক্ষার্থী ও এক হাজার পাঁচশো' দশজন শিক্ষক। নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী—এ'তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়েই একটি ক'রে গান্ধর্ববিদ্যা (সঙ্গীত) শিক্ষা দেবার জন্য বিভাগ ছিল। ডাঃ সঙ্কলিয়া তাঁর *The University of Nālandā* গ্রন্থে একথা উল্লেখ করেছেন। তথাগত-বুদ্ধ যে নিজে সঙ্গীত (কণ্ঠ) ও বাদ্যযন্ত্রাদি শিক্ষা করেছিলেন তা খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর একটি গান্ধারশিল্প (প্লেট নং ২০) ও খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর অজন্তাচিত্র (প্লেট নং ১৭ ও গুহা নং ১৬) থেকে প্রমাণ হয়। অজন্তাগুহার ফ্রেস্কো-চিত্রগুলি প্রথম আবিষ্কৃত হয় ইংরাজী ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে। চিত্রগুলি সর্বত্যাগী বৌদ্ধ-শ্রমণদের জীবনব্যাপী সাধনা ও অনুশীলনের ফল। প্রসিদ্ধ শিল্প-সমালোচক শ্রীঅজিত

by the gods, Nāgas, Yakṣas, Rākṣasas, Gandharvas, Kinnaras, Mahoragas, and human beings; musical instruments were created equal to anything that could be had in all the World of Desire and were to be seen in the Buddha-lands; **.'—*Studies in Laṅkāvatāra-Sūtra* (London, 1950), p. 79.

১। "There is a reference, for instance, to a School of Music presided over by an expert who was 'the chief of his kind in all India'."—*Ancient Indian Education* (London), p. 490

ঘোষ বলেন: "They are the fruits of the pious labour of Bnddhist monks whose life's pleasure it was to enrich the living rock with the life history of the Divine Master". অজন্তা-চিত্রের প্রথম নিদর্শনটিতে দেখানো হয়েছে গৌতম সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করছেন ও বিদ্যালয়ের ওপরে অনেকটা বর্তমান আকারের স্বরোদের মতো দেখতে একটি বীণা ঝোলানো আছে। দ্বিতীয় নিদর্শনটিতে আছে গৌতম রাজপ্রাসাদের বারাণ্ডায় বসে অপর তিনজন বালকের সঙ্গে একজন ব্রাহ্মণ সঙ্গীত-শিক্ষকের কাছ থেকে বাদ্যযন্ত্র শিক্ষা করছেন ও তাঁর ক্রোড়দেশে বর্তমান স্বরোদের মতো দেখতে একটি বাদ্যযন্ত্র আছে। গান্ধারশিল্প ও অজন্তার চিত্র-নিদর্শনগুলি বৌদ্ধযুগে সঙ্গীতানুশীলনের যে চাক্ষুষ প্রমাণ প্রদান করে এ'বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ডাঃ শ্রীবিমলাচরণ লাহা তাঁর *Tribes of Ancient India* গ্রন্থে বলেছেন প্রাচীন ভারতে আর্য ও অনার্য এই উভয় শ্রেণীর লোকের মধ্যেই সঙ্গীতের অনুশীলন ছিল। উৎসবে, শোভাযাত্রায়, রাজদরবারে, যুদ্ধযাত্রায় ও বিভিন্ন আমোদপ্রমোদে সঙ্গীতের আয়োজন থাকতই। বারাণসীর প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন: গঙ্গমাল-জাতকে (৩।৪৫২) বারাণসীর রাজা উদয় তথা ব্রহ্মদত্ত কোশল-রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। তাঁহার বিবাহ উপলক্ষ্যে প্রচুর নাচ-গানের আয়োজন হয়েছিল। ষোল হাজার নর্তকী বিচিত্র ছন্দে নৃত্য ক'রে বিবাহ-বাসরকে মুখরিত করেছিল।

'সুমঙ্গলবিলাসিনী' গ্রন্থে[২] বারাণসীর আরো পুরাতন ইতিহাসের কথা বর্ণিত আছে। তখনও রাজ-অন্তঃপুরে নৃত্য-গীতের জন্য নর্তকীরা নিয়োজিত থাকত। জানা যায়, কাশীরাজ রাম ধবল-কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হ'লে অন্তঃপুরবাসিনী ও নর্তকীদের কাছে তিনি উপেক্ষিত হয়েছিলেন।[৩] সে সকল নর্তকী নৃত্য-গীতে সুশিক্ষিতা ছিল।

বারাণসী তখন বেশ সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সওদাগরেরা সেখানে বাণিজ্য করতে আসত। মহাধন-গোষ্ঠি নামে একজন

২। প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৬০-২৬২

৩। Dr. B. C. Law: *Tribes of Ancient India* (1943), p. 110.

ধনঞ্জয়ের তাঁর মাতার কাছে নৃত্য-গীত শিক্ষা করেছিলেন। তাঁর রূপলাবণ্যবতী পত্নীও ছিলেন সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শিনী।[৪]

ভগবান বুদ্ধ যখন রাজগৃহের কলন্দক-নিবাসে ছিলেন তখন ছ'জন ভিক্ষুণী 'গিরগ্গসমজ্জ' নামে একটি উৎসবে যোগদান করে। জাতকে (১।৪৮৯) রাজগৃহে অনুষ্ঠিত এ' ধরণের উৎসবের বর্ণনা আছে। উৎসবে যোগদানকারীরা যথেচ্ছভাবে নৃত্য-গীতে অংশগ্রহণ করত। 'বিশুদ্ধিমগ্গ' গ্রন্থেও[৫] রাজগৃহে অনুষ্ঠিত এ'রকম একটি উৎসবের বর্ণনা আছে। তাতে পাঁচশত কুমারী নর্তকী মহাকশ্যপ-থেরকে এক প্রকারের পিষ্ঠক উপহার দেয়। মহাকশ্যপ তা গ্রহণ করেন। বিমানবত্থুভাষ্যেও (পৃ: ৬২-৭৪) নক্খত্তকীলম্ নামে একটি উৎসবের উল্লেখ আছে।[৬] মোটকথা উৎসবগুলির প্রধান অঙ্গই ছিল নৃত্য, গীত ও বাদ্য।

বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের পর মল্লরা অধিবেশন-গৃহে সমবেত হলেন ও সিদ্ধান্ত করলেন যে সঙ্গীত সহকারে ভগবান বুদ্ধের পবিত্র দেহ তাঁরা সহরের দক্ষিণে মকুটবন্ধনে নিয়ে যাবেন। বুদ্ধের শরীরে অগ্নিসৎকার করা হ'ল। গীত-বাদ্যে তখন আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছিল।[৭]

লিচ্ছবিরা বিচিত্র রকম উৎসবে যোগদান করতেন। উৎসবগুলির মধ্যে প্রধান ছিল সব্বরত্তিবারো বা সব্বরত্তিচারো। সেই উৎসবে নৃত্য-গীতের সমারোহ থাকত। নানান্ শ্রেণীর গান গাওয়া হ'ত ও গানের সঙ্গে থাকত বিভিন্ন রকমের বাদ্যযন্ত্র। বৈশালীতে যখন কোন উৎসব অনুষ্ঠিত হ'ত তখন সকল নর-নারীই স্বাধীনভাবে নৃত্য-গীতে যোগদান করত।[৮] সম্যুত্তনিকায়[৯] ও থেরগাথাভাষ্যে[১০] এ' ধরণের নৃত্য-গীতের উল্লেখ আছে। প্রাচীন ভারতে ও বিশেষ ক'রে বৌদ্ধযুগে মালব, পাঞ্চাল, কুরু, গান্ধার, চেদী, মদ্র, শালব, আভীর, কেকয়, পুলিন্দ, কুলিন্দ, মদ্র, নিষাদ, লিচ্ছবি, শবর, চোল, বঙ্গ, গৌড়, পুণ্ড্র, কিরাত, ভোজ, লাট, দশার্ণ প্রভৃতি ৮৮টি জাতির মধ্যে নৃত্য, গীত ও

৪। Ibid., p. 110.

৫। ২য় খণ্ড, পৃ: ৪০৩

৬। Vide *Tribes of Ancient India* (1943), p. 218.

৭। Ibid, p. 261..

৮। Ibid, p. 315.

৯। প্রথম ভাগ, পৃ: ২০১-২০২

১০। (ক) ৬২ শ্লোক; (খ) Vide *Psalms of the Brethren*, p. 63.

বাদ্যের যথেষ্ট আদর ও অনুশীলন ছিল। সেই জাতিগুলির অনেকের নিজস্ব সুর পরবর্তীকালে অভিজাত দেশী-সঙ্গীতে 'রাগ' হিসাবে গণ্য হয়েছিল। তাদের নিদর্শন যেমন শবরী > সাবেরী, আভীরি, মালব, বাঙ্গালী, গৌড়, পুলিন্দিকা, গান্ধারী বা গান্ধার প্রভৃতি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

॥ মৌর্য ও গুপ্ত বংশের মধ্যবর্তী যুগ ॥

(খৃষ্টপূর্ব ১৮৭—খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী)

প্রিয়দর্শী সম্রাট অশোকের পর মৌর্যরাজত্বের পতন আরম্ভ হয়। অশোকের মৃত্যুর (খৃষ্টপূর্ব ২৩৬) পর কুনাল, সম্প্রতি ও বৃহদ্রথ পর পর মগধের সিংহাসনে আরোহণ করলেও বেশীদিন কেউই রাজত্ব করতে পারেন নি। তারপর পুষ্যমিত্রাদি শুঙ্গরাজারা ১৮৭—৭৫ খৃষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। পাটলিপুত্র, অযোধ্যা (সাকেত) ও বিদিশায় এবং 'দিব্যাবদান' ও ঐতিহাসিক লামা তারানাথের মতে—এমনকি জলন্ধর ও পঞ্জাবের অন্তর্গত শাকল পর্যন্ত দেশগুলিতে পুষ্যমিত্র তাঁর রাজত্ব বিস্তার করেছিলেন। কবি কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রে উল্লেখ আছে যে তখন বিদর্ভে ও বেরারে কতকগুলি স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠেছিল। পুষ্যমিত্রের সময়ই গ্রীকরা ভারতে অভিযান করে, কিন্তু তিনি গ্রীকদের অভিযান ব্যাহত করেছিলেন। গ্রীকরা শুঙ্গরাজাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিল। পুষ্যমিত্র ছত্রিশ বছর রাজত্ব করেন ও পরে তাঁর পুত্র অগ্নিমিত্র রাজা হন।

অগ্নিমিত্রের পর কাণ্ব বা কাণ্বায়ন রাজারা খৃষ্টপূর্ব ৭৫—৩০ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। অধ্যাপক ভাণ্ডারকর বলেছেন পুরাণ-সাহিত্যের বর্ণনা অনুসারে শুঙ্গরাজারা ১১২ বছর ও কাণ্বরা চার বছর রাজত্ব করেন। কাণ্ব-রাজাদের পর অন্ধ্র-রাজারা শাসন-ক্ষমতা লাভ করেন, কিন্তু তাঁরা বেশীদিন রাজত্ব করিতে পারেন নি। শুঙ্গ ও কাণ্ব রাজারা শিক্ষা ও শিল্পের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁদের সময়ে সাহিত্য, দর্শন ও বিচিত্রশিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চারুকলা ও বিশেষ ক'রে সঙ্গীতের বিকাশও যথেষ্ট হয়েছিল।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে যবনদের অভিযান আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। উত্তরাপথ ও অপরান্ত (পশ্চাদ্দেশ) ও মধ্যদেশের কতকাংশে যবন ও অন্যান্য বৈদেশিক শাসকবর্গ প্রবেশ করেছিল। মজ্ঝিমনিকায়ে (২।১৪৯) উল্লেখ আছে যৌন ও কাম্বোজদের দেশে তখন আর্য ও দাস এই দু'টি বর্ণের অধিবাসী ছিল। পতঞ্জলমহাভাষ্যে যবন ও শকদের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। যবনেরা ক্রমশঃ হিন্দু নাম, ধর্ম ও আচার-ব্যবহার আত্মগত ক'রে নিজেদের ভারতীয়

বলে পরিচয় দিতে থাকে। 'যবন' (Ionian) শব্দে তখন সাধারণভাবে ম্লেচ্ছ বোঝালেও বৈদেশিকরাই প্রধানভাবে ঐ নামে পরিচিত ছিল। আবার খৃষ্টীয় শতাব্দীতে 'যবন' শব্দে একমাত্র গ্রীকদেরই বোঝাত। প্রাচীন পারসিক শব্দ 'যৌন' থেকে 'যবন' শব্দটির সৃষ্টি। এপোলোডোরাস ও ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো বলেছেন ইন্দো-গ্রীক জাতিরা সে সময়ে নিম্ন সিন্ধু-উপত্যকা ও কাথিয়াওয়াড় অঞ্চলে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করে। সিন্ধু-উপত্যকার পশ্চিমদিক থেকে সিন্ধুনদীর পূর্বতীর এই বিস্তৃত অঞ্চলের নাম ছিল সৌবীরদেশ। শোনা যায় সেখানেও ইন্দো-গ্রীক জাতিরা তাদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

যে সকল বৈদেশিক শক্তি ভারতে প্রবেশ করেছিল তাদের মধ্যে যবন বা গ্রীকদের সঙ্গে সঙ্গে শক (সীথিয়ান) ও পহ্লবদের (পার্থিয়ান) নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শক বা সীথিয়ানরা আসলে মধ্য-এশিয়ার অধিবাসী ছিল। শক ও পহ্লবদের মধ্যে শিল্প-সংস্কৃতি ও বিশেষ ক'রে সঙ্গীতের যে একান্ত সমাদর ও অনুশীলন ছিল তা ভারতীয় সমাজে প্রচলিত শকরাগ, শকমিশ্রিত-রাগ ও পল্লবী, অনুপল্লবী প্রভৃতি সঙ্গীত-উপাদান থেকেই বোঝা যায়।

এর পর শকদের পরাজিত ক'রে য়ুচ্-চি (Yuch-chi) জাতিরা তাদের রাজ্য বিস্তার করে। কুষাণরা সেই য়ুচ্-চিদেরই বংশধর বা একটি শাখা। কুষাণদের ভেতর মহারাজ কণিষ্কের নামই উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রাচীন ভারতের মধ্যদেশ, উত্তরাপথ ও অপরান্ত (পশ্চাদ্দেশ) পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। শুধু তাই নয়, পূর্বে বিহার থেকে পশ্চিমে খোরাসান ও উত্তরে খোটান থেকে দক্ষিণে কঙ্কন পর্যন্ত তাঁর রাজত্ব বিস্তৃত হয়েছিল। বিভিন্ন শিলালিপি ও মুদ্রা থেকে প্রমাণ হয় যে কণিষ্ক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ্ ও আলবেরুণী তু'জনেই উল্লেখ করেছেন পেশোয়ারে (কাবুল) কণিষ্ক নাকি একটি বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে প্রাপ্ত একটি মুদ্রালিপি থেকেও সেকথা প্রমাণ হয় যে কণিষ্ক-নির্মিত বৌদ্ধবিহারটি বৌদ্ধ-সংস্কৃতির একটি কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। অনেকে বলেন কাশ্মীরে (কারু কারু মতে গান্ধারে বা জলন্ধরে) যখন বৌদ্ধ-সংগতির একটি মহাধিবেশন বসে তখন ভিক্ষু পার্শ্বের পরামর্শ অনুযায়ী কণিষ্ক ঐ বিহার নির্মাণ করেন। ভিক্ষু বসুমিত্র সেই মহাধিবেশনের সভাপতিত্ব করেছিলেন। শোনা যায় সে'সময়েই মহারাজ কণিষ্ক নাকি বৌদ্ধ দার্শনিক অশ্বঘোষকে পাটলিপুত্র থেকে আনয়ন ক'রে ঐ বিহারের সহকারী সভাপতি-পদে অভিষিক্ত করেন।

কুষাণরাজ কণিষ্ক শিক্ষা ও শিল্পের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অশ্বঘোষ, পার্শ্ব, বসুমিত্র ও সঙ্ঘরক্ষ প্রভৃতি বৌদ্ধ-দার্শনিক ও মনীষীরা তাঁর একান্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। মাধ্যমিকদর্শনের প্রবর্তক নাগার্জুন ও আয়ুর্বেদী চরক নাকি কণিষ্কের রাজদরবার অলংকৃত করতেন। মহারাজ কণিষ্ক ধর্মবিশ্বাসে বৌদ্ধ ব'লে পরিচিত থাকলেও তাঁর মুদ্রার বিপরীত দিকে গ্রীসীয়, সুমেরীয়, এলামাইট, পারসিক ও ভারতীয় দেব-দেবীদের প্রতিমূর্তি অঙ্কিত থাকত।

রাজতরঙ্গিণীতে (১।১৬৮-১৭৩) কল্‌হণ উল্লেখ করেছেন তুরুষ্কজাতীয় হুবিষ্ক, জুষ্ক বা বাসিষ্ক ও কণিষ্ক (২য়) এই তিনজন সমবেতভাবে কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। তাঁরা তিনজনেই বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী ছিলেন। তাঁরা বহু বিহার ও চৈত্য নির্মাণ ক'রে পরিব্রাজক বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণনের যথেষ্ট উপকার ও কল্যাণ-সাধন করেছিলেন। তুরুষ্কজাতিরা সঙ্গীতের বিশেষ প্রিয় ছিল। খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম শতাব্দীর পর ভারতীয় রাগের সঙ্গে তাদের দেশীয় বা জাতীয় রাগের সংমিশ্রণ ঘটেছিল, যেমন তুরুষ্ক-তোড়ী, তুরুষ্ক-গৌড় প্রভৃতি। তবে কুষাণ-রাজাদের সময় ভারতবর্ষে সাহিত্য, নাটক, সঙ্গীত ও শিল্প-সংস্কৃতির রূপ যে সমুজ্জ্বল হয়েছিল তার যথেষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়।

গান্ধারশিল্পের অভ্যুত্থানও সেই সময়ে হয়।[১] অশ্বঘোষ, নাগার্জুন প্রভৃতি বৌদ্ধ-আচার্যদের সাংস্কৃতিক অবদানও সে'সময়ে কম ছিল না। অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত', 'সুন্দরানন্দকাব্য' প্রভৃতি নাটক বৈদর্ভীরীতিতে রচিত। যাঁরা নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের অভ্যুদয়-কাল খৃষ্টপূর্ব ২য় শতক বলেন তাঁদের মতে অশ্বঘোষের নাটকাবলী নাকি ভরতের নাট্যশাস্ত্রকে অনুসরণ ক'রে লেখা হয়েছিল। কিন্তু নানান্ কারণে এই অভিমত গ্রহণ করা যায় না। ডাঃ কৃষ্ণমাচারিয়ার উল্লেখ করেছেন তাঞ্জোর গ্রন্থাগারে নাগার্জুন-রচিত (?) 'অর্জুনভরতম্' নামে একটি নাটকের পাণ্ডুলিপি (Tanj : XVI, 7229) রক্ষিত আছে। নাটকটি নাকি অসম্পূর্ণ। নাটকে সাধারণতই সঙ্গীতের আলোচনা বাদ যায় না। সুতরাং 'অর্জুনভরতম্' নাটকটিতেও

১। "The Kuṣāṇa period marks an important epoch in Indian history. * * The period also witnessed important developments in religion, literature and sculpture, especially the rise of Mahāyāṇa Buddhism, Gāndhāra art, and the appearance of the Buddha figure."—*The History and Culture of the Indian People,* Vol. III (The Age of Imperial Unity), p. 153.

যে সঙ্গীতের প্রসঙ্গ ছিল তা ধরে নেওয়া যায়।[২] সঙ্গীত-রত্নাকরের টীকায় কল্লিনাথ 'মাত্রৈলা'-প্রসঙ্গে নাট্যকার বা সঙ্গীতশাস্ত্রী পার্বতী ও নন্দীর মতো অর্জুনের মতবাদেরও উল্লেখ ক'রে বলেছেন: "অর্জুনমতাদেব ভেদান্তরাণি দর্শয়িতুমাহ * * (১০২-১০৪)। ইত্যর্জুনমতাম্মাত্রৈলাঃ॥" সিংহভূপালও উল্লেখ করেছেন: "অর্জুনমতাদন্যা মাত্রৈলাঃ কথয়তি * * ধনঞ্জয়োঽর্জুনঃ॥ ১০২-১০৪॥ ইত্যর্জুনমতা-ম্মাত্রৈলাঃ॥"[৩] এখানে উল্লেখযোগ্য যে সিংহভূপাল শাস্ত্রকার অর্জুনকে গীতার তথা মহাভারতের ধনঞ্জয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন। ধনঞ্জয় অর্জুন সঙ্গীত ও নৃত্যকলায় পারদর্শী ছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি কোন নাট্যগ্রন্থ বা সঙ্গীতশাস্ত্র রচনা করেছিলেন ব'লে জানা যায় নি। আমাদের অনুমান অর্জুন একজন ভরতোত্তর, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর অনেক পরবর্তী শাস্ত্রী, নচেৎ খৃষ্টপূর্বাব্দের বা ভরতপূর্ব হ'লে ভরত নিশ্চয়ই পূর্বগ আচার্য হিসাবে তাঁর নাট্যশাস্ত্রে অর্জুনের নামোল্লেখ করতেন। মতঙ্গও (খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম শতাব্দী) তাঁর বৃহদ্দেশীতে অর্জুনের কোন প্রমাণ-বাক্য উদ্ধৃত করেন নি। শার্ঙ্গদেবই (খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর প্রারম্ভে) তাঁর সঙ্গীত-রত্নাকরে পূর্বগ সঙ্গীতশাস্ত্রীদের প্রসঙ্গে অর্জুনের নামোল্লেখ করেছেন: "বায়ুর্বিশ্বাবসু রম্ভাঽর্জুনো নারদতুম্বুরু" (১।১৬)। এই সঙ্গীতশাস্ত্রী যে বৌদ্ধাচার্য নাগার্জুন নন্ একথা ঠিক।

ইতিহাস ও পুরাণাদি থেকে জানা যায় খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শিশুনাগ, নাগদর্শক প্রভৃতি নাগরাজাদের অভ্যুদয় হয়। তাঁরা বিদিশা, কান্তিপুরী, মথুরা, পদ্মাবতী প্রভৃতি অঞ্চলে গুপ্তরাজাদের আগে (প্রায় খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী) পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। নাগরাজারা নাগ বা সর্পদেবতার (মনসাদেবীর ?) উপাসক ছিলেন। নাগবংশোদ্ভব ভারশিবরা ছিলেন শৈব (শিবের উপাসক)। তাঁরা যাগ-যজ্ঞ করতেন ও অন্ততপক্ষে দশটি অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। সে সকল যজ্ঞে (বৈদিক) সামগানেরও ব্যবস্থা ছিল ব'লে মনে হয়। তাঁদের যজ্ঞানুষ্ঠান ছাড়া অন্যান্য উৎসব ও মাঙ্গলিক ব্যাপারে নৃত্য-গীতের আয়োজন থাকত।

আভীরজাতি তখন হিরাট ও কান্দাহারের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বাস করত। মহাভারতে তাদের 'অপরান্ত' বা অনার্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আভীরজাতি

২। শুদ্ধতত্ত্ব বেঙ্কটাচার্য-কৃত 'অর্জুনাদিমতসার' (মাদ্রাজ) নামেও একটি অসম্পূর্ণ গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়।

৩। সঙ্গীত-রত্নাকর (আডোয়ার সংস্করণ), ২য় ভাগ, পৃ' ২২৪-২২৫

অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয় ছিল। তাদের নিজস্ব সুর 'আভীরি' পরে রাগশ্রেণীভুক্ত হ'য়ে অভিজাত দেশী-সঙ্গীতের দারবারে স্থান পেয়েছিল।

খৃষ্টীয় ১ম-২য় শতাব্দী ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় যুগ বলা যায়, কেননা সে'সময়েই ভারত ও ভারতেতর ইজিপ্ট, অন্যান্য সুদূর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশগুলির মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক যোগসূত্র রচিত হয়েছিল। আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লিমেণ্টই (খৃষ্টীয় ১৫০-২১৮ শতাব্দী) বৈদেশিক মনীষী হিসাবে মনে হয় প্রথম গৌতম-বুদ্ধের নাম উল্লেখ করেন। পরে ঐতিহাসিক আলবেরুণীও স্বীকার করেন যে খোরাসান, পারস্য, ইরাক, মোসুল ও সিরিয়া পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের প্রসার হয়েছিল। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে প্রথমে রোম-সাম্রাজ্য ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল এবং এই উভয় দেশের শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতিও পরস্পরের মধ্যে ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হয়। অনেকে বলেন গ্রীস, ইজিপ্ট, আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি সুপ্রাচীন সভ্য দেশে হার্প প্রভৃতি বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্রের আমদানী নাকি ভারতবর্ষ থেকে হয়েছিল। অধ্যাপক ব্রেষ্টেড উল্লেখ করেছেন ইজিপ্টে ৫ম রাজবংশে (fifth dynasty) রাজত্বের সময়ে গানের সঙ্গে বিচিত্র রকমের বাদ্যযন্ত্রের সমাবেশ থাকত। তাতে বিভিন্ন আকারের বীণাজাতীয় হার্প এবং বাঁশীও থাকত।[৪] তিনি প্রাচীন ইজিপ্টে ঐক্যতান-বাদনের প্রসঙ্গে কুড়িটি তন্ত্রীযুক্ত একটি বীণার উল্লেখ করেছেন। বীণাটি একটি মানুষের মতো দীর্ঘ ছিল[৫] ও বিশেষ ক'রে জাঁকজমকপূর্ণ ফ্যাণ্টাসিয়া-উৎসবে সে'টি বাজানো হ'ত। তখনকার অর্কেষ্ট্রায় সাধারণভাবে থাকত হার্প, লায়ার, লিউট ও ডবল-পাইপ। লায়ার বাদ্যযন্ত্রটিকে তিনি এসিয়া থেকে আমদানী করা বলেছেন: "the lyre had been introduced from Asia."[৬] অধ্যাপক ভি. আপ্পা রাও পণ্টুলু-গুরুও তাঁর একটি নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, ২৭০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে প্রাচীন গ্রীসে প্রথম রাজবংশের (first dynasty) রাজত্বের সময়ে গানের সঙ্গে যে

৪। "The instruments were small harp, on which the performer played sitting, and two kinds of flutes, a larger and a smaller. Instrumental music was always accompanied by the voice, reserving modern custom, and the full orchestra consisted of two harps and two flutes, a large and a small one."—Prof. James Henry Breasted: *A History of Egypt* (2nd ed., 1951), p. 110. Vide also E. A. Parsons: *The Alexandrian Library* (1952), pp. 231-233.

৫। "The harp was a huge instrument as tall as a man, and had some twenty strings."

৬। Cf. *A History of Egypt* (2nd ed., 1951), p. 349.

বাদ্যযন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হ'ত তাদের মধ্যে হার্প, বাঁশী প্রভৃতি ছিল। ঐক্যতান-বাদনেও এ'সকল বাদ্যযন্ত্রের সমাবেশ থাকত। কায়রোর যাদুঘরে প্রাচীন ইজিপ্টের যে সকল তৈলচিত্র সযত্নে রক্ষিত আছে তাদের মধ্যেও ঐ বাদ্যযন্ত্রগুলির প্রতিচ্ছবি দেখা যায়।[৭] ইজিপ্ট, গ্রীস প্রভৃতি সুপ্রাচীন সুমহান দেশের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের নিবিড় সম্পর্ক ও যোগাযোগ ছিল। সেজন্য এ'দুটি সুসভ্য দেশের মধ্যে সাঙ্গীতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানের আদানপ্রদান হওয়াও মোটেই অসম্ভব ছিল না।

খৃষ্টীয় ১ম-২য় শতাব্দীতে ভারতীয় ভাস্কর্যেও নৃত্য, গীত ও বাদ্যের বিচিত্র নিদর্শন পাওয়া যায় ও সেগুলি থেকে প্রমাণ হয় যে তখনকার সমাজের সঙ্গীত-চেতনা ও অনুশীলন তদানীন্তন কালের শিল্পীদের মন ও রুচিকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবান্বিত করেছিল! খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর পাণ্ডুলেন চৈত্য-মন্দিরের (নাসিক) নাট্যমণ্ডপে (নাট্যশালা) সঙ্গীতশিল্পীদের জন্য একটি প্রেক্ষাগৃহের (গ্যালারি) ভাস্কর্য-চিত্র খোদাই করা দেখা যায়। অধ্যাপক পার্শি-ব্রাউন বলেছেন নাসিকের বৌদ্ধবিহারগুলিতে (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) যে সকল ভাস্কর্যশিল্পের প্রতিকৃতি আছে তাদের থেকে প্রমাণ হয় যে সে সময়ে যে সকল বৌদ্ধ-শ্রমণ ও ভিক্ষু বিহারে বাস করতেন তাঁরা তূর্য ও মৃদঙ্গবাদ্যের সঙ্গে প্রতিদিন গাথা গান করতেন।[৮] অমরাবতীর (খৃষ্টীয় ২য়—৩য় শতাব্দী) বারান্দায় ভগবান বুদ্ধ, তাঁর পিতামাতা, সভাসদ্‌বর্গ ও অনেক নট-নটীর মূর্তি উৎকীর্ণ দেখা যায়। বারান্দায় মাঝখানের চিত্রে শিশু-বুদ্ধের প্রতীক-রূপে একটি হস্তির প্রতিমূর্তিকে শোভাযাত্রা ক'রে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নট ও নটীদের মধ্যে কেউ বীণা, কেউ বেণু ও কেউ মৃদঙ্গ বাজাচ্ছে। তাদের মধ্যে একজন নটের হাতে বর্তমান কালের রবাবের মতো একটি বাদ্যযন্ত্রও দেখা যায়। বাদ্যযন্ত্রটি নিশ্চয়ই বীণা। এই জাতীয় বীণার নিদর্শন অজন্তাগুহা-চিত্রেও পাওয়া যায়। অমরাবতীর ভাস্কর্যচিত্রে কতকগুলি নটী আবার মৃদঙ্গ ও করতালি (মন্দিরা) বাদ্যের তালে তালে ছন্দায়িত ভঙ্গিতে নৃত্য করছে। ক্যাপ্টেন সি. আর. ডে তাঁর বিখ্যাত 'দক্ষিণ-ভারত ও সিংহলের বাদ্যযন্ত্র'

৭। "The ancient Egyptian paintings of the Cairo Museum * *. Musical concerts with harp, flute and dancers 2800 B.C. [2700 B.C.]." —Vide *The Flutes and Its Theory* (appeared in the Journal of the Music Academy, Madras, Vol. II, 1931, p. 2).

৮। Vide *Indian Architechure* (Buddhist & Hindu Periods, second edition), pp. 29, 33.

পুস্তকে উল্লেখ করেছেন ভারতীয় ভাস্কর্যে নট-নটীদের হাতে রবাব বা স্বারোদের মতো যে বাদ্যযন্ত্র দেখা যায় তাদের আকৃতি অনেকটা অসীরীয় হার্পের বা আফ্রিকার সাঙ্কো বা সাঙ্কোর (Sancho) মতো। নট বা নটীদের যে মুখে বেণু বা বাঁশী ছিল তাদের দেখতে অনেকটা আজকালকার সানাইয়ের মতো।[৯]

খৃষ্টপূর্বাব্দের বৌদ্ধবিহার বা হিন্দু-মন্দিরগুলিতেও উৎকীর্ণ অনেক বাদ্যযন্ত্র ও নট-নটীদের মূর্তি দেখা যায়। বারহুত (খৃষ্টপূর্ব ১৫০), সাঁচী (খৃষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দী) প্রভৃতি বৌদ্ধবিহারের বারান্দায় নট, নটী ও বাদ্যযন্ত্রের অনেক প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ আছে। ক্যাপ্টেন ডে উল্লেখ করেছেন সাঁচীর ভাস্কর্যে কতকগুলি রোমীয় বাদ্যযন্ত্রের প্রতিকৃতিও দেখা যায়। মাননীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর সুবিখ্যাত 'উড়িষ্যার প্রাচীন ইতিহাস' গ্রন্থে সাঁচী ও অমরাবতীর ভাস্কর্যে এ'ধরণের সাতটি তন্ত্রীযুক্ত বীণার উল্লেখ করেছেন। বীণাটি ক্রোড়ে স্থাপন ক'রে বাজানো হ'ত। তিনি বলেছেন সাঁচী, অমরাবতী ও ভুবনেশ্বরের মন্দিরশিল্পের কোন কোনটিতে মিশরীয় বাদ্যযন্ত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু আসলে তারা ভারতীয় ছাঁচে গড়া ও ভারতেরই নিজস্ব সম্পদ। অমরাবতীর শিল্পে যে বীণার প্রতিকৃতি পাওয়া যায় তা দেখতে অনেকটা অরফিউসের হার্পের মতো। তাতে সাতটি তন্ত্রী আছে কিন্তু কোন পর্দা নেই।[১০] পূর্বেই বলা হয়েছে যে প্রাচীন ভারতের বীণাদি যন্ত্রে কোন পর্দা দেওয়া থাকত না। বীণায় যতগুলি স্বরের বিকাশ-সাধনের প্রয়োজন হ'ত, ততগুলি তন্ত্রী বা তার সংলগ্ন থাকত। অমরাবতীর বীণায় সাতস্বরের লীলায়ন থাকত ব'লে সাতটি তন্ত্রীর সমাবেশ দেখা যায়। প্রাচীন ভারতের সপ্ততন্ত্রী-বীণাই মনে হয় বর্তমানকালে সেতার বা 'স্বরবীণা' নামে প্রচলিত। পাথরের বুকে প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র ও নট-নটিদের ক্ষোদিত চিত্র অতীত ভারতের সাঙ্গীতিক চেতনা ও ইতিহাসের মর্মকথাই প্রকাশ করে!

খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে মুনি ভরত নাট্যশাস্ত্রে তাঁর একশত পুত্র তথা শিষ্যের নামোল্লেখ করেছেন। শিষ্য পুত্রতুল্য, তাই ভরত তাদের নামের পরিচয় দেবার আগে উল্লেখ করেছেন: "ত্বং পুত্রশতসংযুক্তঃ" (১।২৪) প্রভৃতি। তিনি বলেছেন: "পুত্রানধ্যাপয়ং যোগ্যান্ প্রয়োগং চাহস্য তত্ত্বতঃ" (১।২৫);

৯। Vide (ক) *The Musical Instruments of Southern India and Deccan* (1891), pp. 99-104; (খ) প্রজ্ঞানানন্দ: 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' (১ম ভাগ), পৃঃ ২৩৫

১০। Cf. R. L. Mitra : *Antiquities of Orissa*, Vol. I, and *Indo-Aryans* (Cal. 1881), Vol. I, pp. 283-84.

অর্থাৎ শিষ্যরা যাতে ভালোভাবে অধিগত ক'রে নাট্যশাস্ত্রের বিষয়বস্তু যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারেন সে সম্বন্ধে তিনি যত্ন নিয়েছিলেন। ভরত নাট্যশাস্ত্রের ১ম অধ্যায়ের ২৬-৩৯ শ্লোকগুলিতে একশো বিচক্ষণ শিষ্যের নামোল্লেখ করেছেন। শিষ্যদের মধ্যে আছেন শাণ্ডিল্য, বাৎস্য, কোহল, দত্তিল, তণ্ডু, বিপুল, কপিঞ্জল, বাদরি শালিকর্ণ, শালিক, পিঙ্গল, গৌতম[১১], বাদরায়ণ, কালিয়, তাণ্ড্য, হিরণ্যাক্ষ, শ্যামায়ন, পঞ্চশিখ, রুদ্র, বীর প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে সম্মুখ, ব্যালী, ব্যাস, বামদেব, বাসুকী, দক্ষপ্রজাপতি, ধেনুক বা ধেনুকা, দ্রোহিনি, কম্বল, অশ্বতর, তুম্বুরু, রাবণ, বিশ্বাবসু প্রভৃতিকে ভরতের পূর্বাচার্য ব'লে অনুমান হয়। তাছাড়া কয়েকজনের নাম রামায়ণ, মহাভারত ও হরিবংশের সঙ্গে সংযুক্ত থাকায় তাঁদের খৃষ্টপূর্ব যুগের বলে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকরে অবতারণায় (১।১৫-১৯) প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রীদের নামোল্লেখ করেছেন, কিন্তু তা থেকে তাঁদের পৌর্বাপর্যধারার ঠিক সন্ধান পাওয়া যায় না। সম্মুখ, ব্যালী, কামদেব, বাসুকী, দক্ষ-প্রজাপতি, ধেনুকা, দ্রোহিনি প্রভৃতি সকলেই যে সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রণেতা বা শাস্ত্রী ছিলেন তা পরবর্তী-গ্রন্থকারদের উদ্ধৃতি-বাক্য থেকে জানা যায়। 'তাললক্ষণ' গ্রন্থে কামদেবের নামের উল্লেখ আছে: "চরণনৃত্যলক্ষণং তু কামদেবেন"। সারদাতনয় তার 'ভাবপ্রকাশন' গ্রন্থে বাসুকী, ব্যাস, দ্রোহিনি প্রভৃতির নামোল্লেখ করেছেন: (১) "নানাদ্রব্যৌষধৌ * * ইতি বাসুকিনাপ্যুক্তো ভাবেভ্যো রসসম্ভবঃ" (৩৭ শ্লোক); (২) "সাত্বতী বৃত্তিরত্রস্যাদিতি দ্রৌহিণিরব্রবীৎ" (২৩৯ শ্লোক); (৩) "অস্যাঙ্কমেকং ভরতঃ দ্বাবঙ্কাবিতি কোহলঃ, ব্যাসাঞ্জনেয়গুরবঃ প্রাহুরঙ্কত্রয়ং যথা" (২৫১ শ্লোক)। সঙ্গীত-রত্নাকরের টীকায় সিংহভূপাল দক্ষ-প্রজাপতির নাম উল্লেখ করেছেন: "দক্ষ-প্রজাপতিরপি—অবধানানি * *"। দামোদরগুপ্ত তাঁর 'কুট্টিনীমত' গ্রন্থে ধেনুকার নামোল্লেখ করেছেন: "কীদৃশো নয়মার্গে ধেনুকরচিতে চ তালকে কীদৃক্" (৮২ শ্লোক)। শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকরে কম্বল ও অশ্বতরের নামের উল্লেখ করেছেন: "এতদল্পনিগাস্বাহুঃ কম্বলাশ্বতরাদয়ঃ" (১।৭।২২)। কল্লিনাথও বলেছেন: "ইতি কম্বলাশ্বতরাদি- মতানুসারিণা বচনেন * *"। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে গন্ধর্ব বিশ্বাবসু প্রভৃতির নামোল্লেখ আছে: "* * গন্ধর্বাঙ্বিশ্বাবসু হাহাহুহূন্" (১৩ শ্লোক)। মার্কণ্ডেয়পুরাণে: "বিশ্বাবসুরিতি

১১। এই গৌতম যে প্রাচীন ন্যায়ের আচার্য অক্ষপাদ গৌতম নন তা নাট্যশাস্ত্রের ৩৬ অধ্যায়ে (কাশী সং) "অঙ্গিরা গৌতমোঽগস্ত্যো" (৩৬।১) প্রভৃতি শ্লোক থেকেই অনুমান হয়।

খ্যাতো দিবি গন্ধর্বরাট্ প্রভো" (২১শ অধ্যায়)। খিল-হরিবংশে (ভবিষ্যপর্ব ।৭।২৪) উল্লেখ আছে: "গন্ধর্বরাজঃ প্রোবাচ বিশ্বাবসুরিদং বচঃ" প্রভৃতি।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে সমুখ, ব্যালী, কামদেব, বাসুকী, কম্বল, অশ্বতর, দক্ষপ্রজাপতি, ধেনুকা, দ্রোহিণি প্রভৃতি আচার্যেরা নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের চেয়ে সাধারণভাবে প্রাচীন বলে মনে হলেও তাঁদের সঠিক সময় ও পৌর্বাপর্য নির্ণয় করা কঠিন, কেননা তাঁদের সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণবাক্য পরবর্তী সঙ্গীতশাস্ত্রগুলিতে উদ্ধৃত দেখা যায় তাদের কোন কোন বিষয়বস্তুর আলোচনা খৃষ্টীয় শতাব্দীর পূর্ববর্তী ও কোন কোনটি খৃষ্টীয় শতাব্দীর ব'লে অনুমান হয়। যেমন, কম্বল ও অশ্বতরের মতের উল্লেখ ক'রে শার্ঙ্গদেব (খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দী) বলেছেন,

অংশেষু সমপেষ্বেতদ্‌যথাস্বনিয়মাদ্ভবেৎ।
এতদল্পনিগাস্বাহুঃ কম্বলাশ্বতরাদয়ঃ ॥[১২]

কল্লিনাথ টীকায় বলেছেন: 'পঞ্চমীমধ্যমা' ইতি ভরতমতানুসারিণা বচনেন, 'এতদল্পনিগাসু' ইতি কম্বলাশ্বতরাদিমতানুসারিণা বচনেন চোপাত্তাসু পঞ্চমীমধ্যমা-ষড়্‌জমধ্যমাষাড়্‌জীষু চতসৃষু ষড়্‌জমধ্যমায়া বিকৃতসংসর্গজত্বেন কেবল-বিকৃতত্বাচ্ছুদ্ধতায়া অভাবেঽপীতরাসাং তিসৃণাং শুদ্ধাবস্থায়াং বিকৃতবস্থায়াং চাবিশেষেণ স্বরসাধারণে প্রাপ্তে নিয়ময়তি"। সিংহভূপালও কম্বল ও অশ্বতরের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন: "এতৎ স্বরসাধারণমল্পনিষাদগান্ধারাসু জাতিষু ভবতীতি কম্বলাশ্বতরাদয় আহুঃ। অল্পনিষাদগান্ধারে রাগাভাষাঽদাবপি স্বরসাধারণং প্রোযোক্তব্যমিতি তেষাং কম্বলাশ্বতরাদীনাং মতম্"। শার্ঙ্গদেব, কল্লিনাথ ও সিংহভূপালের উল্লেখ ও বিবৃতি থেকে বোঝা যায় নাগরাজ অশ্বতর ও তাঁর ভ্রাতা কম্বল[১৩] জাতি তথা জাতিরাগ, ভাষারাগ, স্বরসাধারণ, বিকৃতস্বর প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাছাড়া শাস্ত্রী কম্বলকে ব্রহ্মগীতি-রূপ কপালাদির সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত দেখা যায়। শার্ঙ্গদেব উল্লেখ করেছেন: "পীতঃ কম্বলগানেন কম্বলায় বরং দদৌ" (১।৮।১৩)। কপাল ও কম্বল প্রভৃতি ব্রহ্মপদ বা ব্রহ্মা-কথিত পদ: "কপালানাং ক্রমাদ্ ক্রমো ব্রহ্মপ্রোক্তাং পদাবলীম্" (১।৮।১৪)। কল্লিনাথ বলেছেন নাগরাজভ্রাতা কম্বল বিশেষভাবে যে ব্রহ্মগীতি

১২। সঙ্গীত-রত্নাকর ১।৭।২২

১৩। মার্কণ্ডেয়পুরাণে সঙ্গীতের আলোচনার সময় এঁদের সম্বন্ধে আরো বিশেষভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

গান করতেন তাঁর নাম ছিল 'কম্বল': "কম্বলনাম্না খণ্ডপরশুকর্ণকুণ্ডলেন কুণ্ডলীন্দ্রেণ গীতত্বাদস্য কম্বলসংজ্ঞা"। সিংহভূপালও বলেছেন: "কম্বলশব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্তং কম্বলগানস্য * *। যস্মাৎ কম্বলো নাগো গীতবাংস্তস্মাৎকম্বলগানমিত্যাভিধীয়তে"। ভরত নাট্যশাস্ত্রে কম্বলের নাম উল্লেখ না করলেও ব্রহ্মগীতির পরিচয় দিয়েছেন।[১৪] শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকরের স্বরাধ্যায়ে ব্রহ্মগীতি কপালের সঙ্গে সঙ্গে কম্বলগীতির কথাও উল্লেখ করেছেন ও সে'সম্বন্ধে ব্রহ্মার প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি। ব্রহ্মপদগীতি কপাল ও কম্বল শুদ্ধজাতিরাগ ষাড়্জী প্রভৃতি থেকে সৃষ্ট: "শুদ্ধজাতিসমুদ্ভূতকপালানি" (১।৮।১); অথবা কল্লিনাথ বলেছেন: "শুদ্ধজাতিভ্যঃ ষাড়্জ্যাদিভ্যঃ সপ্তভ্যঃ সমুদ্ভূতাণি কপালানি"। সুতরাং কপাল, কম্বল প্রভৃতি ব্রহ্মপদগীতি নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) অনেক আগে থেকে ভারতীয় সমাজে প্রচলিত ছিল ও কম্বলগীতির সঙ্গে সঙ্গীতশাস্ত্রী কম্বলের নাম সম্পর্কিত হওয়ায় কম্বল ও তাঁর ভ্রাতা অশ্বতর যে ভরতের চেয়ে প্রাচীন একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক। এভাবে অন্যান্য প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রীদের সম্বন্ধে আলোচনা করলে হয়তো অনেককেই ভরত-পূর্ব যুগের ব্যক্তি হিসাবে যেমন পেতে পারি তেমনি অনেককে আবার ভরতোত্তর কালের শাস্ত্রী ব'লেও প্রমাণ করা যায়। তাঁদের নির্দিষ্ট অভ্যুদয়-কালের ঐতিহাসিক প্রমাণ না পাওয়ার জন্যই এই বিপর্যয় দেখা যায়।

॥ নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীত ॥

খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের অভ্যুদয় হয়। অবশ্য ভরতের অভ্যুদয়-কাল নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কেউ বলেন ২য় খৃষ্টপূর্বাব্দ কাল পর্যন্ত ভরতের সময় নির্দিষ্ট করা যেতে পারে।[১] ডাঃ কৃষ্ণমাচারিয়ার, অধ্যাপক ধ্রুব, ডাঃ ভাণ্ডারকর, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ষ্টেন কোনো, শ্রদ্ধেয় র‍্যাপ্‌সন, গণপতি শাস্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিতদের মতে ভরতের সময় বা নাট্যশাস্ত্র-রচনার কাল খৃষ্টপূর্ব ২য় শতক থেকে খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী। অনেকের মতে ভরত খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী থেকে ৫ম শতাব্দীর গুণী।[২] কারু কারু মতে বিচিত্র বিবর্তনের ভেতর

১৪। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সংস্করণ) ৩১।১৯৮-২০৭

১। "Its upper limit is fixed at the 2nd century B.C."—ডাঃ রাঘবন

২। 'It will, therefore, not be wrong to suppose that Bharata lived

দিয়ে নাট্যশাস্ত্রের পূর্ণরূপের বিকাশ লাভ করে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে। অনেকে বলেন নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীতের অধ্যায়গুলি (২৮শ—৩৩শ অধ্যায়) খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে রচিত হয়। ডাঃ কানে (P. V. Kane) কলিঙ্গরাজ জৈন খারবেলের হাতিগুম্ফা-লিপিতে উৎকীর্ণ 'গান্ধর্ববেদবুধঃ' শব্দটির নিদর্শন দেখিয়ে বলেছেন যে খৃষ্টপূর্ব ২য় শতকে (কারু মতে খৃষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দী) ঐ প্রস্তরলিপিটি উৎকীর্ণ হয় ও তাতে গন্ধর্ববেদের কথা উল্লিখিত থাকায় গন্ধর্ববেদ তথা নাট্যশাস্ত্র যে ২০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের আগেই রচিত হয়েছিল একথা বোঝা যায়।[৩] হাতিগুম্ফা-গুহাটি উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরের কাছে উদয়গিরিপর্বতে অবস্থিত। জৈন রাজা খারবেল নৃত্য-গীত-বাদ্য ও নাটকে বিশেষ অনুরাগী ও পারদর্শী ছিলেন। তিন বছর রাজত্ব করার পর তিনি তাঁর রাজত্বে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নাট্যাভিনয়, নৃত্য, গীত ও বাদ্যের যাতে বিশেষ প্রচার হয় তার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং লিপিতেও একথার উদ্ধৃতি দেখা যায়: "দপ-নট-গীত-বাদিত-সংদসনাহি উসব-সমাজ-কারাপনাহি চ কীড়াপয়তি নগরীম্"।[৪] সুতরাং ডাঃ কানে উল্লেখ করেছেন যে প্রথম অধ্যায় ও সম্ভবত আর চারটি অধ্যায় (২য়—৫ম) খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে বর্তমান আকারের নাট্যশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এ'ধরণের অনেক মতবাদই নাট্যশাস্ত্রের রচনাকাল ও রচয়িতাকে নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু নানান্ দিক থেকে নাট্যশাস্ত্রের আলোচনা ও বিশেষ ক'রে তার সঙ্গীতাংশের বিষয়বস্তু নিয়ে বিচার করলে মনে হয় যে মুনি ভরত খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর আগে

sometime between the 4th and the 5th century A.D.'—Dr. K. C. Pandey: *Abhinavagupta* (1935), p. 119.

৩। 'The Hāthigumphā Inscription of Kāravela styles Khāravela (the King of Kalinga) 'Gāndharvavedabudhah' (*Epigraphia Indica,* Vol. XX, p. 17 at p. 79). That inscription is generally assigned to the 2nd century B.C. Therefore the Gāndharvaveda must have been recognized some centuries before Christ and the Nātyaveda which includes its principles and practices may very well be placed about 200 B.C.'—*The History of Sanskrit Poetics* (1951, 3rd ed.), p. 19.

৪। Vide ডাঃ শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক লিখিত প্রবন্ধ: *The Literary Merit of Ancient Indian Inscriptions* (appeared in Bulletin of the Rāmakrishna Mission Institute of Culture, Vol. VII, April, 1956, No. 4, p. 77).

বর্তমান আকারের নাট্যশাস্ত্রটি রচনা বা সংকলন করেন নি। ডাঃ শ্রীমনোমোহন ঘোষের অভিমতও তাই।[৫]

ভরতের নাট্যশাস্ত্র আসলে ১২,০০০ হাজার শ্লোক নিয়ে সম্পূর্ণ ছিল, পরে ৬,০০০ হাজার মাত্র শ্লোক-সংখ্যা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকে দু'টি সংস্করণ—বৃহৎ ও ক্ষুদ্র মনে করা যেতে পারে। অনেকের মতে বৃহৎটির নাম 'নাট্যবেদাগম' ও ক্ষুদ্রটির নাম 'নাট্যশাস্ত্র' ছিল। সারদাতনয় (১১৭৫-১২৫০ খৃষ্টাব্দ) 'ভাবপ্রকাশন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (১০।৩৫),

একং দ্বাদশসহস্রৈশ্লোকৈরেকং তদর্ধতঃ।
ষড়্ভিঃশ্লোকসহস্রৈর্যো নাট্যবেদস্য সংগ্রহঃ॥

ধনঞ্জয়-কৃত 'দশরূপ' গ্রন্থের ১।৬২ শ্লোকের টীকায় বহুরূপ-মিশ্র দ্বাদশসহস্রী-সংস্করণটির প্রামাণ্য স্বীকার ক'রে বলেছেন,

সভাষ্যমানমেকস্মিন্নঙ্কেঽন্যার্থস্বসূচনম্।
সমাপ্যতি হি নাট্যজ্ঞৈরঙ্কাবতার ইষ্যতে॥
ইতি দ্বাদশসহস্রীকারঃ।

ডাঃ কৃষ্ণমচারিয়ার বলেন 'ভরতসপ্রকাশনম্' নামে একখানি গ্রন্থ মান্দ্রাজ থেকে তেলেগুভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। তাতে ন'টি রস ও ভাবের পরিচয় আছে, কিন্তু নাট্যশাস্ত্রে আটটি রস ও ভাবের বর্ণনা দেখা যায়। সম্ভবত তেলেগু সংস্করণটি অধুনালুপ্ত দ্বাদশসহস্রীরই অংশ-বিশেষ।[৬] ষট্সহস্রী-নাট্যশাস্ত্রের অস্তিত্বও প্রাচীন মনীষীরা স্বীকার করেছেন। যেমন বহুরূপ-মিশ্র দশরূপের টীকার (১।৬১) উল্লেখ করেছেন: "সূত্রাণাং সকলাঙ্কাণাং হেয়মঙ্কমুখং বুধৈঃ। ইতি ষট্সহস্রীকারঃ"। অভিনবগুপ্তও তাঁর অভিনবভারতীতে বলেছেন: "অপি তু যথাবসরং মহাবাক্যাত্মনা ষট্সহস্রীরূপেণ প্রধানতায়া প্রশ্নপঞ্চকনিরূপণ-পরেণ শাস্ত্রেণ তত্ত্বং নির্ণীয়তে"।

মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ-কবি নাট্যশাস্ত্রের অন্ততপক্ষে চল্লিশখানি পাণ্ডুলিপি পর্যবেক্ষণ ক'রে দ্বাদশসহস্রী সংরক্ষণটিকেই প্রাচীন ব'লে অভিমত প্রকাশ

৫। 'Hence it may be placed in the 2nd century A.D., i.e. one century before the time generally assigned to Bharata's works.'—*The Nātyaśāstra* (Eng. ed.), Vol. I, pp. LXXXV—LXXXVI.

৬। 'This portion may have formed part of Dvādaśasahasri.'—*History of Classical Sanskrit Literature* (1937), p. 810.

করেছেন। তাছাড়া তিনি ৩৬,০০০ হাজার শ্লোকপূর্ণ একটি প্রামাণিক নাট্যবেদের নামও উল্লেখ করেছেন। সেই 'নাট্যবেদ' রচয়িতা ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাভরত।[৭] দ্বাদশসহস্রী ও ষট্‌সহস্রী গ্রন্থ-দু'টি একই ভরতের রচিত কিনা তার উত্তরে সারদাতনয় 'ভাবপ্রকাশন' গ্রন্থে 'একং দ্বাদশসহস্রৈঃ' প্রভৃতি শ্লোকে উল্লেখ করেছেন তা আগেই আলোচনা করেছি। সারদাতনয়ের মতে গ্রন্থ-দু'খানি একই সঙ্গে লিখিত হয়েছিল ও দ্বিতীয়টি প্রথমটির পরিপূরক। কিন্তু অনেক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীদের মধ্যে এ'নিয়ে মতভেদ আছে। শ্রদ্ধেয় পিশেল (Pischel) দ্বাদশসহস্রীকেই প্রাচীনতার সম্মান দিয়েছেন। অধ্যাপক ম্যাকডোনেলও তাই, তবে ষট্‌সহস্রীকে তিনি একেবারে পরবর্তী বলেন নি। ডাঃ লক্ষ্মণস্বরূপের মতে ষট্‌সহস্রী সংস্করণটিই প্রাচীন। দশরূপকার ধনঞ্জয় দ্বাদশসহস্রীর পক্ষপাতী। ভোজরাজের মতে ষট্‌সহস্রীই প্রামাণিক। অভিনবগুপ্তের অভিমতও তাই। ডাঃ শ্রীমনোমোহন ঘোষের সিদ্ধান্ত এ'সম্বন্ধে প্রণিধানযোগ্য।[৮]

৭। 'It is known as 'sütra' (ষট্‌ত্রিংশকং ভরতসূত্রমিদং) as it embodies principles set out in a very concise form. This work is also known as 'Ṣatsahasri' meaning 6,000 (granthas). This appears to be an epitome of an earlier work called 'Dvādaśasahasri', which means 12,000 (granthas). This larger work is now only in part available. Both these works seem to have been based upon a still older one called Nātyaveda which forms one of the four Upavedas, extending over 36,000 slokas written by Brahmā himself.'—Vide *Preface* to *Nātyaśāstra* (Baroda Ed., 1926), Vol. I, pp. 1-2.

Vide also (i) *Journal of Āndhra Historical Research Society*, Vol. III, p. 23; (ii) *Bhāndārkar Oriental Research Institute Catalogue of MSS.*, Vol. XII, p. 453; (iii) Dr. Kane: *The History of Sanskrit Poetics* (1951, 3rd ed.), p. 25.

৮। At first sight the tendency would be to accept the shorter recension, as representing the original better, because elaboration would seem in most cases to come later. But opinion is divided in this matter. * * * All these go to show that the problem of the relation between two recensions of any ancient work is not so simple as to be solved off-hand. So in this case also we should not settle the issue with the idea that the longer recension owes its bulk to interpolations. The text-history of the Nātyaśāstra shows that already in the tenth century the work was available in two recensions. * * * It is likely that the long time which passed since then has witnessed at least minor changes, intentional as well as unintentional, in the text of both the recensions. Hence the problem becomes still

মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ-কবি ব্রহ্মাকেই নাট্যবেদের রচয়িতা বলেছেন।[৯] ভরতও নাট্যশাস্ত্রে একথা স্বীকার করেছেন দেখা যায়ঃ (১) "নাট্যবেদঃ কথং ব্রহ্মন্নুৎপন্নঃ কস্য বা কৃতে" (১।৪), "শ্রূয়তাং নাট্যবেদস্য সংভবো ব্রহ্মনির্মিতঃ" (১।৭), "নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতুর্বেদাঙ্গসংভবম্" (১।১৬), "উৎপাদ্য নাট্যবেদং তু ব্রহ্মোবাচ সুরেশ্বরম্" (১।১৯), "আজ্ঞাপিতো বিদিত্বাহং নাট্যবেদং পিতামহাৎ" (১।২৫) প্রভৃতি। অনেকের মতে নাট্যবেদের রচয়িতা 'আদিভরত'[১০] সদাশিব বা সদাশিবভরত। ব্রহ্মাভরত ও সদাশিবভরতের আলোচনা আমরা আগেই করেছি। ধনঞ্জয় তাঁর 'দশরূপ'-গ্রন্থে সদাশিবের ও সারদাতনয় ভাবপ্রকাশনে ব্রহ্মা, সদাশিব ও মুনি ভরত এই তিনজন প্রাচীন নাট্যাচার্যের নামোল্লেখ করেছেন। অভিনবগুপ্ত

more difficult. But a careful examination of the rival recensions may give us some clue to their relative authenticity".—*The Nātyaśāstra* (Eng. Ed.), published by the Royal Asiatic Society of Bengal, 1951, pp. LXXI-LXXII.

৯। মাননীয় রামকৃষ্ণ-কবি ব্রহ্মা-রচিত নাট্যবেদকে ৩৬০০০ শ্লোক যুক্ত চারটি উপবেদের অন্যতম বলেছেন। তিনি যামলাষ্টকতন্ত্র থেকে প্রমাণও উদ্ধৃত করেছেন। যেমন.

গান্ধর্ববেদঃ ষট্ত্রিংশৎসহস্রগ্রন্থসংমিতঃ।
যত্র সপ্তস্বরোৎপত্তিকথনং পরিকীর্ত্যতে॥
বীণাতন্ত্রং কলাতন্ত্রং রাগতন্ত্রমনুত্তমম্।
মিশ্রতন্ত্রং তালতন্ত্রং গীতিকাতন্ত্রমেব চ।
লাসিকোল্লাসিকাতন্ত্রং মেলতন্ত্রং মহত্তরম্।
জাতিগ্রহলয়স্থানং মার্গাঙ্গপ্রক্রিয়া ক্রিয়া।
কালজ্ঞানং বাদ্যবল্লীত্রিভিন্নাধ্যায় এব চ।
তুরঙ্গরতিসারঙ্গসিংহলীলাবিজৃম্ভণম্॥
অঙ্গহারপ্রবিক্ষেপাধ্যায়ঃ সংক্ষোভণক্রিয়া।
এবমাদীনি গান্ধর্ববেদে সন্তি সহস্রশঃ॥

১০। কবি কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটকের টীকাকার রাঘবভট্টও আদি-ভরতের নামোল্লেখ করেছেন। শ্রদ্ধেয় রামকৃষ্ণ-কবি দ্বাদশসহস্রীকে আবার 'আদিভরত' আখ্যা দিয়েছেনঃ "*Dvādaśasahasri* is simply called *Ādibharata* and is in the form of a dialogue between Pārvati and Śiva. This may be the work referred to as Sadāśiva's by Abhinava." 'আদিভরত' এখানে গ্রন্থ, গ্রন্থকার নয়, আদিভরত বা সদাশিবভরতের রচিত দ্বাদশসহস্রীর অপর নামই আদিভরত। শ্রদ্ধেয় রামকৃষ্ণ-কবি উল্লেখ করেছেনঃ "We have fragments of both *Brahmabharata* and *Sadāśivabharata*". —Vide *Preface* to Nātyaśāstra (Baroda), Vol. I, p. 6.

অভিনবভারতীতে এই তিনজনের নাম উল্লেখ ক'রে পূর্বপক্ষ করেছেন বর্তমান (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে লেখা) সমগ্র নাট্যশাস্ত্রটি মুনি ভরতের নিজের—না তাঁর কয়েকজন শিষ্যের লিখিত। তিনি উল্লেখ করেছেন: "অন্যে ত্বিমন্তং গ্রন্থং কশ্চিচ্ছিষ্যো ব্যরীরচৎ। তত্র ব্রহ্মণেতি ভরতমুনিঃ প্রথম শ্লোকে নির্দিষ্টঃ, কথং ** মধ্যেঽস্য ষট্‌ত্রিংশদধ্যায়াং যানি প্রশ্নপ্রতিবচনপ্রয়োজনবচনানি তানি তচ্ছিষ্যবচনান্যে-বেত্যাহুঃ। তচ্চাসৎ। একস্য গ্রন্থস্যানেকবক্তৃবচনসন্দর্ভময়ত্বে প্রমাণাভাবাৎ **। এতেন সদাশিবব্রহ্মভরতমতত্রয়বিবেচনেন ব্রহ্মমতসারতাপ্রতিপাদনায় মতত্রয়ী-সারাসারবিবেচনং তদ্‌গ্রন্থখণ্ডপ্রক্ষেপেণ বিহিতমিদং শাস্ত্রম্, ন তু মুনিবিরচিতমিতি বদাহুর্নাস্তিকধুর্যোপাধ্যায়স্তৎপ্রযুক্তম্, সর্বানপহ্নবনীয়াবাধিতশব্দলোকপ্রসিদ্ধি-বিরোধাচ্চ"। কিন্তু এ' সিদ্ধান্ত কতটুকু সমীচীন তা আলোচনার বিষয়। পুনরায় কাব্যমালা-সংস্করণ নাট্যশাস্ত্রের শেষে নন্দিভরতের নাম উল্লেখ দেখা যায়: "সমাপ্তশ্চায়ং [গ্রন্থঃ] নন্দিভরতসংগীতপুস্তকম্"। অনেকের মতে ভরত সম্পূর্ণ নাট্যশাস্ত্রটি রচনা করেন নি, নন্দি তথা নন্দিকেশ্বর ও কোহল শেষাংশ রচনা করেছিলেন। কিন্তু নন্দিকেশ্বর-রচিত কোন সঙ্গীতগ্রন্থের সন্ধান এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। শ্রদ্ধেয় রাইস্ মহীশূর ও কূর্গের গ্রন্থ-তালিকায় 'নন্দিভরতম্' নামে একটি গ্রন্থের উল্লেখের কথা বলেছেন। কিন্তু সে'টি নাট্যগ্রন্থ, সম্পূর্ণ সঙ্গীতের গ্রন্থ নয়। কাব্যমালা-সংস্করণে উল্লিখিত নন্দিভরতের উল্লেখ-প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীসুশীলকুমার দে বিশেষভাবে আলোচনা ক'রে বলেছেন সঙ্গীত সম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্রে ২৮ থেকে ৩৩ অধ্যায়গুলি মুনি ভরতের নিজস্ব অবদান হলেও পরবর্তীকালে নন্দিভরতের অভিমত অনুযায়ী তাকে নতুন ক'রে আবার লেখা হয়েছিল।[১১] নাট্যশাস্ত্রটি বেশীরভাগ আর্যাছন্দে (পদ্যে) লেখা ও সামান্য সামান্য তাতে গদ্যরচনাও আছে।

নাট্যশাস্ত্রের রচয়িতা মুনি ভরত আসলে ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা এ' নিয়ে মতদ্বৈততা কম নেই। তবে একথা ঠিক যে, 'ভরত' একটি উপাধি বা পদবী-

১১। (a) "His designation of the later part of Bharata's text, a part of which deals, among other things, with music, probably implies that it was compiled and recast at some later period in accordance with the views of Nandikeśvara. * * * that the re-writing of the portion in question was done some time after Kohala as well as Nandikeśvara had spoken on the subject."—*History of Sanskrit Poetics*, Vol. I, pp. 24-25. (b) Vide also *The Nāṭyaśāstra*, Eng. Ed.) by Dr. M. Ghose, p. LXXIII.

বিশেষ। নাট্যশাস্ত্রে অভিনেতা বা নটমাত্রকেই 'ভরত' আখ্যা দেওয়া হ'ত। ভরত উল্লেখ করেছেন : 'ভরতানাঞ্চ বংশোঽয়ং ভবিষ্যঞ্চ প্রকীর্তিতম্' (৩৬।৭১), বা 'পৃষ্ঠে কৃত্বাস্য কুতপং নাট্যং যুঙ্‌ক্তে যতোমুখং ভরতঃ, সা পূর্ব মন্তব্যা প্রয়োগকালে তু নাট্যজ্ঞৈঃ" (কাব্যমালা সং ১৩।৬১, বরোদা ১৩।৬৬, কাশী ১৪।৬৫)। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়ও (৩।১৬২) 'ভরত' শব্দটি অভিনেতা বা নট অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে দেখা যায়,

যথা হি ভরতো বর্ণৈর্বর্ণয়ত্যাত্মনস্তনুম্।
নানারূপাণি কুর্বাণস্তথাত্মা কর্মজাস্তনুঃ॥

বিশ্বরূপ প্রভৃতি টীকা বা ভাষ্যকাররা এই শ্লোকটিতে ভরত অর্থে 'নট' অর্থই করেছেন।[১২]

সারদাতনয় ভাবপ্রকাশনে বৃদ্ধভরতের নামোল্লেখ ক'রে বলেছেন,

এবং হি নাট্যবেদোঽস্মিন্ ভরতেনোচ্যতে রসঃ।
তথা ভরতবৃদ্ধেন কথিতং গদ্যমীদৃশম্॥

পূর্বে তামিলগ্রন্থ শিলপ্পদিকরমের ভাষ্যে 'পঞ্চভারতীয়ম্' শব্দের উল্লেখ করেছি। 'পঞ্চভারতীয়ম্' একটি গ্রন্থ, এ'টি পাঁচজন ভরতের বোধক নয়। সারদাতনয় ভাবপ্রকাশনের দশম অধ্যায়ে পঞ্চভরতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন দেখা যায়। তিনি আচার্যপরম্পরার পরিচয় দিতে গিয়ে মুনি ভরতের পঞ্চশিষ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং সারদাতনয়ের পঞ্চভরতোপাখ্যানের সঙ্গে নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত একশো শিষ্যের আখ্যানের তাহলে কোন সামঞ্জস্য নাই। সারদাতনয় পঞ্চভরতকে 'নটকুল' বা 'নট' আখ্যা দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন,

স্মৃতিমাত্রে মুনিঃ কশ্চিৎ শিষ্যৈঃ পঞ্চভিরন্বিতঃ।
তানব্রবীৎ নাটবেদং 'ভরত' ইতি পিতামহঃ॥
তুষ্টস্তেভ্যো বরং প্রাদাৎ অভীষ্টং পদ্মবিষ্টরঃ।
নাট্যবেদমিদং যস্মাৎ 'ভরত' ইতি মযোরিতম্॥

১২। ডাঃ কানে এ'প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন : "It is quite possible that some one who had mastered the traditional lore of the histrionic art and was well-disposed to *bharatas* (actors) put together most of the present Nāṭyaśāstra and in order to glorify the tribe of *Bharatas* passed it on as the work of a mythical hero. Such things are common in Sanskrit Literature."—*The History of Sanskrit Poetics* (1951), p. 27.

তস্মাদ্‌ভরতনামানঃ ভবিষ্যথ জগত্ত্রয়ে।
নাট্যবেদোঽপি ভবতাং নাম্না খ্যাতিং গমিষ্যতি ॥

এ' থেকে বোঝা যায় একজন মুনি ভরতের পাঁচজন শিষ্য ছিল ও তাদেরও 'ভরত' বলা হ'ত। সুতরাং ছ'জন ভরত নাট্যশাস্ত্র প্রচার ক'রে পৃথিবীতে যশস্বী হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন নাট্যশাস্ত্রকার মুনি ভরত ও অপর পাঁচজন নন্দিভরত, মতঙ্গভরত, কশ্যপভরত, কোহলভরত ও তণ্ডুভরত। অনেকে তণ্ডুর পরিবর্তে যাষ্টিকভরতের নাম উল্লেখ করেন। আসলে পঞ্চভরতোপাখ্যানটি পৌরাণিকী ধারণা ছাড়া আর কিছু নয়। কাজেই মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ-কবি সারদাতনয়ের 'ভাবপ্রকাশন' এবং 'শিলপ্পদিকরম্‌' ও 'পঞ্চমরবু' এই ছ'টি তামিল-গ্রন্থের অনুসরণ ক'রে যে পাঁচজন ভরতের কল্পনা করেছেন তা যুক্তিসঙ্গত নয়। তাছাড়া 'শিষ্যৈঃ পঞ্চভিরন্বিতম্‌' শব্দগুলি থেকেও পঞ্চভরতের ঐতিহাসিকতা প্রমাণ হয় না।[১৩] সুতরাং নাট্যশাস্ত্রকার মুনি ভরতের প্রসঙ্গে বলা যায় যে 'ভরত' শব্দটি উপাধি-বিশেষ হলেও নাট্যশাস্ত্রের রচয়িতা বা সংকলয়িতা ঐতিহাসিক ভরত একজন ছিলেন। নাট্যশাস্ত্রকার নিজে নাট্যবেদজ্ঞানী ও নট-রূপে (?) প্রসিদ্ধ থাকায় তাঁর পক্ষে নটের অভিন্ন উপাধি 'ভরত' নামধারী হওয়াও কিছু অস্বাভাবিক নয়।

ভরত নাট্যের অঙ্গ বা সহায়ক-রূপে নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীতের আলোচনা করেছেন ও সেদিক থেকে নাট্যশাস্ত্রের সকল অধ্যায়েই সঙ্গীতের কিছু-না-কিছু প্রসঙ্গ আছে। তবে ২৮শ থেকে ৩৩শ অধ্যায়গুলিতেই তিনি বিশেষভাবে সঙ্গীতের পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন। তবে ২৮শ—৩৩শ অধ্যায়গুলিতে সঙ্গীতালোচনার সঙ্গে ১ম থেকে ২৭শ অধ্যায়গুলিরও বেশ সম্পর্ক আছে এবং নাট্যশাস্ত্রের গোড়ার দিকে নাট্য-প্রসঙ্গে সঙ্গীত-উপাদানের যে সব পরিচয় দিয়েছেন, ২৮শ—৩৩শ অধ্যায়গুলিতে তাদের অনেকেরই পুনরুক্তি দেখা যায়। তাই নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীতের পরিপূর্ণ আলোচনা করতে গেলে সম্পূর্ণ গ্রন্থটির সম্বন্ধে সুষ্ঠু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীতের আলোচনা বেশ প্রণালীবদ্ধ ও বিজ্ঞানসম্মত। নাট্যশাস্ত্রের পরবর্তী গ্রন্থগুলি নাট্যশাস্ত্রেরই প্রতিধ্বনি ও একদিক

১৩। ডাঃ রাঘবনের অভিমতও তাই। তিনি উল্লেখ করেছেন: "As above proved, the legend of Pañcha-Bharata has no evidence. There is no meaning in idle guesses or assumptions that Nandin or Tandu or Kohala or Kaśyapa is one of the five Bharatas."—*The Journal of the Music Academy*, Madras (1932), Vol. III, p. 15.

দিয়ে ভাষ্যই বলা যায়। তাছাড়া নিয়মিত আলোচনা ও অনুশীলনের অভাবে নাট্যশাস্ত্রের বিষয়বস্তু অনেকের কাছেই অপরিজ্ঞাত ও দুরূহ হ'য়ে আছে। তাই নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীতের সম্যক পরিচয় পেতে গেলে আমাদের পরবর্তী সঙ্গীতগ্রন্থ ও ভাষ্যগুলির সাহায্য নেওয়া একান্ত আবশ্যক।

নাট্যশাস্ত্রের ২৮ অধ্যায় থেকে বিধিবদ্ধভাবে স্বর, মন্দ্রাদি স্থান, বর্ণ, অলংকার, কাকু, অঙ্গ প্রভৃতির আলোচনা করার আগে ভরত ১৯শ অধ্যায়ে পাঠ্যের গুণাদির নির্ণয়-প্রসঙ্গে ষড়্‌জাদি সাত স্বর, বর্ণ ও অলংকারাদির কিছুটা পরিচয় দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন: "পাঠ্যগুণানিদানীং বক্ষ্যামঃ। তদ্‌যথা সপ্তস্বরাঃ, ত্রীণি স্থানানি, চত্বারো বর্ণাঃ, ত্রিবিধা কাকুঃ, ষড়লঙ্কারাঃ, ষড়ঙ্গানি, ** তত্র সপ্ত স্বরাঃ ষড়্‌জর্ষভগান্ধারমধ্যমপঞ্চমধৈবতনিষাদাঃ। ত এতে রসেষ্বুপপাদ্যঃ যথা—

> হাস্যশৃঙ্গারয়োঃ কার্যৌ স্বরৌ মধ্যমপঞ্চমৌ।
> ষড়্‌জর্ষভৌ তথা চৈব বীররৌদ্রাদ্‌ভুতেষু তু॥
> গান্ধারশ্চ নিষাদশ্চ কর্ত্তব্যৌ করুণে রসে।
> ধৈবতশ্চৈব কর্ত্তব্যো বীভৎসে সভয়ানকে॥
> ত্রীণি স্থানান্যুরঃকণ্ঠশিরাংসীতি ভবন্ত্যপি।
> শারীর্যামথ বীণায়াং ত্রিভ্য স্থানেভ্য এব চ॥
> উরসঃ শিরসঃ কণ্ঠাৎ স্বরঃ কাকুঃ প্রবর্ততে।
> আভাষণং তু দূরস্থে শিরসা সংপ্রযোজয়েৎ॥[১৪]

একথা ঠিক যে ভরত নাট্যের উপযোগী সঙ্গীতের বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন ২৮শ থেকে ৩৩শ অধ্যায়গুলিতে। কিন্তু স্বরনাম, তাদের রসানুযায়ী ব্যবহার, স্বরোচ্চারণের স্থান ও এমন কি পাঠ্য বা সাহিত্যে ব্যবহৃত উদাত্তাদি স্বরের তিনি আগেই উল্লেখ করেছেন দেখা যায়। ভরত ২৮শ অধ্যায়ে জাতি, জাতিগান বা জাতিরাগগান এবং ৩২শ অধ্যায়ে বিভিন্ন ধ্রুবাগীতির আলোচনায় রাগ ও গানের বর্ণ, অলংকার, মূর্ছ্না, রস ও ভাব প্রভৃতির বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু লৌকিক ও উদাত্তাদি স্থানস্বরগুলির বিশেষ কোন পরিচয় দেন নি। একোনবিংশ (১৯শ) অধ্যায়ে পাঠ্যের প্রসঙ্গে তাই স্থানস্বরগুলির প্রকৃতি ও প্রয়োগের কথা

১৪। নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ১৯।২৮-৪১; কাব্যমালা-সংস্করণ ১৭।৯৯-১০১; বরোদা সং ১৭।১০২-১০৭

তিনি আলোচনা করেছেন বলে মনে হয়। স্বরগুলির উচ্চারণে ও প্রয়োগে রস ও ভাবের ব্যঞ্জনাই কাব্যের আবৃত্তি ও গানের বিকাশকে প্রাণবান করে। স্বরোচ্চারণের গতি, ভঙ্গি বা ধারাই মানুষের মনে বা অন্তরে রসের সৃষ্টি করে। রস সৃষ্টি করে ভাব ও তার অভিব্যক্তি। রস-সৃষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখে স্বরালাপ ও গান করা শিল্পীমাত্রেরই কর্তব্য।

আচার্য অভিনবগুপ্ত 'অভিনবভারতী'-টীকায় উল্লেখ করেছেন কাব্যমাত্রেই পাঠ্য, তবে সেই কাব্য ষড়্‌জাদি সাত স্বর, চার বর্ণ, ছ'টি অলংকার, দু'রকম কাকু ও মন্দ্রাদি তিন স্থানযুক্ত হওয়া উচিত। স্বরগত রক্তি বা মাধুর্য-সংযুক্ত হ'লে তবে পাঠ্য 'গান' নামে অভিহিত হয়: "যদি হি স্বরগতা রক্তিঃ পাঠ্যে প্রাধান্যেনাবলম্ব্যেত তদা গানক্রিয়াগৌ স্যাৎ, ন পাঠঃ"।

চার বর্ণ বলতে নাট্যশাস্ত্রকার উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত ও কম্পিত বলেছেন।[১৫] পাঠ্যে স্বরোচ্চারণ-রূপ চারটি বর্ণই বিশেষ উপযোগী। জাতি-রাগের বেলায় চার বর্ণ বলতে তিনি আবার আরোহী, অবরোহী, স্থায়ী ও সঞ্চারীর কথা বলেছেন: "আরোহী চাবরোহী চ স্থায়িসঞ্চারিণৌ তথা, বর্ণাশ্চত্বার এবৈতে অলংকারাস্তদাশ্রয়া"।[১৬] ভরত উদাত্তাদি চার বর্ণেরও রসস্ফূর্তির কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন, স্বরিত ও উদাত্ত থেকে হাস্য ও শৃঙ্গার রস-দু'টির বিকাশ, উদাত্ত ও কম্পিত থেকে বীর ও রৌদ্রের এবং অনুদত্ত, স্বরিত ও কম্পিত থেকে করুণ, বীভৎস ও ভয়ানক রসের স্ফূর্তি হয়। অভিনবগুপ্ত রসের সঙ্গে ষাড়্‌জী প্রভৃতি জাতিরাগগুলিকে সম্পর্কিত ক'রে উদাত্তাদি বর্ণের সহযোগে গান করতে বলেছেন এবং এটাই নাকি তাঁর মতে "তত্র হাস্যশৃঙ্গারয়োঃ" প্রভৃতি পাঠের অর্থ। তিনি উল্লেখ করেছেন: "এবং শৃঙ্গারবীরাদিষু ত্রিষু ষাড়্‌জ্যা আর্ষভ্যা বা স্বাংশং গৃহীত্বা তত্রৈবোদাত্তকম্পিতৈঃ পাঠঃ, করুণে নিষাদিবত্যা গান্ধার্যা বা স্থায়িনমালম্ব্যানুদাত্তেন পাঠঃ, বীভৎসে ধৈবত্যাংশস্বরাশ্রয়েণ স্বরিতকৃতঃ (পাঠঃ)। ভয়ানকে তৎস্বরাবলম্বনেনৈব (ধৈবতাংশ) কম্পিতপ্রধানঃ (পাঠঃ)—ইত্যেবং ভবিষ্যৎ (অধ্যায় ২৯) জাতিবিনিয়োগানুসারিস্বরানুবাদেন বর্ণেষূদাত্তাদিষু তাৎপর্যং, ন তু স্বরেষু।"[১৭]

১৫। উদাত্তশ্চানুদাত্তশ্চ স্বরিতঃ কম্পিতস্তথা।
বর্ণাশ্চত্বার এব স্যুঃ পাঠ্যযোগে তপোধনাঃ। —নাট্যশাস্ত্র (বরোদা সং) ১৭।১০৯

১৬। নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ২৯।১৯-২০

১৭। নাট্যশাস্ত্র (বরোদা-সংস্করণ), ২য় ভাগ, পৃঃ ৩৯০-৩৯১

সাকাংক্ষা ও নিরাকাঙ্ক্ষা ভেদে দু'টি কাকুর কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। অভিনবগুপ্ত বলেছেন : "এবংভূতো যঃ ক্রিয়াবিশেষণত্বেন বাক্যে পঠ্যমানে ধ্বনিধর্মবিশেষঃ সা কাকুঃ"। ক্রিয়াবিশেষণ বলতে তিনি উল্লেখ করেছেন : "তথা বর্ণা উদাত্তাদয়োঽলংকারাশ্চোচ্চনীচদীপ্তাদয়োঽপরিসমাপ্তা অর্থস্পৃষ্টতয়ৈব ত্যক্তা যত্রেতি ক্রিয়াবিশেষণম্"। কাব্যই যে পাঠ্য এই সম্বন্ধে বলতে গিয়ে অভিনবগুপ্ত আবার উল্লেখ করেছেন : "ষড়্‌লংকারসংযুতমিতি" প্রভৃতি। ভরত সেই ছ'টি অলংকারের পরিচয়-প্রসঙ্গে বলেছেন,

অথ ষড়লঙ্কারা নাম—
উচ্চো দীপ্তশ্চ মন্দ্রশ্চ নীচো দ্রুতবিলম্বিতৌ।
পাঠ্যস্যৈতে হ্যলঙ্কারাঃ লক্ষণঞ্চ নিবোধত ॥

ভরত এদের বিস্তৃত পরিচয়ও দিয়েছেন।[১৮] এই অলঙ্কারগুলি কাকুরই শ্রেণীভুক্ত। নাট্যশাস্ত্রের ৪৬ থেকে ৫৮ শ্লোকগুলিতে[১৯] নাট্যানুষ্ঠানে প্রয়োগের উপযোগী ('কর্তব্যা কাকুর্নাট্যপ্রয়োক্তৃভিঃ') উচ্চাদি অলংকার বা কাকুভেদগুলির ব্যবহার আছে। নাটকের কাব্যে বা পাঠ্যেই এ'গুলির ব্যবহার হয়। কিন্তু স্বর ও স্থানযুক্ত গানেও এদের ব্যবহার ছিল। গানে ও পাঠ্যে বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত লয়-তিনটির প্রয়োগ রসানুযায়ী হ'ত। যেমন হাস্য ও শৃঙ্গার রস-দু'টির স্ফূর্তির জন্য মধ্য, করুণের জন্য বিলম্বিত এবং বীর, রৌদ্র, অদ্ভুত, বীভৎস ও ভয়ানক রসগুলির জন্য দ্রুত লয়ের ব্যবহার হ'ত। কাকুর বেলায়ও রস-সঙ্গতির উপযোগিতা ছিল।[২০] কাজেই দেখা যায় ভরত নাট্যের সাহিত্যে বা পাঠ্যের ওপর এবং গানে রসের ব্যবহারিক প্রয়োগের ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। মোটকথা অভিনয়ে ও সঙ্গীতে মানুষের অন্তরে রসানুভূতির সার্থকতাকেই তিনি বেশী ক'রে দেখেছেন, গতানুগতিক প্রাণহীন প্রচেষ্টার সমাদর দেন নি।

ভরত নাটকের দশ রূপ বা দশটি বিভাগের প্রসঙ্গে জাতি, শ্রুতি এবং ষড়্‌জ ও মধ্যম গ্রাম-দু'টির কথা বলেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন : জাতি ও শ্রুতি যেমন গ্রাম সৃষ্টি করে তেমনি বিচিত্র বৃত্তি কাব্যবন্ধ বা নাটক

১৮। নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ১৯।৪৬

১৯। নাট্যশাস্ত্র (কাশী-সংস্করণ) ১৯ অধ্যায়।

২০। 'অভিনবভারতী'-টীকায় অভিনবগুপ্ত উল্লেখ করেছেন : "বিস্ময়াবগতৌ তু সৈব রসকাকুঃ, পরস্য ত্রাসনাভিপ্রায়েণ তু সৈব বিভাবকাকুঃ। * * সৈষে কাকুর্বিরূপতামেতি—স্বচিত্তবৃত্ত্যর্পণাত্রসকাকুঃ, পরস্য রূপোৎপাদনাদ্বিভাবকাকুঃ।"

তৈরী করে। ষড়্জ ও মধ্যম গ্রামদু'টিতে যেমন সকল স্বরেরই সমাবেশ থাকে তেমনি নাটক ও প্রকরণে সকল বৃত্তি থাকে।[২১] জাতি, শ্রুতি ও গ্রাম সম্বন্ধে ভরতের বিবৃতি আর বিশেষ-কিছু না থাকলেও অভিনবগুপ্ত ভরতের মর্মকথা বিস্তৃতভাবে তাঁর অভিনবভারতীতে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন: "স্বরেষু গ্রহাদিদশকবিভাগনিয়তা জাতিঃ। রক্তোঽরক্তো বা ধ্বনিঃ, ধ্বনিঃ স্থানং তদন্তরালং চ শ্রুতিঃ, কর্মাধিকরণ-করণব্যুৎপত্ত্যাশ্রয়াৎ। * * তত্র ষাড়্জীপ্রভৃতয়ো জাতয়ঃ সপ্ত, পঞ্চমস্য চতস্রঃ শ্রুতয়ো, ধৈবতস্য তিস্রঃ ইতি ষড়্জগ্রামঃ। গান্ধার্যাদ্যা একাদশজাতয়ঃ, পঞ্চমাস্ত্রিশ্রুতিঃ ধৈবতস্তু চতুঃশ্রুতিরিতি মধ্যমগ্রামঃ। বস্তুতস্তু ষড়্জাদিস্বরসমুদায়ো গ্রামঃ। তত্র স্বরা ইতি শ্রুতিপক্ষে বহুবচনং লক্ষ্যবিদঃ সমর্থয়ন্তি—মধ্যমগ্রামে পঞ্চমপরিত্যক্তাং শ্রুতিং ধৈবত এবোপভুঙক্তে ইত্যত্র প্রমাণাভাবাৎ সর্ব এব দ্বিত্রিশ্রুতিকাঃ (শ্রুত্যুৎকৃষ্টত) যা সমধিকশ্রুতয়ঃ ক্রিয়ন্তে, কাকল্যন্তরাভ্যাং চ চতুস্ত্রিশ্রুতয়ো ন্যূনশ্রুতয় ইতি সর্বস্বরাণাং শ্রুতিকৃতং বৈচিত্র্যমস্তীতি। * * যথান্যঃ ষড়্জগ্রামোঽন্যো মধ্যমগ্রামঃ, * *। যথা চতুঃশ্রুতিঃ পঞ্চমস্ত্রিশ্রুতিশ্চ ভবন্ গ্রামান্তত্বং করোতি তথা সৈব বৃত্তিঃ শ্রুতিস্থানীয়ৈরঙ্গৈঃ ক্বচিৎসংপূর্ণা ক্বচিন্ন্যূনেত্যেবমপি রূপকবিভাগ ইত্যেতজ্জাতিভিঃ শ্রুতিভিরিতি দ্বয়েন দর্শিতম্।"[২২]

নাট্যশাস্ত্রের ২৮শ অধ্যায়ে সঙ্গীত তথা নৃত্য-গীত-বাদ্যের আরো সুষ্ঠু ও প্রণালীবদ্ধভাবে ভরত অবতারণা করেছেন। নাট্যশাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে "গানং বাদ্যং", "গীতবাদিত্রতালেন", "গীততাললয়ান্বিতম্", "গান্ধর্ব-স্বরতালয়োঃ", "নৃত্তবাদিত্রগীতাঢ্যং", "ধ্রুবানাট্যপ্রয়োগে তু", "গানং নাট্যকৃতং তথা", গীতবাদিত্রভূয়িষ্ঠং" প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ থাকলেও ২৮শ থেকে ৩৩শ অধ্যায়গুলিতেই বিধিবদ্ধভাবে ও বৈজ্ঞানিকী ধারা অনুযায়ী গান্ধর্বতত্ত্বের অনুশীলন করা হয়েছে। অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের প্রথমেই আতোদ্যের পরিচয় দিয়ে ভরত উল্লেখ করেছেন: আতোদ্যবিধিমিদানীং ব্যাখ্যাস্যামঃ। তদ্ যথা—"। তিনি

২১। জাতিভিঃ শ্রুতিভিশ্চৈব স্বরা গ্রামত্বমাগতাঃ।
যথা যথা বৃত্তিভেদৈঃ কাব্যবন্ধা ভবন্তি হি।
গ্রামৌ পূর্ণস্বরৌ দ্বৌ তু তথা বৈ ষড়্জমধ্যমৌ।
সর্ববৃত্তিবিনিষ্পন্নৌ কাব্যবন্ধে তথা দ্বিমৌ।
—নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ২০।২-৬, বরোদা সং ১৮।৫-৬

২২। নাট্যশাস্ত্র (বরোদা সং), ২য় ভাগ, পৃঃ ৪০৭

তত, অবনদ্ধ, ঘন ও সুষির এই চার রকম বাদ্যশ্রেণীর উল্লেখ ক'রে তাদের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন: তন্ত্রীযুক্ত (বীণাদি) বাদ্যযন্ত্রকে 'তত', মৃদঙ্গশ্রেণীর পুষ্করাদিকে 'অবনদ্ধ', তাল দেবার (করতালাদি) বাদ্যযন্ত্রকে 'ঘন' ও বংশ ও বেণু প্রভৃতিকে 'সুষির' বলে। অবশ্য নাটকের প্রসঙ্গে ভরত নাট্যোপযোগী 'সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত' সৃষ্টির জন্য এ'সকল বাদ্যযন্ত্রের নামোল্লেখ করেছেন।[২৩] অভিনয়ের অঙ্গ হিসাবেই সমবেত বাদ্যযন্ত্রের সমাবেশ। ভরত এর নাম দিয়েছেন 'কুতপবিন্যাস'। কুতপের অর্থ তিনি নিজেই ভিন্ন ভিন্ন রকম ভাবে করেছেন তা আগেই উল্লেখ করেছি। যেমন চার শ্রেণীর বাদ্যকে (বাদ্যের সমবেত রূপকে) তিনি কুতপ বলেছেন।[২৪] আবার গায়ক ও বাদকদের বৃন্দকেও তিনি কুতপ বলে উল্লেখ করেছেন। তবে 'চতুর্বিধং আতোদ্যং কুতপং' কথাগুলিই বোধহয় 'কুতপ'-শব্দের আসল পরিচায়ক। অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে কুতপের বর্ণনাও তাই। ভরত উল্লেখ করেছেন বৈপঞ্চিক বীণাবাদক, বংশবাদক, মৃদঙ্গ, পণব ও দর্দুরবাদক প্রভৃতি শিল্পীদের সমাবেশকে 'কুতপবিন্যাস' বলে,

ততঃ কুতপবিন্যাসো গায়নঃ সপরিগ্রহঃ।
বৈপাঞ্চিকো বৈণিকশ্চ বংশবাদক এব চ॥

২৩। ততং চৈবাবনদ্ধং চ ঘনং সুষিরমেব চ।
চতুর্বিধং তু বিজ্ঞেয়মাতোদ্যং লক্ষণান্বিতম্॥
ততং তন্ত্রীগতং জ্ঞেয়মবনদ্ধং তু পৌষ্করম্।
ঘনং তালস্তু বিজ্ঞেয়ঃ সুষিরো বংশ উচ্যতে॥
প্রয়োগস্ত্রিবিধো হ্যেষা বিজ্ঞেয়ো নাটকাশ্রয়ঃ।
—নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ২৮।১-৩

সঙ্গীত-রত্নাকরে (বাদ্যাধ্যায়ে) শার্ঙ্গদেবও এই চারশ্রেণীর বাদ্যের পরিচয়-প্রসঙ্গে বলেছেন,

ততত্তং সুষিরং চাবনদ্ধং ঘনমিতি স্মৃতম্।
চতুর্ধা তত্র পূর্বাভ্যাং শ্রুত্যাদিদ্বারতো ভবেৎ॥ ৬।৪

সিংহভূপাল এগুলি ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন: "তন্ত্র্যা ততং বিস্তারিতং ততমিত্যুচ্যতে। সুষিরং সচ্ছিদ্রং বংশাদি। চর্মণা অবনদ্ধং পিহিতং বদনং মুখং যস্য তদবনদ্ধম্। ঘনো মূর্তিরুচ্যতে। তন্ত্রী চর্মাদিহীনং কাংস্যাদিঘটিতমিত্যর্থঃ। সা মূর্তিঃ অভিঘাতাৎ যত্র ধ্বন্যতে বাদ্যতে তদ্ঘনমিতি।"

২৪। "কুত্তং শব্দং পাতীতি চতুর্বিধমাতোদ্যং কুতপম্। তৎপ্রয়োক্তৃজাতঞ্চ তস্য বিশেষণা-ব্যবস্থাপকানাং তত্র বিশেষেণ ন্যাসো যথাযোগং স্বরতাললয়কলাদিনিবেশনম্। স এব প্রত্যাহারাদি-রাসারিতক্রিয়ান্তঃ পরিপূর্ণো বিন্যাসঃ।"—অভিনবভারতী (৪।২৭৮)

মার্দঙ্গিকঃ পাণবিকস্তথা দর্দুরিকো বুধৈঃ।
অনাবিদ্ধবিধাবেষ কুতপঃ সমুদাহৃতঃ ॥

শার্ঙ্গদেব কুতপকে পুষ্কর বা মৃদঙ্গশ্রেণীর মধ্যে একটি প্রধান বাদ্যযন্ত্র বলেছেন: "কুতপে ত্ববনদ্ধস্য মুখ্যো মার্দঙ্গিকস্ততঃ"। বরাট, লাট, কর্ণাট, গৌড়, গুর্জর, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, চোল, মালব, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশের লাস্য ও তাণ্ডব-তত্ত্ববিদ্‌রা নাট্যকুতপের নাম বর্ণনা করেছেন। শার্ঙ্গদেব উল্লেখ করেছেন,

বরাটলাটকর্ণাটগৌড়গুর্জরকোঙ্কণৈঃ।

* * * *

অঙ্গহারপ্রয়োগজ্ঞৈর্লাস্যতাণ্ডবকোবিদঃ।

* * * *

নাট্যস্য কুতপঃ পাত্রৈরুত্তমাধম মধ্যমৈঃ।

ভরতের অভিমতও তাই এবং ভরতকে অনুসরণ ক'রে শার্ঙ্গদেব নাট্যকুতপের বর্ণনা করেছেন। নাট্য বা অভিনয়ের জন্য নির্দিষ্ট কুতপের নাম 'নাট্যকুতপ'। ভরত নাট্যশাস্ত্রে এই নাট্যকুতপের উল্লেখ ক'রে বলেছেন (২৮।৬),

উত্তমাধমমধ্যাভিস্তথা প্রকৃতিভির্যুতঃ।
কুতপো নাট্যযোগেঽত্র নানাদেশসমাশ্রয়ঃ ॥

উত্তম, মধ্যম ও অধম পাত্রভেদে কুতপও তিনশ্রেণীতে বিভক্ত। সিংহভূপাল এর উল্লেখ ক'রে বলেছেন: "এতেষাং চ পাত্রাণামুত্তমমধ্যমাধমত্বেন কুতপস্যাপি ত্রৈবিধ্যম্"। তিনটি কুতপের একত্র সমাবেশের নাম 'বৃন্দ' বলেছেনঃ "কুতপানামমীষাং তু সমূহো বৃন্দমুচ্যতে" (—শার্ঙ্গদেব)। সিংহভূপাল 'বৃন্দ' অর্থে বলেছেন 'সমূহ' বা সংঘাত: "সংঘাতঃ সমূহো বৃন্দমিত্যুচ্যতে"। বৃন্দ আবার বিচিত্র রকমের, যেমন কুতপবৃন্দ, বংশিকাবৃন্দ, গায়নীবৃন্দ, কোলাহলাখ্য-বৃন্দ প্রভৃতি। কুতপ-বৃন্দও আবার তিন রকম। শার্ঙ্গদেব কুতপের প্রসঙ্গে মুনি ভরতের নামোল্লেখ করেছেন: "আহ বৃন্দবিশেষং তু কুতপং ভরতো মুনিঃ"। এ' থেকে নাট্যশাস্ত্রের রচয়িতা মুনি ভরত নামে ঐতিহাসিক একজন ব্যক্তি যে ছিলেন একথা শার্ঙ্গদেব অবশ্যই জানতেন; আর ভরত যে তত, অবনদ্ধ ও নাট্য এই তিন রকম শ্রেণীর কুতপবৃন্দ স্বীকার করতেন[২৫] সে বিষয়েও শার্ঙ্গদেব পরিচিত ছিলেন।

২৫। ততস্য চাবনদ্ধস্য নাট্যস্যেতি ত্রিধা চ সঃ।।২১২

বৃন্দের চাক্ষুষ রূপের পরিচয় দিতে গিয়ে শার্ঙ্গদেব বলেছেন গায়ক ও বাদকদের সমবেত মিলনকেই 'বৃন্দ' বলে ও তা উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে তিন রকম।[২৬] যে বৃন্দে চারজন মূলগায়ক, আটজন সমগায়ক, চারজন বংশীবাদক ও চারজন মৃদঙ্গবাদক থাকত তাকে উত্তমবৃন্দ বলা হ'ত।[২৭] যে বৃন্দে মূলগায়ক দু'জন, সমগায়ক চারজন, বংশীবাদক দু'জন ও দু'জন মৃদঙ্গী থাকত তাকে মধ্যমবৃন্দ বলা হ'ত। কনিষ্ঠ বা অধমবৃন্দে থাকত একজন মূলগায়ক, তিনজন সমগায়ক, দু'জন বংশীবাদক ও দু'জন মৃদঙ্গী।[২৮] এভাবে গায়নীবৃন্দের মধ্যে উত্তমবৃন্দে থাকত দু'জন মূলগায়ক, দশজন সমগায়ক, দু'জন বংশীবাদক ও দু'জন মৃদঙ্গ। মধ্যম গায়নীবৃন্দ তৈরী হ'ত একজন মূলগায়ক, চারজন সমগায়ক, একজন বংশীবাদক ও একজন মৃদঙ্গীকে নিয়ে। কনিষ্ঠ বা অধম গায়নীবৃন্দে থাকত মধ্যমের অর্ধেক। আবার যে বৃন্দে উত্তমবৃন্দের চেয়ে বেশী গায়ক ও বাদকের সমাবেশ থাকত তাকে 'কোলাহল-বৃন্দ' বলা হ'ত।[২৯] সেরকম বাংশিকবৃন্দে থাকত মূল-বংশীবাদক একজন ও সমবংশীবাদক চারজন।[৩০] বৃন্দসজ্জার পরিচয়

২৬। গাতৃবাদকসংঘাতো বৃন্দমিত্যভিধীয়তে।
উত্তমং মধ্যমথো কনিষ্ঠমিতি তৎত্রিধা॥

২৭। চত্বারো মুখ্যগাতারো দ্বিগুণাঃ সমগায়নাঃ।
গায়ন্তো দ্বাদশ প্রোক্তা বাংশিকানাং চতুষ্টয়ম্॥
মার্দঙ্গিকাস্তু চত্বারো যত্র তদ্ বৃন্দমুত্তমম্।

২৮। মধ্যমং স্যাত্তদর্ধেন কনিষ্ঠে মুখ্যগায়নঃ॥
এক স্যাৎসমগতারস্ত্রয়ো গায়নিকাঃ পুনঃ।
চতস্রো বাংশিকদ্বন্দ্বং তথা মার্দলিকদ্বয়ম্॥

২৯। উত্তমে গায়নীবৃন্দে মুখ্যগায়নিকাদ্বয়ম্।
দশ স্যুঃ সমগায়ন্তো বাংশিকদ্বিতয়ং তথা॥
ভবেন্মার্দলিকদ্বন্দ্বং মধ্যমে মুখ্যগায়নী।
একা স্যাৎ সমগায়ক্স্চতস্রো বাংশিকাস্তথা॥
ইতো ন্যূনং তু হীনং স্যাদ্ যথেষ্টমথবা ভবেৎ।
উত্তমাভ্যধিকং বৃন্দং কোলাহলমিতীরিতম্॥

—সঙ্গীত-রত্নাকর ৩।২০৪-২০৯

৩০। এক স্যাদ্বাংশিকো মুখ্যশ্চত্বারোঽস্যানুযায়িনঃ॥
বাংশিকানামিতি প্রায়স্তজ্জৈর্বৃন্দং নিগদ্যতে।

—রত্নাকর (বাদ্যাধ্যায়) ৬।৬৬৭

সিংহভূপাল বলেছেন: একো মুখ্যো বাংশিকাঃ, চত্বারঃ তদনুগতাঃ, এতদ্বাংশিকবৃন্দম্।"

থেকে বোঝা যায়, খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রথম থেকেই সমবেত গানে ও বাদ্যে মূলগায়ক ও মূলবাদকের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য গায়ক ও বাদকরা থাকতেন। বাঙ্গালার শুধু কীর্তনে কেন, রামায়ণ, পাঁচালী, মঙ্গল প্রভৃতি গানেও মূলগায়ক ও সহকারীদের প্রবর্তন ভারতীয় প্রাচীন ধারাকে অনুসরণ ক'রেই চলে আসছে। কীর্তনে মূলগায়ককে যাঁরা সহায়তা করেন তাঁদের 'দোহার' বলা হয়। মূলগায়কের পদগানকে আবৃত্তি ক'রে বিস্তৃত করাই হ'ল তাঁদের কাজ। খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে কুতপবিন্যাসেও এ'ধারা অনুসৃত হ'ত বোঝা যায়। ভরত নাট্যশাস্ত্রের ৫ম অধ্যায়ে রঙ্গপীঠের বর্ণনায় কুতপবিন্যাসের কথা বর্ণনা করেছেন: "কুতপস্য তু বিন্যাসঃ" (৫।১৭)। ভরত ২৮শ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন: "অলাতচক্রপ্রতিমং কর্তব্যং নাট্যযোক্তৃভিঃ" (২৮।৭); অর্থাৎ নাট্যে শিল্পী-বৃন্দকে অলাতচক্রের মতো সাজানো উচিত। একটি প্রজ্জ্বলিত মশালকে সজোরে ঘোরালে আগুনের যে ঋজু, বক্র বা চক্রের মতো আকার হয় তাকে অলাতস্পন্দন বা অলাত বলে। বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদীরা বিজ্ঞানের উপমা দেবার সময় 'অলাত' শব্দ ব্যবহার করেছেন। মাণ্ডুক্য উপনিষদে আচার্য গৌড়পাদ তাঁর কারিকায় বিজ্ঞানের প্রসঙ্গে 'অলাত' শব্দ ব্যবহার করেছেন দেখা যায়, যেমন "অলাতে স্পন্দমানে" (৪।৪৯), "ন নির্গতা অলাতাত্তে" (৪।৫০), "ঋজুবক্রাদিকাভাস-মলাতস্পন্দিতং যথা" (৪।৪৭) প্রভৃতি। অবশ্য ভরত 'অলাত' শব্দের পরিবর্তে 'অলাতচক্র' ব্যবহার করেছেন ও তা থেকে রঙ্গমঞ্চে চক্রাকারে (বা অর্ধ-চক্রাকারে) গায়ক, বাদক ও নর্তকদের সাজাবার কথা ইঙ্গিত করেছেন। গৌড়পাদের "ঋজুবক্রাদিকাভাসমলাতস্পন্দিতং" প্রভৃতির আভাসের মতো বিভিন্ন আকারে (বা প্রকারে) শিল্পী-সমাবেশের ইঙ্গিতও অলাতচক্র শব্দটিতে নিহিত আছে।

নাট্যারম্ভ ও শিল্পী-সমাবেশের প্রসঙ্গে ভরত নাট্যশাস্ত্রের পঞ্চম অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে যবনিকা উত্তোলন বা অপসারণের পর বাদ্যযন্ত্রে রাগালাপের (জাতিরাগ) সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য ও পাঠ্যের (গানের) অনুষ্ঠান হ'ত। পরে মদ্রক, বর্ধমানক বা বর্ধমানাদি গীতি ও তাণ্ডবনৃত্য হ'ত। ভরত উল্লেখ করেছেন,

বিঘট্য বৈ যবনিকাং নৃত্যপাঠ্যকৃতানি তু।
গীতানাং মদ্রকাদীনাং যোজ্যমেকং তু গীতকম্।
বর্ধমানমথাপীহ তাণ্ডবং যত্র যুজ্যতে॥

মদ্রক প্রকরণাখ্য সাতটি গীতির অন্যতম। এককল, দ্বিকল ও চতুষ্কল ভেদে

মদ্রক তিনশ্রেণীর ছিল। এককল মদ্রকে আটটি গুরু, আটটি লঘু ও একটি বস্তু বা অংশ থাকে। মদ্রকাদি গীতের সাধারণ লক্ষণ হ'ল: যে রাগ (গ্রামরাগ বা উপরাগ তথা ভাষারাগ) গান করা হয় তার কারণ-রূপ জাতিরাগে, অংশস্বরে বা বস্তুতে ন্যাস বা সমাপ্তি হয়।[৩১] এছাড়া চতুর্বস্তু ও ত্রিবস্তুভেদে মদ্রক পুনরায় দু'রকম ছিল: "দ্বিবিধং মদ্রকং তত্র চতুর্বস্তু ত্রিবস্তু চ" (৩১।২৮৮)। বর্ধমানগীতি আসারিতগীতি থেকে সৃষ্ট: "আসারিতেভ্য উৎপন্নং বর্ধমানং বিবক্ষতে" (৫।২১৫)।[৩২] আসারিতগীতি ছাড়া আসারিতনৃত্যও ছিল। হরিবংশে সঙ্গীতের বর্ণনায় আমরা আসারিতনৃত্যের উল্লেখ করেছি। আসারিতগীতির মতো বর্ধমানগীতিও অক্ষর, দ্বিকল ও চতুষ্কলভেদে তিনভাগে বিভক্ত। ভরত মার্গভেদে ছ'রকম বর্ধমানের উল্লেখ করেছেন। কল্লিনাথ সঙ্গীত-রত্নাকরের টীকায় বিস্তৃতভাবে আসারিত ও বর্ধমান গীতি-দু'টির পরিচয় দিয়েছেন। মার্গভেদে ছ'রকম বর্ধমানের (গীতি) পরিচয় দেবার প্রসঙ্গে কল্লিনাথ বলেছেন: "মার্গভেদবশাৎ ষট্‌প্রকারাণি ভবন্তি। যথা প্রথমোক্তান্যেব বর্ধমানানি যানি ন বিস্তন্তে তানি দক্ষিণে যথাক্ষরাণীত্যেকঃ প্রকারঃ। অত্রৈব দ্বিকলানীতি দ্বিতীয়ঃ। তত্রৈব চতুষ্কলানীতি তৃতীয়ঃ। বার্তিকে যথাক্ষরাণীতি চতুর্থঃ। তত্রৈব দ্বিকলানীতি পঞ্চমঃ। চিত্রে যথাক্ষরাণীতি ষষ্ঠঃ। এবং নবানং ষট্‌প্রকারত্বে চতুষ্পঞ্চাশদ্বর্ধমানানি ভবন্তি"। কল্লিনাথ শার্ঙ্গদেবকে অনুসরণ করলেও তাঁর আলোচনা বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মূলভিত্তি কিন্তু নাট্যশাস্ত্র। ভরত তাণ্ডব-পর্যায়ে (৪র্থ অধ্যায়) বর্ধমান বা বর্ধমানক গীতির-উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

বর্ধমানকমাসাদ্যং সং প্রবক্ষ্যামি লক্ষণম্।
কলানাং বৃদ্ধিমাসাদ্য হ্যক্ষরাণাং চ বর্ধনাৎ॥
বর্ধনান্নর্তকীনাং চ বর্ধমানকমুচ্যতে।

কলার সঙ্গে সঙ্গে অক্ষরবৃদ্ধিই হ'ল বর্ধমানগীতির একটি লক্ষণ। অভিনবগুপ্ত এটির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে অভিনবভারতীতে উল্লেখ করেছেন: "বর্ধমানকগীত-তালাভিনয়সম্বন্ধতয়োদিতং তাণ্ডবং বক্ষ্যতীতি যাবৎ। * * সপ্তদশকলঃ কনিষ্ঠাসারিতকঃ। স এব দ্বিগুণলয়ো লয়ান্তরঃ, ত্রয়স্ত্রিংশৎকলো মধ্যমঃ, পঞ্চষষ্টিকলো

৩১। মদ্রকগীতির বিস্তৃত পরিচয় সঙ্গীত-রত্নাকর ৫ম তালাধ্যায় ১১, ৬১-৮৬ দ্রষ্টব্য।

৩২। আসারিতেষু গীতেষু বর্ধমানেষু চৈব হি।
আসারিতানাং সংযোগো বর্ধমানক ইষ্যতে।

এর পৌরাণিক সৃষ্টি-রহস্যও ভরত নাট্যশাস্ত্রের ৩১।২২৬-২২৯ শ্লোকগুলিতে বর্ণনা করেছেন।

জ্যেষ্ঠঃ। তেন কলানাং লয়দ্বারেণ সংখ্যাদ্বারেণ চ বৃদ্ধিঃ। তদ্বৃদ্ধৈব চ হীয়মানপদবৃত্তি (দ্ধি ?)-রাক্ষিপ্তা, যদ্বক্ষ্যতে—'চত্বারস্তু গণা যুগ্মে গুঙ্গ' ইত্যাদি (৩১।১০২)। ইহ ত্বক্ষরাণি, তেষাং বৃদ্ধিঃ কলানুসারেণৈব ; নর্তকীণাং চ বৃদ্ধিঃ, একা হি প্রথমাসারিতে নৃত্তপ্রযোক্ত্রী, দ্বিতীয়ে দ্বে ইত্যাদিক্রমেণ। অতো বৃদ্ধিযোগাদ্বর্ধমানকম্ [ততঃ] সংজ্ঞায়াং কন্। কণ্ডিকানাং চ দশপরিবর্তক্রমো ভবিষ্যতি। প্রয়োগে তথা যথাক্ষরং বিনিবৃত্তমিত্যপি যো ভেদো ভবিষ্যতি, তেনাপি ক্রমেণ কলাদীনাং বৃদ্ধিঃ"।

এরপর কুতপবিন্যাস ক'রে আসারিতক্রিয়ার অনুষ্ঠান: "কৃত্বা কুতপবিন্যাসং * *, আসারিতপ্রয়োগস্তু ততঃ কার্যঃ প্রযোক্তৃভিঃ" (৪।২৭৮-২৭৯)। কুতপবিন্যাসকে প্রত্যাহারও বলে: "কুতপস্য তু বিন্যাসঃ প্রত্যাহার ইতি স্মৃতঃ"। বিচিত্র বাদ্যযন্ত্রের সমাবেশের (সাজানোর) নাম কুতপবিন্যাস একথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। তারপর অবতরণ, আরম্ভ, আশ্রাবণা, বক্ত্রপাণি, পরিঘট্টনা, সংঘোটনা, মার্গাসারিত, আসারিত, গীতিবিধি, উত্থাপন, পরিবর্তন, নান্দী প্রভৃতির অনুষ্ঠান হ'ত। গায়কদের নিবেশন বা তাদের আসন গ্রহণের নাম 'অবতরণ': "তথাবতরণং প্রোক্তং গায়কানাং নিবেশনম্"। অভিনবগুপ্ত অভিনবভারতীতে উল্লেখ করেছেন 'নিবেশন' বলতে অনেকে মন্দ্রাদি স্থান ও ষড়্জাদি স্বরের প্রয়োগ বলেন। নিবেশনে ঋগাদি সাতটি শুদ্ধগীতি গান করা হ'ত। শার্ঙ্গদেব তালাধ্যায়ে প্রকরণাখ্য-গীতপ্রকরণে মদ্রকাদি সাতটি ও ঋগাদি সাতটি এই চৌদ্দটি গীতির পরিচয় দিয়েছেন। ঋক্, গাথা, পাণিকা, সামাদি সাতটি গীতি। এগুলি সামগানোত্তর ব্রহ্মগীতি নামে পরিচিত: "তান্যেব ব্রহ্মগীতানি"। এ'সম্বন্ধে পূর্বেও আমরা আলোচনা করেছি। অভিনবগুপ্ত ঋগাদি সাতটি গীতির প্রসঙ্গে বলেছেন: "তথা চ সপ্তস্বরপরিগ্রহোঽবতরণাদৌ ঋগিত্যাদিরূপাঙ্গসপ্তকেন শুদ্ধসপ্তকগীতিস্তু প্রযোজ্যমিতি"। 'নিবেশন' অর্থে ঋক্, গাথা, পাণিকা প্রভৃতি সাতটি গীতিবিশেষজ্ঞ গায়কদের বসানো হ'ত। কণ্ঠসঙ্গীতের অবতারণার নাম 'আরম্ভ': "পরিগীতক্রিয়ারম্ভ আরম্ভ ইতি"। আরম্ভের প্রসঙ্গে অভিনবগুপ্ত ত্রিসাম প্রয়োগের কথা বলেছেন। প্রয়োগ বলতে এখানে 'প্রয়োগক্রম'। তিনি বলেছেন: "পূর্বং রঞ্জকবর্গঢৌকনং ততো গেয়েমেব তদ্গীতস্যোপরঞ্জকস্য প্রাধান্যাৎ। তস্য চ বিম্বভূতং শারীরং শারীরস্বরাণাং মূলভূতত্বাৎ। তদনুসন্ধানায়ালাপাখ্য আরম্ভঃ"। বাদ্যযন্ত্রগুলিকে নাট্যের উপযোগী ক'রে সাজানোর নাম 'আশ্রাবণা': "আতোদ্যরঞ্জনার্থং তু

ভবেদাশ্রাবণাবিধিঃ"। গানের অনুসঙ্গী হিসাবে তালের প্রয়োজন, তাই বাদ্য যন্ত্রাদির সমাবেশের দরকার। অভিনবগুপ্ত বলেছেন: "ততোঽপি মানরূপতাল-প্রধানসর্বাতোদ্যগর্ভতানুসন্ধানমাসমন্তাচ্ছ্রাবয়তীত্যাশ্রাবণা"। বাদ্যযন্ত্রগুলিকে বিচিত্র বৃত্তিতে (বাদন-পদ্ধতিতে) ভাগ করার নাম 'বক্ত্রপাণি': "বাদ্যবৃত্তিবিভাগার্থং বক্ত্রপাণির্বিধীয়তে"। প্রথমে হস্তাঙ্গুলির কাজ ও পরে বৃত্তিভাগ। পরিঘট্টনার সময় বীণাদি বাদ্যযন্ত্রের তন্ত্রী বা তারগুলিকে গায়কের গলার স্বরের উপযোগী ক'রে বাঁধা হ'ত: "বৃত্তিবিভাগগতশুষ্কপ্রয়োগানুসন্ধানাদ্ ব্যাপারঘট্টনা, ঘট্ট চলন ইতি পাঠাৎ"। এর পর পাণিবিভাগের নাম 'সংঘোটনাবিধি'। বীণাবাদ্যের সহায়ক হিসাবে অবনদ্ধজাতীয় বাদ্যযন্ত্রগুলিকে পঞ্চপাণি হিসাবে ভাগ করা হ'ত: "পশ্চাদ্বীণাবাদ্যোপজীবকত্বাদবনদ্ধস্যানুসন্ধানসংবাদ্যাদিনা প্রহারপঞ্চকযোগেন ক্রিয়ত ইতি সংঘোটনা"। 'ঘুট' শব্দে পরিবর্তন। এর পর মার্গাসারিতের[৩৩] অনুষ্ঠান হ'ত। পুষ্কর বা মৃদঙ্গ ও বীণা একসঙ্গে সমতালে সমান লয়ে বাজানোর নাম 'মার্গাসারিত'। ভরত বলেছেন: "তন্ত্রীভাণ্ডসমাযোগাৎ"। তন্ত্রী অর্থে বীণা ও ভাণ্ড অর্থে পুষ্কর বা মৃদঙ্গ। "তন্ত্রীগান সমন্বিতম্" (৪।২৭৯) বা "ভাণ্ডবাদ্যসমন্বিতঃ" (৪।২৮০) প্রভৃতি শব্দেরও ব্যবহার দেখা যায় উপোহনের পর নর্তকীপ্রবেশের সময়। সকল বাদ্যযন্ত্রগুলিকে একসঙ্গে বাজিয়ে ঐক্যতান বাদনপদ্ধতিরও তখন (খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে) প্রচলন ছিল দেখা যায়। অভিনবগুপ্ত এর পরিচয়ে উল্লেখ করেছেন: "ততোঽপি প্রকৃতিমেব যস্মানাম্নুহার্যামুহর্তৃরূপস্য বৈণবপৌষ্করশব্দস্য পরস্পরসংমেলনং কার্যমিতি"। গান, বাদ্য ও নৃত্যের সঙ্গে তাল রক্ষা (কলাপাত) করার নাম 'আসারিত'। আসারিতবিধিতে কলাপাত হিসাবে শম্যাদি তালের প্রয়োগ থাকত। দেবতাদের গুণ ও মহিমাকীর্তন (স্তুতি) ক'রে গান করার নাম 'গীতবিধি'। রঙ্গপীঠের চতুর্দিকে লোকপালদের বন্দনা (গীতি) করার নাম 'পরিবর্তন'। শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকরে এগুলির সামান্যলক্ষণ বর্ণনা করেছেন।[৩৪]

এছাড়া ভরত নির্গীত, সগীত, বহির্গীত এবং মাগধী, অর্ধমাগধী, পৃথুলা ও সম্ভাবিতা গীতিগুলির প্রয়োগের কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন

৩৩। 'মার্গে প্রকৃত্যাদিলক্ষণাদিগোচরে বিকাররূপস্য পুষ্করবাদস্যাসমন্তাৎসারণং গমনং যত্রেতি।' —অভিনবগুপ্ত

৩৪। সঙ্গীত-রত্নাকর (আডেয়ার সংস্করণ), ৩য় ভাগ (তালাধ্যায়), পৃ' ২৬৬-২৭৮ এবং নাট্যশাস্ত্র (কাশী সংস্করণ) ৫ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

পূর্বরঙ্গে বা রঙ্গমঞ্চের বাইরে মাগধী বা অর্ধমাগধী চিত্রামার্গে গান করা হ'ত। মাগধী, অর্ধমাগধী প্রভৃতি নাট্যে বা ধ্রুবায় ব্যবহৃত গীতির বিশদ পরিচয় ভরত, দত্তিল, মতঙ্গ, অভিনবগুপ্ত, শার্ঙ্গদেব প্রভৃতি সঙ্গীতশাস্ত্রীরা দিয়েছেন। নাট্যশাস্ত্রের (বরোদা সং) পঞ্চম অধ্যায়ে ৩২-৪৪ শ্লোকগুলিতে ভরত বহির্গীত ও নির্গীতের পরিচয় দিয়েছেন। 'বহির্গীত' অর্থে অভিনবগুপ্ত বলেছেন : "বহির্গীতশব্দেন দ্বিতীয়ার্ধেন স্তোভকপদযুক্তমাসারিতপ্রয়োগমাহ। তত্রৈব চোচ্যতে"। পূর্বরঙ্গবিধানের প্রথমার্ধে শুষ্ক-অক্ষরের মাধ্যমে আসারিতগীতির প্রয়োগ করা হ'ত ও দ্বিতীয়ার্ধে স্তোভক-পদের মাধ্যমে আসারিত গান করার নাম 'বহির্গীত'। তারপর কুতপশ্রেণীকে একত্রিত করার পর যবনিকা উদ্ঘাটন ক'রে নৃত্য ও মদ্রকাদি গান করার বিধি ছিল।

চিত্রামার্গে মাগধী গান করার অর্থ চিত্রাকলার সাহায্যে মাগধীগীতির প্রয়োগ বোঝায়। চিত্রা, বৃত্তি ও দক্ষিণাভেদে 'কলা' তিন প্রকার। এদের মধ্যে চিত্রায় দু'টি, বৃত্তিতে চারটি ও দক্ষিণায় আটটি কলার সমাবেশ থাকত : "চিত্রে দ্বিমাত্রা কর্তব্যা বৃত্তৌ সা দ্বিগুণা স্মৃতা, চতুর্গুণা দক্ষিণে স্যাৎ"। মাগধী অর্ধমাগধী প্রভৃতি (অভিজাত) দেশীগান। অভিনবগুপ্ত বলেছেন : "মগধদেশোদ্ভবত্বান্মাগধী।" বিদর্ভাদিষু দৃষ্টত্বাৎ সা সমাখ্যেত্যন্যে"। অনেকে মাগধীকে বিদর্ভদেশজাত গান বলেন। সংভাবিতা ও পৃথুলায় মাত্রার ব্যবহার বেশী। মতঙ্গ বৃহদ্দেশীতে এই গীতিগুলির পরিচয়ে বলেছেন : "দ্বিগুরুদ্বিনিবৃত্তা চ চিত্রে গীতিস্তু মাগধী" প্রভৃতি। অভিনবগুপ্ত এ' অর্থ ঠিক স্বীকার করেন নি। তিনি এই চারটি দেশীগীতের মধ্যে চার রকম আলপ্তিভেদ স্বীকার করেছেন। অবশ্য কলা বা মাত্রাভেদ তো থাকেই। এ'চারটি গীতির প্রয়োগ বা ব্যবহার যে কেবল পূর্বরঙ্গেই হ'ত তা নয়, নাট্যেও প্রয়োগ করা হ'ত : "গানযোগে চতস্রস্তু যোজ্যাঃ সর্বত্র গায়নৈঃ"। কলা বা মাত্রা পূরণের জন্য গানে স্তোভাক্ষর বা অর্থহীন অক্ষরেরও ব্যবহার হ'ত। দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত লয়ে গান গাওয়া হ'ত। গানে মৃদঙ্গাদি বাদ্যের সমাবেশ থাকত। মাগধী প্রভৃতি গীতি দেশজাত হ'লেও তারা গান্ধর্বে ব্যবহৃত হ'ত : "গান্ধর্ব এব যোজ্যাস্তু" (২৯।৮০)।

গুরু ও লঘু অক্ষর বা ছন্দ, বিভিন্ন ধাতু, বর্ণ ও অলংকার যুক্ত ক'রে চিত্রাবীণা বাজানো হ'ত। এখানে ধাতু শব্দে অংশ। কিন্তু ধাতুর 'গেয়' অর্থও হয়। শার্ঙ্গদেব বলেছেন : "পূর্বং ধাতুশব্দেন গেয়মুক্তম্"। 'পূর্বং' বলতে খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর আগে 'গেয়' শব্দের অর্থ ছিল প্রবন্ধানুগত ধর্ম : "গেয়ং নাম সকল-

প্রবন্ধানুগতো ধর্মঃ"। এ'থেকে বোঝা যায় নিবদ্ধ প্রবন্ধগান বেশ প্রাচীন, খৃষ্টপূর্বাব্দেও এর প্রচলন ছিল। রামায়ণে শুদ্ধ-সপ্তজাতি বা জাতিরাগগান প্রবন্ধজাতীয় ছিল। পরবর্তীকালে 'ধাতু' শব্দে প্রবন্ধগানের অংশ বা অবয়ব অর্থ করা হয়েছে: "অত্র প্রবন্ধবয়বো বিবক্ষিতঃ"। প্রবন্ধের অবয়ব গেয় বা ধর্মের অংশ-বিশেষ, অর্থাৎ গেয় বা ধর্ম সামান্য (universal) ও অবয়ব বা অংশ বিশেষ (individual)। এদের পরস্পরের মধ্যে জাতি-ব্যক্তি (কারণ-কার্য) সম্বন্ধ। শার্ঙ্গদেব বলেছেন: "প্রবন্ধাবয়বস্ত ধর্মৈকদেশ ইতি তয়োর্ভেদো দ্রষ্টব্যঃ"।

বিশুদ্ধ করণ ও জাতিরাগ অনুযায়ী যন্ত্রসঙ্গীত সৃষ্টি করার রীতি ছিল। মোটকথা বাদ্যযন্ত্রগুলিতে বিশুদ্ধ জাতিরাগের আলাপই অভিব্যঞ্জিত হ'ত। বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে সমতা (তাল বা লয়) রক্ষা ক'রে 'চারী' সম্পন্ন করা হ'ত। ভাবের ওপর জোর দিয়ে বা ভাবাভিব্যক্তির জন্য যখন গান করা হ'ত তখন বাদ্যযন্ত্রের সহযোগ থাকত না। অঙ্গহার-অনুষ্ঠানের সময় পুষ্কর বা মৃদঙ্গ বাজানো হ'ত। মার্গনৃত্যের সময় মৃদঙ্গাদি বাদ্যযন্ত্র সম, রক্ত, বিভক্ত ও স্ফুট স্বরে বাজানো হ'ত।[৩৫] প্রথমে গানের কথা (বস্তু) ভাবের সঙ্গে প্রকাশ করা হ'ত, তারপর সেই গানের ভাব নৃত্যছন্দে রূপায়িত হ'ত। মুখ ও উপোহনের সময় বাদ্যযন্ত্র কখনো উচ্চে, কখনো বা ধীরে বাজানো হ'ত ঐ দু'টিকে পৃথক ক'রে বোঝাবার জন্য। গানের কোন অংশ যখন আবৃত্তি করার প্রয়োজন হ'ত তখন প্রথমে সেই অংশগুলো স্বরে উচ্চারিত হ'ত ও পরে গানের অংশকে ভাবের মাধ্যমে আবার নৃত্যে পরিস্ফুট করা হ'ত। বাদ্যযন্ত্রে যে করণকে অনুসরণ করা হ'ত তাতে তত্ত্ব, অনুগত ও ওঘ এই তিন রকমের লয় থাকত। 'তত্ত্ব' বলতে বিলম্বিত, 'অনুগত' মধ্য ও 'ওঘ' দ্রুত লয়।[৩৬] গায়ক ও বাদকরা রঙ্গমঞ্চে নেপথ্যগৃহের দরজার মাঝামাঝি স্থানে আসন গ্রহণ করত। গায়ক ও বাদকে মিলে প্রায় দশজন থাকত, অর্থাৎ একজন মৃদঙ্গবাদক (মার্দঙ্গিক), দু'জন পণববাদক (পাণবিক), একজন গায়ন, একজন বৈণিক, দু'জন বংশীবাদক ও অন্ততপক্ষে তিনজন গায়ক, এই দশজনের মধ্যে অন্ততপক্ষে ছ'জন শিল্পী ষড়্দারুকের (নেপথ্যগৃহের দরজার) সামনে থাকত।[৩৭] যবনিকার পিছনে যন্ত্রীরা

৩৫। নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ৪।২৬৭-২৭৪

৩৬। নাট্যশাস্ত্র ৪।২৯৪-৩০১

৩৭। Vide D. R. Mankad: *Ancient Indiain Theatre* (1950), p. 13. Cf. also (a) Dr. S. K. De: *History of Sanskrit Poetics*, Vols. I & II;

বাদ্যযন্ত্রের সুর বাঁধত। তারপর রঙ্গশীর্ষে গায়ক-বাদকরা কোথায় কিভাবে বসত ভরত তা বর্ণনা করেছেন।

মৃদঙ্গবাদকরা রঙ্গপীঠের দিকে মুখ ক'রে পূর্বদিকে বসতো; অর্থাৎ নেপথ্য-গৃহের দরজার মাঝখানে মৃদঙ্গীরা আসন গ্রহণ করতো, পণববাদকরা তাদের বামদিকে, গায়নরা থাকত রঙ্গপীঠের দক্ষিণে উত্তরদিকে মুখ ক'রে, বৈণিকেরা তাদের বামদিকে ও বংশীবাদকেরা তাদের দক্ষিণে স্থান গ্রহণ করতো।[৩৮] আচার্য অভিনবগুপ্ত টীকায় উল্লেখ করেছেন: "নেপথ্য-গৃহদ্বারয়োর্মধ্যে পূর্বাভিমুখো মার্দঙ্গিকঃ, তস্য পাণবিকৌ বামতঃ, রঙ্গপীঠস্য দক্ষিণতঃ উত্তরাভিমুখো গায়নঃ, অস্যাগ্রে উত্তরতো দক্ষিণাভিমুখস্থিতা গায়ক্যঃ। অস্য বামে বৈণিকোঽন্যত্র বংশকারিকাবিত্যেবং কুতং পাতি, কুতঃ শব্দবিশেষঃ। কুং তপতীতি কুতপো ন শব্দবিশেষঃ। * * যদ্যাপি কুতপস্য বিন্যাসো মধ্য এব গায়কস্যাভিমুখো রঙ্গপীঠস্যো-ত্তরতো গায়ন্য ইতি গায়কানাং বিন্যাসস্তথাপি ধ্রুবতরণং নাম পৃথগুক্তম্, অঙ্গানাং গীতস্যাবশ্যংভাবিত্বং রঞ্জকবর্গে খ্যাপয়িতুম্ * *।"[৩৯] এখানে পুরুষ গায়কদের গানের কথাই বলা হয়েছে, কিন্তু অভিনবগুপ্তের "নারদাদ্যৈস্ত গন্ধর্বৈঃ" (৫।৩৩) প্রভৃতি শ্লোকে পুরুষদের গানের প্রসঙ্গ থাকলেও নারীজাতির পক্ষেও গানের অনুপ্রবেশ বা সম্ভাবনা দেখা যায়: "যদ্বা * * ভাবিশ্লোকে কেবলপুরুষাণাং

(b) Dr. P. K. Achārya: *The Play-house of the Hindu Period* (—Dr. S. K. Aiyangar Commemoration Volume, p. 36 ff.); (c) K. R. Pisharoti: *The Ancient Indian Theatre* (—Rajah Sir Annamalai Chettiar Commemoration, Volume, 1941).

অনেকে 'বড়্দারুক' অর্থে 'রঙ্গশীর্ষ' বলেন, কেননা রঙ্গশীর্ষ ছ'টি কাঠের স্তম্ভযুক্ত হ'ত ও সেখানেই রঙ্গদেবতার পূজা হ'ত।

৩৮। এছাড়া নাট্যশাস্ত্রে দেখা যায়,

পশ্চিমে তু পুনর্ভাগে নেপথ্যগৃহমাদিশেৎ।
বিভজ্য ভাগান্ বিধিবৎ যথাবদনুপূর্বশঃ॥
শুভে নক্ষত্রযোগে তু মণ্ডপস্য নিবেশনম্।
শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষৈর্মৃদঙ্গপণবাদিভিঃ॥
সর্বতূর্যনিনাদৈশ্চ স্থাপনং কার্যমেব চ।

—নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ২।৩৫-৩৮

বরোদা-সংস্করণে কিছু পাঠভেদ আছে ও শ্লোকসংখ্যাও ২।৩৮-৪০

৩৯। নাট্যশাস্ত্র (বরোদা-সংস্করণ) ১ম ভাগ, পৃঃ ২১৪

গাতৃত্বং ব্যক্ষ্যমাণমিহাশংক্য পৃথগবতরণমুক্তম্, তস্ত্রৈর্তদবকাশং গন্ধর্বশ্চ গন্ধর্বা-শ্চেত্যেকশেষেণ স্ত্রীগীতস্যাপ্যত্র সংভাবনাৎ"। তিনি ৩২ অধ্যায় থেকে শ্লোক উদ্ধৃত ক'রেও প্রমাণ দিয়েছেন। যেমন,

যদ্যপি পুরুষো গায়তি গীতবিধানং তু লক্ষণোপেতম্।
স্ত্রীবিরহিতঃ প্রয়োগস্তথাপি ন সুখাবহো ভবতি॥

এছাড়া ভরত পূর্বরঙ্গে বা যবনিকার বহির্ভাগেও নৃত্য-গীতের অনুষ্ঠানের কথা বলেছেন। বৈদিকযুগে যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় যাগমণ্ডপের বহির্ভাগে গান করার বিধি ছিল। সেই বহির্গানের নাম ছিল 'বহিষ্পমানস্তোত্র'। পবমানসোমের উদ্দেশে উদ্গাতা, প্রস্তোতা ও প্রতিহর্তা তিনজন সামগায়ী ঋত্বিক্ সামগান করতেন। তারই নাম 'পবমানস্তোত্র', আর যাগমণ্ডপ বা মহাবেদীর বাইরে যে স্তোত্র গান করা হ'ত বলে তাকে 'বহিষ্পবমান'-গান বলা হ'ত। বহিষ্পবমানস্তোত্র গান করার পর তবে আজ্যশস্ত্র পাঠ ও আজ্যস্তোত্র গান করা হ'ত। তারপর আবার প্রউগশস্ত্রও পাঠ করা হ'ত। ভরতের পূর্বে ও সময়ে নাট্যাভিনয়ে বহির্গীতের রীতি সম্ভবত বৈদিক বহিষ্পবমানস্তোত্র-গানেরই অনুসরণ বা অনুকরণ। তাছাড়া একথা অতীব সত্য যে গান্ধর্ব বৈদিকগান সামগানের পরবর্তী গান। দ্রুহিণ-ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাভরতকেই তার সংগ্রহকর্তা ও প্রচারক বলা হয়েছে। ভরত নাট্যশাস্ত্রে তার ইঙ্গিতও দিয়েছেন,

জাগ্রহ পাঠ্যমৃগ্বেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ।
যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসানাথর্বণাদপি॥

* * * *

এবং ভগবতা সৃষ্টো ব্রহ্মণা ললিতাত্মকম্॥[৪০]

'অভিনবভারতী'-টীকায় আচার্য অভিনবগুপ্ত উল্লেখ করেছেন: "তস্য ত্রৈস্বর্য-প্রধানস্য স্তোত্রদ্বারেণ যাগোপকারিত্বাৎ পাঠ্যমপি চ ত্রৈস্বর্যোপেতম্। ঐকস্বর্যৈকাব্যভাবাভ্যাং চ স্ব-স্বাদৌ গীতরূপপাঠেরিতি হি বক্ষ্যামঃ। পাঠ্যগতস্বরপ্রসঙ্গাৎ তদনন্তরং সামভ্যো গীতং জগ্রাহেত্যুক্তম্। উপরঞ্জকত্বেন হি পশ্চাত্তস্যাভিধানং ন্যায্যমিতি কেচিৎ। গীতং প্রাণাঃ প্রয়োগস্যেতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ। * * এবকারেণ গীতমাত্রং ততো গৃহীতম্ গীতিষু সামাখ্যেতি ন্যায়াৎ তদাধার-

৪০। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ১।১৬-১৮
কাব্যমালা ও বরোদা-সংস্করণ দু'টিতে 'ললিতাত্মকম্' পাঠের জায়গায় 'সর্ববেদিনা' আছে।

ধ্রুবাপদযোজনমুখেদাদেবেতি দর্শয়তি, তত এব ধ্রুবাধ্যায়ে বচনাদত্রৈব সংগৃহীতম্। ঘনাবনদ্ধরূপিসামগানক্রিয়াপ্রাণভূতকল্পসাম্যাত্মকতালসামান্যস্বীকৃতমত্রৈব প্রবিষ্টম্। আধ্বর্যবকর্মপ্রধানে তু যজুর্বেদেঽঙ্গকর্মণাং প্রদক্ষিণগমনাদিক্রম এব প্রথমং পঠিষ্যতি 'যা ঋচঃ পাণিকাঃ' (৩২।২) ইত্যাদি, ততসুষিরাত্মকং চাপ্যাতোদ্যং স্বরপ্রাধান্যাৎ। * * * তবেদং নাট্যাদিরূপকোপক্রমং গীতাতোদ্যপ্রাণাভিনয়বর্গপরিপুষ্টরসচর্বণাত্মকং পরপ্রীতিময়মেব নাট্যং, ততস্তদব্যুৎপত্তিরিতি নাট্যমেব বেদ ইতি ক্রমেণ প্রদর্শিতম্"।

পূর্বরঙ্গে বা যবনিকার বহির্ভাগে প্রধানত চচ্চৎপুট ও চাচপুট তালে ধ্রুবাগীতির অনুষ্ঠান হ'ত। সেই ধ্রুবাগীতিও বৈদিক সামগানেরই পরবর্তী লৌকিক রূপ। চচ্চৎপুট চতুরস্র (চতুরশ্র) ও চাচপুট ত্র্যস্র (ত্র্যশ্র) নামেও পরিচিত। চচ্চৎপুট ও চাচপুট আবার তিন ভাগে বিভক্ত: যথাক্ষর, দ্বিকল ও চতুষ্কল। বহির্গীত হিসাবে বর্ধমানকগীতিরও ব্যবস্থা থাকত। ভরত নাট্যশাস্ত্রের (কাশী স') ৪র্থ অধ্যায়ে (২৬৭-২৬৮ শ্লো') বর্ধমানকগীতির পরিচয় দিয়েছেন।[৪১] অভিনবগুপ্ত বর্ধমানকগীতির প্রসঙ্গে বলেছেন: "ইহ বহির্যবনিকাঙ্গান্যেব পূর্বরঙ্গঃ, তানি চ গীতকানীত্যুৎথাপনানি ধ্রুবারূপাণি তদ্দ্বিকলচচ্চৎপুটচাচপুটতালেন বিশিষ্টগতি-গতেনেতি, * * তদেব পূর্বরঙ্গ ইতি তাবৎ তাৎপর্যম্। * * যথাক্ষরদ্বিকলচতুষ্কলতয়া সর্বমেব গীতকবর্ধমানাদিগতং গীয়মানং গেয়ং রূপং সংগৃহীতম্"। তিনি আরো বলেছেন যে শ্রীহর্ষ 'রঙ্গ'-শব্দে তৌর্যত্রিক অর্থ ক'রে নাট্যের অঙ্গ-রূপে পূর্বরঙ্গের ব্যাখ্যা করেছেন: "পূর্বং ত এবং যস্মিন্ শুদ্ধাঃ স্যুঃ পূর্বরঙ্গোঽসৌ"। কিন্তু অভিনবগুপ্ত পূর্বরঙ্গ বলতে মণ্ডপের বা নাট্যমঞ্চের একদেশ অর্থ স্বীকার করেন নি।

পূর্বরঙ্গে যে নৃত্যের প্রসঙ্গ আছে তা বৈচিত্র্যপূর্ণ ও নাট্যানুগত। তারপর নট-নটী ও শিল্পীদের সমাবেশ। ভরত যবনিকা ও রঙ্গপীঠের মাঝখানে প্রধানত নটদের বা বৈণিকদের (বীণাবাদকদের) উপবেশনের কথা বলেছেন। যবনিকা অপসারণ করলে বর্ধমানকগীতি গান করা হ'ত। অভিনবগুপ্তের মতে (বর্ধমান ব্যতীত) অন্য গীতিও গান করা হ'ত।[৪২]

৪১। কলানাং বৃদ্ধিমাসাদ্য হ্যক্ষরাণাং চ বর্ধনাৎ।
লক্ষস্য বর্ধনাচ্চাপি বর্ধমানকমুচ্যতে।

৪২। অত্র যবনিকা রঙ্গপীঠতচ্ছিরসোর্মধ্যে, তস্যা অন্তররাগতৈঃ প্রযোক্তৃভির্নটৈঃ প্রাধান্যাদ্ যদি বা বৈণিকাদিভিরেব প্রযোক্তৃভিঃ * *, যবনিকায়ামপসারিতায়াং 'গীতানা'-মিত্যাদিনা শ্লোকেন গীতক-বর্ধমানান্যন্তরপ্রয়োগ উক্তঃ"।—অভিনবগুপ্ত

অভিনয়ের উদ্দেশ্যে বাদ্যযন্ত্রাদির সমাবেশের নাম 'কুতপবিন্যাস'। কুতপবিন্যাসের পর ভরত নাট্যশাস্ত্রের ২৮শ অধ্যায়ে গান্ধর্বগানের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন,

যত্তু তন্ত্রীগতং প্রোক্তং নানাতোদ্যসমাশ্রয়ম্।
গান্ধর্বমিতি বিজ্ঞেয়ং স্বরতালপদাশ্রয়ম্॥

তন্ত্রী শব্দে বীণা। নানা আতোদ্য বল্‌তে বীণাদি তন্ত্রী-বাদ্যযন্ত্র, সুষির বা বাঁশী, ঘন ও মুরজাদি অবনদ্ধ: "তন্ত্রীশব্দেন তন্ত্রীযুক্তবীণা। নানাতোদ্য চতুর্বিধমাতোদ্যং ততং বীণাদি সুষিরং বংশাদি ঘনং তালবাদ্যাদি অবনদ্ধং মুরজাদি"। বীণাদি বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে স্বর, তাল ও পদযুক্ত সঙ্গীতের নাম 'গান্ধর্ব'। গান্ধর্বের পরিস্ফুট পরিচয় ভরত নিজেই ৩২শ অধ্যায়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: পূর্বে যে স্বর, তাল ও পদযুক্ত গান্ধর্বের কথা উল্লেখ করেছি সেখানে পদের অর্থ স্বর ও তালের বোধক বা অনুভাবক 'বস্তু' ও যা-কিছু অক্ষর-সন্নিবদ্ধ তাই 'পদ' নামে অভিহিত। ভরত পুনরায় উল্লেখ করেছেন,

গান্ধর্বং যন্ময়া প্রোক্তং স্বরতালপদাত্মকম্।
পদং তস্য ভবেদ্বস্তু স্বরতালানুভাবকম্॥
যৎকিঞ্চিদক্ষরকৃতং তৎসর্বং পদসংজ্ঞিতম্।
নিবদ্ধঞ্চানিবদ্ধঞ্চ তৎপদং দ্বিবিধং স্মৃতম্॥[৪৩]

পদ নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ ভেদে আবার দু'রকম। নিবদ্ধপদ তালযুক্ত ও ধ্রুবাগানে তা ব্যবহৃত হ'ত। অনিবদ্ধ পদে তাল থাকে না, কিন্তু অক্ষর, ছন্দ ও যতি থাকে। অনিবদ্ধের অপর নাম 'আলাপ'। নিবদ্ধপদেও বিচিত্র ছন্দের সমাবেশ থাকে।[৪৪] তবে উভয় পদের সঙ্গেই আতোদ্য বা বীণা, বেণু, ঘন ও মৃদঙ্গাদি বাদ্যের সহযোগ থাকে। অর্থাৎ অনিবদ্ধ-পদে (আলাপে) তালের সমাবেশ না

৪৩। নাট্যশাস্ত্রে (কাশী) ৩২।২৫-২৬

৪৪। অতালঞ্চ সতালঞ্চ দ্বিপ্রকারঞ্চ তদ্ভবেৎ।
সতালঞ্চ ধ্রুবার্থেষু নিবদ্ধং তচ্চ বৈ স্মৃতম্॥
যত্তু বা করণোপেতং সর্বতোদ্যানুরঞ্জকম্।
অতালমনিবদ্ধঞ্চ পদং তু জ্ঞেয়মেব চ॥
নিয়তাক্ষরসম্বদ্ধং ছন্দোযতিসমন্বিতম্।
নিবদ্ধন্তু পদং জ্ঞেয়ং নানাছন্দঃসমুদ্ভবম্॥
—নাট্যশাস্ত্র ৩২।২৭-২৯

থাকলেও বাদ্যযন্ত্রাদির সহযোগে তাকে প্রকাশ করা যায়।[৪৫] মোটকথা ষড়্‌জাদি লৌকিক সাত স্বর, নিবদ্ধ ও সতাল এবং অনিবদ্ধ ও অতাল পদ যুক্ত হ'ল গান্ধর্বের সর্বাঙ্গিক রূপ। বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ প্রভৃতির সহযোগ তাতে থাকেই। তবে ভরত পদের প্রসঙ্গে যে বলেছেন: "পদং তস্য ভবেদ্ বস্তু", অর্থাৎ স্বর ও তালের সহযোগী বা উদ্বোধক হ'ল 'বস্তু', সেই বস্তুও মাত্রা ও স্বর-সমন্বিত বিভিন্ন পদের প্রকাশক। শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকরের প্রবন্ধাধ্যায়ে (৪র্থ) এই বস্তুকে বিপ্রকীর্ণ প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করেছেন: "ষট্‌পদী বস্তুসংজ্ঞশ্চ" (৪।৩০)। সেই বস্তুর পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন,

ভেদা বেদ্যাস্ত্রিপদ্যাদেচ্ছন্দোলক্ষ্মণি ভূরয়ঃ।
মাত্রাঃ পঞ্চদশাদ্যেঽন্ত্রৌ তৃতীয়ে পঞ্চমে তথা॥[৪৬]

বস্তু বা বস্তুপ্রবন্ধ পাঁচটি পদযুক্ত। তার প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম পাদে পণেরো মাত্রা এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে বারো মাত্রা, অর্থাৎ বস্তুপ্রবন্ধে পাঁচটি পাদে সাতাশটি মাত্রার সমাবেশ থাকে। এদের প্রথমার্ধে স্বর ও পাট এবং দ্বিতীয়ার্ধে স্বর ও তেনক বা তেন থাকে। 'স্বর' বল্‌তে ষড়্‌জাদি সাত স্বর। 'পাট' বলতে বাদ্যের অক্ষর ও 'তেনক' বা 'তেন' অর্থে মঙ্গল বা কল্যাণবাচী শব্দ।[৪৭] স্বর, তেনক বা তেন ও পাট ছাড়া 'দোধক' নামে ছন্দের সমাবেশ থাকে। এই বস্তুপ্রবন্ধ তেন বা মঙ্গলবাচক শব্দ দিয়েই শেষ হয়। শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকরে নিবদ্ধগানকে প্রবন্ধ, বস্তু এবং রূপকও বলেছেন: "সংজ্ঞাত্রয়ং নিবদ্ধস্য প্রবন্ধো বস্তুরূপকম্"।

সুতরাং একথা ঠিক যে স্বর, তাল ও পদযুক্ত গান্ধর্ব নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ—গান

৪৫। অপদান্যনিবদ্ধানি তালেন রহিতানি চ।
আতোদ্যেষু নিযুক্তানি যানি তানি তু যোজয়েৎ॥
—নাট্যশাস্ত্র ৩২।৩২

৪৬। সঙ্গীত-রত্নাকর ৪।২৭৪, এবং সিংহভূপালের টীকাও দ্রষ্টব্য।

৪৭। প্রবন্ধে উদ্‌গ্রাহাদি পাঁচটি ধাতু ও স্বর, বিরুদাদি ছ'টি অঙ্গ থাকে। পণ্ডিত অহোবল সঙ্গীতপারিজাতে এর উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

পদতালস্বরাঃ পাটাস্তেনো বিরুদনামকঃ।
ইতি গীতে ষড়ঙ্গানি কথিতানি মনীষিভিঃ॥
পদানি বাচকাঃ শব্দাস্তালাশ্চচ্চৎপুটাদয়ঃ।
স্বরাঃ ষড়্‌জাদয়স্তে স্যুঃ পাটো বাদ্যোত্থবাক্ষরম্॥
তেনঃ স্যান্মঙ্গলো শব্দো বিরুদং গুণনামযুক্॥

সঙ্গীত-রত্নাকর ৪।১-২০ দ্রষ্টব্য।

ও আলাপ এই দু'রকম রূপেই খৃষ্টপূর্বাব্দের ও খৃষ্টীয় অব্দের গোড়ার দিকে ভারতীয় সমাজে প্রচলিত ছিল এবং ভরতের "নিবদ্ধঞ্চানিবদ্ধঞ্চ তৎ পদং দ্বিবিধং স্মৃতম্, অতালঞ্চ সতালঞ্চ দ্বিপ্রকারঞ্চ তদ্ভবেৎ" (৩২।২৬-২৭) শ্লোকগুলি থেকেই তা প্রমাণ হয়।

গান্ধর্ব সম্বন্ধে শার্ঙ্গদেবের বিশ্লেষণও প্রণিধানযোগ্য। সঙ্গীত-রত্নাকরের চতুর্থ প্রবন্ধাধ্যায়ের অবতারণায় গান্ধর্ব ও গানের যে মধ্যে ভেদ আছে: একটি মার্গ ও অপরটি দেশী। এ'দু'টির প্রসঙ্গে তিনি গান্ধর্বের সুষ্ঠু পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: 'অনাদিকাল ধরে (?) সম্প্রদায় বা গুরুশিষ্যপরম্পরায় যে গান (সঙ্গীত) গন্ধর্বরা অনুশীলন ও প্রচার করেছে এবং যা নিয়ত বা গ্রহ-অংশ-মূর্ছনাদিযুক্ত, মোক্ষপ্রদ ও কল্যাণকর তাকেই 'গান্ধর্ব' বলে। আর চক্ষুষ্মান শিল্পীরা (বাগে্গেয়কার) গ্রহ-অংশাদি দশ-লক্ষণযুক্ত ক'রে যে দেশীয় ও জাতীয় সুর বা রাগগুলিকে অভিজাত শ্রেণীভুক্ত ক'রে নিয়েছিলেন তাদের 'দেশী' সঙ্গীত বলে।[৪৮] আসলে প্রাচীন ভারতের গান্ধর্বগানই পরবর্তীকালে পরিবর্তিত আকারে ও উপাদানে দেশীগান ব'লে পরিচিত হয়। সুতরাং 'দেশী' গ্রাম্য বা আঞ্চলিক গান (folk music) নয়, তা শাস্ত্রীয় ক্ল্যাসিক্যাল শ্রেণীভুক্ত গান বা সঙ্গীত। কল্লিনাথ গান্ধর্ব সম্বন্ধে বলেছেন: "স্বরগতরাগবিবেকয়োর্জাত্যাদ্যন্তরভাবাত্তং যদুক্তং তদ্‌গান্ধর্বমিত্যর্থঃ" তিনি "নিবদ্ধমনিবদ্ধং তদ্‌দ্বেধা" প্রভৃতি অভিজাত দেশীগানের রূপের কথাও বলেছেন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে ভরত নাট্যশাস্ত্রের ৩২ অধ্যায়ে (কাশী সংস্করণ) গান্ধর্বের পরিচয়ে সতাল নিবদ্ধ ও অতাল অনিবদ্ধ পদ তথা গানের উল্লেখ করেছেন। গান্ধর্ব নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ উভয় রূপেই বিকশিত ছিল। শার্ঙ্গদেব বলেছেন,

> বদ্ধং ধাতুভিরঙ্গৈশ্চ নিবদ্ধমভিধীয়তে।
> আলপ্তির্বন্ধহীনত্বাদনিবদ্ধমিতীরিতা॥

চারটি ধাতু (উদ্‌গ্রাহ, মেলাপকাদি) ও ছ'টি অঙ্গ (স্বর, বিরুদাদি) যুক্ত হ'লে নিবদ্ধ এবং বন্ধহীন তথা তালাদি-বর্জিত আলপ্তির নাম অনিবদ্ধ। এদের

৪৮। অনাদিসংপ্রদায়ং যদ্ গান্ধর্বৈঃ সংপ্রযুজ্যতে।
নিয়তং শ্রেয়সো হেতুস্তদ্‌গান্ধর্বং জগুর্বুধাঃ॥
যত্তু বাগ্‌গেয়কারেণ রচিতং লক্ষণান্বিতম্।
দেশীরাগাদিষু প্রোক্তং তদ্‌গানং জনরঞ্জনম্॥
—সঙ্গীত-রত্নাকর ৪।২-৩

উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। ভরত গান্ধর্বের পরিচয় দিয়ে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন,

গান্ধর্বং ত্রিবিধং বিদ্যাৎ স্বরতালপদাত্মকম্।
ত্রিবিধস্যাপি বক্ষ্যামি লক্ষণং চৈব কর্মভিঃ॥

স্বর, তাল ও পদের সমবেত রূপ যে গান্ধর্ব তাদের প্রত্যেকটির পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। তাই ভরত প্রথমে স্বরের পরিচয় দিয়েছেন তার অপরিচ্ছেদ্য বা অপরিহার্য আঙ্গিক উপাদানগুলিকে নিয়ে। ভরতের মতে স্বর, তাল ও পদ সামান্য (universal) সংজ্ঞা, আর তার পরিপোষক বা আনুসঙ্গিক অপরিহার্য উপাদানগুলি যেন বিশেষ (individual)। তাই 'স্বর'-শব্দটি দিয়ে তিনি ষড়্জাদি সাতস্বর, তাদের অন্তর্বর্তী সূক্ষ্মস্বর হিসাবে শ্রুতি, গ্রাম, মূর্ছনা, স্থান, সাধারণ, আঠার জাতিরাগ, অলংকার, ধাতু, বর্ণ, গীত ও বীণা প্রভৃতির নামোল্লেখ করেছেন :

স্বরাশ্চ শ্রুতয়ো গ্রামো মূর্ছনাঃ স্থানসংযুতাঃ।
স্থানং সাধারণে চৈব জাতয়োঽষ্টাদশৈব চ॥
বর্ণাশ্চত্বার এব স্যুরলংকারাশ্চ ধাতবঃ।
অলংকারাশ্চ বর্ণাশ্চ গীতয়শ্চ শরীরজাঃ॥

এর পর তাল সম্বন্ধে তিনি বলেছেন,

আবাপস্তথ নিষ্ক্রামো বিক্ষেপশ্চ প্রবেশকঃ।
শম্যাতালঃ সন্নিপাতঃ পবিবর্তঃ সবস্তুকঃ॥
মাত্রাবিদার্যাঙ্গুলয়া যতিঃ প্রকরণং তথা।
গীতয়োঽবয়বা মার্গা পাদভাগাঃ সপাণয়ঃ।
ইত্যেকবিংশকো জ্ঞেয়ো বিধিস্তালগতো বুধৈঃ॥

পদের পরিচয়ে উল্লেখ করেছেন,

ব্যঞ্জনানি স্বরা বর্ণাঃ সন্ধয়োঽথ বিভক্তয়ঃ।
নানাখ্যাতোপসর্গাশ্চ নিপাতাস্তদ্ধিতাঃ কৃতাঃ॥
ছন্দো বৃত্তানি জাত্যশ্চ নিত্যং পদগতাত্মকাঃ॥
গান্ধর্বসংগ্রহো হ্যেষ বিস্তারং চ নিবোধত॥

গান্ধর্ব বা গান্ধর্বগানের সংগ্রহ-রূপ অপরিহার্য আঙ্গিক উপাদানগুলিকে বিভাগ করলে তাহলে দেখা যায়,

(১) স্বর— { স্বর, শ্রুতি, গ্রাম, মূর্ছনা, স্থান, সাধারণ, আঠার জাতি (জাতিরাগ), চার বর্ণ, অলংকার, ধাতু ও গীত।

(২) তাল— আবাপ, নিষ্ক্রাম, বিক্ষেপ, প্রবেশক বা প্রবেশ, শম্যা, তাল, সন্নিপাত, পরিবর্ত, বস্তু, মাত্রা, বিদারী, অঙ্গুলি, যতি, প্রকরণ, গীত, অবয়ব, মার্গ, পাদ, ভাগ, পাণি প্রভৃতি।

(৩) পদ— ব্যঞ্জন, স্বর, বর্ণ, সন্ধি, বিভক্তি, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত, তদ্ধিত, ছন্দ, বৃত্ত, জাতি, প্রভৃতি।

'গান্ধর্বং ত্রিবিধং বিদ্যাৎ স্বরতালপদাত্মকম্'—গান্ধর্বগানের যে উপাদান স্বর, তাল ও পদ, তাদের মধ্যে স্বর সামান্যভাবে শ্রুতি ও গ্রামাদির বোধক হ'লেও তার নিজস্ব রূপ লৌকক ষড়্জাদি সাত স্বরকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। বৈদিক ক্রুষ্ট ও প্রথমাদি থেকে লৌকিক ষড়্জাদি নামে (অভিধানে) আলাদা হ'লেও নারদীশিক্ষার মাধ্যমে আমরা বৈদিক প্রথমের সঙ্গে লৌকিক মধ্যমের স্বরোচ্চারণ-সাম্য জানতে পারি। শিক্ষাকার নারদ (খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী) বৈদিকের সঙ্গে লৌকিকের স্বর-সাম্যের উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

যঃ সামগানাং প্রথমঃ স বেণোর্মধ্যমঃ স্বরঃ।
যো দ্বিতীয় সঃ গান্ধারস্তৃতীয়স্তৃষভঃ স্মৃতঃ॥
চতুর্থঃ ষড়্জ ইত্যাহুঃ পঞ্চমো ধৈবতো ভবেৎ।
ষষ্ঠে নিষাদো বিজ্ঞেয়ঃ সপ্তমঃ পঞ্চমঃ স্মৃতঃ॥

অর্থাৎ ক্রুষ্ট (৭)—পঞ্চম, প্রথম (১)—মধ্যম
দ্বিতীয় (২)—গান্ধার, তৃতীয় (৩)—ঋষভ,
চতুর্থ (৪)—ষড়্জ, মন্দ্র (৫)—ধৈবত
অতিস্বার্য (৬)—নিষাদ।

অবশ্য আচার্য সায়ণ বৈদিকের সঙ্গে লৌকিকের স্বরস্থানের সাম্যের একটু ভিন্নভাবে পরিচয় দিয়েছেন: "লৌকিকে যে নিষাদাদয়ঃ সপ্তস্বরাঃ প্রসিদ্ধা ত এব সাম্নি ক্রুষ্টাদয়ঃ সপ্তস্বরাঃ ভবন্তি তদ্ যথা, যো নিষাদঃ স ক্রুষ্টঃ, ধৈবতঃ প্রথমঃ, পঞ্চমঃ দ্বিতীয়ঃ, মধ্যমস্তৃতীয়ঃ, গান্ধারশ্চতুর্থঃ, ঋষভো মন্দ্রঃ, ষাড়্জোতিস্বার্য ইতি"। অবশ্য সামগানোত্তর গান্ধর্ব বা মার্গ-সঙ্গীতের আশ্রয় লৌকিক ষড়্জাদি সাত স্বর। ভরত নাট্যশাস্ত্রে তার পরিচয় দিয়ে বলেছেন,

ষড়্জশ্চ ঋষভশ্চৈব গান্ধারো মধ্যমস্তথা।
পঞ্চমো ধৈবতশ্চৈব নিষাদঃ সপ্ত চ স্বরাঃ॥

'শ্রুতি' শ্রবণযোগ্য সূক্ষ্ম স্বর। কম্পনের আকারে সূক্ষ্মস্বরের সংখ্যা অসংখ্য। তাই

কোহলাচার্য বলেছেন : "আসামানন্ত্যমেব"। আবার কেউ বলেছেন : "তত্রৈকৈব শ্রুতিরিতি",—শ্রুতি একটি মাত্র। শ্রুতি সম্বন্ধে ভরতের শ্রুতিপর্যায়ে পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

গ্রাম প্রাচীন ঠাটবিশেষ (scale)। শ্রুতি ও স্বরের একত্র সমাবেশের নাম 'গ্রাম'। মতঙ্গ বলেছেন : "সমূহবাচিনৌ গ্রামৌ স্বরশ্রুত্যাদিসংযুতৌ"। গ্রামের মধ্যেই স্বর বিকাশ লাভ ক'রে রাগের সার্থকতা নিষ্পন্ন করে। ভরত "অথ দ্বৌ গ্রামৌ" ব'লে ষড়্জ ও মধ্যম গ্রাম-দু'টির প্রচলন স্বীকার করেছেন ও এ'থেকে বোঝা যায় যে গ্রাম আসলে সাতটি, ছ'টি, পাঁচটি বা তিনটি যাই হোক, ভরতের সময়ে (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) একমাত্র ষড়্জ ও মধ্যম গ্রাম-দু'টিরই প্রচলন ছিল। মতঙ্গ বলেছেন : "সামবেদাৎ স্বরা জাতাঃ স্বরেভ্যো গ্রামসম্ভবঃ"। মোটকথা সাত স্বর গ্রামের কাঠামো বা অবয়বকে সৃষ্টি করে।

স্বরের আরোহণ-অবরোহণ থেকেই মূর্ছনার সৃষ্টি হয়। ভরত দু'টি গ্রামের মূর্ছনার পরিচয় দিয়েছেন। উত্তরমন্দ্রা, রজনী, উত্তরায়তা, শুদ্ধষড়্জা, মৎসরীকৃতা, অশ্বক্রান্তা ও অভিরুদ্গতা এই সাতটি ষড়্জগ্রামের মূর্ছনা এবং সৌবীরি, হরিণাশ্বা, কলোপনতা, শুদ্ধমধ্যা, মার্গবী, পৌরবী, হৃষ্যকা এই সাতটি মধ্যমগ্রামের মূর্ছনা। শিক্ষাকার নারদ একুশটি মূর্ছনার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের সঙ্গে একুশটি মূর্ছনাকে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। ভরত ক্রমযুক্ত স্বরকে বলেছেন মূর্ছনা : "ক্রমযুক্তাঃ স্বরাঃ সপ্ত মূর্ছনাস্ত্বভিসংজ্ঞিতাঃ"। মতঙ্গ সাতস্বর ও দ্বাদশস্বর এই দু'রকম 'মূর্ছনা' স্বীকার করেছেন : "সা চ মূর্ছনা দ্বিবিধা সপ্তস্বরমূর্ছনা দ্বাদশস্বরমূর্ছনা চেতি"। এছাড়া পূর্ণা (সাত স্বরের), ষাড়বা (ছ' স্বরের) ও ঔড়ুবা (পাঁচ স্বরের) ও সাধারণা (অন্তরগান্ধার ও কাকলি-নিষাদযুক্ত) এই চার শ্রেণীর মূর্ছনা তো আছেই। ভরত তাদের নামোল্লেখ করেছেন : "ষাড়বোড়ুবিতসংজ্ঞিতাঃ পূর্ণা সাধারণকৃতাশ্চেতি চতুর্বিধশ্চতুর্দশ মূর্ছনাঃ"।[৪৯]

মন্দ্র, মধ্য ও তার এই তিনটি স্থান। স্থান বর্ণ বা স্বরের উচ্চারণভেদ নির্ণয় করে। সাধারণ স্বরও জাতিভেদে দু'রকম—স্বরসাধারণ ও জাতিসাধারণ।

৪৯। ষট্‌পঞ্চকস্বরাস্তাসাং ষাড়বোড়ুবিতস্মৃতাঃ॥
সাধারণকৃতাশ্চৈব কাকলীসমলঙ্কৃতাঃ।
অন্তরস্বরসংযুক্তা মূর্ছনা গ্রাময়োর্দ্বয়োঃ॥
—নাট্যশাস্ত্র ২৮।৩১-৩২

"সাধারণ' শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় ক'রে ভরত বলেছেন : "সাধারণং নামান্তরস্বরতা। কস্মাৎ ? দ্বয়োরন্তরস্থং তৎ সাধারণম্"। মোটকথা ব্যবধান বা অন্তরের নাম 'সাধারণ'। শীত যায় ও গ্রীষ্ম আসে, শিশির যায় ও বসন্ত আসে; এই দু'টি ঋতুর ব্যবধান-কালকে 'কালসাধারণ' বলে। ভরত কাল সাধারণের পরিচয় দিয়ে বলেছেন : "ন চ নাগতো বসন্তো ন চ নিঃশেষঃ শিশিরকালঃ। ইতি কালসাধারণঃ"। সুতরাং স্বরসাধারণ ও জাতিসাধারণ ছাড়া ভরত কাল সাধারণেরও পরিচয় দিয়েছেন। ভরতের সময়ে স্বরসাধারণ দু'টি—কাকলি (নিষাদ) ও অন্তর (গান্ধার)— "স্বরসাধারণং কাকল্যন্তরস্বরৌ"। এদের বিকৃত স্বরও বলে। দু'টি দু'টি শ্রুতির অন্তর তথা প্রকর্ষণের (বৃদ্ধির) জন্য শুদ্ধ-গান্ধার ও শুদ্ধ-নিষাদের বিকৃতিভাব সৃষ্টি হয়। দু'টি শ্রুতিসম্পন্ন নিষাদ যখন চারশ্রুতিযুক্ত ষড়্জের তীব্রা ও কুমুদ্বতী এই দু'টি শ্রুতি গ্রহণ ক'রে চারশ্রুতিযুক্ত হয় তখনই তা কাকলিনিষাদ নামে পরিচিত হয়, আর তারি জন্য তার অন্তরস্বর হ'ল নিষাদ ও ষড়্জ। কল্লিনাথ সঙ্গীত-রত্নাকরের পঞ্চম সাধারণপ্রকরণে এর প্রসঙ্গে বলেছেন : "হি যস্মাৎকারণাৎকাকলী বিকৃতচতুঃশ্রুতিকো নিষাদঃ ষড়্জনিষাদয়োঃ শুদ্ধয়োঃ সাধারণো ভবেত্তদুভয়শ্রুতিসম্বন্ধিত্বেন, অতঃ কারণাত্তস্য কাকলিনো যৎসাধারণং তৎসাধারণং বিদুঃ"। সে'রকম শুদ্ধ-গান্ধার যখন শুদ্ধ-মধ্যমের বজ্রিকা ও প্রসারিণী শ্রুতি দু'টি নিয়ে চারশ্রুতিসম্পন্ন হয় তখন তাকে 'অন্তরগান্ধার' বলে। সিংহভূপাল তাঁর সুধাকর-টীকায় বলেছেন : "অন্তরঃ স্বরো হি গান্ধারমধ্যময়োঃ সাধারণঃ, গান্ধারস্য মধ্যমস্য চ শ্রুতিদ্বয়গ্রহণাৎ। তস্যান্তরস্য গান্ধারমধ্যময়োর্যৎসাধারণত্বং তৎসাধারণামিত্যর্থঃ"। ভরত নাট্যশাস্ত্রে একথাই একটু সংক্ষেপে বলেছেন : "তত্র দ্বিশ্রুতিপ্রকর্ষণান্নিষাদাদয়ঃ। কাকলীসংজ্ঞো নিষাদো, ন ষড়্জঃ। দ্বাভ্যামন্তরস্বরত্বাৎ সাধারণত্বং প্রতিপদ্যতে। এবং গান্ধারোঽপ্যন্তরস্বরসংজ্ঞঃ, গান্ধারো ন মধ্যমঃ। তয়োরন্তরস্বরত্বাৎ"। 'কাকলি'-সংজ্ঞা কেন হ'ল তার উত্তরে ভরত বলেছেন : "কলত্বাৎ কাকলী, কৃষ্টত্বাদ্বা, অতিসৌক্ষ্ম্যত্বাদ্বা, অথবা কাক্ষিত্বাৎ উভয়সম্বন্ধত্বাৎ কাকলীসংজ্ঞা"। অথবা ছ'টি রসের মধ্যে লবণকে যেমন ক্ষার বলা হয় তেমনি স্বরের মধ্যে নিষাদকে 'কাকলি' নাম দেওয়া হয়।

এক গ্রামের জাতির মধ্যে অন্য গ্রামের জাতির বর্ণসাম্য (একবর্ণ) হ'লে গানের যে সাধারণভাব দেখা যায় তাকে 'জাতিসাধারণ' বলে। কল্লিনাথও একথাই বলেছেন : "জাত্যোর্বা জাতিষু বা বর্ণসাম্যেন গানস্য যৎসাধারণং তদেব

তথোক্তম্”। ভরত উল্লেখ করেছেন: “জাতিসাধারণমেকগ্রামাংশানাং জাতিনাং জাত্যোর্বা অন্যস্মিন্ ভাগে প্রত্যঙ্গদর্শনং স্বরাণামবগমাৎ”। ষড়্জ ও মধ্যম গ্রাম-দু'টি অনুসারে স্বরসাধারণ 'ষড়্জসাধারণ' ও 'মধ্যমসাধারণ' নামে পরিচিত। স্বর-বিশেষের নামকেই এখানে 'সাধারণ' বলে।

খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শার্ঙ্গদেব চারটি স্বরসাধারণের কথা উল্লেখ করেছেন। ভরতের সময়ে বিকৃত স্বর হিসাবে আমরা পাই অন্তরগান্ধার ও কাকলি-নিষাদ (গান্ধার ও নিষাদের বিকৃতভাব), কিন্তু শার্ঙ্গদেবের সময়ে ষড়্জ এবং মধ্যমেরও বিকৃতভাব দেখা যায়: “কাকল্যন্তরষড়্জৈশ্চ মধ্যমেন বিশেষণাৎ”। কল্লিনাথ বলেছেন: “কাকলিসাধারণমন্তরসাধারণং ষড়্জ-সাধারণং মধ্যমসাধারণামিত্যেবমিত্যর্থঃ”। শুধু তাই নয়, শার্ঙ্গদেব ষড়্জ ও পঞ্চমেরও বিকৃতভাব স্বীকার করেছেন: “ত এব বিকৃতাবস্থা দ্বাদশ প্রতি-পাদিতাঃ”।[৫০] অর্থাৎ শুদ্ধ সাত স্বর বিকৃত হ'য়ে বারোটি স্বরে পরিণত হয়। সিংহভূপাল স্বরগুলির বিকৃতভাবকে কল্পিত বলেছেন,[৫১] কেননা স্থানচ্যুতি বা শ্রুতিভেদের জন্যই বিকৃতি দেখা যায়, নচেৎ স্বস্থানে ও নিজের নিজের শ্রুতিসংখ্যা নিয়ে সাতটি স্বরই অবিকৃত। সিংহভূপাল এর একটি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যেমন একই দেবদত্ত তিনতলা প্রাসাদের ভিন্ন ভিন্ন তলায় থাকায় জন্য স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন ব'লে মনে হয় তেমনি স্বরগুলির স্থান (শ্রুতিস্থান) ভিন্ন হওয়ার জন্য ভিন্ন ব'লে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু আসলে তারা একই স্বর।[৫২] সাত স্বরের বিকৃতভাব সম্বন্ধে শার্ঙ্গদেব বলেছেন,

> চ্যুতোঽচ্যুতো দ্বিধা ষড়্জো দ্বিশ্রুতিবিকৃতো ভবেৎ।
> সাধারণে কাকলীত্বে নিষাদস্তু চ দৃশ্যতে ॥
> সাধারণে শ্রুতিং ষাড়্জীমৃষভঃ সংশ্রিতো যদা।
> চতুঃশ্রুতিত্বমায়াতি তদৈকো বিকৃতো ভবেৎ ॥
> সাধারণে ত্রিশ্রুতিঃ স্যাদন্তরত্বে চতুঃশ্রুতিঃ।
> গান্ধার ইতি তদ্ভেদৌ দ্বৌ নিঃশঙ্কেন কীর্তিতৌ ॥

৫০। সঙ্গীত-রত্নাকর ১।৩।৩৯

৫১। 'তে শুদ্ধাঃ সপ্ত স্বরা এব বিকৃতাবস্থা বিকারং প্রাপ্তা দ্বাদশসংখ্যকা ভবন্তি'।—সিংহভূপাল

৫২। 'ততশ্চ তাত্ত্বিকো ভেদো নাস্তি, কিং তু স্থানকল্পিতো ভেদঃ।' যথৈক এব দেবদত্তস্ত্রি-ভূমিকে প্রাসাদে প্রথমভূমিকায়াং দ্বিতীয় ভূমিকায়াং চ তিষ্ঠন্নস্ত ইব ভাসন্তে তথা স্বরা অপি স্থানবিশেষেণেত্যর্থঃ

মধ্যমঃ ষড়্জবদ্ দ্বেধাঽন্তরসাধারণাশ্রয়াৎ।
পঞ্চমো মধ্যমগ্রামে ত্রিশ্রুতিঃ কৈশিকে পুনঃ॥
মধ্যমস্থ শ্রুতিং প্রাপ্য চতুঃশ্রুতিরিতি দ্বিধা।
ধৈবতো মধ্যমগ্রামে বিকৃতঃ স্যাচ্চতুঃশ্রুতিঃ॥
কৈশিকে কাকলীত্বে চ নিষাদস্ত্রিচতুঃশ্রুতিঃ।
প্রাপ্নোতি বিকৃতৌ ভেদৌ দ্বাবিতি দ্বাদশ স্মৃতাঃ॥[৫৩]

চ্যুত-ষড়্জ ষড়্জসাধারণ নামে পরিচিত, কেননা নিষাদ ষড়্জের চারশ্রুতির দু'টি শ্রুতি গ্রহণ ক'রে চার শ্রুতিসম্পন্ন হয় ও ষড়্জ তখন হয় দুই শ্রুতিসম্পন্ন। অর্থাৎ কাকলিনিষাদ তখন ষড়্জের দ্বিতীয় শ্রুতিতে অবস্থান করে। ঋষভ তিন শ্রুতিযুক্ত, কিন্তু যখন সে ষড়্জের চতুর্থ শ্রুতি গ্রহণ ক'রে চার শ্রুতিসম্পন্ন হয় তখনি তা বিকৃত হয়। গান্ধার দু'টি শ্রুতিযুক্ত, যখন সে চারশ্রুতিযুক্ত মধ্যম থেকে দু'টি শ্রুতিকে নিয়ে চার শ্রুতিসম্পন্ন হয় তখন তা 'অন্তরগান্ধার'-রূপে পরিচিত হয়। তেমনি অন্তরগান্ধারের জন্য মধ্যম বিকৃত হ'য়ে 'মধ্যমসাধারণ' নামে পরিচিত হয়। মধ্যমগ্রামে তিনটি শ্রুতিযুক্ত হ'লে পঞ্চম বিকৃত হয়। ধৈবত তিন শ্রুতিযুক্ত, কিন্তু পঞ্চমের অন্তিম তথা চতুর্থ শ্রুতি গ্রহণ ক'রে যখনই চার শ্রুতিযুক্ত হয় তখনি তা বিকৃত হয়। নিষাদ দুই শ্রুতিযুক্ত, কিন্তু ষড়্জের দু'টি শ্রুতি নিয়ে যখন চার শ্রুতিসম্পন্ন হয় তখনি সে বিকৃত হয় ও তার নাম তখন হয় কাকলিনিষাদ। সুতরাং রত্নাকরে শুদ্ধ ৭+বিকৃত ১২=মোট উনিশটি স্বর। ১৬ শো শতাব্দীর গুণী পণ্ডিত রামামত্য (১৫৫০ খৃঃ) বারোটি বিকৃত স্বরের জায়গায় মোট সাতটি বিকৃত স্বর স্বীকার করেছেন, সুতরাং তাঁর মতে স্বরসংখ্যা শুদ্ধ ৭+বিকৃত ৭=১৪টি: "বিকৃতাশ্চাপি সপ্তৈবেত্যেবং সর্বে চতুর্দশ" (২।৩৩), বা "চতুর্দশ স্বরা হেতে রাগে রূপে ভবন্ত্যমী "(২।৬৫)। ১৭শ শতাব্দীর সঙ্গীতগুণী পণ্ডিত সোমনাথ (১৬০৯ খৃঃ) বলেছেন

দ্বাদশবিকৃতান্পূর্বে বদন্তি তত্র তু পৃথগ্-পৃথক্ ধ্বনিতঃ।
সপ্তৈব স্যুর্ভিন্না ন পঞ্চ যদি মে সমধ্বনয়ঃ॥[৫৪]

"প্রাচীনমতে চ্যুতঃ ষড়্জ একঃ, ত্রিশ্রুতির্গান্ধারো দ্বিতীয়ঃ, চতুঃশ্রুতির্গান্ধারস্তৃতীয়ঃ, চ্যুতো মধ্যমশ্চতুর্থঃ, ত্রিশ্রুতিঃ পঞ্চমঃ পঞ্চমঃ, ত্রিশ্রুতির্নিষাদঃ ষষ্ঠঃ, চতুশ্রুতিশ্চ নিষাদঃ সপ্তমশ্চেতি। অস্মিন্মতে ত্বেত এব মৃদুসসাধারণান্তরমৃদুমমৃদুপকৈশিকা-

৫৩। সঙ্গীত-রত্নাকর ১।৩।৪০-৪৫

৫৪। রাগবিবোধ ১।২৫

কলীনামানো ভবন্তি"। অর্থাৎ প্রাচীন মতে চ্যুত-ষড়্জ+তিনশ্রুতির গান্ধার+চারশ্রুতির গান্ধার+চ্যুত-মধ্যম+তিনশ্রুতির পঞ্চম+তিনশ্রুতির নিষাদ+চারশ্রুতির নিষাদ=৭টি বিকৃত স্বর। এখানে প্রাচীন মত বলতে ১৬শ শতাব্দীর পণ্ডিত রামামত্য প্রভৃতি সমর্থিত সাতটি বিকৃত স্বর। পণ্ডিত সোমনাথ (১৬০৯ খৃঃ) 'অস্মিন্নতে' ব'লে বিকৃত সাতস্বরের পরিচয় দিয়েছেন মৃদু-স+সাধারণ-গ+অন্তর-গ+মৃদু-ম+মৃদু-প+কৈশিক-নি+কাকলি-নি। বেঙ্কটমুখী (১৬২০ খৃঃ) পাঁচটি বিকৃত স্বর স্বীকার করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন।

বিকৃতাস্তু স্বরা পঞ্চেত্যস্মাভিরবধার্যতে।

* * * *

সর্বমেতৎ সমালোচ্য লক্ষ্যমার্গানুসারতঃ ॥

স্বরাঃ পঞ্চৈব বিকৃতা ইতি সিদ্ধান্তিতং ময়া।

দেখা যায় ১৬শ-১৭শ শতাব্দীতে পাঁচটি বিকৃত স্বর সঙ্গীত সমাজে প্রচলিত হয়েছিল।

স্বরগোষ্ঠির ভেতর ভরত 'জাতয়োঽষ্টাদশৈব চ'—আঠারটি জাতি বা জাতিরাগকে গ্রহণ করেছেন। শুদ্ধ-সপ্তজাতির উল্লেখ রামায়ণাদি মহাকাব্যে পেয়েছি। ভরত নাট্যশাস্ত্রে শুদ্ধ ৭+বিকৃত ১১=মোট ১৮টি জাতিরাগের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ২৮শ অধ্যায়ে (কাশী সংস্করণ) ৩৭ থেকে ৪১ শ্লোকে শুদ্ধ ও বিকৃতগুলির নামোল্লেখ ও পরিচয় দিয়েছেন। পরবর্তীকালে শাণ্ডিল্য, কোহল, মতঙ্গ, শার্ঙ্গদেব প্রভৃতি সঙ্গীতশাস্ত্রীরা ভরতের জাতিরাগ সম্বন্ধে বিবরণ ও বিশ্লেষণ অনুসরণ করেছেন। ভরত উল্লেখ করেছেন মধ্যমা, পঞ্চমী ও ষড়্জমধ্যা এ'তিনটি জাতি বা জাতিরাগ স্বরসাধারণের অন্তর্গত। এ'তিনটি জাতিরাগের অঙ্গ ও অংশ ষড়্জ, মধ্যম ও পঞ্চম। এরপর ষাড়্জী, আর্ষভী, ধৈবতী, নৈষাদী, ষড়্জোদীচ্যবতী, ষড়্জকৈশিকী ও ষড়্জমধ্যমা। এই জাতিরাগগুলি ষড়্জগ্রামকে আশ্রয় ক'রে উৎপন্ন ও আধারগ্রাম ষড়্জেই লীলায়িত ও পরিপুষ্ট। গান্ধারী ও রক্তগান্ধারী, গান্ধারোদীচ্যবা, মধ্যমোদীচ্যবা, মধ্যমা, পঞ্চমী, গান্ধারপঞ্চমী, আন্ধ্রী, নন্দয়ন্তী, কর্মারবী বা কার্মারবী ও কৈশিকী এই এগারটি মধ্যমগ্রামে লীলায়িত।[৫৫] সাতটি

৫৫। স্বরসাধাধারণগতাস্তিস্রো জ্ঞেয়াস্তু জাতয়ঃ।
মধ্যমা পঞ্চমী চৈব ষড়্জমধ্যা তথৈব চ ॥
* * * *
ষড়্জর্ষভী ধৈবতী চ নৈষাদী চ তথা পরা।
ষড়্জোদীচ্যবতী ষড়্জকৈশিকী ষড়্জমধ্যমা ॥

স্বরের নামানুসারে শুদ্ধ জাতিরাগগুলি ও বিকৃত জাতিরাগ উভয় গ্রামেই বিকশিত।[৫৬] ভরত ষড়্জ ও মধ্যম এই দু'টি গ্রাম স্বীকার করেছেন "অথ দ্বৌ গ্রামৌ ষড়্জো মধ্যমশ্চেতি"। তখন (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) গান্ধারগ্রামের সম্পূর্ণভাবে লোপ পেয়েছে। শুদ্ধ-জাতিরাগগুলিতে সাত স্বরই থাকে, তাছাড়া গ্রহ, অংশ, ন্যাস স্বরগুলির ব্যবহার তো থাকেই। শুদ্ধ ও বিকৃত জাতিগুলির বিকাশ কিন্তু একই নিয়মে হয় না।

ভরত বলেছেন পরস্পরের সংযোগে অর্থাৎ একটি জাতিরাগ আর একটি বা কয়েকটি জাতিরাগের সঙ্গে মিশ্রিত হ'য়ে বিকৃত জাতির সৃষ্টি করে। এ'ধরণের বিকৃত জাতি এগারটি : "তত্রৈকাদশ জাতয়োঽধিকৃতাঃ পরস্পরং সংযোগাদেকা-দশ নির্বর্তয়ন্তি"। যেমন,

(১) শুদ্ধ জাতির মধ্যে অন্য কোন বা পারস্পরিক রাগের সংমিশ্রন নাই। ষড়্জাদি সাতস্বরের নামানুসারে তাদের নামকরণ করা হয়েছে।

(২) (ক) ষড়্জমধ্যমা ··· ষাড়্জী+মধ্যমা

(খ) ষড়্জোদীচ্যবা বা
ষড়্জোদীচ্যবতী ··· ষাড়্জী+গান্ধারী+ধৈবতী

(গ) ষড়্জকৈশিকী ··· ষাড়্জী+গান্ধারী

(ঘ) গান্ধারোদীচ্যবা ··· ষাড়্জী+গান্ধারী+ধৈবতী+মধ্যমা

(ঙ) মধ্যমোদীচ্যবা ··· গান্ধারী+পঞ্চমী+ধৈবতী+মধ্যমা

(চ) রক্তগান্ধারী ··· গান্ধারী+পঞ্চমী+নৈষাদী+মধ্যমা

(ছ) আন্ধ্রী ··· গান্ধারী+ষাড়্জী

ষড়্জগ্রামাশ্রয়া হ্যেতা বিজ্ঞেয়াঃ সপ্তজাতয়ঃ।
অত উর্ধ্বং প্রবক্ষ্যামি মধ্যমগ্রামসংশ্রয়াঃ॥
গান্ধারী রক্তগান্ধারী গান্ধারোদীচ্যবা তথা।
মধ্যমোদীচ্যবা চৈবং মধ্যমা পঞ্চমী তথা।
গান্ধারপঞ্চমী চান্ধ্রী নন্দয়ন্তী তথাপরা।
কর্মারবী কৈশিকী চ জ্ঞেয়াস্ত্বেকাদশাপরা॥

—নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ২৮।৩৬-৪১

৫৬। 'এতাসামষ্টাদশানাং সপ্ত স্বরনামধেয়াঃ সপ্ত স্বরাঃ। জাতয়োর্দ্বিবিধা শুদ্ধা বিকৃতাশ্চ। তত্র শুদ্ধা ষড়্জগ্রামে ষাড়্জী আর্ষভী সধৈবতী নিষাদবতী। গান্ধারী মধ্যমা পঞ্চমী মধ্যমগ্রামে। শুদ্ধা অন্যূনস্বরাঃ স্বরাংশগ্রহন্যাসাঃ'। —নাট্যশাস্ত্র ২৮।৪২

(জ) নন্দয়ন্তী ... গান্ধারী + পঞ্চমী + আর্ষভী
(ঝ) গান্ধারপঞ্চমী ... গান্ধারী + পঞ্চমী
(ঞ) কর্মারবী (কার্মারবী) ... নৈষাদী + আর্ষভী + পঞ্চমী
(ট) কৈশিকী ... ধৈবতী + আর্ষভী।[৫৭]

এই জাতি রাগশ্রেণীভুক্ত কিনা এ'নিয়ে অনেকের মধ্যে মতভেদ আছে। এ'সম্বন্ধে বিশদভাবে আমরা পরে আলোচনা করব। তবে জাতি যে ভারতীয় আদিম রাগ এ'বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

স্বর-তাল-পদের পর্যায়ে আঠারটি জাতিরাগের পরই ভরত উল্লেখ করেছেন: "বর্ণাশ্চত্বার এব স্যুরলংকারাশ্চ ধাতবঃ" (২৮।১৪)। সঙ্গীতে বর্ণকে 'গানক্রিয়া' বলে: "গানক্রিয়োচ্যতে বর্ণঃ" (সঙ্গীত-রত্নাকর ১।৬।১)। কল্লিনাথ বর্ণ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন: "গানক্রিয়ায়া বর্ণত্বং স্বরপদাদেবর্ণনাদ্বিস্তারকরণাৎ"; অর্থাৎ স্বরের পদকে বা স্বরকে বিস্তার করার নাম 'বর্ণ'। উদাহরণ যেমন: "তত্রাদৌ 'সাসাসা রীরীরী' ইত্যেবমাদিপ্রয়োগঃ। দ্বিতীয়ে 'সারীগামা' ইত্যেবমাদিরূপঃ।" সিংহভূপাল স্বরোচ্চারণ বা স্বরোচ্চারণ-পদ্ধতিকে 'বর্ণ' বলেছেন: "* * গানক্রিয়া গানকারণম্, উচ্চারণমিতি যাবৎ। সা বর্ণশব্দেনোচ্যতে"। মতঙ্গ বৃহদ্দেশীতে বর্ণকে 'গান' বলেছেন: "বর্ণশব্দেন গানমভিধীয়তে"।

আচার্য অভিনবগুপ্ত 'অভিনবভারতী'-টীকায় উল্লেখ করেছেন: বর্ণালঙ্কার প্রসঙ্গে রাজা নান্যদেব তাঁর ভরতভাষ্য বা সরস্বতীহৃদয়ালঙ্কারে বর্ণকে গীতি বলেছেন: "উক্তং নান্যদেবেন স্বভরতভাষ্যে—'অত্র বর্ণশব্দেন গীতিরভিধীয়তে। নাক্ষরবিশেষঃ, নাপি ষড়্জাদিস্বরান্তানামপ্যবিশেষেণ বাবরোহাদিধর্মানাং প্রত্যেব সুপলভ্যতে। অতো বর্ণ এব গীতিরিত্যবস্থিতম্"। অবশ্য মাগধী প্রভৃতি দেশজাত গীতি সম্বন্ধেই নান্যদেব একথা বলেছেন, তাই উদাহরণ দিয়েছেন: "সোঽপি চতুর্বিধো মাগধ্যাদি"। নান্যদেব অনেকটা মতঙ্গকেই অনুসরণ করেছেন।

ভরত নাট্যশাস্ত্রে 'বর্ণালঙ্কারলক্ষণম্' (২৯শ অধ্যায়) পর্যায়ে চারটি বর্ণের নামোল্লেখ করেছেন, কিন্তু বর্ণের কোন আভিধানিক অর্থের পরিচয় দেন নি। তিনি বলেছেন: "আরোহী চাবরোহী চ স্থায়িসঞ্চারিণৌ তথা" (২৯।১৯)।

৫৭। নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ২৮।৪৩-৫১

আরোহী, অবরোহী, স্থায়ি ও সঞ্চারী বর্ণ-চারটির পরিচয় দিয়ে তিনি আরো উল্লেখ করেছেন,

আরোহন্তি স্বরা যত্র আরোহীতি স ভণ্যতে ॥
যত্র চৈবাবরোহন্তি সোঽবরোহীতি সংজ্ঞিতঃ।
স্থিরস্বরাঃ সমা যত্র স্থায়িবর্ণঃ স সংজ্ঞিতঃ ॥
সঞ্চরন্তি স্বয়ং যত্র স সঞ্চারীতি সংজ্ঞিতঃ।[৫৮]

ভরতোত্তর সকল গ্রন্থকার (মতঙ্গ, কোহল, পার্শ্বদেব শার্ঙ্গদেব প্রভৃতি), ভাষ্য ও টীকাকার সকলে ভরতকে অনুসরণ ক'রে তাঁর মতকেই বিশ্লেষণ করেছেন। অবশ্য সেই বিশ্লেষণ করার পিছনে তাঁদের নিজেদের মত-স্বাতন্ত্র্য ও প্রতিভারও পরিচয় আছে। শার্ঙ্গদেব বলেছেন: "স চতুর্ধা নিরূপিতঃ"। সিংহভূপালও টীকায় চারটি বর্ণের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন একটি স্বর থেকে থেকে উচ্চারিত হ'লে তাকে 'স্থায়ীবর্ণ' বলে, যেমন সাসাসাসা কিংবা মামামামা। যখন স্বরের উর্ধগতি (আরোহণ) হয় তখন তাকে আরোহীবর্ণ ও নিম্নগতি (অবরোহণ) হ'লে অবরোহীবর্ণ বলে। আরোহীবর্ণ—সরিগমপধনি এবং অবরোহীবর্ণ—নিধপমগরিস। মিশ্রবর্ণকে সঞ্চারী বলে; অর্থাৎ স্থায়ী, আরোহী ও অবরোহী বর্ণ-তিনটির সংমিশ্রণে সঞ্চারীবর্ণের সৃষ্টি হয়।[৫৯] যেমন কল্লিনাথ বলেছেন সারী সারীগা সনিধা সারীগা প্রভৃতি। মতঙ্গ বৃহদ্দেশীতে মালবকৌশিকের সঞ্চারীবর্ণের নিদর্শন দিয়েছেন—'সা সা স নি ম ম নি ম প নি রি রি পা পনীপানিধ'। মতঙ্গের সময়ের অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম শতাব্দীর আগেই ভারতীয় সমাজে অভিজাত বা মার্গপ্রকৃতিসম্পন্ন দেশীরাগ হিসাবে মালবকৈশিক-রাগের বিকাশ হয়েছে ও তখন মালবকৈশিক ছিল সম্পূর্ণ ষাড়বজাতির রাগ। মতঙ্গ বলেছেন: "দুর্বলো ধৈবতেন স্যাদ্ * *। পঞ্চমং কেচিদিচ্ছন্তি * * * গান্ধারং চ তথা চান্যে"। মালবকৈশিকের পূর্ণ-পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন: "মালবকৈশিকো মধ্যমগ্রামসম্বন্ধঃ, কৈশিকীজাতের্জাতত্বাৎ। ষড়্জো গ্রহোংঽশো ন্যাসশ্চ। ধৈবত স্যাত্রাল্পত্বম্। প্রয়োগো নিষাদোঽত্র কাকলিঃ। পূর্ণস্বরশ্চায়ম্। বিপ্রলম্ভে শৃঙ্গারে চাস্য বিনিয়োগঃ। বীরাদিকো রসঃ। ষড়্জাদিমূর্ছনা। আরোহী বর্ণঃ।

৫৮। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সংস্করণ) ২৯।২০-২১;
কাব্যমালা-সংস্করণে এর পাঠভেদ আছে।

৫৯। 'যত্রৈকস্যৈব স্বরস্য স্থিত্বা স্থিত্বা বিলম্ব্য বিলম্ব্য প্রয়োগ উচ্চারণং স স্থায়ীবর্ণো বিজ্ঞেয়ঃ। * * যত্র স্বরণামারোহঃ স আরোহী-বর্ণঃ, যত্রাবরোহঃ সোঽবরোহী-বর্ণ ইতি। এতেষাং ত্রয়াণাং সংমিশ্রণাৎপরস্পরলক্ষণসংচরণাৎ সঞ্চারী-বর্ণ উক্তঃ।'—সিংহভূপাল

অলংকারঃ প্রসন্নমধ্যমঃ। দক্ষিণে কলা বার্তিকে কলা চিত্রে কলা। স্বরপদগীতে চচ্চৎপুটাদি তালঃ"। দেশীরাগে বর্ণ, অলংকার, কলা, তাল, মূর্ছনা, রস, ভাব প্রভৃতির প্রয়োগপদ্ধতি গান্ধর্ব জাতিরাগ ও গ্রামরাগ থেকে নেওয়া হয়েছিল। ভরত জাতিরাগের পরিচয়ে এ'সকলগুলির বিশ্লেষণ তাঁর নাট্যশাস্ত্রে করেছেন। বর্ণের সম্বন্ধে ভরত আবার বলেছেন শরীর অর্থে কণ্ঠ থেকে যে গানোপযোগী স্বর সৃষ্টি হয় তা থেকেই বর্ণের উৎপত্তি। মন্দ্র, মধ্য ও তার এই তিন স্থানে এর লীলায়িত গতি। গানেই বর্ণের প্রয়োগ ও বিস্তার হয়।[৬০]

অলংকার সম্বন্ধে ভরত বলেছেন: "বর্ণশ্চত্বার এবৈতে অলংকারাস্তদাশ্রয়াঃ" (২৯।২০)। অলংকার বর্ণের আশ্রয়, আর বর্ণকে আশ্রয় ক'রেই অলংকারের বিকাশ। মতঙ্গ বলেছেন: "অমী বর্ণাস্তু বিজ্ঞেয়াদলঙ্কারাদিসিদ্ধয়ে", অর্থাৎ অলংকারের সিদ্ধির বা সৃষ্টির কারণই বর্ণ। মতঙ্গ অলংকার-শব্দে 'মণ্ডল' বলেছেন: অলঙ্কার-শব্দেন মণ্ডলমুচ্যতে।[৬১] যথা কটককেয়ূরাদিনালঙ্কারেণ নারী পুরুষ বা মণ্ডিতঃ শোভামাবহেৎ, তথা এতৈরলঙ্কারৈঃ প্রসন্নাদিভিরলঙ্কৃতা বর্ণাশ্রয়া গীতির্গাতৃশ্রোতৃণাং সুখাবহা ভবতীতি"। বর্ণের আশ্রয় সাঙ্গীতিক অলংকার গান, গায়ক ও শ্রোতার সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও তাদের আনন্দ দান করে। শার্ঙ্গদেব বলেছেন বিশিষ্ট বর্ণসমূহের নাম 'অলংকার': "বিশিষ্টং বর্ণসন্দর্ভমলংকারং প্রচক্ষতে" (১।৬।৩)। ভরত অলংকারগুলির পরিচয় দিয়েছেন,

প্রসন্নাদিঃ প্রসন্নান্তঃ প্রসন্নাদ্যন্ত এব চ।
প্রসন্নমধ্যশ্চ তথা সমোহন্যস্থির এব চ ॥
স্যান্নিবৃত্তি প্রবৃত্তিশ্চ কম্পিতঃ কুহরস্তথা।
রেচিতব্যস্তথা চৈব প্রেঙ্খোলিতক এব চ ॥

তিনি স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী ও সঞ্চারী-ভেদে প্রসিদ্ধ ত্রিষষ্টি (৬৩টি) অলংকারের নাম ও পরিচয় নাট্যশাস্ত্রের ২৯। ২৫ থেকে ৭৫ শ্লোক পর্যন্ত দিয়েছেন। পরিশেষে তিনি উল্লেখ করেছেন,

এভিরলঙ্কর্তব্যা গীতিবর্ণাবিরোধেন ॥

৬০। শরীরস্বরসম্ভূতা ত্রিস্থানগুণগোচরা।
* * * *
পদলক্ষণসংযুক্তং যদা বর্ণো তু কর্ষতি।
তদা বর্ণস্য নিষ্পত্তির্বিজ্ঞেয়া স্বরসম্ভবা ॥
এতে বর্ণাস্তু বিজ্ঞেয়াশ্চত্বারো গানযোগতঃ।
—নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ২৯।২২-২৪

৬১। সিংহভূপাল টীকায় 'মণ্ডলমুচ্যতে' —মণ্ডলের বর্ণনা করেছেন।

স্থানে চালঙ্কারং কুর্যান্নহ্যুরসি কাঞ্চিকাং বধ্যেৎ।
অতিবহবোঽলঙ্কারা বর্ণবিহীনাস্ত যোক্তব্যাঃ॥

*　　*　　*

অলঙ্কারাস্ত্রয়স্ত্রিংশদেবমেতে ময়োদিতাঃ।[৬২]

তিনি আরো বলেছেন চন্দ্র না থাকলে রাত্রি বা অলংকারবিহীন নারী যেমন সৌন্দর্যহীন হয় তেমনি গানে অলংকার না থাকলে গান অসুন্দর ব'লে প্রতীত হয়। ভরত অলংকারগুলির নামোল্লেখ করেছেন: প্রসন্নাদি, প্রসন্নান্ত, প্রসন্নাদ্যন্ত, প্রসন্নমধ্য, সম, বিন্দু, নিবৃত্তি, প্রবৃত্তি, কম্পিত, কুহর, রোচিতব্য (রেচিত?), প্রেঙ্খোলিতক (প্রেঙ্কোলিত?) মন্দ্রতারপ্রসন্ন, তারমন্দ্রপ্রসন্ন, প্রসার, প্রসাদ, উদ্বাহিত, বেণু, অবলোকিত, নিষ্কূজিতক (নিষ্কূজিত?), উদ্গীত, হ্লাদমান, রঞ্জিত, আবর্তক (আবর্তিত?), পরিবর্তক (পরাবৃত্ত?), উদ্ঘট্টিত, ক্ষিপ্ত, সংপ্রদান, হসিত, হুংকার, সন্ধিপ্রচ্ছাদন, বিধূন, গাত্রবর্ণ (ত্রিবর্ণ?), উদ্বাহিত, উহিত প্রভৃতি। কাশী-সংস্করণের পাঠ ও বিবরণ কাব্যমালা-সংস্করণ[৬৩] থেকে বেশ পৃথক। মতঙ্গ বৃহদ্দেশীতে অলংকারগুলির যে নামোল্লেখ করেছেন তাতে পাঠবিকৃতি আছে। সঙ্গীত-রত্নাকরে শার্ঙ্গদেবের অলংকার-পরিচিতি বরং সুষ্ঠু ও পরিমার্জিত। প্রসন্নাদি অলংকারের পরিচয় দিয়ে ভরত নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখ করেছেন,

ক্রমশো দীপ্যতে যস্ত প্রসন্নাদিঃ স কথ্যতে॥
ব্যস্তোচ্চারিত এবৈষ প্রসন্নান্তোঽভিধীয়তে।
আদ্যন্তয়োঃ প্রশমনাৎ প্রসন্নাদ্যন্ত ইষ্যতে॥
প্রসন্নমধ্যো মধ্যে তু প্রসন্নত্বাদুদাহৃতঃ।
সর্বসাম্যাৎ সমো জ্ঞেয়ঃ স্থিরত্বেকস্বরোঽপি যঃ॥
বিন্দুরেককলাস্তারঃ স্পৃষ্ট্বাতু পুনরাগতঃ।
স্যান্নিবৃত্তঃ প্রবৃত্তশ্চ মন্দং গত্বা সমাগতঃ॥
আক্রীড়িতলয়ো যশ্চ স বেণুঃ পরিকীর্তিতঃ।
কণ্ঠে নিরুদ্ধপবনঃ কুহরো নাম জায়তে॥—প্রভৃতি[৬৪]

৬২। মতঙ্গের বৃহদ্দেশীতে অলঙ্কার-বর্ণনা (ত্রিবান্দ্রম সংস্করণে পাঠভেদ আছে) পৃ° ৩৫-৪৯

৬৩। কাব্যমালা-সংস্করণ ২৯।২৩-৪৭

৬৪। সঙ্গীত-রত্নাকর ১।৬।৩-১৬৮

শার্ঙ্গদেব প্রসন্নাদি অলঙ্কারের যে পরিচয় দিয়েছেন তা সংজ্ঞায় বা রূপ-বর্ণনায় পৃথক্ হ'লেও বক্তব্য এক ও অভিন্ন। তিনি বলেছেন প্রসন্নাদি অলঙ্কারের স্বর প্রথমের দু'টি মন্দ্র (খাদ) ও তৃতীয়টি তার (চড়া): "মন্দ্রদ্বয়াৎপরে তারে প্রসন্নাদিরুদীরিতঃ। স স সা (=স্ স্ র্স)।[৬৫] অর্থাৎ মন্দ্রস্বর দু'বার উচ্চারণ ক'রে তারপর তারস্বর একবার উচ্চারণ করলে প্রসন্নাদি অলঙ্কার হয়। এর বিপরীত হ'ল প্রসন্নান্ত: "তদ্বৈলোম্যে প্রসন্নান্তঃ"। অর্থাৎ এতে প্রথমে তার-স্বর একবার ও পরে দু'বার মন্দ্রস্বর উচ্চারিত হয়—স স স (র্স স্ স্)। প্রসন্নাদ্যন্ত [প্রসন্ন আদি (১ম) + অন্ত (২য়)] অলঙ্কারে প্রথমে মন্দ্রস্বর, মধ্যে তার-স্বর ও শেষে মন্দ্রস্বর উচ্চারিত হয়—স স স (স্ র্স স্) ও প্রসন্নমধ্য-অলঙ্কারে তার বিপরীত, অর্থাৎ প্রথমে তার-স্বর, মধ্যে মন্দ্রস্বর ও শেষে আবার তার-স্বর—স স স (র্স স্ র্স)। ত্রিষষ্টি ৬৩টি অলঙ্কার ছাড়া শার্ঙ্গদেব বলেছেন অনেকে আবার তারমন্দ্রপ্রসন্ন, মন্দ্রতারপ্রসন্ন, আবর্তক, সংপ্রদান, বিধৃত, উপলোল ও উল্লাসিত—এই সাতটি মাত্র অলঙ্কার স্বীকার করেন: "অন্যেঽপি সপ্তালংকারা গীতজ্ঞৈরুপদর্শিতাঃ" (১।৬।৫৪)।[৬৬] শার্ঙ্গদেব ও টীকাকার কল্লিনাথ এবং সিংহভূপাল এদের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। ভরত নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখ করেছেন গীত ও বর্ণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অলঙ্কার প্রয়োগ করা উচিত: "এভিরলঙ্কর্তব্যা গীতির্বর্ণাবিরোধেন" (২৯।৭৩)। মতঙ্গ বৃহদ্দেশীতে ভরতের কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন (১৬৭ শ্লোক)। বর্ণের ব্যবহার না ক'রেও অনেক অলঙ্কারের প্রয়োগ হয়। শার্ঙ্গদেব বলেছেন প্রকৃতপক্ষে অলঙ্কারের কোন সীমায়িত সংখ্যা নাই: "অনন্তত্বাত্তু তে শাস্ত্রে"। স্বরের রঞ্জনাশক্তি (অনুরঞ্জনীশক্তি) বাড়াবার ও তার স্বরূপের জ্ঞানের জন্য এবং স্থায়ী প্রভৃতি বর্ণের বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য অলঙ্কারের প্রয়োজন: "রক্তিলাভ স্বরজ্ঞানং বর্ণাঙ্গানাং বিচিত্রতা, ইতি প্রয়োজনান্যাহুঃ * *"।

৬৫। প্রাচীন স্বরলিপির পরিচয়-প্রসঙ্গে শার্ঙ্গদেব বলেছেন শিরে বিন্দু (স) থাকলে মন্দ্র ও শিরে রেখা (সা) থাকলে তার হয়। সিংহভূপাল (১।৪।১২-১৪) প্রাচীন স্বরচিহ্ন সম্বন্ধে বলেছেন: "লিপৌ বিন্দুশিরা মন্দ্রো জ্ঞাতব্যঃ, উর্ধ্বরেখাশিরাস্তু তারঃ, মন্দ্রো বিন্দুশিরা ভবেৎ। উর্ধ্বরেখাস্তারো লিপৌ ইতি বক্ষ্যমানত্বাৎ'।"

৬৬। সঙ্গীত-রত্নাকর ১।৬।৫৪-৬২

স্বরের প্রসঙ্গে ভরত অলঙ্কারের পর ধাতুর উল্লেখ করেছেন (কাশী-সংস্করণ ২৮।১৪)। ধাতু সম্বন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন,

অত উর্ধ্বং প্রবক্ষ্যামি সাধুবাদ্যস্য লক্ষণম্।
বিস্তারঃ করণশ্চৈব আবিদ্ধো ব্যঞ্জনস্তথা।
চত্বারো ধাতবো জ্ঞেয়া বাদিত্রকরণাশ্রয়াঃ;
সংঘাতজশ্চ সমবায়জশ্চ বিস্তারজোঽনুবন্ধশ্চ।
জ্ঞেয়শ্চতুঃপ্রকারো ধাতুর্বিস্তারসংজ্ঞস্তু ॥[৬৭]

বিস্তার, করণ, আবিদ্ধ ও ব্যঞ্জন এই চার রকম ধাতু। মাগধী, অর্ধমাগধী প্রভৃতি গীতির বর্ণনার পর ভরত বাদ্যযন্ত্র বা যন্ত্রসঙ্গীতের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে বিস্তারাদি চার ধাতুর উল্লেখ করেছেন। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বীণাই শ্রেষ্ঠ। ভরত সুষ্ঠু ধাতুগুলির উপযোগিতা স্বীকার করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন: "ইতি দশবিধঃ প্রযোজ্যো বীণায়াং ব্যঞ্জনো ধাতুঃ" (২৯।৯৫) ও "পঞ্চবিধো বিজ্ঞেয়ো বীণাবাদ্যে করণধাতুঃ" (২৯।৯৬) প্রভৃতি। শার্ঙ্গদেব বলেছেন যা বীণাবাদ্যকে পরিপুষ্ট ও তার রঞ্জনাশক্তি দান করে তাকেই নির্দোষ 'নাদ'-রূপ ধাতু বলে। এই ধাতু প্রহার (সংঘাত বা আঘাত) থেকে উৎপন্ন হ'য়ে স্বরসৃষ্টির কারণ হয়,

পুষ্ণন্তি বীণাবাদ্যং যে রক্তিং দধতি চাতুলাম্ ॥
কুর্বন্ত্যদুষ্টপুষ্টিং চ তান্ ধাতূনধুনা ব্রুবে।
যে প্রহারবিশেষোত্থাঃ স্বরাস্তে ধাতবো মতাঃ ॥[৬৮]

ধাতু সংখ্যা মোট ৩৪টি। বিস্তার, করণ, আবিদ্ধ ও ব্যঞ্জন এই চারটি প্রধান ধাতুর মধ্যে বিস্তারধাতু বিস্তারজ, সংঘাতজ, সমবায়জ ও অনুবন্ধজ ভেদে আবার

৬৭। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ২৯।৮১-৮২
কিন্তু কাব্যমালা সংস্করণ নাট্যশাস্ত্রে শ্লোকগুলির পাঠ ভিন্ন রকমের আছে। যেমন,

গীতয়ো গদিতাঃ সম্যগ্ ধাতুংশ্চৈব নিবোধত।
বিস্তারঃ করণশ্চ স্যাদাবিদ্ধো ব্যঞ্জনস্তথা।
চত্বারো ধাতবো জ্ঞেয়াশ্চদ্যন্তকরণাশ্রয়াঃ।
সংঘাতজোঽয়ং সমবায়জশ্চ বিস্তারজোঽনুবন্ধকৃতঃ।
জ্ঞেয়শ্চতুঃপ্রকারো ধাতুর্বিস্তারসংজ্ঞশ্চ।

—নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা সং) ২৯।৫১-৫৩

৬৮। সঙ্গীত-রত্নাকর (বাদ্যাধ্যায়) ৬।১২৪-১২৫

চার শ্রেণীতে বিভক্ত। এদের মধ্যে সংঘাতজ পুনরায় দ্বিরুত্তরাদি ভেদে চার রকম ও সমবায়জ ত্রিরুত্তাদি ভেদে আট রকম। এভাবে দেখা যায় প্রধান বিস্তার ধাতুর রূপ চৌদ্দ রকম। করণধাতুর রূপ রিভিতাদিভেদে পাঁচ রকম। আবিদ্ধধাতু ক্ষেপাদিভেদে পাঁচ রকম ও ব্যঞ্জনধাতু পুষ্পাদিভেদে দশ রকম = মোট ৩৪ রকম। ধাতুগুলির বিস্তৃত পরিচয় নাট্যশাস্ত্রে ও সঙ্গীত-রত্নাকরে দেওয়া আছে।[৬৯]

পরিশেষে ভরত উল্লেখ করেছেন: "অলঙ্কারাশ্চ বর্ণাশ্চ গীতয়শ্চ শরীরজাঃ" (২৮।১৪)। প্রকৃতপক্ষে বর্ণ, অলঙ্কার ও গীত (মাগধী প্রভৃতি) একে অন্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। ভরত নিজেই উল্লেখ করেছেন: "বর্ণাশ্চত্বার এবৈতে অলঙ্কারাস্তদাশ্রয়াঃ" (২৯।২০) এবং "এভিরলঙ্কার্তব্যা গীতির্বর্ণাবিরোধেন" (২৯।৭৩)। পুনরায় তিনি উল্লেখ করেছেন: "শরীরস্বরসম্ভূতা * * চত্বারো লক্ষণোপেতা বর্ণা হেতে প্রকীর্তিতাঃ" (২৯।২২)। সুতরাং অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত বর্ণ, অলঙ্কার ও গীতের এবং এমন কি তাদের উপাদানগুলির সৃষ্টিও শরীরের চেষ্টা থেকে হয়। বাতাস কণ্ঠে আহত হ'য়ে কণ্ঠে এবং অঙ্গুলি বা কোণের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হ'য়ে বাদ্যযন্ত্রে ধ্বনি বা স্বরের সৃষ্টি হলেও শরীরের চেষ্টাই তার কারণ। অবশ্য শারীরিক চেষ্টা বা কর্মের পেছনে মন ও আত্মার প্রেরণাই মূলকারণ।

গান্ধর্বের স্বরগোষ্ঠিভুক্ত উপাদানের পর তালের বা তালশ্রেণীভুক্ত উপাদানের পরিচয় দিতে গিয়ে ভরত আবাপ, নিষ্ক্রাম, বিক্ষেপ, প্রবেশক, শম্যা, সন্নিপাত, পরিবর্ত, বস্তু, বিদারী প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। তাল দু'রকম: নিঃশব্দ ও সশব্দ: "দ্বিপ্রকারস্ত্বয়ং তালো নিঃশব্দঃ শব্দবাংস্তথা" (কাশী সং ৩১।২৯)। আবাপ, নিষ্ক্রাম, বিক্ষেপ ও প্রবেশক এ'চারটি নিঃশব্দ, আর শম্যা, তাল, ধ্রুব ও সন্নিপাত এ'চারটি সশব্দ।[৭০] নিঃশব্দ ও সশব্দ তালগুলির বর্ণনা দিতে গিয়ে ভরত

৬৯। অঙ্গধাতুগুলির নাম একটু ভিন্ন। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ২৯।৩০-৯৯ এবং সঙ্গীত-রত্নাকর (বাদ্যাধ্যায়) ৬।১২৭-১৬৪

৭০। তত্রাবাপোঽথ নিষ্ক্রামো বিক্ষেপশ্চ প্রবেশকঃ
চতুর্বিকল্পং ইত্যেবং নিঃশব্দঃ কথিতো বুধৈঃ।
শম্যাতালো ধ্রুবশ্চেতি সন্নিপাতস্তথা পরঃ॥
ইতি শব্দেন সংযুক্তো বিজ্ঞেয়শ্চ চতুর্বিধম্।
—নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ৩১।৩০-৩২

বলেছেন (১) উত্থিত হস্তের অঙ্গুলি কুঞ্চনের নাম 'আবাপ', (২) অধস্তলের অঙ্গুলিগুলি প্রসারিত করার নাম 'নিষ্ক্রাম', (৩) উত্থিত হস্তের বিস্তৃত অঙ্গুলিকে দক্ষিণদিকে রাখার নাম 'বিক্ষেপ' ; (৪) পুনরায় অঙ্গুলি সংকোচের নাম 'প্রবেশ' ; (৫) দক্ষিণ হস্তে তালি দেওয়ার নাম 'শম্যা' ; (৬) বামহস্তে তালি দেওয়ার নাম 'তাল' ; (৭) অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমাঙ্গুলির সাহায্যে ছোটিকা দিতে দিতে হস্ত নমিত করার নাম 'ধ্রুব', ও (৮) উভয় হস্তে তালি দেওয়ার নাম 'সন্নিপাত'।[৭১] গীতি প্রভৃতির পরিমাণ-নির্ধারক কাল বা সময়ের নাম 'তাল'। লঘু, গুরু, বিলম্বিত, মধ্য, দ্রুত প্রভৃতি তালভেদের নাম 'লয়'। সিংহভূপাল বলেছেন : "লঘ্বাদয়ো লঘুগুরুপ্লুতদ্রুতাদয়ঃ, তৈঃ মিতা পরিচ্ছিন্নঃ কালস্তাল ইত্যুচ্যতে"। মার্গ ও দেশীভেদে তাল আবার দু'রকম। মার্গতালের ক্রিয়া বা কাজ দু'রকম : নিঃশব্দক্রিয়া ও সশব্দক্রিয়া। নিঃশব্দক্রিয়াকেই 'কলা' বলে। সেই কলাই আবাপাদি-ভেদে চার রকম। মাত্রাকেও অনেক সময় 'কলা' বলে। চিত্রা, বার্তিক ও দক্ষিণা ভেদে কলা আবার তিন রকম। অনেকে ধ্রুবাকলা স্বীকার ক'রে কলা চার রকমও বলেন। ভরত উল্লেখ করেছেন দৈনিন্দিন ব্যবহারের জন্য লৌকিক যে কলা, কাষ্ঠা, নিমেষ প্রভৃতি ক্ষণভেদ তাদের ঠিক 'তালকলা' বা তালের কিংবা বাদ্যের উপযোগী কলা বলে না। মাত্রা ও কলা সম্বন্ধে ভরত উল্লেখ করেছেন,

৭১। সর্বাঙ্গুলিসমাক্ষেপ আবাপ ইতি সংজ্ঞিতঃ॥
নিষ্ক্রামোঽধোগতঃ সব্যাদঙ্গুলীনাং প্রসারণম্।
তস্য দক্ষিণতঃ ক্ষেপাৎ বিক্ষেপঃ পরিকীর্তিতঃ॥
নিবর্তনং চ হস্তস্য প্রবেশোঽধোমুখস্য চ।
কৃত্বাঙ্গুলীনামাক্ষেপং নিষ্ক্রামং চ ভবেদথ॥
* * * *
শম্যাতালশ্চ বিজ্ঞেয়ঃ সন্নিপাতস্তথৈব চ।
শম্যা দক্ষিণহস্তঃ স্যাত্তালঃ পাতস্তু বামতঃ।
হস্তয়োস্তু সমঃ পাতঃ সন্নিপাত ইতি স্মৃতঃ।
ধ্রুবং তু মাত্রিকং পাতঃ রাগমার্গপ্রযোজকঃ॥

—নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ৩১।৩৩-৩৯

এ'ছাড়া সঙ্গীতসময়সারে ৭।৬-১০ ; সঙ্গীত-রত্নাকরে (তালাধ্যায়) ৫।৫-১০ এবং রত্নাকরের কল্লিনাথ ও সিংহভূপাল-কৃত টীকা দু'টি দ্রষ্টব্য। 'অভিনবভারতী' টীকায় আচার্য অভিনবগুপ্তও আবাপাদি তালের পরিচয় দিয়েছেন (বরোদা-সংস্করণ নাট্যশাস্ত্র, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৩০)।

নিমেষাঃ পঞ্চ মাত্রা স্যান্মাত্রাযোগাৎ কলা স্মৃতা।
নিমেষ পঞ্চ বিজ্ঞেয়া গীতকালে কলান্তরম্ ॥
ততঃ কলাকালকৃতো লয় ইত্যভিসংজ্ঞিতঃ।
ত্রয়ো লয়াস্তু বিজ্ঞেয়া দ্রুতমধ্যবিলম্বিতাঃ ॥
যস্তত্র মন্দোঽথ লয়স্তৎপ্রমাণকলা ভবেৎ।
ত্রিবিধা সা চ বিজ্ঞেয়া ত্রিমার্গা নিয়তা বুধৈঃ ॥
চিত্রে দ্বিমাত্রা কর্তব্যা বার্তিকে দ্বিগুণা তু সা।
চতুর্গুণা দক্ষিণা স্যাদিত্যেবং ত্রিবিধা কলা ॥
কলাকালপ্রমাণেন তাল ইত্যভিধীয়তে।
চতরস্রশ্চ ত্র্যস্রশ্চ তালো বিবিধ এব হি ॥[১২]

বস্তু ও বিদারী সম্বন্ধে ভরত বলেছেন সকল গীতের অংশ বা অবয়বের নাম 'বস্তু' : 'সর্বেষামেব গীতানাং বস্তুষ্ববয়বেষু চ' (৩১।২৬৮)। পদ ও বর্ণের সমাপ্তির নাম 'বিদারী' : 'পদবর্ণসমাপ্তস্তু বিদারীত্যভিসংজ্ঞিতা' (৩১।২৭০)। অংশ, ন্যাস অপন্যাস প্রভৃতিকেও 'বস্তু' বলে : 'ন্যাসাপন্যাসমংশানান্তং বস্তু তৎপরিকীর্তিতম্' (৩১।২৭০)। বিদারীর আভিধানিক অর্থ সম্বন্ধে ভরত বলেছেন : 'বিদারয়ন্তি যস্মাদ্ধি পরমধ্যস্বরো যদা, তদা বিদারী বিজ্ঞেয়া' (৩১।২৭১)। গীতের খণ্ড বা বিভাগকে 'বিদারী' বলে। সিংহভূপাল বলেছেন : 'গীতস্য খণ্ডং শকলং বিদারীত্যুচ্যতে'। সামুদ্গ অর্ধসামুদ্গ ও বিবৃত এই তিন প্রকার ভেদ ছাড়া বিদারী আবার মহাবিদারী ও অবান্তরবিদারী ভেদে দু'রকম। যার দ্বারা গানের সমস্ত অংশ, অবয়ব বা বস্তুকে বোঝায় তাকে 'মহাবিদারী' ও যা পদ ও বর্ণের দ্বারা শেষ হয় তাকে 'অবান্তরবিদারী' বলে। আসলে গানের বা আলাপের ছোট ছোট ভাগ বা খণ্ডকে 'বিদারী' বলে। সেদিক থেকে প্রাচীন উদ্গ্রাহ, ধ্রুব, মেলাপকাদি ধাতু ও বর্তমান স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ গানের এই চারটি অংশ বা ভাগও বিদারীশ্রেণীভুক্ত। মতঙ্গ গ্রহ ও অংশের প্রসঙ্গে বিদারী সম্বন্ধে বলেছেন : "নমু বিদারী-শব্দেন কিমুচ্যতে। পাদানং স্যাদিত্যাদি বিদারণা খণ্ডনমিতি যাবৎ। গীতকেশী গীতখণ্ডমিতি যাবৎ"।

বিদারী প্রভৃতির মতো 'যতি' এবং 'প্রকরণ'ও তালশ্রেণীর অন্তর্গত। তালের লয়কে প্রয়োগ করার নিয়ম বা পদ্ধতিকে 'যতি' বলে। যতিও তিন রকম : সমা, স্রোতোগতা ও গোপুচ্ছা। (১) আদিতে, মধ্যে ও অন্তে যদি একটি

১২। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সংস্করণ) ৩১।৩-৭

লয়ের সমাবেশ থাকে তবে তাকে 'সমাযতি' বলে। লয় আবার দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত ভেদে তিন রকম হয়; (২) গীতির আদিতে বিলম্বিত, মধ্যে মধ্য ও অন্তে দ্রুতলয়ের যদি সমাবেশ থাকে তবে তাকে 'স্রোতোগতা-যতি' বলে। অবশ্য এ' এক রকমের স্রোতোগতা। অন্য রকম হ'ল গান বা গীতির তিনটি ভাগ কল্পনা করলে প্রথম ভাগে বিলম্বিত লয়, দ্বিতীয় ভাগে মধ্যলয় ও তৃতীয় ভাগে দ্রুতলয়ের সমাবেশ থাকে—এর নাম 'স্রোতোগতা-যতি'। (৩) গীতির পূর্বভাগে দ্রুত, মধ্যভাগে মধ্য ও শেষভাগে বিলম্বিত লয়ের সমাবেশ থাকলে 'গোপুচ্ছা-যতি' হয়। অনেকে আবার গীতির প্রথমে দ্রুত, মধ্যে বিলম্বিত ও শেষেও বিলম্বিত লয়ের সমাবেশকে 'গোপুচ্ছা' বলেন।

মদ্রক, বর্ধমানাদি গীতিকে প্রস্তুত বা গানোপযোগী করার নাম 'প্রকরণ'। সিংহভূপাল বলেছেন: 'প্রক্রিয়ন্তে প্রস্তূয়ন্তে মদ্রকাদীনীতি প্রকরণানি'। মার্গতালে প্রকরণাখ্য গীতিগুলি গান করা হ'ত। মদ্রক, অপরান্তক, উল্লোপ্যক, প্রকরী, ওবেণক, রোবিন্দক এবং উত্তর, ছন্দক, আসারিত, পাণিকা, ঋক্, গাথা ও সাম—মোট চৌদ্দটি প্রকরণাখ্য গীতি। ভরত বলেছেন: "ঋগ্ গাথা পাণিকা চৈব সপ্তরূপং প্রকীর্ণকম্" (৩২।৫২৮)। শিবস্তুতি হিসাবে এদের গান করা হ'ত: "গীতানীতি চতুর্দশ, শিবস্তুতৌ প্রযোজ্যানি মোক্ষায় বিদধে বিধিঃ।[৭৩] পূর্বেই এ'সমস্ত গীতির পরিচয় আমরা 'মহাভারতে সঙ্গীত'-এর আলোচনায় দিয়েছি।

ভরত যেখানে বিভিন্ন গীতির বস্তু (অংশ বা অবয়ব) বিভাগ করেছেন, সেখানে তিনি গীতির চার ভাগকে 'পাদভাগ' বলেছেন: 'তস্যাংশৈ চতুর্ভাগঃ পাদভাগঃ প্রকীর্তিতঃ' (৩১।৩০৯)। 'পাদভাগ' আসলে গীত বা গীতির অবয়ব। ভরত আবাপ থেকে পাদভাগ পর্যন্ত তালের একুশটি উপাদানকে গান্ধর্বের অপরিহার্য অঙ্গ বলেছেন।

এরপর পদের পরিচয়। স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ, সন্ধি, বিভক্তি, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত, তদ্ধিত, ছন্দ, বৃত্ত, জাতি প্রভৃতি পদের উপাদান। ভরত ৩১শ অধ্যায়ে (কাশী-সংস্করণ) দু'টি বৃত্তের কথা বলেছেন: প্রবৃত্ত ও অবগাঢ়: "প্রবৃত্তমবগাঢ়ং চ দ্বিবিধং বৃত্তমুচ্যতে" (৩১।২৭৪)। এদের মধ্যে প্রবৃত্তের রূপ হ'ল অবরোহী বা নিম্নগতিসম্পন্ন ও অবগাঢ়ের আরোহী বা উচ্চগতিসম্পন্ন: "আরোহিত্বাত্ত্বগাঢ়ং তু প্রবৃত্তমবরোহী চ" (৩১।২৭৪)। আরোহণগতি আবার দু'রকম। পুনরায় ধ্রুবাগানের

৭৩। সঙ্গীত-রত্নাকর (তালাধ্যায়) ৫।৫৩-৫৬

প্রসঙ্গে ভরত ৩২শ অধ্যায়ে (কাশী-সংস্করণ) বলেছেন সকল জাতিই বৃত্ত থেকে সৃষ্ট: "জাতয়ো বৃত্তসম্ভবাঃ" (৩২।২৮৬), আর সকল জাতিরই[১৪] তিনটি ক'রে বৃত্ত: গুরুপ্রায়, লঘুপ্রায় ও গুরুলঘু-অক্ষরপ্রায়: "সর্বাসামেব জাতীনাং ত্রিবিধং বৃত্তমিষ্যতে, গুরুপ্রায়ং লঘুপ্রায়ং গুরুলঘ্বক্ষরং তথা" (৩২।৩৯)। জাতি ধ্রুবাগানের সঙ্গে সম্পর্কিত। গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুভ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, জগতী প্রভৃতি ছন্দ জাতির প্রাণ অথবা অঙ্গ। ভরত নাট্যশাস্ত্রের (কাশী-সংস্করণ) ৩২ অধ্যায়ে ৩৪—৩৮ শ্লোকগুলিতে অনুষ্টুভাদি ছন্দকে সম্পর্কিত ক'রে ধ্রুবার জাতির পরিচয় দিয়েছেন। জাতিগুলি হ'ল অযুক্ত, প্রতিষ্ঠা, মধ্যগায়ত্রী, চপলা, উদগতা, ধৃতি প্রভৃতি। মোটকথা জাতিতে ছন্দ ও বৃত্ত থাকেই।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে ভরত নাট্যশাস্ত্রের ৩২শ অধ্যায়ে স্বর, তাল ও পদের পরিচয়ে বলেছেন যা-কিছু অক্ষর দিয়ে তৈরী তাই 'পদ' নামে অভিহিত[১৫]। পদই গান্ধর্বের স্বর এবং তালের দ্যোতক ও অনুভাবক, আর তারি জন্য গান্ধর্বের অপরিহার্য অঙ্গ বা অবয়ব হিসাবে পদকে 'বস্তু' বলা হয়েছে: "পদং তস্য ভবেদ্‌বস্তু স্বরতালানুভাবকম্"। পদ নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ-ভেদে দু'রকম। তালযুক্ত সতাল ও তালবিহীন অতাল-ভেদে তারা আবার দু'রকম। অতাল ও অনিবদ্ধ গান হ'ল আলপ্তি বা আলাপাদি, আর সতাল ও নিবদ্ধ গান সর্বদাই অক্ষর, ছন্দ ও যতিসম্পন্ন হয়। এ' সম্বন্ধে পূর্বে বিস্তৃতভাবে অবশ্য আলোচিত হয়েছে। স্বর, তাল ও পদের সমবেত রূপই গান্ধর্ব বা মার্গগান। ভরত নাট্যশাস্ত্রের ২৮শ থেকে ৩৩শ অধ্যায়গুলিতে জাতিরাগগান ও ধ্রুবাগান তথা গান্ধর্বের বিশেষভাবে পরিচয় দিলেও নাট্যশাস্ত্রের সকল অধ্যায়গুলিতে কিছু-না-কিছু তাদের অনুশীলন করেছেন এবং ২৮শ অধ্যায়ের ১৩-১৮ শ্লোকগুলিতে (কাশী-সংস্করণ) সমগ্র নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীত-আলোচনার তিনি মূলসূত্রের পরিচয় দিয়েছেন বল্লেও অত্যুক্তি হয় না।

গান্ধর্বের স্বর হিসাবে ভরত শিক্ষাকার নারদের মতো লৌকিক ষড়্‌জাদি সাত স্বর ও তাদের দশ-লক্ষণের পরিচয় দিয়াছেন। লক্ষ্য করার বিষয় যে, পরবর্তী গ্রন্থকারেরা স্বরের পরিচয় দিতে গিয়ে যেমন তাদের জাতি, কুল,

১৪। এই 'জাতি' কিন্তু জাতিরাগ বা জাতিগান নয়। জাতি বল্‌তে এখানে গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দযুক্ত ধ্রুবাগানের জাতি বা প্রকৃতিগত রূপ—অযুক্তা, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি।

১৫। যৎকিঞ্চিদক্ষারকৃতং তৎসর্বং পদসংজ্ঞিতম্। —নাট্যশাস্ত্র ৩২।২৬

বর্ণ, দেবতা, স্থান প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন ভরত তা করেন নি। নারদও নারদীশিক্ষায় (খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী) উল্লেখ করেছেন: "ষড়্জশ্চ ঋষভশ্চৈব গান্ধারো মধ্যমস্তথা, পঞ্চমো ধৈবতশ্চৈব নিষাদঃ সপ্তমঃ স্বরঃ" (২।৫), কিন্তু স্বরগুলির কোন অধিপতি দেবতা, নক্ষত্র, রাশি, কুল, জাতি প্রভৃতির নির্দেশ দেন নি। অবশ্য মূর্ছনার প্রসঙ্গে তিনি দেব, পিতৃ ও গন্ধর্ব কুলের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু লৌকিক সাত স্বরের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নাই। খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম শতাব্দীতে মনে হয় প্রথম মতঙ্গই তার বৃহদ্দেশীতে ষড়্জাদি সাত স্বরের ঋষি, দেবতা, কুল প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। সুতরাং একথা ঠিক যে এ' সকল তান্ত্রিকী, পৌরাণিকী ও জ্যোতিষীকী ধারণা খৃষ্টীয় ২য়-৩য় শতাব্দীর পরে সঙ্গীত-সমাজে সৃষ্টি হয়েছিল। শাস্ত্রী মতঙ্গ (৫ম-৭ম শতাব্দী) সাত স্বরের নামের অভিধান বা ব্যাকরণগত অর্থের সার্থকতা দেখিয়া বলেছেন,

দেবকুলসমুৎপন্নাঃ ষড়্জগান্ধারমধ্যমাঃ।
পিতৃবংশসমুৎপন্নঃ স্বরোঽসৌ পঞ্চমঃ কিল ॥
ঋষিবংশসমুৎপন্নৌ স্বরাবৃষভধৈবতৌ।
অসুরাণাং কুলে জাতো নিষাদঃ স নি-সংজ্ঞিতঃ ॥
শূদ্রজাতিসমুৎপন্নৌ তৎ কাকল্যান্তরৌ স্বরৌ।
পদ্মপত্রপ্রভঃ ষড়্জ ঋষভঃ শুকবর্ণকঃ ॥

* * *

ষড়্জস্য দৈবতং ব্রহ্মা ঋষভো বহ্নিদৈবতঃ ॥ —প্রভৃতি

অবশ্য ভরত নাট্যশাস্ত্রে স্বরের রস ও ভাবের পরিচয় দিয়েছেন) সঙ্গীত-রত্নাকরের টীকায় কল্লিনাথ (১৪৪৬-২৪৬৫ খৃঃ) সাত স্বরের তান্ত্রিক বীজ প্রভৃতিরও উল্লেখ করেছেন: "সরিগদীনাং মতঙ্গাভিমত উদ্ধারক্রম **। হরিবীজমকারঃ। সপ্তমস্য দ্বিতীয়ং কামবীজযুক্তং দ্বিতীয়স্বরমুদ্ধরেৎ। কামবীজ-মিকারঃ" প্রভৃতি। মতঙ্গও তাঁর বৃহদ্দেশীতে এগুলির আভাস দিয়েছেন। বৈদিকী ও তান্ত্রিকী ধারণা-দু'টি সমাজের সকল বিষয়েই আরোপিত দেখা যায় ও অধ্যাত্মমুখী মানুষের পক্ষে সেই ধারণা গ্রহণ করা স্বাভাবিক। কিন্তু খৃষ্টপূর্ব অব্দে বা খৃষ্টীয় শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে যে এই তান্ত্রিকী বা জ্যোতিষীকি ধারণা সঙ্গীতে প্রবেশ লাভ করেনি তার নিদর্শন নারদীশিক্ষায় ও নাট্যশাস্ত্রে চাক্ষুষভাবে পাওয়া যায়। সঙ্গীতের ঐতিহাসিক আলোচনার ক্ষেত্রে এই ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করার বিষয়।

সঙ্গীতে বাদী-সংবাদী-সম্বন্ধ বা স্বরসম্বাদ বিশেষ প্রয়োজনীয়। খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে সাঙ্গীতিকী প্রতিভা ও নিরীক্ষাবৃত্তি বা সমীক্ষণপ্রণালীই সাতস্বরের পারস্পরিক সম্বন্ধ তথা নৈকট্য, দূরত্ব ও সমতার সম্বন্ধগুলি আবিষ্কার করেছে। সঙ্গীতে অংশ বা বাদী, সংবাদী, অনুবাদী ও স্বরসংগতি একান্ত নিরীক্ষারই পরিণতি। শ্রুতিসংখ্যার দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় ষড়্জ, মধ্যম ও পঞ্চম এই তিনটি স্বরেই চারটি ক'রে শ্রুতির সমাবেশ। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিনটি বৈদিক স্বর তথা স্থানস্বর থেকে যে লৌকিক ষড়্জাদি স্বরের বিকাশের কথা বলেছেন তাতেও দেখা যায় এই ২, ৩, ৪ শ্রুতির সাম্য রক্ষা ক'রে ষড়্জাদি স্বরগুলি উদাত্তাদি থেকে সৃষ্টি হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন,

উচ্চৌ নিষাদগান্ধারৌ নীচাবৃষভধৈবতৌ।
শেষাস্তু স্বরিতা জ্ঞেয়াঃ ষড়্জমধ্যমপঞ্চমাঃ ॥

সুতরাং উদাত্তাদি থেকে ষড়্জাদির বিকাশ-ব্যাপারে দেখা যায়,

স্থানস্বর	লৌকিক স্বর	শ্রুতি-সংখ্যা	অন্তর (ব্যবধান)
(১) উচ্চ (উদাত্ত)	(৭) নিষাদ (৩) গান্ধার	২	ক্ষুদ্রান্তর
(২) অনুদাত্ত (নীচ)	(২) ঋষভ (৬) ধৈবত	৩	মধ্যান্তর
(৩) স্বরিত (মধ্য)	(১) ষড়্জ (৪) মধ্যম (৫) পঞ্চম	৪	বৃহদন্তর

এই নক্সা থেকে জানা যায় নিষাদ ও গান্ধারে ক্ষুদ্রান্তর, ঋষভ ও ধৈবতে মধ্যান্তর এবং ষড়্জ, মধ্যম ও পঞ্চমে বৃহদন্তর বর্তমান। বীণা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে এই অন্তর বা ব্যবধান সহজে উপলব্ধি করা যায়! বীণায় শ্রুতি বা সূক্ষ্মস্বরের দূরত্ব পরিমাপের সময় ভরত স্বরজ্ঞানের ওপর বেশী জোর দিয়েছেন। স্বরজ্ঞানের জন্য আবার স্বরসম্বাদ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার। পণ্ডিত শ্রীনিবাস (১৭০০-১৭৫০ খৃ:) তাঁর 'রাগতত্ত্ববিবোধ' গ্রন্থে স্বরজ্ঞানে স্বরসম্বাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলেছেন,

স্বরজ্ঞানবিহীনেভ্যো মার্গোঽয়ং দর্শিতা ময়া।
স্বরসম্বাদিতাজ্ঞানস্বরস্থাপনকারণম্ ॥

স্বরজ্ঞানের জন্য তাই ষড়্‌জ-পঞ্চমের স্থিতির জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন: "ষড়্‌জ পঞ্চমভাবেন ষড়্‌জে জ্ঞেয়া স্বরা বুধৈঃ"। শ্রীনিবাস ষড়্‌জ-পঞ্চমের মতো, ষড়্‌জ-মধ্যম, ঋষভ-ধৈবত ও গান্ধার-নিষাদেরও সম্বাদসম্বন্ধের জ্ঞানের কথা উল্লেখ করেছেন: "পসয়োঃ রিধয়োশ্চৈব * * মসয়ো-স্বরয়োর্মিথঃ"। বিশেষ ক'রে ষড়্‌জ-পঞ্চম ও ষড়্‌জ-মধ্যম এই স্বরসম্বাদ-দু'টির পরিজ্ঞান থেকে অসংখ্য রাগের সৃষ্টি করা সম্ভব হ'তে পারে।

ভরত বাদী, সংবাদী প্রভৃতির ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন শ্রুতি-সংখ্যার মাধ্যমেই এ'গুলি নির্ণয় করা প্রয়োজন: 'বিজ্ঞেয়ং শ্রুতিযোগতঃ'। অংশ ও বাদী সমানার্থক: "তত্র যো যত্রাংশঃ স তস্য বাদী" (২৮।২১)। যখন বিশেষ কোন ব্যাপারে বা প্রয়োজনে কোন একটি রাগে অংশ হিসাবে কোন স্বরের ব্যবহার হয় তখন তাকে 'বাদী' বলে। অংশের আভিধানিক অর্থ সম্বন্ধে ভরত বলেছেন যেখানে (যে স্বরে) রাগ প্রতিষ্ঠিত ও আরম্ভ হয় তাকেই 'অংশ' বা বাদী বলে: "যস্মিন্ বসতি রাগস্তু যস্মাচ্চৈব প্রবর্ততে" (২৮।৭২)। সুতরাং দেখা যায় ভরতের দৃষ্টিতে গ্রহ ও অংশ সমান অর্থাৎ সমান অর্থের প্রকাশক। ভরত নিজেই এ'সংশয়ের মীমাংসা ক'রে বলেছেন,

গ্রহস্তু সর্বজাতীনামংশ এব হি কীর্তিতঃ।
যৎ প্রবৃত্তং ভবেদ্‌গানং সোঽংশো গ্রহবিকল্পিতঃ ॥[৭৬]

সর্বজাতি বলতে আঠারটি (শুদ্ধ+বিকৃত) জাতিরাগ। মতঙ্গ 'জাতি'-শব্দের সার্থকতা দেখিয়েছেন তিন রকম ভাবে, যেমন (১) শ্রুতি, গ্রহ, স্বর প্রভৃতি থেকে যার জন্ম তাকে জাতি বলে; (২) যা থেকে রস-প্রতীতির আরম্ভ হয় তাকে জাতি বলে, এবং (৩) সকল রাগের সৃষ্টির কারণ ব'লে জাতি।[৭৭] প্রকৃতপক্ষে

৭৬। মতঙ্গের বৃহদ্দেশীতে ঐ শ্লোকটির পাঠভেদ যেমন,

গ্রহস্তু সর্বজাতীনামংশবৎ পরিকীর্তিতঃ।
যৎপ্রবৃত্তো ভবেদ্ গেয়ঃ সোঽংশো গ্রহবিকল্পকঃ ॥

'গেয়' অর্থে গান। মতঙ্গ-উদ্ধৃত শ্লোকের পাঠই অর্থসঙ্গত ব'লে মনে হয় (—বৃহদ্দেশী, ত্রিবান্দ্রম সং পৃঃ ৫৭)।

৭৭। (১) 'শ্রুতিগ্রহস্বরাদিসমূহাজ্জায়ন্তে জাতয়ঃ। অতো জাতয় ইত্যুচ্যন্তে।' (২) 'যস্মাজ্জায়তে

গ্রামরাগাদি সকল রাগই জাতিরাগ থেকে বিকাশ লাভ করে। মতঙ্গ মুনি ভরতের প্রমাণবাক্য উদ্ধৃত ক'রে বলেছেন: "তথা চাহ ভরতমুনিঃ। 'জাতিসম্ভূতত্বাদ্ গ্রামরাগাণামিতি'।[৭৮] যৎ কিঞ্চিদেতদ্ গীয়তে লোকে তৎ সর্বজাতিষু স্থিতমিতি"।

অংশ বা বাদীর প্রসঙ্গে ভরত যা বলেছেন, মতঙ্গ তারই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু অংশ ও গ্রহের সমান অর্থের দ্যোতনার পক্ষে মতঙ্গের যুক্তি ভরতের চেয়ে আরো সাবলীল ও সুদৃঢ়। তিনি অংশ ও গ্রহের মধ্যে কোন ভেদ আছে কিনা প্রশ্ন ক'রে বলেছেন: "নন্বেবং গ্রহাংশয়োঃ কো ভেদঃ ? উচ্যতে। অংশো বাদ্যেব পরং, গ্রহস্তু বাদ্যাদিভেদভিন্নশ্চতুর্বিধঃ। যদ্বা প্রধানাপ্রধানকৃতো ভেদঃ। গ্রহো হ্যপ্রধান-ভূতঃ"। অর্থাৎ মতঙ্গ বলেছেন অংশ একমাত্র বাদীস্বরকে বোঝায়, কিন্তু গ্রহ বাদী, সংবাদী, অনুবাদী ও বিবাদী এই চারটির মধ্যে থেকে বাদীস্বরকে বোঝায়। কিংবা প্রধান ও অপ্রধানের ব্যাপারে অংশ 'প্রধান' ও গ্রহ 'অপ্রধান' স্বররূপে গণ্য হয়। পুনরায় তিনি প্রশ্ন করেছেন কোন্ অংশস্বরকে প্রধান বলা হয় ? "রাগজনকত্বাদ্ ব্যাপকত্বাচ্চাংশস্যৈব প্রাধান্যম্",—অর্থাৎ যেহেতু অংশস্বর রাগের নিয়ামক ও প্রাণস্বরূপ সেজন্য তার (অংশের) প্রাধান্য।

মতঙ্গ অংশের বিভিন্ন অর্থের সার্থকতা দেখিয়ে বলেছেন অংশ বলতে বিভাগ বোঝায়। অর্থাৎ রাগে যে স্বর অধিক ব্যবহৃত হ'য়ে রাগরূপকে চাক্ষুষভাবে অভিব্যক্ত করে সে স্বরই 'অংশ' নামে কথিত হয়: "যস্মিন্নংশে ক্রিয়মাণে রাগাভিব্যক্তির্ভবতি সোঽংশঃ"। কিংবা যে স্বর থেকে গান আরম্ভ হয় তাকে 'অংশ' বলে: "যস্মাদ্বারভ্যঃ গীতঃ প্রবর্ততে সোঽংশঃ"। এ'কথা ভরতেরই অনুরূপ।

শ্রুতির সাহায্যে বাদী, সংবাদী, অনুবাদী ও বিবাদী স্বরগুলি নির্ণয় করার প্রণালী সম্বন্ধে ভরত বলেছেন অংশস্বরই 'বাদী'। আর ন'টি বা তেরোটি শ্রুতির অন্তরে যে স্বর থাকে তা 'সংবাদী,' যেমন ষড়্‌জগ্রামে ষড়্‌জ-মধ্যম, ষড়্‌জ-পঞ্চম, ঋষভ-ধৈবত ও গান্ধার-নিষাদ এবং মধ্যমগ্রামে পঞ্চম-ঋষভ প্রভৃতি সংবাদী।[৭৯]

রসপ্রতীতিরারভ্যত ইতি জাতয়ঃ'। (৩) 'সকলস্য রাগাদে জন্মহেতুত্বাজ্জাতয় ইতি। যদ্বা জাতয় ইতি জাতয়ঃ'।—বৃহদ্দেশী, পৃ° ৫৫-৫৬

৭৮। ভরতের এই উক্তি বা অংশ কিন্তু নাট্যশাস্ত্রের কোন সংস্করণেই (কাশী, কাব্যমালা ও বরোদা) নাই। এথেকে মনে হয় নাট্যশাস্ত্রের অনেক অংশই কালের কবলে লুপ্ত হয়েছে।

৭৯। 'যয়োশ্চ নবকত্রয়োদশশ্রুত্যন্তরে তাবন্যোন্যং সংবাদিনৌ। যথা ষড়্‌জপঞ্চমৌ ঋষভধৈবতৌ গান্ধারনিষাদৌ ইতি ষড়্‌জগ্রামে' প্রভৃতি।—নাট্যশাস্ত্র ২৮।২১

বিবাদীস্বর নির্ণয় করা হয় কুড়িটি স্বরের ব্যবধানে ও সেদিক দিয়ে ঋষভ-গান্ধার ও ধৈবত-নিষাদ স্বরগুলি পরস্পর পরস্পরের বিবাদী-স্বর। সে'রকম অনুবাদী সম্বন্ধে—ঋষভ, গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদ—ষড়্জের, মধ্যম পঞ্চম ও নিষাদ—ঋষভের, মধ্যম পঞ্চম ও ধৈবত—গান্ধারের, ধৈবত পঞ্চম ও নিষাদ—মধ্যমের, ধৈবত ও নিষাদ—পঞ্চমের, ঋষভ পঞ্চম ও মধ্যম—ধৈবতের অনুবাদী। এ'গুলি ষড়্জগ্রামের অনুবাদী। মধ্যমগ্রামের অনুবাদী আবার ভিন্ন।

ভরত বাদী, সংবাদী প্রভৃতির স্বরূপগত অর্থেরও পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: "বদনাদ্বাদী সংবাদাৎসংবাদী বিবাদিত্বাদ্বিবাদী অনুবাদাদনুবাদী" (২৮।২২)। মতঙ্গ বৃহদ্দেশীতে ভরতের এই সূত্রগুলির ওপর আলোকপাত ক'রে বলেছেন: "বদনং হি নামাত্র প্রতিপাদকত্বং বিবক্ষিতং, ন বচনমিতি। কিং তৎ প্রতিপাদয়তি। রাগস্য রাগত্বং জনয়তি"। অর্থাৎ 'বদনাৎ'—'যেহেতু বলে' একথার অর্থ রাগের স্বরূপকে প্রতিপাদন করে সুতরাং বাদী। মোটকথা যে স্বরের ব্যবহার বা প্রয়োগের জন্য রাগের রূপ বিকশিত ও লীলায়িত হয় তাকেই 'বাদী' বলে। তাই বাদীকে মতঙ্গ বলেছেন: "বদনাদ্‌বাদী স্বামিবৎ"। বাদী রাজা, সংবাদী মন্ত্রী ('অমাত্যবৎ'), অনুবাদী পরিজন ('পরিজনবৎ') ও বিবাদী শত্রু ('শত্রুবৎ')। 'সংবাদী' নামের সার্থকতা হ'ল বাদীস্বরের দ্বারা রাগের রূপ বিকাশ লাভ করলে তাকে পরিপুষ্ট ও ব্যবহার-উপযোগী করে যা তাই (সংবাদী-স্বর): "যদ্‌ বাদিস্বরেণ রাগস্য রাগত্বং জনিতং তন্নির্বাহকত্বং নাম সংবাদিত্বম্"। অনুবাদীর বেলায়ও তাই। সংবাদী-স্বর রাগরূপের যতটুকু পরিপুষ্টিসাধন করে তাকে আবার যে স্বর আরো পরিস্ফুটভাবে বিকাশে সাহায্য করে তার নাম 'অনুবাদী'। সংবাদীর পরেই তার উপযোগিতা ব'লে তাকে অনুবাদী বলা হয়েছে ('অনু পশ্চাদ্‌ বদতি সম্পাদয়তি ইতি অনুবাদী')। বিবাদী-স্বর রাগের সৌন্দর্যহানি করে।

স্বরগুলির বাদী, সংবাদী প্রভৃতি নির্ণয় করার জন্য শ্রুতির বা শ্রুতিজ্ঞানের প্রয়োজন হয়: "চতুর্বিধত্বমেতেষাং বিজ্ঞেয়ং শ্রুতিযোগতঃ" (২৮।২০)। শ্রুতি বলতে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে ভরত কিছু বলেন নি। সম্ভবত তিনি ধরেই নিয়েছেন যে নাট্যশাস্ত্রের পাঠক বা অনুশীলকরা শ্রুতির আভিধানিক অর্থ জানেন। নাট্যশাস্ত্রের পথপ্রদর্শক হিসাবে তাই আমরা বৃহদ্দেশীর সাহায্য নিতে পারি। অবশ্য শ্রুতি সম্বন্ধে আমরা আগেও এ'গ্রন্থে আলোচনা করেছি। মতঙ্গ বৃহদ্দেশীতে "মামকীকং মতম্" অর্থাৎ নিজের অভিমত ছাড়া বিশ্বাবসু, কোহল, ভরত প্রভৃতি

আচার্যদের মত উদ্ধৃত করেছেন। তবে একটি জায়গায় "তথাচাহ চতুরঃ" বল্‌তে তিনি কোন্ প্রামাণিক সঙ্গীতশাস্ত্রীকে লক্ষ্য করেছেন তা বোঝা যায় না। বিশ্বাবসু বলেছেন শ্রবণেন্দ্রিয় কর্ণ দিয়ে যে সূক্ষ্ম শব্দ (ধ্বনি) শোনা যায় তাকে 'শ্রুতি' বলে: "শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বাদ্ ধ্বনিরেব শ্রুতির্ভবেৎ"। শ্রুতি একও হ'তে পারে আবার অনন্তও হ'তে পারে: "সা চৈকানেকা বা"। কোহল বাইশটি থেকে ছষট্টি (৬৬টি) পর্যন্ত শ্রুতি হ'তে পারে বলেছেন। ভরত বাইশটি শ্রুতির পক্ষপাতী। বাইশ শ্রুতি সম্বন্ধে তিনি বলেছেন,

তিস্রো দ্বে চ চতস্রশ্চ চতস্রস্তিস্র এব চ।
দ্বে চতস্রশ্চ ষড়্‌জাখ্যে গ্রামে শ্রুতিনিদর্শনম্ ॥[৮০]

এই শ্রুতির নিদর্শন দিয়েছেন তিনি ষড়্‌জ ও মধ্যম গ্রাম-দু'টিকে উপলক্ষ্য ক'রে। ভরতের সময়ে (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) গান্ধারগ্রামের ব্যবহার অপ্রচলিত হয়েছিল তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তিনি বলেছেন: "অথ দ্বৌ গ্রামৌ ষড়্‌জো মধ্যমশ্চেতি। তত্রাশ্রিতা দ্বাবিংশতিঃ শ্রুতয়ঃ"। ভরতের সময়ে মাত্র ষড়্‌জ ও মধ্যমগ্রামের প্রচলন থাকলেও গ্রাম যে আসলে সাতটি ছিল তা নারদীশিক্ষা[৮১] থেকে আমরা জান্‌তে পারি। প্রাচীন সাতটি গ্রামরাগ যে প্রধান বা নিয়ামক রাগ হিসাবে ভারতীয় সমাজে প্রচলিত ছিল তা খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে কুডুমিয়ামালাই প্রস্তর-লিপিমালা প্রমাণ করে। সাত গ্রামরাগের আশ্রায় সাতটি গ্রাম (প্রাচীন ঠাট) হ'ল: (১) ষড়্‌জগ্রাম, (২) মধ্যমগ্রাম, (৩) পঞ্চম, (৪) ষাড়ব, (৫) সাধারিত, (৬) কৈশিকমধ্যম ও (৭) কৈশিক। শেষোক্ত কৈশিকমধ্যম ও কৈশিক আসলে একই গ্রাম-রূপে গণ্য, তাই অনেকে ছ'টি মাত্র গ্রাম স্বীকার করেন। শিক্ষাকারও উল্লেখ করেছেন যে ঐ দু'টি গ্রাম মধ্যমগ্রাম থেকে সৃষ্টঃ মধ্যমস্বর যখন ন্যাস হয় তখন তা কৈশিকমধ্যম ও পঞ্চম যখন ন্যাস হয় তখন কৈশিক-রূপে পরিচিত হয়। তাছাড়া শিক্ষাকার নারদ স্পষ্টই বলেছেন যে, 'কৈশিক'-গ্রামরাগটি ঋষি কশ্যপ প্রবর্তন করেছেন: "কশ্যপঃ কৈশিকং প্রাহ মধ্যমগ্রামসম্ভবম্" (১।৪।১১)। হরিবংশে সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনার সময় আমরা 'ষড়্‌গ্রামরাগাঃ' শব্দে ছ'টি গ্রামরাগের পরিচয় পেয়েছি, সুতরাং কশ্যপ খৃষ্টীয় শতাব্দীর সূচনায় বা তার কিছু আগে কৈশিকগ্রামরাগটি প্রবর্তন ক'রে থাকবেন।

৮০। নাট্যশাস্ত্রে (কাশী সং) ২৮।২২

৮১। নারদীশিক্ষা (চৌখাম্বা-সংস্কৃত-সিরিজ), প্রথম প্রপাঠক, ৪র্থ কাণ্ড।

কৈশিকরাগ বা রাগগীতি কৈশিকগ্রামেরই দিকনির্দেশ করে। অনেকের অভিমত যে কৈশিকগ্রামটি খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে শার্ঙ্গদেব প্রবর্তিত সাধারণগ্রামেরই নামান্তর। শার্ঙ্গদেবের সাধারণগ্রাম ছিল নাকি শুদ্ধঠাট হিসাবে গণ্য।

অবশ্য সাতটি, ছ'টি, পাঁচটি কিংবা তিনটি গ্রামের প্রচলন প্রাচীন ভারতে ছিল কিনা তা একান্ত অনুশীলন ও গবেষণার বিষয়। তবে সাধারণভাবে ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধার গ্রাম-তিনটির উল্লেখ আমরা মহাভারতের যুগে কেন, তার আগে থেকেও পাই। মনে হয় গান্ধারগ্রামের প্রচলন লুপ্ত হয়েছিল খৃষ্টপূর্বাব্দের শেষের দিকে ও মধ্যমগ্রামের ব্যবহার অচল হয়েছিল পণ্ডিত শ্রীনিবাস ও অহোবলের সময় থেকে (খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে)।

ভরত ষড়্জ ও মধ্যম এই দু'টি গ্রামের শ্রুতি নিরূপণ করেছেন দু'টি সমান আকারের বীণার তথা বীণার তারের মাধ্যমে। বীণা-দু'টির মধ্যে একটি ছিল অচল বা ধ্রুববীণা ও অপরটি চলবীণা। ভরত প্রথমে উল্লেখ করেছেন: "মধ্যমগ্রামে শ্রুত্যপকৃষ্টঃ পঞ্চমঃ কার্যঃ। পঞ্চমস্য শ্রুত্যুৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাং যদন্তরং মার্দবাদায়তত্বাদ্বা তাবৎপ্রমাণশ্রুতিঃ" (২৮।২৩)। এ' কথাগুলি কিন্তু ভরতের শ্রুতি-নির্ধারণের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান। তিনি বলেছেন মধ্যমগ্রামের পঞ্চমকে একশ্রুতি নীচে নামাতে হবে। এই একশ্রুতি নামানো থেকে মধ্যমগ্রামের পঞ্চমস্বরকে ও একশ্রুতি ওঠানো থেকে ষড়্জগ্রামের পঞ্চমকে পাওয়া যায় এবং এটাই একশ্রুতি নির্ধারণের পক্ষে পরিমাপ-বিশেষ। অবশ্য এই একশ্রুতি নামানো বা ওঠানো বিশেষ সহজসাধ্য কাজ নয়, কেননা উচ্চোচ, মনাকোচ্চ বা উত্তরোত্তর উচ্চ এই ক্রমিক উচ্চতা বা ক্রমিক নীম্নতার জ্ঞান প্রত্যেক শিল্পীর মধ্যে বিশেষভাবে থাকা দরকার। ভরত এই উচ্চতা (উৎকর্ষণ) বা নীম্নতার (অপকর্ষণ) কোন নির্দিষ্ট পরিমাপের কথা উল্লেখ করেন নি, কেননা তিনি সম্ভবত ধরেই নিয়েছেন যে ষড়্জ ও মধ্যম গ্রামদু'টির মধ্যে পঞ্চমের নির্দিষ্ট স্বরস্থান সম্বন্ধে তাঁর পাঠকরা সচেতন। ষড়্গ্রামের শ্রুতি সম্বন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন: "এবমনেন শ্রুতিদর্শনবিধানেন দ্বৈগ্রামিক্যো দ্বাবিংশঃ শ্রুতয়ঃ প্রত্যবগন্তব্যাঃ। অত্র শ্লোকাঃ—

> ষড়্জশ্চতুঃশ্রুতির্জ্ঞেয় ঋষভস্ত্রিঃ শ্রুতিঃ স্মৃতঃ।
> দ্বিশ্রুতিশ্চাপি গান্ধারো মধ্যমশ্চ চতুঃশ্রুতিঃ॥
> চতুঃশ্রুতিঃ পঞ্চমঃ স্যাৎ ত্রিঃশ্রুতির্ধৈবতস্তথা।
> দ্বিশ্রুতিস্তু নিষাদঃ স্যাৎ ষড়্জগ্রামে স্বরান্তরে॥

বাইশটি শ্রুতির নির্দিষ্ট স্বরস্থান হ'ল :

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
•	•	•	স	•	•	রি	•	গ	•	•	•	ম
			৪			৩		২				৪

১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
•	•	•	প	•	•	ধ	•	নি
			৪			৩		২

মধ্যমগ্রামের বেলায় একটু ব্যতিক্রম দেখা যায়। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে ভরত মধ্যমগ্রামের বেলায় বলেছেন : "মধ্যমগ্রামে তু শ্রুত্যপকৃষ্টঃ পঞ্চমঃ কার্যঃ"। আসলে পঞ্চমস্বরের স্বরস্থান বা তার একশ্রুতির ব্যতিক্রম ক'রে তবে ষড়্জ ও মধ্যম গ্রামদু'টি নির্ণয় করা হয়। ষড়্জ ও মধ্যম গ্রামদু'টির পঞ্চম ছাড়া আর সকল স্বরের স্থিতি-স্থান একই রকমের। পঞ্চম চারশ্রুতিযুক্ত হ'লে ষড়্জ-গ্রামের অন্তর্গত হয় আর তিনশ্রুতিযুক্ত হ'লে তা মধ্যমগ্রামের অন্তর্ভুক্ত হয়। ষড়্জগ্রামের শ্রুতি ও স্বরস্থান আমরা উল্লেখ করেছি। মধ্যমগ্রামের নিদর্শন যেমন,

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
•	•	•	স	•	•	রি	•	গ	•	•	•	ম
			৪			৩		২				৪

১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
•	•	প	•	•	•	ধ	•	নি
		৩				৪		২

ভরতের 'মধ্যমগ্রামে শ্রুত্যপকৃষ্টঃ পঞ্চমঃ কার্যঃ' কথাগুলির অর্থ পঞ্চমকে তিনশ্রুতিসম্পন্ন করা। সুতরাং দেখা যায় যে ষড়্জ ও মধ্যম গ্রাম-দু'টির প্রমাণশ্রুতি হ'ল একশ্রুতি। একশ্রুতির বেশী (উৎকর্ষ) ও কমে (অপকর্ষ) দু'টি গ্রামের সন্ধান পাওয়া যায়, আর সেজন্য ভরত উল্লেখ করেছেন : "পঞ্চমস্তু শ্রুত্যুৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাং যদন্তরং মার্দবাদায়তত্বাদ্ বা তৎ প্রমাণশ্রুতিঃ"। এই উৎকর্ষ ও অপকর্ষ কার্য-দু'টি ভরত দু'টি বীণার সাহায্যে করেছেন। তিনি প্রথমে দু'টি বীণাকে ষড়্জগ্রামের মূর্ছনায়[৮২] বেঁধে নিতে বলেছেন : "ষড়্জ-গ্রামাশ্রিতে কার্যে"। দু'টি বীণার মধ্যে যে'টি ষড়্জগ্রামের মূর্ছনায় বাঁধা হয় তাকে অচল বা ধ্রুববীণা বলে, কেননা তার মূর্ছনার পরিবর্তন হয় না, আর

৮২। বাদী প্রভৃতি স্বরের বেলায়ও ভরত বলেছেন : "এতেষাং স্বরাণাং মূর্ছনাধিকারত্বং তু তন্ত্র্যপগাদনদণ্ডেন্দ্রিয়বৈগুণ্যাদুপজায়তে। ইত্যেতৎস্বরবিধানচতুর্বিধম্।"

সে বীণাটিতে মূর্ছনার পরিবর্তন ক'রে শ্রুতি নির্দিষ্ট হয় তার নাম চলবীণা। চলবীণার মূর্ছনার বা শ্রুতি-সংখ্যার পরিবর্তন হয়।

তারপর ভরত বলেছেন: "তয়োরণ্যতরীং মধ্যমগ্রামিকীং কুর্যাৎ। পঞ্চমস্যাপকর্ষে শ্রুতিং তামেব পঞ্চমস্য শ্রুত্যুৎকর্ষবশাৎ ষড়্জগ্রামিকী কুর্যাৎ। এবং শ্রুতিরপকৃষ্টা ভবতি"।[৮৩] অর্থাৎ চলবীণার পঞ্চমস্বরকে একশ্রুতি অপকৃষ্ট ক'রে বা নামিয়ে বীণাটিকে ষড়্জগ্রামের পরিবর্তে মধ্যমগ্রামের অনুযায়ী ক'রে নিতে হয়। এই অপকর্ষে দেখা যায় চলবীণার গান্ধার ও নিষাদ ধ্রুববীণার ঋষভ ও ধৈবতে পরিণত হয়: "পুনরপি তদেবাপকর্ষাৎ গান্ধারনিষাদাবপি ইতরস্যাং ধৈবতর্ষভৌ প্রবিশতঃ শ্রুত্যধিকত্বাৎ"। একবার পরিবর্তন (অপকর্ষণ) করলে চলবীণার ধৈবত ও ঋষভ ধ্রুববীণার পঞ্চম ও ষড়্জে পরিণত হয়: "পুনস্তদেবাপ-কর্ষাদ্ধৈবতর্ষভাবিতরস্যাং পঞ্চমষড়্জৌ প্রবিশতঃ শ্রুত্যধিকত্বাৎ"। এভাবে পুনরায় অপকৃষ্ট করলে চলবীণার পঞ্চম, মধ্যম ও ষড়্জ ধ্রুববীণার মধ্যম, গান্ধার ও নিষাদে পরিণত হয়: "তদ্বৎ পুনরপকৃষ্টায়াং তস্যাং পঞ্চমমধ্যমষড়্জা ইতরস্যাং মধ্যমনিষাদগান্ধারবন্তঃ প্রবেক্ষ্যন্তি চতুঃশ্রুত্যধিকত্বাৎ"। এখানে দেখা যায় বিভিন্ন অপকর্ষণে এক গ্রাম থেকে অন্যে ২, ৩, ৪ শ্রুতির পার্থক্য অর্থাৎ আধিক্য হয়।

হৃদয়নারায়ণদেব (১৬৬০ খৃ°) তাঁর 'হৃদয়প্রকাশ' ও পণ্ডিত শ্রীনিবাস (১৭০০-১৭৫০ খৃ°) তাঁর 'রাগতত্ত্ববিবোধ' গ্রন্থে শ্রুতি ও শ্রুতি অনুসারে স্বরবিভাগপ্রণালী আরো সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করেছেন। অবশ্য তাঁদের বিভাগপদ্ধতি সম্পূর্ণ ভরতেরই অনুযায়ী। নারায়ণদেব উল্লেখ করেছেন,

> ধ্বন্যবচ্ছিন্নবীণায়াং মধ্যে তারকসংস্থিতিঃ।
> ত্র্যংশিনস্যাদ্যভাগান্তে মধ্যমস্য চ পঞ্চমম্॥
> মধ্যমং ষড়্জযোগস্থ সপয়োর্মধ্যমানয়েৎ।
> ত্র্যংশিতস্য তয়োর্মধ্যস্যাদ্যাংশান্তে তথার্ষভম্॥
> তত্রৈব ধৈবতং মধ্যে সপয়োঃ স্থাপয়েদ্বুধঃ।
> তত্র ভাগদ্বয়ং ত্যক্ত্বা নিষাদাখ্যাং স্বরং নয়েৎ॥

অবশ্য সঙ্গীত-পারিজাতকার পণ্ডিত অহোবলের স্বর-স্থাপনার পদ্ধতিও ঠিক এই

৮৩। কাব্যমালা-সংস্করণে কিছু কিছু পাঠভেদ আছে। যেমন: "তয়োরেকতরস্যাং মধ্যমগ্রামিকীং কৃত্বা পঞ্চমস্যাপকর্ষে শ্রুতিং তামেব পঞ্চমবশাৎষড়্জগ্রামিকী কুর্যাৎ।"—নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা), পৃঃ ৪৩৩

ধরণের। শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের স্থাপন সম্বন্ধে শ্রীনিবাসের অভিমত পণ্ডিত অহোবলেরই মতো। শুদ্ধ-স্বরস্থাপন সম্বন্ধে শ্রীনিবাস উল্লেখ করেছেন,

পূর্বাংতয়োশ্চ মের্বোশ্চ মধ্যে তারকসঃ স্থিতঃ।
তদর্ধে স্বরিতারস্য সম্বরস্য স্থিতির্ভবেৎ ॥

* * *

ভাগত্রয়সমাযুক্তং তৎসূত্রং কারিতং ভবেৎ।
পূর্বভাগদ্বয়াদগ্রে স্থাপনীয়োঽথ পঞ্চমঃ ॥
ষড়্জপঞ্চমমধ্যে তু গান্ধারস্থানমাচরেৎ।
ষড়্জপঞ্চমগং সূত্রমংশত্রয়সমন্বিতম্ ॥
তত্রাংশদ্বয়সংত্যাগাৎ পূর্বভাগে তু রির্ভবেৎ।
পঞ্চমাত্তরষড়্জাখ্যমধ্যে ধৈবতমাচরেৎ ॥
পসয়োর্মধ্যভাগেস্যাৎ ভাগত্রয়সমন্বিতে।
পূর্বভাগদ্বয়ং ত্যক্ত্বা নিষাদো রাজতে স্বরঃ ॥

এ' থেকে বোঝা যায় একটি বীণার তার হবে ৩৬" ইঞ্চি দীর্ঘ ও এই দীর্ঘতা হ'ল বীণার উত্তর ও পূর্ব মেরু-দু'টির মাঝখানের তারের। মনে করা যেতে পারে যে এই তারেই ষড়্জস্বর স্থাপিত। সুতরাং তদনুযায়ী অপরাপর তারের দৈর্ঘ্য হবে :

স	রি	গ	ম	প	ধ	নি	র্স
৩৬"	৩২"	৩০"	২৭"	২৪"	২১$\frac{১}{৩}$"	২০"	১৮"

অনেকের মতে বর্তমান পদ্ধতির ঠাটের সাতটি শুদ্ধস্বরের তারের (বীণার) দৈর্ঘ্য হ'ল,

স	রি	গ	ম	প	ধ	নি	র্স
৩৬"	৩২"	২৮$\frac{৪}{৫}$"	২৭"	২৪"	২১$\frac{১}{৩}$"	১৯$\frac{১}{৫}$"	১৮"

সুতরাং মেরু থেকে তারের পরিমাপ হবে—

১	$\frac{৮}{৯}$	$\frac{৪}{৫}$	$\frac{৩}{৪}$	$\frac{২}{৩}$	$\frac{১৬}{২৭}$	$\frac{৮}{১৫}$	$\frac{১}{২}$

পুনরায় শুদ্ধ সাতস্বরের কম্পন-সংখ্যা অনুমান করা হয়েছে,

স	রি	গ	ম	প	ধ	নি	র্স
২৪০	২৭০	২৮৮	৩২০	৩৬০	৪০৫	৪৩২	৪৮০

আবার অনেকের মতে—

২৪০	২৭০	৩০০	৩২০	৩৬০	৪০৫	৪৫০	৪৮০

যাইহোক একটি মত অনুসারে, অর্থাৎ মধ্য-ষড়্‌জ থেকে তার-ষড়্‌জ (স—র্স) পর্যন্ত শুদ্ধ সাতস্বরের পারম্পরিক দৈর্ঘ্য ৩৬", ৩২", ৩০", ২৭", ২৪", ২১⅓", ২০" এবং ১৮" ইঞ্চি ধ'রে নিয়ে পণ্ডিত শ্রীনিবাসের শ্লোকগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—

(১) পূর্ব ও উত্তর মেরু-দু'টির মাঝখানে তার-ষড়্‌জ (র্স) থাকলে তার অর্ধভাগে অতিতার-ষড়্‌জ (স") ধ্বনিত হবে। তারের দৈর্ঘ্য ৩৬" ÷ ২ = ১৮", সুতরাং তার-ষড়্‌জ (র্স) ধ্বনিত হবে ৩৬" − ১৮" = ১৮" ইঞ্চি স্থানে এবং অতিতার-ষড়্‌জ হবে ১৮" − ৯" = ৯" ইঞ্চি স্থানে।

(২) ॥ মধ্যম ॥ ৩৬" − ১৮" = ১৮" ; ১৮" ÷ ২ = ৯" ; ১৮ + ৯" = ২৭" ; অর্থাৎ ২৭" দৈর্ঘ্যে মধ্যমের স্থান।

(৩) ॥ পঞ্চম ॥ ৩৬" − ১৮" = ১৮" ; ১৮" ÷ ৩ = ৬" ; ৬" × ২ = ১২" ; ৩৬" − ১২" = ২৪" দৈর্ঘ্যে পঞ্চমের স্থান।

(৪) ॥ গান্ধার ॥ ৩৬" − ২৪" = ১২" ; ১২" ÷ ২ = ৬" ; ৩৬" − ৬" কিংবা ২৪" + ৬" = ৩০" দৈর্ঘ্যে গান্ধারের স্থান।

(৫) ॥ ঋষভ ॥ ৩৬" − ২৪" = ১২" ; ১২" ÷ ৩ = ৪" ; ৪" × ২ = ৮" ; ২৪" (প) + ৮" = ৩২" দৈর্ঘ্য ঋষভের স্থান।

(৬) ॥ ধৈবত ॥ পঞ্চম থেকে তার-ষড়্‌জ (র্স) = ২৪" − ১৮" = ৬" ; ৬" ÷ ২ = ৩" ; ১৮" + ৩" কিংবা ২৪" − ৩" = ২১" দৈর্ঘ্যে ধৈবতের স্থান। কিন্তু এখানে ধৈবতের ঋষভ থেকে পঞ্চম সংখ্যার স্বরহিসাবে (fifth) গণ্য হওয়া উচিত। সুতরাং ত্রৈরাশিকের মাধ্যমে পাওয়া যায় $\frac{২৪'' \times ৩২''}{৩৬''}$ = $\frac{৬৪''}{৩}$ = ২১⅓" = ধৈবতের স্থান

(৬) ॥ নিষাদ ॥ পঞ্চম থেকে ষড়্‌জ = ২৪" − ১৮" = ৬" ; ৬" ÷ ৩ = ২" ; ২" × ২" = ৪" ; ২৪" − ৪" = ২০" দৈর্ঘ্যে নিষাদের স্থান।[৮৪] সুতরাং শ্রীনিবাস

৮৪। (ক) শ্রীসুব্বা রাও : *A Plea for a Rational Interpretation of Saṅgita-Śāstra* (The Journal of Music Academy, Madras, Vol. IX, 1938, pp. 49-67).

(খ) পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে : *A Comparative Study of Some of the Leading Music Systems of the 15th, 16th, 17th and 18th Centuries,* pp. 28, 36-37.

(গ) শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায় : "শ্রুতি ও স্বরস্থান (প্রাচীন)', 'প্রবাসী', ১৩৬১, পৃঃ ২৭৩-২৭৮

প্রভৃতির মতে (১) পূর্ব ও উত্তর মেরু-ছ'টির মাঝখানে তার-ষড়্জ; (২) মধ্য-ষড়্জ ও তার-ষড়্জের মাঝখানে মধ্যমস্বর; (৩) মধ্য-ষড়্জ ও তার-ষড়্জের মধ্যস্থানকে তিনভাগ ক'রে পূর্বের ছ'ভাগের প্রথমে পঞ্চমস্বর; (৪) মধ্য-ষড়্জ ও পঞ্চমের মাঝখানে গান্ধার; (৫) ষড়্জ ও পঞ্চমের মধ্যবর্তী স্থানকে তিন ভাগ ক'রে ছ'ভাগের পূর্বভাগে ঋষভ; (৬) পঞ্চম ও ষড়্জের মাঝখানে ধৈবত; (৭) পঞ্চম ও তার-ষড়্জের মধ্যভাগকে তিন ভাগ ক'রে ও পূর্ব ছ'টি ভাগ ত্যাগ ক'রে উত্তর তৃতীয়ভাগে নিষাদ—এই হবে শুদ্ধ সাতস্বরের স্থান। বিকৃত স্বরের বিষয়ে ভরতের সঙ্গে শার্ঙ্গদেব ও তাঁর পরবর্তী সঙ্গীতশাস্ত্রীদের মতের ঐক্য নাই, কেননা ভরত মাত্র ছ'টি স্বরের (গান্ধার ও নিষাদ) বিকৃতভাব স্বীকার করেছেন।

ভরত-প্রবর্তিত (প্রাচীন) শ্রুতিবিভাগপদ্ধতি থেকে কিন্তু বর্তমান হিন্দুস্থানী-পদ্ধতির মিল নাই। উভয় পদ্ধতির মধ্যে (প্রাচীন ও নবীন) স্বরগুলির শ্রুতিসংখ্যা সমান হ'লেও স্বরস্থানের নির্ণয়-ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে মতের পার্থক্য যথেষ্ট। প্রাচীন পদ্ধতিতে সাত স্বরের স্থান নির্দিষ্ট হয় ৪, ৭, ৯, ১৩, ১৭, ২০, ২২ সংখ্যক শ্রুতিতে, কিন্তু বর্তমান বা নতুন পদ্ধতি অনুসারে স্বরস্থান হয় ১, ৫, ৮, ১০, ১৪, ১৮, ২১ শ্রুতিগুলিতে। ছ'টি পদ্ধতির তুলনামূলক শ্রুতি ও স্বরস্থান যেমন,

শ্রুতি-সংখ্যা	শ্রুতি-নাম		ভরত-প্রবর্তিত প্রাচীন পদ্ধতি		বর্তমান পদ্ধতি	
১	তীব্রা	...	...	...	স	
২	কুমুদ্বতী					
৩	মন্দা					৪
৪	ছন্দোবতী		স	৪		
৫	দয়াবতী	...	...	...	রি	
৬	রঞ্জনী					
৭	রতিকা		রি	৩		৩
৮	রৌদ্রী	...	...	...	গ	
৯	ক্রোধা		গ	২		২
১০	বজ্রিকা	...	...	...	ম	
১১	প্রসারিণী					
১২	প্রীতি					৪
১৩	মার্জনী		ম	৪		
১৪	ক্ষিতি	...	...	...	প	
১৫	রক্তা					
১৬	সন্দীপনী					৪
১৭	আলাপিনী		প	৪		
১৮	মদন্তী	...	...	...	ধ	
১৯	রোহিণী					৩
২০	রম্যা		ধ	৩		
২১	উগ্রা	...	...	...	নি	
২২	ক্ষোভিণী		নি	২		২

প্রাচীন পদ্ধতির পরিবর্তে বর্তমান নতুন পদ্ধতির ব্যবহার খুবই আধুনিক। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় মুনি ভরত থেকে শার্ঙ্গদেবের—অর্থাৎ খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী থেকে ১৩শ শতাব্দী পর্যন্ত তো বটেই, তা ছাড়া সঙ্গীতসুধাকর-প্রণেতা হরিপাল (১৩০৯—১৩১২ খৃ°), সঙ্গীতসূর্যোদয়কার লক্ষ্মীনারায়ণ (১৫০৯—১৫৪৯ খৃ°), পণ্ডিত রামামত্য (১৫৫০ খৃ°), পুণ্ডরিক বিঠ্ঠল (১৫৯০ খৃ°), পণ্ডিত সোমনাথ (১৬০৯ খৃ°), গোবিন্দ-দীক্ষিত (১৬১৪ খৃ°), বেঙ্কটমুখী (১৬২০ খৃ°), পণ্ডিত অহোবল (১৭০০ খৃ°), কবি লোচন পণ্ডিত (১৭ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি), হৃদয়নারায়ণ (১৬৬৭ খৃ°), শ্রীনিবাস পণ্ডিত (১৭০০—১৭৫০ খৃ°),

তুলজা (১৭২৯—১৭৩৫ খৃ°), রাজা নারায়ণদেব (১৮০০ খৃ°), কবি নারায়ণ (১৮০০ খৃ°), গোপীনাথ (১৮০০ খৃ°), নরহরি চক্রবর্তী (১৮০০ খৃ°) প্রভৃতি সকলেই ভরত-প্রবর্তিত প্রাচীন পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর সঙ্গীতশাস্ত্রী পণ্ডিত রামামত্য তাঁর 'স্বরমেলকলানিধি' পুস্তকে ভরতের মতোই শ্রুতির স্বরস্থান সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন,

তত্র তুর্যশ্রুতৌ ষড়্জঃ সপ্তম্যামৃষভো মতঃ ॥
ততো নবম্যাং গান্ধারস্ত্রয়োদশ্যাং তু মধ্যমঃ।
পঞ্চমঃ সপ্তদশ্যাং তু ধৈবতো বিংশতিশ্রুতৌ ॥
দ্বাবিংশে তু নিষাদঃ স্যাচ্ছ্রুতিদ্বিত্থং স্বরোদ্ভবঃ।
দ্বাভ্যাং নিষাদগান্ধারৌ তিসৃভ্যো ধৈবতর্ষভৌ ॥
চতুসৃভ্যস্ত্রয়স্তু স্যুঃ ষড়্জমধ্যমপঞ্চমাঃ।[৮৫]

দক্ষিণী শাস্ত্রী বেঙ্কটমুখীও (১৬২০ খৃ°) তাঁর 'চতুর্দণ্ডীপ্রকাশিকা' গ্রন্থে শার্ঙ্গদেবের মতো শ্রুতিবীণার মাধ্যমে শ্রুতি ও স্বরস্থান নির্ণয় করেছেন ভরতকে অনুসরণ ক'রে। এমন কি ১৮শ শতাব্দীর গুণী রাজা নারায়ণদেব তাঁর সঙ্গীতসারে ও নরহরি চক্রবর্তী তাঁর 'সঙ্গীতসারসংগ্রহ' গ্রন্থে ভরত-প্রবর্তিত স্বরস্থান-বিভাগকেই স্বীকার করেছেন। সুতরাং বর্তমান শ্রুতিবিভাগ ও স্বরস্থানপদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে মনে হয় বিংশ শতাব্দীর সমাজে। বিস্তৃত আলোচনার পরিবর্তে শ্রদ্ধেয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর 'সঙ্গীতসার' গ্রন্থ থেকে তাঁর স্বীকারোক্তি উদ্ধৃত করলেই বর্তমান হিন্দুস্থানীপদ্ধতি অনুযায়ী স্বরস্থান-বিভাগটির রহস্য সাধারণভাবে বোঝা যাবে ব'লে মনে করি। তিনি উল্লেখ করেছেন: "কিন্তু শাস্ত্রের সহিত বর্তমান সময়-প্রচলিত বীণাদি যন্ত্রের পর্দা-বিন্যাসের ঐক্য নাই। যে যে স্বরে যে কয়েকটি করিয়া শ্রুতি-সংখ্যা নির্দিষ্ট আছে, সেই সেই স্বর তাহার অন্ত্যশ্রুতিতে সংস্থাপিত, ইহা শাস্ত্রকারেরা কহিয়া গিয়াছেন, * *। কিন্তু বীণাদি যন্ত্রের পর্দা দেখিলে তদ্বৈপরীত্যই প্রতীত হয়, অর্থাৎ নিষাদ ও ষড়্জের মধ্যে যে পরিমাণে স্থান আছে, ষড়্জ ও ঋষভের মধ্যে প্রায় তাহার দ্বিগুণ স্থান আছে। ইহাতে বোধ হয়, আধুনিক বীণকারেরা অন্ত্যশ্রুতিতে স্বরস্থাপন না করিয়া প্রথম শ্রুতিতেই স্বরকে স্থাপন করিয়া থাকিবেন। উইলার্ড প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণও এই মতটি অবলম্বন করিয়া হিন্দু-সংগীত বিষয়ক প্রস্তাব লিখিয়া গিয়াছেন এবং ইংরাজী

৮৫। Vide *Svaramelakalānidhi* edited by M. S. Rāmaswāmi Aiyar (published by the Annamalai University, 1932), II. 27-30.

সংগীত-গ্রন্থকর্তাদিগেরও মত এই মতের অনুগত; বিশেষতঃ সংস্কৃত শাস্ত্রকর্তারা চতুর্থ, সপ্তম ও নবম প্রভৃতি শ্রুতিতে ষড়্জাদি স্বরসমূহকে স্থাপিত করিয়াও তত্তৎপূর্ববর্তী শ্রুতিসকলের স্বরকারণত্ব স্বীকার করিয়াছেন (?); বোধ করি সেই কারণেই বীণকারেরা প্রথম, পঞ্চম ও অষ্টমাদি শ্রুতিতে ষড়্জাদি স্বরসমূহকে স্থাপিত করাতে উক্ত বৈপরীত্য সংঘটিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু কি হেতু, কোন্ সময়ে কোন্ ব্যক্তি কর্তৃক এ'রূপ বৈপরীত্য সংঘটিত হইয়াছে তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা হউক আমরা বীণকার-দিগের (বর্তমান) মতের অনুবর্তী হইয়াই শ্রুতি-বিভাগ করিলাম * *।"[৮৬]

বর্তমান পদ্ধতির স্বরস্থান-নির্ণয়ের এই পর্যন্ত গেল সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। তবে সাতস্বরের শ্রুতিসংখ্যার ব্যাপারে প্রাচীন ও নবীন মত-দু'টির সিদ্ধান্ত একই। ভরত ষড়্জগ্রামের শ্রুতি-বিভাগের পরিচয় দিয়েছেন ৪, ৩, ২, ৪, ৪, ৩, ২ শ্রুতির অন্তর বা ব্যবধান অনুযায়ী। তিনি মধ্যমগ্রাম সম্বন্ধে বলেছেন,

চতুঃশ্রুতিস্তু বিজ্ঞেয়ো মধ্যমঃ পঞ্চমঃ পুনঃ।
ত্রিশ্রুতির্ধৈবতস্তু স্যাচ্চতুঃশ্রুতিক এব চ ॥
নিষাদষড়্জৌ বিজ্ঞেয়ৌ দ্বিচতুঃশ্রুতিসম্ভবৌ।
ঋষভস্ত্রিঃশ্রুতিশ্চ স্যাৎ গান্ধারো দ্বিশ্রুতিস্তথা ॥

অর্থাৎ মধ্যমগ্রামে সাত স্বরে শ্রুতিসংখ্যার বিভাগ হবে ৪, ৩, ২, ৪, ৩, ৪, ২। ভরতের পরবর্তী গ্রন্থকারেরা ১৫শ—১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত মধ্যমগ্রামের এ'ধরণের শ্রুতিবিভাগই স্বীকার করেছেন।

শ্রুতির পর ভরত ষড়্জ ও মধ্যমগ্রামের মূর্ছনার পরিচয় দিয়েছেন। মূর্ছনার আভিধানিক অর্থ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন ক্রমযুক্ত (পর পর) সাত স্বরকে 'মূর্ছনা'

৮৬। (ক) 'সঙ্গীতসার' (২য় সংস্করণ, কলিকাতা), পৃ° ৩-৪

(খ) এন. এস. রামচন্দ্রও এই প্রসঙ্গের উল্লেখ ক'রে বলেছেন:

"Sa is fixed on the fourth string, Ri on the 7th, Ga on the 9th * *. This gives the values of the Śuddha scale indubitably and this clearly shows the mistake committed by a host of writers including Sir Wm. Jones, Ousley, Paterson, Stafford, Williard, French, Carl Engel, S. M. Tagore, Grosset, C. R. Day, etc., when they defined S to R as four śrutis, R to G as three śrutis and so on. Mr. Fox-Strangways also accepts this wrong allocation of the śrutis in the face of the texts and practice and is therefore led into a series of errors."—*The Rāgas of Karnatic Music* (Madras, 1938, pp. 21-22).

বলে : "ক্রমযুক্তাঃ স্বরাঃ সপ্ত মূর্ছনাস্বভিসংজ্ঞিতাঃ।"[৮৭] মতঙ্গ বৃহদ্দেশীতে আরো সুস্পষ্টভাবে মূছনার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন: "'মূর্ছা মোহসমুচ্ছ্রায়য়োঃ', মূর্ছতে (?) যেন রাগো হি মূর্ছনেত্যভিসংজ্ঞিতা, আরোহণাবরোহণক্রমেণ স্বরসপ্তকম্"। মতঙ্গ মূর্ছনায় সাতটি স্বরেরই শুধু আরোহণ নয়, অবরোহণও স্বীকার করেছেন। তাছাড়া সাতটি স্বরের মতো তিনি বারোটি স্বরের ক্রম-আরোহণ-অবরোহণ তথা মূর্ছনাও স্বীকার করেছেন: "সা চ মূর্ছনা দ্বিবিধা সপ্তস্বরমূর্ছনা দ্বাদশস্বরমূর্ছনা ইতি"। এ'ছাড়া বলেছেন পূর্ণ, ষাড়ব, ঔড়ব ও সাধারণভেদে মূর্ছনাও চারশ্রেণীর। ভরত এই চার রকম মূর্ছনাভেদ স্বীকার ক'রে বলেছেন: "ষাড়বৌড়ুবিতসংজ্ঞিতাঃ পূর্ণা সাধারণকৃতাশ্চেতি চতুর্বিধশ্চতুর্দশ মূর্ছনাঃ" (২৮।৩১)।

ভরত ষড়্জ ও মধ্যম গ্রামের সাত স্বরের মূর্ছনাগুলির পরিচয়ে বলেছেন:

ষড়্জগ্রামের··· { উত্তরমন্দ্রা, রজনী, উত্তরায়তা, শুদ্ধষড়্জা, মৎসরীকৃতা, অশ্বক্রান্তা, অভিরুদ্গতা—৭টি মূর্ছনা

মধ্যমগ্রামের··· { সৌবীরী, হরিণাশ্বা, কলোপনতা, শুদ্ধমধ্যা, মার্গবী, পৌরবী, হৃষ্যকা—৭টি মূর্ছনা

পূর্ণা মূর্ছনায় সাতটি স্বরের সমাবেশ থাকে। ষাড়বে ছ'টি ও ঔড়ুবে পাঁচ স্বরের ক্রম-সমাবেশ থাকে। সাধারণ-মূর্ছনায় কেবল কাকলিনিষাদ ও অন্তরগান্ধার স্বর থাকে। মতঙ্গ বলেছেন: "সাধারণস্বরৌ নিষাদগান্ধারবন্তৌ। তদাদিকৃতা তত্রৈবান্তর্ভূতা সাধারণমূর্ছনা ভবতি"।

ভরত তানেরও উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তানের কোন আভিধানিক পরিচয় তিনি দেন নি। ভরত উল্লেখ করেছেন: "তত্র মূর্ছনাতানাশ্চতুরশীতিঃ"। (১) ষড়্জ, ঋষভ, পঞ্চম ও নিষাদ-বিহীন চার রকম তান—ষড়্জগ্রামে এবং ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার ও নিষাদ-বিহীন তিন রকম তান—মধ্যমগ্রামে বিকাশ লাভ করে। (২) ষড়্জ-পঞ্চম, ঋষভ-পঞ্চম ও গান্ধার-নিষাদ-বিহীন তিন রকম তান—ষড়্জগ্রামে ও গান্ধার-নিষাদ ও ঋষভ-ধৈবত-বিহীন দু'রকম তান—মধ্যমগ্রামে দেখা যায়। ভরত বলেছেন তন্ত্রী তথা বীণা প্রভৃতিতে প্রবেশ ও নিগ্রহভেদে তানক্রিয়া (তানের কাজ) দু'রকম। (১) প্রবেশ বল্‌তে স্বরকে নিম্ন (অপকৃষ্ট) বা নরম (মৃদু তথা মার্দব) করা বোঝায়, (২) নিগ্রহ অর্থে স্পর্শ করা। একমাত্র

৮৭। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ২৮।৩১

মধ্যমস্বর অবিকৃত (অনাশী) ব'লে[৮৮] তার কোনরূপ প্রবেশ (নিম্নতা) বা সংস্পর্শ হয় না। ভরত বলেছেন শিল্পী ও শ্রোতার সুখ বা আনন্দ-বিধানের জন্যই তান ও মূর্ছনার উপযোগিতা।

ভরত 'সাধারণ' অর্থে অন্তর বা ব্যাবধানিক স্বর বলেছেন। স্বর ও জাতিভেদে সাধারণ দু'রকম। স্বরসাধারণ আবার ষড়্জ ও মধ্যম গ্রামভেদে ষড়্জসাধারণ ও মধ্যমসাধারণ হিসাবে পরিচিত। অবশ্য সাধারণ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

ভরত আঠারটি জাতির ('জাতয়োঽষ্টাদশোত্যেব') রাগত্ব বা রাগধর্মত্ব প্রমাণ করার জন্য দশটি লক্ষণের পরিচয় দিয়েছেন। এই দশটি লক্ষণের প্রয়োগ ও প্রচলন খৃষ্টপূর্বযুগে ছিল কিনা তার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে রামায়ণে বা মহাভারতে স্বরসন্দর্ভের সমাবেশ নিয়ে শুদ্ধ-জাতিগানের প্রচলন ছিল। দেবগান্ধার বা গান্ধার (গান্ধারীজাতি ?) রাগেরও উল্লেখ মহাভরত-হরিবংশে পাওয়া যায়। কৈশিকরাগেরও (কৈশিক-গ্রামরাগ বা কৈশিকী-জাতিরাগ) উল্লেখ হরিবংশে আছে। রাগের স্বরসম্বাদিতার (ষড়্জ-পঞ্চম অথবা ষড়্জ-মধ্যম ভাব) প্রয়োগ তখন নির্দিষ্টভাবে না পাওয়া গেলেও তাতে মাধুর্য, লাবণ্যাদি গুণের ও রঞ্জণাশক্তির যে বিকাশ ছিল একথা সত্য। গ্রহ ও অংশ শব্দ-দু'টির উল্লেখ না থাকলেও মন্দ্র, মধ্য ও তারাদি, স্থানত্রয়ের ব্যবহার ছিল। সুতরাং দশ-লক্ষণের পরিপূর্ণ বিকাশ খৃষ্টীয় অব্দের গোড়ার দিকে দেখা গেলেও একথা স্বীকার করতে হবে যে কোন জিনিসের পরিপূর্ণতার বিকাশ একদিনে হয় না, ক্রমবিকাশের ধারা সকল জিনিসেই থাকে। তাই মনে হয় বৈয়াকরণিক বা গাণিতিক ভিত্তিতে দশ-লক্ষণের বিচার ও বিশ্লেষণের প্রয়োজনবোধ হয়তো খৃষ্টপূর্বাব্দের সমাজে ছিল না, কিন্তু তার প্রয়োগ আংশিকভাবে অবশ্যই ছিল। পরে সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য ভরত সেগুলিকে সংগ্রহ ক'রে রাগের প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য প্রয়োগ করেন। তখনই বিজ্ঞানসম্মত হ'ল সঙ্গীতের ধারা ও সাধনা এবং সে' ধারাই অনুসৃত হ'ল পরবর্তী সঙ্গীতশাস্ত্রী ও সাধকদের ভিতরে।

ভরত জাতিরাগ-নির্ণয়ের জন্য দশটি লক্ষণের পরিচয় দিয়েছেন :

গ্রহাংশৌ তারমন্দ্রৌ চ ন্যাসোপন্যাস এব চ।
অল্পত্বং চ বহুত্বং চ ষাড়বৌড়বিতে তথা ॥[৮৯]

৮৮। মুনি ভরতের সময় (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) মধ্যমস্বর অবিকৃত ছিল, কিন্তু খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে শার্ঙ্গদেবের সময় শুধু মধ্যমের নয়, ষড়্জাদি সকল স্বরেরই বিকৃতভাব দেখা দিয়েছিল।

৮৯। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সংস্করণ) ৮২।৭০

গ্রহ, অংশ, তার, মন্দ্র, ন্যাস, অপন্যাস, অল্পত্ব, বহুত্ব, ষাড়ব ও ঔড়ব এই দশবিধ লক্ষণ। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে ভরত গ্রহ ও অংশ সমান অর্থে ব্যবহার করেছেন: "যৎ প্রবৃত্তং ভবেদ্‌গানং সোঽংশো গ্রহ বিকল্পিতঃ"। তাছাড়া 'তত্রাংশো নামঃ' শব্দগুলি উল্লেখ ক'রে যেখানে অংশ সম্বন্ধে আলাদা ভাবে বল্‌তে চেয়েছেন সেখানেও দেখা যায় অংশকে তিনি গ্রহ থেকে অভিন্ন বলেছেন: "যস্মিন্ বসতি রাগস্তু যস্মাচ্চৈব প্রবর্ত্ততে"। রাগের আলাপ বা বিকাশ যেখান থেকে আরম্ভ হয় তাকে 'গ্রহ' বলে ও রাগ যে স্বরে স্থিত হয় বা যে স্বরের (বহুল বা পুনঃপুনঃ) প্রয়োগের জন্য রাগমূর্তি রূপায়িত ও পরিপুষ্ট হয় তাকে (সে স্বরকে) অংশ বা বাদী ('বদনাদ্বাদী') বলে। সুতরাং ভরত অংশের পরিচয় দেবার প্রসঙ্গে 'যস্মিন বসতি' ও' যস্মাচ্চৈব প্রবর্ত্ততে' এই উভয় কথাই বলেছেন ও তা থেকে গ্রহ ও অংশকে যে তিনি এক ও অভিন্ন বলেছেন তা বোঝা যায়।[৯০]

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে শার্ঙ্গদেব সংন্যাস ও বিন্যাস এ' দু'টি লক্ষণকে অধিক গ্রহণ ক'রে রাগ-নির্ণয়ের জন্য তেরোটি লক্ষণের কথা উল্লেখ করেছেন: "কাপীত্যেবমাহুস্ত্রয়োদশ" (১।৭।৩০)। কল্লিনাথও "অথ ত্রয়োদশবিধং জাতি-লক্ষ্য ইত্যুদ্দেশে লক্ষ্যত্বেনোপাত্তজাতিনিরূপণাবসরে" প্রভৃতি কথায় তেরোটি লক্ষণ সমর্থন করেছেন।

দশটি বা তেরোটি লক্ষণ স্বীকার করার উদ্দেশ্য রাগ বা রাগের স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ণয় করা। ভরত জাতি তথা জাতিরাগ নির্ণয়ের জন্য দশ-লক্ষণ স্বীকার করেছেন। আর এ' থেকে বোঝা যায় যে নাট্যশাস্ত্রে শুদ্ধ ও বিকৃত জাতিগুলি (আঠারটি) রঞ্জনাশক্তি ও লাবণ্যগুণবিশিষ্ট রাগই। ভরত জাতির উদ্দেশ্যে 'রাগ' শব্দটি অন্তত পাঁচবার নাট্যশাস্ত্রে ব্যবহার করেছেন। যেমন (১) 'জাতিরাগং শ্রুতিশ্চৈব' (২৮।৩৫); (২) 'যস্মিন বসতি রাগস্তু' (২৮।৭২); (৩) '* * রাগ-মার্গপ্রযোজকঃ' (৩১।৩৯); (৪) 'এবমেনং বিনা গানং নাট্যং রাগং ন গচ্ছতি' (৩২।৪৫০); (৫) '* * রাগঃ সজ্ঝর্ষ এব চ' (৩২।৪৭৫)। মোটকথা 'জাতি'-নামে আঠারটি কারণ-রাগের বিকাশ নাট্যশাস্ত্রে দেখা যায়।

ষাড়্‌জী প্রভৃতি সাতটি শুদ্ধজাতির ন্যাস তাদের নামানুযায়ী সাতটি স্বর;

৯০। সঙ্গীত-রত্নাকরের টীকায় সিংহভূপাল উল্লেখ করেছেন: "নন্বেবং তর্হি গ্রহাংশয়োঃ কো ভেদঃ? উচ্যতে—অংশো বাদ্যেব পরম্, গ্রহস্তু বাদ্যাদিভেদভিন্নশ্চতুর্বিধঃ; অংশশ্চ রাগজনকত্বাৎ প্রধানম্, গ্রহস্ত্বপ্রধানমিতি তয়োর্ভেদঃ।" মতঙ্গও বৃহদ্দেশীতে এ'কথাই বলেছেন তা উল্লেখ করেছি।

অর্থাৎ ষাড়্‌জীর ন্যাস ষড়্‌জ; আর্ষভীর ন্যাস ঋষভ, ইত্যাদি। এই ন্যাসস্বরের (শুদ্ধজাতির) কোন পরিবর্তন বা বিকৃতি হয় না। শুদ্ধজাতি থেকে বিকৃত জাতি সৃষ্টি করতে গেলে ন্যাস ছাড়া আর সব-কিছুরই পরিবর্তন করা যেতে পারে। ভরত তাই উল্লেখ করেছেন: "শুদ্ধা অন্যূনস্বরাঃ স্বরাংশগ্রহন্যাসাঃ। এভ্যোঽন্যতমেন দ্বাভ্যাং বহুভির্বা লক্ষণৈর্বিক্রিয়াত্মুপগতা ন্যাসবর্জং বিকৃতসংজ্ঞা ভবন্তি"।[৯১]

প্রতিটি জাতির অংশ বা গ্রহ স্বর থাকা একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে প্রত্যেক রাগের একটির বেশী অংশ বা বাদীস্বর আমরা স্বীকার করি না। কিন্তু ভরত বলেছেন একটি জাতিরাগের তিনটির অধিকও অংশ থাকতে পারে ও সেদিক থেকে তিনি দু'টি গ্রামের (ষড়্‌জ ও মধ্যম) মোট ৬৩টি অংশ স্বীকার করেছেন। এর প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,

দ্বৈগ্রামকীনাং জাতীনাং সর্বাসামপি নিত্যশঃ।
অংশস্ত্রিষষ্টির্বিজ্ঞেয়াস্তাসাং চৈব তথা গ্রহাঃ ॥[৯২]

'ন্যাস' অর্থে জাতিরাগ বা রাগের আলাপ কিংবা বিকাশ যেখানে শেষ হয়। ভরত বলেছেন: "ন্যাসো হ্যংগসমাপ্তৌ"। 'অঙ্গ' অর্থে অংশ বা পাদ। 'অপন্যাস' একটি অংশ বা পাদের পূর্বার্ধে (প্রথমাংশে) থাকে: "অঙ্গমধ্যেঽপন্যাস এব স্যাৎ"। 'অল্পত্ব' বলতে সাধারণভাবে কম স্বরের ব্যবহার বোঝায়। ভরত বলেছেন অল্পত্ব দু'রকম—অনভ্যাস ও লঙ্ঘন। অংশ ছাড়া অন্যান্য স্বরকে বর্জন করার নাম 'অনভ্যাস', আর সামান্যভাবে স্বরকে স্পর্শ করার নাম 'লঙ্ঘন': "স্বরাণাং লঙ্ঘনাদনভ্যাসাচ্চ সকৃদুচ্চরণম্"। ভরত বলেছেন লঙ্ঘন অর্থে ষাড়ব ও ঔড়ব জাতি-দু'টিতে অংশ ভিন্ন অন্যান্য স্বরকে বর্জন করা বোঝায়: "তত্র ষাড়বৌড়-বিতকরণত্বমংশানাং[৯৩] গীতানামন্তরমার্গমুপগতানাং স্বরাণংলঙ্ঘনাদনভ্যাসাচ্চ সকৃদুচ্চারণং যথা জাতিঃ"।[৯৪] অনেকে' অনভ্যাস'-শব্দের অর্থ করেন দুর্বল স্বরের অনাবৃত্তি বা অনুচ্চারণ। অন্তরমার্গ সাধারণত বিকৃত জাতিতে ব্যবহৃত হয়।

৯১। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ২৮।৪৩

৯২। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ২৮।৭৫; ২৮।৮১ কাব্যমালা-সংস্করণে এর পাঠভেদ যেমন,
দ্বৈগ্রামিকীনাং জাতীনাং সর্বাসামপি নিত্যশঃ।
ত্রিষষ্টিরংশা বিজ্ঞেয়াস্তাসাং চৈব তথা গ্রহাঃ ॥ ২৮।৮৬

৯৩। অনেকে 'অংশানাং' স্থানে 'অনাংশানাং' পাঠ শুদ্ধ বলেন।

৯৪। নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা সং) ২৮।৮১

ভরত তিন রকম মন্দ্রগতির কথা উল্লেখ করেছেন—অংশপরা, ন্যাসপরা ও অপন্যাসপরা: "ত্রিবিধা মন্দ্রগতি:—অংশপরা ন্যাসপরাপন্যাসপরা চেতি। মন্দ্রস্ত্বংশপরো নাস্তি ন্যাসে তু দ্বৌ ব্যবস্থিতৌ * *"।[৯৫] মন্দ্র বা নিম্ন (খাদ)-গতির ব্যবহার অংশ পর্যন্ত অথবা ন্যাস বা অপন্যাস পর্যন্ত হ'তে পারে। সুতরাং দেখা যায় যে ভরত ৬৩টি (২১×৩=৬৩) অংশ এবং ৪২টি অপন্যাসের (কেননা প্রত্যেকটি জাতিতে অন্ততঃ দু'টি ক'রে অপন্যাস থাকে) কথা বলেছেন। কিন্তু আসলে তিনি ৫৬টি অপন্যাসের কথা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং বোঝা যায় যে ১৪টি বিকৃত-জাতির প্রত্যেকটিতে আবার একটি ক'রে অধিক অপন্যাস যোগ করা হয়, আর তারি জন্য অপন্যাসের সংখ্যা হয় মোট ৪২+১৪=৫৬টি। প্রকৃতপক্ষে ভরত অঙ্গসমাপ্তিতে ২১টি ন্যাস ও অঙ্গমধ্যে ৫৬টি অপন্যাসের কথা বলেছেন।[৯৬] ভরত অন্তরগান্ধার ও কাকলিনিষাদের উপযোগিতাও জাতিরাগের বিকাশে স্বীকার করেছেন: "দ্বিবিধাস্তরমার্গস্তু জাতীনাং ব্যক্তিকারক:"।[৯৭] 'অন্তরমার্গ' বলতে বিকৃতস্বর গান্ধার ও নিষাদ (অন্তর ও কাকলি) বোঝায় এবং পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে এরা বিকৃত-জাতিরাগে ব্যবহৃত হ'ত। অনেকে অন্তর ও কাকলি দু'টি বিকৃতস্বর-সম্পর্কিত গ্রাম হিসাবে গান্ধারগ্রাম, কৈশিকগ্রাম ও ধৈবতগ্রাম এই তিনটির পরিচয় দেন।

৯৫। নাট্যশাস্ত্রে (কাব্যমালা সং) ২৮।৮১

৯৬। অথ ন্যাস:—একবিংশতিবিধো হ্যঙ্গসমাপ্তৌ। তদ্বদপন্যাসোঽপ্যঙ্গমধ্যে ষট্‌পঞ্চাশৎ-সংখ্য:। যথা—

ন্যাসো হ্যঙ্গসমাপ্তৌ চৈকবিংশতিবিধো বিধাতব্য:।
ষট্‌পঞ্চাশৎসংখ্যোঽঙ্গমধ্যেঽপ্যপন্যাস এব স্যাৎ॥

—নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা) ২৮।৮১

৯৭। নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা সং) ২৮।৮৩

সাতটি শুদ্ধ জাতিরাগের অংশ, ন্যাস ও অপন্যাস স্বর :

সংখ্যা	শুদ্ধ জাতিরাগ	অংশ বা গ্রহ	ন্যাস	অপন্যাস
১	ষাড়্জী	ষড়্জ, মধ্যম, ধৈবত	ষড়্জ	মধ্যম, ধৈবত
২	আর্ষভী	ধৈবত, ঋষভ, মধ্যম	ঋষভ	ধৈবত, মধ্যম
৩	গান্ধারী	ষড়্জ, গান্ধার, পঞ্চম	গান্ধার	ষড়্জ, পঞ্চম
৪	মধ্যমা	মধ্যম, নিষাদ, ঋষভ	মধ্যম	নিষাদ, ঋষভ
৫	পঞ্চমী	ঋষভ, পঞ্চম, নিষাদ	পঞ্চম	ঋষভ, নিষাদ
৬	ধৈবতী	ধৈবত, ঋষভ, মধ্যম	ধৈবত	ঋষভ, মধ্যম
৭	নৈষাদী	মধ্যম, নিষাদ, ঋষভ	নিষাদ	মধ্যম, ঋষভ

ভরত উল্লেখ করেছেন :" তত্রৈকাদশ জাতয়োঽধিকৃতাঃ পরস্পরং সংযোগাদেকাদশ নির্বর্তয়ন্তি"। অবশ্য এ'সম্বন্ধে পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। শুদ্ধ জাতিরাগে মিশ্রণ নাই। তবে অংশ, গ্রহ, ন্যাস, অপন্যাস ও বর্জিত স্বরের নীতি শুদ্ধ ও বিকৃত এই উভয় জাতিতেই সমান। ক্রমবিবর্ধমান সমাজে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক ও তা প্রতিভার বিকাশ ও অবদান হিসাবে গণ্য। ভরত-পূর্ব যুগে শুদ্ধ সাতটি জাতিরাগ নিয়েই শিল্পীসমাজ সন্তুষ্ট ছিল, খৃষ্টীয় শতাব্দীর সূচনায় আবার নবসৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। বিকৃত জাতিরাগ এই নবসৃষ্টিরই অবদান।

এভাবে ভরত বিকৃত জাতিগুলির অংশ বা গ্রহ, ন্যাস, অপন্যাস ও বর্জিত স্বরগুলিরও নির্দশন দিয়েছেন।[১৮] তাদের কয়েকটি যেমন,

সংখ্যা	বিকৃত জাতিরাগ	অংশ বা গ্রহ	ন্যাস	অপন্যাস
১	কৈশিকী	ষড়্জ, গান্ধার, পঞ্চম	পঞ্চম	ষড়্জ, গান্ধার
২	ষড়্জ-কৈশিকী	,,	ষড়্জ	গান্ধার, পঞ্চম
৩	আন্ধ্রী	ঋষভ, পঞ্চম, নিষাদ	নিষাদ	ঋষভ, পঞ্চম
৪	কর্মারবী	ঋষভ, পঞ্চম, নিষাদ	ঋষভ	পঞ্চম, নিষাদ
৫	গান্ধারোদিচ্যবা	ষড়্জ, মধ্যম, ধৈবত	মধ্যম	ষড়্জ, ধৈবত
৬	মধ্যমোদীচ্যবা	,,	,,	,,
৭	ষড়্জোদীচ্যবা	,,	,,	,,

শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকরে (স্বরাধ্যায়, ৭ম প্রকরণ) জাতিরাগগুলির যে অংশ, ন্যাস ও অপন্যাসের পরিচয় দিয়েছেন ভরতের বিবরণ থেকে তা কিছুটা ভিন্ন। রাজা রঘুনাথও (১৬১৪ খৃ°) তাঁর 'সঙ্গীতসুধা' গ্রন্থে শার্ঙ্গদেবকে অনুসরণ করেছেন। শার্ঙ্গদেব অংশাদির পরিচয় যেভাবে উল্লেখ করেছেন তার পরিচয় দেওয়া হ'ল :

১৮। 'অংশগ্রহদানিদানীং ব্যাখ্যাস্যামঃ। তত্র—

মধ্যমোদীচাবায়াস্তু নন্দয়ন্ত্যাস্তথৈব চ।
তথা গান্ধারপঞ্চম্যাঃ পঞ্চমোংশো গ্রহস্তথা॥
ধৈবত্যাশ্চ তথৈবাংশৌ বিজ্ঞেয়ৌ ধৈবতর্ষভৌ।
পঞ্চম্যাস্তু গ্রহাবংশৌ ভবতঃ পঞ্চমর্ষভৌ।
গান্ধারোদীচ্যবায়াস্তু গ্রহাংশৌ ষড়্জমধ্যমৌ॥

(১) ॥ ষাড়্‌জী ॥ 'অস্যাং ষাড়্‌জ্যাং ষড়্‌জোন্যাসঃ। গান্ধারপঞ্চমাবপন্যাসৌ। বরাটী দৃশ্যতে'। ষড়্‌জ ন্যাস এবং গান্ধার ও পঞ্চম অপন্যাস। নিষাদ ও ঋষভ বর্জিত হ'লে ষড়্‌জ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম ও ধৈবত এ' পাঁচটি স্বর গ্রহ বা অংশ হয়ঃ "ষাড়্‌জ্যামংশঃ স্বরাঃ পঞ্চ"। নিষাদ বর্জিত হ'য়ে ষাড়্‌জী কখনো ষাড়বজাতি-রূপে প্রকাশ পায়, আবার নিষাদ কাকলি হ'লে অভিজাত দেশীরাগ বরাটীর ছায়া আসতে পারে। ষড়্‌জ ও গান্ধারে এবং ষড়্‌জ ও ধৈবতে স্বরসংগতি হয়। এককল, দ্বিকল বা চতুষ্কল এই তিন রকম তালের ব্যবহার হয়। এককল হ'লে চিত্রামার্গে মাগধীগীতির সমাবেশ থাকে। দ্বিকল হ'লে বার্তিকমার্গে সম্ভাবিতার ও চতুষ্কল হ'লে দক্ষিণামার্গে পৃথুলাগীতির প্রয়োগ হয়। নাটকের প্রথমাঙ্কে নৈষ্ক্রামিকী-ধ্রুবাগানেরও ব্যবহার হয়।

(২) ॥ আর্যভী ॥ আর্যভীতে নিষাদ, ঋষভ ও ধৈবত তিনটি স্বর অংশ। ঋষভ ন্যাস। অংশস্বরই অপন্যাস। ষড়্‌জ বর্জিত হ'লে ষাড়ব, কিংবা ষড়্‌জ ও পঞ্চম বর্জিত হ'লে আর্যভী ঔড়বজাতি সম্পন্ন হয়। এতে চচ্চৎপুটতাল ও আটটি কলার ব্যবহার ও নৈষ্ক্রামিকী-ধ্রুবগানের প্রয়োগ হয়। আর্যভীতে অভিজাত দেশীরাগ মাধুকরীর বিকাশ হ'তে পারে।

(৩) ॥ গান্ধারী ॥ গান্ধারী-জাতিরাগে ষড়্‌জ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম ও নিষাদ এ' পাঁচটি স্বর বিকল্পে অংশ, গান্ধার ন্যাস, ষড়্‌জ ও পঞ্চম অপন্যাস। ধৈবত ও ঋষভ পর্যন্ত রাগের আরোহণ। ঋষভ বর্জিত হ'লে ষাড়ব, কিংবা ঋষভ ও ধৈবত বর্জিত হ'লে ঔড়বজাতি হয়। ষোলটি কলা ও চচ্চৎপুট তালের ব্যবহার। প্রবেশিকা-ধ্রুবগানে এর প্রয়োগ হয়। গান্ধার ও পঞ্চম স্বর-দু'টির বিকাশ হ'লে গান্ধারীতে দেশী বেলাবলিরাগের প্রতীতি হয়।

আর্ষভ্যাং তু নিষাদস্তু তথা চর্ষভধৈবতৌ।
নিষাদ্যাং চ নিষাদস্তু গান্ধারশ্চর্ষভস্তথা॥
তথা চ ষড়্‌জকৈশিক্যাং ষড়্‌জগান্ধারপঞ্চমাঃ
তিসৃণামপি জাতীনাং গ্রহাস্ত্বংশাশ্চ কীর্তিতাঃ॥

*　　*　　*　　*

পঞ্চমেনর্ষভশ্চৈব নিষাদো ধৈবতস্তথা।
কর্মারব্যা বুধৈরংশা গ্রহাশ্চ পরিকীর্তিতাঃ॥ —প্রভৃতি

—নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা) ২৮৷৮৭-১০৪;
কাশী-সংস্করণ ২৮৷৭৬-৮৭

(৪) ॥ মধ্যমা ॥ মধ্যমাজাতিতে ষড়্‌জ, ঋষভ, মধ্যম, পঞ্চম ও ধৈবত পাঁচটি স্বর বিকল্পে অংশ, মধ্যম ন্যাস ও অংশস্বর অপন্যাস। ষড়্‌জ ও মধ্যম স্বরদু'টির ব্যবহার অধিক ও গান্ধার অল্প। গান্ধার বর্জিত হ'লে ষাড়ব এবং নিষাদ ও গান্ধার বর্জিত হ'লে ঔড়বজাতি। আটটি কলা ও চচ্চৎপুটতালের ব্যবহার। মধ্যমায় দেশী আন্ধালীরাগের ছায়ার প্রতীতি হ'তে পারে।

(৫) ॥ পঞ্চমী ॥ পঞ্চমী-জাতিরাগে ঋষভ ও পঞ্চম অংশ। পঞ্চম ন্যাস। ঋষভ, পঞ্চম ও নিষাদ অপন্যাস। ষড়্‌জ, মধ্যম ও গান্ধারের ব্যবহার অল্প। ঋষভ ও মধ্যমে সংগতি। আটটি কলা ও চচ্ছৎপুটতালের ব্যবহার। দেশীরাগ আন্ধালীর প্রতীতি হ'তে পারে।

(৬) ॥ ধৈবতী ॥ ঋষভ ও ধৈবত অংশ। ধৈবত ন্যাস। ঋষভ, মধ্যম ও ধৈবত অপন্যাস। পঞ্চম বর্জিত হ'লে ষাড়ব এবং ষড়্‌জ ও পঞ্চম বর্জিত হ'লে ঔড়ব। ঋষভাদি মূর্ছনা। ষাড়জী-জাতিরাগের মতো এতে বারোটি কলার ব্যবহার। প্রাবেশিকী-ধ্রুবগানে এর ব্যবহার। দেশী শুদ্ধ-কৈশিকরাগের প্রতীতি হ'তে পারে।

(৭) ॥ নৈষাদী ॥ ঋষভ, গান্ধার ও নিষাদ বিকল্পে অংশ। নিষাদ ন্যাস। অংশস্বর অপন্যাস। ষড়্‌জ, মধ্যম, পঞ্চম ও ধৈবত স্বরগুলির বেশী ব্যবহার। পঞ্চম বর্জিত হ'লে ষাড়ব এবং ষড়্‌জ ও পঞ্চম বর্জিত হ'লে ঔড়বজাতি। নাটকীয় নৈষ্ক্রামিকী-ধ্রুবগানে এর ব্যবহার। ষোলকলা ও চচ্চৎপুট তালের প্রয়োগ। দেশী শুদ্ধসাধারিত-রাগের প্রতীতি হ'তে পারে।

এভাবে বিকৃত এগারটি জাতিরাগেরও অংশ, ন্যাস, অপন্যাস, ষাড়বত্ব ও ঔড়বত্ব, তাল, কলা প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। বিজ্ঞানসম্মতভাবে স্বরলিখন (notation) না থাকায় জাতিরাগগুলির বিকাশসাধন করা এখন কঠিন। তা ছাড়া গান্ধর্বগানের রীতি ও প্রকৃতি দেশীগান থেকে যথেষ্ট ভিন্ন। মানুষের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গি পুরাতনের বুকে নতুনের সৃষ্টি করতে উন্মুখ। জাতিরাগের স্বরসজ্জা ও প্রয়োগ তাই অভিজাত দেশীগানের সমাজে অচল হওয়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া উল্লেখযোগ্য যে শার্ঙ্গদেব সনাতন যুগের জাতিরাগগুলিকে ধরা ও বোঝার জন্য অভিজাত দেশীরাগের প্রতীতি-রূপ মানদণ্ডের নিদর্শন দিয়েছেন, তাতে ক'রে আধুনিক যুগের মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি পেয়েছে সুযোগ প্রাচীনের কিছুটা আভাস পেতে।

উল্লেখযোগ্য যে নাট্যশাস্ত্রকার ভরত জাতিরাগে তিনটির অধিকও

অংশের কথা উল্লেখ করেছেন। তাই গ্রহ বা অংশের নির্ণয় ব্যাপারে কিছুটা ভিন্নমতও আছে :

আর্ষভ্যাম্নিধা অংশ নিষাদী রিনিগাস্ত্রয়ঃ ॥
সগপাঃ ষড়্জকৈশিক্যাস্ত্রিস্রোঽংশকাঃ প্রকীর্তিতাঃ।
চতুরংশ সমনিধা ষড়্জোদীচ্যবতী স্মৃতাঃ ॥
কর্মারবী রিপনিধৈরান্ধ্রী রিপনিগঃ স্মৃতা।
সগমপধৈঃ ষাড়্জী স্যাৎ পঞ্চভিশ্চাপি মধ্যমা ॥
সপরিমধৈরংশৈঃ স্যাদ্‌গান্ধারী সমগানিপৈঃ।
তদ্বৎস্যাদ্রক্তগান্ধারী চতস্রোঽংশৈশ্চ পঞ্চভিঃ ॥
কৈশিকী চ ষড়্জা স্যাৎ সগমপনিধৈঃ স্মৃতাঃ।
ষড়্জমধ্যা তু সপ্তাংশা ত্রিষষ্টিরিতি তেঽংশকাঃ ॥৯৯

ভরতের মতে গ্রহ ও অংশ সমার্থক ('সোঽংশো গ্রহ-বিকল্পিতঃ') একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। শার্ঙ্গদেব কিন্তু একথা স্বীকার করেন নি। তিনি বলেছেন : "তত্রাংশগ্রহয়োরণ্যতরোক্তাবুভয়গ্রহঃ" (১।৭।৩১)। কল্লিনাথ এ'প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন : "* * যত্র কচিদংশ এবোচ্যতে ন গ্রহঃ, যত্র চ গ্রহ এবোচ্যতে ন ত্বংশঃ, * *। অয়মর্থঃ—যত্র গীতলক্ষণে যস্য স্বরস্যাংশত্বমুক্তং নান্যস্য গ্রহত্বং তত্র তস্যৈব গ্রহত্বমপ্যুক্তম্, যস্য চ গ্রহত্বমুক্তং নান্যস্যাংশত্বং তত্রাপি তস্যৈবাংশত্বমপ্যক্তমিতি। * * নন্বংশো গ্রহ ইতি ভরতাদেশেন সর্বেষপ্যংশধর্মেষু গ্রহস্য প্রাপ্তেষু গ্রহাংশয়োঃ কো বিশেষ ইতি চেৎ, উচ্যতে—গ্রহস্যাংশাতিদেশতস্তু প্রাপ্তং ন কেবলং বাদিত্বমেব ধর্মঃ, অপি তু বাদিত্বাদিচতুষ্টয়মপীতি তয়োর্ভেদ ইতি"। মতঙ্গ বৃহদ্দেশীতে উল্লেখ করেছেন : "অংশো বাদ্যেব পরং গ্রহস্তু বাদ্যাদিভেদভিন্নশ্চতুর্বিধঃ"। সিংহভূপাল বলেছেন : "নন্বেবং তর্হি গ্রহাংশয়োঃ কো ভেদঃ? উচ্যতে—অংশো বাদ্যেব পরম্, গ্রহস্তু বাদ্যাদিভেদভিন্নশ্চতুর্বিধঃ; অংশশ্চ রাগজনকত্বাৎপ্রধানম্; গ্রহস্ত্বপ্রধানমিতি তয়োর্ভেদঃ"। ঐতিহাসিক দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় খৃষ্টীয় শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে গ্রহ ও অংশ সমান অর্থে ও সার্থকতায় ব্যবহৃত হ'ত, কিন্তু বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গের সময়, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৫ম—৭ম শতাব্দী থেকে দু'টির অর্থে ও প্রয়োগে ভিন্ন মতের সৃষ্টি হয় ও মতঙ্গের পরবর্তী গ্রন্থকার ও শিল্পীরা দু'টিকে একেবারেই ভিন্নভাবে ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন ব'লে মনে হয়।

৯৯। নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা সং) ২৮।১০৩-১০৭

ভরত বলেছেন গ্রহ বা অংশাদিযুক্ত জাতিরাগগুলি চিত্রা, আবৃত্তি ও দক্ষিণা এই তিনটি বৃত্তির সহযোগে এবং মাগধী, অর্ধমাগধী, সম্ভাবিতা ও পৃথুলা এই চারটি গীতির সঙ্গে প্রয়োগ করা হ'ত। সেই প্রয়োগের পূর্বে বহির্গীত হিসাবে আসারিতগানে যে আশ্রবণাবিধি বা তালের সমাবেশ থাকত তারও সাহায্য নেওয়া হ'ত। তিনি উল্লেখ করেছেন,

আসাং প্রয়োগকালে তু পুরমাশ্রাবণাবিধিঃ ॥
মার্গৈস্ত্রিভিঃ প্রযোক্তব্যাশ্চিত্রবার্তিকদক্ষিণৈঃ।
চতুর্ভির্গীতিভিশ্চ স্যাম্মাগধ্যাদিভিরেব চ ॥[১০০]

ভরতের এই শ্লোকগুলি বোঝার জন্য আমাদের জানা দরকার (১) তিনটি বৃত্তি কাকে বলে? (২) লক্ষণযুক্ত বহির্গীত কি (৩) আশ্রাবণাবিধির অর্থ কি? এবং (৪) চারটি গীতি কি কি ও তাদের স্বরূপ কি?

(১) ॥ বৃত্তি ॥ তিনটি বৃত্তি সম্বন্ধে ভরত বলেছেন: "তিস্রো গতিবৃত্তয়ঃ প্রধান্যেন গ্রাহ্যাঃ চিত্রাবৃত্তির্দাক্ষিণাচেতি। তাসাং বাদ্যতাললয়গীতযতিমার্গ-প্রধানানি যথাস্বং ব্যঞ্জনানি ভবন্তি। তত্র চিত্রায়াং সংক্ষিপ্তবাদ্যং তালদ্রুতলয়সমা যতিঃ অনাগতগ্রহাণাং প্রাধান্যম্। তথাবৃত্তৌ গীতিবাদিত্রদ্বিকলতালমধ্যলয়-শ্রোতোগতা যতিঃ। সমগ্রমার্গাণাং প্রাধান্যম্। দক্ষিণায়াং গীতিচতুষ্কল-তালবিলম্বিতলয়গোপুচ্ছা যতিঃ অতীতমাগ্রহমার্গাণাম্ প্রাধান্যম্"।[১০১] চিত্রা, আবৃত্তি ও দক্ষিণা এ'তিনটি মার্গবৃত্তির মধ্যে: (ক) চিত্রাবৃত্তিতে সংক্ষিপ্ত বাদ্য, দ্রুতলয়, সমাযতি ও অনাগতগ্রহের প্রাধান্য থাকে; (খ) আবৃত্তিবৃত্তিতে গীতি (মাগধী প্রভৃতি), বাদ্যযন্ত্র, দ্বিকলবিশিষ্ট তাল, মধ্যলয়, স্রোতোগতা-যতি ও সমগ্রহের প্রাধান্য ও (গ) দক্ষিণাবৃত্তিতে গীতি, চতুষ্কলযুক্ত তাল, বিলম্বিত লয়, গোপুচ্ছাযতি ও অতীতগ্রহের প্রাধান্য থাকে।

(২) ॥ বহির্গীত ॥ পূর্বরঙ্গ বা রঙ্গপীঠের বহির্ভাগে যবনিকা উত্তোলনের পর আসারিত বা বর্ধমানক প্রভৃতি যে গীতি বা গান হ'ত তাকে ভরত 'বহির্গীত' বলেছেন।

১০০। নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা সং) ২৮।১০৮-১০৯

১০১। (ক) নাট্যশাস্ত্র (কাশী সংস্করণ) ২৯।১০১; কাব্যমালা সংস্করণে—

"তিস্রস্তু বৃত্তয়শ্চিত্রা দক্ষিণাবৃত্তিসংজ্ঞিতাঃ।" ২৯।৭৩

(খ) অনাগতগ্রহ, সমগ্রহ ও অতীতগ্রহ সম্বন্ধে সঙ্গীত-রত্নাকর, ৩য় ভাগ (আড্যেয়ার সংস্করণ, ১৯৫১), পৃঃ ২৬৭-২৬৮ দ্রষ্টব্য।

(৩) ॥ আশ্রাবণাবিধি ॥ নাট্যশাস্ত্রের (কাশী সং) ৫ম অধ্যায়ে উল্লেখ আছে: "আতোদ্যরঞ্জনার্থং তু ভবেদাশ্রাবণা বিধিঃ" (৫।১৮), অর্থাৎ আতোদ্যাদি বাদ্যে রঞ্জনাশক্তি সৃষ্টির জন্য আশ্রবণাবিধির সার্থকতা। সপ্ততন্ত্রী ও নবতন্ত্রী চিত্রা ও বিপঞ্চী বীণার উল্লেখের পর ভরত নাট্যশাস্ত্রে বহির্গীতের পরিচয় দিয়ে বলেছেন,

অত উর্ধ্বং ব্যাখ্যাস্যে লক্ষণযুক্তং বহির্গীতম্ ॥

আশ্রাবণারম্ভবিধী বক্ত্রপাণিস্তথৈব চ।

পরিঘট্টনা চ বিজ্ঞেয়া তথা সংঘোটনৈব চ ॥

* * * *

তত্রাশ্রাবণা নাম।

বিস্তারধাতুবিহিতৈঃ করণৈঃ প্রবিভাগশো দ্বিরভ্যস্তৈঃ।

বিশ্বাপি (?) সন্নিবৃত্তৈঃ করণোপচয়ৈঃ ক্রমেণ স্যাৎ ॥

গুরুণি স্যাদাবেকাদশকচতুর্দশকসপঞ্চদশকম্।

সচতুর্বিংশকমেব দ্বিগুণীকৃতমেতদেব স্যাৎ ॥

লঘুগুরুণী চ স্যাতামথাষ্টমং গুরু ভবেত্তদা চ পুনঃ।

* * * *

ঘটপরস্তথা চ যুক্তৈঃ স্যাদেব হ্যাশ্রাবণাতালঃ ॥[১০২]

শার্ঙ্গদেব যেন নাট্যশাস্ত্রের ভাষ্যকার হিসাবে সঙ্গীত-রত্নাকরে বাদ্যাধ্যায়ে এই আশ্রাবণাবিধির বিশদ পরিচয় দিয়েছেন। কল্লিনাথ ও সিংহভূপাল তাকে আরো সাবলীল ও পরিস্ফুট করেছেন। শার্ঙ্গদেব বলেছেন আশ্রাবণ-রূপ শুষ্কবাদ্যটির কথা সঙ্গীতশাস্ত্রী বিশাখিল উল্লেখ করেছেন: "আশ্রাবণং শুষ্কবাদ্যমত্র হ্যাহ বিশাখিলঃ" (৬।১৮৩)। 'শুষ্ক' অর্থে নির্গীত বাদ্য। গীত বা নৃত্যের বিরামের সময় যে বাদ্য প্রয়োগ করা হয় তাকে 'শুষ্কবাদ্য' বলে। শুষ্কবাদ্যের পরিকল্পনা বিচিত্র রকমের হ'তে পারে। নাট্যে নৃত্য-গীতের বিরামস্থলে একমাত্র বাদ্যেরও সমাবেশ করা হ'ত। এই নৃত্য-গীতহীন একক বাদ্যই আসলে শুষ্কবাদ্য নামে পরিচিত। কল্লিনাথও বলেছেন নির্গীত-বাদ্যই 'শুষ্কবাদ্য': "নির্গীত-বাদ্যান্যেব শুষ্কবাদ্যানীত্যুচ্যন্তে"। সঙ্গীত-রত্নাকরের টীকায় কল্লিনাথের মতো সিংহভূপাল আশ্রবণা বা শুষ্কবাদ্যের পরিচয় দিয়ে বলেছেন: "আদিমং বিস্তারজং দ্বিঃ দ্বিবারং প্রযুজ্য আদ্যং ভেদং দ্বিতীয়ভেদে লীনা বিলীনা দক্ষিণা-

১০২। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সংস্করণ) ২৯।১১৬-১২৪

কৃতির্বস্তু তথাবিধং দ্বিবারমুচ্চার্য তদ্বদেব যুগ্মান্তরাণি দ্বৌ দ্বৌ ভেদৌ দ্বিরুক্তরাদিকো যদা প্রযুঞ্জীত তদা আশ্রবণেত্যুচ্যতে"। মনে হয় পণ্ডিত কল্লিনাথের বিশ্লেষণভঙ্গি আরো পরিষ্কার। তিনি সাতটি যুগ্মের (দ্বিগুণের) কথা বলেছেন। বিস্তার নামক ধাতুর ভেদ চৌদ্দবার হ'লে আশ্রাবণাবিধি বা আশ্রাবণা-রূপ নির্গীত বা শুষ্কবাদ্য হয়ঃ "বিস্তারধাতুভেদানাং চতুর্দশানামাদিমং বিস্তারজং নাম ভেদং" ইত্যাদি।

(৪) ॥ চতুর্বিধ গীতি ॥ চারটি গীতি হ'ল মাগধী, অর্ধমাগধী, সম্ভাবিতা ও পৃথুলা। ভরত নাট্যশাস্ত্রের বিভিন্ন অধ্যায়ে নাট্যবিধানে (পূর্বরঙ্গে), জাতিরাগ-পর্যায়ে (নন্দয়ন্তী-জাতিরাগগানে), ধ্রুবাপ্রসঙ্গে মাগধী প্রভৃতি গীতির উল্লেখ করেছেন। যেমন,

(১) চতস্রো গীতয় কার্যা মাগধী হ্যর্ধমাগধী ॥
সংভাবিতং তথা চৈব পৃথুলা চ প্রকীর্তিতা।[১০৩]

এখানে পূর্বরঙ্গের বা রঙ্গপীঠের বহির্ভাগে যবনিকা উত্তোলনের পর আসারিত, বর্ধমানক প্রভৃতি গানের মতো মগধদেশজাত মাগধী বা অর্ধমাগধী গীতি ও গাওয়া হ'তঃ "মাগধী অথ কর্তব্যা অথবা চার্ধমাগধী"। মাগধী প্রভৃতি গীতি ত্রিমার্গ বা তিনটি কলাযুক্ত ক'রে গাওয়া হ'ত। তিনটি কলা যেমন চিত্রা, বার্তিক ও দক্ষিণা। এদের প্রমাণকলাও বলা হ'ত। চিত্রাকলায় দু'মাত্রা, বার্তিকে চারমাত্রা ও দক্ষিণাকলায় আটমাত্রার সমাবেশ থাকত।[১০৪] চিত্রাকলাযোগে পৃথুলাগীতি পরিবেশনের ব্যবস্থা ছিল।[১০৫] চিত্রাদিতে কলাসমষ্টির আবার ব্যতিক্রম থাকত। শার্ঙ্গদেবও নন্দয়ন্তী-জাতিগানের পর্যায়ে উল্লেখ করেছেন

১০৩। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ৫।১৮৪-১৮৫

১০৪। যত্তত্র মন্দোহথ লয়স্তৎপ্রমাণকলা ভবেৎ।
ত্রিবিধা সা চ বিজ্ঞেয়া ত্রিমার্গা নিয়তা বুধৈঃ ॥
চিত্রে দ্বিমাত্রা কর্তব্যা বার্তিকে দ্বিগুণা তু সা।
চতুর্গুণা দক্ষিণা স্যাদিত্যেবং ত্রিবিধা কলা ॥
—নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ৩১।৫-৬

১০৫। পূর্বরঙ্গে ভবেচ্চিত্রে চিত্রমার্গে চ মাগধী।
যথা মিশ্রস্তু যোক্তব্যঃ পূর্বরঙ্গো ভবেদিহ ॥
মিশ্রে সংভাবিতা কার্যা তদা বার্তিকমাশ্রিতা।
শুদ্ধে চ পৃথুলা কার্যা দক্ষিণং মার্গমাশ্রিতা ॥
—নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ৫।১৮৬-১৮৭

মাগধী, সংভাবিতা ও পৃথুলাগীতিতে যে চিত্রাদি কলার ব্যবহার হ'ত তাদের মধ্যে দক্ষিণায় কলা-সংখ্যা থাকত বার্তিকের দ্বিগুণ ও চিত্রার চতুর্গুণ।[১০৬]

(২) প্রথমা মাগধী জ্ঞেয়া দ্বিতীয়া চার্ধমাগধী।
সম্ভাবিতা তৃতীয়া চ চতুর্থী পৃথুলা স্মৃতা ॥[১০৭]

ভরত উল্লেখ করেছেন ভিন্ন বৃত্তিতে যে গীতি গান করা হ'ত তার নাম 'মাগধী'। অর্ধকালবিশিষ্ট হ'লে 'অর্ধমাগধী'। গুরু অক্ষরযুক্ত হ'লে 'সম্ভাবিতা' ও লঘু অক্ষরে 'পৃথুলা' গান করা হ'ত।[১০৮] এই গীতিগুলি বর্ণ, অলংকার, পদ, ধাতু, লয় প্রভৃতি উপাদানবিশিষ্ট ছিল। স্মতরাং মগধদেশজাত ব'লে অভিহিত হ'লেও এই গীতিগুলি অনিবদ্ধ দেশী তথা আঞ্চলিক (folk song) শ্রেণীভুক্ত ছিল না। ভরতও বলেছেন গান্ধর্বগানেই এগুলি প্রযুক্ত হ'ত: "এতাস্তু গীতয়ো জ্ঞেয়া ধ্রুবাযোগং বিনৈব হি, গান্ধর্ব এব যোজ্যাস্ত" (নাট্যশাস্ত্র ২৯।৮০)।

(৩) বহ্বক্ষরা চ বিপুলা মাগধী চার্ধমাগধী।
সমাক্ষরপদা চৈব তথা বিষমাক্ষরা ॥

* * * *

দ্রুতবাক্যা দ্রুতলয়া জ্ঞেয়া বহ্বক্ষরেতি সা ॥
গুরুপ্লুতাক্ষরাপ্রায়া স্বল্পবাক্যা যদা তথা।
ত্রিলয়া পৃথুলাখ্যা চ স্থকুমারবিধৌ স্মৃতা ॥
ত্রিলয়া ত্রিযতিশ্চৈব ত্রিপ্রকারাক্ষরান্বিতা।
একবিংশতিতালা চ মাগধী সম্প্রকীর্তিতা ॥
গুরুলঘরক্ষরকৃতা দ্রুতমধ্যলয়ান্বিতা।
মাগধ্যে বার্ধতালে চ যুক্তা স্যাদর্ধমাগধী ॥[১০৯]

১০৬। মার্গাঃ ক্রমাচ্চিত্রবৃত্তিদক্ষিণা গীতয়ঃ পুনঃ।
মাগধী সংভাবিতা চ পৃথুলেত্যুদিতাঃ ক্রমাৎ।
যোক্তাঽস্মাভিঃ কলাসংখ্যা সা দক্ষিণপথে স্থিতা।
বার্তিকে দ্বিগুণা জ্ঞেয়া সৈব চিত্রে চতুর্গুণা।
—সঙ্গীত-রত্নাকর ১।৭।১১০-১১২

১০৭। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ২৯।৭৭

১০৮। ভিন্নবৃত্তিপ্রগীতা যা সা গীতির্মাগধী মতা।
অর্ধকালনিবৃত্তা চ বিজ্ঞেয়া ত্বর্ধমাগধী ॥
সম্ভাবিতা চ বিজ্ঞেয়া গুর্বক্ষরসমন্বিতা।
লঘ্বক্ষরকৃতা নিত্যা পৃথুলা সংপ্রকীর্তিতা ॥
—নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ২৯।৭৮-৭৯

১০৯। নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ৩১।৪৪৮-৪৫৫

এখানে ধ্রুবাগানের পর্যায়ে মাগধী ও অর্ধমাগধীর উল্লেখ করা হয়েছে। এই শ্লোকগুলি থেকে বোঝা যায় মাগধীগীতি বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত এ' তিনটি লয়ে ও তিনটি যতিতে ও তিন রকম অক্ষরে গাওয়া হ'ত। মাগধীতে একুশটি (একবিংশতি) তালের সমাবেশ থাকত। অর্ধমাগধীতে তিনটি লয়, যতি প্রভৃতির সহযোগও থাকত। আর মাগধীর অর্ধতাল অর্থে অর্ধমাগধীতে সাড়ে দশটি তালের সমাবেশ থাকত। গীতির অক্ষর অবশ্য সম ও বিষম ভেদে দুই প্রকৃতির হ'ত।

মাগধী প্রভৃতি গীতি যে গ্রামরাগগীতি শুদ্ধা, সাধারণী প্রভৃতির সমপর্যায়ভুক্ত নয় একথা শার্ঙ্গদেব ও কল্লিনাথ উভয়েই উল্লেখ করেছেন।[১১০] কল্লিনাথ বলেছেন: "নমু পূর্বোক্তাভ্যো মাগধ্যাদিগীতিভ্যোঽধুনোক্তানাং শুদ্ধাদিগীতিনাং কো ভেদ ইতি চেৎ, উচ্যতে। মাগধ্যাদয়ঃ প্রাধান্যেন পদতালাশ্রিতাঃ, শুদ্ধাদয়স্তু প্রাধান্যেন স্বরাশ্রিতা ইতীহ গ্রন্থকার এতা পঞ্চগীতিদুর্গামতানুসারেণালক্ষয়ং"। অর্থাৎ মাগধী, অর্ধমাগধী, সম্ভাবিতা ও পৃথুলা গীতিগুলিতে পদ বা অক্ষর ও তালের প্রাধান্য, আর গ্রামরাগগীতি শুদ্ধাদিতে স্বর-বিকাশের প্রাধান্য থাকিত। অথবা বলা যায় পদ ও তালাশ্রিত গীতি মাগধ্যাদি ও স্বরাশ্রিত গীতি শুদ্ধাদি। কল্লিনাথ বলেছেন দুর্গাশক্তি যে পাঁচটি গীতির কথা উল্লেখ করেছেন তাদের পার্থক্য দেখানো হয়েছে মাগধী প্রভৃতি গীতির সঙ্গে।

শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকরে ব্রহ্মগীতি-রূপ সাতটি কপাল ও কম্বল গীতির পরিচয়-দানের পর বর্ণ, অলংকার, পদ ও লয়বিশিষ্ট মাগধী প্রভৃতি চারটি গীতির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন,

বর্ণাদ্যলংকৃতা গানক্রিয়াং পদলয়ান্বিতা ॥
গীতিরিত্যুচ্যতে সা চ বুধৈরুক্তা চতুর্বিধা।

'বর্ণ'-অর্থে আরোহী অবরোহাদি কিংবা অক্ষর-বিশেষ। কিন্তু রাজা নান্যদেব তার ভরতভাষ্য 'সরস্বতীহৃদয়ালংকার'-এ 'বর্ণ' অর্থে মাগধী প্রভৃতি গীতি বলেছেন। নান্যদেবের উক্তি আচার্য অভিনবগুপ্তও তাঁর 'অভিনবভারতী' টীকায় উল্লেখ করেছেন। নান্যদেব বলেছেন: "অত্র বর্ণশব্দেন গীতিরভিধীয়তে। নাক্ষরবিশেষঃ, নাপি ষড়্‌জাদিসপ্তস্বরাঃ পদগ্রামে ত্বনিয়মাদেব স্বেচ্ছয়া প্রযুজ্যন্তে। ষড়্‌জাদিস্বরান্তানামপ্যবিশেষেণ বাবরোহাদিধর্মাণং প্রত্যেব সমুপ-

১১০। সঙ্গীত-রত্নাকর ২।১।৭

লভ্যতে। অতো বর্ণ এব গীতিরিত্যুবস্থিতম্। সোঽপি চতুর্বিধো মাগধ্যাদিঃ"। অভিনবগুপ্ত বলেছেন মগধদেশ থেকে উৎপন্ন বা প্রবর্তিত ব'লে 'মাগধী'। অনেকে বিদর্ভদেশ থেকে সৃষ্ট বলেন: "মগধদেশোদ্ভবত্বাৎমাগধী। বিদর্ভাদিষু দৃষ্টত্বাৎ সা সমাখ্যেত্যন্যে। অর্ধনিবর্তনাদর্ধমাগধী। দ্বে অপি নিবৃত্তিপ্রধানে। সংভাবিতা পৃথুলা চ মাত্রাপ্রধানা"। পূর্বেও এ'সম্বন্ধে আমরা উল্লেখ করেছি। মতঙ্গ বৃহদ্দেশীতে এ'চারটি গীতির প্রকৃতির পরিচয় দিয়ে বলেছেন মাগধীর দু'টি পদ গুরু, দু'টি মাত্রাবিশিষ্ট ও দু'বার গান করা হয় (আবৃত্তি)।[১১১] অর্ধমাগধীর পদ লঘু ও প্লুত এবং একমাত্রাবিশিষ্ট, অর্থাৎ মাগধীর অর্ধেক। আর সংভাবিতা চারমাত্রাবিশিষ্ট ও গুরু এবং পৃথুলা আটমাত্রাবিশিষ্ট গীতি। যেমন—

দ্বিগুরু দ্বিনিবৃত্তা চ চিত্রে গীতিস্ত মাগধী।
লঘুপ্লুতকৃতা চৈব তদর্ধে চার্ধমাগধী।
সংভাবিতা গুরুর্বৃত্তৌ পৃথুলা দক্ষিণে লঘুঃ॥

অর্থাৎ (১) চিত্রা = ১ কলা = ১ তাল = ২ মাত্রা = মাগধী,
(২) বার্তিক = ২ কলা = ২ তাল = ৪ মাত্রা = সম্ভাবিতা,
(৩) দক্ষিণা = ৪ কলা = ৪ তাল = ৮ মাত্রা = পৃথুলা,
(৪) মাগধীর অর্ধেক = অর্ধমাগধী।[১১২]

মতঙ্গ এ'চারটি গীতির বিকাশপ্রণালীকে আরো স্পষ্টভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন: "চিত্রে সমাযতি * * দ্রুতোলয়ঃ উপরিপাণিঃ মাগধী ধনামুখোঽবয়বঃ বার্তিকে স্রোতোগতা যতিমধ্যো লয়ঃ সমপাণিঃ সম্ভাবিতা। অত্র গবোবলয়বঃ উদগ্দক্ষিণে গোপুচ্ছা যদি (?) বিলম্বিতো লয়ঃ অধমপাণিঃ পৃথুলা গীতিতত্ত্বং চাবয়বঃ চিত্রে অনাগতোগ্রহঃ" প্রভৃতি। কলা বা বৃত্তিভেদে গীতিগুলির রূপেরও পরিবর্তন হ'ত। বিভিন্ন পদে গীতির কথারও পরিবর্তন ছিল। যেমন হয়তো গীতির পদ দ্বিতীয় কলায় মধ্যম লয়ে: 'দেবম্ * * বরদেন শর্বম্' প্রভৃতি হ'লে তৃতীয় কলায় দ্রুত লয়ে সেই পদ হ'ত: 'দেবশর্বপদদ্বয়ে বন্দে' প্রভৃতি।

১১১। মাগধীর পদকে তিনবার আবৃত্তি করা হ'ত: 'ত্রিরাবৃত্তপদামৃঃ'।

১১২। চিত্রে চৈককলে তালে বিজ্ঞেয়া গীতির্মাগধী।
বার্তিকে দ্বিকলা জ্ঞেয়া গীতিঃ সম্ভাবিতা বুধৈঃ।
দক্ষিণে পৃথুলা গীতিস্তালৈর্জ্ঞেয়া চতুষ্কলে।
অনেনৈব বিধানেন গাতব্যা গীতয়ো বুধৈঃ।
—মতঙ্গ ১৭৫-১৭৬ শ্লোক।

গীতির পদ সর্বদাই প্রায় শিবস্তুতিমূলক ছিল ও সেদিক থেকে তা অনেকটা ব্রহ্মগীতির পর্যায়ভুক্ত ছিল। মাগধী, অর্ধমাগধী প্রভৃতি চারটি গীতি মগধ বা বিদর্ভ যে দেশ থেকেই আমদানী করা হোক সেগুলি যে নাট্য ও সঙ্গীতের আদি-প্রবর্তক ব্রহ্মাভরত ও সদাশিবভরতের সময়েও প্রচলিত ছিল তা অনুমান করা যায়। ভরতও নাট্যশাস্ত্রে ধ্রুবা বা গান্ধর্ব তথা মার্গ-সঙ্গীতের সম্পর্কে তাঁর পূর্বগ আচার্য ব্রহ্মা ও সদাশিবের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে তাদের উল্লেখ করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে মাগধীগীতিতে তিনটি পদের সমাবেশ থাকত ও তিনটি পদে কলাসংখ্যা ও লয়ের প্রার্থক্য ছিল। তিনবার আবৃত্তি ক'রে মাগধীর তিনটি পদ তিন লয়ে গান করা হ'ত।[১১৩] এক পদের সঙ্গে অন্য পদেরও যোগ করা হ'ত। শার্ঙ্গদেব স্বররূপের সঙ্গে মাগধীর নিদর্শন দিয়েছেন,—

	মা	গা	মা	ধা
(১)	দে	০	বং	০
	ধনি	ধনি	সনি	ধা
(২)	দে০	বং০	রু০	দ্রং
	রিগ	রিগ	মগ	রিসা।
(৩)	দেবং	রুদ্রং	ব	ন্দে০

এই ধরণের গানের রীতি ছিল। (১) 'দেবং' পদ বিলম্বিত লয়ে গান ক'রে (২) 'দেব' পদের সঙ্গে 'রুদ্র' পদ যুক্ত ক'রে 'দেবং রুদ্রং' একসঙ্গে মধ্যলয়ে গান করা হ'ত। পরে (৩) তৃতীয় কলায় 'দেবং রুদ্রং' পদ-দু'টিকে 'বন্দে' এই পদান্তরের (অন্যপদ) সঙ্গে যুক্ত ক'রে 'দেবং রুদ্রং বন্দে' একসঙ্গে দ্রুত লয়ে গান করা হ'ত। এ'থেকে বোঝা যায় তিনটি পদে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন লয়ের ব্যবহার হ'ত।

১১৩। (ক) শার্ঙ্গদেব বলেছেন (সঙ্গীত-রত্নাকর ১।৮।১৬–১৭),

গীত্বা কলায়ামাদ্যায়াং বিলম্বিতলয়ং পদম্।
দ্বিতীয়ায়াং মধ্যলয়ং তৎপদান্তরসংযুতম্।
সতৃতীয়পদে তে চ তৃতীয়স্যাং দ্রুতে লয়ে।
ইতি ত্রিরাবৃত্তপদাং মাগধীং জগদুর্বুধাঃ।

(খ) সিংহভূপাল টীকায় উল্লেখ করেছেন: "আদ্যায়াং কলায়াং বিলম্বিতলয়েন পদং গায়েৎ। দ্বিতীয়কলায়াং তদেব পদং পদান্তরেণ সংযুতং মধ্যলয়েন গায়েৎ। তৃতীয়স্যাং তু কালায়াং তে দ্বে পদে তৃতীয়পদসহিতে দ্রুতলয়েন গায়েৎ। এবং ত্রিরাবৃত্তপদাং ত্রিকলাং মাগধীং * *।"

আচার্য অভিনবগুপ্ত রঘুনাথের প্রমাণবাক্য উদ্ধৃত ক'রে চারটি গীতির পরিচয় ও স্বররূপ দিয়েছেন।[১১৪] তাতে দেখা যায় রঘুনাথ বলেছেন : "ইতি ত্রিরাবৃত্তপদাং বদন্তি তাং মাগধীং মাগধরাজহৃদ্যাম্"। মনে হয় এই মাগধী বা অর্ধমাগধী গীতি মগধরাজের বিশেষ প্রিয় ছিল। অভিনবগুপ্তও মাগধীর স্বর-রূপের পরিচয় দিয়েছেন, তবে তা শার্ঙ্গদেব থেকে একটু ভিন্ন। যেমন,

গা মা ধা	ধনি ধনি সনিসা	রি গরি গমা গা রি সা
ব ন্দে —	দেবং০ রুদ্রং০ রুদ্রং০০	দেবং ০০০ রুদ্রং ০০০ বন্দে০০০

পুনরায় অর্ধমাগধীর পরিচয় দিয়ে শার্ঙ্গদেব উল্লেখ করেছেন,

মা	রী	গা	সা	সা	সা	ধা	নী	পা	ধা	পা	মা
দে	০	বং	০	বং	রু	দ্রং	০	দ্রং	ব	ন্দে	০

এ'টিকে তিনবার আবৃত্তি করলে হয়,

মা	মা	মা	মা	ধা	সা	ধা	নী	পা	নিধা	মা	মা
দে	০	বং	০	দে	বং	রু	দ্রং	রু	দ্রং	ব	ন্দে

প্রথম পদ একবার গান ক'রে শেষ পদ দু'বার গান করার নিয়ম ছিল। তিনটি কলায় বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত লয়ের ব্যবহার হ'ত। অভিনবগুপ্তও অর্ধমাগধীর নিদর্শন দিয়েছেন। যেমন,

মারীগাসা—	সা	সা	ধা	নী	পা	ধা	মা	মা
দেবং ০০০—১	বং	রুদ্রং	—	২	দ্রং	বন্দে	—	৩

পুনরায় শার্ঙ্গদেব সম্ভাবিতার নিদর্শন দিয়েছেন,

ধা	মা	মা	রি	গা	রী	গা	সা	সা
ভ	০	ক্ত্যা	০	০	দে	০	বং	০
নী	ধা	সা	নী	ধা	নী	মা	মা	
রু	০	দ্রং	০	ব	০	ন্দে	০	

সম্ভাবিতার পদসংখ্যা কম, কিন্তু তাতে গুরু বা যুক্ত অক্ষরের ব্যবহার ছিল। প্রথম কলায় 'ভক্ত্যা, দেবং, রুদ্রং, বন্দে' এই কয়টি শব্দ গান করা হ'ত। দ্বিতীয় কলায় মধ্যপদ দু'টি দু'বার গান করার রীতি ছিল, যেমন 'দেবং দেবং, রুদ্রং রুদ্রং'। তৃতীয় কলায় প্রথম কলার অনুবর্তন ছিল, অর্থাৎ 'ভক্ত্যা, দেবং, রুদ্রং, বন্দে' এই চারটি পদ (শব্দ) আবার গান করা হ'ত।

পরিশেষে শার্ঙ্গদেব পৃথুলার নিদর্শন দিয়েছেন,

মা গা রী গা	সা ধনি ধা ধা	ধা সা ধা নী	পা নিধপ মা মা
স্থ র ন ত	হ র০ প দ	যু গ লং ০	প্র ণ ০ ০ ম ত

১১৪। নাট্যশাস্ত্র (বরোদা সংস্করণ) ১ম ভাগ (১৯২৬), পৃঃ ২৫৫-২৫৭

গানে অনেকগুলি লঘু অক্ষরের ব্যবহার হ'ত ব'লে পৃথুলাগীতি বলা হ'ত। পৃথুলার প্রথম কলায় চারটি পদ, দ্বিতীয় কলায় মধ্যপদের দু'বার আবৃত্তি ও তৃতীয় কলায় প্রথমবারের মতো পদের সমাবেশ ও গান হ'ত। অভিনবগুপ্ত পৃথুলার স্বররূপ দিয়েছেন শার্ঙ্গদেব থেকে কিছুটা ভিন্ন—

মা গা রি গা } মা ধা নি ধা ধা } { সা সা ধা নী { পা নি ধপ মা মা
স্ম র ন ত } হ র প দ ০ } { যু গ লং ০ { প্র ণ ম ০ ত ০

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে কলা, বৃত্তি বা লয়ভেদে গীতিরূপের পরিবর্তন হ'ত। অভিনবগুপ্ত উল্লেখ করেছেন চিত্রাকলার পরিবর্তে বার্তিক বা বৃত্তকলায় গান করলে সম্ভাবিতা মাগধী নামে ও বার্তিক বা বৃত্তকলার পরিবর্তে দক্ষিণাকলায় গান করলে পৃথুলা সম্ভাবিতা নামে পরিচিত হ'ত। লয়ভেদই গীতিরূপের পরিবর্তনের কারণ ছিল।[১১৫] অভিনবগুপ্ত বলেছেন এ' চারটি গীতি শুধু পূর্বরঙ্গে বা রঙ্গপীঠের বহির্গীত হিসাবে নয়, অভিনয়ের বিভিন্ন অংশেও ব্যবহৃত হ'ত: "চতস্রোঽপি গীতয়ঃ ন কেবলং পূর্বরঙ্গে প্রযোজ্যাঃ, অপি তু নাট্যেঽপি। তদুক্তং মুনিনা—'গানযোগে চতস্রস্তু যোজ্যাঃ সর্বত্র গায়নৈঃ' (৩১ অ°)"। মুনি ভরত নাট্যশাস্ত্রের[১১৬] ৫ম অধ্যায় ১২৪-২২৩ এবং ৩১শ অধ্যায়ে ৪৪৮-৪৯৭ শ্লোকগুলিতে[১১৭] চারটি গীতির বিশদ বিবরণ এবং তাদের অক্ষর, কলা বা বৃত্ত, লয়, তাল ও পদ-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।[১১৮]

এর পর ভরত ২৯শ অধ্যায়ে বীণায় রক্তি বা রঞ্জণাশক্তি সৃষ্টির উপযোগী বিস্তার, করণ, আবিদ্ধো ও ব্যঞ্জন এ' চারটি ধাতুর বিবরণ দিয়েছেন।[১১৯] ধাতু

১১৫। 'যদা চিত্রমার্গে বার্তিকমার্গাশ্রিতা সংভাবিতা ভবেত্তদা সা মাগধীতুচ্যতে লয়স্য ভিন্নত্বাৎ, তথা বার্তিকমার্গে দক্ষিণমার্গাশ্রিতা পৃথুলাচেত্তদা সা সংভাবিতেত্যুচ্যতে।'—অভিনবগুপ্ত

১১৬। নাট্যশাস্ত্র (বরোদা সংস্করণ) ১ম ভাগ, পৃ° ২৫৫-২৬১

১১৭। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সংস্করণ), পৃ° ৩৭৬

১১৮। বহ্বক্ষরা চ বিপুলা মাগধী চার্ধমাগধী।

* * * *

ত্রিলয়া পৃথুলাখ্যা চ সুকুমারবিধৌ স্মৃতা॥

ত্রিলয়া ত্রিযতিশ্চৈব ত্রিপ্রকারাক্ষরান্বিতা।

একবিংশতিতালা চ মাগধী সম্প্রকীর্তিতা॥—প্রভৃতি

—নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ৪৪৮-৪৫৫

১১৯। বিস্তারঃ করণশ্চৈব আবিদ্ধো ব্যঞ্জনস্তথা।

চত্বারো ধাতবো জ্ঞেয়া বাদিত্রকরণাশ্রয়াঃ॥

—নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ২৯।৮১

অর্থে এখানে মেলাপক বা স্থায়ি প্রভৃতি গানের অংশ বা বিভাগ নয়, বীণার তন্ত্রীতে অঙ্গুলি বা কোণ দ্বারা আঘাতজ যে স্বর বা শব্দ তারি নাম 'ধাতু' : "যে প্রহারবিশেষেণ উত্থাঃ উদিতাঃ স্বরাঃ তে ধাতবঃ"। বিস্তারধাতু আবার বিস্তারজ, সংঘাতজ, সমবায়জ ও অনুবন্ধজ ভেদে চার রকম।[১২০] সংঘাতজ পুনরায় দ্বিরুত্তরাদি ভেদে চার রকম ও সমবায়জ ত্রিরুত্তরাদি ভেদে আট রকম। এভাবে দেখা যায় বিস্তারধাতু চৌদ্দ, করণধাতু রিভিতাদি ভেদে পাঁচ, আবিদ্ধধাতু ক্ষেপাদি ভেদে পাঁচ ও ব্যঞ্জনধাতু পুষ্পাদি ভেদে দশ—মোট চৌত্রিশ (চতুস্ত্রিংশৎ) শ্রেণীতে বিভক্ত।[১২১] ধাতুযুক্ত বীণাবাদ্য ধ্রুবাগানকে মাধুর্যমণ্ডিত করত। বিশেষ ক'রে ধ্রুবাগানে চিত্রা ও বিপঞ্চী দু'টি বীণার সহযোগ থাকত। পুষ্করাদি চর্মবাদ্য ও বেণু প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের সমাবেশও জাতিগানে এবং ধ্রুবাগানে থাকত। চিত্রা ও বিপঞ্চী ছাড়াও ভরত নাট্যশাস্ত্রের ৩৩শ অধ্যায়ে (কাশী সং) দারবী, কচ্ছপী, ঘোষকা প্রভৃতি বীণার নামের উল্লেখ করেছেন। সমবেতবাদ্যে এ'সকল বীণার ব্যবহার হ'ত। তদানীন্তন সমবেত-বাদ্য এখনকার অনেকটা কনসার্টের মতো ছিল। ধ্রুবাগানে বেশীর ভাগ চিত্রা ও বিপঞ্চীর (বীণা) ব্যবহার হ'ত। চিত্রা ছিল সাতটি তন্ত্রীযুক্ত বীণা—এখনকার সেতারের অনুরূপ, আর বিপঞ্চী ছিল ন'টি তন্ত্রীবিশিষ্ট বীণা। চিত্রা বাজানো হ'ত অঙ্গুলির সাহায্যে ও বিপঞ্চী কোণ (plectrum) দিয়ে।[১২২]

১২০। সংঘাতজশ্চ সমবায়জশ্চ বিস্তারজোঽনুবন্ধশ্চ।
জ্ঞেয়শ্চতুঃপ্রকারো ধাতুর্বিস্তারসংজ্ঞস্তু॥

—নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ২৯।৮২

১২১। (ক) সংঘাতসমবায়ৌ তৌ বিজ্ঞেয়ৌ দ্বিকত্রিকৌ॥
পূর্বশ্চতুর্বিধস্তত্র পশ্চিমোঽষ্টবিধঃ স্মৃতঃ।

* * * *

ইতি দশবিধঃ প্রযোজ্যো বীণায়াং ব্যঞ্জনো ধাতুঃ॥
পঞ্চবিধো বিজ্ঞেয়ো বীণাবাদ্যো করণধাতুঃ।—প্রভৃতি

—নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ২৯।৮৩-৯৯

(খ) সঙ্গীত-রত্নাকরে, বাদ্যাধ্যায়ে ৬।১২৪-১৬৪ শ্লোকগুলিতে এ'সকল ধাতুর বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া আছে।

১২২। সপ্ততন্ত্রী ভবেচ্চিত্রা বিপঞ্চী নবতন্ত্রিকা।
বিপঞ্চী কোণবাদ্যা স্যাৎ চিত্রা চাঙ্গুলিবাদনা॥

—নাট্যশাস্ত্র ২৯।১১৪

নাট্যশাস্ত্রে নিবদ্ধ ধ্রুবাগানের আলোচনা ও বিষয়বস্তু বড় কম নয়। ভরত নাট্যশাস্ত্রের (কাশী সং) ৩২শ অধ্যায়ে ৪৮৩টি (কাব্যমালা-সংস্করণে ৪৪২টি) শ্লোকে ধ্রুবার বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন।

ধ্রুবার সংজ্ঞা নির্ণয়-প্রসঙ্গে ভরত উল্লেখ করেছেন,

ধ্রুবাসংজ্ঞানি তানি স্যুর্নারদপ্রমুখৈর্দ্বিজৈঃ।
গীতাঙ্গানীহ সর্বানি বিনিযুক্তান্যনেকশঃ॥
যা ঋচঃ পাণিকা গাথা সপ্তরূপাঙ্গমেব চ।
সপ্তরূপপ্রমাণং চ তদ্ধ্রুবেত্যভিসংজ্ঞিতম্॥[১২৩]

ছন্দক, আসারিত, বর্ধমানক, ঋক্, পাণিকা, গাথা ও সাম এ'সাতটি বৈদিকোত্তর নিবদ্ধগানের কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। এই সাতটি গান বা গীতি বৈদিকোত্তর হ'লেও বৈদিক গানের উপাদানেই সৃষ্ট। এ'গুলি ধ্রুবার অঙ্গ। ভরত উল্লেখ করেছেন নাট্যে ব্যবহারের জন্য বিবিধ ছন্দে, বৃত্তে, রসে ও ভাবে অনুবিদ্ধ ঋকাদি অঙ্গগুলির (গীতির) অনুশীলন করা হ'ত। ঋকাদি গীতিগুলি 'প্রমাণ' নামেও অভিহিত হ'ত: "সপ্তরূপপ্রমাণং চ"। মুখ, প্রতিমুখ, বৈহায়সিক বা বৈহায়স, স্থিরপ্রবৃত্তি, বজ্র, সন্ধি, সংহরণ, প্রস্তার, উপবর্ত বা উপবর্তন, মাষঘাত, চতুরস্র, অবপাত, প্রবেশ্য বা প্রাবেশিকী, শীর্ষক, সংবিষ্টতা, অন্তাহরণ, মহাজনিক প্রভৃতি ধ্রুবার কাব্যরূপকে গড়ে তোলে। ওবেণকগীতির পরিচয় দিতে গিয়ে শার্ঙ্গদেব তার যে বারোটি অঙ্গের নামোল্লেখ করেছেন তাদের বেশীর ভাগই ধ্রুবার কাব্যাঙ্গ বা কাব্য-উপাদানের সঙ্গে মেলে। শার্ঙ্গদেব উল্লেখ করেছেন,

ওবেণকং দ্বাদশাঙ্গং সপ্তাঙ্গং চ পরাবরম্।
স্যাৎ পাদঃ প্রতিপাদশ্চ মাষঘাতোপবর্তনম্॥
সন্ধিশ্চ চতুরস্রং স্যাদ্বজ্রং সংপিষ্টকং ততঃ।
বেণী তথা প্রবেণী স্যাদুপপাতস্ততঃ পরম্॥
অন্তাহরণমিত্যেতান্যঙ্গানি দ্বাদশাবদন্।[১২৪]

শার্ঙ্গদেব ও কল্লিনাথ এই অঙ্গগুলির পরিচয় দিয়েছেন। 'মুখ' অর্থে নাটকের প্রস্তাবনা। সুতরাং নাটক আরম্ভ হবার আগে মুখাঙ্গগীতি গান করার নিয়ম ছিল। পাঁচটি সন্ধির ভেতর 'মুখ' অন্যতম। ভরত নাট্যের মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্শ ও নির্গ্রহণ এই পাঁচটি ভাগ কল্পনা ক'রে বলেছেন মুখে মধ্যমগ্রামরাগ, প্রতিমুখে

১২৩। নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা সংস্করণ) ৩২।১-২

১২৪। সঙ্গীত-রত্নাকর (তালাধ্যায়) ৫।১৪৩-১৪৫

ষড়্জগ্রামরাগ, গর্ভে সাধারিতগ্রামরাগ, বিমর্শে পঞ্চমগ্রামরাগ ও নির্গ্রহণে কৈশিকগ্রামরাগ-গীতিগুলি গান করার নিয়ম ছিল।[১২৫] এই গ্রামরাগ-গীতিগুলির পরিচয় আমরা নারদীশিক্ষায় পাই। নাট্যপ্রয়োগে গ্রামরাগগুলিও ধ্রুবাগীতির সমপর্যায়ভুক্ত ছিল। আর সেই রকম ছিল মাগধী প্রভৃতি চারিটি নিবদ্ধ গীতিগুলিও। ধ্রুবার কাব্য-উপাদানগুলির ভেতর বারোটি কলাযুক্ত নিবদ্ধগানের নাম 'বৈহায়সিক' বা বৈহায়স। দ্বিকলোত্তর তালকে 'মাষঘাত' বলে।

ভরত উল্লেখ করেছেন পরিগীতিকা, মদ্রক, চতুষ্পদা প্রভৃতি বস্তু এবং বাক্য, বর্ণ, অলংকার, যতি, পাণি, লয় প্রভৃতি ধ্রুবার কলেবরকে পরিপুষ্ট করে। ধ্রুবা বা ধ্রুবাগান উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিনভাগে বিভক্ত। ভরত উল্লেখ করেছেন এই তিন শ্রেণীর ধ্রুবাই লোকের পাপ-কালিমা দূর ক'রে পুণ্য বা মোক্ষের পথে নিয়ে যায়ঃ "তথা পাপগ্রহাচৈব ত্রিবিধা তু ধ্রুবা স্মৃতা"। বিচিত্র বৃত্ত থেকে সৃষ্ট ধ্রুবা প্রাবেশিকী, আক্ষেপিকী, প্রাসাদিকী, অন্তরা ও নৈষ্ক্রামিকী এই পাঁচ শ্রেণীতে বা রূপে বিকশিতঃ "ধ্রুবাশ্চ পঞ্চ বিজ্ঞেয়া নানাবৃত্তসমুদ্ভবাঃ"। জাতি, স্থান, প্রমাণ, প্রকার ও নাম এই পাঁচটিকে ধ্রুবার হেতু বা কারণ-রূপে কল্পনা করা হয়েছেঃ "বিকল্পান্ পঞ্চহেতুকান্, জাতিস্থানং প্রমাণঞ্চ প্রকারো নাম চৈব হি"। অবশ্য নাট্যবিদ্‌রাই এই পাঁচটি কারণ কল্পনা করেছেন। বৃত্ত, অক্ষর ও প্রমাণকে 'জাতি' বলে। সুতরাং 'জাতি'-শব্দে আমরা জাতিগান বা জাতিরাগগান, ওড়বাদি, বৃত্ত ও অক্ষরাদির সমবায় এতগুলি অর্থ পাই। সম, অর্ধ ও বিষমকে 'প্রকার' বলে। প্রমাণ দু'টি—ষট্‌কলা ও অষ্টকলা। মানুষের কুলাচারবিহিত অভিধানকে 'নাম' বলে ও আশ্রয়ের নাম 'স্থান'।[১২৬] স্থান পরস্থ ও আত্মস্থ-ভেদে দু'রকম। চতুঃষষ্টিটি (৬৪টি) ধ্রুবা 'সমধ্রুবা' ও 'বিষমধ্রুবা'

১২৫। মুখে তু মধ্যমগ্রামঃ ষড়্জঃ প্রতিমুখে ভবেৎ।
সাধারিতং তথা গর্ভে বিমর্শে চৈব পঞ্চমম্॥
কৈশিকং চ তথা কার্যং গাননির্গ্রহণে বুধৈঃ।
—নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা) ৩২।৪৩৪-৩৫

১২৬। বৃত্তাক্ষরপ্রমাণং হি জাতিরিত্যভিসংজ্ঞিতাঃ॥
সমার্ধবিষমাণাঞ্চ প্রকারঃ পরিকীর্তিতঃ।
ষট্‌কলাষ্টকলে চৈব প্রমাণং দ্বিবিধে স্মৃতে॥
যথাহেতুকুলাচারৈর্নৃণাং নাম বিধীয়তে।
এবং স্থানাশ্রয়োপেতং ধ্রুবাণামপি ইষ্যতে॥
—নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ৩২।৩৩১-৩৩৩

ভেদে দু'রকম। সমান বৃত্তযুক্ত হ'লে 'সমধ্রুবা' ও অসমান বা বিষম বৃত্তযুক্ত হ'লে 'বিষমধ্রুবা' নামে পরিচিত। অর্থাৎ বৃত্তের সমতা ও অসমতাই ধ্রুবার দু'টি রূপকে সৃষ্টি করে। যুগ্মা, ঔজা ও মিশ্রা-ভেদে সমধ্রুবা আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রাবেশিকী-ধ্রুবাদির পরিচয় আমরা পূর্বেও দিয়েছি। নাটকের প্রথমে বা প্রস্তাবনায় বিচিত্র রস ও ভাবের ব্যঞ্জনা দিয়ে যে ধ্রুবা গান করা হ'ত তার নাম ছিল 'প্রাবেশিকা'। নাটকের কোন অঙ্কের শেষে নিষ্ক্রান্ত (বার) হবার উদ্দেশ্যে যে ধ্রুবা গান করা হ'ত তার নাম ছিল 'নৈষ্ক্রামিকী'। নৃত্যকালে যথারীতি ক্রম ভঙ্গ (উল্লঙ্ঘন) ক'রে দ্রুত লয়ে যে ধ্রুবা গান করার রীতি ছিল তাকে বলা হ'ত 'আক্ষেপিকী'। নির্দিষ্ট রসের পরিবর্তে ভিন্ন রসের অবতারণা ক'রে সেই বিজাতীয় রসের মধ্যে আবার সাম্য সৃষ্টির জন্য যে ধ্রুবা গান করা হ'ত তাকে বলা হ'ত 'প্রাসাদিকী'। বিষণ্নতা, বিস্মৃতি, ক্রোধ, সুপ্তি, মত্ততা, সঙ্গতা, গুরুভারে অবসন্নতা, মূর্ছা, পতন, দোষ-প্রচ্ছাদন (দোষ ঢাকা) প্রভৃতি ব্যাপারে যে গান করা হ'ত তার নাম ছিল 'অন্তরা'।[১২৭] ভরত পুনঃপুনঃ বলেছেন এ'সমস্ত গানই রস ও ভাবে অনুবিদ্ধ ক'রে গাওয়া হ'ত: "ধ্রুবাণাং চৈবং সর্বাসাং রসভাবসমন্বিতম্"।

১২৭। নানারসার্থযোগং নৃণাং যো গীয়তে প্রবেশেষু।
প্রাবেশিকী তু নাম্না বিজ্ঞেয়া সা ধ্রুবা তজ্জ্ঞৈঃ।
অঙ্কান্তে নিষ্ক্রান্তে যা তু ভবেৎ প্রস্তুতস্তুতিযোগে।
নিষ্ক্রামোপগতগুণা বিদ্যান্নৈষ্ক্রামিকীং তাং তু॥
ক্রমমুল্লঙ্ঘ্য বিধিজ্ঞৈঃ ক্রিয়ন্তে যা দ্রুতলয়েন নাট্যবিধৌ।
আক্ষেপিকী ধ্রুবাসৌ দ্রুতা স্থিতা বাপি বিজ্ঞেয়া॥
যা চ রসান্তরমুপগতমাক্ষেপবশাৎ প্রসাদয়তি।
রঙ্গরাগপ্রসাদজননী জ্ঞেয়া প্রাসাদিকী সা তু॥
বিষণ্ণে বিস্মৃতে ক্রুদ্ধে সুপ্তে মত্তেঽথ সঙ্গতে।
গুরুভারাবসন্নে চ মূর্ছিতে পতিতে তথা॥
দোষপ্রচ্ছাদনে যা চ গীয়তে সান্তরা ধ্রুবা।

—নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ৩২।৩৩৫-৩৪০

কাব্যমালা-সংস্করণ নাট্যশাস্ত্রে পাঠভেদ আছে। বিশেষ ক'রে অন্তরা-গীতিটির বেলায় পাঠভেদ যেমন,

বিবসংমূর্ছিতে ভ্রান্তে বস্ত্রাভরণসংযমে।
দোষপ্রচ্ছাদনে যা চ গীয়তে সান্তরাচ্ছদা॥ ৩২।৩১৮-৩২২

পুনরায় বলা হয়েছে শীর্ষকা, উদ্ধতা, অনুবন্ধা, বিলম্বিতা, অড্ডিতা ও অপকৃষ্টা ভেদে ধ্রুবাগান ছয় শ্রেণীর।[১২৮] ভরত তাদের আভিধানিক অর্থও দিয়েছেন।[১২৯] দৈবী ও মানুষী—অপার্থিব ও পার্থিব এই প্রধান দু'টি ফললাভের উদ্দেশ্যেই এ'সকল ধ্রুবার উপযোগিতা ছিল। তিনি উল্লেখ করেছেন : "প্রয়োগশ্চৈব বিজ্ঞেয়ো দিব্যমানুষসংশ্রয়ঃ"। উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে ধ্রুবার তিন রকম প্রকৃতিরও তিনি পরিচয় দিয়েছেন : "উত্তমাধমমধ্যা তু ত্রিবিধা প্রকৃতিঃ স্মৃতা"। তাছাড়া রাত্র ও দিনের বিভিন্ন সময়ে নির্দিষ্ট ধ্রুবাগানের রীতির কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন,

প্রাবেশিক্যাশ্রয়ো যে চ পূর্বাহ্ণে চৈব তে স্মৃতাঃ।
নক্তন্দিবসমুত্থাস্তু নৈষ্ক্রামিক্যাশ্চ কালজাঃ॥
সাম্যাঃ পূর্বাহ্ণকালে তু মধ্যাহ্নে দীপ্তসংশ্রয়াঃ।
অপরাহ্নে তথা মধ্যাঃ সন্ধ্যায়াং করুণাশ্রয়াঃ॥

অবশ্য রসের সঙ্গেই ধ্রুবাগুলির প্রকৃতিকে সম্পর্কিত ক'রে দিনরাত্রি বিভিন্ন সময়ে গান করা হ'ত।

অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধভেদে ধ্রুবার পদ ছিল দু'রকম ও তারা সতাল ও অতাল-ভেদেও আবার দু'রকম শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। নিবদ্ধ ধ্রুবায় বিচিত্র তাল, ছন্দ, যতি, পাদ ও সমনিয়ত অক্ষরের সমাবেশ থাকত ও অনিবদ্ধ ধ্রুবায় সেগুলি থাকলেও তালের বন্ধন থেকে তা মুক্ত ছিল। অর্থাৎ নিবদ্ধ ধ্রুবা ছিল তাল ও ছন্দযুক্ত গান, আর অনিবদ্ধ ধ্রুবা ছিল আলাপ বা আলপ্তি-শ্রেণীভুক্ত। কাজেই ভরত আলাপের কথা স্পষ্টভাবে নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখ না করলেও তার প্রচলন যে অনিবদ্ধ গানের পর্যায়ে অব্যাহত ছিল তা একদিক দিয়ে তিনি স্বীকার করেছেন।

১২৮। শীর্ষকোদ্ধতা চৈব অনুবন্ধো বিলম্বিতা।
আড্‌ডিতা চাপকৃষ্টা চ ষট্‌প্রকারা ধ্রুবা স্মৃতাঃ॥
—নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ৩২।৩৫৩

১২৯। শিরঃস্থা নীয়তে তদ্ধি যস্মাত্তদ্ধি চ শীর্ষকম্।
উদ্ধতা রুদ্ধতা যস্মাৎ তস্মাদ্‌গেয়া ধ্রুবা বুধৈঃ॥
* * *
অড্ডিতা তুৎকটগুণা শৃঙ্গাররসসম্ভবা।
যস্মাত্তস্মাৎ প্রসন্না চ তস্মাদেবাড্‌ডিতা স্মৃতা॥ —প্রভৃতি
—নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ৩২।২৫৪-২৬০

সুতরাং ছন্দ, বৃত্ত ও জাতিভেদে ধ্রুবা বিচিত্র রূপে প্রকাশিত ছিল। পদ বা সাহিত্যগুলি বেশীর ভাগ শঙ্করস্তুতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকত। বিভিন্ন ধ্রুবার নামও বিচিত্র রকমের ছিল। যেমন তটি, ধৃতি, রজনী, ভ্রমরী, অম্মা, বিদ্যুৎভ্রান্তা, ভুজগতন্বী, কমলমুখী, শিখা, ঘনপঙ্‌ক্তি, মালিনী, বিমলা, জলা, রম্যা, ভীমা, নলিনী, নীলতোয়া, কামিনী, ভ্রমরমালা, ভোগবতী, মধুকরিকা, সমুদ্রা প্রভৃতি। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় ধ্রুবার পদগুলি রচিত হ'ত।[১৩০]

ধ্রুবাগানের ভাষা সম্বন্ধেও ভরত উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন ধ্রুবায় শূরসেনী ভাষা প্রয়োগ করা হ'ত, কিন্তু তাতে মাগধীর প্রচলন বিশেষ সুখকর হ'ত না। দিব্যভাষা হিসাবে সংস্কৃতের সমাদর যথেষ্ট ছিল, অর্ধসংস্কৃত ছিল মানুষের পক্ষে উপযোগী।[১৩১] ছন্দ ও প্রমাণযুক্ত গানকেই 'দিব্য' বলে। স্তুতিমূলক গানের (ধ্রুবা) নাম ছিল 'সংকীর্তন'। এখানে উল্লেখযোগ্য যে 'সংকীর্তন' তথা শৌর্য-বীর্য-গুণগাথা-রূপ স্তুতিমূলক সঙ্গীতের প্রচলন খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতেও ছিল, এ'টি কেবল মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব-সাধক পদকর্তাদেরই সৃষ্ট বা উদ্ভাবিত নয়। বিজয়, আশীর্বাদ প্রভৃতি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ও দেবতার আরাধনায় ঋক্, গাথা, পাণিকা প্রভৃতি সাতটি 'অঙ্গগীতি' গান করার রীতি ছিল। ষড়্জ, গান্ধার, মধ্যম ও পঞ্চমাদি স্বরযুক্ত জাতিগানগুলি দেবতাদের উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হ'ত।[১৩২]

১৩০। উদাহরণ যেমন,

(ক) শঙ্করঃ শূলভৃৎ, পাতু মাং লোককৃৎ॥ (—সংস্কৃত)

(খ) সংঅন্তত্তো অঙ্গঅস্মি
বাই বাও পুপ্পবাহী। (—প্রাকৃত)

(গ) এ এ গজ্জন্তা তোওং মুচ্চন্তা
লোঅং ছাঅন্তা মেহা সংপত্তা।—প্রভৃতি

১৩১। ভাষা তু শূরসেনী স্যাৎ ধ্রুবাণাং সম্প্রয়োজয়েৎ॥
ন ভাষাঞ্চৈব মাগধ্যাৎ কর্তব্যং নৎকুটং বুধৈঃ।
দিব্যানাং সংস্কৃতাঙ্গানাং প্রমাণৈস্তু বিধীয়তে॥
অর্ধসংস্কৃতমেবং তু মানুষাণাং প্রয়োজয়েৎ।

—নাট্যশাস্ত্র ৩২।৪০৮-৪১০

১৩২। যদ্বেষাং সাত্ত্বিকে ভাবঃ কর্ম সঙ্কীর্তনং চ যৎ।
তৎকার্যং গানযোগে তু প্রমাণং বিধিসংশ্রয়ম্॥
* * * *
ছন্দঃপ্রমাণসংযুক্তং দিব্যানাং গানমিষ্যতে।
স্তুত্যাশ্রয়েণ তৎকার্যং কর্ম সঙ্কীর্তনাদপি॥

ধ্রুবাগানের আন্তর প্রকৃতি বা লক্ষণের পরিচয় দিয়ে ভরত উল্লেখ করেছেন,

পূর্ণস্বরং তত্র বিলম্বিবর্ণং, ত্রিস্থানশোভং ত্রিতয়ং ত্রিমাত্রম্।
রক্তং সমং শ্লক্ষ্মমলংকৃতং চ, সুখপ্রযুক্তং মধুরঞ্চ গানম্॥
গীতে প্রযত্নঃ প্রথমং তু কার্যঃ, শয্যা হি নাট্যস্য বদন্তি গীতম্।
গীতে চ বাদ্যে চ হি সংপ্রযুক্তো, নাট্যপ্রয়োগো ন বিপত্তিমেতি॥

ধ্রুবগানে পূর্ণস্বর, বিলম্বিত বর্ণ, মন্ত্রাদি তিন স্থান ও বিলম্বিতাদি তিন মাত্রার বিকাশ থাকে। গান আনন্দের উদ্বোধক ও মধুর হয়। ধ্রুবা রক্ত, সম, শ্লক্ষ্ণ প্রভৃতি গুণে অলঙ্কৃত। নাট্য বা অভিনয়ের জন্যই ধ্রুবগান অভিপ্রেত। 'সম' বল্‌তে লয়ের সঙ্গে আরোহ অবরোহাদি চার বর্ণ লয়ের সঙ্গে সঙ্গত। 'রক্ত' বলতে বীণা, বেণু ও কণ্ঠস্বর তথা গানের একীকরণ ও তিনটির সম্মিলিত আনন্দদায়ক ও প্রীতিকর ধ্বনি। 'শ্লক্ষ্ণ' অর্থে মন্দ্র বা তার (উচ্চ) স্বরগুলি দ্রুত মধ্যাদি লয়ের মধ্যে প্রকাশিত হ'লেও সুস্পষ্টতা ও সাবলীলতার উদ্বোধক। 'মধুরং' শব্দে মাধুর্য বা লাবণ্য এবং এই লাবণ্য রাগত্ব-প্রকৃতির পরিচায়ক। মোটকথা ধ্রুবগানগুলি শ্রুতিরঞ্জক ও মনোহরণকারী স্বরের তথা রাগের মাধ্যম ও পরিবেশক ছিল। এ'ছাড়া ধ্রুবাগানে গান্ধর্ব[১৩৩] জাতিরাগগুলির প্রয়োগ করা হ'ত। যেমন শার্ঙ্গদেব গান্ধারীজাতির (জাতিরাগ) প্রকৃতি বা লক্ষণের পরিচয় দিয়ে বলেছেন: "বিনিয়োগো ধ্রুবাগানে তৃতীয়প্রেক্ষণে ভবেৎ"। মধ্যমাজাতির বেলায় বলেছেন: "বিনিয়োগো ধ্রুবাগানে দ্বিতীয়প্রেক্ষণে ভবেৎ"। ষড়্‌জকৈশিকীজাতির লক্ষণের পরিচয়ে তিনি বলেছেন: "প্রাবেশিক্যাং ধ্রুবায়াং"; ষড়্‌জোদীচ্যবার বেলায়: "দ্বিতীয়ে প্রেক্ষণে গানে ধ্রুবায়াং বিনিযোজনম্", গান্ধারোদীচ্যবার প্রসঙ্গে: "বিনিয়োগো ধ্রুবগানে", রক্তগান্ধারীর বেলায়: "ধ্রুবায়াং বিনিযোজনম্" প্রভৃতি। এভাবে কৈশিকী, মধ্যমোদীচ্যবা, কার্মারবী, গান্ধারপঞ্চমী, আন্ধ্রী, নন্দয়ন্তী প্রভৃতি জাতিরাগের বেলায়ও ধ্রুবাগানে তাদের প্রয়োগের কথা শার্ঙ্গদেব উল্লেখ করেছেন।[১৩৪]

* * * *

জয়াশীর্বাদযুক্তানি কার্যাণ্যেতানি দৈবতে।
ঋগ্‌গাথাপাণিকা হ্যেষাং বোদ্ধব্যাস্তু প্রমাণতঃ।
বিশ্রাব্যশ্চৈব যস্মাত্তু তস্মাদ্‌গীতেষু যোজয়েৎ।

১৩৩। কল্লিনাথ উল্লেখ করেছেন: "ষাড়্‌জ্যাদিজাতয়ো গ্রামরাগাদয়শ্চ ষড়্‌বিধা রাগা গান্ধর্বশব্দেনোচ্যন্তে।"

১৩৪। সঙ্গীত-রত্নাকর, ১ম ভাগ (আডেয়ার সংস্করণ), পৃঃ ১৯৯-২৩৪ দ্রষ্টব্য।

শার্ঙ্গদেব জাতিরাগগুলি স্বররূপ তথা স্বরলিপিরও আভাস দিয়েছেন। যেমন ষাড়্জীর পরিচয় দিয়েছেন: ষড়্জস্বর ন্যাস এবং অংশ। গান্ধার ও পঞ্চম অপন্যাস। স্বররূপ যেমন,

II	সা	সা	সা	সা	পা	নিধ	পা	ধনি	
	তং	০	ভ	ব	ল	লা০	০	ট০	
	রী	গম	গা	গা	সা	রিগ	ধস	ধা	
	ন	য়০	নাং	০	বু	জা০	০০	ধি	
	রিগ	সা	রী	গা	সা	সা	সা	সা	
	কং	০	০	০	০	০	০	০	
				।			।	।	
	ধা	ধা	নী	নিস	নিধ	পা	সা	সা	
	ন	গ	সু	০০	নু০	প্র	ণ	য়	
	নী	ধা	পা	ধনি	রী	গা	সা	গা	
	কে	লি	০	০০	স	মু	০	দ্ভ	
		০	০ ০						
	সা	ধা	ধনি	পা	সা	সা	সা	সা	
	বং	০	০০	০	০	০	০	০	II[১৩৫]

—প্রভৃতি

পদ, কথা বা সাহিত্য ব্রহ্মপদ: "অস্যাং তং ভবললাটেতি ব্রহ্মপ্রোক্তপদাক্ষরৈঃ স্বরযোজনাপ্রকারস্তু * *"। সমস্ত পদটি হল,

তং ভবললাটনয়নাম্বুজাধিকং
নগসূনুপ্রণকেলিসমুদ্ভবম্।
সরসকৃততিলকপঙ্কানুলেপনং
প্রণমামি কামদেহেন্ধনানলম্॥

এই পদটিতে ষড়্জ ৩৬ বার + ঋষভ ১২ বার + গান্ধার ২০ বার + মধ্যম ৮ বার + পঞ্চম ৮ বার + ধৈবত ১৬ বার + নিষাদ ১২ বার = ১১২টি স্বরসংখ্যার প্রয়োগ আছে। শার্ঙ্গদেব বলেছেন যদি শুদ্ধ-নিষাদের পরিবর্তে ষাড়্জীতে কাকলি-

১৩৫। স (উপরে ।) = তার-ষড়্জ = র্স এবং স (উপরে ০) = মন্দ্র-ষড়্জ = স্। এ'ভাবে স্বরচিহ্ন অনুসরণ করতে হবে। প্রাচীন স্বরলিপিপদ্ধতি এই ধরণের ছিল:

"ঊর্ধ্বরেখাশিরাস্তু তারঃ, মন্দ্রো বিন্দুশিরা ভবেৎ"।

নিষাদের ব্যবহার করা হয় তবে দেশীরাগ বরাটীর ছায়া দেখা দেয়ঃ "বরাটী দৃশ্যতে"। অবশ্য জাতিরাগ থেকে গ্রামরাগ ও গ্রামরাগ থেকে অন্তরভাষাদি ও অভিজাত দেশীরাগাদির সৃষ্টি হয়েছে।

জাতিরাগগুলির স্বরলিপিতে মন্দ্র, মধ্য ও তার তিন রকম স্থানের এবং উচ্চারণভঙ্গি হিসাবে গুরু ও লঘু স্বরের মাত্র ব্যবহার দেখা যায়। ভরতের সময়ে (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে) স্বরলিখনের প্রচলন ছিল কিনা তার কোন প্রমাণের তিনি উল্লেখ করেন নি, কিন্তু টীকা বা ভাষ্যকার অভিনবগুপ্তের সময় তথা খৃষ্টীয় ৯৫০-৯৬০ অব্দে স্বরলিখনপ্রণালীর যে উদ্ভাবন হয়েছিল তার প্রমাণ পাই আচার্য-লিখিত মাগধী প্রভৃতি গীতির স্বরলিখন (notation) থেকে। খৃষ্টীয় ১৩শো শতাব্দীতে শার্ঙ্গদেবের সময়ে অবশ্য স্বরলিখনের প্রচার ভিন্নভাবে হয়েছিল। তবে তা এখনকার মতো সুষ্ঠু ও বিজ্ঞানসম্মত না হওয়ায় জাতি-রাগগুলির তদানীন্তন স্বরলিখন আয়ত্ত করা আমাদের পক্ষে দুরূহ। তারি জন্য ধ্রুবাগানে জাতিরাগগুলির ব্যবহার হ'লেও তাদের স্বররূপ দিয়ে ধ্রুবাগানের নির্দিষ্ট রূপের পরিচয় লাভ করা কঠিন।

কল্লিনাথ উল্লেখ করেছেন ধ্রুবাগানের রাগগুলি প্রকাশের জন্য স্থায়ীস্বরকে আশ্রয় ক'রে ব্রহ্মগীতিতে 'ঝণ্টু' প্রভৃতি অর্থহীন শব্দগুলির ব্যবহার হ'ত লঘু আদি কালের মাধ্যমে তাল বা ছন্দের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য।[১৩৬] বৈদিক অর্থহীন শব্দগুলির নাম ছিল 'স্তোভাক্ষর'। বৈদিক 'হায়ি হায়ি, হুবা হায়ি' ও আধুনিক অনিবদ্ধগানে বা আলাপে 'নেতে তারি তোম নোম, আলি আলা' প্রভৃতি শব্দ এবং ব্রহ্মগীতিতে ব্যবহৃত 'ঝণ্টুং ঝণ্টুং বা হৌঁ হৌঁ, হুঁ হুঁ' শব্দগুলি। লৌকিক স্তোভাক্ষারেরই অনুকৃতি। পরিশেষে ভরত উল্লেখ করেছেন,

ধ্রুবাবিধানঞ্চ ময়া স্বরতালপদাত্মকম্ ॥
গান্ধার্বমেতৎ কথিতং ময়া হি
পূর্ব যদুক্তং ত্বিহ নারদেন ।[১৩৭]

গান্ধর্ব যেমন স্বর, তাল পদযুক্ত গান বা গীতি, ধ্রুবাও তাই। ধ্রুবাগানে

১৩৬। 'ধ্রুবাদিগানেষু রাগপ্রকাশনার্থং স্থায়িস্বরাশ্রয়ণেন
ঝণ্টুমাদিবর্ণপরিগ্রহো লঘ্বাদিকালপরিজ্ঞানায় তালপরিগ্রহশ্চ"।

—কল্লিনাথ

১৩৭। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সংস্করণ) ৩২।৪৮৩-৪৮৪

জাতিরাগের সমাবেশ থাকায় তা যে গান্ধর্বশ্রেণীভুক্ত সেকথা ভরত মুক্তকণ্ঠে 'গান্ধর্বমেতৎ' শব্দের দ্বারা স্বীকার করেছেন। মাগধী প্রভৃতি চারটি নিবদ্ধ গীতির সম্বন্ধে ঐ একই কথা। জাতিরাগগানে ধ্রুবাগানের মতো মাগধী প্রভৃতি চারটি গীতির নিবিড় সম্পর্ক ছিল, সুতরাং তারাও অভিজাত দেশী গীতি নয়, গান্ধর্ব বা মার্গসঙ্গীতেরই অপরিহার্য উপাদান।

আতোদ্যপ্রকরণে প্রথমে (৩০শ অধ্যায়) ভরত মাত্র বেণু বা বংশের কথাই উল্লেখ করেছেন।[১৩৮] বেণুর ছিদ্রগুলিতে (পর্দায়) অঙ্গুলি-স্থাপনার কৌশল থেকে পূর্ণ, অর্ধ প্রভৃতি স্বরগুলির সৃষ্টি হ'ত। বেণুবাদকরা শ্রুতিজ্ঞানসম্পন্ন ছিল, কেননা চতুঃশ্রুতিযুক্ত পূর্ণ, তিনশ্রুতিযুক্ত কম্পিত বা দু'শ্রুতিসম্পন্ন অর্ধ স্বরগুলি প্রকাশের জন্য তাদের অঙ্গুলি-চালনা দ্বারা শ্রুতির বিকাশসাধন করতে হ'ত। ভরত উল্লেখ করেছেন,

স্বরাণাং তু শ্রুতিকৃতং তচ্চ মে সন্নিবোধত।
ব্যক্তমুক্তাঙ্গুলিস্তত্র স্বরো জ্ঞেয় চতুঃশ্রুতিঃ॥
কম্পমানাঙ্গুলিশ্চৈব ত্রিশ্রুতিশ্চ স্বরো ভবেৎ।
দ্বিকোঽর্ধাঙ্গুলিমুক্তস্তু এবং শ্রুত্যাশ্রিতাঃ স্বরাঃ॥[১৩৯]

সম্পূর্ণ মুক্ত অঙ্গুলি থেকে (অর্থাৎ অঙ্গুলি বেণুর ছিদ্র থেকে সম্পূর্ণভাবে তুলে নিলে) চতুঃশ্রুতিসম্পন্ন পূর্ণস্বরের সৃষ্টি হয়। এর দ্বারা বোঝা যায় ভরত মোটামুটি এককলা বা একমাত্রার স্বরকে চারশ্রুতির স্বর বলেছেন। অঙ্গুলি কম্পিত হ'লে তিনশ্রুতির স্বর (এক কলা বা এক মাত্রার তিন ভাগ), অর্ধাঙ্গুলি হ'লে অর্থাৎ বেণুর ছিদ্র থেকে অঙ্গুলি অর্ধেক মুক্ত করলে দু'শ্রুতির স্বর সৃষ্টি হয়। শ্রুতিমুখে স্বরের বর্ণনা ও তার কলা বা মাত্রা-নির্ণয়ের পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত ছিল। খৃষ্টপূর্ব যুগে এ'ধরণের স্বরসৃষ্টির কৌশল বা উদ্ভাবনের স্পষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভরতের সময়ে গানের স্বরকে অনুগমন করত বেণু বা বাঁশী (বংশ) এবং কণ্ঠসঙ্গীতের সহচারীও হ'ত বেণু: "যেন্নং গীতা (বা যং যং গতঃ) স্বরং গচ্ছেৎ তং বংশেন বাদয়েৎ"। শ্রুতি-নির্ধারণের সময় বীণাকে ভরত মানুষের শরীরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বেণু বা বংশের বেলায়ও তাই। বেণুতে স্বরসৃষ্টির সময় শিল্পীকে তিনি বর্ণ ও অলংকার সৃষ্টির দিকে মন দিতে

১৩৮। প্রকৃতপক্ষে ভরত আতোদ্যপ্রকরণ নিয়ে দু'টি অধ্যায়ে (৩০শ ও ৩৩শ অধ্যায়) দু'বার আলোচনা করেছেন।

১৩৯ নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ৩০।৫-৬

বলেছেন। বেণুতে ললিত, মধুর ও স্নিগ্ধ এই তিন রকম স্বর সৃষ্টি করা হ'ত : "ললিতং মধুরং স্নিগ্ধং বেণোরেবিধং বাদ্যম্"। বেণুবাদ্য যে গানের মাধুর্য ও সৌন্দর্য উৎপাদনের জন্য সেকথা ভরত স্পষ্ট ক'রেই বলেছেন : "এবমেতৎ স্বরকৃতং বিজ্ঞেয়ং গানযোক্তৃভিঃ"। এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে আতোদ্যপ্রকরণে মাত্র সুষিরশ্রেণীর বাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা করলেও তিনি বিভিন্ন বীণার বিবরণ দিয়েছেন। নারদীশিক্ষায় নারদ বৈদিক ও লৌকিক গানের জন্য গাত্র ও দারবী এই দু'টি বীণার কথা উল্লেখ করেছেন। এদের মধ্যে সামগানের জন্য গাত্রবীণা ও গান্ধর্ব বা জাতিগানের জন্য দারবীবীণা ব্যবহৃত হ'ত।[১৪০] অনেকের অনুমান যে খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে বৈদিক যুগের বীণাগুলির প্রচলন লোপ পেয়েছিল, তাই ভরত সামগানের জন্য একটি বীণার কথাই উল্লেখ করেছেন, আর গান্ধর্বের জন্যও তাই। শুধু তাই নয়, বীণার নির্মাণ-রহস্যের পরিচয় দেবার বেলায়ও তিনি মাত্র গাত্রবীণার কথাই বলেছেন। কিন্তু এ'ধরণের সিদ্ধান্ত করার কোন কারণ নাই। নারদের অভিপ্রায় হ'ল বৈদিক ও লৌকিক গান-দু'টির আলোচনার মাধ্যমে দু'টি পদ্ধতির মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপন করা, আর তারি জন্য তিনি দু'টি পদ্ধতির মিলনমন্ত্র উচ্চারণ করেছেন : "যঃ সামগানাং প্রথমঃ স বেণোর্মধ্যমঃ স্বরঃ"। বীণা ও বেণুর মধ্যে এখানে নারদের সাম্য-মৈত্রীর মিতালী পাঠানোর আকুতি দেখা যায়। তাঁর প্রয়োজনের অনুযায়ী তাই (১) স্বরের বেলায় বীণা ও বেণু, এবং (২) বীণার বেলায় গাত্রবীণা ও দারবীবীণার আশ্রয় নিয়েছেন। নচেৎ তাঁর সময়েও বিভিন্ন রকম বীণার প্রচলন ছিল।

ভরতের বেলায়ও তাই। তিনি ৩০শ অধ্যায়ে বিশেষভাবে বেণুর উদাহরণ দিয়ে গানের জন্য (২৯শ অধ্যায়ে) সপ্ততন্ত্রী-চিত্রা ও নবতন্ত্রী-বিপঞ্চীর বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু তাই ব'লে তাঁর সময়ে অপরাপর বীণা ও বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন যে ছিল না তা নয়। কেননা ৩০শ অধ্যায়ে "আতোদ্যং সুষিরং নাম"[১৪১] প্রভৃতি শ্লোকের উল্লেখ ক'রে পুনরায় ৩৩শ (কাব্যমালা-সংস্করণে ৩৪শ) অধ্যায়ে

১৪০। দারবী গাত্রবীণা চ দ্বে বীণে গান-জাতিষু।
সামিকী গাত্রবীণা তু তস্যাঃ শৃণুত লক্ষণম্॥
গাত্রবীণা তু সা প্রোক্তা যস্যাং গায়ন্তি সামগাঃ।

১৪১। এ'টি কাব্যমালা-সংস্করণের পাঠ। কাশী-সংস্করণে পাঠ হ'ল : "আতোদ্যং তু শুষিরং নাম" প্রভৃতি।

তিনি আতোদ্য বা অবনদ্ধবিধিরও আলোচনা করেছেন : "অথাতোদ্যবিধিস্তেব ময়া প্রোক্তঃ সমাসতঃ" (কাশী-সংস্করণ)। কিন্তু কাব্যমালা-সংস্করণে দু'টি আতোদ্যপ্রকরণের পাঠে বেশ একটি পূর্বাপর যোগসূত্রের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন,

ততবাদ্যবিধানং যন্ময়াবিভিহিতং পুরা।
অবনদ্ধা ততস্থাপি তস্য বক্ষ্যামি লক্ষণম্ ॥

এখানে 'পুরা' শব্দটি ৩০শ ও ৩৩শ বা ৩৪শ অধ্যায়-দু'টির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধের কথা প্রকাশ করছে। দ্বিতীয় আতোদ্য বা অবনদ্ধপ্রকরণটি প্রথমের চেয়ে বিস্তৃত ও মূল্যবান। এই অধ্যায়ে ভরত মৃদঙ্গ বা পুষ্করের জন্মকাহিনীর পরিচয় দিয়েছেন যা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। পুষ্কর, মৃদঙ্গ, পণব, দর্দুর, ঝল্লরী, পটহ প্রভৃতি চর্মে নির্মিত অবনদ্ধ ('চর্মাবনদ্ধানি')[১৪২] ও তন্ত্রী-বাদ্যযন্ত্র বিপঞ্চী, চিত্রা, দারবী, কচ্ছপী, ঘোষা বা ঘোষকা প্রভৃতির আলোচনা ৩৩শ (কাব্যমালা ৩৪শ) অধ্যায়ে দেওয়া আছে। এখানে বিপঞ্চী, চিত্রা ও দারবী বীণা-তিনটি অঙ্গ এবং কচ্ছপীও ঘোষকা প্রভৃতি প্রত্যঙ্গশ্রেণীভুক্ত।[১৪৩] তন্ত্রীর মতো চর্মবাদ্যগুলির মধ্যেও অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গরূপ বিভাগ আছে। যেমন মৃদঙ্গ, দর্দুর, পণব প্রভৃতি অঙ্গ-চর্মবাদ্য ও ঝল্লরী পটহ প্রভৃতি প্রত্যঙ্গ-চর্মবাদ্য।[১৪৪] সে'রকম শুষিরবাদ্যশ্রেণীর মধ্যে বেণু বা বংশ এবং শঙ্খ ও ডক্কিণী প্রত্যঙ্গ।[১৪৫] এ' ছাড়া ভরত ভেরী, দুন্দুভি, ডিণ্ডিমি প্রভৃতি গম্ভীর শব্দকারী বাদ্যযন্ত্রেরও নামোল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন এ'সকল বাদ্যযন্ত্র গঠনে শিথিল ও আয়ত ব'লে এদের শব্দ বা ধ্বনি বেশ গম্ভীর।[১৪৬]

১৪২। চর্মণা চাবনদ্ধাংস্তাম্ মৃদঙ্গান্ দর্দুরাংস্তথা।

* * * *

ঝল্লরীপটহাদীনি চর্মাবনদ্ধানি তানি তু ॥ ৩৪।১১-১২

১৪৩। বিপঞ্চী চৈব চিত্রা চ দারবীষঙ্গসংজ্ঞিতে।
কচ্ছপীঘোষকাদীনি প্রত্যঙ্গানি তথৈব চ। ৩৪।১৪

১৪৪। মৃদঙ্গো দর্দুরশ্চৈব পণবেষঙ্গসংজ্ঞিতে।
ঝল্লরীপটহাদীনি প্রত্যঙ্গানি তথৈব চ ॥ ৩৪।১৫

১৪৫ অঙ্গলক্ষণসংযুক্তো বিজ্ঞেয়ো বংশ এব হি।
শঙ্খস্তু ডক্কিণী চৈব প্রত্যঙ্গে পরিকীর্তিতে ॥ ৩৪।১৬

১৪৬ ভেরীপটহঝাঞ্ঝাভিস্তথা দুন্দুভিডিণ্ডিমৈঃ।
শৈথিল্যাদায়তত্বাচ্চ স্বরে গাম্ভীর্যমিষ্যতে ॥ ৩৪।২৬

ভরত বাদ্যযন্ত্রগুলির গঠন ও নির্মাণপ্রণালীরও বিবরণ দিয়েছেন। তিনি মৃদঙ্গের প্রসঙ্গে বলেছেন: মৃদঙ্গের আলিঙ্গ গোপুচ্ছের মতো গঠনবিশিষ্ট হওয়া উচিত। বামমুখ ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ অঙ্গুলি ব্যাসযুক্ত, দক্ষিণমুখ তার কিছু কম। মধ্যদেশ পৃথুল ও চারদিকে চার অঙ্গুলি পরিমিত গোলাকার গুল্ম সূত্রের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। তিনি মৃদঙ্গের লক্ষণ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন,

ত্রিবিধা ক্রিয়া মৃদঙ্গানাং হরিদক্রিয়বাশ্রয়া।
তথা গোপুচ্ছরূপা চ ভবত্যেষাং স্বরূপতঃ॥
হরীতক্যা তু তিস্বক্যা যমযধ্যস্তুতধ্বকঃ।
আলিঙ্গশ্চৈব গোপুচ্ছা কৃতিরেষাং প্রকীর্তিতাঃ॥
তালাশ্রয়ো ধ্বতাশ্চ মৃদঙ্গাঙ্গিত ইষ্যতে।
মুখে তস্যাঙ্গুলানি স্যুস্ত্রয়োদশ চতুর্দশ॥
তয়োর্ধ্বকশ্চ কর্তব্যশ্চতুস্তালপ্রমাণকম্।
মুখং তস্যাঙ্গুলানি স্যুঃ অষ্টাবেব সমাসতঃ॥[১৪৭]

ভরত পণবের দীর্ঘতা ষোল অঙ্গুলি বলেছেন। পণবের একটি মুখ আট অঙ্গুলি ও অন্য মুখ পাঁচ অঙ্গুলি ব্যাসবিশিষ্ট হ'ত। দর্দর (দর্দুর?) ঘটের (কলসী) আকারবিশিষ্ট এবং মুখও ঘটের মতো দেখতে। মধ্যদেশ পৃথুল (মোটা) ও বারো অঙ্গুলি ব্যাসবিশিষ্ট হ'ত। মুখ চর্ম দিয়ে ঢাকা (আচ্ছাদিত) হ'ত।[১৪৮] সেই চর্ম আবার কি ধরণের হ'ত ভরত তারও পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন পণব, পুষ্কর ও মৃদঙ্গের মুখে যে চর্মের আচ্ছাদন থাকত তা উত্তম হ'ত এবং জীর্ণ, পরিত্যক্ত, কাকের মুখের দ্বারা স্পৃষ্ট, মেদযুক্ত ও ধূমাদি দ্বারা দূষিত প্রভৃতি ছ'টি দোষ থেকে মুক্ত হ'ত। সেই চর্মবাদ্য নির্মাণ করার আগে দেবতার অর্চনাদি-রূপ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করা হ'ত। প্রাচীনকালে সঙ্গীত যে ধর্মের সঙ্গে ওতঃপ্রোতঃভাবে যুক্ত ছিল তা ভরতের "দেবতাভ্যর্চনাং কৃত্বা" প্রভৃতি কথাগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।[১৪৯] কণ্ঠসঙ্গীত ও নৃত্যের সহযোগী

১৪৭। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সংস্করণ) ৩৩।২২৬-২২৯

১৪৮। দর্দরস্য ঘটাকারো ভরত্যাষ্টমুখস্তথা।
মুখং চ তস্য কর্তব্যং ঘটস্য সদৃশং বুধৈঃ॥
দ্বাদশাঙ্গুলিবিস্তীর্ণং পীনোষ্ঠঞ্চ সমাসতঃ।
—নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ৩৩।২৩৩

১৪৯। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ৩৩।২৩৫-২৪৫ শ্লোকগুলিতে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে।

হিসাবে ভাণ্ডবাদ্য বা মৃদঙ্গের উপযোগিতা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। শুধু তাই নয়, "মৃদঙ্গানাং তু লক্ষণম্" (৩৩।২৫৫)—মৃদঙ্গের লক্ষণ-বর্ণনা থেকে বোঝা যায় মৃদঙ্গ বাদ্যযন্ত্র হিসাবে কত পবিত্র ও কল্যাণপ্রদ ছিল।

মৃদঙ্গলক্ষণের পর ভরত সমহস্ত, কর্তরী, হস্তপাণিত্রয়, বর্তনাবর্তনা, দণ্ডহস্ত প্রভৃতি উপহস্তের লক্ষণের পরিচয় দিয়েছেন।[১৫০] তারপর বাদকের লক্ষণ। তিনি উল্লেখ করেছেন যিনি গীতবাদ্য, কলাবাদ্য ও গীতমোক্ষে বিশারদ, যিনি লঘুহস্ত ও চিত্রপাণিবিধি ভালোভাবে জানেন, ধ্রুবাগীতি ও বাদ্যকলা সম্বন্ধে যাঁর অভিজ্ঞতা আছে, যাঁর হস্ত মধুর, যিনি স্বাস্থ্যবান ও বুদ্ধিমান তিনিই সুবাদক হবার উপযোগী।[১৫১] নাট্যের উপলক্ষে বাদ্য ও বাদ্যলক্ষণ বর্ণিত হ'লেও আগম-শাস্ত্র অনুযায়ী সকল লোকের ও সকল অনুষ্ঠানের জন্যই সেগুলি নির্বাচিত ছিল।

ভরত মৃদঙ্গকে বলেছেন 'ভাণ্ডবাদ্য'। পুষ্কর অনেক সময় মৃদঙ্গের সমানার্থক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আসলে পুষ্কর মৃদঙ্গশ্রেণীভুক্ত বাদ্য, কেননা ভরত নাট্য-শাস্ত্রের আতোদ্য বা অবনদ্ধপ্রকরণে মৃদঙ্গ ও পুষ্কর উভয় শব্দই ব্যবহার করেছেন উভের সার্থকতা দেখিয়ে। তিনি উল্লেখ করেছেন,

১৫০। তর্জন্যাঙ্গুষ্ঠযোগেন যত্রে জাতিগতিস্ততঃ ॥
পর্যাগাপতনৈর্জ্ঞেয়া কর্তরী হস্তয়োর্দ্বয়োঃ।
সময়োঃ সমতালেন দ্বয়োর্হস্তসমাশ্রয়োঃ ॥
পর্যায়তঃ প্রভাতো যঃ সমহস্ত ইতি স্মৃতঃ।
বিভাবিতব্যা বামস্য পার্ষ্ণিনাঙ্গুলিভিস্তথা ॥
সকৃদ্দক্ষিণাস্তস্য হস্তপাণিত্রয়ং ভবেৎ।
পূর্বদক্ষিণহস্তেন ক্রমাদ্বামেণ পাদতঃ ॥
চত্বারো যত্র বর্তন্তে বর্তনাবর্তনাঃ স্মৃতাঃ।
প্রথমং বামহস্তেন গৃহীত্বা দক্ষিণেন তু ॥
প্রহারাঃ ক্রমপাদেন দণ্ডহস্তঃ সমস্তয়োঃ।
—নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ৩৩।২৫৭-২৬২

১৫১। অত ঊর্ধ্বং প্রবক্ষ্যামি বাদকানাং তু লক্ষণম্।
গীতবাদ্যকলাবাদ্যগৃহমোক্ষবিশারদঃ ॥
* * *
সুবিহিতশরীরবুদ্ধিঃ সংসিদ্ধো বাদকঃ শ্রেষ্ঠঃ।
—নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ৩৩।২৬৪-২৬৬

ষতিপাণিসমাযুক্তং গুরুলঘক্ষরান্বিতম্ ॥
পৌষ্করস্য তু বাদ্যস্য মৃদঙ্গপণবাশ্রয়ম্ ।
বিধানং তু প্রবক্ষ্যামি দর্দুরস্য তথৈব চ ॥

এ'থেকে বোঝা যায় চর্মবাদ্য পুষ্কর মৃদঙ্গ, পণব ও দর্দুরের সমগোষ্ঠিভুক্ত। ভরত পুষ্করকেই কিন্তু চর্মবাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বেশী সম্মান দিয়েছেন, কেননা ষোড়শ অক্ষর, চতুর্মার্গ, ছ'রকম কারণ, বিলেপন, তিন যতি, তিন লয়, ত্রি-গত, ত্রি প্রকার, ত্রি-যোগ, ত্রি-পাণি, ত্রি-প্রহার, পঞ্চ-পাণিপ্রহার, ত্রি-মার্জনা, কুড়ি প্রকার অলংকার, আঠার জাতি প্রভৃতি সাঙ্গীতিক উপাদান পুষ্কর-চর্মবাদ্যের সঙ্গেই সম্পর্কিত।[১৫২] এই উপাদান বা অঙ্গগুলির মধ্যে ষোলটি অক্ষর হ'ল—ক খ গ ঘ ট ঠ ড চ ত থ দ ধ য র ল হ। (১) এই ষোলটি অক্ষর তথা ব্যঞ্জনবর্ণ বাদ্যের অক্ষর (বোল) রূপে ব্যবহৃত হত।[১৫৩] (২) ভরত উল্লেখ করেছেন পুষ্কর, পণব, দর্দুর ও মৃদঙ্গে ক-ট-র-ত-ঘ-জ প্রভৃতি দক্ষিণমুখে ও গ-হ-থ প্রভৃতি অক্ষর বামদিকে হাতের আঘাতে উৎপন্ন হয়। আঘাত অক্ষরকে অনুকরণ ক'রেই উৎপন্ন হয়। চারটি মার্গ—আলিপ্ত, আদিত, গোমুখ ও বিতস্ত।[১৫৪] (৩) পুষ্করের বামদিকে ঊর্ধ্বে প্রলেপ দেওয়ার নাম 'বিলেপন'।[১৫৫] (৪) ছ'টি করণ—রূপ, কৃত বা প্রতিকৃত, প্রতিভেদ, রূপশেষ, ওঘ ও প্রতিশুক্ক।[১৫৬] (৫) ত্রিযতি হ'ল সমা, স্রোতোগতা ও গোপুচ্ছা।[১৫৭] (৬) দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত তিন লয়।[১৫৮] (৭) তিন গত—তত্ত্ব, ঘন ও ওঘ।[১৫৯] (৮) তিনটি প্রচার—সমপ্রচার, বিষমপ্রচার ও সমবিষমপ্রচার।[১৬০] (৯) তিনটি যোগ বা সংযোগ—গুরুসংযোগ, লঘুসংযোগ ও গুরুলঘুসংযোগ।[১৬১] (১০) তিন পাণি হ'ল সমপাণি, অব বা অবরপাণি ও উপরিপাণি।[১৬২] (১১) পাঁচটি পাণিপ্রহার

১৫২। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ৩৭-৩৯
১৫৩। ক খ গ * * ইতি ষোড়শাক্ষরাণি স্যুঃ। ৩৩।৪০
১৫৪। চতুর্মার্গ নাম—আলিপ্তাদিতগোমুখবিতস্তাল্লত্বানি চত্বারো মার্গাঃ।
১৫৫। বিলেপনং নাম—বামোর্ধ্বকপ্রলেপাৎ।
১৫৬। ষট্‌করণং নাম—রূপং কৃত (প্রতিকৃত) প্রতিভেদো রূপশেষমোঘঃ প্রতিশুক্কেতি।
১৫৭। ত্রিযতি নাম—সমা স্রোতোগতা গোপুচ্ছেতি অন্বয়াৎ।
১৫৮। ত্রিলয়ং নাম—দ্রুতমধ্যবিলম্বিতযোগাৎ।
১৫৯। ত্রিগতং নাম—তত্ত্বং ঘনমোঘশ্চেতি।
১৬০। ত্রিপ্রচারো নাম—সমপ্রচারো বিষমপ্রচারঃ সমবিষমপ্রচারশ্চেতি।
১৬১। ত্রিসংযোগং নাম—গুরুসংযোগো লঘুসংযোগো গুরুলঘুসংযোগশ্চেতি।
১৬২। ত্রিপাণিকং নাম—সমপাণিঃ অবরপাণিঃ উপরিপাণিশ্চেতি।

যেমন সমপাণি, অর্ধপাণি, অর্ধার্ধপাণি, পার্শ্বপাণি ও প্রদেশিনীত।[১৬৩] (১২) তিন প্রকার প্রহার হ'ল নিগৃহীত, অর্ধনিগৃহীত ও মুক্ত।[১৬৪] (১৩) তিন প্রকার মার্জনা—মায়ূরী, অর্ধমায়ূরী ও কর্মারবী। (১৪) আঠার জাতি হ'ল শুদ্ধা, একরূপা, দেশানুরূপা প্রভৃতি। এগুলির উদাহরণ ভরত ৩৩।৪২-৯১ (কাশী সং) শ্লোকগুলিতে দিয়েছেন। ৩৩।৮৫-৯১ শ্লোকগুলিতে সমা, স্রোতোগতা ও গোপুচ্ছা যতি-তিনটির পরিচয় দিয়েছেন। 'যতি' অর্থে হাতের তিন প্রকার সংযোগ।[১৬৫] তাও আবার তিন রকম ছিল: রাদ্ধ, বিদ্ধ ও শয্যাগত। যেখানে গান বা গীতিই প্রধান ও দক্ষিণ-মার্গের ব্যবহার সেখানে 'শয্যাগত' যতি বা বাদ্যের ব্যবহার হ'ত। যেখানে স্রোতোগতা যতির ব্যবহার, মধ্য লয় ও সমপাণি সেখানে 'বিদ্ধ'-বাদ্যের প্রয়োগ হ'ত। আর যেখানে গানের চেয়ে বাদ্য প্রধান এবং পরিপাণি[১৬৬] ও সমা-যতির ব্যবহার সেখানে 'রাদ্ধ'-বাদ্যের প্রয়োগ হ'ত। আসলে যতি, পাণি ও লয় বাদ্যের সহচারী ও আশ্রয়, বাদ্যকেই এরা পরিপুষ্ট ও সৌন্দর্যমণ্ডিত ক'রত।

ভরত উল্লেখ করেছেন: "তিস্রো মার্জনা"। অর্থাৎ মায়ূরী, অর্ধমায়ূরী ও কর্মারবী (কার্মারবী ?) এই তিন রকম মার্জনা বা পুষ্করে স্বরস্থাপনা। মার্জনাকে ইংরাজীতে tuning process বলা যেতে পারে। আধুনিক যুগে তানপুরায় (তুম্বীবীণা) যেমন আমরা ষড়্জাদি স্বরের স্থাপনা করি, খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে তেমনি তিনটি সমান আকারের অথবা দু'টি সমান আকারের ও একটি তার চেয়ে একটু ছোট আকারের (তিনটি) পুষ্করে স্বর-স্থাপনা করার রীতি ছিল। বর্তমানে তানপুরার চারটি তারে আমরা ষড়্জ ও পঞ্চমস্বর স্থাপনা করি। ষড়্জই আধারস্বর (tonic or basic note)। ষড়্জ (মধ্য) থেকে কম্পনের মাধ্যমে আমরা ঋষভ ও গান্ধার স্বর-দু'টির অনুরণন এবং পঞ্চম (কারু কারু মতে তার-ষড়্জ) থেকে ধৈবত ও নিষাদ স্বর দু'টির অনুরণন পাই। মধ্যম ষড়্জ থেকে চতুর্থ স্বর; তার অনুরণন পেতে হ'লে আমাদের পঞ্চমের পরিবর্তে

১৬৩। পঞ্চপাণিপ্রহতং নাম—সমপাণিরর্ধপাণিরর্ধার্ধপাণিঃ পার্শ্বপাণিঃ প্রদেশিনীতঃ ইতি।

১৬৪। ত্রিপ্রহারং নাম—নিগৃহীতোঽর্ধনিগৃহীতো মুক্তশ্চেতি।

১৬৫। 'যতিপাণিনা ত্রিবিধসংযোগঃ। স চ ত্রিপ্রকারো ভবতি। যথা—রাদ্ধং বিদ্ধং শয্যাগতম্। এবং ত্রিপ্রকারঃ সংযোগঃ করণেষু বিধীয়তে।'—নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ৩৩।৮৫

১৬৬। 'পাণি' অর্থে ভরত বলেছেন লয়ের ওপর বাদ্যবিশেষ: লয়স্তোপরি যদ্বাদ্যং পাণিঃ স উপকীর্ত্যতে"। সমান লয়ের বাদ্যকে 'সমপাণি' বলে: "লয়ে লয়ং সমং বাদ্যং সমপাণিঃ প্রকীর্ত্যতে"।
—নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা সংস্করণ) ৩১।৩২৯-৩৩১

চতুর্থ স্বরে স্বর-স্থাপনা করতে হয়। এ' নিয়েও অবশ্য মতভেদ আছে। তবে তানপুরায় স্বর-স্থাপনা করাই হ'ল আধুনিক যুগের পদ্ধতি। ভরতের সময়ে স্বর-স্থাপনা বা মার্জনা ছিল পুষ্করে। ভরত উল্লেখ করেছেন,

গান্ধারো বামকে কার্যঃ ষড়্‌জো দক্ষিণপুষ্করে ॥
ঊর্ধ্বকে পঞ্চমশ্চৈব(?) মায়ূর্যাং তু স্বরা মতাঃ।
বামকে পুষ্করে ষড়্‌জ ঋষভো দক্ষিণে তথা ॥
ঊর্ধ্বকে পঞ্চমশ্চৈবমর্ধমায়ূর্যুদাহৃতা।
ঋষভঃ পুষ্করে বামে ষড়্‌জো দক্ষিণপুষ্করে ॥
পঞ্চমশ্চোর্ধ্বকে কার্যঃ কার্মারব্যাঃ স্বরাস্ত্রয়ী।
এতেষামনুবাদী তু জাতীনাং যঃ স্বরঃ স্মৃতঃ ॥
আলিঙ্গ্যমার্জনপ্রাপ্তো নিষাদঃ সংবিধীয়তে।
মায়ূরী মধ্যমগ্রামে ষড়্‌জে ত্বর্ধা তথৈব চ ॥
কার্মারবী চ গান্ধারে সাধারণসমাশ্রয়াঃ ॥
স্বরাঃ স্থানস্থিতা যে তু শ্রুতিসাধারণাশ্রয়াঃ ॥
এবং সংমার্জনকৃতাঃ শেষাঃ সংচারিণো মতাঃ।
বামকে চোর্ধ্বকে কার্যা হার্যা লেপতশ্চ সপ্তস্বরাঃ ॥[১৬৭]

মায়ূরী, অর্ধমায়ূরী ও কার্মারবী এ'তিনটি মার্জনার মধ্যে মায়ূরী মধ্যমগ্রামের সঙ্গে, অর্ধমায়ূরী ষড়্‌জগ্রামের সঙ্গে ও কার্মারবী গান্ধারগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কিত।

১৬৭। নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা-সংস্করণ) ৩৪।৪৬-৫২

কাশী-সংস্করণ নাট্যশাস্ত্রে যথেষ্ট পাঠভেদ আছে। যেমন,

ত্রিস্রো মার্জনা নাম—
মায়ূরী হ্যর্ধমায়ূরী তথা কর্মারবী পুনঃ।
তিস্রস্তু মার্জনা জ্ঞেয়াঃ পুষ্করেষু স্বরাশ্রয়াঃ।
গান্ধারো বামকে কার্যঃ ষড়্‌জো দক্ষিণপুষ্করে।
ঊর্ধ্বগে মধ্যমশ্চৈব মায়ূর্যশ্চ স্বরাশ্রয়াঃ ॥
বামকে পুষ্করে ষড়্‌জ ঋষভো দক্ষিণে তথা।
ধৈবতশ্চোর্ধগে কার্যঃ অর্ধমায়ূরকাশ্রয়াঃ ॥
ঋষভঃ পুষ্করে বামে ষড়্‌জো দক্ষিণপুষ্করে।
পঞ্চমশ্চোর্ধ্বগে কার্যঃ কর্মারব্যঃ স্বরাশ্রয়াঃ ॥
এতেষামনুবাদী তু জাতিরাগস্বরান্বিতঃ।
আলিঙ্গে মার্জনং প্রাপ্য নিষাদস্তু বিধীয়তে।
মায়ূরী মধ্যমে গ্রামেঽপ্যর্ধে ষড়্‌জে তথৈব চ।
কর্মারবী চৈব কর্তব্যা সাধারণসমাশ্রয়াঃ।

—নাট্যশাস্ত্র (কাশী-সংস্করণ) ৩৩।৯২-৯৭

ভরত উল্লেখ করেছেন : কার্মারবী চ গান্ধারে সাধারণসমাশ্রয়াঃ" ; অর্থাৎ সাধারণকে আশ্রয় ক'রে গান্ধারগ্রাম বিকশিত। দু'টি স্বরের মধ্যবর্তী স্বরকে 'সাধারণ' বলে। মোটকথা মধ্যবর্তী যেকোন বস্তু বা ব্যক্তিমাত্রেই 'সাধারণ' নামে অভিহিত হয়। ভরত বলেছেন : "সাধারণং নামান্তরস্বরতা। কস্মাৎ ? দ্বয়োরন্তরস্থং তৎ সাধারণম্"।[১৬৮] অনেকে সাধারণকে গ্রাম (scale) হিসাবে গণ্য করেন এবং এই সাধরণগ্রাম বর্তমান উত্তর-ভারতীয় হিন্দুস্থানীপদ্ধতির শুদ্ধ-বিলাবল ঠাট (?) ও ইউরোপীয় ডায়োটনিক মেজর স্কেল (Diatonic Major Scale)। সাধারণকে যাঁরা গ্রাম বলেন তাঁদের যুক্তি হ'ল ষড়্জ ও মধ্যম এই গ্রাম-দু'টিতে সাধারণও দু'রকম—ষড়্জসাধারণ (ষড়্জগ্রামে) ও মধ্যমসাধারণ (মধ্যমগ্রামে)। এ'দু'টি সাধারণকে সাধারিত ও কৈশিক কিংবা সাধারিতগ্রাম ও কৈশিকগ্রামও বলা হ'ত। মধ্যমগ্রামকে 'কৈশিক' বলা হ'ত তার প্রমাণ হ'ল : "মধ্যমগ্রামেঽপি সাধারণত্বং। অস্তস্ত প্রয়োগসৌক্ষ্ম্যাৎ কৈশিকমিতি নাম নিষ্পদ্যতে"। অর্থাৎ মধ্যমগ্রামেও সাধারণ আছে, প্রয়োগে বা ব্যবহারের সূক্ষ্ম কৌশল থাকার জন্য এই গ্রামকে কৈশিক বলা হ'ত। সাধারিত ও কৈশিক এই উভয় গ্রামের কথাই ভরত উল্লেখ করেছেন। 'সাধারণকৃত' শব্দ থেকে সাধারণ বা সাধারণগ্রাম কথার সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। নারদীশিক্ষায়ও সাধারিত ও কৈশিক গ্রামরাগ এবং গ্রামের উল্লেখ ও তাদের বিবরণ আছে।

॥ মায়ূরী-মার্জনা ॥ মায়ূরী-মার্জনা সম্বন্ধে ভরত উল্লেখ করেছেন,

গান্ধারো বামকে কার্যঃ ষড়্জো দক্ষিণপুষ্করে ॥
ঊর্ধ্বকে পঞ্চমশ্চৈব মায়ূর্যাং তু স্বরা মতাঃ ॥

বর্তমান কালে ক্ল্যাসিক্যাল গানে আমরা যেমন তবল (তলমৃদঙ্গ) ও বাঁয়া (বামমৃদঙ্গ) এই দু'টি মৃদঙ্গ ব্যবহার করি, প্রাচীন ভারতে (খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত) তেমনি গানে তিনটি মৃদঙ্গের ব্যবহার হ'ত : দু'টি সমান আকারের—বর্তমান পাখোয়াজের মতো দেখতে ও একটি ছোট মৃদঙ্গ। সেই মৃদঙ্গকে পুষ্কর বলা হ'ত। বড় পুষ্কর-দু'টি সোজাভাবে দাঁড়করানো আর ছোটটি শোয়ানো (শায়িত আকারে) থাকত। পাথরের গায়ে খোদাই করা ভাস্কর্যচিত্রে কখনো কখনো দু'টি পুষ্করের প্রতিকৃতি দেখা যায়।[১৬৯] বেশীর ভাগ লোকের বিশ্বাস যে

১৬৮। নাট্যশাস্ত্র (কাশী-সংস্করণ) ২৮।৩৩

১৬৯। Vide প্রজ্ঞানানন্দ : *Ancient Methods of Tuning in Indian Music* (প্রবন্ধ) appeared in the Sovenior of All India Sadāraṅg Music Conference, Cal. 1955, pp. 4-7.

প্রাচীন ভারতে মাত্র একটি মৃদঙ্গের ব্যবহার ছিল এবং বর্তমান তবলা ও বাঁয়ার প্রচলন মুসলমান রাজত্বের সময় পারসিক ও আরবদের প্রভাবের ফলে হয়েছিল। অনেকে আবার আমীর খসরুকেই তবলা ও বাঁয়ার স্রষ্টা ব'লে অভিমত প্রকাশ করেন। কতকগুলি ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের বেলায়ও তাই (সেতার, রবাব, স্বরোদ, বেহালা প্রভৃতি)। প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেখ্‌লে এ'সকল অভিমতের তেমন কোন সার্থকতা দেখা যায় না। বর্তমান তবলা ও বাঁয়ার গঠন ও বাদনপদ্ধতি মুসলমান যুগে নতুন রূপ গ্রহণ করতে পারে এবং করাও স্বাভাবিক, কেননা যুগধর্ম ও পরিবর্তনশীল কালস্রোতের স্বভাব হ'ল পুরাতনের মাঝে নতুন-কিছু পরিবর্তন সৃষ্টি করা। সমাজবাসী মানুষের বিবর্তনশীল রুচিই অবশ্য এ' পরিবর্তন এনে দেবার পক্ষপাতী। কিন্তু তাই ব'লে প্রাচীন ভারতে তবলা ও বাঁয়ার মতো গানে দু'টি মৃদঙ্গের ব্যবহার ছিল না একথা বল্‌লে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করা হয়। প্রাচীন কালে তিনটি পুষ্করের মধ্যে বড় দু'টির একটিকে বাম হাতে ও অপরটিকে ডান হাতে ও ছোটটিকে সম্ভবত উভয় হাত দিয়ে বাজানো হ'ত। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ—৭ম শতাব্দীতে ভুবনেশ্বরে মুক্তেশ্বর-মন্দিরে, খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বোম্বাইয়ের বাদামী-মন্দিরে ও তা'ছাড়া উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের বিভিন্ন প্রাচীন বৌদ্ধবিহার ও মন্দিরগুলিতে তিনটি পুষ্করের প্রস্তরচিত্র উৎকীর্ণ দেখা যায়। ভুবনেশ্বরে মুক্তেশ্বর-মন্দিরের গাত্রে যে পুষ্কর-তিনটির প্রস্তর-প্রতিকৃতি খোদাই করা আছে তার বিবরণ হ'ল : নটরাজ শিব অপরূপ মূর্তিতে নৃত্যরত। তাঁর আটটি হাতে হস্তমুদ্রার প্রতিফলন খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ—৭ম শতাব্দীর ভারতীয় সমাজে নাট্যশাস্ত্রের অনুযায়ী নৃত্য, মুদ্রা ও অঙ্গহারাদির অনুশীলনের মর্মকথা প্রকাশ করে। নটরাজের দক্ষিণে নৃত্যশীল গণপতি একটি বাঁশী বাজাচ্ছেন শিবের নৃত্যকে সুষমান্বিত করার জন্য। তাঁর বাম দিকে একটি লোক চারটি পায়া (পদ)-যুক্ত একটি আসনে উপবেশন ক'রে দু'টি সমান আকারের পুষ্কর বাজাচ্ছে নটরাজের নৃত্যছন্দের তালে তালে। বাদামী-মন্দিরে (৬ষ্ঠ শতাব্দী) উৎকীর্ণ শিব-নটরাজের ষোলটি হাত। প্রত্যেকটি হাতে শাস্ত্রীয় হস্তমুদ্রার রূপায়ণ। দক্ষিণের দিকে এক হাতে নটরাজ একটি ত্রিশূল ধ'রে আছেন। নটরাজ নৃত্যভঙ্গিতে দণ্ডায়মান। তাঁর বামদিকে গণপতি মুক্তেশ্বর-মন্দিরের গণেশের মতো একটি বাঁশী বাজাচ্ছেন। গণপতির পাশে একজন বাদক দু'হাতে দু'টি সমান আকারের মৃদঙ্গ (পুষ্কর) বাজাচ্ছে। তার সাম্‌নে আর একটি সামান্য ছোট আকারের মৃদঙ্গ শোয়ানো আছে। প্রাচীন ভারতের তিনটি

বা দু'টি পুষ্কর যে কালস্রোতের বিবর্তনে পড়ে মুসলমান যুগে বাঁয়া ও তবলে পরিবর্তিত হয়নি তা কে বলতে পারে। বরং হওয়াই স্বাভাবিক। প্রাচীন ভারতের ধনুর্যন্ত্র ও মধ্যযুগীয় বা আধুনিক যুগের ভায়োলিন বা বেহালার ইতিকথাও তো তাই। এছাড়া ৬ষ্ঠ—৭ম শতাব্দীতে পরমেশ্বর-মন্দিরের গর্ভে যে নট ও নটীদের প্রতিমূর্তি উৎকীর্ণ আছে তাদের একজন অদ্ভুত ধরণের ডমরু-আকৃতি একটি মৃদঙ্গ বাজাচ্ছে দেখা যায়। খৃষ্টীয় ১১শ—১২শ শতাব্দীতে দক্ষিণ-ভারতে চিদাম্বরম্-মন্দিরে নট-নটী-পরিবৃত হ'য়ে তাণ্ডবনৃত্যরত যে শিব-নটরাজের মূর্তির প্রতিফলন দেখা যায় তাতেও নট-নটীদের হাতে পুষ্কর ও করতাল আছে। উড়িষ্যার কোনার্কের সূর্য-মন্দিরেও মৃদঙ্গবাদ্যরতা নটীদের প্রতিমূর্তি দেখা যায়। সুতরাং বর্তমান কালের মতো প্রাচীন ভারতেও দু'টি বা তিনটি পুষ্কর বা মৃদঙ্গের ব্যবহার ছিল গান ও নৃত্যকে ছন্দায়িত করার জন্য। রূপ-বিবর্তিত সকল-জিনিসের মধ্যেই বিদেশী প্রভাব থাকা কিছু বিচিত্র নয়, কিন্তু সকল সময় দেশীয় সৃষ্টি-প্রতিভার অবদানকে নিঃসন্দিগ্ধভাবে বিদেশী ব'লে সিদ্ধান্ত করাও বিশেষ চাক্ষুমানতার কাজ নয়। বিশেষ ক'রে প্রাচীন ভারতের ভাস্কর্যচিত্রগুলিতে পুষ্করাদি বাদ্যযন্ত্রগুলির আকার ও বাদনপ্রণালী লক্ষ্য করলে যুক্তির সারতা ও অসারতার কথা অনুভব করা যায়।

মায়ূরী-মার্জনায় তিনটি পুষ্করের প্রয়োজন। তাদের মধ্যে (কাব্যমালা-সংস্করণ অনুযায়ী) দু'টি পুষ্কর পাশাপাশি সাজালে বামদিকের পুষ্করে গান্ধারস্বর, দক্ষিণদিকের পুষ্করে ষড়্জস্বর ও সোজাসুজি দাঁড়করানো পুষ্করে পঞ্চমস্বর (?) বাঁধা হ'ত বা পাওয়া যেত। কাব্যমালা-সংস্করণটিতে শ্লোকের ২য় লাইনটিতে পাঠ সম্ভবত অশুদ্ধ আছে। অর্থাৎ 'উর্ধ্বকে পঞ্চশ্চৈব স্থানে 'মধ্যমশ্চৈব' হওয়াই উচিত। কাশী-সংস্করণে এটির পাঠ শুদ্ধ আছে। যেমন,

গান্ধারো বামকে কার্যঃ ষড়্জো দক্ষিণপুষ্করে।
উর্ধ্বগে মধ্যমশ্চৈব মায়ূর্যঞ্চ স্বরাশ্রয়াঃ॥

কাশীর সম্পাদকীয় টীকায় মধ্যমের স্থানে 'পঞ্চম° স্ব' তথা ভিন্নমতে 'পঞ্চমস্বর' ব'লে মন্তব্য আছে—মনে হয় যা ঠিক নয়, 'উর্ধ্বগে মধ্যমশ্চৈব' পাঠই হওয়া উচিত।

॥ অর্ধমায়ূরী-মার্জনা ॥ অর্ধমায়ূরী-মার্জনা সম্বন্ধে ভরত উল্লেখ করেছেন,

বামকে পুষ্করে ষড়্জ ঋষভো দক্ষিণে তথা॥
উর্ধ্বকে পঞ্চমশ্চৈবমর্ধমায়ূর্যদাহৃতা।

অর্ধমায়ূরী-মার্জনার বেলায়ও তিনটি পুষ্করের প্রয়োজন। দু'টি সমান আকারের শায়িত পুষ্করের মধ্যে বামেরটিতে ষড়্জ, দক্ষিণ-পুষ্করে ঋষভ ও তৃতীয় পুষ্করে পঞ্চমস্বর স্থাপনা করা হ'ত। কাশী-সংস্করণের নাট্যশাস্ত্রে পাঠ ও বিষয়বস্তুরও ভেদ আছে। যেমন—

বামকে পুষ্করে ষড়্জ ঋষভো দক্ষিণে তথা।
ধৈবতশ্চোর্ধগে কার্যঃ অর্ধমায়ুরকাশ্রয়াঃ ॥

এই শ্লোক থেকে বোঝা যায় দু'টি সমান আকারের শায়িত পুষ্করে ষড়্জ ও ঋষভ এবং তৃতীয়টিতে ধৈবতস্বর স্থাপন করা হ'ত।

॥ কার্মারবী-মার্জনা ॥ কার্মারবী-মার্জনা সম্বন্ধে ভরত উল্লেখ করেছেন,

ঋষভঃ পুষ্করে বামে ষড়্জো দক্ষিণপুষ্করে ॥
পঞ্চমশ্চোর্ধকে কার্যঃ কার্মারব্যাঃ স্বরাশ্রমী।

পূর্বের মতো তিনটি পুষ্করের মধ্যে শায়িত দু'টির মধ্যে বাম-পুষ্করে ঋষভ, দক্ষিণ-পুষ্করে ষড়্জ ও তৃতীয় (উর্ধ্ব) পুষ্করে পঞ্চমস্বর স্থাপনা করা হ'ত। এখানে দেখা যায় তিনটি মার্জনার দ্বারা ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম ও ধৈবত এই ছয়টি স্বর-স্থাপনার দ্বারা ছয়টি স্বর পাওয়া যেত। আর নিষাদস্বর পাওয়া যেত ষড়্জ ও পঞ্চমের অনুবাদী এবং জাতিরাগের রাগস্বর (অংশ) হিসাবে আলিঙ্গ্য-মার্জনার দ্বারা। ভরত উল্লেখ করেছেন,

এতেষামনুবাদী তু জাতীনাং যঃ স্বরঃ স্মৃতঃ ॥
আলিঙ্গ্যমার্জনপ্রাপ্তো নিষাদঃ সংবিধীয়তে।

সুতরাং মায়ূরী-আদি ত্রিমার্জনা ও আলিঙ্গ্য-মার্জনার দ্বারা পাওয়া যেত—

(১) মধ্যমগ্রামে মায়ূরী-মার্জনায়—গান্ধার, ষড়্জ, মধ্যম ;
(২) ষড়্জগ্রামে অর্ধমায়ূরী—ষড়্জ, ঋষভ, পঞ্চম,
(৩) গান্ধারগ্রামে কার্মারবী—ষড়্জ, ঋষভ ; পঞ্চম
(৪) আলিঙ্গ্য-মার্জনায়—নিষাদ।[১৬৯]

পরিশেষে ভরত মধ্যমগ্রামের সঙ্গে মায়ূরীকে, ষড়্জের সঙ্গে অর্ধমায়ূরীকে ও গান্ধারের সঙ্গে কার্মারবীকে সম্পর্কিত করেছেন। তিনি বলেছেন যে সকল

১৬৯। কাব্যমালা-সংস্করণ অনুসারে—

(ক) গসম। ৪৬। সঋপ। ৪৭। সঋপ। ৪৭-৪৮। আলিঙ্গ্যে—নি। ৪৯-৫০

স্বর শ্রুতিসাধারণের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাদের কোন পরিবর্তন হয় না, তাছাড়া গ্রামের অপর সকল স্বরের পরিবর্তন হয় :

স্বরাঃ স্থানস্থিতা যে তু শ্রুতিসাধারণাশ্রয়াঃ ॥
এবং সমার্জনকৃতাঃ শেষাঃ সঞ্চারিণো মতাঃ ।

কাশী-সংস্করণে পাঠভেদ আছে। 'শ্রুতিসাধারণ' শব্দটির ব্যবহারে ভরত কি বলতে চেয়েছেন তা সঠিক নির্ধারণ করা কঠিন। ভরত (২৮শ অধ্যায়ে) স্বর ও জাতি এই দু'টি সাধারণের কথা উল্লেখ করেছেন : "দ্বে সাধারণে স্বরসাধারণং জাতিসাধারণঞ্চেতি"। কাকলিনিষাদ ও অন্তরগান্ধার স্বরসাধারণ। এ'ছাড়া কালসাধারণের কথাও ভরত উল্লেখ করেছেন : "ইতি কালসাধারণঃ"। কিন্তু শ্রুতিসাধারণের কথা তিনি নাট্যশাস্ত্রের কোথাও আলোচনা করেছেন ব'লে মনে হয় না। সাধারণভাবে দু'টি শ্রুতির অন্তর বা মধ্যবর্তী শ্রুতি এই ধরণের শ্রুতিসাধারণের অর্থ হ'তে পারে, কিন্তু মার্জনা-প্রসঙ্গে ভরতের অভিপ্রায় ঠিক মধ্যবর্তী শ্রুতি নয়। তবে মার্জনা-তিনটির পদ্ধতি থেকে বোঝা যায় তারা বিভিন্ন তিনটি গ্রামে (ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধার) প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে তিনটি স্বরের নির্দেশ করে। তিনটি গ্রামের নির্ধারণপদ্ধতিও পরস্পর নিরপেক্ষ, অর্থাৎ একটি অপরটির সঙ্গে সম্পর্কিত বা একটি অন্যটির ওপর প্রতিষ্ঠিতও নয়। অথচ পাঠ্যে, কাব্যবন্ধে, গেয়ে বা গানে তাদের বিকাশের কোন অসঙ্গতি দেখা যায় না। প্রতিটি মার্জনায় প্রতিষ্ঠিত তিনটি ক'রে স্বর সেই সেই গ্রামের অংশ হিসাবে গণ্য।

মার্জনাপদ্ধতিতে পুষ্করে মৃত্তিকালেপনের উপযোগিতা ছিল : "মৃত্তিকালেপেন হেষাং যথাকার্যন্তু মার্জনম্" (৩৩।১০৩)। সেই মৃত্তিকা কি ধরণের হ'ত ভরত তারও পরিচয় দিয়েছেন (কাশী-সংস্করণ ৩৩।১০১-১০৭)। তিনি উল্লেখ করেছেন,

নদীকূলপ্রদেশস্থা শ্যামা যা মৃত্তিকা ভবেৎ।
তোয়াপসরণশ্লক্ষ্ণা তয়া কার্যন্তু মার্জনম্ ॥

নদীতীরে শ্যামবর্ণা মৃত্তিকাই মার্জনাক্রিয়ার পক্ষে প্রশস্ত, তবে তার জলের অংশকে বেশ ক'রে শুকিয়ে লেপনের উপযুক্ত ক'রে নিতে হ'ত। শ্যামবর্ণ ও লেপনের উপযোগী করার জন্য অনেক সময় মাটির সঙ্গে গোধূলি বা যবচূর্ণ প্রভৃতি মিশিয়ে নিতে হ'ত : "এবং তু মার্জনাযোগাৎ শ্যামা স্বরকরী ভবেৎ"। এর জন্য ত্রিসংযোগের প্রয়োজন হ'ত। 'ত্রিসংযোগ' অর্থে তিন রকম সঞ্চয়

বা সংযোগ বোঝাত : গুরুসঞ্চয়, লঘুসঞ্চয় ও গুরুলঘুসঞ্চয়। উরুস্থিতিলয়বৃত্তির নাম 'গুরুসঞ্চয়'। দ্রুতলয়বৃত্তির নাম 'লঘুসঞ্চয়'। ভরত উল্লেখ করেছেন মৃদঙ্গ (পুষ্কর)-বাদ্যে এই তিনটি সংযোগের বিশেষ উপযোগিতা থাকত। এদের 'ত্রিপ্রকৃতি'-ও বলা হ'ত। পদ, বর্ণ, অক্ষরাদি অনুযায়ী বাদ্যের প্রকৃতি গঠিত হ'ত। এর নাম 'বৃত্ত'। বাদ্যের বৃত্তের প্রকৃতি গানের বা বাক্যের (কাব্যের) গুরু ও লঘু অক্ষরাদি অনুযায়ী হ'ত। বাদ্য সর্বদাই গানকে অনুসরণ করত। কাব্য ও গানের কালপ্রমাণ বা লয়কে অনুসরণ করাই ছিল মৃদঙ্গ ও পুষ্করাদি বাদ্যের ধর্ম।[১৭০(ক)]

পূর্বে পুষ্করবাদ্যের আশ্রয় যে আঠারটি জাতিলক্ষণের উল্লেখ করা হয়েছে সে'গুলি যাড়্জী প্রভৃতি জাতি তথা জাতিরাগ নয়, সে'গুলি শুদ্ধা, একরূপা, দেশানুরূপা, পর্যায়, বিষ্কম্ভ, পর্যস্তা, সংরম্ভ, পার্ষ্ণিসমস্তা, দুষ্করকারণা, ঊর্ধ্বগোষ্টিকা, উচ্চিতিকা প্রভৃতি আঠারটি লক্ষণ। এদেরই আঠার জাতি বলা হ'ত। ভরত এদের পরিচয় দিয়েছেন (নাট্যশাস্ত্র, কাশী সং ৩৩।১১৬-১৫৩)। প্রাবেশিকী, নৈষ্ক্রামিকী, প্রাসাদিকী প্রভৃতি পাঁচটি ধ্রুবাগান কি লয়ে গান করা হ'ত তার পরিচয় দিয়ে তিনি বলেছেন : (১) লয় অনুযায়ী প্রাবেশিকী-ধ্রুবা গান করা হ'ত ; (২) ত্রিলয় বা তিনটি লয় অনুযায়ী নৈষ্ক্রামিকী-ধ্রুবা ও দ্রুতলয়ে প্রাসাদিকী-ধ্রুবা গান করা হ'ত। গানের গতিপ্রচার অনুযায়ী বাদ্যের লয় হ'ত ; গান ও বাদ্য পরস্পরের মধ্যে কখনো বৈষম্যের ভাব সৃষ্টি হ'ত না।

পুষ্কর-প্রসঙ্গে ভরত গ্রহের কথা বলেছেন : "গ্রহান্ ভাণ্ডসমাশ্রয়ান্" (৩৩।১৬৪)। শম্যা, সন্নিপাত প্রভৃতি তালই অবশ্য গ্রহের সার্থকতা সম্পন্ন করে। তিনি উল্লেখ করেছেন,

তথা চাঙ্গনিবদ্ধানি শীতকানি যথাক্রমম্ ॥
এবমেতে বুধৈর্জ্ঞেয়া গ্রহা ভাণ্ডসমাশ্রয়াঃ।

ভাণ্ড বা ভাণ্ডবাদ্য বলতে মৃদঙ্গ, পণব, পুষ্করাদি আনদ্ধযন্ত্র। তাণ্ডবাদি নৃত্য, অঙ্গবিক্ষেপ বা অঙ্গহার প্রদর্শন প্রভৃতি ব্যাপারে বাদ্যপ্রয়োগ কি ধরণের হ'ত ভরত তারও পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

যদ্‌বৃত্তস্তু পদং গানে তাদৃশং বাদ্যমিষ্যতে।
গীতবাদ্যপ্রমাণেন কুর্যাচ্চাঙ্গবিচেষ্টিতম্ ॥

১৭০(ক)। যৎপ্রমাণং ভবেদ্‌গানং কলাকালপ্রমাণতঃ।
যৎপ্রমাণং তু তদ্বাক্যং তদ্বৈ তালসমং ভবেৎ ॥
—নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ৩৩।১১২

যে বিধি বা প্রয়োগের জন্য গান ও বাদ্যে নিয়মকানুন প্রয়োজন, নৃত্য ও অঙ্গহার প্রদর্শনের বেলায়ও তাই। এথেকে বোঝা যায় যে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের মধ্যে পারস্পারিক একটি সাম্যের যোগসূত্র ছিল, কেউ কাকেও অতিক্রম ক'রে সঙ্গীতকলার মর্যাদা ভঙ্গ করত না। ভরত উল্লেখ করেছেন,

> সমং রক্তং বিভক্তঞ্চ স্ফুটং শুদ্ধপ্রয়োগজম্।
> নৃত্তাঙ্গগ্রাহি লোকজ্ঞৈর্বাদ্যং যোজ্যং তু তাণ্ডবে॥
>
> * * * *
>
> স্থিতে মধ্যে দ্রুতে চাপি যথা গানং তু বাদয়েৎ।
> পদনৃত্তাঙ্গহারে তু তেনৈব প্রক্রমেণ তু॥
> যো বিধির্গানবাদ্যানাং পদাক্ষরলয়ান্বিতঃ।
> স তু নৃত্তাঙ্গহারেষু কর্তব্যো নাট্যযোগতঃ॥[১৭০(খ)]

ভরত এগুলিকেই তাণ্ডবাদ্যের জাতি বলেছেন। এই জাতি সম্বন্ধে বাদক-শিল্পীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

জাতির পর ভরত বাদ্যের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে প্রকারের পরিচয় দিয়েছেন: "অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি প্রকারান্ বাদ্যসংশ্রয়ান্"। এই 'প্রকার' হ'ল প্রায় উনিশটি। যেমন, চিত্র, সম, বিভক্ত, ছিন্ন, ছিন্নবিদ্ধ, অনুবিদ্ধ, স্বরূপানুগত, অনুসৃত, বিচ্যুত, দুর্গ, অবকীর্ণ, অর্ধাবকীর্ণ, একরূপ, পরিক্ষিপ্ত, সাচীকৃত, সমলেখ, চিত্রলেখ, সর্বসমবায় ও দৃঢ়। এই উনিশটি প্রকারের তিনি পরিচয়ও দিয়েছেন (নাট্যশাস্ত্র, কাশী সং, ৩৩।১৮৪-২০৪)। যখন দর্দুর, পণব, মৃদঙ্গ, আনক প্রভৃতি চর্মবাদ্যগুলির বাদ্যের (তালের) সঙ্গে বংশ বা বেণু অনুসরণ করত তখন তার নাম হ'ত 'সমপ্রকার', ইত্যাদি। অবশ্য এ'সকল ব্যাপারে রসসৃষ্টির দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হ'ত।

এদের প্রয়োগ সম্বন্ধেও শিল্পীদের জ্ঞান অর্জন করতে হ'ত। নাট্য-ব্যাপারে এই প্রয়োগের সার্থকতা দেখা দিত। ভরত এই প্রয়োগ-রহস্যের পরিচয় দিতে

১৭০(খ)। কাব্যমালা-সংস্করণে পাঠ—

> "সমরক্তং বিভক্তং চ স্ফুটং শুদ্ধং প্রহারজম্।
> নৃত্তাঙ্গগ্রাহি চ তথা বাদ্যং কার্যং তু তাণ্ডবে।
> সনৃত্তেষু প্রয়োগেষু তত্ত্বং হ্যনুগতং তথা।
> অনৃত্তেষু প্রয়োগেষু তত্ত্বমোঘং ক্রমেণ তু।
> যো বিধির্গান"···প্রভৃতি ঠিক আছে।

গিয়ে বলেছেন : 'রঙ্গমঞ্চের পূর্বদিকে মুখ ক'রে বসে কুতপ বিন্যাস করা উচিত। পূর্বে (৪র্থ অধ্যায়ে) যে নেপথ্যগৃহের দ্বারের মাঝখানের কথা বলা হয়েছে তারি মধ্যে কুতপবিন্যাসের প্রয়োজন। রঙ্গের অভিমুখে মৃদঙ্গ, পণব ও দর্দুর বাদকগণ, গায়ক-গায়িকা, বংশী ও বীণা বাদকরা উপবেশন করবে। পরে গ্রাম, রাগ ও মূর্ছনা অনুযায়ী মৃদঙ্গে (পুষ্করে) মার্জনা বা স্বর-স্থাপনা করা উচিত। বাদ্যযন্ত্রগুলি বাজাবার আগে প্রথমে রঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের আবাহন ও বিসর্জনমূলক 'ত্রিসাম' অনুষ্ঠান করবে। সর্বচরাচরের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে প্রথম সাম বামপার্শ্বে চন্দ্র ও দক্ষিণে পন্নগাদির উদ্দেশ্যে জলসাম ও বৃহৎসাম প্রভৃতি বিধিমত গান (?) করবে' প্রভৃতি।[১৭১] কাব্যমালা-সংস্করণে (নাট্যশাস্ত্রে) পাঠভেদ আছে, কিন্তু বক্তব্য বিবরণটি বেশ সুপরিস্ফুট। যেমন "* * * তত্র রঙ্গভিমুখো মৌরজিকঃ। তস্য···পাণবিকাদ্দর্দরিকো বামতঃ। এব প্রথমমবনদ্ধ কুতপবিন্যাস উক্তঃ। তত্রোত্তরাভিমুখো গায়নঃ। গায়নস্য বামপার্শ্বে বৈণিকঃ, তস্য দক্ষিণে বংশবাদকৌ। গায়ু (?)-ভিমুখ্যো গায়িকা ইতি কুতপবিন্যাসঃ"।[১৭২] অর্থাৎ রঙ্গের পূর্বদিকে বাদ্যযন্ত্রাদি ও শিল্পীদের নিয়ে আসর সাজানো হ'ত। কুতপবিন্যাসের বিবরণ পূর্বে দেওয়া হয়েছে। নাট্যশাস্ত্রের ৪র্থ—৫ম অধ্যায়ে ভরত বাদ্যযন্ত্রের বাদক ও গায়কদের সুষ্ঠু সন্নিবেশের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি পুনরায় পুষ্করাদি বাদ্যের জাতি ও প্রকারের প্রসঙ্গে কুতপবিন্যাসের কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন : (কাব্যমালা অনুযায়ী) রঙ্গের নেপথ্যগৃহের দ্বারের মাঝখানে কুতপবিন্যাস করা হ'ত। রঙ্গের দিকে মুখ ক'রে মুরজবাদকরা উপবেশন ক'রত। তার বামে পণব ও দর্দির (দর্দর ?)-বাদকরা আসন গ্রহণ করত। গোড়ার দিকেই অবনদ্ধজাতীয় বাদ্যযন্ত্রের সজ্জার কথা বলা হয়েছে।

১৭১। এতেষাং প্রয়োগমিদানীং বক্ষ্যামি। তত্রোপবিষ্টঃ প্রাঙ্‌মুখো রঙ্গে কুতপবিনিবেশঃ কর্তব্যঃ। অত্র পূর্বোক্তয়োর্নেপথ্যগৃহদ্বারয়োর্মধ্যে কুতপবিন্যাসঃ। স্বরঙ্গাভিমুখমার্দঙ্গিকপাণবিক-দার্দরিকেষু গায়কগায়িকাবংশিকবৈণিকসহিতেষু অশিথিলায়তন্ত্রীবদ্ধান্তনিতেষু আতোদ্যেষু যথাগ্রামরাগমূর্ছনামার্জনাঙ্গুলিপ্তেষু মৃদঙ্গেষু ধারয়া নিপীড়িতনিগৃহীতার্থগৃহীতমুক্তপ্রকারকৃতেষু দর্দরবাদ্যমুখ্যবিন্যস্তহস্তৈঃ বাদনকৈর্দেবতানামাবাহনবিসর্জনার্থং প্রথমমেব ত্রিসামঃ কর্তব্যঃ। স তু সর্বসচরাচরোৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়কর্তুর্ব্রহ্মণোঽভিসন্ধেন প্রথমেন সাম্না বামপার্শ্বে চন্দ্রং সংপ্রীণয়তি দক্ষিণেন পন্নগান্ অর্ধান্তরেণ জলসাম্না মুনীনায়তেন বৃহৎসাম্না দৈবতেন চ—"।—নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ৩৩।২০৬। কাব্যমালা-সংস্করণে পাঠভেদ আছে।

১৭২। নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা সংস্করণ) ৩৪।১৯৮

তার উত্তরদিকে গায়করা, তাদের বামপার্শ্বে বীণাবাদকরা, তার দক্ষিণে বংশীবাদকরা এবং গানের (গায়কদের ?) দিকে মুখ ক'রে গায়িকারা বসত। এরই নাম কুতপবিন্যাস।

এক্ষণে 'ত্রিসাম' ('ত্রিসাম কর্তব্যঃ') বলতে আমরা বুঝি কি ? ত্রিসাম প্রণব বা ওঙ্কারেরই অভিন্ন রূপ। ওঙ্কার শব্দটিকে বিভাগ বা বিশ্লেষণ করলে অ+উ+ম এই তিনটি অক্ষর পাই। এই তিনটি অক্ষর সমস্ত বর্ণের (স্বর ও ব্যঞ্জন) ও যাবতীয় শব্দের প্রকাশক। বিচিত্র বর্ণের উচ্চারণ বা সকল শব্দ প্রকাশ করার সময় প্রথমে অকার দ্বারা আমাদের মুখ উন্মুক্ত হয়, পরে উকারে স্থিত ও পরিপুষ্ট এবং মকারে সমাপ্ত হয়। বর্ণ বা শব্দের উচ্চারণে যন্ত্র বা মাধ্যম-রূপ মুখের এই তিনটি অবস্থা আমরা লক্ষ্য করি। বর্ণই সকল শব্দের মূল। শব্দাত্মক জগৎ। সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে তাই বলা হয় নাদতনু শব্দব্রহ্ম। তন্ত্রসাহিত্যে শব্দাত্মিকা বিশ্বের রহস্যকথা বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। সঙ্গীতশাস্ত্রকাররা শব্দতত্ত্ববিষয়ে তন্ত্রকার ও বৈয়াকরণিকদের সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছেন। গায়ক ও বাদকরা ব্যক্ত ও অব্যক্ত শব্দতত্ত্বের সাধক। মুরজ, পণব, মৃদঙ্গ, পুষ্কর, বীণা, বেণু প্রভৃতি বাদ্যে শ্রুতিমধুর শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি হয়। গানেও তাই। তাই কুতপবিন্যাসে ত্রিসামের অনুষ্ঠান করার বিধি ছিল। ত্রিসামের অনুষ্ঠান অর্থে ত্রিসাম গান (?) করা বোঝায়। ত্রিসামের প্রকৃতি সম্বন্ধে ভরত উল্লেখ করেছেন,

> এবঞ্চ শ্রূয়তে যস্মাৎ ব্রহ্মাণং কেশবং শিবম্।
> তস্মাদেতৎ ত্রিসামং তু ঋষিভিঃ পরিকীর্তিতম্॥
> চতুর্নামপি বেদানামাদাবোঙ্কার উচ্যতে।
> তথাত্র সর্বগীতানাং ত্রিসাম পরিগীয়তে॥ [১৭৩]

ঋকাদি চার বেদে যাকে প্রণব বা ওঙ্কার বলে, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এই ত্রিত্ববাদের কারণ-রূপ ত্রিসাম নাট্য, গীত, বাদ্য ও নৃত্যে গান করা হ'ত। ত্রিসাম তিনটি অক্ষরের (অ+উ+ম) পরিণতি ব'লে তিনটি প্রকার, তিনটি কলা প্রভৃতি যুক্ত: "ত্রিবিধং সাক্ষরবিধিযুক্তং ** অকারশ্চ মকারশ্চ ত্রিকৈঃ ত্রিগুণিতং ভবেৎ"॥

ভরত উল্লেখ করেছেন কুতপবিন্যাসের পর ছন্দ ও অক্ষরের দ্বারা সাম্য

১৭৩। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সংস্কার) ৩৩।২০৭-২০৮

রক্ষা ক'রে (ছন্দসম ও অক্ষরসমের দ্বারা) বাদ্য আরম্ভ করা হ'ত। তখন বহির্গীত হিসাবে যবনিকায়[১৭৪] বাইরে আসারিত গান করা হ'ত ও তার সঙ্গে বাদ্যের সমাবেশ থাকত। এ'সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। ভরত নাট্যশাস্ত্রে বাদ্যাধ্যায়টি নাটকে ব্যবহৃত অভিনয়, গীতি ও নৃত্যের সহায়ক হিসাবে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে সঙ্গীতের আলোচনা ২৮শ—৩৩শ অধ্যায়গুলিতে বিশেষভাবে থাকলেও সমগ্র নাট্যশাস্ত্রের পাতাগুলিতেই তার কিছু-না-কিছু উপাদান ছড়িয়ে আছে। তাই নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীতের পরিচয় দিতে গেলে সমগ্র নাটশাস্ত্রই সকলের পড়া উচিত। নৃত্য সঙ্গীতের একটি অপরিহার্য অংশ। বিশেষ ক'রে ভরতের সময়ে নৃত্য, গীত ও বাদ্য তিনটিই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল, একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির সার্থকতা অনুভূত হ'ত না। ভরত নাট্যশাস্ত্রের তাণ্ডবলক্ষণপ্রকরণে (৪র্থ অধ্যায়ে) দু'রকম পূর্বরঙ্গবিধি, অঙ্গহার ও তার প্রয়োগ, ঋষি তণ্ডু কর্তৃক উল্লিখিত ৩২টি অঙ্গহার, ১০৮টি করণ ও তাদের প্রয়োগ, তাণ্ডববিধি, নৃত্যের প্রয়োজনীয়তা, বর্ধমানক ও আসারিতবিধি, গীতিছন্দকবিধি, নৃত্যপ্রয়োগবিধি প্রভৃতি কারিকায় বা আর্যাছন্দে পদের দ্বারা পরিচয় দিয়েছেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নাট্যশাস্ত্রের আলোচনাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন: 'থিয়েটারের এই বইয়ে নাচের অনেক কথা আছে। নাচের তিনটি অঙ্গ। প্রথম—অঙ্গহার, দ্বিতীয়—করণ ও তৃতীয় —নাট্য। ললিত অঙ্গভঙ্গির নাম 'অঙ্গহার'। দুই তিনটি অঙ্গহার একসঙ্গে

১৭৪। 'যবনিকা' শব্দটির উল্লেখ আমরা আগে কয়েকবার করেছি। কিন্তু এ'শব্দটির ধাতুগত বা আভিধানিক অর্থ নিয়ে কিছুটা মতভেদ আছে। আচার্য অভিনবগুপ্ত যবনিকার উল্লেখ ক'রে বলেছেন: "যবনিকা রঙ্গপীঠতচ্ছিরসোর্মধ্যে"। দামোদরগুপ্তও তাঁর 'কুট্টনীমতম্' গ্রন্থে যবনিকা-শব্দটির উল্লেখ করেছেন: "বভূব তূর্যবনিকান্তরিতে"। ডি. আর. মানকাদ তাঁর *Ancient Indian Theatre* পুস্তিকায় শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীসুশীলকুমার দে মহাশয়ের একটি অভিমত উদ্ধৃত ক'রে উল্লেখ করেছেন: "In this connection Dr. S. K. De writes to me: 'I have found in some Mss. and printed texts of some Sanskrit dramas, the word 'yavanikā' is given as yamanikā. * * I suppose that this is the true form of the word, as the word then etymologically would mean 'a covering or a curtain' from root *yam,* 'to restrain'." অনেকে 'যু'-ধাতু থেকে 'যুনোক্তি আবৃণোতি অনয়া ইতি' এভাবে যবনিকা-শব্দটির ধাতুগত অর্থ নিষ্পন্ন করেন।

করিলে তাহার নাম হইত 'করণ'। অনেকগুলি করণ একত্র হইলে 'নৃত্য' হইত।' চারী ও মহাচারীর সম্বন্ধে বলেছেন: 'জর্জর একটা ছেঁচা বাঁশ। তাহার ছেঁচা অংশ বাদ দিয়া ছয়টা পাব থাকিত। প্রত্যেক পাবে ভিন্ন ভিন্ন রঙ্‌ থাকিত। এই জর্জর হইল থিয়েটারের দেবতা। সূত্রধার জর্জরের পূজা করিতেন। তারপর জর্জরকে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হইত। তারপর সূত্রধার ষ্টেজের উপর নানাভঙ্গীতে পায়চারী করিতেন, তাহার নাম 'চারী' আর 'মহাচারী'। তারপর নান্দীপাঠ।'

ভরত উল্লেখ করেছেন: "হস্তপাদসমাযোগো নৃত্তস্য করণং ভবেৎ" (৪।৩০), অর্থাৎ হস্তপদের পারস্পরিক সহযোগ করণের রূপকে বিকশিত করে। করণ একশোটি: তলপুষ্পপুট, বর্তিত, বলিতোরু, অপবিদ্ধ, সমনখ, লীন, স্বস্তি-করেচিত, মণ্ডলস্বস্তিক, নিকুট্টক, অর্ধনিকুট্টক, কটিচ্ছি, অর্ধরেচিত, বক্ষঃস্বতিক, উন্মত্তস্বস্তিক, পৃষ্ঠস্বস্তিক, দিক্‌স্বস্তিক, অলাত, কটিসম, আক্ষিপ্তরেচিত, বিক্ষিপ্তাক্ষিপ্তক, অর্ধস্বস্তিক, অঞ্চিত, ভুজঙ্গত্রাসিত, উর্ধ্বজানু, নিকুঞ্চিত, মত্তল্লি, অর্ধমত্তল্লি, রেচকনিকুট্টিত, পাদাপবিদ্ধক, বলিত, ঘূর্ণিত, ললিত, দণ্ডপক্ষ, ভুজঙ্গত্রস্তরেচিত, নূপুর, বৈশাখরেচিত, ভ্রমরক, চতুর, ভুজঙ্গাঞ্চিতক, দণ্ডকরেচিত, বৃশ্চিককুট্টিত, কটিভ্রান্ত, লতাবৃশ্চিক, ছিন্ন, বৃশ্চিকরেচিত, বৃশ্চিক, ব্যংসিত, পার্শ্বনিকুট্টন, ললাটতিলক, ক্রান্তক, কুঞ্চিত, চক্রমণ্ডল, উরোমণ্ডল, আক্ষিপ্ত, তলবিলাসিত, অর্গল, বিক্ষিত আবৃত্ত, দোলপাদ, বিবৃত্ত, বিনিবৃত্ত, পার্শ্বক্রান্ত, নিশুম্ভিত, বিদ্যুদ্‌ভ্রান্ত, অতিক্রান্ত, বিবর্তিক, গজক্রীড়িতক, তলসংস্ফোটিক, গরুড়প্লুতক, গণ্ডসূচী, পরিবৃত্ত, পার্শ্বজানু, গৃধ্রাবলীনক, সন্নত (সংনত), সূচী, অর্ধসূচী, সূচীবিদ্ধ, অপক্রান্ত, ময়ূরললিত, সর্পিত, দণ্ডপাদ, হরিণপ্লুত, প্রেঙ্খোলিতক, নিতম্ব, স্খলিত, করিহস্তক, প্রসর্পিতক, সিংহবিক্রীড়িত, সিংহাকর্ষিত, উদ্বৃত্ত, অপসৃতক, তলসংঘট্টিত, জণিত, অবহিত্থক, নিবেশ, এলকাক্রীড়িত, উরুবৃত্ত, মদস্খলিতক, বিষ্ণুক্রান্ত, সম্ভ্রান্ত, বিষ্কম্ভ, উদ্ঘট্টিত, বৃষভক্রীড়িত, লোলিতক, নাগোপসর্পিত, শকটাস্য ও গঙ্গাবতরণ। ভরত নাট্যশাস্ত্রের ৪র্থ অধ্যায়ে (কাশী ও কাব্যমালা সংস্করণ) ৩৪-১৬৮ শ্লোকগুলিতে এই ১০৮টি করণের পরিচয় দিয়েছেন। যেমন তিনি বৈশাখরেচিত-করণ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন,

রেচিতৌ হস্তপাদৌ চ কটিগ্রীবৌ চ রেচিতৌ।
বৈশাখস্থানকেনৈতৎ ভবেদ্বৈশাখরেচিতম্॥ ৪।৯৭

কিংবা ললাটতিল-ককরণ—

বৃশ্চিকং করণং কৃত্বা পাদস্যাঙ্গুষ্ঠকেন তু।
ললাটে তিলকং কুর্যাল্ললাটতিলকং চ তৎ ॥ ৪।১১০

বৃশ্চিককরণ ক'রে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বারা ললাটে তিলক দেওয়ার নাম 'ললাট-তিলক'। বৃশ্চিককরণের পরিচয় হ'ল—

বাহু শীর্ষাঞ্চিতৌ হস্তৌ পাদঃ পৃষ্ঠাঞ্চিতস্তথা।
দূরসন্নতপৃষ্ঠং চ বৃশ্চিকং তৎপ্রকীর্তিতম্ ॥ ৪।১০৭

এ'ছাড়া ভরত ৩২ রকম অঙ্গহারের পরিচয় দিয়েছেন। অঙ্গহারে ছয়, সাত, আট বা ন'টি করণের সমাবেশ থাকে।[১৭৫] বত্রিশটি অঙ্গহারের নাম: স্থিরহস্ত, পর্যস্তক, সূচীবিদ্ধ, অপবিদ্ধ, আক্ষিপ্তক, উদ্ঘট্টিত, বিষ্কম্ভ, অপরাজিত, বিষ্কম্ভাপসৃত, মত্তাক্রীড়, স্বস্তিকরেচিত, বৃশ্চিক, ভ্রমর, মত্তস্খলিতক, মদবিলসিত, গতিমণ্ডল, পরিচ্ছিন্ন, পরিবৃত্তরেচিত, বৈশাখরেচিত, পরাবৃত্ত, অলাতক, পার্শ্বচ্ছেদ, বিদ্যুদভ্রান্ত, উদ্ধৃতক, আলীঢ়, রেচিত, আচ্ছুরিত, আক্ষিপ্তরেচিত, সম্ভ্রান্ত, উপসার্পিত ও অর্ধনিকুট্টক। এ'ছাড়া রেচক-পর্যায়ে পাদরেচক, কটীরেচক, হস্তরেচক, গ্রীবারেচক প্রভৃতির পরিচয়ও তিনি নাট্যশাস্ত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে দিয়েছেন। তাণ্ডবনৃত্যের পরিচয়ে ভরত উল্লেখ করেছেন মুনি তণ্ডু গান ও ভাণ্ডবাদ্য তথা পুষ্করবাদ্যের তালে তালে যে নৃত্য সৃষ্টি করেছিলেন তার নাম 'তাণ্ডব'।[১৭৬] কিংবদন্তী যে মুনি তণ্ডু সৃষ্টি করেছিলেন ব'লে নৃত্যের নাম হয়েছিল 'তাণ্ডব'। ভরতও একথার প্রতিধ্বনি ক'রে বলেছেন: "তস্য তণ্ডুপ্রযুক্তস্য তাণ্ডবস্য বিধিক্রিয়াম্" (৪।২৬৬)। মৃদঙ্গ বা পুষ্করবাদ্য ও বর্ধমানক-গীতির সঙ্গে তাণ্ডবনৃত্যের অনুষ্ঠান করার বিধি ছিল। ভরত তাণ্ডবকে শৃঙ্গাররস থেকে সৃষ্ট বলেছেন এবং এর প্রয়োগও সুকুমার—লীলায়িত গতিবিশিষ্ট।[১৭৭]

১৭৫। ষড়্‌ভির্বা সপ্তভির্বাপি অষ্টভির্নবভিস্তথা।
করণৈরিহ সংযুক্তা অঙ্গহারাঃ প্রকীর্তিতাঃ।
—নাট্যশাস্ত্র ৪।৩৩

১৭৬। সৃষ্ট্বা ভগবতা দত্তস্তাণ্ডিনে মুনয়ে তথা।
তাণ্ডিনাপি ততঃ সম্যগ্‌গানভাণ্ডসমন্বিতঃ।
নৃত্যপ্রয়োগঃ সৃষ্টো যঃ স তাণ্ডব ইতিস্মৃতঃ।
—নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ৪।২৫৭।২৫৮

১৭৭। সুকুমারপ্রয়োগস্তু শৃঙ্গাররসসংভবঃ।
—নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ৪।২৬৬

ভরতের সময়ে তাণ্ডবনৃত্য স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের জন্ত নির্বাচিত ছিল একথা আমরা পূর্বেও আলোচনা করেছি। ভরত তাণ্ডব ও লাস্তকে সমপর্যায়ভুক্ত বলেছেন।[১১৮] পরবর্তীযুগে তাণ্ডব ও লাস্তকে নৃত্যভেদে পৃথক ক'রে তাণ্ডবকে পুরুষের ও লাস্তকে নারীর জন্ত নির্বাচিত করা হয়েছিল। সুতরাং তাণ্ডব নারীর পক্ষে নিষিদ্ধ হওয়ায় সমাজশাস্ত্রীরা তখন সেই নৃত্যকে পুরুষেরই করণীয় ব'লে বিধান দিয়েছিলেন। ভরত কিন্তু তা করেন নি। বর্ধমানক, মদ্রক প্রভৃতি নিবদ্ধ-গীতের বেলায় ভরত বলেছেন যে গান শৃঙ্গাররসের সঙ্গে সম্পর্কিত তাতে নির্বিচারে স্ত্রী ও পুরুষের সমান অধিকার। তাণ্ডবও শৃঙ্গাররস থেকে উদ্ভূত, সুতরাং তা স্ত্রী ও পুরুষের পক্ষে সমানভাবে অনুষ্ঠেয়। নৃত্যের প্রয়োগবিধির প্রসঙ্গে কোথায় কিভাবে কোন্ নৃত্যের বিকাশসাধন করা উচিত ভরত তারও পরিচয় দিয়েছেন। উপাঙ্গবিধানে (৮ম অধ্যায়) শিরঃকর্ম, দৃষ্টি, নাসাকর্ম, ভ্রূর কর্ম, তারাপুটের কর্ম, গণ্ডভেদ, ওষ্ঠলক্ষণ, চিবুককর্ম, গ্রীবাকর্ম প্রভৃতিরও আলোচনা করেছেন। নাট্যাভিনয়ের মতো নৃত্যে হস্তমুদ্রার একান্ত প্রয়োজন। মনের বৃত্তি বা ভাবগুলিকে ইঙ্গিতে প্রকাশ করার জন্ত হস্তাভিনয় বা হস্তমুদ্রার উপযোগিতা। ভরত নাট্যশাস্ত্রের ৯ম অধ্যায়ে ২০৭টি শ্লোকে (কাশী-সংস্করণ) পতাক, ত্রিপতাক, কর্তরীমুখ, অর্ধচন্দ্র প্রভৃতি ২৪টি অসংযুতহস্ত ও অঞ্জলি, কপোত, কর্কট, স্বস্তিক প্রভৃতি ১৩টি সংযুতহস্ত, বিভিন্ন হস্তপ্রচার, নৃত্তাশ্রয়-হস্ত ও দশ রকম বাহুপ্রচারের পরিচয় দিয়েছেন। এ'ছাড়া তিনি ১১শ অধ্যায়ে চারী, মহাচারী, ১২শ অধ্যায়ে আকাশ ও ভৌম তথা পৃথিবীগামী এই দু'রকম মণ্ডল, ১৩শ অধ্যায়ে রসাদুবিদ্ধ গতিপ্রচার প্রভৃতির বিবরণ দিয়েছেন,। চারী, করণ, খণ্ড ও মণ্ডল এ'গুলি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, একটি অপরটির ওপর নির্ভর করে। ভরত এগুলির পরিচয় দিয়ে বলেছেন,

এবং পাদস্য জঙ্ঘায়া ঊর্বো কট্যাস্তথৈব চ।
সমানকরণাচ্চেষ্টা সা চারীত্যভিধীয়তে ॥

* * * *

একপাদপ্রচারো যঃ সা চারীত্যভিসংজ্ঞিতা।
দ্বিপাদক্রমণং যত্তু করণং নাম তদ্ভবেৎ ॥

১১৮। অভিনবভারতীতে অভিনবগুপ্তও উল্লেখ করেছেন: "তাণ্ডববিধিরিতি সর্বং নৃত্যমুচ্যতে লাস্যপক্ষেন সন্নিধৌ গৌৰলীবৰ্দ্দন্যায়েন প্রবর্ততে * *"।

কয়ণানাং সমাযোগাৎ খণ্ডমিত্যভিধীয়তে।
খণ্ডৈঃ ত্রিভিশ্চতুর্ভিবা সংযুক্তং মণ্ডলং ভবেৎ॥
চারিভিঃ প্রস্তুতং নৃত্তং চারিভিশ্চেষ্টিতং তথা।
চারিভিঃ শস্ত্রমোক্ষশ্চ চার্যো যুদ্ধে চ কীর্তিতাঃ॥[১৭৯]

পাদ, জঙ্ঘা, উরু, কটি (বা কটী) এই অঙ্গগুলির একত্রীকরণের নাম 'চারী'। একটি পায়ের প্রচার (প্রচেষ্টা) হ'লেও তাকে 'চারী' বলে। দু'টি পায়ের চেষ্টাকে 'করণ', সমস্ত করণকে একত্র করার নাম 'খণ্ড' এবং তিনটি বা চারটি খণ্ডকে সমবেত করার নাম 'মণ্ডল'। চারীকে বাদ দিয়ে মণ্ডলের প্রয়োগ হয় না: "চারীসংযোগ-জানীহ মণ্ডলানি"। ভরত ১২শ অধ্যায়ে অতিক্রান্ত, বিচিত্র, সূচীবিদ্ধ প্রভৃতি মণ্ডলের পরিচয় দিয়েছেন (২-৫৭ শ্লোক)। অঙ্গ-মাধুর্য ও বিচিত্র বাদ্যের সঙ্গে মণ্ডলবিধি প্রয়োগ করা হ'ত।

অনেকে চারী, অঙ্গহার, হস্তমুদ্রা, করণ, মণ্ডল প্রভৃতির প্রাচীনত্ব নাট্যশাস্ত্রের-আগে (পূর্বযুগে) স্বীকার করতে চান না। তাছাড়া কারু কারু মতে অঙ্গহার প্রভৃতি নৃত্যের অপরিহার্য উপাদান ভরতেরও অনেক পরেকার যুগে বিকাশ লাভ করেছিল। কিন্তু খৃষ্টপূর্ব যুগে নৃত্য ও অভিনয়ে অঙ্গহার, চারী, করণ প্রভৃতির যে প্রয়োগ ও প্রচলন ছিল রামায়ণ, মহাভারত ও হরিবংশে সঙ্গীতের আলোচনায় তার আমরা যথেষ্ট নিদর্শন পেয়েছি। বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে হস্তমুদ্রাদির ব্যবহার ছিল দেবতাদের আবাহন, বিসর্জনাদি অনুষ্ঠানের প্রতীকহিসাবে। তাছাড়া ব্রাহ্মণাদি সাহিত্যে যজ্ঞানুষ্ঠানে ঋত্বিক্‌পত্নীদের পিচ্ছোরাবীণার বাদন ও নৃত্যের প্রমাণও পেয়ে থকি। বৌদ্ধজাতকে নৃত্য ও অভিনয়ের চাক্ষুষ নিদর্শন আমরা পেয়েছি। ভরত যে নাট্য ও নৃত্যের উপকরণ পূর্বগ আচার্যদের গ্রন্থ থেকে আহরণ ক'রে তাঁর নাট্যশাস্ত্রকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছিলেন সেকথাও তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীঅর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর *A New Document of Indian Dancing* নামক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে তক্ষশিলার ধ্বংসস্তূপ থেকে 'ঊর্ধ্বতাণ্ডব'-ভঙ্গিতে একটি নটমূর্তি পাওয়া গেছে যা প্রমাণ করে আনুমানিক ৫ম বা ৪র্থ খৃষ্টপূর্বাব্দে (?) মৌর্যযুগের পূর্ববর্তী সমাজে শাস্ত্রীয় ধারার অনুসরণ ক'রে বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে নৃত্যকলার অনুশীলন করা হ'ত। একটি

১৭৯। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ১১।১-৫

চতুষ্কোণ পাথরের চারপাশে কারুকার্য করা, তার উভয় দিকে কতকগুলি মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। দু'টি মূর্তির হাতে বাদ্যযন্ত্র ও তারা বাদ্যরত। একটি মূর্তি মাথায় পেটিকার মতো জিনিস বহন করছে এবং আর একটি ভঙ্গমূর্তি (নটমূর্তি ?) বিশুদ্ধ করণ আশ্রয় ক'রে ঊর্ধ্বদিকে একটি পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নিজের ললাটে স্পর্শ করিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই 'ঊর্ধ্বতাণ্ডব'-করণটির সঙ্গে ভরতের নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত 'ললাটতিলক'-করণের হুবহু মিল আছে। ভরতের ললাটতিলক-করণটির (নাট্যশাস্ত্র, কাশী-সংস্করণ ৪।১১০) পরিচয় আমরা আগেই দিয়েছি। বৃশ্চিককরণ ক'রে পদের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা ললাটদেশে তিলকদানের ভঙ্গিই 'ললাটতিলক'-করণ : "বৃশ্চিকং করণং কৃত্বা পাদস্যাঙ্গুষ্ঠকেন তু, ললাটে তিলকং কুর্যাল্ললাটতিলকং চ তৎ"। চতুষ্কোণ প্রস্তরখণ্ডটি তক্ষশিলার যাদুঘরে রক্ষিত আছে। বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক স্যার জন. মার্শাল ইংরাজী ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে যখন তক্ষশিলার ভীর-মণ্ড-ধ্বংসস্তূপের খননকার্যে নিযুক্ত তখন সেই প্রস্তরখণ্ডটি আবিষ্কার করেন।[১৮০] প্রস্তরখণ্ডে মূর্তিগুলির বৈশিষ্ট্যের দিকে বিশেষ কারু লক্ষ্য পড়েছিল ব'লে মনে হয় না। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার বিবরণীতেও অতি সামান্যভাবেই তার উল্লেখ ছিল। তক্ষশিলার ধ্বংসস্তূপ থেকে পাওয়া বিভিন্ন মূর্তি ও অন্যান্য উপাদানকে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা হেলেনীয় সভ্যতারও আগেকার যুগের নিদর্শন ব'লে মন্তব্য করেছেন। প্রস্তরখণ্ডের কারুকার্য সম্পূর্ণ ভারতীয় ধরণের। তক্ষশিলার ঊর্ধ্বতাণ্ডব-মূর্তিটির সঙ্গে তাঞ্জোরের তিরুপ্পণ্ডল ও চিদাম্বরম্ এই মন্দির-দু'টিতে

১৮০। ভীর-মণ্ড সম্বন্ধে স্যর জন,-মার্শাল উল্লেখ করেছেন :

"In concluding this description of the ancient monuments of Taxila, it remains to mention a few finds made in the Bhir Mound—the earliest of the three city sites. In this city digging operations have hitherto been limited to trial trenches and pits, * *. The remains disclosed in this and other trenches comprise sections of streets and houses built of rough rubble masonry and apparently analogous to but earlier than, those in Sirkap. The smaller antiquities include potteries, terracotta figurines of primitive workmanship, coins and jewellery. * * The coin of Antiochus and the local punch-marked coins point to the latter half of the 3rd century B.C. as the time when this jewellery was hidden in the ground * *. Most of these antiquities appear to belong to the period of the Maurya occupation, when the city of Taxila was undoubtedly situated on the Bhir Mound."—*A Guide to Taxila* (1921), pp. 123-125.

উৎকীর্ণ উর্ধতাণ্ডবভঙ্গিতে শিব-নটরাজের ললিত মূর্তির হুবহু মিল আছে।[১৮১] শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বলেন ভারতীয় নৃত্য-গীতের নিদর্শন হিসাবে বারহুতে (খৃষ্টপূর্ব ২য় শতক) অপ্সরাদের লীলায়িত নৃত্যছন্দ, উড়িষ্যার উদয়গিরিগুহার রাণীগুম্ফায় (খৃষ্টপূর্ব ১ম শতক) নটনটীদের নর্তনমূর্তি, অমরাবতীতে (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) নৃত্যরত নট ও নটীদের মূর্তি নিঃসন্দেহে তদানীন্তন কালের সমাজে নৃত্য-গীতের অনুশীলনের কথা প্রমাণ করে। কিন্তু তক্ষশিলার ধ্বংসস্তূপ থেকে আবিষ্কৃত উর্ধতাণ্ডবভঙ্গিতে নটমূর্তিটি আরো চাক্ষুষভাবে প্রমাণ করে যে ভরতের নাট্যশাস্ত্র-প্রবর্তিত নৃত্য ও তার করণাদি উপকরণের অনুশীলন হবার অনেক আগেই (খৃষ্টপূর্ব ৫ম বা ৪র্থ শতক) ভারতীয় সমাজে শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুযায়ী নৃতচর্চা অব্যাহত ছিল। তিনি উল্লেখ করেছেন :

"But our Terra-Cotta from Taxila offers very tangible evidence that this peculiar pose must have been practised several centuries before the Christian Era. The traditions of Indian Dance Art had disappeared from the North, surviving in the practices of the gilds of dancers under

১৮১। "To this interesting series of lithic documents in support of the antiquity of the Indian Art of Dancing—it was my good fortune to add a piece of evidence. It is the identification of a very early Terra-Cotta containing a Dance-motif, from the Taxila Museum, hitherto unnoticed except in the meagre mention of it in the excavation Report. It is a rectangular piece of Terra-Cotta,-obviously, a vocative tablet (of Pre-Mauryan date—about the 5th or 4th century B.C.). The Bhiṛ-Mound site at Taxila was excavated by Sir John Marshall in 1913, and the finds from this site are admitted by official archaeologists as belonging to Pre-Helenistic times. This is further established by the characteristically Indian motifs of the decorations of this piece. Amongst the plan motifs occur several human figures, two playing on musical instruments, one, a caryatid figure carrying a basket on its head, and another figure, in a peculiar dance-pose (*vaṅga*) poised on one leg and throwing up the other leg to touch the head. This turn (*karaṇa*) is codified in the Nātyaśāstra (ch. IV. Verse, 110) as the Lalāta-Tilaka posture, a stance composed out of a *vriṣchika* pose, with one of the legs thrown up to offer by means of the big toe a *tilaka* (auspicious mark on the fore-head—*lalāta*)."—Vide *Music Centre News* (A Monthly Bulletin from the Uday Shankar India Culture Centre, Almora), April 15, 1943, V. 5, No. 50, p. 1.

the active patronage of South Indian Temple Foundations. The Bhir-Mound Slab appears to prove that it was assiduously practised, also in the Northern regions, and evidently from very remote antiquity. It incidently establishes the fact that the various *karaṇas* codified in the text of Bharata's *Nātyaśāstra* has centuries of practice in the current performances of dancers before they were systematized under significant names in a demonstration given me to at Tanjore in 1907 by a Dance-Tutor (Nātyāchārya=Nattua) exemplifying the difficult turn."[১৮২]

নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীতের আলোচনায় অভিনয়, নৃত্য, অঙ্গহার, চারী, মুদ্রা ও মণ্ডলাদির বিবরণ গৌণ হ'লেও সঙ্গীতকলার সঙ্গে তারা অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত ব'লে তাদের কিছুটা পরিচয় সঙ্গীতের পথচারীমাত্রেরই জানা উচিত। ভারতীয় সঙ্গীতের আলোচনার ক্ষেত্রে নাট্যশাস্ত্রের স্থান অতীব উচ্চে। বৈদিক সাহিত্যের মাধ্যমে যেমন সামগানের রূপ ও বিকাশ সম্বন্ধে আমরা কিছুটা ধারণা করতে পারি তেমনি ক্ল্যাসিক্যাল যুগের গান্ধর্ব-সঙ্গীত যে বৈদিক সঙ্গীতের মালমশলা নিয়ে নতুন রূপে ও ভাবে গড়ে উঠেছিল তার সকল-কিছুর সন্ধান পাই মুনি ভরতের নাট্যশাস্ত্র থেকে। রাজা নান্যদেব তাঁর 'ভরতভাষ্যম্' বা 'সরস্বতী-হৃদয়ালঙ্কার' ও আচার্য অভিনবগুপ্ত 'অভিনবভারতী' ভাষ্য টীকাদি রচনা করেছেন নাট্যশাস্ত্রের মর্মকথাকে প্রকাশ করার জন্য। ভরতের সমসাময়িক ও তাঁর পরবর্তীকালের সঙ্গীতশাস্ত্রী দত্তিল, কোহল, যাষ্টিক, বিশ্বাখিল, মতঙ্গ, আঞ্জনেয়, পার্শ্বদেব, শার্ঙ্গদেব প্রভৃতি সকলেই নাট্যশাস্ত্রের ভাষ্য রচনা করেছেন বল্লে মোটেই অসমীচীন হবে না মনে করি। নাট্যশাস্ত্রের আলোচনা নাট্যামোদী, নৃত্য ও সঙ্গীতশিল্পীদের দরবারে বিশেষভাবে না থাকায় গ্রন্থখানি এখন অবরুদ্ধ পেটিকা বা 'sealed box'-এর আকারে আমাদের কাছে প্রতিভাত। অথচ নাট্যশাস্ত্রের আলোচনা ও অনুশীলনকে বাদ দিয়ে নাট্যে, নৃত্যে ও অভিনয়ে ভারতীয় আদর্শ-প্রকোষ্ঠের চাবীকাঠি খোলা অসম্ভব। ললিতকলা-রূপ অভিনয় ও

১৮২। Vide *Music Centre News,* Rānidhara, Almora, April, 15, 1943, V. 5, No. 50, p. 2.

সঙ্গীতের সকল-কিছু উপাদানই বীজাকারে নাট্যশাস্ত্রে নিহিত আছে, আর পরবর্তী শাস্ত্রী ও কলাবিদ্‌রা তাকেই ফলফুলশোভিত বৃক্ষে পরিণত করেছেন।

নাট্যশাস্ত্র-রচনায় ভরত স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন নাট্য, গীত ও নৃত্যের তিনি স্রষ্টা নন, পূর্বপূর্ব আচার্যদের অনুসরণকারীমাত্র। নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে রসের আলোচনায় তিনি উল্লেখ করেছেন,

অহং চ কথয়িষ্যামি নিখিলেন তপোধনাঃ।
সংগ্রহং কারিকাং চৈব নিরুক্তং চ যথাক্রমম্ ॥
* * * *
নাট্যস্যাস্য প্রবক্ষ্যামি রসভাবাদিসংগ্রহম্।
বিস্তরেণোপদিষ্টানামর্থানাং সূত্রভাষ্যয়োঃ ॥
নিবন্ধো যঃ সমাসেন সংগ্রহং তং বিদুর্বুধাঃ ॥
রসা ভাবা হ্যভিনয়া ধর্মী-বৃত্তি-প্রবৃত্তয়ঃ।
সিদ্ধিস্বরাস্তথাতোদ্যং গানং রঙ্গং চ সংগ্রহঃ ॥
* * * *
ত্রয়োদশবিধো হ্যেষা হ্যাদিষ্টো নাট্যসংগ্রহঃ ॥

রস, অভিনয়, ধর্মী (অভ্যাস), বৃত্তি, সিদ্ধি, স্বর, বাদ্যযন্ত্রাদি (আতোদ্য), গীত, রঙ্গ প্রভৃতি তেরোটি উপাদান ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাভরত-রচিত নাট্যবেদের 'সংগ্রহ'। 'সংগ্রহ' শব্দের প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বিবৃতি উল্লেখযোগ্য। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন: "'বৃত্তি' বলিয়া নাটকের আর একটা জিনিস ছিল। সেটা লেখার ভঙ্গি, অভিনয়ের ভঙ্গি, কিরূপ শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে, কোথায় করিতে হইবে না। * * আর 'সিদ্ধি' মানে যাহাতে রস জন্মে। * * আর সিদ্ধি—যখন রস জমিয়া ওঠে, করুণরসে হা-হুতাশ করে অথবা হাস্যরসে হাসিয়া গড়াইয়া উঠে * *। ভরত মুনিকে মুনিরা ৫টি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে ৫টি প্রশ্ন এই—যাহারা নাট্যশাস্ত্রের সমঝদার তাহারা রস কাহাকে বলে এবং কি হইলে রস হয়, ভাব কাহাকে বলে এবং তাহাতে কি ভাবাইয়া দেয়, সংগ্রহ কাহাকে বলে, কারিকা কাহাকে বলে, নিরুক্ত কাহাকে বলে। এ' ৫টি কথা শুনিয়া ভরত মুনি উত্তর দিলেন। সে উত্তরটি ৫-এর শ্লোক হইতে ৩২-এর শ্লোক পর্যন্ত (?)। * * নটসূত্রের মধ্যে রসসূত্র আরম্ভ নামে তিনি এক নাটক লিখিয়াছেন এবং নিজে তাহার অভিনয় শিখাইয়াছিলেন। * * সুতরাং ভরতের একখানি নটসূত্র ছিল

বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারি। ভরতের আরো একখানি সূত্র ছিল (?)। সেখানির কথা ভবভূতি উত্তররামচরিতের ৬ষ্ঠ অঙ্কের বিষ্কম্ভকে বলিয়া গিয়াছেন। সেখানির নাম 'তৌর্যত্রিকসূত্র' অর্থাৎ বাজনার সূত্র। * * এখন কথা হইতেছে নটসূত্র কাহাকে বলে? পাণিনি আপনার সূত্রে দুইখানি নটসূত্রের নাম করিয়াছেন। দুইখানিই ঋষি 'প্রোক্ত' অর্থাৎ কাহারও রচিত নয়, কৃত নয়। 'প্রোক্ত' গ্রন্থের কথা কহিয়া তাহার পর পাণিনি 'কৃত' গ্রন্থের কথা বলিয়াছেন। পূর্বাপর চলিয়া আসিতেছিল, কোন ঋষি সেগুলি বলিয়া গিয়াছেন তাহার নাম 'প্রোক্ত' আর নিজের মাথা থেকে রচনা করা হয়েছে যাহা তাহার নাম 'কৃত'। * * সূত্রকে ভাষায় ব্যাখ্যা করার নাম 'ভাষ্য'। * * সূত্র ও ভাষ্যে যে সকল জিনিস বিস্তার করিয়া বর্ণনা করা আছে সংক্ষেপে সেই সকল কথা বলার নাম 'সংগ্রহ'। রস, ভাব, অভিনয়, পাত্র, বৃত্তি, প্রবৃত্তি, সিদ্ধি, স্বর, বাজনা, গান—এই হইল রঙ্গের সংগ্রহ। অর্থাৎ এই সকল কথাই নাট্যশাস্ত্রে আছে।

"কারিকা কাহাকে বলে? সূত্রে ও ভাষ্যে যে জিনিস বিস্তার করিয়া লেখা আছে, সেই জিনিস ছোট করিয়া একটি দু'টি শ্লোকে বলার নাম 'কারিকা'। * * 'নিরুক্ত' কাহাকে বলে? নিরুক্ত শব্দের অর্থ ব্যুৎপত্তি। ধাতুর উত্তর প্রত্যয় করিয়া যে শব্দ সাধন হয় তাহার নাম 'ব্যুৎপত্তি', তাহারই নাম 'নিরুক্তি'। কিন্তু এখানে নিরুক্ত বলিতে আরও একটু বেশী বুঝায়। ইহাতে কতকটা ব্যাখ্যা বুঝায়, কতকটা সিদ্ধান্ত বুঝায়, কতকটা অন্য অন্য প্রমাণ দেওয়া বুঝায়। * * 'নট' বলিতে একটা পেশা বুঝায়। একটা পেশা থাকিলেই নাটক যে তখন অনেক ছিল একথা অনুমান করিয়া লইতে পারি। তাহা হইলে একথা আমরা বলিতে পারি যে, পাণিনির অনেক পূর্বেও নট বলিয়া একটা পেশা ছিল এবং বহুসংখ্যক নাটক লেখা হইয়াছিল। * * এবং 'প্রোক্ত' হইতে আমরা বুঝিতে পারি যিনি লিখিয়াছেন বা বলিয়াছেন তাঁহার পূর্বেও নটদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল, সেই চেষ্টাগুলিকে একত্র করিয়া শিলালী ও কৃশাশ্ব সূত্রগ্রন্থ বলিয়া গিয়াছেন। * * দুইজন প্রোক্ত করিয়াছেন। সুতরাং দুইজনকে ২০০ বৎসর দিতে হয়। তাঁহারাও আবার নিজের কথা লেখেন নাই, পুরাণো কথা লিখিয়াছেন। তাহার আগেও নাটক ছিল, কেননা 'নট' বলিয়া একটা পেশাই হইয়া গিয়াছে। এখন আমাদের নাটকের আদি কোথায়?'[১৮৩]

১৮৩। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী: 'ভরতের নাট্যশাস্ত্র', পঞ্চপুষ্প, আষাঢ়, ১৩৩৬

ভরত ও তাঁর ভাষ্যকারগণ সকলেই ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাভরতকে নাট্যসূত্র বা নাট্যশাস্ত্রের প্রবর্তক বলেছেন, আর তারি জন্য তাঁর নাট্যশাস্ত্রকে বেদের সম্মান দিয়ে তাঁরা 'নাট্যবেদ' বলেছেন। পাণিনির আগে কৃশাশ্ব ও শিলালির 'নটসূত্র' যে ব্রহ্মার নাট্যবেদেরই অনুবর্তন নয়, তা কে বলতে পারে। তাছাড়া পরবর্তী শাস্ত্রকাররা প্রামাণিক পূর্বাচার্যদের গ্রন্থকেই প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেন। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে কৃশাশ্ব, শিলালি বা পাণিনির কিন্তু কোন নামগন্ধ নাই। তারপর বৈদিকযুগের পরেই ও ক্ল্যাসিক্যাল যুগের প্রারম্ভে গান্ধর্বগানের প্রচলন হয় ও তার সংগ্রাহক বা স্রষ্টা ও প্রবর্তক দ্রুহিণ-ব্রহ্মা। সুতরাং ব্রহ্মা বা ব্রহ্মা-ভরতকেই আমরা গান্ধর্ব-সঙ্গীতের মতো নাট্যাভিনয়েরও আদিপ্রবর্তক ও রচয়িতা হিসাবে গ্রহণ করব।

ভরত বলেছেন রস ও ভাবই অভিনয় ও সঙ্গীতের প্রাণ। তিনি আটটি রস ও তাদের আট রকম স্থায়িভাবের উপযোগিতার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে শৃঙ্গার আদিরস, কেননা রতি তার স্থায়িভাব: "রতিস্থায়িভাবপ্রভব"। শান্তরসের স্থায়িভাব না থাকায় ভরত তাকে রস হিসাবে গ্রহণ করেন নি। অভিনবভারতীতে অভিনবগুপ্ত বলেছেন: "অতএব শান্তস্য স্থায়িত্বেঽপ্য-প্রাধান্যম্"।[১৮৪] পণ্ডিত লক্ষ্মীধর উল্লেখ করেছেন: 'বিক্রিয়াজনকা এব রসা ইতি অষ্টৌ রসা ভরতমতে। 'শান্তস্য নির্বিকারত্বাৎ ন শান্তং মেনিরে রসম্' ইতি শান্তস্য রসাত্বাভাবাৎ অষ্টাবেব রসাঃ সঙ্গৃহীতাঃ।" সারদাতনয় 'ভাবপ্রকাশন' গ্রন্থে শান্তরসের উপযোগিতা বা সার্থকতা প্রতিপন্ন করেছেন। কিন্তু তাঁর যুক্তি সুদৃঢ় নয়। তিনি প্রথমে বলেছেন মোক্ষ দান করে ব'লে শান্ত 'রস' হিসাবে গণ্য এবং তার বিভাবও আছে; কিন্তু পর মুহূর্তেই তিনি আবার শান্তরসের বিভাব অস্বীকার করেছেন, কাজেই তার যুক্তি বিকলাঙ্গবিশেষ। ধনিক তাঁর 'দশরূপকাবলোক' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: "যত্তু কৈশ্চিন্নাগানন্দাদৌ শমস্য স্থায়িত্বমুপবর্নিতম্, তত্তু মলয়বত্যনুরাগেণ আপ্রবন্ধপ্রবৃত্তেন * *। অতো

১৮৪। অভিনবগুপ্ত ভরত-সমর্থিত আটটি রসের পক্ষপাতী। কিন্তু ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে তিনি যেন নবরস হিসাবে শান্তের দিকে একটু নমনীয় হয়েছেন: "এতে নবৈব রসাঃ, পুমর্থোপযোগিত্বেন, রঞ্জনাধিক্যেন বা ইয়ন্তামেব উপদেশ্যত্বাৎ। তেন রসান্তরসম্ভবেঽপি * *।" ভোজরাজও তাই। তিনি "শৃঙ্গারবীরকরুণরৌদ্রাদ্ভুতভয়ানকাঃ" প্রভৃতি শ্লোকে আটটি রসের পক্ষপাতী, কিন্তু এই রসগুলির 'বিশেষ' অর্থাৎ শৃঙ্গারাদি রস থেকে অধিক হিসাবে শান্ত, উদাত্ত ও উদ্ধত রসগুলিও স্বীকার করেছেন: "শান্তোদাত্তোদ্ধতা রসাঃ"—সরস্বতীকণ্ঠাভরণ ৫।১৬৪

দয়াবীরোৎসাহস্যাত্র স্থায়িত্বম্। তত্রৈব শৃঙ্গারস্য অঙ্গত্বেন চক্রবর্তিত্বাদেশ্চ ফলত্বেন অবিরোধাৎ * *।" মোটকথা ধনিক শৃঙ্গারের মতো শম বা শান্তরসের উপযোগিতা পাকেপ্রকারে স্বীকার করেছেন। কিন্তু ভরত নাট্যশাস্ত্রে শৃঙ্গারাদি আটটি রসই স্বীকার করেছেন, শান্তকে তিনি রস হিসাবে গ্রহণ করেন নি। শান্ত প্রধান রসপর্যায়ে উন্নীত হয়েছে পরবর্তীকালে। বৈষ্ণব-আলঙ্কারিকেরা আবার নির্বিচারে শম বা শান্তকেই প্রধান রস হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে কাব্যমালা-সংস্করণ-নাট্যশাস্ত্রে নবরসের পরিচয় দেওয়া আছে, কিন্তু কাশী-সংস্করণে তার কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং কাব্যমালা-সংস্করণ-নাট্যশাস্ত্রের অধিক পাঠটি পরবর্তীকালের প্রক্ষিপ্ত ব'লে মনে হয়।[১৮৫] কেননা রস-প্রসঙ্গে আলোচনার মধ্যে সেখানে যথেষ্ট অসংগতি দেখা যায়। যেমন রসের পরিচয়ে উল্লেখ করা হয়েছে,

শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ রসা স্মৃতাঃ॥

"চেত্যোষ্টৌ রসা স্মৃতাঃ" স্বীকারোক্তির পর আবার বলা হয়েছে "এবং নবরসা

১৮৫। কাব্যমালায় অধিক পাঠ যথা: 'অথ শমো নাম শমস্থায়িভাবাত্মকো মোক্ষপ্রবর্তকঃ। স তু তত্ত্বজ্ঞানবৈরাগ্যাশয়শুদ্ধ্যাদিভির্বিভাবৈঃ সমুৎপদ্যতে। তস্য যমনিয়মাধ্যাত্মধ্যানধারণোপাসন-সর্বভূতদয়ালিঙ্গগ্রহণাদিভিরনুভাবৈরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ। ব্যভিচারিণশ্চাস্য নির্বেদস্মৃতিধৃতি-সর্বাশ্রমশৌচস্তম্ভরোমাঞ্চাদয়ঃ। অত্রার্যাঃ শ্লোকাশ্চ ভবন্তি—

মোক্ষাধ্যাত্মসমুত্থস্তত্ত্বজ্ঞানার্থহেতুসংযুক্তঃ।
নৈঃশ্রেয়সোপদিষ্টঃ শান্তরসো নাম সংভবতি॥
বুদ্ধীন্দ্রিয়কর্মেন্দ্রিয়সংরোধাধ্যাত্মসংস্থিতোপেতঃ।
সর্বপ্রাণিসুখহিতঃ শান্তরসো নাম বিজ্ঞেয়ঃ॥
ন যত্র দুঃখং ন সুখং ন দ্বেষো নাপি মৎসরঃ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু স শান্তঃ প্রথিতো রসঃ॥
ভাবা বিকারা রত্যাদ্যাঃ শান্তস্তু প্রকৃতির্মতঃ।
বিকারঃ প্রকৃতের্জাতঃ পুনস্তত্রৈব লীয়তে॥
স্বং স্বং নিমিত্তমাসাদ্য শান্তাদ্ভাবঃ প্রবর্ততে।
পুনর্নিমিত্তাপায়ে চ শান্ত এবোপলীয়তে॥
এবং নবরসা দৃষ্টা নাট্যজ্ঞৈর্লক্ষণান্বিতাঃ।
ইতি শান্তরসপ্রকরণম্।

—নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা) ৬।৭৮-৮৩

দৃষ্ট্বা নাট্যজ্ঞৈর্লক্ষণান্বিতাঃ"। "অথ শমো নাম" প্রভৃতি শ্লোকে শম শান্তরসেরই অভিন্ন নাম। অভিনবগুপ্ত 'শম' অর্থে 'আত্মস্বভাব' 'তত্ত্বজ্ঞানং' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন। ভরত শৃঙ্গারের পরিচয় দেবার সময় 'বিপ্রলম্ভকৃতন্তু নির্বেদগ্লানিশঙ্কাসূয়া * *' প্রভৃতি কথার প্রসঙ্গে নির্বেদ তথা বৈরাগ্য বা তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় উল্লেখ করলেও তা আসলে অনুভাব বা অঙ্গভাব হিসাবে গণ্য, কিন্তু তিনি প্রধান বা আদিরস হিসাবে শৃঙ্গারের নাম উল্লেখ করেছেন।

প্রত্যেকটি রসের আবার স্থায়িভাব থাকা দরকার, কেননা স্থায়িভাব বা স্থায়ি সঞ্চারিভাবের দ্বারাই রস সার্থক ও পরিপুষ্ট হয়। শৃঙ্গারাদি আটটি রসের স্থায়িভাব হ'ল: রতি, হাস বা হাস্য, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময়। ভরত উল্লেখ করেছেন,

রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেতি স্থায়িভাবাঃ প্রকীর্তিতা॥[১৮৬]

ভরত বলেছেন তিনি রস ও ভাবাদির পরিচয় দিয়েছেন দ্রুহিণ-ব্রহ্মা তথা ব্রহ্মাভরতের নাট্যবেদকে অনুসরণ ক'রে: "এতে হ্যষ্টৌ রসাঃ প্রোক্তা দ্রুহিণেন মহাত্মনা"। এ'থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় যে শাস্ত্রী ও গান্ধর্বসাধক ব্রহ্মা নাট্য, গীত, নৃত্য ও বাদ্য প্রভৃতির মতো রস ও ভাবের পূর্ণ-পরিচয় দিয়েছিলেন খৃষ্টপূর্বাব্দ সমাজে। তাঁর রচিত নাট্যগ্রন্থ এখন লুপ্ত হ'লেও মুনি ভরতের নাট্যশাস্ত্র-রূপ স্বচ্ছ দর্পণে তা সুপরিস্ফুটভাবে প্রতিফলিত। প্রতিফলন বা প্রতিবিম্ব বিম্বেরই প্রকাশক, ছায়া কায়ারই প্রতিচ্ছবি। ভরত তাই নিজের নাট্যগ্রন্থকে বলেছেন 'সংগ্রহ': "নাট্যস্যাস্য প্রবক্ষ্যামি রসভাবাদিসংগ্রহম্"। স্থায়িভাব ছাড়া ব্যাভিচারি ভাব আছে। তারা সংখ্যায় তেত্রিশটি: নির্বেদ, গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া, আলস্য, দৈন্য, চিন্তা, স্মৃতি, ধৃতি, ব্রীড়া, চপলতা, হর্ষ, আবেগ, জড়তা, গর্ব, বিষাদ, ঔৎসুক্য, নিদ্রা, অপস্মার প্রভৃতি।[১৮৭] ভাব আবার সাত্ত্বিক,

---

১৮৬। নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা) ৬।১৮; কাশী সং ৬।১৭

১৮৭। নির্বেদগ্লানিনিশঙ্কাখ্যাস্তথাসূয়ামদশ্রমাঃ।
আলস্যং চৈব দৈন্যং চ চিন্তা মোহঃ স্মৃতির্ধৃতিঃ॥
ব্রীড়া চপলতা হর্ষ আবেগো জড়তা তথা।
গর্বো বিষাদ ঔৎসুক্যং নিদ্রাপস্মার এব চ॥
সুপ্তং বিবোধোঽমর্ষশ্চাপ্যবহিত্থমথোগ্রতা।
মতির্ব্যাধিস্তথোন্মাদস্তথা মরণমেব চ॥
ত্রাসশ্চৈব বিতর্কশ্চ বিজ্ঞেয়া ব্যভিচারিণঃ।
ত্রয়স্ত্রিংশদমী ভাবাঃ সমাখ্যাতাস্তু নামতঃ॥

রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন রকম। ভরতের মতে সাত্ত্বিকভাব আটটি: স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু বা কম্পন, অশ্রু, বিবর্ণতা ও প্রলয়।[১৮৮] তিনি নাট্যে প্রয়োগের জন্য রস এবং স্থায়ী, ব্যভিচারী ও সাত্ত্বিক ভাবগুলির পরিচয় দিয়েছেন। কাব্য ও সঙ্গীতেও এদের পরিপূর্ণ উপযোগিতা আছে। সঙ্গীতশাস্ত্রীগণ স্বর ও রাগের পরিচয় দিতে গিয়ে তাদের আন্তর বৃত্তিরূপ রস ও ভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। রস ও ভাব দুইই অন্তঃকরণের বৃত্তি। হিন্দু-মনোবৈজ্ঞানিকেরা (Hindu psychologists) অন্তঃকরণকে (মনকে) প্রতিটি মানুষ ও প্রাণীর নিয়ামক বলেছেন। পাতঞ্জলদর্শন, যোগবাশিষ্ঠরামায়ণ ও তন্ত্র-সাহিত্য বা যোগসংহিতাদি একথাই প্রমাণ করে। ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি অন্তঃকরণের বৃত্তি (কর্ম)। স্বর, রাগ ও তাদের প্রয়োগ এবং প্রকাশভঙ্গি সকল-কিছুরই সৃষ্টি ও নিয়মন ইচ্ছা বা প্রবৃত্তির দ্বারা হয়। সঙ্গীতে রস ও বিচিত্র ভাবের বিকাশ শিল্পীর ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ভরতের পূর্বগ আচার্যেরা, স্বয়ং ভরত ও ভরতোত্তর সঙ্গীতশাস্ত্রীরা একথা জানতেন। তাঁরা জানতেন রস ও ভাবই স্বর ও রাগের রক্ত-মাংসময় কাঠামোয় প্রাণ বা জীবনীশক্তি দান করে। তাই সঙ্গীতের আলোচনায় রস ও ভাবাদির পরিচয় দেওয়াকে তাঁরা আলোচনার অপরিহার্য অঙ্গরূপে গ্রহণ করেছেন।

ভরত রস ও ভাবের প্রসঙ্গে নাট্যের আশ্রয়-রূপে আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক এই চার রকম অভিনয়ের উল্লেখ করেছেন।[১৮৯] নাট্যের দু'টি ধর্ম—লোকধর্মী ও নাট্যধর্মী[১৯০]; চারটি বৃত্তি—ভারতী, সাত্ত্বতী, কৈশিকী ও আরভটী[১৯১]; চারটি প্রবৃত্তি বা লৌকিক আচার—আবন্তী, দাক্ষিণাত্যা, ওড্রমাগধী ও পাঞ্চাল-মধ্যমা[১৯২]; দু'রকম সিদ্ধি—দৈবিকী বা দৈবী ও মানুষী[১৯৩];

১৮৮। স্তম্ভঃ স্বেদোঽথ রোমাঞ্চঃ স্বরভঙ্গোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ॥
—নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা সং) ৬।১৯-২৩

১৮৯। আঙ্গিকো বাচিকশ্চৈব আহার্যঃ সাত্ত্বিকস্তথা।
চত্বারোঽভিনয়া হ্যেতে বিজ্ঞেয়া নাট্যসংশ্রয়াঃ॥ ৬।২৪

১৯০। লোকধর্মী নাট্যধর্মী ধর্মীতি দ্বিবিধ স্মৃতঃ।৬।২২।

১৯১। ভারতী সাত্ত্বতী চৈব কৈশিক্যারভটী তথা॥
চতস্রো বৃত্তয়ো হ্যেতা যাসু নাট্যং প্রতিষ্ঠিতম্।৬।২৫-২৬

১৯২। আবন্তী দাক্ষিণাত্যা চ তথা চৈবোড্রমাগধী॥
পঞ্চাল (পাঞ্চালী?)-মধ্যমা চেতি বিজ্ঞেয়াস্তু প্রবৃত্তয়।৬।২৬-২৭

১৯৩। দৈবিকী মানুষী চৈব সিদ্ধিঃ স্যাদ্দ্বিবিধৈব তু॥ ৬।২৭

শারীর (মানুষের শরীরজাত) ও বৈণব (বীণাজাত) ভেদে ষড়্‌জাদি সাতস্বর দুই শ্রেণীর[১৯৪] এবং চার রকম আতোদ্য—তত, অবনদ্ধ, ঘন ও সুষির। এদের মধ্যে তন্ত্রী বা তার ও তাঁতযুক্ত বাদ্যযন্ত্র 'তত', চর্মাচ্ছাদিত পুষ্করাদি বাদ্যযন্ত্রের নাম 'অবনদ্ধ', করতাল মন্দিরাদি ধাতুনির্মিত বাদ্যযন্ত্রের নাম 'ঘন' ও ছিদ্রযুক্ত ফাঁপা বাদ্যযন্ত্রের নাম 'সুষির'[১৯৫]। পাঁচ শ্রেণীর ধ্রুবাগান হ'ল প্রবেশ, আক্ষেপ, নিষ্ক্রাম, প্রাসাদিক ও অন্তর। রঙ্গ বা অভিনয়মঞ্চ তিন শ্রেণীর—চতুরস্র, বিকৃষ্ট ও ত্র্যস্র। চতুরস্র অর্থে সমক্ষেত্র বা চারকোণযুক্ত ক্ষেত্র (square), বিকৃষ্ট অর্থে দীর্ঘক্ষেত্র (rectrangular) ও ত্র্যস্র অর্থে ত্রিকোণক্ষেত্র (trangular)। ডি. আর. মানকাদ উল্লেখ করেছেন চতুরস্র রঙ্গক্ষেত্র হ'ত ৪৮'×৪৮', বিকৃষ্ট রঙ্গ ৯৬'×৪৮' এবং ত্রিকোণ রঙ্গ হ'ত ২৪' পার্শ্বযুক্ত। সঙ্গীত-মকরন্দকার নারদ মাত্র চতুরস্র বা সমক্ষেত্র ৯৬'×৯৬' বিস্তৃতির রঙ্গের কথা উল্লেখ করেছেন। অবশ্য এই তিন রকম ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য আকারেরও রঙ্গমঞ্চ তৈরী করা হ'ত। রঙ্গমঞ্চ সাধারণ প্রধান দু'ভাগে ভাগ করা হ'ত: (১) নেপথ্যগৃহ ও (২) রঙ্গশীর্ষ+রঙ্গপীঠ+মত্তবারণী। শেষোক্ত রঙ্গশীর্ষাদিই রঙ্গমঞ্চের প্রধান অংশ। নেপথ্যগৃহে দু'টি দরজা থাকত রঙ্গশীর্ষে যাবার জন্য।[১৯৬] রঙ্গশীর্ষ ও নেপথ্যগৃহাদির বিস্তৃতি ও নির্মাণ ব্যাপারে আচার্য অভিনবগুপ্ত 'অভিনবভারতী' টীকায় উল্লেখ করেছেন: "দ্বাত্রিংশৎকরং

১৯৪। শারীরাশ্চৈব বৈণাশ্চ সপ্ত ষড়্‌জাদয়ঃ স্বরাঃ। ৬।২৮

১৯৫। ততং চৈবাবনদ্ধং চ ঘনং সুষিরমেব চ॥
চতুর্বিধং চ বিজ্ঞেয়মাতোদ্যং লক্ষণান্বিতম্‌।
ততং তন্ত্রীগতং জ্ঞেয়মবনদ্ধং তু পৌষ্করম্‌॥
ঘনস্তু তালো বিজ্ঞেয়ঃ সুষিরো বংশ এ বচ। ৭।২৯-৩০

১৯৬। (ক) Vide D. R. Mankad: *Ancient Indian Theatre* (1950), pp. 12, 23-43.

(খ) 'শিল্পরত্ন' গ্রন্থে রাজপ্রাসাদ-নির্মাণ করার রীতি ও পদ্ধতির উল্লেখ আছে। তাতে নাট্যমণ্ডপেরও পরিচয় আছে:

প্রাসাদসম্মুখে কুর্যান্মণ্ডপানাং চতুষ্টয়ম্‌।
মুখমণ্ডপমাদৌ তু প্রতিমামণ্ডপং ততঃ।
স্নানমণ্ডপমন্যং হি নৃত্যমণ্ডপমেব চ॥

নাট্যমণ্ডপ সম্বন্ধে 'শিল্পরত্ন' (পৃঃ ২০১); সারদাতনয়-কৃত 'ভাবপ্রকাশন' (১৩৩৯), ডাঃ পি. কে. আচার্য-সংপাদিত 'মানসার' (১৯১৪) ও অভিনবগুপ্তের 'অভিনবভারতী' টীকা দ্রষ্টব্য।

ক্ষেত্রং গৃহীত্বা মধ্যে সূত্রং বিস্তারেণ দদ্যাৎ। তত্র যৎপ্রযোক্তুঃ পৃষ্ঠতো ভবিষ্যতি তদেব পৃষ্ঠম্। তস্য মধ্যে বিস্তারেণ সূত্রং দদ্যাৎ। ততঃ ষোড়শহস্তৌ দ্বৌ ভাগৌ ভবতঃ। পৃষ্ঠগতং মধ্যমর্ধেন বিভজ্যাষ্টহস্তং রঙ্গশিরঃ প্রবিশতাং পাত্রাণাং চান্তঃস্থানং নাট্যমণ্ডপস্য হ্যুত্তানস্থ্যগুবদবস্থিতস্য রঙ্গপীঠমুখ্যং তদষ্টহস্তং শিরঃ। তৎপৃষ্ঠে তু দৈর্ঘ্যাদ্ধি ষোড়শহস্তং নেপথ্যগৃহং ভবতি বিস্তারাত্তু দ্বাত্রিংশৎকরমেব। নম্বু নৈপথ্যাদিকং চ তত্র গৃহ্যতে পশ্চিমে চেতি। তত্র রঙ্গপীঠং বিস্তারতঃ ষোড়শ দৈর্ঘ্যতস্ত্বষ্টহস্তা ইতি কেচিৎ। অন্যে ত্বেতদেব বিপর্যাসয়ন্তি সর্বথা। তবদ্রঙ্গপীঠস্যাপি বিকৃষ্টত্বং বিধেয়মিতি তাৎপর্যম্। যদ্বক্ষ্যতে রঙ্গে বিকৃষ্টো ভরতেন কার্য (১২-১৯) ইত্যাদি।"

অর্থাৎ নাট্যমণ্ডপের ৬৪ হাতকে দু'ভাগে বিভক্ত করলে পরিমাপ হয় ৩২ × ৩২ হাত। অভিনেতাদের সম্মুখের অংশ 'প্রেক্ষাগৃহ'। সেখানে শ্রোতারা আসন গ্রহণ করত। অভিনেতাদের পিছনের অংশের নাম ছিল 'পৃষ্ঠ'। এ'দুটির পরিমাপ হ'ত ৩২ × ৩২ হাত। পৃষ্ঠাংশ আবার সমান দু'ভাগে অর্থাৎ ১৬ × ৩২ এবং ১৬ × ৩২ হাত ক'রে ভাগ করা থাকত। এই দু'ভাগের মধ্যে প্রথম ১৬ × ৩২ হাত পরিমিত অংশকে 'পৃষ্ঠগত' ও অপর ১৬ × ৩২ হাত পরিমিত ভাগকে 'পশ্চিম' বলা হ'ত। পৃষ্ঠগত বা প্রথমাংশকে আবার ৪ × ৩২ হাত পরিমিত ভাগ করা হ'ত। সেখানে ৮ হাত পরিমিত স্থান নিয়ে 'রঙ্গশীর্ষ' ও তার

(গ) এ' ছাড়া বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণে (৩।২০।৪) উল্লেখ করা হয়েছে,

লাস্যং স্বচ্ছন্দতঃ কার্যং মণ্ডপে যদি বা বহিঃ।
নাট্যং মণ্ডপ এব স্যান্মণ্ডপং দ্বিবিধং ভবেৎ॥
আয়তং চতুরস্রং তু দ্বাবিংশদ্ধস্তসম্মিতম্।
চতুরস্রং তু কর্তব্যমায়তং দ্বিগুণায়তম্।
হীনাধিকং ন কর্তব্যং দৃষ্টাদৃষ্টশুভপ্রদম্॥'

এখানে পুরাণকার নাট্যমণ্ডপের বিস্তৃতি নির্ণয় করেছেন ৩২' × ৩২' (ঘ) নাট্যসর্বস্বদীপিকা' গ্রন্থেও (পাণ্ডুলিপি নং ৪১।১৯১৮-১৯) নাট্যমণ্ডপের বর্ণনা আছে। সারদাতনয় চতুরস্র, ত্র্যস্র ও বৃত্ত এই তিন রকম রঙ্গমঞ্চের কথা বলেছেন,

'রাজ্ঞঃ সঙ্গীতকং যত্র বৃত্তাখ্যো রঙ্গমণ্ডপঃ॥
* * * *
যত্র সঙ্গীতকং রাজ্ঞঃ, চতুরস্রঃ স কথ্যতে।
ঋত্বিক্‌পুরোহিতাচার্যৈঃ সহান্তঃপুরিকাজনৈঃ।
মহিষ্যা সহ যত্র স্যাৎ ত্র্যস্রোঽসৌ রঙ্গমণ্ডপঃ।

পিছনে ১৬×৩২ হাত পরিমিত স্থানে 'নেপথ্যগৃহ' তৈরী করা হ'ত। সুতরাং নেপথ্যগৃহের সামনে রঙ্গশীর্ষের পরিমাণ ৮×৩২ হাত ও তার সামনে ১৬×৮ হাত স্থান নিয়ে হ'ত 'রঙ্গপীঠ'। অভিনবগুপ্ত বলেছেন অনেকে রঙ্গপীঠের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন রকম করত, যেমন দৈর্ঘ্যে ৮×প্রস্থে ১৬ হাত কিংবা দৈর্ঘ্যে ১৬×প্রস্থে ৮ হাত। প্রেক্ষাগৃহের সামনের অংশ ৮×১৬ হাত ক'রে দু'ভাগে বিভক্ত থাকত। তাদের সামনে ১৬×৮ হাত পরিমাণ স্থান রঙ্গপীঠ নির্দিষ্ট হ'ত। রঙ্গপীঠের উভয় দিকে ৮×৮ হাত ক'রে দু'টি 'মত্তবারণী' থাকত। রঙ্গপীঠের মতো মত্তবারণীও কারু কারু মতে বিভিন্ন হ'ত, অর্থাৎ তখন রঙ্গপীঠের পরিমাণ হ'ত ৮×১৬ হাত ও মত্তবারণীর পরিমাণ ১২×৮ হাত। এ'ধরণের পরিমাণ হ'লে ভরত ও টীকাকার অভিনবগুপ্ত বলেছেন রঙ্গপীঠের অর্ধেক অংশ ৮×৮ হাত পরিমিত স্থান প্রেক্ষাগৃহ বা দর্শকদের ঠিক সামনে নির্দিষ্ট থাকত। এ'ছাড়া বৃত্ত বা অর্ধবৃত্তের আকারেও রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করা হ'ত ও তাদের মধ্যে রঙ্গপীঠ, রঙ্গশীর্ষ, নেপথ্যগৃহ, মত্তবারণী, প্রেক্ষাগৃহ সমস্তই থাকত।[১৯৭]

১৯৭। "Both the text and the commentator are very clear that the length of 64 cubits should be first divided into two equal parts. Thus we will get two parts of 32×32. Then before proceeding further one should properly understand the word pṛṣthato in 40 and the word paścima in 41. Abhinava explains that pṛṣtha means that which is at the back of the actors. Out of the two parts of 32×32 cubits, one is in front of the actor (i.e. the auditorium) and the other at the back of the actor. This portion of 32×32 sq. cubits at the back of the actor should further be divided into two. Then there will be two parts here thus 16×32 and 16×32. Out of these two, first part of 16×32 is called pṛṣthagata by Abhinava and the other part of 16×32 is called paścima. Abhinava says that this first of 16×32, should be divided into two (which will be 8×32 each). Here Raṅgaśīrṣa of 8 cubits should be made, and at its back Nepathya of 16×32 sq. cubits should be made. Both the text and the commentator support this interpretation fully. It is clear that Nepathya should be 16×32. In front of the Nepathya there must be Raṅgaśīrṣa of 8×32 and in front of this there must be Raṅgapīṭha of 16×8, though it is not mentioned in the above quotation from the text. But Abhinava has discussed this. He says that according to some, Raṅgapīṭha is 16 cubits long and 8 cubits wide, while according to others it is 8 cubits long and 16 cubits wide. But Abhinava is in favour of the first view. According to this view, the portion (8×32) just adjoining the auditorium will be thus

ভরত নাট্যশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে নাট্যমণ্ডপ, রঙ্গপীঠ, প্রেক্ষাগৃহ প্রভৃতির বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন,

ত্রিবিধঃ সন্নিবেশশ্চ শাস্ত্রতঃ পরিকল্পিতঃ।
বিকৃষ্টশ্চতুরস্রশ্চ ত্র্যস্রশ্চৈব তু মণ্ডপঃ॥[১৯৮]

চতুরস্র, বিকৃষ্ট ও ত্র্যস্র আকারের নাট্যমণ্ডপগুলির মধ্যে আবার উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ তিন রকম ভেদ ছিল: "তেষাং ত্রীণি প্রমাণাণি জ্যেষ্ঠং মধ্যমং তথাবরম্" (২।৯)। বিকৃষ্ট ছিল জ্যেষ্ঠ বা উত্তম, চতুরস্র মধ্যম ও ত্র্যস্র কনিষ্ঠ: "কণীয়স্তু স্মৃতং ত্র্যস্রং চতুরস্রং তু মধ্যমম্, জ্যেষ্ঠং বিকৃষ্টং বিজ্ঞেয়ং" (২।১০-১৫)। এদের মধ্যে দেবতাদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল জ্যেষ্ঠ, মানুষের জন্য মধ্যম ও প্রকৃতিদের জন্য কনিষ্ঠ।[১৯৯] প্রেক্ষাগৃহ দৈর্ঘ্যে ১০৮ হাত, ৬৪ হাত ও ৩২ হাত তিন রকমেরই হ'ত। এদের মধ্যে ১০৮ হাতকে জ্যেষ্ঠ, ৬৪ হাতকে মধ্যম ও ৩২ হাতকে কনিষ্ঠ বলা হ'ত।[২০০] রাজা ও রাজন্যবর্গের জন্য মধ্যম-মণ্ডপ নির্দিষ্ট থাকত: "নৃপানাং মধ্যমং ভবেৎ" (২।১১)। ভরত নাট্যমণ্ডপের পরিমাপ করার জন্য বিভিন্ন প্রমাণের পরিচয় দিয়েছেন। যেমন, অণু, রজঃ, বাল, লিক্ষা, যুকা, যব, অঙ্গুলি, হস্ত ও দণ্ড।[২০১] এদের পরিচয়: ১ দণ্ড = ৪ হাত, ১ যব = ৮

---

divided. In the centre of this portion there will be Raṅgapīṭha of 16×8 sq. cubits and on both the sides of this Raṅgapīṭha there will be two Mattavārṅīs of 8×8 sq. cubits each. According to the other view, I think, Mattavāraṅīs will be 12×8 sq. cubits each and Raṅgapīṭa will be 8×16 sq. cubits. In this case half of the portion (8×8) of Raṅgapīṭha will just out in the auditorium."—Dr. R. Mankad: *Ancient Indian Theatre* (1950), pp. 31-32. Vide pp. 33-34 of the same book. Vide also Dr. S. K. De: *The Curtain in Ancient Indian Theatre* (an article published in Bhāratiya Vidyā, Vol. IX, 1948).

১৯৮। নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা-সংস্করণ) ২।৮

১৯৯। দেবানাং তু ভবেজ্জ্যেষ্ঠং নৃপাণাং মধ্যমং ভবেৎ॥
শেষাণাং প্রকৃতীনাং তু কনীয়ঃ সংবিধীয়তে।
—নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমাল) ২।১১-১২

২০০। শতং চাষ্টৌ চতুঃষষ্টির্হস্তা দ্বাত্রিংশদেব চ।
অষ্টাধিকং শতং জ্যেষ্ঠং চতুঃষষ্টিস্তু মধ্যমম্।
কনীয়স্তু তথা বেশ্ম হস্তা দ্বাত্রিংশদিষ্যতে। ২।১০-১১

২০১। অণু রজশ্চ বালশ্চ লিক্ষা যূকা যবস্তথা।
অঙ্গুলং চ তথা হস্তো দণ্ডশ্চৈব প্রকীর্তিতঃ।২।১৬-১৭

যূকা, ১ বাল=৮ রজঃ, ১ হাত=২৪ অঙ্গুলি, ১ যূকা=৮ লিক্ষা, ১ রজঃ=৮ অণু, ১ অঙ্গুলি=৮ যব, ১ লিক্ষা=৮ ব্যাল।[২০২] তবে সাধারণত লোকে মধ্যম-পরিমাণ প্রেক্ষাগৃহই (৬৪ × ৩২) পছন্দ করত, কেননা তাতে নাটক ভালভাবে শোনা যেত।[২০৩]

ভরত নাটকের জন্য পাঁচ রকম ভূমির পরিচয় দিয়েছেন : সমা, স্থিরা, কঠিনা, কৃষ্ণা ও গৌরী।[২০৪] প্রেক্ষাগৃহে আসন-রচনার (seat-arrangement) মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। চার শ্রেণীর স্তম্ভ থাকৃত : সাদা, লাল, হল্‌দে ও কাল প্রভৃতি রঙের। সাদা রঙের থামের নাম ছিল 'ব্রাহ্মণস্তম্ভ'—ব্রাহ্মণেরা সেই সীমায় বসতেন। লাল রঙের থামের নাম ছিল 'ক্ষত্রিয়স্তম্ভ',—ক্ষত্রিয়েরা সেখানে বসতেন। হল্‌দে রঙের থামের নাম ছিল 'বৈশ্যস্তম্ভ',—বৈশ্যেরা সেখানে বসত, আর গাঢ়নীল বা কালোরঙের থামের নাম ছিল 'শূদ্রস্তম্ভ',—শূদ্রেরা সেখানে আসন গ্রহণ ক'রে অভিনয় দেখত।[২০৫] ব্রাহ্মণস্তম্ভের নীচে স্বর্ণ, ক্ষত্রিয়স্তম্ভের নীচে তামা, বৈশ্যস্তম্ভের নীচে রূপা ও শূদ্রস্তম্ভের নীচে লোহা দেওয়া থাকৃত।

২০২। অণবোঽষ্টৌ-রজঃ প্রোক্তং তাষ্টৌ বাল উচ্যতে॥
বালাস্ত্বষ্টৌ ভবেল্লিক্ষা যূকা লিক্ষাষ্টকং ভবেৎ।
যূকাস্ত্বষ্টৌ যবো জ্ঞেয়ো যবস্ত্বষ্টৌ তথাঙ্গুলম্॥
অঙ্গুলানি তথা হস্তশ্চতুর্বিংশতিরুচ্যতে।
চতুর্হস্তোভবেদ্দণ্ডো নির্দিষ্টস্তু প্রমাণতঃ॥
—নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা) ২।১৭-১৯

২০৩। [প্রেক্ষাগৃহাণাং সর্বেষাং প্রশস্তং মধ্যমং স্মৃতম্॥
তত্র পাঠ্যং চ গেয়ং চ সুখশ্রাব্যতরং ভবেৎ।]
* * * *
চতুঃষষ্টিকরান্ কুর্যাদ্দীর্ঘত্বেন তু মণ্ডপম্॥
দ্বাত্রিংশতং চ বিস্তারান্ মর্ত্যানাং যো ভবেদিহ।
—নাট্যশাস্ত্র ২।১২, ২০-২১

২০৪। নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা) ২।৩০

২০৫। (ক) প্রথমে ব্রাহ্মণস্তম্ভে সর্পিংসর্ষপসংস্কৃতে।
সর্বশুক্লো বিধিঃ কার্যো * *॥
ততশ্চ ক্ষত্রিস্তম্ভে * *।
সর্বং রক্তং প্রদাতব্যং * *॥
বৈশ্যস্তম্ভে বিধি কার্যো দিগ্‌ভাগে পশ্চিমোত্তরে।
সর্বং পীতং প্রদাতব্যং * *॥

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় ভরতের সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর ভারতীয় সমাজে জাতিভেদপ্রথা পুরোদস্তুরভাবে প্রচলিত ছিল। শ্রোতাদের জন্য থাক্ থাক্ ক'রে আসন সাজানো থাকত। আসনগুলি হয় ইট—নয় কাঠ দিয়ে তৈরী হ'ত। সাম্‌নের রঙ্গের (stage) পাশে চারটি স্তম্ভের ওপর একটি বারাণ্ডা থাকৃত, সেখানে সম্ভবত সম্ভ্রান্তবংশীয় দর্শকেরা আসন গ্রহণ করতেন। রঙ্গ (stage) চিত্র ও বিভিন্ন মূর্তি দিয়ে সুসজ্জিত থাকত এবং এ'থেকে বোঝা যায় তখনকার সমাজে চিত্রবিদ্যা ও ভাস্কর্যশিল্পের যথেষ্ট সমাদর ছিল। রঙ্গের শেষের দিকে অবস্থিত রঙ্গশীর্ষটিও নানান্ মূর্তি দিয়ে সাজানো থাকত। রঙ্গশীর্ষে ছ'টি কাঠের স্থানু বা খুঁটি থাকত ও সেখানে রঙ্গদেবতার পূজা হ'ত। রঙ্গশীর্ষের গর্ভ কালোরঙের মাটি দিয়ে ভরাট করা থাকত।[২০৬] রঙ্গপীঠের পাশে মত্তবারণী থাকত। রঙ্গপীঠে যে চারটি থাম (স্তম্ভ) থাকত তাই দিয়ে রঙ্গপীঠকে বোঝা যেত। মণ্ডপকে এমনই চাতুর্যের সঙ্গে নির্মাণ করা হ'ত যাতে বাদ্যযন্ত্রগুলির শব্দ বেশ গম্ভীর ও সুস্পষ্টভাবে শোনা যায়ঃ "গম্ভীরস্বরতা যেন কুতপস্য ভবিষ্যতি" (২।৮৮)।[২০৭]

শূদ্রস্তম্ভে বিধি কার্যঃ সম্যক্‌পূর্বোত্তরাশ্রয়ে।
নীলপ্রায়ং প্রযত্নেন * * ॥
পূর্বোক্তংব্রাহ্মণস্তম্ভে * * নিক্ষিপেৎকনকং মূলে *।
তাম্র চাধঃ প্রদাতব্যং স্তম্ভে ক্ষত্রিয়সংজ্ঞকে ॥
বৈশ্যস্তম্ভস্য মূলে তু রজতং সম্প্রদাপয়েৎ।
শূদ্রস্তম্ভস্য মূলে তু দদ্যাদায়সমেব চ ॥ —নাট্যশাস্ত্র ২।৫৩-৫৭

২০৬। রঙ্গশীর্ষং তু কর্তব্যং ষড়্‌দারুকসমন্বিতম্।
কার্যং দ্বারদ্বয়ং চাত্র নেপথ্যগৃহকস্য তু ॥
পূরণে মৃত্তিকা চাত্র কৃষ্ণা দেয়া প্রযত্নতঃ ॥

—নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা সং) ২।৭৫-৭৬

২০৭। নাট্যমণ্ডপ নাট্যাভিনয় ও ছায়ানাট্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি দ্রষ্টব্যঃ

(ক) অশোকনাথ শাস্ত্রীঃ 'প্রাচীন ভারতীয় ছায়ানাট্য',—ভারতবর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৪৬ পৃ° ৬৪৫-৬৬০ এবং 'ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের গোড়ার কথা'—উদয়ন, শ্রাবণ ১৩৪০, চৈত্র ও বৈশাখ ১৩৪১

(খ) অমূল্যভূষণ বিদ্যাভূষণঃ 'ভারতীয় নাট্যশালার গোড়ার কথা'.—প্রবাসী, ১৩৩৬, পৃ° ৩৬২-৩৭০

(গ) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীঃ 'ভরতের নাট্যশাস্ত্র',—পঞ্চপুষ্প, আষাঢ়, ১৩°৬ এবং প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৩৬ পৃ° ৬৯৫

(ঘ) অমূল্যভূষণ বিদ্যাভূষণঃ 'আদি-নাট্যশাস্ত্র,'—প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৩৬

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে নেপথ্যগৃহের দ্বারের মাঝখানে ভাণ্ডবাদ্য বা কুতপবিন্যাস করা হ'ত। ভরতও উল্লেখ করেছেন: "যে নেপথ্যগৃহদ্বারে ময়া পূর্বং প্রকীর্তিতে, তয়োর্ভাণ্ডস্য বিন্যাসো মধ্যে কার্যঃ প্রযোক্তৃভিঃ"। জেমস্ ফার্গুসন, অধ্যাপক মিডিল্টন, অধ্যাপক হুজ্সন, অধ্যাপক র‍্যাপসন্, অধ্যাপক কিথ্ প্রমুখ পাশ্চাত্য মনীষীরা বলেছেন প্রাচীন গ্রীকদের রঙ্গমঞ্চও প্রাচীন ভারতীয় অভিনয়গৃহ বা নাট্যমণ্ডপের মতো তৈরী করা হ'ত। মাননীয় ফার্গুসন উল্লেখ করেছেন: "The theatre was by no means an essential a part of the economy of a Roman city as it was of a Grecian too. With the latter it was quit as indispensable as the temple ; and in the semi-Greek city of Harculaneum there was one, and in Pompii two, on a scale quite equal to those of Greece * * "।[২০৮] গ্রীকদের রঙ্গমঞ্চগুলি কখনো কখনো উন্মুক্ত স্থানে তৈরী করা হ'ত ও আকার হ'ত অর্ধবৃত্তাকার কিংবা বৃত্তাকার। অন্য আকারের রঙ্গগৃহও তৈরী হ'ত। প্রেক্ষাগৃহগুলি (auditorim) বিশেষভাবে অর্ধ-বৃত্তাকার ৪১০ ফিট বা ৩৪০ ফিট ব্যাসবিশিষ্ট (diameter) হ'ত। অরেঞ্জের রঙ্গমঞ্চটি অর্ধ-বৃত্তাকার ছিল। ফ্লেবিয়ান-এম্পিথিয়েটারটিও অর্ধ-বৃত্তাকার, তবে কিছুটা চাপা ধরণের ছিল। মাননীয় ফার্গুসন উল্লেখ করেছেন: "One of the most striking Roman provincial theatres is that of Orange, in the south of France. * * Its auditorium is 340 ft. in diameter, but much ruined, * *. The stage is very tolerably preserved." নাট্যশাস্ত্র-অনুমোদিত রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে এদের রেখাচিত্রও গ্রন্থের শেষের দিকে দেওয়া হ'ল।

যাহোক রসের আলোচনায় ভরত বলেছেন বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারি ভাব দ্বারা রস-নিষ্পত্তি হয়, রসের পরিপুষ্টি ও সচ্ছল বিকাশ বিভাবাদি

(ঙ) অমূল্যভূষণ বিদ্যাভূষণ: 'ভারতীয় নাটকের গোড়ার কথা',—প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৩৬ সাল।

(চ) রামদাস সেন: 'হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়',—ঐতিহাসিক-রহস্য, ১ম ভাগ (১২৮১ সাল), পৃ° ৫৯-৭০

২০৮। Vide J. Fergusson: *History of Architecture*, Vol. I (1893), pp. 334-335.

অন্তঃকরণ বৃত্তিগুলি না থাকলে হয় না।[২০৯] কিন্তু এই 'রস' কি পদার্থ? ভরত বলেছেন 'আস্বাদন' মাত্র। লোকে ব্যঞ্জনাদি আস্বাদন ক'রে যেমন তার কটুতা, মিষ্টতা প্রভৃতি ধর্ম বা প্রকৃতির অনুভব করে তেমনি রস আস্বাদ্য বস্তু, আস্বাদন ব্যতীত তার সঠিক স্বরূপ মোটেই অনুভূত হয় না। ভরত বলেছেন: "অত্রাহ—রস ইতি কঃ পদার্থঃ। উচ্যতে। আস্বাদ্যত্বাৎ। কথমাস্বাদ্যতে রসঃ। যথা হি নানাব্যঞ্জনসংস্কৃতমন্নং ভুঞ্জানা রসানাস্বাদয়ন্তি সুমনসঃ প্রেক্ষকাঃ হর্ষাদীংশ্চাধিগচ্ছন্তি তথা নানাভাবাভিনয়ব্যঞ্জিতান্ বাগঙ্গসত্ত্বোপেতান্ স্থায়িভাবানাস্বাদয়ন্তি সুমনসঃ প্রেক্ষকাঃ, হর্ষাদিংশ্চাধিগচ্ছন্তি তস্মান্নাট্যরসা ইত্যভিব্যাখ্যাতাঃ"। এখন রস ও ভাবের পারস্পরিক সম্বন্ধ কি তা জানা উচিত। রস থেকে ভাব হয়—না ভাবই রসের উদ্বোধক? ভরত উল্লেখ করেছেন,

ন ভাবহীনোঽস্তি রসো ন ভাবো রসবর্জিতঃ।
পরস্পরকৃতা সিদ্ধিস্তয়োরভিনয়ে ভবেৎ ॥

* * * *

এবং ভাবা রসাশ্চৈব ভাবয়ন্তি পরস্পরম্ ॥
যথা বীজাদ্ভবেদ্বৃক্ষো বৃক্ষাৎপুষ্পং ফলং যথা।
তথা মূলং রসাঃ সর্বে তেভ্যো ভাবা ব্যবস্থিতাঃ ॥

সুতরাং রস থেকেই ভাবের সৃষ্টি। রস জনক ও ভাব জন্য, রস ও ভাবে জন্য-জনক বা কার্য-কারণসম্বন্ধ।

প্রকৃতপক্ষে ভরত মূলরস হিসাবে শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর ও বীভৎসকে গ্রহণ করেছেন এব এদের চারটি মূলভাব থেকেই সকল ভাব জন্মলাভ করে: "তথা মূলং রসাঃ সর্বে তেভ্যো ভাবা ব্যবস্থিতাঃ। * তদ্‌যথা শৃঙ্গারো রৌদ্রো বীরো বীভৎস ইতি"। চারটি মূলরস থেকে অনুকৃতি বা প্রধান অঙ্গরস হিসাবে হাস্য, করুণ, অদ্ভুত ও ভয়ানক রসগুলির সৃষ্টি: "শৃঙ্গারাদ্ধি ভবেদ্ধাস্যো * *", কিংবা "শৃঙ্গারানুকৃতির্যা তু স হাস্যস্তু প্রকীর্তিতঃ"। এখানে মূল ও অনুকৃতি এই উভয় রসের পর্যায়ে শৃঙ্গারাদি চারটি মূলরস হাস্যাদি অঙ্গরসের কারণ হিসাবে গণ্য। এ'প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য যে ভরত পরবর্তী সঙ্গীতশাস্ত্রীদের মতো স্বর ও রাগের বর্ণ, অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের নামোল্লেখ না করলেও রসের বর্ণ ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের পরিচয় দিয়েছেন: "অথ বর্ণাঃ", "অথাধিদৈবতানি"। তিনি আটটি রসের বর্ণ ও দেবতাদের পরিচয়-প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন,

২০৯। 'তত্র বিভাগানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ।'—নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা) ৬।৩৩

সংখ্যা	রস	বর্ণ	অধিদেবতা
১	শৃঙ্গার	শ্যাম	বিষ্ণু
২	হাস্য	সিত (শুক্ল)	প্রমথ
৩	করুণ	কপোত	রুদ্র
৪	রৌদ্র	রক্ত	যম
৫	বীর	গৌর	মহাকাল
৬	ভয়ানক	কৃষ্ণ	কাল
৭	বীভৎস	নীল	মহেন্দ্র
৮	অদ্ভুত	পীত	ব্রহ্মা

পূর্বেই উল্লেখ করেছি ভরত রসের মতো স্বর ও রাগের কোন বর্ণ ও দেবতার পরিচয় দেননি বটে, কিন্তু স্বর ও রাগ যে আটটি রসের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্বন্ধযুক্ত সে'কথা তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন: "জাতয়ো রসসংশ্রয়াঃ" (২৯।১৬)। তিনি উল্লেখ করেছেন,

> ষড়্‌জোদীচ্যবতী চৈব ষড়্‌জমধ্যা তথৈব।
> ষড়্‌জমধ্যমবাহুল্যাৎ কার্যং শৃঙ্গারহাস্যয়োঃ॥
> আর্ষভী চৈব ষাড়্‌জী চ ষড়্‌জর্ষভগ্রহস্বরান্।
> বীরাদ্ভুতে চ রৌদ্রে চ নিষাদঙ্গপরিগ্রহাৎ॥
> গান্ধার্যংশোপপত্ত্যা চ করুণে ষড়্‌জকৈশিকী।
> ধৈবতী ধৈবকাংশাঁ চ বীভৎসে সভয়ানকে॥[২১০]

এ'ভাবে তিনি অন্যান্য জাতিরাগগুলি যে রসে অনুবিদ্ধ হ'য়ে ভাব, অনুভাব, বিভাবাদি প্রকাশ করে তা উল্লেখ করেছেন। এ'ছাড়া তিনি স্বরগুলির নির্দিষ্ট রসেরও পরিচয় দিয়েছেন,

২১০। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সংস্করণ) ২৯।১-৩

হাস্যশৃঙ্গারয়োঃ কার্যৌ স্বরৌ মধ্যমপঞ্চমৌ।
ষড়্‌জর্ষভৌ চ কর্তব্যৌ বীররৌদ্রাদ্ভুতেষথ ॥
গান্ধারশ্চ নিষাদশ্চ কর্তব্যৌ করুণে রসে।
ধৈবতশ্চ প্রযোক্তব্যো বীভৎসে সভয়ানকে ॥[২১১]

এ'ছাড়া নৃত্যে, অভিনয়প্রদর্শনে, বর্ধমানক আসারিত মদ্রকাদি গীতিতে, ঋক্ পাণিকা সাম ও বাড়্‌জীকপালাদি ব্রহ্মগীতি, এবং মাগধী প্রভৃতি গীতির বেলায় রসের অনুপ্রবেশের কথাও ভরত উল্লেখ করেছেন।

শৃঙ্গারাদি রসের স্থায়িভাব বিভাব, অনুভাব, ব্যাভিচারিভাব প্রভৃতির পরিচয় দেবার প্রসঙ্গে ভরত বলেছেন,

(১) ॥ শৃঙ্গার ॥ শৃঙ্গারের স্থায়িভাব রতি। সংযোগ ও বিপ্রলম্ভ দু'টি অধিষ্ঠান।[২১২]

(২) ॥ হাস্য ॥ হাস্যের স্থায়ীভাব হাস। এর আত্মস্থ ও পরস্থ দু'টি প্রকাশ। নিজে হাস্য করার নাম 'আত্মস্থ' ও পরকে হাসালে তা 'পরস্থ'।[২১৩]

(৩) ॥ করুণ ॥ করুণের স্থায়িভাব শোক। ক্লেশাদি ভাব। নির্বেদ, গ্লানি প্রভৃতি ব্যাভিচারী ভাব।[২১৪]

(৪) ॥ রৌদ্র ॥ রৌদ্রের স্থায়িভাব ক্রোধ।[২১৫]

(৫) ॥ বীর ॥ বীরের স্থায়িভাব উৎসাহ। ধৃতি, মতি প্রভৃতি ভাব।[২১৬]

(৬) ॥ ভয়ানক ॥ ভয়ানকের স্থায়িভাব ভয়। স্তম্ভ, স্বেদাদি ভাব।[২১৭]

(৭) ॥ বীভৎস ॥ বীভৎসের স্থায়িভাব জুগুপ্সা। অপস্মার প্রভৃতি ভাব।[২১৮]

(৮) ॥ অদ্ভুত ॥ অদ্ভুতের স্থায়ীভাব বিস্ময়। স্তম্ভাদি ভাব।[২১৯]

২১১। ঐ ঐ ২৯।১৭-১৮

২১২। 'তত্র শৃঙ্গারো নাম রতিস্থায়িভাবপ্রভব উজ্জ্বলবেষাত্মকঃ। * * স চ স্ত্রীপুরুষহেতুক উত্তমযুব-প্রকৃতিঃ। তস্য দ্বে অধিষ্ঠানে—সংভোগঃ বিপ্রলম্ভশ্চ। * * বিপ্রলম্ভকৃতস্তু নির্বেদগ্লানি শঙ্কাসূয়া * *।

২১৩। 'অথ হাস্যো নাম হাসস্থায়িভাবাত্মকঃ। * * দ্বিবিধশ্চায়ম্—আত্মস্থঃ পরস্থশ্চ। যদা স্বয়ং হসতি তদাত্মস্থঃ। যদা তু পরং হাসয়তি তদা পরস্থঃ। * *।'

২১৪। 'অথ করুণো নাম শোকস্থায়িভাবপ্রভবঃ। স চ শাপক্লেশবিনিপতিতেষ্টজনবিপ্রয়োগ * *'।

২১৫। 'অথ রৌদ্রো নাম ক্রোধস্থায়িভাবাত্মকো রক্ষোদানবোদ্ধতমনুষ্যপ্রকৃতিঃ সংগ্রামহেতুকঃ। * * ভাবাশ্চাস্য—অসংমোহোৎসাহাবেগামর্ষচপলতৌগ্র্যগর্ববিকৃতেক্ষণস্বেদবেপথুরোমাঞ্চগদ্গদাদয়ঃ * *।

২১৬। 'অথ বীরো নামোত্তমপ্রকৃতিরুৎসাহাত্মকঃ। * * ভাবাশ্চাস্য ধৃতিমতিগর্বা * *।

২১৭। 'ভয়ানকো নাম ভয়স্থায়িভাবাত্মকঃ। * * ভাবশ্চাস্য স্তম্ভস্বেদ * *।

২১৮। 'অথ বীভৎসো নাম জুগুপ্সাস্থায়িভাবাত্মকঃ। * * ভাবাশ্চাস্য—অপস্মারোদ্বেগাবেগ-মোহব্যাধিমরণাদয়ঃ।'

২১৯। 'অদ্ভুতো নাম বিস্ময়স্থায়িভাবাত্মকঃ। * * ভাবাশ্চাস্য—স্তম্ভোশ্রুস্বেদ * *।'

॥ মু[illegible]ভরতের অনুযায়ী আটটি রস ও তাদের ভাব ও [illegible]ভাবাদি ॥

সংখ্যা	রস	ভাব	অনুভাব (ও তনু-ব্যভিচার)	মন-ব্যভিচার
১	শৃঙ্গার (ক) সম্ভোগ	রতি	স্বেদ, স্তম্ভ, রোমাঞ্চ, অশ্রু	গ্লানি, মদ, ধৃতি, হর্ষ, চপলতা, গর্ব, আবেগ, নিদ্রা, উন্মাদ
„	(খ) বিপ্রলম্ভ		স্বেদ, স্তম্ভ, স্বরভঙ্গ, বিবর্ণ, অশ্রু, প্রলাপ	নির্বেদ, শঙ্কা, আলস্য, অসূয়া, শ্রম, মদ, দৈন্য, চিন্তা, স্মৃতি, জড়তা, বিষাদ, আবেগ, উৎকণ্ঠা, নিদ্রা, স্বপ্ন, অবহিত্যা, অমর্ষ, ব্যাধি, উন্মাদ, মরণ, ত্রাস, বিতর্ক
২	হাস্য	হাস	বিবর্ণ, হাস, স্বরভঙ্গ	মদ, স্মৃতি, হর্ষ, চপলতা, গর্ব, আবেগ, মতি, বিতর্ক
৩	করুণ	শোক	স্বেদ, স্তম্ভ, স্বরভঙ্গ, বিবর্ণ, অশ্রু	শঙ্কা, আলস্য, অসূয়া, শ্রম, দৈন্য, চিন্তা, স্মৃতি, ক্রীড়া, বিষাদ, উৎকণ্ঠা, স্বপ্ন, অবহিত্যা, ব্যাধি, মরণ, ত্রাস
৪	রৌদ্র	ক্রোধ	স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বিবর্ণ, প্রলাপ	অসূয়া, মদ, স্মৃতি, গর্ব, আবেগ, অমর্ষ, উগ্রতা, উন্মাদ
৫	বীর	উৎসাহ	স্বেদ, রোমাঞ্চ, বিবর্ণ, অশ্রু, সংমোহ	মদ, স্মৃতি, ধৃতি, হর্ষ, গর্ব, আবেগ, অমর্ষ, উগ্রতা, মতি, বিরোধ, বিতর্ক
৬	ভয়ানক	ভয়	স্বেদ, স্তম্ভ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বিবর্ণ, অশ্রু, প্রলাপ	শঙ্কা, শ্রম, দৈন্য, চিন্তা, স্মৃতি, ক্রীড়া, বিষাদ, আবেগ, অপস্মার, ত্রাস
৭	বীভৎস	জুগুপ্সা	রোমাঞ্চ, প্রলাপ	মদ, গর্ব, আবেগ, অমর্ষ, উগ্রতা, ব্যাধি
৮	অদ্ভুত	বিস্ময়	স্বেদ, স্তম্ভ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বিবর্ণ	অসূয়া, দৈন্য, চিন্তা, হর্ষ, জড়তা, আবেগ, মতি

রস অন্তঃকরণ-বৃত্তির পরিণতি। বৃত্তি কর্মবিশেষ ও কর্ম কম্পনের সমষ্টি। বর্ণও তাই। বর্ণ নির্দিষ্ট কম্পনের পরিণতি। সকল শ্রেণীর স্বর বা ধ্বনিও তাই। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে (Western Psychology) সাঙ্গীতিক স্বর ও বর্ণের কম্পনসংখ্যা নির্ণয় করা হয়েছে।[২২০] রসেরও গতি, আকার ও বর্ণ আছে। ভরত রসের বর্ণ স্বীকার করেছেন।

ভরত ভাব অর্থে বলেছেন: "বাগঙ্গসত্ত্বোপেতান্ কাব্যার্থান্ ভাবয়ন্তীতি ভাবা ইতি"। বিভাব হ'ল: "বিভাবো নাম বিজ্ঞানার্থঃ"। অনুভাব: "অনুভাব্যতেঽনেন বাঙ্গসত্ত্বকৃতোঽভিনয় ইতি"। সুতরাং দেখা যায় আটটি স্থায়িভাব, তেত্রিশটি ব্যভিচারিভাব। আটটি সাত্ত্বিক ভাব আবার তিন রকম। এভাবে ভরত ৭ম অধ্যায়ের ১ম—১৩০ শ্লোক (কাব্যমালা-সংস্করণ, ১ম—১২৪ শ্লোক কাশী-সংস্করণ) পর্যন্ত ভাব, বিভাব, ব্যাভিচারি-ভাবগুলির বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে ভরত আটটি রসের পরিচয় দিয়েছেন তার পূর্বগ আচার্যদের অনুসরণ ক'রে: "এতে হ্যষ্টৌ রসাঃ প্রোক্তা দ্রুহিণেন মহাত্মনা" (নাট্যশাস্ত্র ৬।১৫-১৬)। 'ভাবপ্রকাশন' গ্রন্থে সারদাতনয়ও উল্লেখ করেছেন পদ্মভূব ব্রহ্মাই আটটি রসের প্রবর্তক: "তস্মান্নাট্যরসা অষ্টাবিতি পদ্মভুবো মতম্" (২য় ভাগ, পৃঃ ৪৬-৪৭)। অবশ্য সারদাতনয় "ইত্যূচুঃ শংকরাদয়ঃ"—রসাদির কথা শংকরাদিও উল্লেখ করেছেন। এই শংকর নিশ্চয়ই প্রলয়কর্তা শিব নন, তিনি ব্রহ্মাভরতের পরবর্তী গুণী সদাশিবভরত।[২২১] পার্শ্বদেবও তাঁর 'সঙ্গীত-সময়সার' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: "সকলং নিষ্কলং চেতি * *, কথিতং শংকরেণদম্ একতন্ত্রীসমাশ্রয়ম্"।[২২২] এ'ছাড়া শংকর বা সদাশিবভরতের নাম ব্রহ্মাভরতের মতো ভরতোত্তর সকল সঙ্গীতশাস্ত্রীই তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। শৃঙ্গারাদি আটটি রসের প্রবর্তন যে মুনি ভরত করেন নি তা রামায়ণের বালকাণ্ডে

২২০। "At the end of the spectrum, the wave length of the light is 760 millionth of a millimetre, and at the violet end it is 390 millionths. In between are waves of every intermediate length, appearing to the eye as orange, yellow, green and blue, with all their transitional hues. A wave-length of 600 gives yellow, one of 500 gives green, one of 470 gives blue, etc."—Prof. Woodworth.

২২১। ডাঃ রাঘবনও একথাই বলেছেন: "Śaṅkara may mean Śiva himself and this would mean that the Sadāśiva-Bharata is the source of this story."—Vide *The Number of Rasas* (Adyar, 1940), p. 9.

২২২। সঙ্গীতসময়সার (ত্রিবান্দ্রম সংস্করণ), পৃঃ ৪২

(৪র্থ সর্গ) কুশী-লবের রামায়ণগান-সম্পর্কে শৃঙ্গারাদি রসের উল্লেখই নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে। মুনি বাল্মিকী রামায়ণে উল্লেখ করেছেন,

রসৈঃ শৃঙ্গারকরুণহাস্যরৌদ্রভয়ানকৈঃ।
বীরাদিভি রসৈর্যুক্তং কাব্যমেতদগায়তাম্ ॥[২২৩]

বাল্মিকী রামায়ণ মহাকাব্য রচনা করেন আনুমানিক ৪০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে। ভরত নাট্যশাস্ত্রে রসের পরিচয় দেবার সূচনায় উল্লেখ করেছেন: "এতে হ্যষ্টৌ রসাঃ প্রোক্তা দ্রুহিণেন মহাত্মনা"। এই দ্রুহিণ-ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাভরতই রসতত্ত্বের আদি-প্রবর্তক এবং তিনি রামায়ণকারেরও পূর্ববর্তী গুণী। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে শৃঙ্গারাদি আটটি রসের প্রচলন ৬০০-৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের সমাজেও প্রচলিত ছিল। তারপর ব্রহ্মাভরতও তাঁর নাট্য ও সঙ্গীতগ্রন্থের সকল-কিছু উপাদান সংগ্রহ করেছেন ('যদম্বিষ্টং') বৈদিক গান সামগান থেকে, সুতরাং আভ্যুদয়িক বৈদিক সামগানেও যে রসের লীলায়ন ছিল তা অনুমান করা যায়। ভরতও উল্লেখ করেছেন: "যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসানাথর্বণাদপি" (নাট্যশাস্ত্র ১।১৭)।

খৃষ্টপূর্ব ৩য়-২য় শতক থেকে খৃষ্টীয় ২য়-৩য় শতাব্দী ভারতীয় সঙ্গীতকলার সমাজে একটি স্মরণীয় যুগ বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। এই কালপরিধির মধ্যে একটি ক্রম-বিবর্তনের ভাব লক্ষ্য করা যায়। খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতক থেকে -২য় শতক পর্যন্ত রামায়ণ ও মহাভারত-হরিবংশে সঙ্গীতের রূপ ও বিকাশ সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করেছি। সঙ্গীতানুশীলনের ধারা ও সমাদর তখন অক্ষুণ্ণই ছিল। কিন্তু তদানীন্তন ব্রাহ্মণ্য সমাজের সামাজিক ও কৌলিন্য দৃষ্টি ক্রমশই যেন নাট্য ও সঙ্গীতানুশীলনের প্রতি ধীরে ধীরে কিছুটা বিসদৃশ ভাব পোষণ করতে আরম্ভ করে। খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতকের আগে (?) শিলালি ও কৃশাশ্ব যে নটসূত্রের তথা নাটকের ধারা প্রবর্তন করেছিলেন তার প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করি পাণিনির ভিক্ষু ও নটসূত্রে, তা পূর্বেই আলোচনা করেছি। কিন্তু খৃষ্টপূর্ব ৩য়-২য় শতকে ধর্মসূত্রকার আপস্তম্ভ এক নিষেধাজ্ঞা (সূত্র ১।১।৩।১১-১২) জারী করিলেন যে শিক্ষাসেবীরা কোন রকম নৃত্য দর্শন করতে বা কোন আমোদানুষ্ঠানের সভায় যোগদান করতে পারবে না। খৃষ্টপূর্ব ২য় শতকের মাঝামাঝি সময়ে মহর্ষি মনু আবার আপস্তম্ভকারকে অনুসরণ ক'রে মধু-মাংসের মতো নৃত্য-গীত বর্জন করতে

২২৩। রামায়ণ (বম্বে-সংস্করণ) ১।৪।৯

বিধান দিলেন: "বর্জয়েন্মধুমাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যং রসান্ স্ত্রিয়ঃ, * * নর্তনং গীতবাদনম্" (মনু ২।১৭৮)। শুধু তাই নয়, নৃত্য ও গীতশিল্পীদের গোপালক ও পাচকদের পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ক'রে শূদ্রশ্রেণী হিসাবে তাদের সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় করতেও তিনি পশ্চাদ্‌পদ হন নি: "গোরক্ষকান্ * * কারুকুশীলবান্, * * শূদ্রবদাচরেৎ" (মনু ৮।১০২)। স্মার্তগণ রজক, চর্মকার প্রভৃতি সাত শ্রেণীর অন্ত্যজদের দলে নট, নটী ও শৈলূষদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন: "রজকশ্চর্মকারশ্চ নটোবরুড় এব চ" (—যমসংহিতা)। হারীত, পরাশর প্রভৃতি সমাজনিয়ন্তরা নৃত্য, গীত ও বাদ্য অভিনয়কারীদের মোটেই সুনজরে দেখতেন না। খৃষ্টীয় ২য় শতকে নাট্যশাস্ত্রকার ভরতই বরং সমাজ-সংস্কারকের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি তাঁর নাট্যশাস্ত্র রচনা করলেন সমাজের সকল বর্ণের—সর্বসাধারণের জন্য: "তস্মাৎ সৃজাপরং বেদং পঞ্চমং সার্ববর্ণিকম্"। কাজেই অন্ত্যজ ও অভিজাতদের মধ্যে আর কোন বিধি-নিষেধের বালাই থাকল না। খৃষ্টীয় ৩য়—৪র্থ থেকে ১০ম—১২শ শতাব্দী পর্যন্ত পুরাণকারেরা নাট্য ও সঙ্গীতকলার মর্যাদাকে আরো মার্জিত ও উন্নত করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন; স্ত্রী-পুরুষ—পণ্ডিত ও অভিজাত সকলেই নির্বিচারে গান্ধর্ববিদ্যার অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করেছিল ও সমাজে তাদের অবদান তখন শ্রদ্ধার আসনই লাভ করেছিল।

মুনি ভরতের পর সঙ্গীতশাস্ত্রী হিসাবে স্বাতি, কোহল, শাণ্ডিল্য, বিশ্বাখিল, দত্তিল, নন্দিকেশ্বর যাষ্টিক, বিশ্বাবসু, দুর্গাশক্তি, শার্দুল প্রভৃতির নাম পাই। এঁদের মধ্যে অনেকে ভরতের সমসাময়িক ও অনেকে কিছু পরবর্তী। দত্তিল প্রণীত 'দত্তিলম্' গ্রন্থে প্রামাণিক আচার্য হিসাবে নারদ, কোহল, বিশ্বাখিল প্রভৃতির নামের উল্লেখ দেখি। মতঙ্গের বৃহদ্দেশীতে তেমনি কশ্যপ, দত্তিল, কোহল, দুর্গাশক্তি, নন্দিকেশ্বর, ব্রহ্মা, ভরত, যাষ্টিক, বিশ্বাবসু, শার্দুল প্রভৃতির নাম পাই। দত্তিল আনুমানিক খৃষ্টীয় ২য় অব্দের গুণী ও মতঙ্গ খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম শতাব্দীর সঙ্গীতশাস্ত্রী। এ'ছাড়া ভরতের নাট্যশাস্ত্রে শাণ্ডিল্য, কোহল, স্বাতি, নারদ, ব্রহ্মা প্রভৃতি গুণীদের উল্লেখ আছে। সুতরাং বোঝা যায় স্বাতি, কোহল, শাণ্ডিল্য, বিশ্বাখিল, দত্তিল, নন্দিকেশ্বর, যাষ্টিক, বিশ্বাবসু, দুর্গাশক্তি, শার্দুল এঁরা খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী থেকে খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের সঙ্গীতশাস্ত্রী।

॥ স্বাতি ॥

ভরত স্বাতির নামোল্লেখ ক'রে বলেছেন,

স্বাতির্ভাণ্ডনিযুক্তস্তু সহ শিষ্যৈঃ স্বয়ংভুবা ॥
নারদাদ্যাশ্চ গন্ধর্বা গানযোগে নিয়োজিতাঃ।

* * *

স্বাতিনারদসংযুক্তো বেদবেদাঙ্গকারণম্।
উপস্থিতোঽহং লোকেশং প্রয়োগার্থং কৃতাঞ্জলিঃ ॥[১]

এখানে স্বাতি সঙ্গীতাচার্য হিসাবে পরিচিত। ভরত উল্লেখ করেছেন ইন্দ্রধ্বজ মহোৎসব-রূপ প্রথম নাট্যাভিনয়ে তিনি স্বাতিকে ভাণ্ডবাদ্য ও নারদকে গায়ক হিসাবে সঙ্গে নিয়েছিলেন। তিনি উল্লেখ করেছেন: "অয়ং ধ্বজমহঃ শ্রীমন্মহেন্দ্রস্য প্রবর্ততে; অত্রেদানীময়ং বেদো নাট্যসংজ্ঞঃ প্রযুজ্যতাম্"। ভাণ্ডবাদ্যের সঙ্গে স্বাতির নাম যুক্ত থাকায় আচার্য অভিনবগুপ্ত স্বাতিকে পুষ্করবাদ্যের আবিষ্কারক ব'লে মন্তব্য করেছেন। ভরতও সে'কথা স্বীকার করেছেন। তিনি আতোদ্যপ্রকরণে স্বাতি যে পুষ্করিণীর জলধারার গম্ভীর শব্দের অনুকরণে মৃদঙ্গ বা পুষ্করবাদ্য সৃষ্টি করেছিলেন তা উল্লেখ করেছেন:

যথোক্তং মুনিভিঃ পূর্বং স্বাতিনারদপুষ্করৈঃ।

* * * *

অনধ্যায়ে কদাচিত্তু মুনির্মহতি দুর্দিনে।
জলাশয়ং জগামাথ সলিলানয়নং প্রতি ॥

* * * *

গম্ভীরমধুরং হৃদ্যমাজগামাশ্রমং ততঃ।
গত্বা সৃষ্টং মৃদঙ্গানাং পুষ্করানসৃজত্ততঃ।[২]

ভরতের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় স্বাতি বিশ্বকর্মার সাহায্য নিয়ে মৃদঙ্গ বা পুষ্করের মতো পণব, দর্দুর, এবং দেবতাদের প্রিয় বাদ্য দুন্দুভির অনুকরণে মুরজবাদ্যও নির্মাণ করেছিলেন:

পণবং দর্দুরাংশ্চৈব সহিতো বিশ্বকর্মণা ॥
দেবানাং দুন্দুভিং দৃষ্ট্বা চকার মুরজং ততঃ।[৩]

১। নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা-সংস্করণ) ১।৫০-৫২
২। " " ৩৪।৪-৯
৩। " " ৩৪।৯-১০

অভিনবগুপ্ত ভরতের বর্ণনায় প্রতিধ্বনি ক'রে সুললিত কাব্যছন্দে উল্লেখ করেছেন: "স্বাতি ঋষিবিশেষঃ যেন জলধরসময়নিপতৎসলিলধারাবৈচিত্র্যাভিহন্যমানপুষ্করদলবিলসিতরচিতবিচিত্রবর্ণানুহরণযোজনয়া যথাস্বং বৃত্তিনিয়মেন পুষ্করবাদ্যনির্মাণং কৃতমিত্যর্থঃ"।

অনেকে স্বাতিকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঙ্গীতে রাগ-রাগিণী ও বাদ্যাদির সৃষ্টিরহস্যের পিছনে ইতিহাসের পরিবর্তে পৌরাণিকী কাহিনী ও উপকথারই প্রচলন দেখা যায়। সৃষ্টিকথার সঙ্গে জলধারার ও সঙ্গে সঙ্গে নির্মাতা স্বাতির নামের সম্পর্ক থাকায় অনেকে বৃষ্টির কারণীভূত নক্ষত্রের সঙ্গে স্বাতিকে যুক্ত করেন। অথচ অভিনবগুপ্ত বলেছেন: "স্বাতিঃ ঋষিবিশেষঃ"। স্বাতিকে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসাবে গ্রহণ করলে তিনি যে পুষ্কর, প্রণব, দর্দুর ও মুরজ বাদ্যগুলির উদ্ভাবক ও স্রষ্টা ছিলেন এই মাত্রই বোঝা যায়।

॥ কোহল ॥

ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে কোহলের নামোল্লেখ করেছেন: "কোহলং দত্তিলং তথা" (১।২৬)। শাণ্ডিল্যাদির মতো ভরত কোহলকে তাঁর শিষ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মনে হয় কোহল খৃষ্টীয় ২য়-৩য় শতাব্দীর গুণী। দত্তিল তাঁর 'দত্তিলম্' গ্রন্থে তালের প্রসঙ্গে কোহলের নাম উল্লেখ করেছেন,

অযুগ্মোথঃ প্লুতাদ্যস্তস্তথা চাহাত্র কোহলঃ
দ্বৌ তু চাচপুটৌ কৃত্বা দ্বিতীয়োপান্ত্যকে ক্রমাৎ ॥[১]

কোহল যে একজন ভরতের অনুবর্তী সঙ্গীতশাস্ত্রী ছিলেন তা দত্তিলম্, বৃহদ্দেশী, সঙ্গীত-রত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে প্রমাণ হয়। দত্তিল, মতঙ্গ, শার্ঙ্গদেব প্রভৃতি সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ্‌রা কোহলকে প্রাচীন আচার্য হিসাবে সম্মান দিয়েছেন। 'অভিনবভারতী' থেকে জানা যায় কোহল 'সঙ্গীতমেরু' নামে একটি সঙ্গীতের গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কল্লিনাথও সঙ্গীত-রত্নাকরের নর্তনাধ্যায়ে এই গ্রন্থের ইঙ্গিত করেছেন। সঙ্গীত-রত্নাকরের ৭।২৮৭ শ্লোকের টীকায় কল্লিনাথ উল্লেখ করেছেন: "নাপ্যেত এব কোহলাদিভিরণ্যেষাং দর্শনাৎ"। পুনরায় ৭।৩৫১ শ্লোকের টীকায় তিনি বলেছেন: "স্বরূপপরিজ্ঞানার্থং কোহলোক্তাঃ কাঞ্চন

১। দত্তিলম্ (ত্রিবান্দ্রম্ সং), পৃ° ১২ (১২৮ শ্লোক)।

বর্তনাঃ কথ্যন্তে"। ৭।৩৫২ শ্লোকের টীকায় তিনি আবার উল্লেখ করেছেন: "তেষাং কেষাংচিৎস্বরূপপরিজ্ঞানায় কোহলোক্তানি লক্ষণানি লিখ্যন্তে"। এখানে মুনি শার্দুল প্রশ্নকর্তা ও কোহল বক্তা। এ'প্রসঙ্গে কল্লিনাথ কোহলাচার্যের সঙ্গীতমেরুর দ্বিতীয় অধ্যায়ে যুক্ত ও অযুক্ত হস্তের আশ্রয় চালক প্রভৃতির প্রভেদের কথা উল্লেখ করেছেন। বর্তনার পরিচয় দেবার প্রসঙ্গেই অবশ্য কল্লিনাথ কোহলের মত উদ্ধৃত করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন: "যথা শার্দুলমুনিনা পৃষ্টঃ কোহল উবাচ—

স্বরূপং চালকানাং বৈ সমাহিতমনা শৃণুঃ।
তত্র ক্রিয়া মনোহারী বাদ্যে চালনমুচ্যতে॥

* * * *

অন্যেঽপি বহবঃ পূর্বং প্রযুক্তা ভট্টতণ্ডুনা॥

* * * *

নৃত্তমঙ্গলশাস্ত্রে তু শতং সন্ত্যেব চালয়াকাঃ॥
নারদেনাপি মুনিনা তথা সপ্তশতং মুনে।

* * * *

সহস্রং চালয়াস্ত্বন্যে তাণ্ডবে শম্ভুনোদিতা।

* * * *

নবরত্নমুখং তত্র প্রাহ লোহিতভট্টকঃ॥

* * * *

প্রসঙ্গানুপ্রসঙ্গেন কোহলেন ময়া দিশ (?)।
যথালক্ষণমাখ্যাতা মুনি-শার্দুল তত্ত্বতঃ॥

ইতি কোহলশার্দুলসংবাদে সংগীতমেরৌ যুক্তাযুক্তনৃত্তহস্তাশ্রয়চালয় (-ক)-ভেদ-প্রভেদলক্ষণং নাম দ্বিতীয়মাহ্নিকং সমাপ্তম্"। সঙ্গীত-রত্নাকরের ৭।৩৫১—৩৫২ শ্লোক-দু'টিতে শার্ঙ্গদেব যে বর্তনা-প্রসঙ্গের সূচনা করেছেন ('বর্তনাশ্চতুরৈরূহ্যাস্তাঃ শোভাভরসংভৃতা') তাতে আলোকপাত করার জন্য কল্লিনাথ কোহলের 'সঙ্গীতমেরু' থেকে সুদীর্ঘ একটি প্রমাণবাক্য উদ্ধৃত করেছেন দেখা যায়। কোহলাচার্যের শ্লোকগুলিতে সঙ্গীতাচার্য হিসাবে ভট্টতণ্ডু, শার্দুল, নারদ, ক্ষেমরাজ[২], সুমন্তু[৩], লোহিতভট্ট, শম্ভু প্রভৃতির নামের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং

২। 'তৎস্বস্তিকত্রিকোণাখ্যঃ ক্ষেমরাজেন লক্ষিতম্।'

৩। 'তির্যগগতস্বস্তিকাগ্রং তদুদ্দিষ্টং সুমন্তুনা।'

সেই উল্লেখ থেকে এঁরা যে কোহলের কিছু পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক সঙ্গীতাচার্য একথা স্পষ্ট বোঝা যায়। শম্ভু সম্ভবত সদাশিবভরত। কল্লিনাথের উদ্ধৃতি তথা কোহলের গ্রন্থ থেকে আমরা পতাকা, অরাল, শুকতুণ্ড, অলপল্লব, খটকামুখ, মকর, ঊর্ণা, আবিদ্ধ, রেচিত, নিতম্ব, কেশবন্ধ, ফালব, কক্ষ, উরো, খড়্গ, পদ্ম, তণ্ডু (তণ্ডুদণ্ড?), পল্লব, অর্ধমণ্ডল, ঘাত, ললিত, বলিত, গাত্র, প্রতি প্রভৃতি বর্তনা বা বর্তনিকার পরিচয় পাই। কোহল বিস্তৃতভাবে এদের স্বরূপের পরিচয় দিয়েছেন। তাছাড়া তিনি কররেচকেরও বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন: "ইতি কররেচকরত্নম্"। কররেচকের প্রসঙ্গে কোহল বিশ্লিষ্টবর্তিত, বেপথুব্যঞ্জক, অপবিদ্ধ, লহরীচক্রসুন্দর, বর্তনাস্বস্তিক, সম্মুখীনরথাঙ্গ, পুরোদণ্ডভ্রম, ত্রিভঙ্গীবর্ণসরক, দোল, নীরাজিত, স্বস্তিকাশ্লেষচালয়ন, মিথোসংবীক্ষ্যবাহু, বামদক্ষবিলাসিত, মৌলিরেচিত (-ক), বর্তনাভরণ, আদিকূর্মাবতার, অসংবর্তনক, মণিবন্ধাসিকর্ষ, কলবিম্ববিনোদ, চতুষ্পত্রাব্জ, মণ্ডলাগ্র, বালব্যজচালন, বীরুধবন্ধন, শৃঙ্গাটকবন্ধন, কুণ্ডলিচার, মুকুলাডম্বর, হারদামবিলাসক, ধনুরাকর্ষণ, সাধারণ, সমপ্রকোষ্ঠবলন, দেবোপহারক, তির্যগ্‌গতস্বস্তিকাগ্র[৪], মণিবন্ধগতাগত, অলাতচক্রক, ব্যস্তোৎপ্লুতনিবর্তক, উরভ্রসংবাধ, তির্যক্তাণ্ডবচালন, ধনুর্বল্লীবিনামক, তার্ক্ষ্যপক্ষবিলাসক প্রভৃতি। এ'ছাড়া কোহল শরসন্ধান, মণ্ডলাভরণ প্রভৃতি আরো কয়েকটি লোহিতভট্টের নির্দেশিত কররেচকের পরিচয় দিয়েছেন। কোহলও ভরতের মতো আদি-আচার্য দ্রুহিণ-ব্রহ্মার নাম উল্লেখ ক'রে বলেছেন: 'ব্রহ্মা যা পূর্বে উল্লেখ ক'রে গেছেন তার লক্ষণই আমি প্রতিপাদন করছি। এগুলির যথাযথ প্রয়োগ হ'লে কীর্তি ও কল্যাণ লাভ হয়':

> ইতীদং তপতাং শ্রেষ্ঠ যদাদিষ্টং স্বয়ংভুবা।
> লক্ষণং চালয়া (-কো) নাং বৈ প্রত্যপাদি ময়াঽধুনা॥
>
> *   *   *   *
>
> যথার্হং তে প্রোক্তাঃ স্যুঃ কীর্তিমঙ্গলদায়কাঃ।

সঙ্গীতমেরু গ্রন্থটি অনুষ্টুভ-ছন্দে লেখা। গ্রন্থটিতে মাত্র নাট্য ও সঙ্গীতের আলোচনা আছে।[৫] তাল সম্বন্ধে তিনি নাকি পৃথকভাবে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন ও

৪। এটি নাকি সঙ্গীতাচার্য সুমন্তর উদ্ভাবিত কররেচক।

৫। কোহলের 'সঙ্গীতমেরু' সম্বন্ধে ডাঃ রাঘবন তাঁর *Some Names in Early Saṅgita Literature* নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন: "It is in Anuṣṭubh verses. IV. Its first part treated of Nātya and the latter part only of Saṅgita. The work was thus in the style of the ancient works, in dialogue style

তার নাম ছিল 'তাললক্ষণ'। আচার্য অভিনবগুপ্তও নাট্যাধিকার ও গেয়াধিকারে কোহলের অনেক প্রমাণবাক্য উদ্ধৃত করেছেন। বিশেষ ক'রে নাট্য কিংবা ছন্দের ব্যাপারে পরবর্তী গ্রন্থকারেরা কোহলের উক্তিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন দেখা যায়। কোহল নাকি নাট্যের উপরূপক এবং তোটক, সট্টক প্রভৃতি সাধারণ কতকগুলি ধারা সৃষ্টি করেছিলেন। ডাঃ রাঘবন উল্লেখ করেছেন যে বিশেষ ক'রে নাট্যাভিনয় ও সঙ্গীতের ইতিহাসে কোহলের নাম স্মরণীয় হওয়া উচিত।[৬]

'সঙ্গীতমেরু' ছাড়া কোহল 'তাললক্ষণ' নামেও নাকি একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তা উল্লেখ করেছি। তাছাড়া মাদ্রাজ গ্রন্থসূচীতে 'কোহলীয় অভিনয়-শাস্ত্র' নামে একটি গ্রন্থেরও উল্লেখ পাওয়া যায় (১২৯৪৯ নং)। মাদ্রাজ গ্রন্থসূচীতে 'তাললক্ষণ' গ্রন্থটিরও উল্লেখ আছে (১২৯৯২ নং)।[৭] মাদ্রাজ গ্রন্থাগারের গ্রন্থসূচীতে 'কোহলরহস্যম্' নামেও একটি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৮] গ্রন্থাগারে কোহলরহস্যের মাত্র ১৩শ অধ্যায়ের পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে। পূর্বোক্ত কোহলীয় অভিনয়শাস্ত্রের তেলেগুভাষায় একটি ভাষ্যেরও সন্ধান পাওয়া যায়। 'কোহলরহস্যম্' গ্রন্থটি নাকি সঙ্গীতমেরুর মতো কথোপকথনের আকারে লিখিত। কথোপকথনের কুশীলব কোহল ও মতঙ্গ। কোহলরহস্যে কোহল ও মতঙ্গের নাম একসঙ্গে যুক্ত থাকায় সাধাণতই কোহলকে মতঙ্গের মতো খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম শতাব্দীর গুণী হিসাবে মনে হ'তে পারে। কিন্তু নাট্যশাস্ত্রে কোহলের নামোল্লেখ থাকায় কোহল যে ভরতের সমসাময়িক একথা মনে হওয়া

and divided into Āhnikas."—*The Journal of the Music Academy*, Madras, Vol. III, 1932, p. 17.

৬। The name of Kohala is as great in the history of Drama and Dramaturgy as it is in that of Music. * * In Dramaturgy and Rhetoric, Kohaḷa is always quoted even by later writers as the writer who first introducd the *Upa-rupakas*, minor types of Dramas, *Totaka, Sattaka* etc."—*JMA*., Vol. III, 1932, p. 17.

৭। *The Madras Catalogue*, Vol. XXII.

৮। (a) Vide *Triennial*, 1910-1911 to 1912-1913.

(b) ডাঃ কৃষ্ণমাচারিয়ার উল্লেখ করেছেন কোহল চরিত গ্রন্থের তালাধ্যায়ের কিছুটা অংশ Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the India Office, London, by Eggeling, No. 3025, 3089 এবং Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Oriental Manuscripts Library, Madras, Vol. XXII, No. 8725 (with Telegu Commentary) এবং এছাড়া Aufrecht's Catalogues Catalogorum, pt. I, (Leipzig) No. 130 প্রভৃতিতে পাওয়া যায়।

স্বাভাবিক এবং সে'জন্য 'কোহলরহস্য' গ্রন্থটির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। তাছাড়া ভরত নিজেই ইঙ্গিত করেছেন যে নাট্যশাস্ত্রের শেষাংশ কোহলের রচিত। মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের পাণ্ডুলিপিসংগ্রহে (Madras Government Manuscript Library) সুরেশ্বর-কৃত 'সাহিত্যসার' নামে একখানি গ্রন্থের উল্লেখ দেখা যায়। তাতে ভরত-প্রণীত 'ভরতবিস্তর' গ্রন্থেরও (?) উল্লেখ আছে,

আহৃতং ভরতাং কিঞ্চিং উত্তরাৎ কিঞ্চিদুদ্ধৃতম্।
কলিতং কোহলাৎ কিঞ্চিং কিঞ্চিং ভরতবিস্তরাৎ ॥[৯]

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে নাট্যশাস্ত্রের শেষাংশ কোহল নাকি রচনা করেছিলেন। নাট্যশাস্ত্রের যে অংশটি কোহল রচনা করেছিলেন তাকে বলা হ'ত 'উত্তরতন্ত্র' ও ভারত-রচিত বাকি অংশের নাম ছিল 'পূর্বতন্ত্র'। নাট্যশাস্ত্রে ভরত উল্লেখ করেছেন,

যুষ্মাকং বৈ সংক্ষেপাৎ নহুষস্য মহাত্মনঃ।
আপ্তোপদেশসিদ্ধশ্চ নাট্যো প্রোক্তা স্বয়ংভূবা ॥
শেষমুত্তরতন্ত্রেন কোহলঃ কথয়িষ্যতি।
প্রয়োগঃ কারিকাশ্চৈব নিরুক্তানি তথৈব চ ॥[১০]

অর্থাৎ নহুষের অভিপ্রায় অনুযায়ী ভরতের নাট্যশাস্ত্রকে সর্বসাধারণের দরবারে প্রচার করার জন্য ('এতচ্ছাস্ত্রং প্রযুক্তস্ত নারাণাং বুদ্ধিপূর্বকম্') ঋষি কোহল স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন। ভরত পূর্বতন্ত্রে যে সকল জিনিস লিপিবদ্ধ করেন নি, কোহল নাকি উত্তরন্ত্রে সে সকলের আলোচনা করেছেন। নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত বিবরণটির ঐতিহাসিক সত্যতা কতটুকু তা নির্ণয় করা দুরূহ। তবে আমাদের মনে হয় নাট্যশাস্ত্রের শেষের দিকে কতকগুলি শ্লোক নানা কারণে পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত হওয়া স্বাভাবিক। কেননা পূর্বোক্ত সুরেশ্বর-কৃত সাহিত্যসারে "আহৃতং ভরতাং" প্রভৃতি শ্লোক থেকে প্রমাণ হয় যে নাট্যশাস্ত্রের উত্তরতন্ত্রের সঙ্গে কোহলের কোন সম্পর্ক নাই।[১১]

ডাঃ কৃষ্ণমারারিয়ার উল্লেখ করেছেন কোহল তাঁর 'তাললক্ষণ' গ্রন্থে 'তাল'

৯। Vide *S. S. Madras Manuscripts Trinnial Catalogue*, 1916-1919, R. 2432.

১০। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সংস্করণ) ৩৬।৬৪-৬৫

১১। Vide *The Journal of the Music Academy*, Madras, Vol. III, 1932, pp. 96-97.

শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করতে গিয়ে একদিকে দার্শনিক তত্ত্বরূপ সৃষ্টিরহস্তের অবতারণা করেছেন। কোহল উল্লেখ করেছেন,

তকারঃ শংকরঃ প্রোক্তো লকারঃ শক্তিরুচ্যতে।
শিবশক্তিসমাযোগাত্তালনামাভিধীয়তে ॥[১২]

প্রাচীন নাট্যসম্প্রদায় হিসাবে কোহল-মতঙ্গের নামও শোনা যায়। ভরত ও নন্দিকেশ্বরের মতো কোহল এবং মতঙ্গেরও নাট্য সম্বন্ধে একটি বিশিষ্ট মত ছিল। পূর্বরঙ্গের শ্রেণী হিসাবে কোহল নাকি শুদ্ধ, চিত্র ও মিশ্র এই তিন রকম বিভাগ স্বীকার করতেন। ভাব, রস ও তাদের প্রয়োগ সম্বন্ধেও কোহলের একটি নিজস্ব অভিমত ছিল। নাট্যশাস্ত্রের শেষাংশ রচনা করার দায়িত্ব নাকি নন্দি বা নন্দিকেশ্বরও নিয়েছিলেন। অবশ্য এর মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য কতটুকু আছে তা' নির্ণয় করা দুরূহ।

এক্ষণে বিভিন্ন গ্রন্থে আচার্য কোহলের সঙ্গীত-সম্বন্ধীয় অভিমত যে উদ্ধৃত ও আলোচিত হয়েছে তাদের কিছুটা একত্রিত ক'রে দেখব তাঁর সত্যকারের আলোচনার বিষয়বস্তু ও প্রকৃতি কি ধরণের ছিল। তিনি ষড়্জাদি সাত স্বর ও বাইশটি শ্রুতির পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন শ্রুতিসংখ্যারও পরিচয় দিয়েছেন। শ্রুতির প্রসঙ্গে কোহল উল্লেখ করেছেন,

দ্বাবিংশতিং কেচিদুদাহরন্তি (শ্রুতীঃ ?) শ্রুতিজ্ঞানবিচারদক্ষাঃ।
ষট্‌ষষ্টিভিন্নাঃ খলু কেচিদাসামানন্ত্যেব প্রতিপাদয়ন্তি ॥

ভরতাদি শ্রুতিবিচারবিদ্‌রা বাইশ শ্রুতির পক্ষপাতী। কিন্তু অনেকে চৌষট্টি শ্রুতি ও অপরে অনন্ত শ্রুতির কথাও উল্লেখ করেছেন। মোটকথা কোহল সাতস্বরের অন্তবর্তী সূক্ষ্মস্বর বা শ্রুতিবিবেক সমর্থন করতেন ও তাঁর সময়ে অন্যান্য আচার্যরা যে বিভিন্ন সংখ্যার শ্রুতি মানতেন সেকথারও তিনি উল্লেখ করেছেন।

শ্রুতি বা শ্রবণযোগ্য সূক্ষ্মস্বরের সমষ্টি লৌকিক স্বরের সৃষ্টি সম্বন্ধেও কোহল পরিচয় দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন,

আত্মেচ্ছয়া মহিতলাদ্ (?) বায়ুরুত্তিষ্ঠন্নির্ধার্যতে।
নাড়ীভিত্তৌ তথাকাশে ধ্বনিরুক্তঃ স্বরঃ স্মৃতঃ ॥

মানুষের ইচ্ছা-রূপ শক্তির আঘাতে বায়ু যখন নাভি থেকে ওঠার সময় কণ্ঠদেশে

১২। Vide (a) *Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Oriental MS. Library*, Madras, Vol. XXII, No. 8726.

(b) *History of Classical Sanskrit Literature*, Madras, 1937, p. 832.

প্রতিহত (আঘাতপ্রাপ্ত) হয় তখনি তা ধ্বনি বা শব্দের আকারে বাইরে (স্থূলভাবে) অভিব্যক্ত হয়। বায়ু আকাশেরই ভিন্ন পরিভাষা। লৌকিক সাত স্বর ধ্বনি ছাড়া অন্য কিছু নয়। মতঙ্গও বৃহদ্দেশীতে কোহলের অভিমত বা সিদ্ধান্তকে অনুসরণ ক'রে বলেছেন: "নন্বু স্বর ইতি কিম্? উচ্যতে। রাগজনকো ধ্বনিঃ স্বর ইতি"। সঙ্গীতের ধ্বনি মধুর ও রক্তিজনক এবং রাগকে মূর্তিমান করার মাধ্যম বা কারণ।

ধ্বনি, শব্দ বা স্বরের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে কোহল স্ফোটবাদী পতঞ্জলির মতো অব্যক্ত নাদকে (স্ফোট) নিত্য বা অপরিবর্তনীয় ও আকাশের মতো ব্যাপক বলেছেন। কোহল প্রাচীন মতের পক্ষপাতী হ'লেও তাতে নব্য-বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের স্ফূর্তি দেখা যায়। তিনি উল্লেখ করেছেন,

জাতিভাষাদিসংযোগাদনন্তঃ কীর্তিতঃ স্বরঃ।
নাদৈর্যুক্তস্তালমিতি কৃতৌ যোজ্যো রসেষপি॥

সাঙ্গীতিক স্বর অবিনাশী ও অনন্ত এই বিচারের প্রসঙ্গে কোহল জাতিরাগ ও ভাষারাগের উল্লেখ করেছেন। ভরতেরও উল্লিখিত জাতি বা জাতিরাগ তাঁর সময়ে প্রচলিত ছিল। তাছাড়া গ্রামরাগ ও ভাষাদিরাগের বিকাশও তাঁর সময়ে হয়েছিল, সুতরাং সেদিক থেকে তিনি যে ভরতের সমসাময়িক ও ভরতের তিরোভাবের পরেও কিছুদিন জীবিত ছিলেন তা অনুমান করা যায়। কেননা জাতিরাগ থেকে গ্রামরাগ ও গ্রামরাগ থেকে অন্তরভাষাদি রাগের সৃষ্টি ও সে' সৃষ্টির বিকাশকাল ভরত ও মতঙ্গের তথা খৃষ্টীয় ২য় থেকে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়। কোহল 'নাদৈর্যুক্তস্তালমিতি' শব্দের দ্বারা বাদ্যকেও (তালকে) নাদের অভিব্যক্তি ব'লে স্বীকার করেছেন। তাছাড়া গীত ও বাদ্য-রূপ নাদকে পরিপুষ্ট করার জন্য তিনি ভরতের মতো রাগে রসস্ফূর্তির ('যোজ্যো রসেষপি') উপযোগিতাও স্বীকার করেছেন।

স্বরগুলিও ব্যাপক। ধ্বনি মূর্ছিত হ'য়ে অভিব্যক্ত হয় এবং প্রকৃতির প্রজা জীবজন্তুর ধ্বনির শেষ (অন্তিম) শ্রুতির সঙ্গে তাদের ঐক্য যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় একথা কোহল উল্লেখ করেছেন:

ঊর্ধ্বনাড়ীপ্রযত্নেন সর্বভিত্তিনিঘট্টনাৎ।
মূর্ছিতো ধ্বনিরামূর্ধ্নঃ স্বরোঽসৌ ব্যাপকঃ পরঃ॥
ষড়্জং বদতি ময়ূর ঋষভং চাতকো বদেৎ।
অজা বদন্তি গান্ধারং ক্রৌঞ্চো বদতি মধ্যমম্॥

পুষ্পসাধারণে কালে কোকিলঃ পঞ্চমঃ বদেৎ।
প্রাবৃট্‌কালে তু সম্প্রাপ্তে ধৈবতং দর্দুরো বদেৎ ॥
সর্বদা চ তথা দেবি, নিষাদং বদতে গজঃ।

শ্লোকগুলি 'বদেৎ' ও 'বদতি' ক্রিয়া থাকার জন্য অনেকে ভুলক্রমে ব্যাখ্যা করেন যে ময়ূর থেকে ষড়্‌জ, চাতক থেকে ঋষভ, অজা থেকে গান্ধার প্রভৃতি স্বরের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু শ্লোকের অর্থ তা নয়। সাঙ্গীতিক স্বর কেন, সকল রকম স্বরের কারণই বায়ু (আকাশ)। শিল্পীর অভ্যন্তরস্থ বায়ু কণ্ঠে প্রতিহত হ'য়ে সাঙ্গতিক ধ্বনি বা স্বরের আকারে প্রকাশ পায়। শিল্পীর প্রযত্নই স্বরকে সৃষ্টি করে, ইচ্ছা ও বায়ু তার কারণ। পরবর্তী (এমন কি শিক্ষা-প্রতিশাখ্যের যুগেও চাক্ষুষ্মান শিল্পীরা অভিনিবেশ সহকারে দেখেছিলেন কণ্ঠনির্গত সাত স্বরের প্রতিধ্বনি বা স্বরকম্পনের সঙ্গে কতকগুলি জীবজন্তু ধ্বনির (ডাক বা শব্দের) সাদৃশ্য আছে ও তারি জন্য তারা 'বদেৎ' বা 'বদতি' ক্রিয়াশব্দ-গুলির ব্যবহার করেছেন। ঋক্‌প্রাতিশাখ্যকার "চাষস্তু বদতে মাত্রাং দ্বিমাত্রাং বায়সোঽব্রবীৎ" প্রভৃতি শ্লোকে বাণ্য বা তালের মাত্রার অনুভূতিও যে জীবজন্তুর ডাকে বা ধ্বনিতে পাওয়া তা স্বীকার করেছেন। সম্ভবত কোহলাদি আচার্য সাত স্বরের ধ্বনিসাম্য নিরীক্ষণের বেলায় বৈদিক রীতির অনুসরণ করেছেন।

কোহল মূর্ছনার উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

যোজনীয়ো বুধৈর্নিত্যং ক্রমো লক্ষ্যানুসারতঃ।
সংস্থাপ্য মূর্ছনা জাতিরাগভাষাদিসিদ্ধয়ে ॥

জাতিরাগ, গ্রামরাগ ও ভাষাদিরাগের প্রকাশের সার্থকতা ও পরিপুষ্টির জন্য মূর্ছনার প্রয়োজন। কোহল উল্লেখ করেছেন রাগের লক্ষণ ও প্রকৃতি অনুসারে মূর্ছনার প্রয়োগ করা দরকার। অলংকারের প্রসঙ্গে মতঙ্গ বৃহদ্দেশীতে কোহলের মতানুযায়ী 'নিষ্কূজিত' অলংকারের নিদর্শন দিয়েছেন দেখা যায়। মতঙ্গ যেখানে নিষ্কূজিত অলংকারের পরিচয় দিয়েছেন: "আদ্যং তৃতীয়ং ততো দ্বিতীয়ং ততশ্চ চতুর্থমনেনৈব ক্রমেণাস্থানপ্যারোহ মন্দ্রান্নিষ্কূজিতঃ" সেখানে কোহল বলেছেন: "একান্তরস্বরারোহন্নাহুর্নিষ্কূজিতঃ", অর্থাৎ "সগারিগমপা। মধাপনী। ধসা" এই হ'ল নিষ্কূজিত অলংকারের নিদর্শন। কোহলের মতে একান্তর বা একটি স্বরের অন্তরে (পরে) অপর স্বরের আরোহণকে নিষ্কূজিত অলংকার হয়। তার নিদর্শন যেমন: যায় (১) ষড়্‌জের পর ঋষভকে বাদ দিয়ে গান্ধারের সমাবেশ; (২) মধ্যমের পর পঞ্চমকে বাদ দিয়ে ধৈবত এবং (৩) ধৈবতের

পর নিষাদকে বাদ দিয়ে ষড়্জের সন্নিবেশ। অলংকারের নাম এক হ'লেও মতঙ্গের সঙ্গে কোহলের মতের পার্থক্য আছে।

॥ শাণ্ডিল্য ॥

ভরত নাট্যশাস্ত্রে দু'বার শাণ্ডিল্যের নাম উল্লেখ করেছেন: (১) "শাণ্ডিল্যং চাপি বাৎস্যং চ কোহলং দত্তিলং তথা" (১।২৬) এবং (২) "কোহলাদিভিরেবৈর্বা বাৎস্যশাণ্ডিল্যধূর্তিলৈঃ" (৩৬.৭১)। এই দু'বারই ভরত কোহল, বাৎস্য, ধূর্তিল তথা দত্তিলের সঙ্গে শাণ্ডিল্যের নামোল্লেখ করেছেন। ভরত শাণ্ডিল্যকে তাঁর একশো পুত্র তথা শিষ্যের অন্যতম ব'লে স্বীকার করেছেন। শাণ্ডিল্যের নাম কিন্তু আর কোথাও বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। রামায়ণের ১ম অধ্যায়ের ৪র্থ সর্গে স্থান ও মূর্ছনার প্রসঙ্গে 'তিলক'-টীকাকার রাম শাণ্ডিল্যের প্রমাণবাক্য উদ্ধৃত করেছেন দেখা যায়। যেমন,

> যদূর্ধ্বং হৃদয়গ্রন্থেঃ কপোলফলকাদধঃ।
> প্রাণসঞ্চারণাস্থানং স্থানমিত্যভিধীয়তে ॥
> উরঃ কণ্ঠঃ শিরশ্চেতি তৎপুনস্ত্রিবিধং ভবেৎ।
> মন্দ্রং মধ্যং চ তারং চ * * * ॥
> ইতি শাণ্ডিল্যঃ।

পুনরায় রামায়ণের ১ম অধ্যায়ের ৪র্থ সর্গে যেখানে কুশী-লবের শুদ্ধ-সপ্তজাতিরাগের বিকাশের সঙ্গে রামায়ণগানের উল্লেখ আছে: "সপ্তভিঃ জাতিভির্যুক্তং" (১।৪।৮) সেখানে রামায়ণের অন্য টীকাকার জাতিরাগ সম্বন্ধে শাণ্ডিল্যের প্রমাণবাক্য উদ্ধৃত করেছেন দেখা যায়,

> সর্বগীত-সমাধারো জাতিরিত্যভিধীয়তে।
> ষাড়্জী চৈবাথ নৈষাদী ধৈবতী পঞ্চমী তথা।
> মাধ্যমী চৈব গান্ধারী সপ্তমীত্বার্ষভি মতা ॥

শাণ্ডিল্যের এই দু'টিমাত্র প্রমাণবাক্য থেকে জানা যায় তিনি ভরতের মতের অনুগামী ছিলেন। রামায়ণ-টীকাকার কুশী-লব কর্তৃক গীত শুদ্ধ সাতটি জাতিরাগের অনুযায়ী শাণ্ডিল্য-অনুমোদিত ষাড়্জী, আর্ষভী প্রভৃতি সাতটি শুদ্ধজাতির উল্লেখ করেছেন, বিকৃত কোন জাতিরাগের কথা বলেন নি। কিন্তু মনে হয় ভরতানুগামী শাণ্ডিল্য নিশ্চয়ই বিকৃত জাতিরাগের বিষয় জানতেন। তবে সে

সম্বন্ধে তাঁর কোন স্বীকৃতি কোথাও পাওয়া যায় না। সম্ভবত শাণ্ডিল্যের সঙ্গীত-গ্রন্থ অনেক আগেই লুপ্ত হয়েছে, আর তারি জন্য অপরাপর প্রামাণিক সঙ্গীত-গ্রন্থে তাঁর উদ্ধৃতি বিশেষ পাওয়া যায় না।

॥ বিশ্বাখিল ও বিশ্বাবসু ॥

বিশ্বাখিলের নাম দত্তিল, অভিনবগুপ্ত এঁরা উল্লেখ করেছেন। অভিনবগুপ্ত ন্যাসের প্রসঙ্গে বিশ্বাখিলের নাম উল্লেখ করেছেন: "তস্যান্তেঽর্থসমাপ্তি চ ন্যাসং চাহ বিশ্বাখিলঃ"। দত্তিলের গ্রন্থে বিশ্বাখিলের নাম উল্লেখ থাকায় তিনি যে খৃষ্টীয় ২য়-৩য় শতাব্দীর সঙ্গীতগুণী একথা অনুমান করা অসমীচীন নয়।[১]

বিশ্বাবসুর নাম আমরা মহাভারতে পেয়ে থাকি। সেখানে তিনি গন্ধর্বরাজ এবং সঙ্গীতজ্ঞানে গুণী। মনে হয় গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু ও সঙ্গীতশাস্ত্রী বিশ্বাবসু দু'জন পৃথক ব্যক্তি। বিশ্বাবসু যদি ভরত-পূর্ব কালের গুণী হিসাবে পরিচিত থাকতেন তবে অবশ্যই শিক্ষাকার নারদ ও ভরত তাঁর নামোল্লেখ করতেন। কিন্তু তাঁরা তা করেন নি। পরবর্তী গ্রন্থ হিসাবে বিশ্বাবসুর প্রথম উল্লেখ পাই বৃহদ্দেশীতে স্বরের প্রসঙ্গে। স্বর, শ্রুতি প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশ্বাবসু বলেছেন,

শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বাদ্ ধ্বনিরেব শ্রুতির্ভবেৎ।
সা চৈকাপি দ্বিধা জ্ঞেয়া স্বরান্তরবিভাগতঃ॥
নিয়তশ্রুতিসংস্থানাদ্ গীয়ন্তে সপ্ত-গীতিষু।
তস্মাৎ স্বরগতা জ্ঞেয়াঃ শ্রুতয়ঃ শ্রুতিবিদেভিঃ॥
অন্তঃশ্রুতিবিবর্তিন্যো হ্যন্তরশ্রুতয়ো মতাঃ।
এতাসামপি চৈশ্বর্যং ক্রিয়াগ্রামবিভাগতঃ॥

বিশ্বাবসু উল্লেখ করেছেন যে সূক্ষ্ম স্বরগুলি কাণে শোনা যায় তাদের 'শ্রুতি' বলে। শ্রুতি ধ্বনি বা শব্দবিশেষ। তবে গীতি বা গানের ধ্বনি মধুর ও মনোরঞ্জনকারী। আসলে শ্রুতি একটি, কিন্তু স্বর ও অন্তর-ভেদে তা দু'টি ব'লে প্রতিভাত হয়। সাতটি গীতিও শ্রুতির সঙ্গে সর্বদা সম্পর্কযুক্ত। গ্রামরাগের আশ্রয় ছ'টি গীতির কথা আমরা হরিবংশে সঙ্গীতের আলোচনায় উল্লেখ করেছি। হরিবংশকার যেখানে বলেছেন: "ষড়্‌গ্রামরাগাদিসমাধিযুক্তাম্", টীকাকার নীলকণ্ঠ সেখানে

১। ডাঃ রাঘবন বিশ্বাখিলকে দত্তিলেরও পূর্ববর্তী গুণী ব'লে মন্তব্য করেছেন: "His work was earlier to that of Dattila who quotes him."—*JMA.*, Vol. III, p. 20.

উল্লেখ করেছেন: "তে চ মধ্যশুদ্ধভিন্নগৌড়মিশ্রগীতরূপাঃ"। মতঙ্গ বৃহদ্দেশীতে বলেছেন: "ইদানীং সম্প্রবক্ষ্যামি সপ্তগীতির্মনোহরাঃ"। এই সাতটি গীতি হ'ল: শুদ্ধা, ভিন্নকা, গৌড়িকা, রাগগীতি, সাধারণী, ভাষাগীতি ও বিভাষা। অবশ্য নীলকণ্ঠের সঙ্গে মতঙ্গের গীতিনামের বিশেষ পার্থক্য নাই। যাষ্টিক, শার্দুল, দুর্গাশক্তি প্রভৃতি আচার্যেরা বিশ্বাবসু ও মতঙ্গের চেয়ে গীতির সংখ্যা কম বলেছেন। মতঙ্গ সম্ভবত বিশ্বাবসুকে অনুসরণ করেছেন। সঙ্গীত-রত্নাকরে শ্রুতির আলোচনায় টীকাকার সিংহভূপাল বিশ্বাবসুর উপরি-উক্ত প্রমাণটি উদ্ধৃত করেছেন।

বিশ্বাখিল ও বিশ্বাবসু দু'জনেই নাট্য, নৃত্য, গীত ও বাদ্য সকল বিষয়ে কৃতবিদ্য ছিলেন মনে হয়। শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকরে বিশ্বাখিল ও বিশ্বাবসু উভয়ের নাম প্রাচীন সঙ্গীতাচার্য হিসাবে উল্লেখ করেছেন,

বিশ্বাখিলো দত্তিলশ্চ কম্বলোঽশ্বতরস্তথা।
বায়ুর্বিশ্বাবসু রম্ভার্জুনো নারদতম্বুরু ॥

দেবেন্দ্র তাঁর 'সঙ্গীতমুক্তাবলী' গ্রন্থে বিশ্বাখিলের নাম উদ্ধৃত করেছেন: "প্রোক্তঃ সোঽপি বিশ্বাখিলশ্চ মুনয়ঃ সঙ্গীতবিদ্যেশ্বরাঃ"। অভিনবগুপ্ত টীকায় বা ভাষ্যের গেয়াধিকারে অন্তত ছ'বার বিশ্বাখিলের নামোল্লেখ করেছেন। এ'ছাড়া শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকরের বাদ্যাধ্যায়ে নির্গীত আশ্রাবণবাদ্যের প্রসঙ্গে শার্ঙ্গদেব উল্লেখ করেছেন: "আশ্রাবণং শুষ্কবাদ্যমত্র ত্বাহ বিশ্বাখিলঃ" (৬।১৮৩); অর্থাৎ নির্গীত আশ্রাবণবাদ্যকে বিশ্বাখিল 'শুষ্কবাদ্য' বলেছেন। কল্লিনাথ ও সিংহ-ভূপাল আচার্য বিশ্বাখিলের কথা উল্লেখ করেছেন। এ'থেকে বোঝা যায় বাদ্যবিষয়েও বিশ্বাখিলের একটি নিজস্ব অভিমত ছিল।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে কোহল 'সঙ্গীতমেরু' গ্রন্থে শার্দুল, ভট্টতণ্ডু, ক্ষেমরাজ, লোহিতভট্ট, সুমন্ত প্রভৃতি সঙ্গীতচার্যের নামোল্লেখ করেছেন। নৃত্যের করণপ্রসঙ্গে কোহলও তাঁদের প্রামাণিক গুণী হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কোহল উল্লেখ করেছেন ভট্টতণ্ডু ২৪ রকম বর্তনা স্বীকার করতেন: "চতুর্বিংশতিরিত্যুক্তা বর্তনা ভট্টতণ্ডুনা", কিংবা "অন্যেঽপি বহবঃ পূর্বং প্রযুক্তাভট্টতণ্ডুনা", "ধনুরাকর্ষণখ্যং তন্নির্ণীতং ভট্টতণ্ডুনা"। সুমন্তর বেলায়ও তাই: "নির্বগ্গতস্বস্তিকাগ্রং তদুদ্দিষ্টং সুমন্তুনা"। স্বস্তিকত্রিকোণ-বর্তনার প্রসঙ্গে কোহল ক্ষেমরাজের নামোল্লেখ করেছেন: "তংস্বস্তিকত্রিকোণাখ্যং ক্ষেমরাজেন লক্ষিতম্"। নবরত্নমুখ-বর্তনার প্রসঙ্গে তিনি লোহিতভট্টের নাম করেছেন: "নবরত্নমুখং তত্র প্রাহ লোহিত-ভট্টকঃ"। মুনি শার্দুলের উল্লেখ যেমন: "যথালক্ষণমাখ্যাতা মুনিশার্দুল তত্বতঃ"।

॥ শার্দূল ॥

আচার্য শার্দূলকে মাঝে মাঝে 'ব্যাল' নামেও অভিহিত করা হয়। মতঙ্গ বৃহদ্দেশীতে ভাষাদি গীতির প্রসঙ্গে শার্দূলের মতের উল্লেখ করেছেন: "ভাষাগীতিস্তথৈকৈব শার্দূলমতসম্মতা" (২৯০ শ্লোক)। তাছাড়া দেবালবর্ধনী, পৌরালী, ত্রাবণী (ত্রিবেণী ?), তানললিতিকা, দেহ্যা (?), শার্দূলী, ভিন্নবলিতকা, রবিচন্দ্রা, ভিন্নপৌরালী, দ্রাবিড়ী, পিঞ্জরী, পার্বতী প্রভৃতি অভিজাত দেশী ভাষা-রাগের রূপের পরিচয় দেবার সময় মতঙ্গ শার্দূলের নাম উল্লেখ করেছেন: "অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি শার্দূলমতে ভাষালক্ষণম্"। শুধু তাই নয়, বৃহদ্দেশীর (ত্রিবান্দ্রম সংস্করণ) ভাষারাগ-পর্যায়ে পর পরই শার্দূলের মতের উল্লেখ দেখা যায়: (১) "টক্করাগে শার্দূলমতে ভাষাসমপ্তা", (২) "ইতি শার্দূলমতে পঞ্চমভাষাঃ সমাপ্তাঃ"; (৩) "ইতি শার্দূলমতে ভাষাঃ ষোড়শ সমাপ্তাঃ"। তা'ছাড়া শার্দূলীরাগটি আচার্য শার্দূলের উদ্ভাবিত কিনা কে বলতে পারে! মতঙ্গ বলেছেন শার্দূলের মতে শার্দূলীর রূপ-পরিচিতি হ'ল:

"নিষাদাংশা তু ষড়্জেন বিহীনা পঞ্চমস্বরা।
টক্করাগে তু শার্দূলী + + ঋষভ দুর্বলা (জ্ঞেয়া) ॥

উদাহরণ—নীনিনি। সারীরীমারীরাপানিধাপানিসারিরিমধামারিধানিরিসা।" অবশ্য শার্দূলীর এই স্বররূপের নিদর্শন দিয়ে তার সত্যিকার পরিচয় লাভ করা এখন কঠিন। শার্দূলের সমর্থিত কোন কোন দেশীরাগে নারদ ও তম্বুরুর নামের উল্লেখ আছে। যেমন (১) নিষাদবতীরাগের রূপ-বর্ণনায়: "ধৈবতান্তসংযুক্তা ষাড়বা তুম্বুরু স্মৃতা", কিংবা মধ্যমারাগের বর্ণনায়: "কালিঙ্গা * * গীয়তে নারদ-তুম্বুরু (?)"। মতঙ্গের উল্লেখ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় শার্দূল দেশজ রাগগুলি সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন এবং তাঁর সময়ে গান্ধর্বের পরিবর্তে অভিজাত (মার্গপ্রকৃতিসম্পন্ন) দেশজ রাগগুলির সমাজে প্রচলন আরম্ভ হয়েছে। আচার্য কোহলও[১] শার্দূলের সম্বন্ধে জানতেন, কেননা তাঁর 'সঙ্গীতমেরু' গ্রন্থে শার্দূলকে তিনি অন্যতম বক্তারূপে গ্রহণ করেছেন: "ইতি কোহলশার্দূলসংবাদে সঙ্গীতমেরৌ" প্রভৃতি। টীকাকার কল্লিনাথ উল্লেখ করেছেন: "যথা শার্দূলমুনিনা

১। কোহল শার্দূলের নামোল্লেখ করেছেন এবং দত্তিল কোহলের নাম ও তাঁর প্রমাণবাক্য উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় দত্তিল তাঁর গ্রন্থে শার্দূলের কোন নামের উল্লেখ করেন নি। কাজেই প্রত্যেকের সঠিক অভ্যুদয়কাল নির্ণয় করা কঠিন।

পৃষ্টঃ কোহল উবাচ"। সুতরাং শার্দূলের অভ্যুদয়কাল খৃষ্টীয় ২য় থেকে ৫ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ব'লে অনুমান হয়।

রাজা রঘুনাথ (১৭শ শতাব্দী) তাঁর 'সঙ্গীতসুধা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন আচার্য শার্দূলের মতে শ্রুতির জাতি পাঁচটি—দীপ্তা, আয়তা, করুণা, মৃদু ও মধ্যা। শার্দূলের এই বিবরণ ও বিভাগ শিক্ষাকার নারদের (খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী) সঙ্গে মেলে। পূর্বেই আমরা শিক্ষাকার নারদের মতে দীপ্তাদি পাঁচটি জাতি ও জাতি অনুযায়ী বাইশটি শ্রুতির কথা উল্লেখ করেছি। জাতি যেন বীজ বা কারণ ও শ্রুতি তার কার্য। নারদ (১ম) অবশ্য বর্তমান শ্রুতির কথা বলেন নি বা সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেন নি। তিনি দীপ্তাদিকেই শ্রুতি বলেছেন :

দীপ্তায়তাকরুণানাং মৃদুমধ্যময়োস্তথা।
শ্রুতীনাং যোঽবিশেষজ্ঞো ন স আচার্য উচ্যতে ॥
দীপ্তা মন্দ্রে দ্বিতীয়ে চ প্রচতুর্থে তথৈব তু।
অতিস্বারে তৃতীয়ে চ ক্রুষ্টে তু করুণা-শ্রুতিঃ ॥
শ্রুতয়োঽন্যা দ্বিতীয়স্ত মৃদুমধ্যায়তা স্মৃতাঃ।

নারদ বৈদিক প্রথমাদি স্বরের শ্রুতি (পরবর্তীকালে শ্রুতির জাতি) নির্ণয় করেছেন, লৌকিক ষড়্‌জাদির নয়। অথচ একথা ঠিক যে খৃষ্টপূর্ব যুগে শ্রুতির কোন ব্যবহার ও উল্লেখের কথা আমরা কোন বৈদিক সাহিত্যে পাই না।

রাজা রঘুনাথ সঙ্গীতসুধায় শার্দূলের উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

'ততঃ শ্রুতীনামপি পঞ্চ জাতীর্বক্ষ্যামি শার্দূলমতানুসারাৎ' ॥

শার্দূল দত্তিলের পূর্ববর্তী ও কোহলের পরবর্তী গুণী, অর্থাৎ শার্দূলের অভ্যুদয়-কাল পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে খৃষ্টীয় ২য় থেকে ৫ম শতাব্দীর মধ্যে। সুতরাং দেখা যায় শিক্ষাকার নারদের ও শার্দূলের সময়ের ব্যবধানে (খৃষ্টীয় ২য় থেকে ৫ম শতাব্দী) নারদে শ্রুতি জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। অবশ্য ভরত বাইশ শ্রুতির কথাই বলেছেন (লৌকিক ষড়্‌জাদি স্বরের), শ্রুতির কারণীভূত জাতির উল্লেখ তিনি করেন নি। শার্দূল দীপ্তাদি পাঁচটি জাতির অন্তর্গত বাইশটি শ্রুতির উল্লেখ করেছেন ('শার্দূলমতানুসারাৎ')। কশ্যপ, দুর্গাশক্তি, যাষ্টিকাদি প্রাচীন শাস্ত্রীরা তা সমর্থন করেছেন : "উক্তং কিল কাশ্যপেন" (কশ্যপেন ?), "দ্বাবিংশতিঃ কাশ্যপযাষ্টিকাদ্যৈঃ শ্রুতিপ্রভেদাঃ কথিতাঃ স্বরেব"। রঘুনাথের শ্লোকগুলি হ'ল :

দীপ্তায়তা স্যাৎকরুণা মৃদুশ্চ মধ্যেতি নামানি চ কীর্তিতানি।
জাতিস্বরূপে কথিতে চ পশ্চাৎপ্রত্যেকমাসাং কথয়ামি ভেদান্ ॥

চতুর্বিধাস্থা খলু তত্র দীপ্তা তীব্রা চ রৌদ্রীতি চ রঞ্জিকোগ্রা।
তত্রাঽয়তা পঞ্চবিধা প্রসিদ্ধা কুমুদ্বতী প্রাথমিকী দ্বিতীয়া॥
ক্রোধা প্রসারিণ্যপরা চতুর্থী সন্দীপনী স্যাদথ রোহিণীতি।
জাতিস্তৃতীয়া করুণা ত্রিধা স্যাদ্দয়াবতী প্রাথমিকী দ্বিতীয়া॥
আলাপিনী চৈব মদন্তিকা চ ত্রৈবিধ্যমুক্তং কিল কশ্যপেন।
মৃদুশ্চতুর্থী কথিতা চ মন্দা তত্রাদিমা স্যাদ্রতিকা দ্বিতীয়া॥
প্রীতিঃ পরা ক্ষমা কথিতা চতুর্থী দুর্গামতজ্ঞৈঃ কথিতং কিলৈবম্।
মধ্যা চ ষোঢ়া পরকীর্তিতাস্থা ছন্দোবতী রঞ্জনিকা দ্বিতীয়া॥
স্যান্মার্জনী তত্র চ রক্তিকাঽন্যা রম্যাপরা ক্ষোভিণিকা তথাঽন্যা।
দ্বাবিংশতিঃ কাশ্যপযাষ্টিকাদ্যৈঃ শ্রুতিপ্রভেদাঃ কথিতাঃ স্যুরেবম্॥[২]

সুতরাং দেখা যায়,

জাতি			শ্রুতি
(১)	দীপ্তা	·	দীপ্তা, তীব্রা, রৌদ্রী ও রঞ্জিকা (বজ্রিকা ?) = ৪টি
(২)	আয়তা	···	কুমুদ্বতী, ক্রোধা, প্রসারিণী, সন্দিপনী ও রোহিণী = ৫টি
(৩)	করুণা	···	দয়াবতী, আলাপিনী ও মদন্তিকা (মদন্তী ?) = ৩টি
(৪)	মৃদু	··	মন্দা, রতিকা, প্রীতি ও ক্ষমা (?) = ৪টি
(৫)	মধ্যা	···	ছন্দোবতী, রঞ্জানিকা (রঞ্জনী ?), মার্জনী, রক্তিকা (রতিকা ?), রম্যা ও ক্ষোভিণীকা (ক্ষোভিণী) = ৬টি
			মোট = ২২টি

খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকরে শ্রুতির জাতি সম্বন্ধে যা উল্লেখ করেছেন তা শার্দুলের সঙ্গে মেলে। শার্ঙ্গদেব জাতিগুলিকে শ্রুতির হেতু বা 'কারণ' বলেছেন: "পূর্বা অপ্যত্র হেতবঃ"। এই শ্রুতি-জাতিসম্বন্ধ স্থাপন করার সার্থকতা কি সে'কথা শার্ঙ্গদেব কিছু বলেন নি। টীকাকার কল্লিনাথ বলেছেন (শার্ঙ্গদেবের পরবর্তী যুগে): "এতেন 'কুলানি জাতয়' ইত্যাদিক্রমস্ত্ববিবক্ষিত ইতি মন্তব্যম্"। কল্লিনাথের কুলানুযায়ী জাতি নির্ণয়ের মন্তব্যটি আমাদের মতে মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ ও প্রীতিপ্রদ নয়। বরং সিংহভূপাল তাঁর 'সুধাকর'-টীকায় যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। কল্লিনাথ বলেছেন:

২। 'সঙ্গীতসুধা' (The Music Academy, Madras, 1940), ১-১৩১

"নমু কিং শ্রুতিজাতিনিরূপণেন প্রয়োজনম্? উচ্যতে—তত্তজ্জাতিকাং শ্রুতিং শ্রুত্বা মনসো নামসাম্যেন তথা তথা বিকার উৎপদ্যত ইতি সূচয়িতুং শ্রুতিজাতি-নিরূপণম্। ততশ্চ দীপ্তাং শ্রুতিমাকর্ণ্য মনসো দীপ্তত্বমিব ভবতি, আয়তাং শ্রুতিমাকর্ণ্যায়তত্বমিব, এবং করুণত্বাদি জ্ঞাতব্যম্"। আমরা পূর্বেও এভাবে শ্রুতি-জাতিসম্বন্ধের সার্থকতার কথা উল্লেখ করেছি। শার্ঙ্গদেব নিম্নলিখিত ভাবে শ্রুতি-জাতিসম্বন্ধ বর্ণনা করেছেন,

	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
শ্রুতি	তীব্রা,	কুমুদ্বতী,	মন্দা,	ছন্দোবতী,	দয়াবতী,	রঞ্জনী,	রতিকা,	রৌদ্রী,
জাতি	দীপ্তা	আয়তা,	মৃদু,	মধ্যা,	করুণা,	মধ্যা,	মৃদু,	দীপ্তা
	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
শ্রুতি	ক্রোধা,	বজ্রিকা,	প্রসারিণী,	প্রীতি,	মার্জনী,	ক্ষিতি,	রক্তা,	সন্দীপনী,
জাতি	আয়তা,	দীপ্তা,	আয়তা,	মৃদু,	মধ্যা,	মৃদু,	মধ্যা,	আয়তা,
	১৬	১৮	১৯	২০	২১	২২		
শ্রুতি	আলাপিনী,	মদন্তী,	রোহিণী,	রম্যা,	উগ্রা,	ক্ষোভিণী।		
জাতি	করুণা,	করুণা,	আয়তা,	মধ্যা,	দীপ্তা,	মধ্যা।		

॥ দত্তিল ॥

দত্তিল বা দন্তিলের পরিচয় মনে হয় আচার্য কোহলের পরেই দেওয়া উচিত, কেননা বেশীরভাগ সময় প্রাচীন আচার্যদের অনেকে কোহল ও দত্তিলের নাম একই সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।[১] বিশেষ ক'রে অভিনবগুপ্ত তাঁর অভিনবভারতীর গেয়াধিকারে কোহল ও দত্তিলের নামের উল্লেখ অনেক সময় এক সঙ্গে করেছেন দেখা যায়।

ভরত নাট্যশাস্ত্রে দত্তিলের নামোল্লেখ করেছেন। তাঁর "ত্বং পুত্রশতসংযুক্তঃ" প্রভৃতি শ্লোক থেকে জানা যায় দত্তিল কোহলাদির মতো ভরতের পুত্র তথা শিষ্যস্থানীয় ছিলেন ("পুত্রানধ্যাপয়ং যোগ্যান্")। ভরতের নাম নাট্যশাস্ত্রে দু'বার দু'জায়গায় 'দন্তিল' ও 'ধূর্তিল' এই দু'রকম নামে উল্লেখ করা হয়েছে: (১) "শাণ্ডিল্যং চাপি বাৎস্যং চ কেহালং (?) দন্তিলং তথা" (১।২৬) ও

১। ডাঃ রাঘবনের অভিমতও তাই। তিনি উল্লেখ করেছেন: "Even as regards the original Dattila, it may be only later to Kohala."—*JMA*, Vol. III, 1932, p. 18.

(২) "কোহলাদিভিরেবৈর্বা বাৎস্যশাণ্ডিল্যধূর্তিলৈঃ" (৩৬।৭১)। দু'বারই দত্তিলের নাম শাণ্ডিল্য ও কোহলের নামের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। এ' থেকে মনে হয় শাণ্ডিল্য, কোহল ও দত্তিল প্রায় সমসাময়িক।

ত্রিবান্দ্রাম-সংস্কৃত-সিরিজ (No. CH) থেকে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে দত্তিলাচার্য-কৃত 'দত্তিলম্' গ্রন্থটি ছাপা হয়েছে, সম্পাদনা করেছেন কে. সাম্বস্বামী শাস্ত্রী। কিন্তু এই গ্রন্থটি মুনি[২] দত্তিলের রচিত হ'লেও যে অসম্পূর্ণ তা বোঝা যায়। ডাঃ রাঘবনের অভিমত তাই। তিনি বলেছেন প্রধানভাবে নাট্য, নৃত্য ও সঙ্গীত সম্বন্ধে দত্তিলাচার্য-প্রণীত একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ ছিল। অভিনবগুপ্তের আলোচনা থেকে বোঝা যায় সে'টি ভরতের নাট্যশাস্ত্র ও কোহলের সঙ্গীতমেরুর মতো অনুষ্টুভছন্দে লেখা ছিল। দত্তিলের বড় গ্রন্থটি এখন পাওয়া যায় না।[৩] ত্রিবান্দ্রম-সংস্করণ গ্রন্থটির সম্পাদক কে. সাম্বশিব শাস্ত্রী অবশ্য এ'কথা ঠিক মেনে নিতে পারেন নি। তিনি গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন : "It may be doubted from the last line 'অকরোদ্ দত্তিলঃ শাস্ত্রং গীতং দত্তিলসংজ্ঞিতম্' that the present work is only an abridgement by a later hand from a larger work on music by Dattila. But the fact that the stanzas quoted by Mataṅga in his *Brihaddeśī* and by Kṣīrasvāmin in his commentary of *Amarakoṣa* are a traceable in the present work makes it certain that it is the real work of Dattila."। তিনি সর্বানন্দ-কৃত অমরকোষের 'টীকাসর্বস্ব' ভাষ্যে উল্লিখিত "যদ্ দত্তিলঃ—মুখং প্রতিমুখং চৈব গর্ভো বিমর্শ এব চ" প্রভৃতি দত্তিল-নামাঙ্কিত শ্লোকগুলি 'দত্তিলম্' গ্রন্থে না পাওয়ার জন্য দত্তিলাচার্যের অপ্রকাশিত একখানি নাট্যগ্রন্থ ছিল ব'লে অনুমান করেছেন ("I think

২। 'মুনি' জ্ঞানবৃদ্ধ আচার্যদের উপাধি-বিশেষ ব'লে মনে হয়।

৩। "*Dattilam* published now in the Trivāndrum Series is only a very late fragmentary selection or condensation of the early original and big work of Dattila, which is not yet available. Dattila's work must have, like other early works, dealt with Dance and Dramaturgy. It must have been big. The Trivāndrum text of *Dattilam* is very poorly small even as regards Music. It has no section of Drama and Dance. There is no denying the fact that Dattila's work treated of Nātya also."—*The Journal of the Music Academy*, Madras, Vol. III, p. 18.

there must be a treatise also on dramaturgy by Dattila")। আমাদের অনুমান দত্তিল-কৃত পৃথক নাট্যগ্রন্থ থাকলেও বিশেষভাবে নৃত্য, গীত ও নাট্যসম্বন্ধে বৃহৎ একটি গ্রন্থ অবশ্যই ছিল এবং বর্তমান 'দত্তিলম্' সেই গ্রন্থের সঙ্গীতাংশের সংক্ষেপ বা সারাংশ মাত্র। 'দত্তিলম্' গ্রন্থের মুখবন্ধ-শ্লোকেও তার আভাস পাওয়া যায় :

(প্রণম্য পরমেশানাং) ব্রহ্মাদ্যাংশ্চ গুরুংস্তথা।
গান্ধর্বশাস্ত্রসংক্ষেপঃ সারতোঽয়ং ময়োচ্যতে ॥

দত্তিল ভরতকে অনুসরণ ক'রে নাট্যের উপযোগী গান্ধর্ব-সঙ্গীতেরই আলোচনা করেছেন। গান্ধর্বগানকে তিনি বলেছেন 'অবধান' : "প্রযুক্তশ্চাবধানেন" বা "প্রসিদ্ধমবধানং তু"। ভরত যেমন স্বর-তাল-পদাত্মক গানকে 'গান্ধর্ব' বলেছেন : "গান্ধর্বমিতি বিজ্ঞেয়ং স্বরতালপদাশ্রয়ম্" (২৮।৮), দত্তিলের পরিচয় দেবার ভঙ্গিও ঠিক তেমনি। দত্তিল বলেছেন,

পদস্থস্বরসঙ্ঘাতস্তালেন সুমিতস্তথা।
প্রযুক্তশ্চাবধানেন গান্ধর্বমভিধীয়তে ॥

পদমধ্যস্থ স্বরসমূহ ও তালের দ্বারা যে গান অবধানের সঙ্গে প্রযুক্ত হয় তাকেই 'গান্ধর্ব' বলে। এখানে 'অবধান' শব্দে মনঃসংযোগ ও তদনুসঙ্গী একান্ত যত্ন ও অধ্যবসায়। উপরি-উক্ত শ্লোকটিতে দত্তিলাচার্যের আসল বক্তব্য হ'ল একান্ত মনঃসংযোগ সহকারে ও যত্নের সঙ্গে পদের মধ্যে যে সাত স্বর ও তালাদি আছে তাদের সুপরিস্ফুটভাবে প্রকাশ করতে না পারলে গান্ধর্বগানের রূপ বাস্তবে পরিণত হয় না। উপাদান হিসাবে স্বর, তাল ও পদ থাকলেও সাধকের (শিল্পীর) অবধান বা মনসংযোগই তাদের পিছনে মূলকারণ, আর তারি জন্য সমগ্র জিনিসটিকে 'অবধান' নাম দেওয়া যেতে পারে। দত্তিল তাই উল্লেখ করেছেন : "প্রসিদ্ধমবধানং তু সম্যগ্‌বুদ্ধ্যাদিযোজনম্" (৪র্থ শ্লোক)। গান্ধর্বগানকে যে উপাদানগুলি পরিপুষ্ট ও পূর্ণ করে সেগুলি হ'ল : শ্রুতি, স্বর, গ্রাম, মূর্ছনা, তান, স্থান বৃত্ত, শুষ্ক বা নির্গীত বাদ্য, সাধারণ, জাতি, বর্ণ, অলংকার ও রস। গান্ধর্বের বর্ণনায় দত্তিল ভরতকে অনুসরণ করেছেন। তিনি বাইশটি শ্রুতির পক্ষপাতী : "দ্বাবিংশতিবিধো ধ্বনিঃ"। শ্রুতিকে দত্তিল অবশ্য 'ধ্বনি' বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রুতি ধ্বনি বা স্বরই, তবে তা সূক্ষ্ম। শ্রুতির অনুভূতি (আবিষ্কার) ব্যাপারে বীণার কথাই তিনি উল্লেখ করেছেন। মন্দ্র থেকে পরপর (উত্তরোত্তর)

তার তথা উচ্চের দিকে গতিযুক্ত ধ্বনিই শ্রুতির স্বরূপ জানিয়ে দেয়। দত্তিল বলেছেন,

উত্তরোত্তরতারস্তু বীণায়ামধরোত্তরঃ।
ইতি ধ্বনিবিশেষাস্তে শ্রবণাচ্ছ্রুতিসংজ্ঞিতাঃ॥

দত্তিল শ্রুতির অনুভূতি-ব্যাপারে বীণার তন্ত্রীতে (তারে) স্বরের উত্তরোত্তর আরোহণ-অবরোহণের কথাই বলেছেন। ষড়্জাদি স্বর সাতটি। ষড়্জ ও মধ্যম দু'টি গ্রাম। অনেকে (নারদাদি) গান্ধারগ্রামের কথাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু দত্তিলের সময় গান্ধারগ্রামের অপ্রচলন হয়েছিল।[৪]

শ্রুতির অনুভূতির জন্য দত্তিল ভরতের মতো ষড়্জগ্রামের ষড়্জ থেকে স্বর ক্রমশ উর্ধ্বে (তার-ষড়্জের দিকে) উত্থিত হ'লে ঋষভাদি অন্যান্য স্বর নিরূপিত হয় একথাই বলেছেন। সাত স্বরকে তিনি বলেছেন 'স্বরমণ্ডল': "ব্যবস্থিতান্তরান্ বেত্তি স বেত্তি স্বরমণ্ডলম্"। শিক্ষাকর নারদের স্বরমণ্ডল কিন্তু শ্রুতি, স্বর, মূর্ছনা গ্রাম, তাল প্রভৃতি নিয়ে সার্থক: "সপ্ত স্বরাস্ত্রয়ো গ্রামা মূর্ছনাস্ত্বেকবিংশতিঃ, তানাএকোনপঞ্চাশদিত্যেতৎ স্বরমণ্ডলম্"। টীকাকার ভট্টশোভাকর অনেকটা দত্তিলের মতো বলেছেন: "স্বরণাং সমূহো মণ্ডলম্"। শ্রুতি অনুসারে দত্তিলের সাত স্বরের নিরূপণপ্রণালী একটু নতুন (বা অদ্ভুত) ধরণের, কেননা ষড়্জগ্রামের বেলায় ষড়্জ থেকে ক্রমোচ্চ ধারার অনুসরণ করলেও তিনি ঋষভকে বলেছেন তৃতীয় সংখ্যক স্বর, গান্ধার দ্বিতীয়, মধ্যম চতুর্থ, মধ্যম থেকে গান্ধারের অনুভূতি হয়, (তার-ষড়্জ থেকে ?) নিষাদ দ্বিতীয়, ধৈবত তৃতীয় (এবং তার-ষড়্জ চতুর্থ)। দত্তিল উল্লেখ করেছেন,

ষড়্জত্বেন গৃহীতো যঃ ষড়্জগ্রামে ধ্বনির্ভবেৎ।
তত উর্ধ্বং তৃতীয়ঃ স্যাদ্ ঋষভো নাত্র সংশ্রয়ঃ (?)॥
ততো দ্বিতীয়ো গান্ধারশ্চতুর্থো মধ্যমস্ততঃ।
মধ্যমাৎ পঞ্চমস্তদ্বৎ তৃতীয়ো ধৈবতস্ততঃ॥
নিষাদোঽতো দ্বিতীয়ঃ স্যাৎ ততঃ ষড়্জশ্চতুর্থকঃ।

দেখা যায় মধ্যম ও তার-ষড়্জ উভয়েই চতুর্থ স্বর। সুতরাং দত্তিলের স্বরমণ্ডলের নক্সাটি হ'ল:

৪। স্বরা ষড়্জাদয়ঃ সপ্ত গ্রামৌ দ্বৌ ষড়্জমধ্যমৌ।
কেচিদ্ গান্ধারমপ্যাহুঃ স (তু) নেহোপলভ্যতে।

×			×				×
স	রি	গ	ম	প	ধ	নি	র্স
১ম	৩য়	২য়	৪র্থ	|	৩য়	২য়	৪র্থ
|	|	|	|	|	|	|	|
৪র্থ	৩য়	২য়	১ম	৪র্থ	৩য়	২য়	১ম
|	|	| ←	|	|	|	|	←
১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ	৭ম	×
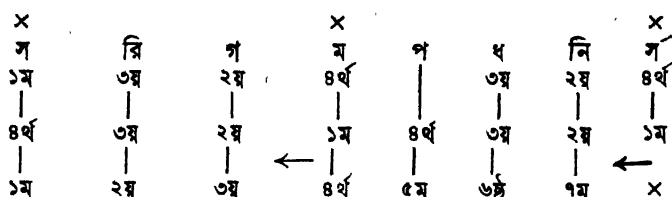
দত্তিলের শ্লোকানুযায়ী স্বরমণ্ডলস্থিতির নক্সা অনেকটা এ' ধরণেরই দাঁড়ায় ও তা ভরতের শ্রুতি অনুযায়ী স্বর-নির্দেশপ্রণালী থেকে অভিনব, কিন্তু রহস্যপূর্ণ।

বিকৃত স্বর হিসাবে দত্তিল ভরতের মতো অন্তরগান্ধার ও কাকলিনিষাদের নামোল্লেখ করেছেন: "নিষাদঃ কাকলীসংজ্ঞো * * গান্ধারস্তদ্বদেব স্যাদন্তরস্বর-সংজ্ঞিতঃ"। নিষাদের কাকলিত্ব নিষ্পন্ন করার জন্য দত্তিল বলেছেন: "দ্বিশ্রুত্যুৎ-কর্ষণাদ্ ভবেৎ"; অর্থাৎ ষড়্‌জ চারটি শ্রুতিযুক্ত ও নিষাদ দু'টি শ্রুতিসম্পন্ন হবে। এক্ষণে নিষাদ ষড়্‌জের দু'টি শ্রুতিকে নিয়ে যদি চারশ্রুতিসম্পন্ন হয় তবে ষড়্‌জস্বর চ্যুত বা বিকৃত (মাত্র দু'টি শ্রুতিসম্পন্ন) হয় ও নিষাদের নাম হয় 'কাকলি'। তেমনি গান্ধারও দু'টি শ্রুতিযুক্ত এবং যদি তা চারশ্রুতিসম্পন্ন মধ্যম থেকে দু'টি শ্রুতি নিয়ে চারশ্রুতির (গান্ধার) হয় তবে মধ্যম হয় চ্যুত বা বিকৃত ও গান্ধারের নাম হয় তখন 'অন্তর'। শ্রুতিসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধিই (উৎকর্ষ-অপকর্ষ) শুদ্ধ-বিকৃত অথবা কাকলি-অন্তরত্বের কারণ। শ্রুতি অনুরণনাত্মক সূক্ষ্মধ্বনি এবং সাতস্বর স্থূল, কিন্তু তাহ'লেও সাতস্বর শ্রুতির মতো অনুরণনাত্মক ও রঞ্জনাশক্তিবিশিষ্ট।[৫]

দত্তিল বলেছেন যে স্বর গানে ও আলাপে বেশী ব্যবহৃত হয় তাকে 'অংশ' বা 'বাদী' বলে।[৬] ভরতের মতো তিনি অংশ ও বাদীকে সমশ্রেণীভুক্ত বলেছেন, কিন্তু একই রাগের যে অনেকগুলি ক'রে অংশ হবে তার কোন নিদর্শন দেন নি। তিনি সংবাদী, অনুবাদী ও বিবাদী স্বর-তিনটিরও উল্লেখ করেছেন ও বলেছেন: "স্বরাংশ্চতুর্বিধানেব জানীয়াৎ"।

দত্তিল ভরতের মতো মূর্ছনা প্রভৃতির সংখ্যা ও নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি চতুরশীতি (৮৪টি) তানের কথাও বলেছেন এবং শিক্ষাকার নারদ যেমন তানগুলিকে যজ্ঞনামের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন দত্তিলও তেমনি "অগ্নিষ্টোমা-

৫। রাজা রঘুনাথ 'সঙ্গীতসুধা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,

এবং স্বতো রঞ্জকতামবাপ্তঃ স্বরাহ্বয়োঽসৌ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ।

শ্রুতিস্বরূপং রণনাত্মকং স্যাৎস্বরস্ততঃস্যাদনুরণরূপঃ।

৬। যোঽত্যন্তবহুলো যত্র বাদী বাংশশ্চ তত্র সঃ। ১৮

দিনামানঃ" প্রভৃতি ব'লে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন যজ্ঞনামীয় তানগুলি দেবতাদের আরাধনায় ও পুণ্যোৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়ঃ "দেবারাধযোগেন তৎপুণ্যোৎপাদকা যতঃ"। সাত স্বরযুক্ত (সম্পূর্ণ) তান ছাড়াও তিনি ষাড়ব ও ঔড়ব তানগুলির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন,

ক্রমমুৎস্জ্য তন্ত্রীণাং তননৈর্মূর্ছনাস্তু যাঃ।
পূর্ণাশ্চৈবাপ্যপূর্ণাশ্চ কূটতানাস্তু তে স্মৃতাঃ॥
পূর্ণাঃ পঞ্চসহস্রাণি ত্রয়স্ত্রিংশচ্চ সংখ্যয়া।
কথয়ন্তি প্রতিগ্রামমুপায়ো গণনেঽধুনা॥

বীণার তন্ত্রীতে বা তারে আঘাত প্রাপ্ত হ'য়ে যে সকল স্বর (শ্রুতিমধুর ধ্বনি) বিস্তৃতি লাভ ক'রে মূর্ছিত হয় তাদেরই 'তান' বলে। তান পূর্ণ, অপূর্ণ ও কূট ভেদে তিন রকম। ষড়্জ ও মধ্যম এই দু'টি গ্রামের পূর্ণতান সংখ্যায় পাঁচ হাজার তেত্রিশটি (৫০৩৩)। মুনি কোহল ও মকরন্দকার নারদ পূর্ণ, ষাড়ব ও ঔড়ব তানগুলির চাক্ষুষ কার্যকারিতার কথাও উল্লেখ করেছেন। কোহলাচার্য বলেছেন,

আয়ুর্ধর্মো যশঃকীর্তির্বুদ্ধিসৌখ্যধনানি চ।
রাজ্যাভিবৃদ্ধিসন্তানঃ পূর্ণরাগেষু জায়তে॥
সংগ্রাম-রূপ-লাবণ্যাবিরহং গুণকীর্তনম্।
ষাড়বেন প্রগাতব্যং লক্ষণং গদিতং যথা॥
ব্যাধিনাশী শত্রুনাশী ভয়শোকবিনাশন।
ব্যাধিদারিদ্র্য সন্তাপে বিষমগ্রহমোচনে

* * *

ঔড়বেন প্রগাতব্য গ্রামশাস্ত্যর্থকর্মাণি॥

শুদ্ধ ও বিকৃতভেদে দত্তিল আঠারটি জাতিরাগের উল্লেখ করেছেন। রাগত্বধর্ম বা রাগপ্রকৃতির নিয়ামক গ্রহ, অংশ, তার, মন্দ্র, ষাড়ব, ঔড়ব, অল্পত্ব, বহুত্ব, ন্যাস ও অপন্যাস এই দশটি লক্ষণের তিনি পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ৫৭ থেকে ৬৩ শ্লোকগুলিতে ভরতের অনুরূপ দশলক্ষণের আভিধানিক অর্থ নির্ণয় করেছেন। তাছাড়া তিনি আঠারটি জাতিরাগের অংশ গ্রহাদিরও উল্লেখ করেছেন। তিনি আরোহাদি চারটি বর্ণ, প্রসন্নাদি অলংকার প্রভৃতিরও বর্ণনা করেছেন।

'অথ তালং প্রবক্ষ্যামি' ব'লে ১০৯ শ্লোক থেকে দত্তিল কলা, পাত, পাদভাগ, মাত্রা, পরিবর্ত, বস্তু, বিদারী, অঙ্গুলি, পাণি, যতি প্রভৃতি বাদ্যের

অপরিহার্য উপাদানগুলির পরিচয় দিয়েছেন। তারপর তিনি আবাপ, নিষ্ক্রাম, বিক্ষেপ, প্রবেশন (প্রবেশ), শম্যা, তাল, সন্নিপাত এই সাতটি তালের নামোল্লেখ ক'রে তাদেরও প্রত্যেকটি পরিচয় দিয়েছেন। 'কলা'-র উল্লেখ ক'রে তিনি বলেছেন নিমেষকালকে অনেকে 'কলা' বলেন। মার্গতাল আবাপাদি কলাযুক্ত হ'য়ে প্রকাশ পায়। কলা তিনটি—চিত্রা, বার্তিক ও দক্ষিণা। চিত্রায় দু'টি, বার্তিকে চারটি ও দক্ষিণায় আটটি কলার সমাবেশ থাকে: "দ্বিমাত্রা স্যাৎ কলা চিত্রে চতুর্মাত্রা তু বার্তিকে, অষ্টমাত্রা তু বিদ্বদ্ভির্দক্ষিণে সমুদাহৃতা"। মাত্রাযুক্ত হ'য়ে 'কলা' বিকাশ লাভ করে। আবার অনেক সময় কলা ও মাত্রাকে সমান অর্থে ব্যবহার হ'তে দেখা যায়।

দত্তিল 'আবাপ'-কে বলেছেন উত্থিত অঙ্গুলির কুঞ্চন। 'নিষ্ক্রামণ' হাতের অধস্তলের প্রসারণ; হাতের অধস্তলকে দক্ষিণদিকে প্রসারিত করার নাম 'বিক্ষেপ' ও আকুঞ্চণের নাম 'প্রবেশ'। দক্ষিণহস্তে ছটিকার দ্বারা তাল দেওয়ার নাম 'শম্যা' ও বামহস্তে তাল দেওয়ার নাম 'তাল', উভয় হস্তে তাল দেওয়ার নাম 'সন্নিপাত'।[৭] তালের বিবরণে 'দত্তিলম্' গ্রন্থে অনেক পাঠ লুপ্ত হয়েছে দেখা যায়। তারপর দত্তিল বিদারী, বস্তু, অবগাঢ়, অন্তরমার্গ; সামুদ্গ, অর্ধসামুদ্গ, বিবৃদ্ধ; তিন রকম 'বিবিধ'—সম, মধ্য ও বিষম; দ্রুত মধ্য ও বিলম্বিত লয়; তিন রকম পাণি; সমা, স্রোতোগতা ও গোপুচ্ছা তিন যতি; কুলক, ছেদক; নির্যুক্ত ও অনির্যুক্ত পদ প্রভৃতি সাঙ্গীতিক উপাদানের বিবরণ দিয়েছেন দত্তিলমের ১৪২ থেকে ১৭০ শ্লোকগুলিতে।

এর পর নাট্যে প্রযুক্ত নিবদ্ধগীতি হিসাবে মদ্রক, অপরান্তক, উল্লোপক বা (উল্লোপ্য), প্রকরী, ওবেণক, রোবিন্দক, উত্তর, বর্ধমানক (বা বর্ধমান), আসারিত এবং মাগধী প্রভৃতি চারটি গীতিরও তিনি বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন।[৮]

৭। আবাপসংজ্ঞকং জ্ঞেয়মুত্তানাঙ্গুলিকুঞ্চনম্॥
অধস্তলেন হস্তেন নিষ্ক্রামাখ্যং প্রসারণম্।
তস্য দক্ষিণতঃ ক্ষেপো বিক্ষেপঃ পরিভাষিতঃ॥
অথ চাকুঞ্চনং জ্ঞেয়ং প্রবেশাখ্যমধস্তলম্।
শম্যা দক্ষিণপাতস্তু তালো বামস্তু কীর্তিতঃ।
উভয়োর্হস্তয়োঃ পাতঃ সন্নিপাত ইতি স্মৃতঃ।
—দত্তিলম্ ১১৮-১২১

৮। 'দত্তিলম্' ১৫৫ থেকে ২৪৩ শ্লোক।

অবশ্য এ'সকল গীতির বিষয় আমরা 'নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীত' পর্যায়ে আলোচনা করেছি। মাগধী, অর্ধমাগধী, সম্ভাবিতা ও পৃথুলা গীতিগুলির স্বরূপ ও প্রয়োগ সম্বন্ধে আচার্য দত্তিল উল্লেখ করেছেন,

তত্র স্যান্মাগধী চিত্রে পদৈঃ সমনিবৃত্তকৈঃ।
অর্ধকালনিবৃত্তৈস্তু বর্ণাঢ্যা চার্ধমাগধী॥
বৃত্তৌ লঘ্বক্ষরপ্রায়া গীতিঃ সম্ভাবিতা স্মৃতা।
গুর্বক্ষরৈস্তু পৃথুলা বর্ণাঢ্যা দক্ষিণে সদা॥
মার্গেষু তা যথাযোগং চতস্রো গীতয়ঃ স্মৃতাঃ।
অথ মার্গা য উদ্দিষ্টাস্তেষাং মূলং ধ্রুবঃ স্মৃতঃ॥
মাত্রিকঃ স প্রযোক্তব্যঃ সুবিবিক্তলয়ান্বিতঃ।
ততঃ স্যাদ্ দ্বিগুণশ্চিত্র উত্তরৌ দ্বিগুণোত্তরৌ॥
জ্ঞাত্বৈবং সর্বগীতানি সর্বমার্গেষু যোজয়েৎ॥[৯]

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে নৃত্য ও নাট্য সম্বন্ধে দত্তিলের আলোচনা সম্ভবতঃ দত্তিলমের আসল (বৃহৎ) সংস্করণে নিবদ্ধ ছিল। সমগ্র গ্রন্থটি প্রকাশিত হ'লে আচার্যের অন্যান্য প্রতিভার অবদানও আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করবে। শোনা যায় দত্তিল নাকি 'প্রয়োগস্তবক' নামে নৃত্য ও গীতের ওপর টীকাও রচনা করেছিলেন।[১০] মান্দ্রাজ-গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপি-তালিকায় (Madras Mss. Library, Catalogue, Vol. XXII, Vos. 13014 and 13015) 'রাগসাগর' নামে একটি গ্রন্থের উল্লেখ দেখা যায়। গ্রন্থের তিনটি তরঙ্গ (অধ্যায়) আছে ও তিনটি তরঙ্গের বিষয়বস্তু হ'ল 'রাগবিমর্শ', 'শ্রুতিস্বররাগবিমর্শ' ও 'রাগধ্যানবিজ্ঞানম্'। তিনটি তরঙ্গের প্রথমটির শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলির উল্লেখ দেখা যায়: "ইতি শ্রীরাগসাগরে নারদদত্তিল-সংবাদে রাগবিমর্শকো নাম প্রথমস্তরঙ্গঃ"।[১১] এ'থেকে অনেকে অনুমান করেন যে 'সাগরসাগর' গ্রন্থটির সঙ্গে আচার্য দত্তিল ও নারদের বিশেষ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু আমাদের তা মনে হয় না। কেননা রাগসাগরের শেষ বা তৃতীয় তরঙ্গে

৯। ঐ ২৬৮-২৪২ শ্লোক।

১০। সিংহভূপাল সঙ্গীত-রত্নাকরের টীকার একস্থানে উল্লেখ করেছেন:

'বিকৃতং চৈতদ্ প্রয়োগস্তবকাখ্যায়াং দত্তিলটীকায়াম্'।

১১। Vide *The Journal of the Music Academy*, Madras, Vol. III, 1932, p. 18.

'রাগধ্যানবিজ্ঞানম্' বিষয়ের আলোচনায় নাকি প্রত্যেকটি রাগের ছন্দ, ঋষি ও ধ্যানরূপ দেওয়া আছে। কিন্তু এ'কথা ঠিক যে খৃষ্টীয় ১৬শ—১৭শ শতাব্দীর আগে কোন সঙ্গীতগ্রন্থেই রাগের রূপ ও ধ্যানকল্পনার নির্দশন পাই না এবং সুললিত ছন্দে ধ্যান-রচনার বোধহয় প্রথম উল্লেখ পাই পণ্ডিত সোমনাথের (খৃষ্টীয় ১৯০৬) 'রাগবিবোধ' গ্রন্থে।

॥

তুম্বুরু, যাষ্টিক, নন্দিকেশ্বর, দুর্গাশক্তি প্রভৃতি ভরত ও মতঙ্গের মধ্যবর্তী সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ২য় থেকে ৫ম-৭ম শতাব্দীর সঙ্গীতগুণী। এঁরা সকলেই বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গের পূর্ববর্তী। যাষ্টিক, তুম্বুরু, দুর্গশক্তির গ্রন্থগুলির না পাওয়ার জন্ম সাধারণভাবে আমরা মতঙ্গকেই দেশীরাগের সংগ্রাহক ও প্রবর্তক ব'লে গণ্য করি; ভরতের পর ভারতীয় সঙ্গীতের জগতে নবজাগরণের অগ্রদূত হিসাবে মতঙ্গকেই সর্বাগ্রে সম্মান প্রদর্শন করি, কিন্তু মনে রাখা উচিত যে ভরতের নাট্যশাস্ত্র যেমন একটি সংগ্রহ-গ্রন্থ তেমনি মতঙ্গের বৃহদ্দেশীও একখানি সংগ্রহপুস্তক। ভরত উল্লেখ করেছেন: "নাট্যশাস্ত্রং প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মণা যদুদাহৃতম্" এবং "নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতুর্বেদাঙ্গসম্ভবম্" শ্লোক-দু'টি থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাভরত নাট্যবেদ-রূপ 'ব্রহ্মভরতম্' গ্রন্থ রচনা করেছিলেন চতুর্বেদ থেকে সাঙ্গীতিক উপাদান আহরণ ক'রে এবং ভরত নাট্যশাস্ত্র রচনা করেছিলেন ব্রহ্মার নাট্যবেদ থেকেই উপাদান সংগ্রহ ক'রে। এখানে গুরুপরম্পরা বা পারম্পর্যধারার একটি নিদর্শন পাওয়া যায় এই শ্লোক বা উক্তিগুলি থেকে। মতঙ্গের বৃহদ্দেশীও তাই। মতঙ্গ কোহল, যাষ্টিক, দুর্গাশক্তি প্রভৃতি গুণীদের কাছ থেকে যে তাঁর গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করেছেন তা তাঁর বৃহদ্দেশী প্রমাণ করে। মতঙ্গ অন্তত সাতবার যাষ্টিকের; পাঁচবার কোহলের ও চারবার দুর্গাশক্তির নামোল্লেখ করেছেন। এ'ছাড়া তিনি ভরতকে চৌদ্দবার, শার্দুলকে দু'বার, দত্তিলকে দু'বার, কশ্যপকে সাতবার, নন্দিকেশ্বরকে একবার ও নারদকে চারবার উল্লেখ করেছেন। জায়গায় জায়গায় সামান্যভাবে যাষ্টিকের নামোল্লেখ ছাড়া ভাষারাগ-লক্ষণপ্রকরণে "এতা যাষ্টিকেন প্রযুক্তাঃ" প্রভৃতির অবতারণা ক'রে "সর্বাগম-সংহিতায়াং যাষ্টিকপ্রমুখ্যভাষালক্ষণাধ্যায়ঃ চতুর্থঃ" প্রভৃতি ভণিতায় মতঙ্গ যে বিশেষ পরিমাণে যাষ্টিকের কাছে ঋণী তা তিনি স্বীকার করেছেন। তেমনি

আবার "অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি শার্দুলমতে ভাষালক্ষণম্" বা "টক্করাগে শার্দুলমতে" প্রভৃতি সমাপ্তি-ভণিতায় শার্দুলের কাছে ও মতঙ্গ ঋণী ছিলেন দেখা যায়। মোটকথা ভাষারাগের বেলায় মতঙ্গ সম্পূর্ণভাবে যাষ্টিক, শার্দুলাদির কাছে ঋণী এবং একদিক থেকে রাগাধ্যায়টি তাহা সংগ্রহাংশ হিসাবে গণ্য হ'তে পারে। ডাঃ রাঘবন তাঁর *Early Saṅgita Literature* নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ-কবির মতে ত্রিবান্দ্রাম থেকে দত্তিলমের ছ'টি অধ্যায় মাত্র প্রকাশিত হয়েছে, বাকী অংশ অপ্রকাশিত। মতঙ্গ ভাষারাগের বেলায় যেমন যাষ্টিকের গ্রন্থ থেকে প্রমাণবাক্য হিসাবে অনেক অংশ উদ্ধৃত ক'রেছেন তেমনি শার্দুলের গ্রন্থ থেকেও প্রমাণবাক্য গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এই প্রমাণবাক্যের গ্রহণ বা উদ্ধৃতি থেকে সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নয় যে মতঙ্গের বৃহদ্দেশীর শেষাংশটি যাষ্টিক বা শার্দুল রচনা করেছেন।[১] যাইহোক বৃহদ্দেশীর ভাষালক্ষণপ্রকরণের সমাপ্তি-ভণিতায় যেখানে "সর্বাগমসংহিতায়াং যাষ্টিকপ্রমুখ্য-ভাষালক্ষণাধ্যায়ঃ চতুর্থঃ" প্রভৃতি কথা উল্লিখিত আছে সেখানে তা থেকে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে যাষ্টিক-রচিত 'সর্বাগমসংহিতা' নামে নৃত্য, নাট্য ও দেশী-সঙ্গীতের একখানি আলাদা গ্রন্থ ছিল। সঙ্গীত-রত্নাকরের রাগবিবেকাধ্যায়ে কল্লিনাথ অভিজাত দেশীরাগের আলোচনায় যাষ্টিকের নাম উল্লেখ করেছেন: "যাষ্টিকে ত্রাবণী" (২।১৮৬) এবং "সংকীর্ণোতি পূর্বং ভাষাণাং সম্পূর্ণা দেশজা মূর্ছা ছায়ামাত্রেতি নামভিরিতি যাষ্টিকমতেন চাতুর্বিধ্যং দর্শিতম্"। কল্লিনাথের এই সামান্য উদ্ধৃতি থেকে মনে হয় প্রমাণ হয় যে গ্রামরাগের ছায়ারাগ বা ভাষারাগ অভিজাত দেশীরাগদের সম্বন্ধে যাষ্টিক বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন এবং তাঁর দেশীরাগ সম্বন্ধে উক্তিও প্রামাণিক হিসাবে গণ্য। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে অভিজাত দেশীসঙ্গীতের ক্ষেত্রে যাষ্টিক, কোহল, শার্দুল, বিশ্বাখিল

১। "In a conversation with me, Mr. Rāmakrishna-Kavi told me that the Trivāndrum edition of the *Brihaddeśi* is not wholly by Mataṅga and that the latter part of it is the *Yāṣṭika-Saṁhitā*. This is not a fact. Mataṅga's *Brihaddeśi* is a big work. It is now made available to us in the Trivāndrum edition, which unfortunately contains only upto the 6th chapter dealing with Pravandhas. * * Mataṅga has quoted a chapter from Yāṣtika's work on Bhāṣās, as also from Śārdula's work on the 16 Bhāṣās. These quotations do not mean that Trivāndrum edition of the *Brihaddeśi* is a medley of the works of Mataṅga, Yāṣtika and Śārdula,"—*JMA.*, Vol. III, 1932, pp. 95-96.

ভিন্নতান, গান্ধারপঞ্চম প্রভৃতি প্রায় ১৩টি দেশী তথা দশলক্ষণপরিশুদ্ধ অভিজাত দেশীরাগের নামোল্লেখ করেছেন।[৩]

পুনরায় ঐ ভাষালক্ষণপ্রকরণে মতঙ্গ "এতা যাষ্টকেন প্রযুক্তাঃ" প্রভৃতি কথার উল্লেখ ক'রে স্বররূপের উদাহরণসহ ককুভ, মধ্যমগ্রামিকা, শাতবাহিনী, ভোগবর্ধণী, মধুকরী, শকমিশ্রিতা, ভিন্নপঞ্চমী, প্রথমমঞ্জরী, ছেবাটী প্রভৃতি হিন্দোলরাগের ভাষারাগ; ভাবিনী, মাঙ্গালী, সৈন্ধবী, গুর্জরী, প্রভৃতি পঞ্চমের ও গান্ধারী, পৌরালী, বেগমধ্যমা প্রভৃতি সৌবীরকের ভাষারাগ; শুদ্ধাভিন্না, বরাটী প্রভৃতি ভিন্নপঞ্চমের ও মাঙ্গালী, দ্রাবিড়ী, নাদাখ্যা, রেবগুপ্তা প্রভৃতি পঞ্চমষাড়বের ভাষারাগগুলির পরিচয় দিয়েছেন। পরিচয়গুলি সমস্তই যাষ্টিকের মতানুযায়ী মতঙ্গ যাষ্টিকের অধুনালুপ্ত 'সর্বাগমসংহিতা' গ্রন্থ থেকে সেগুলি উদ্ধৃত করেছেন। রত্নাকরের রাগাধ্যায়ে দেজশ বা দেশীরাগের পর্যায়ে কল্লিনাথও এদের উল্লেখ করেছেন: "যাষ্টিকমতেন" বা "যাষ্টিকোদিতা"। তাছাড়া গ্রামরাগ থেকে সৃষ্ট ভাষারাগগুলির রঞ্জনাশক্তি বা রাগত্বধর্ম আছে কিনা তার উত্তরে কল্লিনাথ যাষ্টিকের প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। সেখানে যাষ্টিককে তিনি 'মুনি' আখ্যা দিয়েছেন। কল্লিনাথ উল্লেখ করেছেন: 'রঞ্জনাদ্রাগতা ভাষারাগাঙ্গাদেরপীষ্যতে' ইতি। তাসাং জনকা যাষ্টিকোদিতা ভাষাজনকতয়া যাষ্টিকমুনিনোক্তাঃ"।

॥ তুম্বুরু ॥

তুম্বুরু একজন গন্ধর্বজাতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রী ছিলেন। নারদ এবং বিশ্বাবসুও তাই। অনেকে বলেন কোন একটি তাম্রলিপি থেকে জানা যায় তুম্বুরুর চারটি মুখ ছিল ও তাদের নাম বিনাশিক, নয়োত্তর, সম্মোহন ও শিরোচ্ছেদ। আসলে এই চারখানি তন্ত্রগ্রন্থ।[১] বিভিন্ন পুরাণসাহিত্যে গন্ধর্বগুণীদের মধ্যে তুম্বুরুর নাম পাওয়া যায়। তা'ছাড়া সঙ্গীত-রত্নাকরের স্বরাধ্যায়ে ধ্বনি, নাদ বা শব্দের প্রসঙ্গে কল্লিনাথ তুম্বুরুর একটি প্রমাণবাক্য উদ্ধৃত করেছেন। প্রমাণবাক্যটি হ'ল,

---

৩। 'বৃহদ্দেশী' (ত্রিবান্দ্রম-সংস্করণ), পৃঃ ১০৫-১০৮

১। 'The word Tumburu (of which, according to the inscription, the four texts constitute the four faces) is the name of a gandharva and there is a Gandharva-Tantra in the Viṣṇukrāntā group.''—Dr. Bijan Rāj Chatterji :—*Indian Cultural Influence in Cambodia* (Calcutta, 1928), pp. 273-274.

উচ্চৈস্তরো ধ্বনি রুক্ষো বিজ্ঞেয়ো বাতজো বুধৈঃ।
গম্ভীরো ঘনলীনস্তু জ্ঞেয়োঽসৌ পিত্তজো ধ্বনিঃ॥
স্নিগ্ধশ্চ সুকুমারশ্চ মধুরঃ কফজো ধ্বনিঃ।
ত্রয়াণাং গুণসংযুক্তো বিজ্ঞেয়ঃ সন্নিপাতজঃ॥

বাতজ, পিত্তজ ও কফজ এবং উচ্চ, গম্ভীর ও স্নিগ্ধ এই দুই শ্রেণীর তিনটি ক'রে ধ্বনি। আহত বা ব্যক্ত সাঙ্গীতিক একটি ধ্বনি হ'লেও গুণযুক্ত হ'য়ে তা বিভিন্ন আকারে ও নামে প্রকাশিত হয়। তুম্বুরু আসলে রুক্ষ, ঘন ও মধুর এই তিন রকম শব্দের পরিচয় দিয়েছেন। ব্যক্ত শব্দ শ্রুতি ও ষড়্‌জাদি স্বরের কারণ। স্বর শ্রুতিমধুর তথা মাধুর্যগুণযুক্ত হ'লে স্নিগ্ধ ও সুকুমার হয় এবং সেই মধুর ও লাবণ্যপূর্ণ শব্দতরঙ্গ বা স্বরসন্দর্ভই রাগের বিকাশসাধন করে। তত্ত্বজ্ঞ তুম্বুরুর "উচ্চস্তরো ধ্বনি" প্রভৃতি শ্লোকগুলির মর্মকথা এই।

শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকরের বাদ্যাধ্যায়ে তুম্বুরুর নামোল্লেখ করেছেন: "চক্রে কৌতুকতো নন্দিস্বাতিতুম্বুরুনারদৈঃ" (৬।১৯)। তিনি শুষ্ক, গীতানুগ, নৃত্তানুগ ও নৃত্তগীতানুগ এই চারশ্রেণীর বাদ্যের প্রসঙ্গে নন্দিকেশ্বর, স্বাতি ও নারদের পাশাপাশি তুম্বুরুর উল্লেখ করেছেন। নৃত্য-গীত ছাড়া স্বতন্ত্রভাবে বাদ্যের প্রয়োগের নাম 'শুষ্কবাদ্য'। গীতের সঙ্গে বাদ্য গীতানুগ, নৃত্যের সঙ্গে নৃত্তানুগ এবং নৃত্য ও গীতের সঙ্গে বাদ্যের প্রয়োগের নাম নৃত্যগীতানুগ বাদ্য। শার্ঙ্গদেব পুনরায় বাদ্যাধ্যায়ে ঘনবাদ্যের প্রসঙ্গে তুম্বুরুর নামোল্লেখ করেছেন: "দেবতা তুম্বুরুর্যুগ্মে শক্তিঃ শক্তৌ শিবে শিবঃ" (৬।১১৮০)। কম্বোজে সিসোফোন-অঞ্চলে আবিষ্কৃত 'সদোক্-কক্-থোম্'-লেখামালার কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। লেখামালাটি হ'ল,

শাস্ত্রং শিরশ্ছেদ-বিনাশিকাখ্যম্
সম্মোহনামপি নয়োত্তরাখ্যম্।
তৎ তুম্বুরোর্বক্ত্র চ চতুষ্কমস্য
সিধ্যেব বিপ্রস্সমদর্শয়ৎ সঃ॥

ডাঃ প্রবোধকুমার বাগচী লেখামালায় উল্লিখিত চতুর্মুখ তুম্বুরুর সঙ্গে গান্ধর্বতত্ত্ববিদ্ তুম্বুরুর অভিন্নতা স্বীকার করেন না। তিনি বলেছেন: "But the context has no bearing on any *Tantra* connected with the name of *Tumburu*".[২] হেমচন্দ্র তাঁর 'অভিধানচিন্তামণি' গ্রন্থে (১।৪১) তুম্বরুকে

২। তাছাড়া ডাঃ বাগ্‌চি তুম্বুরুর চতুর্মুখের রহস্যটিকে কম্বোজে দেবরাজ-অনুষ্ঠানের সঙ্গে

জিনের উপাসক একটি যক্ষ ব'লে বর্ণনা করেছেন। হেমচন্দ্রের ভাষ্যকার উল্লেখ করেছেন: "তুম্বুতি অর্থাতি বিদ্বান্ তুম্বুরুঃ"। বৌদ্ধগ্রন্থে তুম্বুরুকে 'গন্ধর্বরাজ' ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। বৌদ্ধ 'মহাসময়সুত্তন্ত' গ্রন্থে[৩] গন্ধর্বশ্রেষ্ঠী হিসাবে পঞ্চশিখের সঙ্গে তিম্বরুর কন্যা সুরিয়বচ্চসার উল্লেখ পাওয়া যায়। পুনরায় 'সক্কপঞ্হসুত্তন্ত' গ্রন্থে[৪] ঐ একই ধরণের উল্লেখ দেখা যায়। সেখানে পঞ্চশিখ সঙ্গীত দ্বারা বুদ্ধকে বিমুগ্ধ করছে এবং গন্ধব্ব-কন্যা ভদ্দা সুরিয়বচ্চসাও বিদ্যমানা। পঞ্চশিখের কাহিনীতে পঞ্চশিখকে 'বেলুবকাষ্ঠে তৈরী বীণার বাদনপ্রণালীতে বিশেষ দক্ষ' ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। 'পাসাদিকসুত্তন্ত' পালিগ্রন্থেও গন্ধব্ব-তিম্বরুর নামের উল্লেখ আছে। এই সুত্ত তথা সূত্রগ্রন্থগুলির চীনা-সংস্করণে গন্ধব্ব তথা গন্ধর্ব তিম্বরুর নাম অনুবাদ করা হয়েছে *Tau-feou-lu*=tam-bieuru—*tamburu* নামে।[৫] পালিসুত্তেও তুম্বুরুকে 'তিম্বরু' নামে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু চীন-অনুবাদে 'তুম্বুরু' নামই দেখা যায়।

মহাভারতের আদিপর্বে (১।৬৫।৫১) তুম্বুরুকে 'গন্ধর্বসত্তম' বলা হয়েছে:

স্বপ্রিয়া চাতিবাহুশ্চ বিখ্যাতৌ চ হাহাহুহুঃ।
তুম্বুরুঃ চেতি চত্বারঃ স্মৃতাঃ গন্ধর্বসত্তমাঃ॥

মহাভারতের আদিপর্বের ১৫৯।৫৪ শ্লোকেও পুনরায় উল্লেখ আছে: "গন্ধর্বৈঃ সহিতং শ্রীমান্ প্রাগায়তঃ চ তুম্বুরুঃ"। প্রথম শ্লোকটিতে স্বপ্রিয়া, অতিবাহু, হাহা ও হুহু এই চারজন গন্ধর্বের সকলকে তুম্বুরু ব'লে সম্বোধন করা হ'ত, কিন্তু দ্বিতীয় শ্লোকটিতে সঙ্গীতবিদ্ হিসাবে তুম্বুরু একজন স্বতন্ত্র গন্ধর্ব।[৬] নন্দিকেশ্বরের

সম্পর্কিত বলেছেন। দেবরাজ লিঙ্গরাজ-শিবেরই একটি তান্ত্রিক প্রতীক। এই তান্ত্রিকানুষ্ঠানটি ভারতবর্ষ থেকে খৃষ্টীয় ৭ম—৮ম শতাব্দীতে কম্বোজে প্রবর্তন করা হয়। খৃষ্টীয় ৮০২ অব্দে রাজা দ্বিতীয় জয়বর্ধন দেবরাজ-মন্দিরটি নির্মাণ করেন। ডাঃ বাগ্‌চি উল্লেখ করেছেন:

"Tumburu evidently had some sort of connection with the *Devarāja* cult. Devarāja was a phallic representation (*liṅgarāja*) of Śiva— and we have already seen that Tumburu was an emanation of Śiva himself."—Vide *Studies in the Tantras* (1939), p. 22.

৩। Vide *Dialogues of Buddha,* pt. II, p. 288.

৪। Vide *Sakkapañha-suttanta,* pp. 302-303.

৫। Vide *Teou-foeu-lou*=Tteu-zieu-ru=*tu (m) buru* [cf. *Tripitaka,* New Tokio Ed., Vol. I, pp. 80, 634].

৬। ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চি নানান্ দিক থেকে বিচার ক'রে পরিশেষে মন্তব্য করেছেন:
"Whatever it may be, the number four seems to have been connected with the name of Tumburu, * *. But there is no doubt that Tumburu was *par excellence* a musician. He is mentioned as an authority on the musical science."—*Studies in Tantras* (1939), p. 13.

অর্থ যেখানে 'শিব' সেখানে অনেকে তুম্বুরুকে শিবের অনুচর ব'লেও উল্লেখ ক'রে থাকেন। গন্ধর্ব তুম্বুরু শিবের অনুচর হওয়াও স্বাভাবিক। সঙ্গীতশাস্ত্রে তুম্বুরুকে একজন প্রামাণিক গুণী হিসাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। সঙ্গীত-রত্নাকরে শার্ঙ্গদেব আচার্যতালিকায় উল্লেখ করেছেন: "বায়ুর্বিশ্বাবসু রম্ভাহর্জুনো নারদ-তুম্বুরুঃ" (১।১৬)। আমাদের মনে হয় নারদ উপাধিধারী গন্ধর্ব-সঙ্গীতশাস্ত্রীর মতো তুম্বুরুও একজন ঐতিহাসিক আচার্য ছিলেন। তবে তুম্বুরুবীণা, তম্বুরা বা তানপুরার সঙ্গে ঋষি বা গন্ধর্ব তুম্বুরুর নামের যে সম্পর্ক দেখা যায় তার ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। কেননা তুম্বুরু ঋষি, মুনি বা গন্ধর্ব যে শ্রেণীর সঙ্গীতশাস্ত্রী হোন, তাঁর অভ্যুদয়-কাল নানান্ দিক দিয়ে খৃষ্টীয় ২য় থেকে ৫ম-৭ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ব'লে অনুমান করতে পারি। কিন্তু তুম্বীবীণার উল্লেখ খৃষ্টপূর্ব যুগে মহাভারত-হরিবংশের সময়েও (খৃষ্টপূর্ব ৩০০-২০০) পাওয়া যায়। তুম্বীবীণাই পরবর্তী যুগে (খৃষ্টীয় যুগে) তুম্বুরা, তম্বুরা বা তানপুরা নামে প্রচলিত হওয়া স্বাভাবিক। অনেকের অভিমত নাকি খৃষ্টীয় অব্দের গোড়ার দিকে (খৃষ্টীয় ২য়—৫ম-৭৫ শতাব্দী) সঙ্গীতশিল্পী ও শাস্ত্রী তুম্বুরুর নামের সঙ্গে তুম্বীবীণাটিকে সম্পর্কিত ক'রে তুম্বুরুবীণা তথা তানপুরার নাম ভারতীয় সমাজে প্রচলন করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই অভিমতের সপক্ষে এখনো কোন ঐতিহাসিক নথিপত্র পাওয়া যায় নি।

কবি লোচন (১৭শ শতাব্দীর মাঝামাঝি) তাঁর 'রাগতরঙ্গিণী'[৭] গ্রন্থে 'তুম্বুরুনাটক' নামে একটি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। অনেকে এই নাটকটির সঙ্গে গন্ধর্ব তুম্বুরুকে সম্পর্কিত ক'রে বলেন 'তুম্বুরুনাটক' গ্রন্থটি সঙ্গীতশাস্ত্রী তুম্বুরুর রচিত। পণ্ডিত লোচন রাগ-রাগিণীদের গানের সময় নির্দেশ করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন: "অথ রাগাণাং গানকালাঃ। তুম্বুরুনাটকে।" উদ্ধৃতির ভঙ্গি থেকে মনে হয় লোচন তুম্বুরুনাটক থেকেই প্রমাণ দিয়েছেন। "অথ রাগাণাং" তথা রাগগুলি হ'ল: মালশ্রী, দেশাখ, পটমঞ্জরী, বিভাস, ভৈরবী, ললিত, গণ্ডকরি (গোণ্ডকিরি), কামোদ, মালব, নাট, হিন্দোল, বসন্ত, গোড়, বরাড়ী, গুর্জরী প্রভৃতি। তিনি উদ্ধৃত করেছেন,

> শ্রীপঞ্চমীং সমারভ্য যাবৎস্যাচ্ছয়নং হরেঃ।
> তাবদ্বসন্তরাগস্য গানমুক্তং মনীষিভিঃ॥

৭। 'রাগতরঙ্গিণী' (দ্বারভাঙ্গা-সংস্করণ)—সম্পাদক বলদেব মিশ্র।

ইন্দ্রোত্থানং সমারভ্য যাবদ্দুর্গামহোৎসবম্।
গেয়া তাবদ্‌ধ্বনিত্যং মালশ্রী সা মনোহরা॥
প্রাতর্গেয়স্তু দেশাখ্যো ললিতঃ পটমঞ্জরী।
বিভাসো ভৈরবী চৈব কামোদো গণ্ডকর্য্যপি॥
একা বরাড়ী মধ্যাহ্নে সায়ঙ্কার্ণাট মালবৌ।
নাটশ্চৈব বিশেষেণ শেষ গেয়স্তু সর্বদা॥

*   *   *   *

শুদ্ধ শালগ সংকীর্ণ ধাতুমাতুবিভেদতঃ॥
দেশভাষা বিভেদাচ্চ রাগসংখ্যা ন বিদ্যতে।—প্রভৃতি

এখানে আলোচনার বিষয় যে পণ্ডিত লোচন রাগের কাল-নির্ধারণের ব্যাপারে যে প্রমাণবাক্য উদ্ধৃত করেছেন তা যদি সত্যই গন্ধর্ব তুম্বুরু-রচিত নাটকের অন্তর্ভুক্ত ব'লে গণ্য হয় তবে তুম্বুরুকে আমরা অনেক পরবর্তীকালের গ্রন্থকার ও কলাবিদ্ ব'লে মনে করিব, কেননা প্রমাণশ্লোকগুলিতে—বিশেষ ক'রে মালশ্রী, ললিত, নটমঞ্জরী, ভৈরবী প্রভৃতি দেশী রাগ বা রাগিণীগুলি খৃষ্টীয় ৯ম থেকে ১১শ শতাব্দীর আগেকার অবদান নয়। তাছাড়া গানের অবয়ব বা অংশ ও রাগকে বোঝাবার জন্য 'ধাতু' ও 'মাতু' পরিভাষাগুলিও ঐ সময়ের সৃষ্টি, খৃষ্টীয় ২য় থেকে ৫ম-৭ম শতাব্দীর নয়। আবার নানান্ দিক দিয়ে বিচার করলে শাস্ত্রী তুম্বুরু কোহল, যাষ্টিক, শাদুর্ল প্রভৃতি আচার্যদের প্রায় সমসাময়িক তথা খৃষ্টীয় ২য় থেকে ৫ম-৭ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের গুণী ব'লে ধারণা হয়।

পুনরায় তথাকথিত তুম্বুরুনাটকের শ্লোকগুলির সঙ্গে মধ্যযুগীয় সঙ্গীতশাস্ত্রী পণ্ডিত শুভঙ্করের রচিত 'সঙ্গীত-দামোদর' গ্রন্থে উল্লিখিত শ্লোকের হুবহু মিল দেখা যায় এবং থাকাও স্বাভাবিক। শুভঙ্কর সঙ্গীত-দামোদরে রাগের সময়-নির্ধারণের বেলায় তুম্বুরুনাটকের নজির দিয়েছেন: "তথাচ তুম্বুরুনাটকে"। মোটকথা সঙ্গীত-দামোদরের উদ্ধৃতি ও রাগতরঙ্গিণীর উদ্ধৃতি একই, পার্থক্য কেবল শেষের শ্লোকটি নিয়ে। সঙ্গীত-দামোদরে শেষের শ্লোকটি হ'ল

রাগান্ দধতি গোবিন্দে রাগান্ দধতি চেতসি।
গোপিকা গোপিকাঃ পত্যৌ ভাবানাং ভাবিনামানি॥

লোচন যে সম্ভবত তুম্বুরুনাটকের শ্লোকগুলি শুভঙ্করের 'সঙ্গীত-দামোদর' থেকে গ্রহণ করেছেন তা তাঁর ১৩২ পৃষ্ঠায় ('রাগতরঙ্গিণী'-দারভাঙ্গা-সংস্করণ) "অর্বাচীনাস্ত"-পর্যায়ে "তত্র দামোদরঃ" (পৃঃ ১৩৩) শব্দগুলি থেকে বোঝা যায়। কবি লোচন

নায়িকার বর্ণনায় "শৃঙ্গারেষু ভবন্ত্যেতে" প্রভৃতি শ্লোকগুলি সঙ্গীত-দামোদর থেকে উদ্ধৃত করেছেন। সঙ্গীত-দামোদরের ১ম স্তবকে "অথ নায়িকাঃ" পর্যায়ে উল্লিখিত শ্লোকগুলির সঙ্গে রাগতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত শ্লোকগুলির মিল আছে। সুতরাং বোঝা যায় কবি লোচন সঙ্গীত-দামোদরকার শুভঙ্করের পরবর্তী গ্রন্থকার। তাছাড়া শুভঙ্কর সঙ্গীত-দামোদরে তুম্বুরুনাটকের যে "রাগান্ দধতি গোবিন্দে * * গোপিকা গোপিকাঃ পত্যৌ" প্রভৃতি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন তা সম্পূর্ণ মধ্যযুগীয় ভাবধারাপুষ্ট, সুতরাং তুম্বুরুনাটকটি খৃষ্টীয় ২য় থেকে ৫ম-৭ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সঙ্গীতগুণী তুম্বুরুর রচিত নয় এই আমাদের ধারণা। তুম্বুরুর নামাঙ্কিত ক'রে মধ্যযুগের কোন সঙ্গীতশাস্ত্রী তুম্বুরুনাটক গ্রন্থখানি রচনা ক'রে থাকবেন।

॥ নন্দিকেশ্বর ॥

নন্দি বা নন্দিকেশ্বরের নাম ভরতের নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখ পাওয়া যায় না। দত্তিলও তাঁর গ্রন্থে (দত্তিলম) নন্দিকেশ্বরের নামোল্লেখ করেন নি, অথচ তিনি ভরত, কোহল, বিশ্বাখিল প্রভৃতির নাম উল্লেখ করেছেন। তবে মতঙ্গের বৃহদ্দেশীতে নন্দিকেশ্বরের নামোল্লেখ ও প্রমাণবাক্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। সুতরাং নন্দিকেশ্বরের অভ্যুদয়-কাল খৃষ্টীয় ২য়-৩য় থেকে ৫ম-৭ম শতাব্দীর মাঝামাঝি এবং কোহল ও দত্তিলের পরবর্তী সময়ে ব'লে অনুমান করি। মতঙ্গ দ্বাদশস্বরমূর্ছনার আলোচনায় নন্দিকেশ্বরকে কোহল প্রভৃতির মতো প্রামাণিক শাস্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেছেন। মূর্ছনার প্রসঙ্গে বৃহদ্দেশীতে নন্দিকেশ্বরের প্রমাণবাক্যটি হ'ল : 'নন্দিকেশ্বারেণাপ্যুক্তং—

দ্বাদশস্বরসম্পন্না জ্ঞাতব্যা মূর্ছনা বুধৈঃ।
জাতিভাষাদিসিদ্ধ্যর্থং তারমন্দ্রাদিসিদ্ধয়ে ॥'

নন্দিকেশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে মতঙ্গ কোহলের অভিমতও উদ্ধৃত করেছেন। যেমন,

যোজনীয়ো বুধৈর্নিত্যং ক্রমো লক্ষ্যানুসারতঃ।
সংস্থাপ্য মূর্ছনা জাতিরাগভাষাদিসিদ্ধয়ে ॥

কোহলের 'জাতিরাগভাষাদিসিদ্ধয়ে' শব্দগুলির সঙ্গে নন্দিকেশ্বরের 'জাতিভাষাদি-সিদ্ধ্যর্থং' কথাগুলির মিল আছে। কোহল ও নন্দিকেশ্বরের প্রমাণবাক্যের নজিরে মতঙ্গ সিদ্ধান্ত করেছেন মন্দ্র মধ্যাদি তিনটি স্থানকে প্রতিপাদনের জন্য আচার্যেরা সাতটি স্বরের মতো বারোটি স্বরের মূর্ছনারও প্রয়োগ করেছেন, সুতরাং

ক্রম-আরোহণ-রূপ বারোটি স্বরের মূর্ছনা প্রতিপন্ন হ'ল : "বহ্বাপ্যাচার্যৈঃ সপ্তস্বরমূর্ছনাঃ প্রতিপাদিতাঃ স্থানত্রিতয়প্রাপ্ত্যর্থং দ্বাদশস্বরৈরেব মূর্ছনাঃ প্রযুক্তা ইতি"। এই শ্লোকটি থেকে বোঝা যায়, নন্দিকেশ্বর জাতিরাগ, গ্রামরাগ ও ভাষারাগাদি গান্ধর্ব ও অভিজাত দেশী উভয় সঙ্গীতের বিষয়েই সুশিক্ষিত ছিলেন। অবশ্য তাঁর সময়ে সমাজে অভিজাত দেশীসঙ্গীতের অনুশীলনেরই সমাদর ছিল। তখন আঞ্চলিক ও জাতীয় সুরগুলিকে দশলক্ষণে সংস্কৃত ক'রে অভিজাত করার কাজ পুরোমাত্রায় চলেছে। সাত ও বারো এই উভয় শ্রেণীর স্বর-মূর্ছনাই তিনি স্বীকার করতেন। তা'ছাড়া শ্রুতি, তান, অলংকার, দশলক্ষণ, রাগের বিকাশে বিচিত্র রস ও ভাব প্রভৃতির উপযোগিতাও যে স্বীকার করেছেন তা বোঝা যায়।

পূর্বে উল্লেখ করেছি যে ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নন্দিকেশ্বরের নামের উল্লেখ নাই। নাট্যশাস্ত্রের কাশী-সংস্করণে কোন নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না, কিন্তু কাব্যমালা-সংস্করণের পরিশেষে "সমাপ্তশ্চায়ং [গ্রন্থঃ] নন্দিভরতসংগীত-পুস্তকম্" কথাগুলির উল্লেখ থাকায় সাধারতণই মনে হয় নন্দি বা 'ভরত'-উপাধিধারী নন্দিকেশ্বর নাট্যশাস্ত্র-রচনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নাট্যশাস্ত্রের আলোচনার সময় আমরা এ'কথা সামান্যভাবে আলোচনা করেছি। বিশেষ বিচার-বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে বলা বোধহয় অসমীচীন হবে না যে কাব্যমালা-সংস্করণ-নাট্যশাস্ত্রের পরিশেষে 'নন্দিভরতসংগীতপুস্তকম্' শব্দগুলি আসলে প্রক্ষিপ্ত। কেননা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে অনেকের মতে নাট্যশাস্ত্রের শেষাংশ রচনা করেছিলেন আচার্য কোহল নাট্যশাস্ত্রের সকল সংস্করণে তার সামান্য ইঙ্গিতও আছে। সুতরাং নন্দি, নন্দিকেশ্বর বা নন্দিভরত নাট্যশাস্ত্রকে 'সঙ্গীতগ্রন্থ' নামাঙ্কিত ক'রে কেন শেষাংশ রচনা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন (?) তা বোঝা যায় না। আর যদি ধরেই নেওয়া যায় যে নন্দিকেশ্বর নাট্যশাস্ত্রের শেষাংশটি সঙ্গীতের উপযোগী ক'রে ভরতোত্তরকালে রচনা করেছিলেন, কিন্তু তারই বা চাক্ষুষ নিদর্শন আমরা পাই কোথা? নাট্যশাস্ত্রের (কাব্যমালা-সংস্করণ) শেষাংশে ৩৭শ অধ্যায়ে[১] বা তার দু'তিনটি পূর্ববর্তী অধ্যায়েও প্রত্যক্ষ-একমাত্র সঙ্গীতের আলোচনা নাই, যতটুকু আছে তা নাট্য-আয়োজনের অনুসঙ্গী

১। কাশী-সংস্করণ-নাট্যশাস্ত্রটি ৩৬শ অধ্যায়ে সমাপ্ত: "ইতি ভারতীয়ে নাট্যশাস্ত্রে নাট্যাবতারো নাম ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ। ৩৬।" কিন্তু কাব্যমালার ৩৭শ ও কাশীর ৩৬ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু প্রায় এক।

হিসাবে। মাননীয় রাইস সাহেব মহীশূর ও কূর্গের গ্রন্থতালিকায় 'নন্দিভরতম্' নামে একটি গ্রন্থের নাকি সন্ধান পেয়েছিলেন। মাদ্রাজের পুস্তকতালিকায়ও নন্দিভরতের কথার উল্লেখ দেখা যায়: "নন্দিভরতোক্ত সংকরহস্তাধ্যায়:"। এ'ছাড়া তামিলভাষায় একটি টীকাসহিত 'ভরতার্থচন্দ্রিকা' নামে নন্দিকেশ্বর বা নন্দিভরতের গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। ভরতার্থচন্দ্রিকার প্রশ্নকর্তা পার্বতী ও সিদ্ধান্তী নন্দিকেশ্বর। গ্রন্থের নানার্থপ্রকরণের শেষে উল্লেখ দেখা যায়: "ইতি নন্দিকেশ্বর-বিরচিত পার্বতীপ্রযুক্ত ভরতচন্দ্রিকা নানার্থপ্রকরণং সমাপ্তমাসীৎ"। কিন্তু তাঞ্জোর গ্রন্থাগারে রক্ষিত 'ভারতার্ণব' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে এই ভরতচন্দ্রিকার (?) নানার্থপ্রকরণটিকে ১০ম অধ্যায়-রূপে উল্লেখ দেখা যায়।

ডাঃ কৃষ্ণমাচারিয়ার 'ভরতচন্দ্রিকা' অর্থাৎ 'ভরতার্থচন্দ্রিকা' গ্রন্থটিকে 'ভরতার্ণব' গ্রন্থের সারসংকলন বলেছেন। 'ভরতার্ণব' গ্রন্থটিতে নাকি ৪০০ শ্লোকের সমাবেশ ছিল—নন্দি ও সুমতির মধ্যে কথোপকথনের আকারে লিখিত। তাঞ্জোর-গ্রন্থাগারে রক্ষিত পাণ্ডুলিপিতে নাকি ৫ম থেকে ১৪শ এই দশটি অধ্যায় মাত্র আছে এবং সে অধ্যায়গুলির নাম 'গুহেশভরতলক্ষণ'—অভিনয় সম্বন্ধে আলোচনা। ১৪শ অধ্যায়ের শেষে উল্লিখিত দেখা যায়: "ইতি শ্রীনন্দিকেশ্বরবিরচিতে ভরতার্ণবে নাট্যার্ণবে সুমতিবোধকে সপ্তলাস্তপ্রকরণং নাম চতুর্দশোঽধ্যায়:"।[২] ডাঃ রাঘবন উল্লেখ করেছেন 'গুহেশভরত' নামটি শুদ্ধ নয়, পরিশুদ্ধ নাম 'গুহ্যকেশভরত', কেননা সুমতি ছিলেন গন্ধর্বজাতীয় গুহ্যকদের রাজা আর তারি জন্য তার নাম ছিল গুহ্যকেশ। নন্দিকেশ্বর গুহ্যকেশ-সুমতিকে লক্ষ্য ক'রে নাট্যবিষয়ের আলোচনা করেছিলেন।[৩]

তাঞ্জোর-গ্রন্থাগারের পুস্তকতালিকায় নন্দিকেশ্বরের নামাঙ্কিত 'তাললক্ষণ' নামে আর একটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। গ্রন্থটির সূচনায় উল্লিখিত হয়েছে: "নন্দিকেশ্বরায় নমঃ"। কিন্তু এই নন্দিকেশ্বর কে? নন্দিকেশ্বর নিজেকে কখনো 'নন্দিকেশ্বরায় নমঃ' ব'লে প্রণাম করতে পারেন না। অনেকে বলেন প্রণম্য নন্দিকেশ্বর 'শিব'; গ্রন্থকার নন্দিকেশ্বর শিব-নন্দিকেশ্বরকে প্রণাম

২। Vide *History of Classical Sanskrit Literature*, pp. 825-826.

৩। (ক) Vide *The Journal of the Music Academy*, Madras, Vol. III, 1932, p. 16.

(খ) 'ভরতার্ণব' পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে (*a*) Vide *Descriptive Catalogue of Sans. Mss. in the Oriental Mss. Library*, Madras, Vol. XII, No. 8735; (*b*) *Triennial Catalogue of Sans. Mss. in Oriental Library*, Madras, Vol. II, No. 1360, Vol. III, No. 2435.

ক'রে তবে 'তাললক্ষণ' গ্রন্থটি আরম্ভ করেছেন। যুক্তিটি সাবলীল হ'লেও বিশেষ সুদৃঢ় নয়, তাই 'তাললক্ষণ' গ্রন্থটি সত্যই অভিনয়দর্পণকার বা 'ভরতার্ণব' রচয়িতা নন্দিকেশ্বরের রচনা কিনা সে' বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

একথা ঠিক যে নন্দিকেশ্বর সঙ্গীতের চেয়ে নাট্যের আলোচনাই বিশেষভাবে করেছেন। কবি রাজশেখর তাঁর 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থে সাহিত্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে নন্দিকেশ্বরকে রসশাস্ত্রের রচয়িতা ব'লে উল্লেখ করেছেন। 'অভিনয়দর্পণ' গ্রন্থখানি আলোচনা করলে অবশ্য সে'কথা চাক্ষুষভাবে প্রমাণ হয়। 'অভিনয়দর্পণ' ছাড়া তাঞ্জোর-গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত 'ভরতার্ণব' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির ১০ম অধ্যায়ে যেমন নাট্যসম্বন্ধীয় 'ভরতচন্দ্রিকা' গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় তেমনি তার ১৩শ অধ্যায়ে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত আর একখানি নাট্যগ্রন্থেরও নিদর্শন পাওয়া যায়। ভরতার্ণবের ১৩শ অধ্যায় উল্লিখিত অংশটি হ'ল:

স্বমতে শ্রুয়তাং সম্যক্ যাজ্ঞবল্ক্যো মহামুনিঃ।
তাণ্ডবানাং গতীনাং চ ভরতার্ণবলক্ষণে॥
নাট্যশাস্ত্রক্রমং সম্যক্ উক্তবান্ ক্রমপূর্বকম্।

অনেকে নন্দিকেশ্বর ও ঋষি তণ্ডু এই দু'জনকে অভিন্ন ব্যক্তি বলেন (?)। সঙ্গীত-রত্নাকরে নর্তনাধ্যায়ের টীকায় কল্লিনাথ অন্ততপক্ষে পাঁচবার তণ্ডুর নাম উদ্ধৃত করেছেন। সেখানে তণ্ডু 'ভট্টতণ্ডু' নামে পরিচিত: "অন্যেঽপি বহবঃ পূর্বং প্রযুক্তা ভট্টতণ্ডুনা"। কল্লিনাথ অবশ্য কোহলের 'সঙ্গীতমেরু' থেকে পাঠ উদ্ধৃত করেছেন ও সেখানে নন্দিকেশ্বরের কোন নামের উল্লেখ নাই। কাজেই তণ্ডু বা ভট্টতণ্ডু[৪] নন্দিকেশ্বর থেকে পৃথক আচার্য ছিলেন ব'লে আমাদের ধারণা।

আচার্য অভিনবগুপ্ত নন্দিকেশ্বর সম্বন্ধে অভিনবভারতীতে আলোচনা করেছেন, কিন্তু নন্দিকেশ্বর সম্বন্ধে তাঁর ধারণা প্রত্যক্ষ নয়, কেননা কীর্তিধরাচার্যের মতবাদই তিনি উল্লেখ করেছেন, প্রত্যক্ষভাবে নন্দিকেশ্বরের কোন বিষয় নিয়ে তিনি সম্ভবত আলোচনা করেন নি। তা'ছাড়া তিনি স্বীকারও করেছেন: "যত্তুৎ কীর্তিধরেণ নন্দিকেশ্বরতন্মাত্রগামিত্বেন (?) দর্শিতং তদস্মাভিঃ (তদস্মাভিঃ) ন দৃষ্টং, তৎ-প্রত্যয়াত্তু লিখ্যতে"। আচার্য কীর্তিধর নন্দিকেশ্বরের গ্রন্থ থেকে নাট্যের পূর্বরঙ্গে অনুষ্ঠেয় মার্গ-আসারিতনৃত্যের প্রয়োগ সম্বন্ধে যা আলোচনা করেছিলেন

৪। অনেকে আবার তণ্ডু তথা ঋষি তণ্ডুকে ভট্টতণ্ডু থেকে পৃথক ব্যক্তি বলেন।

অভিনবগুপ্ত তারই উল্লেখ করেছেন মাত্র।[৫] তবে অভিনবগুপ্তের 'অভিনব-ভারতী' থেকে বোঝা যায় তিনি 'নন্দিমত' নামে একটি গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছিলেন ও সে'সম্বন্ধে তিনি উল্লেখও করেছেন,

'তথা চ নন্দিমতে উক্তং—

রেচিতাখ্যোঽঙ্গহারো যো দ্বিধা তেন হ্যশেষতঃ।

তুষ্যন্তি দেবতাস্তেন তাণ্ডবে তে নিয়োজয়েৎ॥'

নন্দিকেশ্বরের অভ্যুদয় ও রচনা-কাল প্রভৃতি নিয়ে বিচিত্র মতবাদের প্রচলন আছে। অনেকে তাঁকে নাট্যশাস্ত্রকার ভরতেরও পূর্ববর্তী বলেন ও অনেকে আবার ভরতের সমসাময়িক ব'লেও উল্লেখ করেন। তাঁরা বলেন নন্দি বা নন্দিকেশ্বর প্রথমে শিবের (সদাশিবভরত ?) কাছ থেকে নাট্য ও সঙ্গীতবিজ্ঞান শিক্ষা করেন এবং পরবর্তী গ্রন্থকারেরাও ভরত ও নন্দিকেশ্বরের নামও একই সঙ্গে উল্লেখ করেছেন দেখা যায়।[৬] যেমন দামোদর-মিশ্র তাঁর 'কুট্টনীমত' গ্রন্থে (খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দী) প্রাচীন শাস্ত্রী হিসাবে ভরতের পাশাপাশি নন্দিকেশ্বরের নামোল্লেখ করেছেন।[৭] সারদাতনয় তাঁর 'ভাবপ্রকাশন' গ্রন্থে (৩য় অধ্যায়ে) উল্লেখ করেছেন যে নন্দিকেশ্বর মুনি ভরতকে নাট্যকলা শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু সারদাতনয় এই ধারণা কোথা থেকে পেলেন তার কোন প্রমাণপঞ্জীর কথা তিনি উল্লেখ করেন নি। বাৎস্যায়ন নন্দিকে আবার শিবের অনুচর ব'লে উল্লেখ করেছেন। নন্দি তথা নন্দিকেশ্বর নাকি 'কামশাস্ত্র' নামে একটি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। বাৎস্যায়ন উল্লেখ করেছেন: "মহাদেবানুচরশ্চ নন্দী সহস্রেণাধ্যায়ানাং পৃথক্কামসূত্রং প্রোবাচ"। কিন্তু নন্দিকেশ্বর-প্রণীত কোন কামশাস্ত্রের উল্লেখ কোন গ্রন্থে আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় না। নন্দিকে অনেকে আবার তুম্বুরুর মতো শিব বা মহাদেবেরই অভিন্ন মূর্তি বলেন।[৮] কিন্তু সঙ্গীত-রত্নাকরে শার্ঙ্গদেব

৫। Vide *The Journal of the Music Academy*, Madras, Vol. III, 1932, p. 15.

৬। "Nandikeśvara or Nandin shortly, was the first to receive initiation into the science of music from Śiva. * * While Bharata confined himself to music in relation to drama, Nandikeśvara interested himself in the music requisite for ceremonials and festivals."—*HSL.*, p. 825.

৭। Vide Dr. S. K. De: *The Sanskrit Poetics*, pp. 24-26.

৮। ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চি উল্লেখ করেছেন: "Nandikeśvara is another name of Śiva; * * still it seems probable that Tumburu was no other than *Śiva* himself."—*Studies in the Tantras*, pp. 13-14.

কতটুকু তা বিচার করা প্রয়োজন। নন্দিকেশ্বরই বরং উল্লেখ করেছেন : "নাট্যবেদং দদৌ পূর্বং ভরতায় 'চতুর্মুখঃ'। চতুর্মুখ দ্রুহিণ-ব্রহ্মারই গৌরবসূচক উপাধি। তা'ছাড়া নন্দিকেশ্বর-সম্প্রদায়কে যে তিনি ভরতের সম্প্রদায়ের চেয়ে প্রাচীন বলেছেন তাও কতটুকু সমীচীন তা আলোচনার বিষয়।[১৪]

পরবর্তী গ্রন্থকাররা উল্লেখ করেছেন যে ভরত ও নন্দিকেশ্বর উভয়ের মতের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছিল। অভিনবগুপ্ত মৃদঙ্গের প্রসঙ্গে নন্দিমতের উল্লেখ ক'রে উভয়ের (ভরত ও নন্দিকেশ্বর) মতের পার্থক্য দেখিয়ে বলেছেন :

'যথোক্তং নন্দীশ্বর মতে—

ষোড়শস্বপি বর্ণেষু ভেদাঃ পঞ্চদশোদিতাঃ।

তাড়নে গ্রহসন্ধানমোক্ষে মুখচতুষ্টয়ম্ ॥

'নন্দীশ্বরসংহিতা'গ্রন্থের উল্লেখ ক'রে রঘুনাথও ঐ পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন আচার্য উমাপতি তাঁর 'ঔমাপতম্' গ্রন্থে নাট্যের আলোচনায় ভরতের মতের সঙ্গে একমত হ'তে পারেন নি। কল্লিনাথ অবশ্য অনৈক্যের পরিবর্তে নন্দিকেশ্বর, ভরত ও মতঙ্গের মতের তুলনা করেছেন : "যদি পুনর্মতঙ্গ-নন্দিকেশ্বরাদিভিঃ প্রয়োগে স্থানত্রয়ব্যাপ্তিসিদ্ধ্যর্থং লক্ষ্যানুরোধেন দ্বাদশস্বরমূর্ছনা অপ্যুক্তা * *। কুতোঽয়ং নিয়মঃ। ভরতাদিনিয়মিতত্বাত্তাসাম্। যথাঽহ ভরতঃ—'মধ্যমস্বরেণ বৈণবেন মূর্ছনানির্দেশঃ' ইতি। মতঙ্গোঽপি—'মধ্যসপ্তকেন মূর্ছনানির্দেশঃ কার্যো মন্দ্রতারসিদ্ধ্যর্থম্' ইতি।"[১৫] শ্রদ্ধেয় অশোকনাথ শাস্ত্রী তাঁর বাঙ্গালা-সংস্করণ অভিনয়দর্পণের ভূমিকায় ভরত, নন্দিকেশ্বর ও শার্ঙ্গদেবের মধ্যে শিরঃকর্ম, দৃষ্টি, গ্রীবা, হস্ত, অসংযুত-হস্ত, সংযুত-হস্ত, নৃত্তহস্ত, পাদভেদ, মণ্ডল, উৎপ্লবন, ভ্রমরী, চারী, স্থান, গতি প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনায় যেখানে তাঁদের মধ্যে মত-পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে তার উল্লেখ করেছেন। তাঁর অভিমত যে, সঙ্গীত-রত্নাকরের নর্তনাধ্যায়টি ভরত-সম্প্রদায়ের অনুবর্তী। আবার অনেকে বলেন যে শার্ঙ্গদেব বিশেষভাবে নন্দিকেশ্বরের মতেরই অনুগামী ছিলেন।

নন্দিকেশ্বর নাট্য, নৃত্ত ও নৃত্য এ'তিনটির পরিচয়-প্রসঙ্গে বলেছেন : যা নাট্য তাই নাটক। নাট্য পূজার উপযোগী ও প্রাচীন কথাযুক্ত : "নাট্যং তন্নাটকঞ্চৈব

১৪। শ্রদ্ধেয় অশোকনাথ শাস্ত্রী তাঁর অভিনয়দর্পণের বাঙ্গালা-সংস্করণে নন্দিকেশ্বর, ভরত ও কোহল-মতঙ্গ সম্প্রদায় তিনটির আলোচনা করেছেন।—অভিনয়দর্পণের ভূমিকা, পৃ° ।/০-।৵০ দ্রষ্টব্য।

১৫। 'সঙ্গীত-রত্নাকর' (পুনা-সংস্করণ), পৃ° ৪৭, এবং (আডয়ার সংস্করণ) ১ম ভাগ, পৃ° ১০৩।

পূজ্যং পূর্বকথাযুতম্"। 'নৃত্ত' ভাববিহীন ও 'নৃত্য' রস ও ভাবযুক্ত।[১৬] সারদাতনয় বলেছেন 'নৃত্ত' নট-কর্তৃক রসাভিনয়কর্ম, আর 'নৃত্য' ভাব ও রসাশ্রিত কর্ম। প্রকৃত-পক্ষে আঙ্গিকাদি চারটি অভিনয়বিহীন গাত্রবিক্ষেপের নাম 'নৃত্ত'। নৃত্যবিদ্‌গণ নৃত্যকে মার্গ ও নৃত্তকে দেশীশ্রেণীভুক্ত বলেছেন। সারদাতনয় 'ভাবপ্রকাশন' গ্রন্থে নৃত্ত ও নৃত্যকে মধুর ও উদ্ধত—লাস্য ও তাণ্ডব ভেদে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। শার্ঙ্গদেব তাণ্ডব ও লাস্যের পার্থক্য বিশেষভাবে স্বীকার করেছেন। তিনি সঙ্গীত-রত্নাকরের নর্তনাধ্যায়ের (৭ম) সূচনায় উল্লেখ করেছেন,

প্রয়োগমুদ্ধতং স্মৃত্বা স্বপ্রযুক্তং ততো হরঃ।
তণ্ডুনা স্বগণাগ্রণ্যা ভরতায় ন্যদীদিশৎ॥
লাস্যমস্যাগ্রতঃ প্রীত্যা পার্বত্যা সমদীদিশৎ।
বুদ্ধ্বাঽথ তাণ্ডবং তণ্ডোর্মর্ত্যেভ্যো মুনয়োঽবদন্॥
পার্বতী ত্বনুশাস্তিস্ম লাস্যং বাণাৎমজামুষাম্।
তয়া দ্বারবতীগোপ্যস্তাভিঃ সৌরাষ্ট্রযোষিতঃ।
তাভিস্তু শিক্ষিতা নার্যো নানাজনপদাস্পদা॥
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমেতল্লোকে প্রতিষ্ঠিতম্।

এখানে দেখা যায় তাণ্ডবকে উদ্ধত ও উগ্র নৃত্য হিসাবে তণ্ডুর তথা পুরুষের মাধ্যমে, আর লাস্য সুকুমার কোমল ব'লে পার্বতী তথা নারীর মাধ্যমে প্রচার করেছিলেন। দ্বারাবতী, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি জনপদের নারীরা পার্বতীর কাছ থেকে নৃত্য (লাস্য) শিক্ষা করেছিলেন। তাণ্ডব ও লাস্যের মধ্যে এখানে যথেষ্ট পরিমাণে ভেদ সৃষ্টি হয়েছে। অথচ আমরা আলোচনা করেছি যে ভরত নাট্যশাস্ত্রে তাণ্ডব ও লাস্যের মধ্যে ঠিক ভেদ স্বীকার করেন নি ও তারি জন্য স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষে তিনি তাণ্ডবনৃত্যের বিধান দিয়েছেন। কিন্তু খৃষ্টীয় ৯ম-১০ম থেকে ১৩শ শতাব্দীর সমাজে তাণ্ডব ও লাস্যের প্রয়োগে বেশ পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছিল। তখন যে নৃত্য অঙ্গহার, লয় ও ললিতভাবযুক্ত এবং কৈশিকীবৃত্তিসম্পন্ন তাকেই 'লাস্য' বলা হ'ত, আর যে নৃত্যের করণ ও অঙ্গহার উদ্ধত ও বীররসের দ্যোতক এবং বৃত্তি আরভটী তাকে 'তাণ্ডব' বলা হ'ত। অবশ্য এ'নিয়ে মতভেদও আছে। বিষম, বিকট ও লঘু ভেদে নৃত্যকে শার্ঙ্গদেব আবার তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। সঙ্গীত-দামোদরে নারদ

১৬। ভাবাভিনয়হীনং তু নৃত্তমিত্যভিধীয়তে।
রসভাবব্যঞ্জনাদিযুক্তং নৃত্যমিতীর্যতে।

(২য়) তাণ্ডবকে পেবলি ও বহুরূপ এই দু'ভাগে এবং লাস্যকে ছুরিত ও যৌবত দু'ভাগে বিভক্ত বলেছেন। পেবলিতে অঙ্গবিক্ষেপের প্রাধান্য থাকে। বহুরূপে ছেদন, ভেদন প্রভৃতি এবং বীররসের ও উদ্ধতভাবের প্রকাশ থাকে। ছুরিতনৃত্যে নায়ক ও নায়িকার মধ্যে ভাব ও রসের বিকাশ ও বিনিময় থাকে। যৌবত মধুর ও লীলায়িত নৃত্য।

নন্দিকেশ্বর নৃত্যের স্থানকে 'রঙ্গ' বলেছেন: "তদগ্রে নটনং কুর্যাৎ তৎস্থলং রঙ্গ উচ্যতে"। এই রঙ্গ বা নৃত্যমণ্ডপ কিভাবে সাজানো উচিত ও কিভাবে সেখানে শিল্পী-সমাবেশ করা হ'ত তার পরিচয় দিয়ে নন্দিকেশ্বর বলেছেন,

রঙ্গমধ্যে স্থিতে পাত্রে তৎসমীপে নটোত্তমঃ॥
দক্ষিণে তালধারী চ পার্শ্বদ্বন্দ্বে মৃদঙ্গকৌ।
তয়োর্মধ্যে গীতকারী শ্রুতিকারস্তদন্তিকে॥
এবং তিষ্ঠেৎ ক্রমেণৈব নাট্যাদৌ রঙ্গমণ্ডলী।

নর্তকী যখন রঙ্গমধ্যে স্থান গ্রহণ করত তখন তার কাছে একজন উত্তম অভিজ্ঞ নট থাকত। তার দক্ষিণে করতালধারী ও দু'পাশে দু'জন মৃদঙ্গী বা মৃদঙ্গবাদক আসন গ্রহণ করত। মৃদঙ্গীদের মাঝখানে থাকত গানকারী বা গায়ক ও তার কাছে শ্রুতিকার বা একজন বাদ্যযন্ত্রী থাকত। নাট্যের সূচনায় রঙ্গের যারা প্রযোজনা করত তারা এই ক্রম অনুসরণ ক'রে বসত। এখানে দেখা যায় ভরতের কুতপবিন্যাসের বা আসর-বিছানোর পদ্ধতি থেকে নন্দিকেশ্বরের আসরসজ্জার ধারা একটু ভিন্ন। তবে নৃত্যে ও নাট্যে গায়ক ও বাদকের উপযোগিতা যে প্রাচীন ভারতে অপরিহার্য ছিল তা ভরত ও নন্দিকেশ্বরের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়। পূর্ববঙ্গের বিধানের পর ভাব ও তালের দিকে লক্ষ্য রেখে নৃত্য, গীত ও অভিনয় আরম্ভ করা হ'ত: "এবং কৃত্বা পূর্বরঙ্গং নৃত্যং কার্যং * * নৃত্যং গীতাভিনয়নভাবতালযুতং ভবেৎ"। কণ্ঠে স্বরের অপরূপ লীলায়ণের সঙ্গে হাতের ইঙ্গিতে গানের অর্থ বোঝানো হ'ত। চোখের ভঙ্গিতে ভাব ও পদদ্বয়ে তাল প্রদর্শন করা হ'ত।[১৭] এই সকল-কিছুর পিছনে থাকত কিন্তু মনের খেলা, ভাবের বিকাশ ও রসের স্বতঃস্ফূর্ত ধারা। মোটকথা রস ও ভাবের বিকাশসাধন করাই ছিল নৃত্য, গীত ও অভিনয়ের মুখ্য-উদ্দেশ্য। নন্দিকেশ্বর ঐ প্রসঙ্গে উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

১৭। আস্যেনালম্বয়েদ্ গীতং হস্তেনার্থং প্রদর্শয়েৎ।
চক্ষুর্ভ্যাং দর্শয়েদ্ভাবং পাদাভ্যাং তালমাদিশেৎ॥

যতো হস্তস্ততো দৃষ্টির্যতো দৃষ্টিস্ততো মনঃ।
যতো মনস্ততো ভাবো যতো ভাবস্ততো রসঃ॥

ভরতও নাট্যশাস্ত্রে রস ও ভাবের ওপরই জোর দিয়েছেন নৃত্য, গীত, বাদ্য ও অভিনয়ের বেলায়। নন্দিকেশ্বর অভিনয়ের পরিচয়-প্রসঙ্গে আঙ্গিকাভিনয়, বাচিকাভিনয়, আহার্যাভিনয়, সাত্ত্বিকাভিনয়, অভিনয়ের সাধন-রূপ অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, উপাঙ্গ, শিরোভেদ, সমশির, উদ্বাহিতশির, অধোমুখশির, আলোলিতশির, ধুতশির, কম্পিতশির, পরাবৃত্তশির, উৎক্ষিপ্তশির, পরিবাহিতশির, আলোকিতাদি দৃষ্টিভেদ, সুন্দরী প্রভৃতি গ্রীবাভেদ এবং অসংযুত, পতাকাদি হস্তভেদ ও তাদের প্রয়োগের পরিচয় দিয়েছেন। ভরতের সঙ্গে এ'সকল করণের কিছু কিছু ভেদ আছে। যেমন পতাক, ত্রিপতাক, কর্তরীমুখ, অর্ধচন্দ্র, অরাল, শুকতুণ্ড, মুষ্টি, শিখর, কপিত্থ, কটকামুখ, সূচী, পদ্মকোশ, সর্পশীর্ষ, মৃগশীর্ষ, হংসবক্ত্র, হংসপক্ষ, সন্দংশ, মুকুল, তাম্রচূড় প্রভৃতি হস্তমুদ্রার বর্ণনাভেদ নাট্যশাস্ত্রের তুলনায় অভিনয়দর্পণে লক্ষ্য করা যায়।[১৮] হস্তমুদ্রার পরিচয় দেবার সময় নন্দিকেশ্বর মাঝে মাঝে 'ভরতাগম' শাস্ত্রের নামোল্লেখ করেছেন: "ভ্রমরাখ্যশ্চ হস্তোঽয়ং কীর্তিতো ভরতাগমে"; "পিধানে হংসপক্ষোঽয়ং কথিতে ভরতাগমে"; "মুকুলাভিধহস্তোঽয়ং কীর্ত্যতে ভরতাগমে" প্রভৃতি। এ'ছাড়া তিনি 'ভরতবেদিভিঃ' বা 'ভরতাগমকোবিদৈঃ' শব্দগুলির ব্যবহার করেছেন। 'ভরতাগম' বলতে মনে হয় ভরতের নাট্যশাস্ত্রকে তিনি লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু পূর্ব-পূর্ব আচার্য ব্রহ্মা, সদাশিব, কোহল সকলেরই উপাধি 'ভরত', সুতরাং তাঁদের আগম বা নাট্যশাস্ত্র তথা নাট্যবেদকেও বোঝাতে পারে। তবে অভিনয়দর্পণের প্রারম্ভে নন্দিকেশ্বর যখন উল্লেখ করেছেন: "নাট্যবেদং দদৌ পূর্বং ভরতায় চতুর্মুখঃ" তখন খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর মুনি ভরতের নাট্যশাস্ত্রকেই 'ভরতাগম' শব্দের দ্বারা লক্ষ্য করেছেন ব'লে অনুমান হয়।

নন্দিকেশ্বর ভ্রমরীর লক্ষণ ও ভেদ, চারিভেদ, গতিভেদ প্রভৃতিরও পরিচয় দিয়েছেন। ভ্রমরী ষোল রকম আকাশিকী-চারির অন্যতম। অবশ্য এর অঙ্গবিক্ষেপের প্রণালী একটু ভিন্ন। ভরত ১৬টি ভৌম ও ১৬টি আকাশিকী-চারির পরিচয় দিয়েছেন। শার্ঙ্গদেব ৩৫ রকম দেশী ভৌমচারী ও ১৯ রকম দেশী আকাশিকী-চারি এবং কোহল ২৫ রকম 'মধুপ'-চারির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে

১৮। Vide *Introduction* to Abhinaya-Darpaṇam (edited by Dr. Monomohon Ghose), pp. xlvi-lx.

ভরত, কোহল ও শার্ঙ্গদেবের বর্ণিত চারিগুলির সঙ্গে নন্দিকেশ্বরের ৮ রকম চারিভেদের কোন মিল নাই।[১৯] নন্দিকেশ্বর-বর্ণিত আটটি চারির নাম : চলন, চঙ্ক্রমণ, সরণ, বেগিণী, কুট্টন, লুঠিত, লোলিত ও বিষমসঞ্চার। গতিভেদ আবার দশ রকম। ভরতও গতিভেদ স্বীকার করেছেন (১২শ অধ্যায়)। শার্ঙ্গদেব গতিভেদ স্বীকার করেন নি, তিনি চারিকেই গতিশ্রেণীভুক্ত বলেছেন।[২০]

বিকানির-গ্রন্থাগারের পুস্তকতালিকা থেকে (The Bakaner Catalogue, p. 519, Manuscript No. 1107) নন্দিকেশ্বরের নামাঙ্কিত 'রুদ্রডমরুদ্ভব-সূত্রবিবরণম্' নামে একখানি পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া যায়। ডাঃ রাঘবন তাঁর *Later Saṅgita Literature* নিবন্ধে[২১] এবং এ্যালেন দানিয়েলু *A Commentary on the Mahcśvara-Sutra* প্রবন্ধে[২২] উল্লেখ করেছেন। সূত্র-বিবরণটি বিখ্যাত মহেশ্বরসূত্রের ওপর ভাষ্যবিশেষ। 'মহেশ্বরসূত্র' সংস্কৃত ব্যাকরণের অবিচ্ছেদ্য অংশ ও এ'সম্বন্ধে আমরা 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' গ্রন্থের ১ম খণ্ডে 'পাণিনীয়-শিক্ষায় সঙ্গীত' আলোচনায় উল্লেখ করেছি।[২৩] স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণগুলির সৃষ্টিরহস্যের পরিচয় দিয়েছে 'মহেশ্বরসূত্র'। নন্দিকেশ্বর সেই রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য 'কাশিকাবৃত্তি' রচনা করেছিলেন। কাশিকাবৃত্তির কথা নাগোজীভট্ট তাঁর 'মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্যত' ও উপমন্যু তাঁর 'তত্ত্ববিমর্শিনী' ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন। বিকানিরের পুস্তকতালিকা থেকে জানা যায় 'নন্দিকেশ্বর'-নামা জনৈক ভাষ্যকার 'রুদ্রডমরুদ্ভবসূত্রবিবরণ'-ও রচনা করেন মহেশ্বরসূত্রের অক্ষর-সৃষ্টিরহস্যকে পরিস্ফুট করার জন্য। এখানে প্রশ্ন এই যে কাশিকাবৃত্তিকার ও ডমরুদ্ভবসূত্রবিবরণকার এই দুই নন্দিকেশ্বর এক ব্যক্তি—কি দু'জন পৃথক ব্যক্তি এবং খৃষ্টীয় ২য়—৫ম শতাব্দীর নাট্য ও সঙ্গীতশাস্ত্রকার নন্দিকেশ্বরের সঙ্গে তাদের কোন যোগসূত্র আছে কিনা,

১৯। 'অভিনয়দর্পণ' (শ্রদ্ধেয় অশোকনাথ শাস্ত্রী-সংপাদিত), পৃ° ১১৬-১২০

২০। শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকরের ৬ষ্ঠ বাদ্যাধ্যায়ে নন্দিকেশ্বরের অভিমতে কোণাহত, সম্রান্ত, বিষম ও অর্ধসম এই চার রকম হস্তপাটের উল্লেখ করেছেন : "ইতি নন্দিকেশ্বরোক্তশ্চত্বারো হস্তপাটাঃ"। কল্লিনাথও উল্লেখ করেছেন : "নন্দিকেশ্বরোক্তানাং পাটানাং স্বরূপং বাদনপ্রকারপূর্বকং নির্ণয়তি"। এ'থেকে মনে হয় নন্দিকেশ্বরের-রচিত একটি সঙ্গীতগ্রন্থ ছিল।

২১। Vide *The Journal of the Music Academy*, Madras, Vol. IV, 1933, p. 78.

২২। Vide *The Journal of the Music Academy*, Madras, Vol. XXII, 1951, pp. 119-128.

২৩। প্রজ্ঞানানন্দ : 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি', ১ম ভাগ, পৃ° ১৭০, ১৮২-১৮৩

কিংবা বৃত্তিকার, বিবরণকার ও অভিনয়দর্পণ-প্রণেতা নন্দিকেশ্বর একই ব্যক্তি কিনা।

মাননীয় দানিয়েলু 'সূত্রবিবরণ'-ভাষ্যটির রচনাকালের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন সূত্রটির পাণ্ডুলিপিতে প্রাচীন আচার্য হিসাবে মাত্র ভরত ও পাণিনির নামই উল্লিখিত হয়েছে: "তেষু পাণিনীয় মুনীশ্বরৈঃ" এবং "তাসাং নামানি প্রোক্তানি ভরতেন চ", সুতরাং তা থেকে অনুমান করা যায় সূত্রবিবরণকার নন্দিকেশ্বর পাণিনি ও ভরতের (কোন্ ভরত তার কোন সঠিক উল্লেখ নাই) পরবর্তী এবং পাণিনি ও ভাষ্যকার পতঞ্জলির তথা খৃষ্টপূর্ব ৫ম ও খৃষ্টপূর্ব ২য় শতকের মাঝামাঝি সময়ের গুণী।[২৪] অবশ্য সূত্রবিবরণকারের সময়-নির্ধারণে মাননীয় দানিয়েলু ধরেই নিয়েছেন যে কাশিকাবৃত্তিকার ও সূত্রবিবরণকার নন্দিকেশ্বর এক ও অভিন্ন ব্যক্তি, আর অভিনয়দর্পণকার কিংবা নাট্য ও সঙ্গীতকার নন্দিকেশ্বরের কোন কথাই তিনি উল্লেখ করেন নি। নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের অভ্যুদয়-কাল সম্বন্ধেও তাঁর অভিমত সুস্পষ্ট নয়। ডাঃ রাঘবন সূত্রবিবরণকারের অভ্যুদয়-কাল বলেছেন অজ্ঞাত।[২৫]

মাননীয় এ্যালেন দানিয়েলু যে 'রুদ্রডমরূদ্ভবসূত্রবিবরণম্' সূত্রভাষ্যটি প্রকাশ করেছেন তার সূচনায় আছে "(শ্রীনন্দিকেশ্বর-প্রণীতম্?)"। সূত্রভাষ্যটি কিন্তু অসম্পূর্ণ; তার ১ থেকে ১৫নং শ্লোক নাই এবং ১৬ থেকে ৪৫নং শ্লোক পর্যন্তই আছে। তাও ২৯, ৩৬, ৪০, ৪১ শ্লোকগুলি সম্পূর্ণ নয়। সূত্রবিবরণটি বিশেষভাবে আলোচনা করলে সাধারণত মনে হয় যে ভাষ্যটি খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে হ'লেও খৃষ্টীয় ৩য়-৪র্থ ও ৫ম-৭ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে লেখা, তার আগে নয়। সেদিক থেকে অভিনয়দর্পণকার নন্দিকেশ্বর ও সূত্রবিবরণকার নন্দিকেশ্বর বরং

২৪। 'The manuscript mentions only two names those of Bharata and Pāṇini. Since *Kāśikā* appears to be anterior to Patanjali, Nandikeśvara should be situated between Pāṇini and Patanjali. According to the present usual chronology this would place him between the 5th and the 2nd centuries B.C. * * As for Bharata his name is of the greatest antiquity although the available *Nātya Sāstra* appears to be a compilation made in the first centuries of the Christian era * * ".

২৫। "The work now under notice, viz. the *Rudra-Damarudbhava-Sūtra-Vivaraṇa* seems to give an exposition of the legend of the origin of those *Sūtras* * *. The author of the work is not known." —*JMA*, Vol. IV, 1933, p. 78.

একই ব্যক্তি এ'রকম মনে করা যেতে পারে (?)। কিন্তু যদিও সূত্রে পাণিনি ও ভরতের নামোল্লেখ আছে তাই ব'লে মোটেই তিনি খৃষ্টপূর্বাব্দের রচয়িতা নন। অবশ্য বিকানির-গ্রন্থতালিকায় সূত্রবিবরণকারের কোন সময়ের উল্লেখ নাই। তাই বেশীর ভাগই মনে হয় রুদ্রডমরূদ্ভবসূত্রবিবরণকার কাশিকা ও অভিনয়-দর্পণ এই উভয় ব্যাখ্যাকার ও রচয়িতা থেকে ভিন্ন একজন গুণী। তবে সঙ্গীত বিষয়ে তিনি যে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন একথা স্বীকার্য। আমাদের কথা এই যে যখন সঠিক নির্ধারণের দ্বার চাক্ষুষ প্রমাণপঞ্জীর অভাবে অবরুদ্ধ তখন অভিনয়-দর্পণকার নন্দিকেশ্বরের আলোচনা প্রসঙ্গে নন্দিকেশ্বর নামের সাদৃশ্য থাকায় তাঁর অমূল্য অবদান 'সূত্রবিবরণম্'-ভাষ্যের কিছুটা পরিচয় দেওয়া অসমীচীন নয়। অন্তত সাঙ্গীতিক জ্ঞান ও সঙ্গীতের ইতিহাসের ক্ষেত্রে তার মূল্য যথেষ্ট।

'সূত্রবিবরণ'-ভাষ্যের পরিশেষে উল্লিখিত হয়েছে: "ইতি শ্রীমার্গসঙ্গীতে শ্রীরুদ্রডমরূদ্ভবসূত্রবিবরণং সমাপ্তম্"। এক্ষণে এই সমাপ্তিপাঠটি যদি বিকানির-পুস্তকতালিকায় উল্লিখিত পাণ্ডুলিপির অন্তর্ভুক্ত হয় তবে ভাষ্যটির কাল নির্ধারণ করা যেতে পারে খৃষ্টীয় ২য় শতক থেকে ৫ম-৭ম শতাব্দীর মধ্যে, কেননা বৈদিকোত্তর ক্ল্যাসিক্যাল যুগের গোড়া তথা খৃষ্টপূর্ব ৬০০-৫০০ থেকে খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত গান্ধর্ব বা মার্গসঙ্গীতই একমাত্র ভারতীয় সমাজের অনুশীলনের বস্তু ছিল। কল্লিনাথের "জাত্যান্তরভাষান্তং যদুক্তং তদ্গান্ধর্বমিত্যার্থঃ" কথাগুলি থেকে বোঝা যায় জাতিরাগ থেকে অন্তরভাষা পর্যন্ত রাগগীতিগুলি গান্ধর্ব বা মার্গশ্রেণীভুক্ত ছিল। জাতি, গ্রাম, ভাষা, বিভাষা ও অন্তরভাষা রাগগুলি গান্ধর্ব-সঙ্গীতের উপাদান। ভরতের পর কোহল, দত্তিল, যাষ্টিক, শাণ্ডিল্য ও অভিনয়-দর্পণকার নন্দিকেশ্বরের সময়ে দেশীরাগ ও রাগগীতিগুলি সমাজে বিকাশ লাভ করলেও গান্ধর্ব বা মার্গসঙ্গীতের একেবারে বিলোপ ঘটে নি, সুতরাং সে'দিক থেকেও সূত্রবিবরণকারের সময় খৃষ্টীয় ২য় থেকে ৫ম-৭ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে নির্ধারণ করা যেতে পারে।

সূত্রবিবরণের ১৬শ শ্লোকে তত্ত্ব, মন্ত্র, ভূত, রৌদ্র, সারস্বত ও পাট এই ছ'রকম সূত্রের উল্লেখ আছে। ছত্রিশটি অক্ষর তত্ত্বসূত্র এবং ব্রহ্মা (ব্রহ্মাভরত ?) এই তত্ত্বসূত্রের পরিচয় দিয়েছিলেন: "ব্রহ্মপ্রভাবিতম্"। সূত্রকার লৌকিক ষড়্জাদি সাত স্বর স্বীকার করেছেন। মহেশ্বরসূত্রের প্রারম্ভিক প্রধান সূত্র বারটি। তাদের মধ্যে দ্বিতীয়টি অর্থশূন্য। প্রথমটি লঘুসূত্র—ষড়্জ, ঋষভ ও গান্ধারের, তৃতীয়টি গুরুসূত্র—মধ্যম ও পঞ্চমের এবং চতুর্থটি প্লুতসূত্র—ধৈবতও

নিষাদ স্বরের দ্যোতক। এ'ভাবে তিনটির অক্ষর বা স্বরসূত্র থেকে সাতটি সাঙ্গীতিক স্বরের সন্ধান পাওয়া যায়। সূত্রকার উল্লেখ করেছেন।

ত্রিবিধং স্বরসূত্রং তু নামাক্ষরস্বরাত্মকম্ ॥
ত্রিসূত্রৈস্তে স্বরাঃ প্রোক্তা দ্বিতীয়ং তু নিরর্থকম্।
লঘুসূত্রং তু প্রথমং গুরুসূত্রং তৃতীয়কম্ ॥
চতুর্থং প্লুতসূত্রং স্যাদইউণ্ সরিগাঃ স্মৃতাঃ।
এঅোঙ্ মপৌ ধনী ঐঔচ্ দ্বেধা সপ্তস্বরা মতাঃ ॥

অর্থাৎ—

II অ ই উ ণ্	ঋ ৯ ক্	এ অো ঙ্	ঐ ঔ চ্ II
১	২	৩	৪
সরিগ	×	মপ	ধনী

সূত্রকার বলেছেন সাতটি স্বরবর্ণ ও সাঙ্গীতিক স্বর দু'রকমভাবে বিকাশ লাভ করে: "অস্মাদ্ যৎ দ্বিগুণং (?) প্রোক্তম্"। এ'ভাবেই (দ্বিগুণ অনুসারেই) মন্দ্র, মধ্য ও তার স্থান-তিনটির সৃষ্টি হয়েছে। সূত্রকার আবার শিক্ষাকার যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির মতো উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিনটি স্থানস্বর থেকে ষড়্জাদি সাতটি লৌকিক স্বরের সৃষ্টির কথা বলেছেন,

উদাত্তে নিষাদগান্ধারাবনুদাত্ত (?) ঋষভধৈবতৌ ॥
স্বরিতপ্রভবা হ্যেতে ষড়্জমধ্যম (-পঞ্চমাঃ)।[২৬]

এরপর সূত্রবিবরণকার শ্রুতি ও তার বিভাগের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন: "চতুঃসপ্তাষ্টবিধিসপ্তদশবিংশতিদ্বাবিংশতিরিতি সপ্তস্থানসংস্থিতাঃ শুদ্ধাঃ। যেষাং শুদ্ধত্বহানিঃ স্যাত্তে স্বরা বিকৃতা মতাঃ ॥" অর্থাৎ একটি সপ্তকে বাইশটি শ্রুতির সমাবেশ থাকে এবং ষড়্জাদি সাত স্বরের স্থিতিস্থান ৪, ৭, ৯, ১৩, ১৭, ২০ এবং ২২ সংখ্যক শ্রুতিতে নির্দিষ্ট থাকে। এই শ্রুতি ও স্বরস্থানের বিভাগকে প্রকৃত বা শুদ্ধ বলে। শুদ্ধত্বের হানি হ'লে বিকৃত স্বরের সৃষ্টি হয়।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে সূত্রবিবরণকার ভরতের অনুযায়ী বাইশ শ্রুতি ও স্বরস্থানের পরিচয় দিয়েছেন এবং শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের কথা উল্লেখ করেছেন। শুদ্ধ স্বর যে সাতটি সে'কথাও তিনি স্বীকার করেছেন, কিন্তু বিকৃত স্বরের কোন সংখ্যার কথা বলেন নি। তবে নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের যখন তিনি অনুগামী তখন

২৬। সূত্রবিবরণের পাণ্ডুলিপিতে (manuscript) পঞ্চমের স্থানে নাকি 'ধৈবতাঃ' শব্দ আছে, মনে হয় তা সঠিক নয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

॥ গুপ্ত ও তার পরবর্তী যুগ
(খৃষ্টীয় ৩২০—৬০০ শতাব্দী)

মৌর্যযুগের পর গুপ্তযুগের সূচনা হয় আনুমানিক ৩২০ খৃষ্টাব্দে ও গুপ্তরাজারা রাজত্ব করেন খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত। এই দু'শো আশী বছর ভারতের সংস্কৃতি তথা শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, ভাস্কর্য প্রভৃতির ক্ষেত্র যথেষ্ট পরিমাণে প্রসারিত হয়েছিল। এই সময়েই বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীদের নিখুঁৎ মূর্তিশিল্পের বিকাশসাধন হয়। মৌর্যযুগেই বিশেষ ক'রে মগধ ও মালোয়ার (মালব ?) শাসক ও রাজন্যবর্গ গ্রীস ও রোম প্রভৃতি বিদেশী সভ্য জাতিদের সঙ্গে মৈত্রীসম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। ভারতীয় দার্শনিক, ব্যবসায়ী ও পরিব্রাজকরা এথেন্সের বিদ্বৎসমাজের সঙ্গে মেলামেশার ভাব বজায় রেখেছিলেন। ভারত ও ভারতেতর দেশগুলির মধ্যে শিক্ষা, শিল্প ও সভ্যতার আদানপ্রদান ছিল। গুপ্তযুগের সূচনায় চীনাদেশের সঙ্গে ভারতের সৌখ্যসম্পর্কেরও আভাস পাওয়া যায়।

গুপ্তযুগ আরম্ভ হয় শ্রীগুপ্ত ও তাঁর পুত্র শ্রীঘটোৎকচগুপ্ত থেকে। 'মহারাজ' উপাধি লাভ ক'রে শ্রীগুপ্ত ও শ্রীঘটোৎকচগুপ্ত মগধে (?) পর পর রাজত্ব করেন। পরে শ্রীঘটোৎকচগুপ্তের পুত্র 'মহারাজাধিরাজ' উপাধিতে ভূষিত হ'য়ে রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। খৃষ্টীয় ৬৭১—৬৯৫ অব্দে চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিঙ্ তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে মহারাজ শ্রীগুপ্তের নামোল্লেখ করেছেন। মহারাজ শ্রীগুপ্ত ও শ্রীঘটোৎকচগুপ্তের নির্দিষ্ট তারিখ বা তাঁদের সবিশেষ কাহিনী কিছু পাওয়া যায় না। ডাঃ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার উল্লেখ করেছেন তাঁদের সম্বন্ধে দু'টি প্রমাণপঞ্জী নাকি পাওয়া যায়: (১) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্যা বাকাটকরাজমহিষী প্রভাবতীগুপ্তার, এবং (২) রেওয়া থেকে আবিষ্কৃত—এই দু'টি নথিপত্র থেকে জানা যায় মহারাজ শ্রীঘটোৎকচগুপ্তই ছিলেন গুপ্তবংশের প্রথম রাজা। তবে আসলে মহারাজ শ্রীঘটোৎকচের পুত্র ও উত্তরাধিকারী মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্তই (১ম) ছিলেন গুপ্তবংশে উল্লেখযোগ্য নৃপতি। চন্দ্রগুপ্ত (১ম) লিচ্ছবিবংশের কুমারদেবীকে বিবাহ করেন। স্মার্ত মনু উল্লেখ করেছেন লিচ্ছবিরা ছিল ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়। গৌতম-বুদ্ধের সময়ে কেন—তাঁর আগে থেকেই

লিচ্ছবিরা স্বাধীন রাজা হিসাবে বৈশালীনগরে রাজত্ব করত। লিচ্ছবি-শাসকরা ছিল এক একজন ধনী শ্রেষ্ঠী বা গোষ্ঠিপতি। নেপালের উপত্যকায়ও লিচ্ছবিবংশের নিদর্শন পাওয়া যায়। লিচ্ছবিরা ছিল রুচিতে সৌখীন ও শিল্প-সংস্কৃতির পূজারী। সঙ্গীতানুশীলন ছিল তাদের দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অংশ। তারা বিচিত্র রকমের উৎসবের অনুষ্ঠান করত। বৌদ্ধজাতকে সঙ্গীতের আলোচনায় আমরা তাদের আমোদানুষ্ঠানের কথা কিছু উল্লেখ করেছি। তাদের উৎসবগুলির মধ্যে সব্বরত্তিবারো বা সব্বরত্তিচারো ছিল প্রধান ও উল্লেখযোগ্য। সেই উৎসবে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের আয়োজন থাকত। বিচিত্র রকমের গীতির সঙ্গে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রের সমাবেশ থাকত। বৈশালীতেই প্রায় সে ধরণের উৎসব অনুষ্ঠিত হত। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই স্বাধীনভাবে সেই সব্বরত্তিচারো-উৎসবে যোগদান করত।

পৌরাণিকী প্রমাণপঞ্জী থেকে জানা যায় মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত (১ম) অযোধ্যা (সাকেত), প্রয়াগ (এলাহাবাদ) ও মগধে (দক্ষিণ-বিহার) রাজত্ব করতেন। ঐতিহাসিকেরা বলেন আনুমানিক খৃষ্টীয় ৩২০ শতাব্দীর ২৬শে ফেব্রুয়ারী থেকে গুপ্ত অব্দের সূচনা হয়।[১] সুতরাং সম্ভবত ঐ সময়েই চন্দ্রগুপ্ত (১ম) সিংহাসনে আরোহণ করেন। খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষ কতকগুলি স্বাধীনরাজ্যে বিভক্ত হয়েছিল। মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত (১ম) ও মহারাণী কুমারদেবীর পুত্র মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত সম্ভবত খৃষ্টীয় ৩২০ শতাব্দীতে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।[২] ঐতিহাসিকদের মধ্যে এ' নিয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। তিনি সমগ্র বিহারে, উত্তরপ্রদেশে ও বাঙ্গালায় (উত্তরবঙ্গে ও পূর্ববঙ্গে কামরূপ থেকে তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত) রাজ্যবিস্তার করেন। তিনি উড়িষ্যায় এবং দক্ষিণদেশেও (দাক্ষিণাত্য) অভিযান করেছিলেন। শক ও কুষাণ রাজাদের সঙ্গে তাঁর বেশ সম্প্রীতি ছিল। কাজেই তদানীন্তন গুপ্তরাজ্যে শক ও কুষাণদের শিল্প ও সংস্কৃতির প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে পড়েছিল ব'লে মনে হয়।

মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত একজন আদর্শ নৃপতি ছিলেন। তাঁর সময়ে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নতুন যুগ সৃষ্টি হয়েছিল বলা যায়। বিভিন্ন মুদ্রা বা

১। অনেকের মতে ৩১৮ খৃষ্টাব্দে ২০শে ডিসেম্বর।

২। "He signalised his increased power and dominion by changing the title *Mahārāja,* adopted by his father and grandfather, for the higher imperial title *Mahārājādhirāja,* and probably also by founding an era to commemorate his corronation in A.D. 320."—*The History and Culture of the Indian People* (The Classical Age), p. 6.

শীলমোহর ও শিলালিপি থেকে প্রমাণ হয় যে তিনি বৈদিক সংস্কার ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুদ্ধার ক'রে অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। একটি শীলমোহরে এর চাক্ষুষ নিদর্শনও লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন শ্রেণীর শীলমোহরের মধ্যে পাঁচটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পঞ্চম শীলমোহরটির একপীঠে একটি তেজস্বী অশ্বকে যজ্ঞীয় যূপের সামনে দণ্ডায়মান দেখা যায় ও অন্যপীঠে রাজমহিষীর প্রতিকৃতি অঙ্কিত।[৩] অশ্ব ও যূপ অশ্বমেধ-যজ্ঞানুষ্ঠানেরই স্মারক চিহ্ন। অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠানে বৈদিক গান বা সামগানেরও পুনরাবৃত্তি হয়েছিল অনুমান করা যায়। তাছাড়া শিল্প, কাব্য ও সাহিত্যসেবী হিসাবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। বিভিন্ন শিল্প ও তাম্রলিপি থেকে জানা যায় তাঁকে 'কাব্যশ্রেষ্ঠ' উপাধিও দান করা হয়েছিল। সঙ্গীতশিল্পের তিনি একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং নিজেও অভিজাত (ক্ল্যাসিক্যাল) সঙ্গীতে কৃতবিদ্য ছিলেন। এলাহাবাদ শিলালেখা থেকে অবশ্য সে'কথা নিঃসংসয়ে প্রমাণ হয়।[৪] একটি স্বুবর্ণমুদ্রায় সমুদ্রগুপ্তের বীণা-বাজানো প্রতিকৃতিও উৎকীর্ণ দেখা যায়। মহারাজাধিরাজ একটি সিংহাসনে আসীন, তাঁর জানুর ওপরে শায়িত একটি বীণা, তিনি দু'টি হাত দিয়ে সে'টি বাজাচ্ছেন। বীণাটি দেখতে অনেকটা হার্পের মতো। বীণা বাজানোর রীতি থেকে অনুমান

৩। "He is known to have performed the *Aśvamedha* sacrifice. * *. The fifth type of coins commemorates the *Aśvamedha* sacrifice. It shows, on the obverse, a spirited horse standing before a sacrificial post, and on the reverse, the figure of the queen-empress. The legend on this type reads 'The king of kings, who performed the *Aśvamedha* sacrifice, having protected the earth, wins heaven'."—*The History and Culture of the Indian People* (The Classical Age), pp. 14-15.

৪। "According to the Allāhābād inscription he was not only a great patron of learning but was himself a great poet and a musician. His poetical compositions, which earned him the title of 'King of Poets', have not survived, but we have a striking testimony to his love of music. In one type of his gold coins the great emperor is represented as seated cross-legged on a couch, playing on a *viṇā* (lute or lyre) which rests on his knees. The royal figure on this unique type of coins was undoubtedly drawn from real life and testifies to his inordinate love for, and skill in, music."—*The History and Culture of the Indian People* (The Classical Age), p. 14.

ডাঃ দাশগুপ্তও উল্লেখ করেছেন: "He * * is reputed to have been an adept not only in music and song but it is said that he had also composed many materical works of great value and was called a King of Poets." —*A History of Sanskrit Literature* (1947), p. CVIII.

করা যায় মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত সঙ্গীতবিদ্যায় ও বিশেষ ক'রে বীণাবাদ্যে পারদর্শী ছিলেন।[৫] রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন এর উল্লেখ ক'রে সুললিত ভাষায় বলেছেন: "যে সময়ে সমুদ্রগুপ্ত বীণা বাজাইতেন তাঁহার সেই স্বরলহরী নারদ ও তুম্বুরু প্রভৃতি সঙ্গীত-সম্রাটদিগকেও লজ্জা দিত বলিয়া তাম্রশাসনে উল্লিখিত আছে। এই বীণাতে তিনি এরূপ সুদক্ষ ছিলেন যে মুদ্রায়ও তাঁহার মূর্তি বীণাবাদক-রূপে অঙ্কিত হইয়াছিল"।[৬] এলাহাবাদ-লেখামেলা থেকে জানা যায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের কলেবরে আবার নতুন প্রাণসঞ্চার করার জন্য মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্তকে দেবতা ব'লেও সম্বোধন করা হয়েছিল। মনে হয় সমুদ্রগুপ্ত সঙ্গীত-সাধনার সংস্কার পেয়েছিলেন তাঁর মাতৃবংশ লিচ্ছবিদের কাছ থেকে। তাঁর মাতা মহারাণী কুমারদেবীও ছিলেন সঙ্গীতের সাধিকা ও একান্ত পৃষ্ঠপোষক। সে'জন্য সমুদ্রগুপ্তের সময়ে সমাজে স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই স্বাধীনভাবে সঙ্গীতের অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করত। সঙ্গীতের প্রসারের জন্য আমোদাহ্লাদ ও ক্রীড়াকৌতুকের ব্যবস্থার মতো রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে রঙ্গমঞ্চ এবং সঙ্গীতশালাও নির্মিত হয়েছিল। রাজ্যের অধিবাসীরা বিভিন্ন নাট্য ও সাঙ্গীতিক অনুষ্ঠানে যোগদান করার সুযোগ লাভ ক'রে ললিতরুচির সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করত। মোটকথা মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্তের সময়ে সকল দিক দিয়ে ভারতবর্ষে আবার নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল।[৭] সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যু হয় আনুমানিক ৩৮০ খৃষ্টাব্দে।

সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর কিছুদিনের জন্য তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রামগুপ্ত মগধের রাজা হন। শক ও কুষাণরা তখন ভারতে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিশেষ ক'রে কুষাণদের দ্বারা শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্প প্রভাবিত হয়েছিল। শকজাতির সাংস্কৃতিক দানও কম ছিল না। শকরাও যে চারুশিল্প সঙ্গীতের একান্ত অনুরাগী ও অনুশীলক ছিল ভারতীয় সমাজে তাদের অবদান শক, শকমিশ্রিত প্রভৃতি রাগই

৫। 'বৃহৎবঙ্গ', ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯০৮

৬। "* * and he ushered in a new age in the history of India. * * His coins and inscriptions hold up before our mind's eye a king of robust and powerful build, whose physical strength and prowess, matched by his cultural attainments, heralded a new era in Āryāvarta (N. India). * * It was the Golden Age which inspired succeeding generations of Indians and became alike their ideal and despair."—*The History and Culture of the Indian People* (The Classical Age), pp. 15-16.

তা প্রমাণ করে। শক ও কুষাণরা মাঝে মাঝে আক্রমণ-অভিযান চালাত। মহারাজ রামগুপ্তের সময়ে শকরা একবার মগধ আক্রমণ করে। রামগুপ্ত শকদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, কিন্তু পরাজিত হন। পরে নানান্ কারণে কনিষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রগুপ্ত (২য়) 'বিক্রমাদিত্য' উপাধিতে ভূষিত হ'য়ে সম্ভবত ৩৮০ খৃষ্টাব্দে পাটলিপুত্রের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত ও তাঁর পূর্বপুরুষেরা সকলেই সম্ভবত শৈব ছিলেন, কেননা তখনকার ভাস্কর্যশিল্পে শৈবধর্মের প্রভাব সুপরিস্ফুট দেখা যায়। কিন্তু মহারাজ বিক্রমাদিত্য চন্দ্রগুপ্তের 'পরমভাগবত' পদবী থেকে বোঝা যায় কিন্তু তিনি বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিধবা-পত্নী ধ্রুবদেবীকে বিবাহ করেন ও পুনরায় নাগবংশের দেবী কুবেরনাগারও পাণিগ্রহণ করেন। কুবেরনাগা ছিলেন জনৈক নাগরাজার (শ্রেষ্ঠী ?) কন্যা। নাগ ও ভাকাটকরা তখন প্রবল প্রতাপশালী ছিল। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত (২য়) নাগরাজার কন্যাকে বিবাহ ক'রে নাগবংশের সঙ্গে নিবিড় বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন। পুনরায় রাণী কুবেরনাগার গর্ভে প্রভাবতী-গুপ্তা নামে যে কন্যা জন্মগ্রহণ করে ভাকাটকরাজ রুদ্রসেনের (২য়) সঙ্গে তার বিবাহ দিয়ে ভাকাটকবংশের সঙ্গেও তিনি নিকট সম্পর্ক স্থাপন করেন। মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত শক, হুন, কুষাণ প্রভৃতি বিদেশীদের আক্রমণ অনেক পরিমাণে প্রতিহত করেছিলেন, কিন্তু ভারতীয় সমাজে তাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতার অনুপ্রবেশকে বাধা দিতে পারেন নি তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের (২য়) সময়েও শক ও কুষাণরা তাদের আক্রমণ চালাতে কসুর করেনি, কিন্তু তিনি নাগ ও ভাকাটক রাজাদের সহায়তা নিয়ে তাদের অভিযান ব্যর্থ করেছিলেন। কুন্তলের প্রবল পরাক্রান্ত কদম্ব-নৃপতি কাকুস্থবর্মনের প্রস্তরলিপি থেকে জানা যায় গুপ্তরাজারা কদম্ব কেন, বহু রাজা ও সামন্ত রাজাদের সঙ্গেও মৈত্রী-সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। তাতে ক'রে একদিক দিয়ে গুপ্ত, নাগ, ভাকাটক, ও কদম্ব প্রভৃতি দেশীয় ও শক, হুণ, কুষাণ প্রভৃতি বিদেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটেছিল। সঙ্গীতের বেলায়ও তাই। দেশী ও বিদেশী তথা হিন্দু ও তথাকথিত যবন শিল্প-সংস্কৃতির সংমিশ্রন ভারতীয় সঙ্গীতের কলেবরকে তখন আরো স্বাস্থ্যবান ও সমৃদ্ধ করেছিল। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের (২য়) রাজত্বের সময় চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন দশ বছর (খৃষ্টীয় ৪০০ বা ৪০৫-৪১১) ভারতবর্ষে পরিভ্রমণ ক'রে যে ইতিবৃত্তান্ত রচনা করেছিলেন গুপ্তযুগের শিল্প ও সংস্কৃতির গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী তার অনেকখানি অংশ জুড়ে রয়েছে।

এখন প্রশ্ন হ'তে পারে যে, মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত ও তাঁর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী মহারাজ বিক্রমাদিত্য-চন্দ্রগুপ্তও শিক্ষা, ভাস্কর্যশিল্প ও সঙ্গীতের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সে'জন্য [illegible] সঙ্গীতও তখন সমৃদ্ধ ও উন্নত হয়েছি[illegible]ণের ছিল। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী থেকে খৃ[illegible] নারদ, মুনি ভরত, কোহল, দত্তিল, যা[illegible] গুণীদের সঙ্গীত-অবদানের কথা আমরা [illegible] ভরত[illegible]রদ বৈদিক ও লৌকিক দু'রকম সঙ্গীতের আভাস দিয়ে[illegible]লিদাস-নামা কা[illegible]শাস্ত্রে নাট্যপ্রয়োগে লৌকিক গান্ধর্ব-সঙ্গীতেরই পরিচয় দিয়েছেন। ভর[illegible]ময়ে জাতিরাগ ও গ্রামরাগ অংশ, গ্রহাদি দশটি লক্ষণ, রস ও ভাব সমন্বিত হ'য়ে শাস্ত্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে সেই সময় (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) গান্ধর্বগানের একরকম সায়াহ্নকাল বলা যায়। কোহল, শাণ্ডিল্য, যাষ্টিক, বিশাখিল, দুর্গাশক্তি প্রভৃতির সময়ে গান্ধর্বের পাশাপাশি অভিজাত দেশী-সঙ্গীতের অভিযান শুরু হয়েছিল। গুপ্তযুগে (আনুমানিক খৃষ্টীয় ৩২০ থেকে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী) গান্ধর্বগানের প্রচলন বিলুপ্ত বল্লেই চলে এবং গান্ধর্ব বা মার্গপ্রকৃতিসম্পন্ন দেশীয় ও জাতীয় সুরগুলি তখন অভিজাত 'রাগ'-পদমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে চলেছে। দেশীয় (আঞ্চলিক) ও জাতীয় সুর বা স্বরসংগঠনগুলি গান্ধর্বের দশলক্ষণ দ্বারা শাসিত (?) বা নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে ভারতীয় সঙ্গীতের বিস্তৃতি ও প্রকৃতিকে সমৃদ্ধ করেছিল। নাট্যে বিচিত্র গীতি, রঙ্গসজ্জা, নট-নটীদের নৈপুণ্য ও কলামাধুর্য, অঙ্গহার, মুদ্রা, নৃত্য, হাব-ভাব ও রস-পরিবেশন ললিতকলার কলেবর ও পরিবেশকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছিল। রাগ তখন নির্দিষ্ট অভিধান, গঠন ও বিকাশ নিয়ে এখনকার মতো আলাপে, অলংকারে, তানে, মূর্ছনায়, ছন্দে, তালে, যতিতে, বৃত্তে, রসে ও ভাবে মানুষের সমাজে স্পষ্টতর হ'য়ে উঠেছিল। বাদ্যযন্ত্র ও নৃত্যছন্দের কথাও তাই। খৃষ্টপূর্ব ও খৃষ্টীয় শতাব্দীতে পাথরে খোদাই করা বাদ্যযন্ত্র ও নট-নটীদের নৃত্যছন্দের মূর্তি ও প্রতিকৃতি সেই সেই সময়কার ভারতীয় সমাজের বাদ্যযন্ত্র, বাদনপ্রণালী ও নৃত্যকলার মর্মকথা নিঃসন্দেহে প্রকাশ করে।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য-চন্দ্রগুপ্ত শিক্ষা, শিল্প ও সংস্কৃতির বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ও সে'দিক থেকে তিনি তাঁর সুযোগ্য পিতার (মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের) গৌরব ও আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। তিনিও তাঁর প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিভিন্ন সমাজ, আপনক, উদ্যানযাত্রা, সঙ্গীতশালা, নাট্যগৃহ, চিত্রগৃহ,

চিত্রশালা প্রভৃতি নির্মাণ ক'রে দিয়েছিলেন। নাগরিকরা দৈনন্দিন কর্মজীবনের অবসরকালে সায়াহ্নে সুবেশিত নাট্যশালা ও সঙ্গীতশালা প্রভৃতিতে স্বাধীনভাবে গমন ও আনন্দ উপভোগ কর্‌ত হন। পরে নানান্ আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন। তা'ছাড়া প্রত্যেক শিক্ষার্থী ও উপাধিতে ভূষিত হ'য়ে সম্ভবত ৩৮০ খৃষ্টব্যবস্থা ছিল। মহারাজ বিক্রমাদিত্য-| করেন। মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত দের প্রতি পরমশ্রদ্ধাশীল ছিলেন তা তাঁর খব ছিলেন, কেননা তখনকার ভাস্বমান করা যায়। মহাকবি কালিদাস, বরাহমি। কিন্তু মহারাজ বিক্রমাদিত্য চা অলংকৃত করতেন। কিন্তু তিনি বৈষ্

॥ মহাকবি কালিদাস ও সঙ্গীত ॥

মহাকবি কালিদাসের কাব্য ও নাট্যগ্রন্থে আমরা গুপ্তযুগের সঙ্গীতের রূপ ও অনুশীলনের কিছুটা পরিচয় পাই। মহাকবির অভ্যুদয়-কাল নিয়ে মতের অনৈক্য যথেষ্ট। অনেকে মহারাজ অগ্নিমিত্রের (খৃষ্টপূর্ব ১৫০) সময়ে তাঁর অভ্যুদয়-কাল নির্ণয় করেন। আবার যে'জন্য খৃষ্টীয় ৪৭৩ শতাব্দীর মান্দাসোর ও খৃষ্টীয় ৬৩৪ অব্দের আইহোল এই উভয় শিলালেখায় কালিদাস ও তাঁর গ্রন্থাবলীর উল্লেখ পাওয়া যায় সে'জন্য অনেকে তাঁকে খৃষ্টীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের কবি ব'লে নির্দিষ্ট করেন। কারু কারু অনুমান যে কালিদাসের কাব্য ও নাটকের প্রভাব বৌদ্ধাচার্য নাগার্জুনের (খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী) গ্রন্থে বিশেষভাবে পাওয়া যায়, আর তারি জন্য কালিদাস শূন্যবাদী নাগার্জুনের পূর্ববর্তী ও তাঁর অভ্যুদয় ভাষ্যকার পাতঞ্জলি (খৃষ্টপূর্ব ২য় শতক) ও নাগার্জুনের (খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী) মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ১৫০ অব্দে হয়েছিল। অনেকের মতে কামসূত্রকার বাৎস্যায়ন (খৃষ্টপূর্ব ২য় শতক) ও নাট্যশাস্ত্রকার মুনি ভরত (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) এই দু'জনের গ্রন্থসমূহের প্রভাব কালিদাসের রচনায় নাকি সুস্পষ্ট, তাই মহাকবির আবির্ভাব হয়েছিল ঐ দু'জন মহামনীষীর পরে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ২য়-৩য় শতাব্দীর পরবর্তীকালে। বেশীর ভাগ ঐতিহাসিক নানান্ দিক দিয়ে বিচার ক'রে মহাকবি কালিদাসের অভ্যুদয়-কাল নির্ণয় করেছেন খৃষ্টপূর্ব ১০০ থেকে খৃষ্টীয় ৪০০ অথবা ৪৫০ শতাব্দী। ডাঃ দাসগুপ্ত এই অভিমত ঠিক স্বীকার করেন না।[১]

১। "The hypotheses and controversies on the subject need not occupy us here, for none of the theories are final, and without further more definite material, no convincing conclusion is attainable. Let

ডাঃ কৃষ্ণমাচারিয়ার তাঁর ক্ল্যাসিক্যাল-সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাসে টি. এস. নারায়ণ-স্বামীর সিদ্ধান্তের নিদর্শন দিয়ে বলেছেন ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসাবে আমরা পাই আট নয় জন কালিদাস। খৃষ্টীয় ৮ম-৯ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েই তিনজন কালিদাসের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং কালিদাসের নামাঙ্কিত সকল কাব্য ও নাট্যগ্রন্থই মহাকবি কালিদাসের রচিত নয়। তাঁদের অভিমত যে দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা, শৃঙ্গারশতক ও নলোদয়নাটক রঘুবংশকার কালিদাসের রচিত নয়। বিশেষ ক'রে দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা সম্ভবত খৃষ্টীয় ৭ম ও ১১শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে অন্য কোন কালিদাস-নামা কবির দ্বারা রচিত। আসলে কালিদাস শকুন্তলানাটক, মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশী, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, ঋতুসংহার প্রভৃতি কাব্য ও নাটক রচনা করেন।[২] এ'গুলির ভিতর নাটক হিসাবে কালিদাস নাকি শকুন্তলার আগে মালবিকাগ্নিমিত্র ও বিক্রমোর্বশী নাটক-দু'টি রচনা করেন। মহাকাব্য হিসাবে সম্ভবত কুমারসম্ভব আগে ও রঘুবংশ তার পরে রচনা করেন। কারু কারু অভিমত যে ঋতুসংহারকাব্যই তাঁর প্রথম রচনা। অনেকে আবার ঋতুসংহারকে মহাকবির রচনা ব'লে সন্দেহ প্রকাশ করেন।[৩]

it suffice to say that since Kālidāsa is mentioned as a poet of great reputation in the Aihole inscription of 634 A.D., and since he probably knows Aśvaghoṣa's works and shows a much more developed form and sense of style * * the limits of his time are broadly fixed between the 2nd and the 6th century A.D."—*A History of Sanskrit Literature* (Classical Period), p. 124.

২। Cf. Dr. S. N. Das Gupta and Dr. S. K. De: *A History of Sanskrit Literature* (Classical Period), p. 740.

৩। ডাঃ কৃষ্ণমাচারিয়ার এ'সম্বন্ধে পণ্ডিত হরিচাঁদের অভিমত উদ্ধৃত ক'রে বলেছেন: "Six works are by universal consent considered the authentic productions of the great poet: the three dramas *Sakuntalā, Vikramorvaśī* and *Mālavikāgnimitra,* the two epics *Raghuvaṁśa* and *Kumerasambhava,* and the lyric *Meghadūta.* All these are frequently quoted in Alaṁkāra works. The *Ritusaṁhāra* is also commonly attributed to *Kālidāsa,* but a strong argument adduced by our author against this attribution is the fact that the treatises on Alaṁkāra ignore this poem completely with a striking unanimity. * * no commentary on the *Ritusaṁhāra* appears till the eighteenth century while the *Meghadūta,* the *Raghuvaṁśa,* and the *Kumerasambhava,* were already commented upon in the tenth century. An anthology of the fifteenth century is the first work to cite stanzas from the *Ritusaṁhāra,* two under the name of Kālidāsa."—*History of Classical Sanskrit Literature* (1937), pp. 608-609. Vide also Dr. Das Gupta and Dr. De: *A History of Sanskrit Literature,* pp. 126-154.

কালিদাসের নাটকে ও কাব্যে 'সঙ্গীত' ও 'রাগ' শব্দ-দু'টি বিশেষ অর্থবোধক ও মূল্যবান। তাঁর সময়ে গান্ধর্ব ও মার্গ-সঙ্গীতের অনুশীলন সমাজ থেকে একরকম বিলুপ্ত হয়েছিল বলা যায়, আর অভিজাত দেশী-সঙ্গীতের রূপ ও অনুশীলন তখন সমাজ-মনকে অধিকার ক'রে বসেছে। জাতিরাগগান ও গ্রামরাগগানের প্রচলন থাকলেও তা বৈদিক অনুষ্ঠানে সামগানের মতো সচরাচর লৌকিক প্রয়োগেরই অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

'সঙ্গীত' শব্দটির উল্লেখ আমরা রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড (২৮।৩৭) প্রভৃতিতেও পেয়েছি। কালিদাসের গ্রন্থগুলিতেও 'সঙ্গীত' ও 'রাগ' শব্দ-দু'টির উল্লেখ পাই: (১) 'বনান্তসঙ্গীতসখীরবোদং' (কুমারসম্ভব ৫।৫৬), (২) 'সঙ্গীতার্থো নন্থ' (মেঘদূত, পূর্বমেঘ, ৫৭), (৩) 'অহো, রাগাপহৃতচিত্তবৃত্তিরালিখিত ইব' (অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্), (৪) 'সঙ্গীদসালব্‌ভন্তরে কণ্ণং দেহি' (অভিজ্ঞানশকুন্তলম্), (৫) 'তবাস্মি গীতরাগেণ হরিণা' (ঐ), (৬) 'সঙ্গীদে অব্‌ভন্তর ন্ধ' বা 'কদবাতে সঙ্গীদসহআরিণী রুচ্চদি' (মালবিকাগ্নিমিত্রম্) প্রভৃতি। এ'ছাড়া গীতি, গান, গান্ধর্ব, নৃত্য, মৃদঙ্গ, মুরজাদি চর্মবাদ্য, বীণা প্রভৃতির উল্লেখ তাঁর গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়। চিত্রবিদ্যা, তার বর্ণ ও লাবণ্যাদি গুণের পরিচয় দিতেও কালিদাস কার্পণ্য করেন নি। যেমন—"চিত্রেঽপ্যালপতীব * * মিশ্র। অম্মো এসো রাত্রসিণো বত্তিআলেহানিউণদা * *। তথাপি তস্যা লাবণ্যং লেখয়া কিঞ্চিদান্বিতম্। * * অঙ্গে চ প্রতিভাতি মার্দবমিদং স্নিগ্ধপ্রভাবাচ্চিরং * *" (—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্)। পুনরায় "অঙ্গে চ অতিভাতি মার্দবমিদং স্নিগ্ধপ্রাবাচ্চিরম্"। বর্ণনাটি হ'ল: 'তৈলাক্ত বর্ণের শক্তিগুণের জন্য অঙ্গের কোমলতা যেন স্থায়িরূপে প্রতিফলিত হচ্ছিল'। চিত্রশিল্পে তৈলচিত্রের এই স্নিগ্ধতা বা লাবণ্য বৃদ্ধি করার কৌশল তখনকার সমাজবাসী শিল্পীরা ভালোভাবেই জানত, এবং কালিদাসও তা হুবহু বর্ণনা করেছেন।

মহাকবি মেঘদূতকাব্যে উত্তরমেঘ-বর্ণনায় যে গান্ধারগ্রামের মূর্ছনার কথা উল্লেখ করেছেন তা আমরা আগেও উল্লেখ করেছি।[৪] টীকাকার মল্লিনাথ কালিদাসের 'মূর্ছনাং' শব্দটির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে 'তদুক্তং' তথা প্রমাণিক সঙ্গীতশাস্ত্রীর কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

ষড়্‌জমধ্যমনামানৌ গ্রামৌ গায়ন্তি মানবাঃ।
ন তু গান্ধারনামানং স লভ্যো দেবযোনিভিঃ॥

৪। প্রজ্ঞানানন্দ: 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি', ১ম ভাগ, পৃ° ২২-২৩

গান্ধারগ্রামের মূর্ছনা দেবযোনিদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। গান্ধারদেশবাসী গন্ধর্বরা দেবযোনিশ্রেণীভুক্ত ছিল, কাজেই গান্ধারগ্রাম ও তার মূর্ছনাগুলির ওপর গন্ধর্বদের অধিকার ছিল এ'কথাই যেন মল্লিনাথ বলতে চেয়েছেন। নারদীশিক্ষার বক্তব্য কিন্তু এ'থেকে একটু পৃথক । নারদ (১ম) বলেছেন: "উপজীবন্তি গন্ধর্বা দেবানাং সপ্তমূর্ছনাঃ"; অর্থাৎ ষড়্‌জগ্রামিক উত্তরমন্দ্রাদি সাতটি মূর্ছনা দেবতাদের জন্য নির্দিষ্ট আর দেবযোনি গন্ধর্বরাও ঐ ষড়্‌জগ্রামিক মূর্ছনাগুলি ব্যবহার করত। শিক্ষাকার নারদ দেবযোনিদের জন্য গান্ধারগ্রামের মূর্ছনা নির্বাচন করেন নি। কিন্তু মল্লিনাথের অভিপ্রায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। উত্তরমেঘের ৯১ শ্লোকটি হ'ল:

> উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে সৌম্য নিক্ষিপ্য বীণাং
> মদ্‌গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদ্‌গাতুকামা।
> তন্ত্রীরার্দ্রা নয়নসলিলৈঃ সারয়িত্বা কথংচিৎ
> ভূয়োঃ ভূয়ঃ স্বয়মধিকৃতাং মূর্ছনাং বিস্মরন্তী ॥

কালিদাস 'গেয়' পদের দ্বারা নিবদ্ধ প্রবন্ধগানের কথা বুঝিয়েছেন। মল্লিনাথ তার উল্লেখ ক'রে বলেছেন: "বিরচিতানি পদানি যস্য তত্তথোক্তং গেয়ং গানার্হং প্রবন্ধাদি"। 'গেয়' ও 'পদ' শব্দ দু'টির ব্যবহার আমরা রামায়ণ এবং মহাভারতেও পেয়েছি। কাজেই নিবদ্ধ তথা ছন্দ, তাল, লয়, যতি, স্থান, গ্রাম ও রসের দ্বারা অনুবিদ্ধ প্রবন্ধগান গান্ধর্ব বা মার্গশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে প্রয়োগ ও পদ্ধতি হয়তো দু'টিতে ভিন্ন ভিন্ন ছিল। কালিদাসের যুগে অভিজাত দেশীগানের প্রচলন ছিল তা আগেই উল্লেখ করেছি। কালিদাস সঙ্গীতশাস্ত্রের অভিপ্রায় সম্বন্ধে নিশ্চয়ই সচেতন ছিলেন, তাই গন্ধর্বশ্রেণীভুক্ত যক্ষপত্নীর বীণার তারকে গান্ধারগ্রামের সঙ্গে তিনি সম্পর্কিত করেছেন। তা'ছাড়া যক্ষপত্নী পতিবিরোহিণী, নায়কের আগমন-প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিতা। তিনি বীণার তন্ত্রীতে তাই আভিচারিক প্রয়োগ করেছিলেন, কিন্তু অভিপ্রায় তাঁর সিদ্ধ হয়নি, কেননা প্রয়োগ বিধি-বহির্ভূত হয়েছিল। তার চোখের জলে বীণার তারগুলি সিক্ত হয়েছিল, তারের কম্পনে সুরের নিটোল নক্সা রূপায়িত হয় নি। কাজেই প্রয়োগের ফল প্রতিহত হয়েছিল। অভিচার-প্রয়োগে নাম ও গোত্র পুটিত করার বিধি ছিল। সঙ্গীত ও মন্ত্র উভয়ের বেলায় একই কথা। তদানীন্তন সমাজে শিল্পীরা এ'কথা জানতেন। গান্ধারগ্রামের মূর্ছনাগুলির নাম নন্দা, বিশাখা, সুমুখী, চিত্রা, চিত্রবতী, সুখা ও আলাপা। পতিশোককাতরা যক্ষিণী এই মূর্ছনাগুলির প্রয়োগ-রহস্য বিস্মৃত হয়েছিলেন। গান্ধারগ্রামের মূর্ছনা যে সাতটি

সে'কথা কালিদাস জানতেন। টীকাকার অবশ্য অনেক পরেকার যুগের গুণী (খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর পরবর্তী) এবং "ইতি সঙ্গীতরত্নাকরে" কথাগুলি থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। তারপর "মূর্ছনাং বিস্মরন্তি" শব্দগুলি থেকে এ'কথা অনুমান করা যায় যে মহাকবি কালিদাসের সময়ে ঠাট, মেল বা মেলকর্তার প্রচলন ছিল না, মূর্ছনাই রাগরূপের গঠনে সহায়তা করত। কালিদাস এ'কথাও বিশেষভাবে জানতেন।

কুমারসম্ভবে (৮।৮৫) কালিদাস পুনরায় উল্লেখ করেছেন,

সব্যবুধ্যত বুধস্তবোচিতঃ
শাতকুম্ভকমলাকরৈঃ সমম্।
মূর্ছনাপরিগৃহীতকৈশিকৈঃ
কিন্নরৈরুষসি গীতিমঙ্গলঃ॥

'উষাকালে কিন্নরগণ মূর্ছনার সঙ্গে রাগবিশেষের দ্বারা শিবের উদ্দেশ্যে মঙ্গলগীতিগানে প্রবৃত্ত হ'লে বিবুধগণের স্তবনীয় মহেশ্বর কনকপদ্মাকরের সহিত জাগ্রত হলেন'। এখানেও কিন্নরগণের কণ্ঠে মূর্ছনা-পুটিত ক'রে গীতমঙ্গল তথা মঙ্গলগীতের কথা উল্লিখিত হয়েছে। 'কৈশিকৈঃ' অর্থে কৈশিকরাগ দ্বারা। কৈশিকরাগ মূর্ছনাযুক্ত ছিল এবং রাগের সুষ্ঠু বিকাশের পক্ষে তা মূর্ছনাযুক্ত থাকাই স্বাভাবিক। মল্লিনাথ এই শ্লোকটির অর্থ করেছেন: "তয়া মূর্ছনয়া পরিগৃহীতকৈশিকৈঃ স্বকৃতরাগবিশেষৈঃ কিন্নরৈঃ গীতমঙ্গলঃ সন্"। অনেকে 'গীতমঙ্গল' শব্দটি যুক্ত থাকায় কৈশিককে 'মঙ্গলকৈশিকরাগ' বলেন। কিন্তু তা সমীচীন নয় ব'লে আমাদের ধারণা। মঙ্গল ও কৈশিক দু'টি পৃথক রাগ, মঙ্গলার্থে বা মাঙ্গলিক প্রয়োগে কৈশিকরাগের ব্যবহার হয়। মল্লিনাথ 'রাগবিশেষৈঃ' বলতে কৈশিককে স্বতন্ত্র রাগ হিসাবে গণ্য করেছেন। মনে হয় কালিদাসের অভিপ্রায়ও তাই। কৈশিকরাগের বিস্তৃত পরিচয় আমরা 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' গ্রন্থের পূর্বভাগে (পৃ° ২৪০-২৪২) দিয়েছি। কালিদাস যে 'গেয়' পদ হিসাবে নিবদ্ধ প্রবন্ধগানের লক্ষণ ও পরিচয় জানতেন তা উল্লেখ করেছি। 'স ব্যবুধ্যত' প্রভৃতি শ্লোকের অর্থও তাই।

গীতমঙ্গল তথা মঙ্গলগীতির নিবদ্ধ প্রবন্ধরূপের সুস্পষ্ট পরিচয় আমরা শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীত-রত্নাকরে পাই। শার্ঙ্গদেব মঙ্গলগীতিকে বিপ্রকীর্ণপ্রবন্ধের পর্যায়ভুক্ত করেছেন। নাট্যশাস্ত্রে নৃত্য, গীত, বাদ্য ও নাট্যারম্ভের আগে আশীর্বচনসহ 'মঙ্গলস্তুতি' গান করার বিধি ছিল। ভরত উল্লেখ করেছেন,

বাচয়িত্বা দ্বিজান্ স্বস্তি দত্ত্বা পূর্ণপ্রদক্ষিণান্।
পূজয়িত্বা তু গন্ধর্বান্ পশ্চাদ্ বাস্তং সমাচরেৎ ॥

অথবা—

আশীর্বাদনযুক্তৈর্মধুরৈর্বাক্যৈশ্চ স্বমঙ্গলাচারৈঃ।
সর্বং স্তৌতি হি লোকং যস্মাত্তস্মাদ্ভবেদ্ নান্দী ॥

মহাভারতে মঙ্গলগীতির প্রসঙ্গে গ্রন্থকার ব্যাস উল্লেখ করেছেন : (১) "সূতমাগধ-বন্দীনাং সংস্তবৈর্গীতমঙ্গলৈঃ" (দ্রোণপর্ব ৫।৪১), "মঙ্গলানি চ গীতানি নাস্ত গাস্তি পঠস্তি চ" (দ্রোণপর্ব ৬৯।১১)। সূত, মাগধ ও বন্দীরা মঙ্গলগীতি করতো রাজ্যাধিপতির মঙ্গল তথা কল্যাণ কামনা ক'রে। তবে তখনকার পরিশুদ্ধ গীতির রূপ ও প্রকাশভঙ্গি ঠিক কি ধরণের ছিল তা নির্ণয় করা কঠিন। সঙ্গীত-রত্নাকরে 'মঙ্গল'-প্রবন্ধের যে গঠন ও ধারার পরিচয় দেওয়া আছে তা থেকে রামায়ণ-মহাভারতে মঙ্গলগীতির রূপের কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে। পরিবর্তনই জগতের ধর্ম। জাগতিক সকল সামগ্রীর রূপে ও বিকাশে পরিবর্তন স্বাভাবিক। তাহ'লেও বিচিত্র পরিবর্তনের মর্মস্থলে লক্ষ্য করলে একটি অপরিবর্তনীয় ধারার অবশ্যই সন্ধান পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর মঙ্গলপ্রবন্ধের দর্পণে তাই খৃষ্টপূর্ব মঙ্গলগীতির প্রতিকৃতির কিছুটা সন্ধান লাভ করা সম্ভব।

মঙ্গলগীতি মনে হয় কল্যাণবাচক আভ্যুদয়িক নিবদ্ধ মঙ্গলাচরণগীতি ছিল। শার্ঙ্গদেব কিন্তু মঙ্গলাচার ও মঙ্গলপ্রবন্ধ দু'টিকে পৃথক শ্রেণী হিসাবে পরিচয় দিয়েছেন। মঙ্গলাচারে কৈশিকীরাগের ও নিঃসারুতালের সমাবেশ থাকত, আর মঙ্গলপ্রবন্ধগীতি কৈশিকী বা বোট্ট (ভোট)-রাগে গাওয়া হ'ত। তবে এর লয় ও পদ মঙ্গলাচার থেকে ভিন্ন। শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকরের প্রবন্ধাধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন : "প্রবন্ধাস্ত্রিবিধাঃ"—সূড় বা মার্গসূড়, আলিসংশ্রিত ও বিপ্রকীর্ণ। বিপ্রকীর্ণপ্রবন্ধ আবার ছত্রিশ রকম ছিল। তাদের মধ্যে চর্চরী, চর্যা, পদ্ধড়ী, ধবল, মঙ্গল বা মঙ্গল-গীতি অন্যতম। কালিদাসের নাট্য ও কাব্যগ্রন্থে এ'সকল প্রবন্ধের কয়েকটির উল্লেখ পাওয়া যায়। কালিদাস কুমারসম্ভবে যেমন কৈশিকরাগের সঙ্গে সম্পর্কিত ক'রে গীতমঙ্গল>মঙ্গলগীতি>মঙ্গলপ্রবন্ধগীতির উল্লেখ করেছেন তেমনি 'বিক্রমোর্বশী' নাটকে ককুভরাগের উল্লেখের সঙ্গে জম্ভালিকা, চর্চরী, দ্বিপদিকা প্রভৃতি প্রবন্ধগীতির পরিচয় দিয়েছেন। চর্চরী বা চর্চরিকাপ্রবন্ধ বসন্তকালে নবপল্লবিত কুসুমাচ্ছাদিত প্রকৃতিকে অভিনন্দন জানিয়ে হোলি-উৎসবে গান করা হ'ত :

সা বসন্তোৎসবে গেয়া চর্চরী প্রাকৃতৈঃ পদৈঃ।
চর্চরীচ্ছন্দসেত্যন্তে ক্রীড়াতালেন বেত্যপি ॥[১]

টীকাকারগণ চর্চরীর আরো স্পষ্ট রূপের পরিচয় দিয়েছেন। চর্চরী প্রবন্ধগীতি। চর্চরী আবার তালও (ছন্দ) বটে। চর্চরীর পদে দেশীভাষা সংযুক্ত থাকে। একে ক্রীড়াতালে অনেক গান করে। কল্লিনাথ ক্রীড়াতালের পরিচয় দিয়ে বলেছেন: "ক্রীড়াদ্রুতৌ বিরামান্তৌ"। অনেক সময় চর্চরীতে হিন্দোলরাগের সমাবেশ দেখা যায়। ককুভ, হিন্দোল, কৈশিক (কৈশিকীজাতি নয়) এ'গুলি খৃষ্টপূর্ব যুগে ছিল না, তখন ষাড়্‌জী প্রভৃতি শুদ্ধজাতিরাগের অনুশীলন ছিল, কাজেই রামায়ণ-মহাভারতের যুগে মঙ্গলাদি প্রবন্ধে (অভিজাত-) দেশীরাগের সমাবেশ ছিল না, জাতি বা গ্রামরাগের সহযোগই থাকত। বিপ্রকীর্ণপ্রবন্ধ চর্যাগীতি সম্বন্ধে শার্ঙ্গদেব বলেছেন: "অধ্যাত্মগোচরা চর্যা"।[২] চর্যাপ্রবন্ধ যে অধ্যাত্ম-সাধনার সাথী বা সহকারী ছিল ১০ম-১১শ শতাব্দীর বাঙ্গলায় বজ্রযানীদের বৌদ্ধ দোঁহাগুলি তার প্রমাণ। প্রবন্ধগানের আভিজাত্যসম্পন্ন চর্যা বৌদ্ধযোগীরা গান করতেন। ধবল ও মঙ্গল গান সম্বন্ধে শার্ঙ্গদেব বলেছেন: "আশীর্ভির্ধবলো গেয়ো ধবলাদিপদান্বিতঃ"।[৩] প্রবন্ধগান হিসাবে ধবলগানে বিধি-নিষেধ ছিল, কেননা ধবলাদি পদ যুক্ত ক'রে রাগে ও তালে ধবলপ্রবন্ধ গান করা হ'ত। এ'ছাড়া ধবলের একটি লৌকিক রূপও ছিল, শিল্পী ইচ্ছানুসারে বন্ধনহীনভাবে লোকপ্রসিদ্ধ ধবলগীতি গান করতে পারত। প্রবন্ধরূপের অবশ্য তিনটি বিকাশ ছিল: কীর্তি, বিজয় ও বিক্রম।[৪] চারটি চরণ বা পদযুক্ত হ'লে 'কীর্তিধবল', ছ'টি পদযুক্ত হ'লে 'বিজয়ধবল' ও আটটি চরণযুক্ত হ'লে 'বিক্রমধবল' হ'ত। এদের আবার মাত্রাবৈচিত্র্য ছিল।

'মঙ্গল'-প্রবন্ধগানের উল্লেখ ক'রে শার্ঙ্গদেব বলেছেন,

কৈশিক্যাং বোট্টরাগে বা মঙ্গলং মঙ্গলৈঃ পদৈঃ।
বিলম্বিতলয়ে গেয়ং মঙ্গলছন্দসাথবা ॥[৫]

১। সঙ্গীত-রত্নাকর ৪।২৯০—২৯১

২। ঐ ৪।২৯২

৩। সঙ্গীত-রত্নাকর ৪।৩০২

৪। ত্রিবিধো ধবলঃ কীর্তির্বিজয়ো বিক্রমস্তথা।
চতুর্ভিশ্চরণৈঃ ষড়্‌ভিরষ্টভিশ্চ ক্রমাদসৌ ॥
—সঙ্গীত-রত্নাকর ৪।২৯৮

৫। সঙ্গীত-রত্নাকর ৪।৩০৩

কালিদাসের অভ্যুদয় হয় গুপ্তরাজাদের সময়ে। একমাত্র মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত (১ম) ছাড়া সমুদ্রগুপ্ত প্রভৃতি শৈবধর্মাবলম্বী ছিলেন। সম্ভবত মহাকবি নিজে শিবোপাসক ছিলেন এবং কুমারসম্ভবই তার পরিচয়। কুমারসম্ভবে গীতমঙ্গল তথা মঙ্গলগীতিও শিবোপাসনার সঙ্গে সম্পর্কিত। বিলম্বিত লয়ে কিংবা মঙ্গলপদে (ছন্দে) কৈশিক বা বোট্ট রাগে মঙ্গলপ্রবন্ধ গান করা হ'ত। সিংহভূপাল টীকায় আলোকপাত ক'রে বলেছেন : "কৈশিকীরাগে বোট্টরাগে বা কল্যাণবাচিকৈঃ পদৈর্বিলম্বিতেন লয়েন মঙ্গলো গেয়ঃ। অথবা মঙ্গলনাম্না ছন্দসা।" মঙ্গলগানের সঙ্গে ভোটদেশীয় (তিব্বত) বোট্টরাগ কিভাবে সম্পর্কিত হ'ল তা এখন নির্ণয় করা দুরূহ। তবে দেশীরাগে মিশ্রণ অনিবার্য। বাণিজ্যিক ও ধর্মপ্রচারব্যপদেশে ভারত ও ভারতেতর কিংবা জাতীয় ও বিজাতীয় রাগগুলির এক সময়ে মিশ্রণ সম্ভব হয়েছিল, আর তারি জন্য পবিত্র মঙ্গলগীতিতে ভোটদেশীয় রাগের সমাবেশ থাকা কিছু অস্বাভাবিক নয় মনে করা যেতে পারে।

মঙ্গলপ্রবন্ধের সম্পর্কে 'কল্যাণবাচিকৈ পদৈঃ' প্রভৃতি কথার উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, মঙ্গলাচরণ গানও[৬] মঙ্গলবাচী গদ্য, পদ্য ও গদ্যপদ্য মিশ্রিত ছিল। তিন রকম পদেই মঙ্গলাচরণ গাওয়া হ'ত : "যস্তু গদ্যেন পদ্যেন গদ্যপদ্যেন বা কৃতঃ"। কৈশিকীরাগের সমাবেশ উভয় গীতে থাকলেও তাদের সামান্য পার্থক্যেরও পূর্বে উল্লেখ করেছি। রামায়ণ, মহাভারত ও হরিবংশে এবং কালিদাসের গ্রন্থগুলিতে মঙ্গলগীতি ও মঙ্গলাচরণগীতি এই দু'রকমেরই উল্লেখ দেখা যায়। অনেকের মতে খৃষ্টপূর্ব যুগের মঙ্গলগীতি মঙ্গলাচরণ তথা মঙ্গলাচার-গীতিরূপ ছিল।

গীতিমঙ্গল বা মঙ্গলগীতে যে কৈশিকরাগের বিকাশ থাকত তা গ্রামরাগ—কি অভিজাত দেশীরাগ এ'নিয়েও মতভেদ আছে। 'কৈশিক'-গ্রামরাগটির পরিচয় নারদীশিক্ষায় পাই, মুনি কশ্যপ মধ্যমগ্রামে লীলায়িত ক'রে এর প্রবর্তন করেন। এই গ্রামরাগ ধ্রুবাগানেও প্রয়োগ করা হ'ত : "ধ্রুবায়াং বিনিযোজনম্"। শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকরে শুদ্ধকৈশিকের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন,

কার্মারব্যাশ্চ কৈশিক্যাঃ সঞ্জাতঃ শুদ্ধকৈশিকঃ ॥
তারষড়্জগ্রহাংশশ্চ পঞ্চমান্তঃ সকাকলী।
সাবরোহিপ্রসন্নান্তঃ পূর্ণঃ ষড়্জাদিমূর্ছনঃ ॥

৬। 'কৈশিক্যা মঙ্গলাচারঃ স নিঃসারঃ স্বরান্বিতঃ।'
—সঙ্গীত-রত্নাকর ৪।২৯৭

বীররৌদ্রাদ্‌ভূতরসঃ শিশিরে ভৌমবল্লভঃ।
গেয়ো নির্বহণে যামে প্রথমেঽহ্নো মনীষিভিঃ ॥

কার্মারবী জাতিরাগ। 'কৈশিকী তু মধ্যমগ্রামসম্বদ্ধা', অর্থাৎ গ্রামরাগ কৈশিকী কার্মারবী-জাতিরাগ থেকে সৃষ্ট ও মধ্যমগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এতে পঞ্চম ন্যাস, কাকলিনিষাদের ব্যবহার। বীর, রৌদ্র ও অদ্ভুত রস-তিনটির সহযোগে কৈশিকী আলাপ করার নিয়ম। বোট্টরাগ সম্বন্ধে শার্ঙ্গদেব বলেছেন,

বোট্টঃ স্যাৎপঞ্চমীষড়্‌জমধ্যমাভ্যাং গ্রহাংশপঃ ॥
মান্তোঽল্পগঃ কাকলিমান্‌পঞ্চমাদিকমূর্ছনঃ।
* * * *
উৎসবে বিনিযোক্তব্যো ভবানীপতিবল্লভঃ ॥

বোট্টরাগের গ্রহ ও অংশ পঞ্চম, মধ্যম ন্যাস। এতে গান্ধারের ব্যবহার অল্প ও কাকলিনিষাদের সংযোগ আছে। বোট্টরাগটি পূর্ণজাতির। উৎসব-ব্যাপারে এই রাগের প্রয়োগ হয়। ভবানীপতি শিবের সঙ্গে এর সম্পর্ক। এমন কি মঙ্গলবাচী বোট্টরাগের ছায়া বা অঙ্গরাগ মাঙ্গলীও কল্যাণবাচক: "বোট্টজা ন্বিধসঞ্চারা গীয়তে সর্বমঙ্গলে"। সুতরাং এ'কথা ঠিক যে কালিদাসের সময়ে তথা গুপ্তযুগেও মঙ্গলগীতি মঙ্গলছন্দে আনন্দোৎসবে ও অন্যান্য পবিত্র অনুষ্ঠানে গান করা হ'ত। সিংহভূপাল বিষয়টিকে আরো প্রাঞ্জল ক'রে বুঝিয়ে উল্লেখ করেছেন: "কৈশিকরাগে বোট্টরাগে বা কল্যাণবাচিকৈঃ পদৈর্বিলম্বিতেন লয়েন মঙ্গলো গেয়ঃ। অথবা মঙ্গলনাম্নাছন্দসা।" মঙ্গলছন্দের লক্ষণসম্বন্ধে কল্লিনাথ বলেছেন মঙ্গল শঙ্খ, চক্র, পদ্মাদি সংজ্ঞাযুক্ত পদ: "মঙ্গলৈঃ পদৈরিতি। শঙ্খচক্রাব্জকোককৈরবাদিশংসিভিরিত্যর্থঃ। * * পঞ্চ চকারগণাঃ প্রতিপাদ-গতাশ্চেন্মঙ্গলমাহুরিদং সুধিয়ঃ খলু বৃত্তম্"। উদাহরণকে তিনি 'পূর্ববৎ' অর্থাৎ ধবলপ্রবন্ধগীতির মতো (মঙ্গলছন্দে) বলেছেন। এই ছন্দে পাঁচটি চারমাত্রাযুক্ত গণবিশিষ্ট পাদ ও প্রতিটি পাদে (চরণে) কুড়িটি ক'রে মাত্রার সমাবেশ এবং প্রতি পাদে 'মঙ্গল'-শব্দটির উল্লেখ থাকে। পদগুলি আবার পাঁচভাগে বিভক্ত। সুতরাং কৈশিক বা বোট্টরাগযুক্ত গীতমঙ্গল (মঙ্গলগীতি) মঙ্গলকৈশিকরাগ নয়, আসলে তা কল্যাণবাচী বিচিত্র পদ, তাল ও বিলম্বিত লয়যুক্ত বিপ্রকীর্ণ প্রবন্ধগান।

কালিদাস চর্চরী, জম্ভালিকা প্রভৃতি গীতিরও উল্লেখ করেছেন। 'বিক্রমোর্বশী' নাটকে (নাটিকা?) আছে: "অনন্তরে চর্চরী", "পুনশ্চর্চরী" প্রভৃতি। বাঙ্গালাদেশে

পাল ও সেন রাজত্বের সময় মঙ্গলগীতিগুলি আবার নতুনভাবে রূপায়িত হয়। অবশ্য খৃষ্টীয় ১৩শ থেকে ১৮শ শতাব্দীকেই বাঙ্গালায় মঙ্গলকাব্যের (গান) যুগ বলা যায়। তাহলেও ১৩শ শতাব্দীতে মঙ্গলকাব্যগুলি বিশেষভাবে রূপগ্রহণ করতে পারেনি, চাক্ষুষ রূপ নিয়েছিল ঠিক ঠিক ১৬শ শতাব্দী থেকে এবং তখনি কাব্যরচনার মধ্যে নূতনত্বের ভাব লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী মঙ্গল-কাব্যগুলি ১৬শ শতাব্দীরই অনুবর্তন ব'লে অসমীচীন হয় না। মঙ্গলকাব্য-গীতিগুলির আগে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দী থেকে প্রায় ১১শ-১২শ শতাব্দী পর্যন্ত পালরাজাদের রাজত্বের সময়ে বাঙ্গলাদেশে নাথযোগীরা 'নাথগীতিকা' রচনা করেছিলেন। ১১শ শতাব্দীতে 'চর্যা' প্রবন্ধের রূপ নিয়ে আবার আত্মপ্রকাশ করলো সাধকসমাজে। নাথগীতিকার ভিত্তিতেই সম্ভবত চর্যাপদগীতির উৎপত্তি হয়। মঙ্গলকাব্যের গান বা মঙ্গলগীতিগুলি নাথগীতি, চর্যা ও অন্যান্য দেশীয় বা আঞ্চলিক গীতিরূপের উপাদানকে নিয়ে ছন্দ বা তাল, স্বর (রাগ), শব্দবিন্যাস, বিচিত্র ধ্বনি (উচ্চারণভঙ্গি) ও বিলম্বিতাদি লয় ও মন্দ্রাদি স্থানকে নিয়ে রূপায়িত হয়েছিল। মঙ্গলকাব্য হিসাবে শিবমঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, রায়মঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল, সূর্যমঙ্গল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' ই সম্ভবত মঙ্গলকাব্যের শেষ রচনা। তবে মনে রাখতে হবে যে মঙ্গলগীতি রামায়ণের যুগ (খৃষ্টপূর্ব ৪০০) থেকে কালিদাসের সময় পর্যন্ত একইভাবে অব্যাহত ছিল। বাঙ্গালায় মঙ্গলগীতির প্রবর্তন পূর্বসূত্রকে ধরেই হয়েছিল। বাঙ্গালাদেশের সঙ্গীতধারার ইতিহাস আলোচনার সময় আমরা বিস্তৃতভাবে এ'সম্বন্ধে আলোচনা করতে চেষ্টা করব। বাঙ্গালাদেশেও সঙ্গীতের বিচিত্র প্রবন্ধরূপের সন্ধান পাই। তা'ছাড়া অপর দেশেও আছে। বাঙ্গালায় চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, উমাপতি ধর প্রভৃতির সময়ে কীর্ত্তনগানের পাশাপাশি পাঁচালীগানের যথেষ্ট নিদর্শন পাই। পাঁচালী সম্ভবত কীর্তনেরই একটু ভিন্ন রূপ। অনেকের অভিমত যে মঙ্গলগানই পরে কাব্যগীতি পাঁচালীতে রূপান্তরিত হ'য়ে নাটগীতির শ্রেণীভুক্ত হয়েছিল। অবশ্য এ'নিয়ে মতভেদও আছে। ডাঃ শ্রীসুকুমার সেন উল্লেখ করেছেন: "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কৃষ্ণ-মঙ্গল-পাঁচালী, তবে মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় অথবা মাধব আচার্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ইত্যাদির মতো পুরাপুরি পৌরাণিক পাঁচালি-কাব্য নয়। প্রাচীন যাত্রা-নাট ও পাঁচালীর মাঝামাঝি রূপ পাই চণ্ডীদাসের এই কাব্যে। আগাগোড়া পদের সমষ্টি, কেবল মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোকের দ্বারা কাহিনীর খেই গাঁথা হইয়াছে।

জয়দেবের গীতগোবিন্দের এবং শঙ্করদেবের নাট-যাত্রার (ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ) গাঁথনিও কতকটা এই রকম। পৌরাণিক শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল-পাঁচালী হয় সম্পূর্ণ বর্ণনামূলক বা narrative, নয় বর্ণনামালাসূত্রে গ্রথিত পদাবলীর সৃষ্টি।"[৭] প্রকৃতপক্ষে পাঞ্চালী-পদগান নিবদ্ধ প্রবন্ধগীতিরই পরিশুদ্ধ অথবা বিবর্তিত রূপ। পাঁচালীর আসল নাম 'পঞ্চালিকাপ্রবন্ধ'। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর বাঙ্গালার সঙ্গীতগুলি নরহরি চক্রবর্তী বা ঘনশ্যামদাস 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,

তাল-ধাতুযুক্ত বাক্য মাত্র ক্ষুদ্র গীত।
ধাতু পূর্বে উক্ত উদ্‌গ্রাহাদি যথোচিত ॥
শুদ্ধ সালগের প্রায় ক্ষুদ্রগীত হয়।
ইথে অন্ত্যানুপ্রাস প্রশস্ত শাস্ত্রে কয় ॥
ক্ষুদ্রগীত-ভেদ চারি চিত্রপদা আর।
চিত্রকলা ধ্রুবপদা পাঞ্চালী প্রচার ॥

ক্ষুদ্রগীতি চিত্রপদা, চিত্রকলা, ধ্রুবপদা ও পাঞ্চালী এই চার শ্রেণীতে বিভক্ত। পাঁচালী, পাঞ্চালী বা পঞ্চালিকা-প্রবন্ধ বিষমধ্রুবা-গীতির অন্তর্গত। মঙ্গলগানও তাই। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন: "বাঙ্গালার মঙ্গলগানগুলি পাঁচালীর অন্তর্ভুক্ত। কৃষ্ণমঙ্গল, শিবমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, মনসা-মঙ্গল সব গান একই ধরণে গাওয়া হয়।"[৮] মোটকথা মঙ্গল, পাঁচালী বা পঞ্চালিকা, জম্ভালিকা, চর্চরী বা চর্চরিকা, দ্বিপাদিকা, খণ্ডধারা-দ্বিপাদিকা, বলস্তিকা প্রভৃতি গীতি—যে'গুলি মহাকবি কালিদাসের সময়ে প্রচলিত ছিল তারা নিবদ্ধ পদগীতি তথা বিপ্রকীর্ণ-প্রবন্ধগীতি। সঙ্গীত-রত্নাকরের প্রবন্ধাধ্যায়ে শার্ঙ্গদেব দ্বিপদী বা দ্বিপাদিকা, ত্রিপদী, চতুষ্পদী, ষট্‌পদী, চর্চরী, বর্ণ, গদ্য প্রভৃতি প্রবন্ধগীতির পরিচয় দিয়েছেন। কালিদাস 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের ৪র্থ অঙ্কে প্রবন্ধগীতি ও মার্গনৃত্যগুলির উল্লেখ করেছেন। চতুর্থ অঙ্কের কতকাংশ যেমন,

॥ "(নেপথ্যে সহজন্যাচিত্রলেখয়োঃ প্রাবেশিক্যাক্ষিপ্তিকা)
পিঅসহি-বিওঅবিমণা সহিসহিআ বাউলা সমুব্বহই।
সুরকরপসসবিঅসিঅতামরসে সরবরুসঙ্গে ॥
(ততঃ প্রবিশতি সহজন্যা চিত্রলেখা চ)

৭। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম ভাগ, পৃঃ ১৬৯-১৭০

৮। 'পদাবলী-পরিচয়', পৃঃ ৬

চিত্র। (প্রবেশান্তরে দ্বিপাদিকয়া দিশোঽবলোক্য)

*　　*　　*　　*

চিত্র। তদো সোবি তসিসং জ্জেব কাণণে পিঅসহীং অণ্ণেসঅন্তো উম্মত্তীভূদো ইদো উব্বসী তদো উব্বসী ত্তি কহুঅ অহোরত্তাইং অদিবাহেদি (নভোঽবলোক্য) এদিণা উণ ণিব্বিদাণং পি উক্কণ্ঠাআরিণা মেহোদএণ অপ্পদীআরো ভবিস্সদি ত্তি তক্কেমি।

(অত্রান্তরে জম্ভালিকা)

*　　*　　*　　*

সহ। ণ ঈদিসা আকিদিবিসেসা চিরং * * (প্রাচীং দিশং বিলোক্য) তা এহি উঅআহিবস্স ভঅদো সুজ্জস্স উবখাণং করেহ্ম।

(অত্রান্তরে খণ্ডধারা)

*　　*　　*　　*

(ইতি মূর্ছিতঃ পততি। পুনর্দ্বিপদিকয়া উত্থায় নিশ্বস্য)

*　　*　　*　　*

(অনন্তরে চর্চরী)

গন্ধুম্মাইঅ মহুঅরগীএহিং, বজ্জন্তেহিং পরহুঅতূরেহিং।"—প্রভৃতি ॥*

এ'ভাবে 'পুনশ্চর্চরী', 'পাঠস্থান্তরে ভিন্নকং', 'দ্বিপাদিকয়া পরিক্রম্যাবলোক্য

১। (নেপথ্যে সহজন্যা ও চিত্রলেখার প্রবেশসূচক গীত)

সহজন্যানাম্নী সখীর সহিত চিত্রলেখা প্রিয়সখী উর্বশীর বিরহে উৎকণ্ঠিতচিত্ত হ'য়ে, যে সরোবরে সূর্যকিরণস্পর্শে পদ্মসমূহ প্রস্ফুটিত হ'য়ে প্রকাশ পাচ্ছে, তার তীরে বসে বিলাপ করছে ॥

(সহজন্যা ও চিত্রলেখার প্রবেশ)

চিত্রলেখা। (প্রবেশ ক'রে দ্বিপদিকা নামক গীতি গান করতে করতে চারদিকে দৃষ্টিপাত ক'রে)। * * *

চিত্রলেখা। রাজর্ষিও সেই কাননে প্রিয়সখীকে অন্বেষণ করতে করতে উন্মত্তপ্রায় 'এখানে উর্বশী—ওখানে উর্বশী' বলতে বলতে অহর্নিশি অতিবাহিত করেছেন। (আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে) আবার মেঘোদয় হ'ল। এই মেঘদর্শনে সুখী ব্যক্তিদেরও উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পায়। আমার বিবেচনায় এটাই অপ্রতীকারের লক্ষণ। (এরপর জম্ভালিকা)। * *

সহজন্যা। যাঁর এরূপ আকৃতি তিনি কখনো চিরদুঃখভাগী হন না * * (পূর্বদিকে অবলোকন ক'রে) অতএব এসো, উদয়চলাধিপতি সূর্যের উপাসনা করি। (এরপর খণ্ডধারা-গীতি)।

* * (রাজার মূর্ছা ও দ্বিপদিকাগীতির সহিত পুনরুত্থান ও দীর্ঘ-নিঃশ্বাস সহ) * * (অনন্তর চর্চরীগীতি) * * ।

চ', 'অনন্তরে খণ্ডক:', 'তেন খণ্ডকান্তরে চর্চরী', 'দ্বিপদিকয়া দিশোঽবলোক্য', 'অনন্তরে খুরক:', 'খুরকানন্তরে চর্চরী', 'ককুভেন ষড়্পভঙ্গা:', 'বলম্বিকয়া উপসৃত্য জানুভ্যাং স্থিত্বা', 'উপবিশ্য চর্চরী', 'দ্বিপাদিকয়া পরিক্রম্যাবলোক্য চ', 'অনন্তরে কুটিলিকা', 'দ্বিলয়ান্তরে চর্চরী', 'অন্যান্তরে অর্ধাদ্বিচতুরস্রক:', 'চতুরস্রকেণোপবিশ্য অঞ্জলিং বদ্ধা', 'কুটিলিকান্তরে চর্চরী', 'গলিতক:', 'জানুভ্যাং স্থিত্বা' প্রভৃতি প্রবন্ধগীতি, অভিনয় ও নৃত্যের উল্লেখ আমরা কালিদাসের গ্রন্থগুলিতে পাই।

দ্বিপদিকা, জম্ভালিকা, খণ্ডধারা প্রভৃতি প্রবন্ধগীতি। জম্ভালিকা ও খণ্ডধারা দ্বিপদিকার রূপভেদ। দ্বিপদিকা শুদ্ধা, খণ্ডা, মাত্রা ও সম্পূর্ণভেদে চার রকম। দ্বিপদিকার চারটি পদ বা চরণ ও তেরোটি মাত্রা। দ্বিপদিকার লক্ষণ যেমন,

শুদ্ধা খণ্ডা চ মাত্রা চ সম্পূর্ণেতি চতুর্বিধা।
ভবেদ্দ্বিপদিকা গীতির্ভরতেন প্রকীর্তিতা।
ভবেচ্চতুর্ভিশ্চরণৈস্ত্রয়োদশকলাত্মকৈ: ॥

খণ্ডধারা-দ্বিপদিকায় চৌদ্দটি কলা ও চারটি পাদ বা চরণের সমাবেশ থাকে। খণ্ডধারার লক্ষণ যেমন,

চতুর্দশকলাযুক্তৈশ্চতুর্ভিশ্চরণৈরিহ।
খণ্ডাখ্যা দ্বিপদাগীতি: খণ্ডধারা হি সা ভবেৎ ॥

সঙ্গীত-রত্নাকরের প্রবন্ধাধ্যায়ে শার্ঙ্গদেব দ্বিপদী বা দ্বিপদিকাগীতির লক্ষণ দিয়েছেন,

শুদ্ধা খণ্ডা চ মাত্রাদি: সম্পূর্ণেতি চতুর্বিধা ॥
দ্বিপদী করুণাখ্যেণ তালেন পরিগীয়তে।
পাদে ছ: পঞ্চ ভা গোঽন্তে জৌন্ত: ষষ্ঠিদ্বিতীয়কৌ ॥
চতুর্ভিরীদৃশৈ: পাদৈ: শুদ্ধা দ্বিপদিকোচ্যতে।
অর্ধান্তেঽন্তে স্বরানাহু: খণ্ডা স্যাচ্ছুদ্ধয়ার্ধয়া ॥
ষষ্ঠেনৈকেন গুরুণা মাত্রাদ্বিপদিকা মতা।

শুদ্ধা, খণ্ডা (খণ্ডধারা), মাত্রা ও সম্পূর্ণা চার শ্রেণীর দ্বিপদী বা দ্বিপদিকা-প্রবন্ধগীতি। করুণাতালে গান করার নিয়ম। পণ্ডিত লোচন (১৭শ শতাব্দীর মাঝামাঝি) 'রাগতরঙ্গিণী' গ্রন্থে 'করুণামালব' ও 'করুণাসুহব' ছন্দ ও বৃত্তের পরিচয় দিয়েছেন।[১০] পুনরায় মানবী, চন্দ্রিকা, ধৃতি ও তার-ভেদে দ্বিপদিকা

১০। 'রাগতরঙ্গিণী' (দ্বারভাঙ্গা-সংস্করণ), পৃ: ৭২, ৯৪

চার রকম (৪।২১৭-২১৯)। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে চর্চরী বা চর্চরিকাগীতি বসন্তোৎসবে ক্রীড়াতালে গান করা হয়। সম্ভবত খণ্ডাগীতিকেই কালিদাস খণ্ডিকা, খণ্ডধারা প্রভৃতি শব্দে উল্লেখ করেছেন।

কালিদাস বিক্রমোর্বশীতে ককুভরাগের উল্লেখ করেছেন: "ককুভেন ষড়্‌পভঙ্গাঃ"। কালিদাসের অভিপ্রায় যে ককুভরাগের সঙ্গে ছ'রকম অবচ্ছেদক-যুক্ত গীতি (অঙ্গগীতি) গান করা বিধেয়। অভিজাত দেশীরাগ হিসাবে ককুভরাগের নাম মতঙ্গের বৃহদ্দেশীতে ভাষারাগের পর্যায়ে পাই। মতঙ্গ উল্লেখ করেছেন: "এতাস্তু ককুভে সপ্ত ভাষা জ্ঞেয়া মনোহরাঃ"। ককুভরাগ থেকে উৎপন্ন সাতটি দেশীরাগ হ'ল: কাম্বোজা, মধ্যমগ্রামিকা, সালবাহানিকা, ভাগবর্ধনী (ভোগবর্ধনী ?), মুহরী, শকমিশ্রিতা ও ভিন্নপঞ্চমী।[১১] কালিদাস ককুভরাগের সঙ্গে যে ছ'টি অবচ্ছেদযুক্ত গীতি গান করার কথা বলেছেন সে'গুলি ককুভের সাতটি ভাষা তথা অঙ্গরাগের মধ্যে ছ'টি গ্রামরাগগীতি কিনা নির্ণয় করা কঠিন। 'ভিন্নক'-গীতি গ্রামরাগের আশ্রয় ভিন্নকা বা ভিন্নাগীতিরই নামান্তর ব'লে মনে হয়। বিক্রমোর্বশীর টীকাকার ভিন্নককে 'রাগ' বলেছেন। হরিবংশে 'ষড়্‌গ্রামরাগাদিসমাধিযুক্তাম্' শ্লোকাংশের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে টীকাকার নীলকণ্ঠ ভিন্নাকে গ্রামরাগ বলেছেন: "ষট্‌গ্রামাঃ স্থানানি যেষাং রাগানাং তৈর্ষঃ সমাধিঃ * *। তে চ মধ্যশুদ্ধভিন্নগৌড়মিশ্রগীতরূপাঃ"। এখানে গ্রামরাগ-গীতিগুলি গ্রামরাগের পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং সে'দিক থেকে কালিদাস যদি ভিন্নক, ভিন্নকা বা ভিন্নাকে রাগ হিসাবে মনে করেন তবে তাতে বিশেষ অসঙ্গতি দেখা যায় না। তবে ভিন্নকা বা ভিন্না হ'ল গ্রামরাগগীতি তথা রাগগীতিই। কালিদাস ছ'টি গ্রাম ও গ্রামরাগ সম্বন্ধে অবশ্যই সচেতন ছিলেন। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে কুডিমিয়ামালাই প্রস্তরলেখামালায় সাতটি গ্রামের উল্লেখ সে'কথাই প্রমাণ করে। জম্ভালিকা, বলস্তিকা প্রভৃতি গীতিগুলিরও তখন প্রচলন ছিল। এই গীতিগুলির অবশ্য সঠিক পরিচয় পাওয়া কঠিন। কালিদাস

১১। কাম্বোজা প্রথমা জ্ঞেয়া মধ্যমগ্রামিকা মতা।
সালবাহানিকা চৈব তদন্তে ভাগবর্ধনী।
পঞ্চমী মুহরী জ্ঞেয়া ষষ্ঠী চ শকমিশ্রিতা।
প্রযোক্তব্যা প্রযত্নেন সপ্তমী ভিন্নপঞ্চমী।
এতাস্তু ককুভে সপ্ত ভাষা জ্ঞেয়া মনোহরাঃ।
—বৃহদ্দেশী (ত্রিবান্দ্রম), পৃঃ ১০৬

'গলিতক' অভিনয়ের কথাও উল্লেখ করেছেন। নন্দ্যাবর্ত, চতুরস্র, খুরক প্রভৃতি নৃত্যেরও তিনি নামোল্লেখ করেছেন। শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকরে নন্দ্যাবর্ত, চতুরস্র প্রভৃতি নৃত্যের পরিচয় দিয়েছেন। এ'গুলি একপার্শ্বগত নৃত্যশ্রেণীর অন্তর্গত। নন্দ্যাবর্তের উল্লেখ ক'রে শার্ঙ্গদেব বলেছেন,

অঙ্গৈব চেচ্চরণয়োরন্তরং স্যাৎষড়ঙ্গুলম্।
বিতস্তিমাত্রমথবা নন্দ্যাবর্ত্যং তদোদিতম্॥

নন্দ্যাবর্ত-নৃত্যে উভয় চরণের স্থিতি ছ' আঙ্গুলির ব্যবধানে থাকে। নন্দ্যাবর্ত্যের সঙ্গে চতুরস্র-নৃত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। শার্ঙ্গদেব চতুরস্রের পরিচয় দিয়েছেন,

নন্দ্যাবর্তস্থ চেদঙ্ঘ্র্যোর্ভবেদষ্টাদশাঙ্গুলম্।
অন্তরং চতুরৈঃ স্থানং চতুরস্রং তদোদিতম্॥

কালিদাস যে "অস্থানন্তরে অর্ধদ্বিচতুরস্রকঃ"—অর্ধদ্বিচতুরস্র-নৃত্যের উল্লেখ করেছেন তার অপর নাম 'নন্দ্যাবর্তাপর', কেননা নন্দ্যাবর্ত্য-নৃত্যে শিল্পীর ছ' আঙ্গুলি পরিমিত স্থান দূরত্বে দু'টি চরণের স্থিতি থাকে, আর চতুরস্রে তার তিন গুণ বা আঠার আঙ্গুলি পরিমিত স্থান দূরত্বে থাকে। সুতরাং যে নৃত্যে দু'টি চরণের স্থিতি বারো আঙ্গুলি পরিমিত স্থানের দূরত্বে হয় তাকে অর্ধদ্বিচতুরস্র (১৮ – ৯ = ৯ + ৩ = ১২) বা নন্দ্যাবর্ত্যপর (৬ × ২ = ১২) নৃত্য বলে। কালিদাস নৃত্য, গীত, বাদ্য ও নাট্য কলায়-পারদর্শী না হ'লেও চাক্ষুষভাবে নৃত্য, গীত ও অভিনয়ের তত্ত্ব তিনি জানতেন। তা'ছাড়া নাটকে তিনি শাস্ত্রীয় নৃত্য-গীতের উল্লেখ করেছেন।

কালিদাস 'রঘুবংশ'-কাব্যে (১৯শ সর্গে) বেণু, বীণা ও আঙ্গিকাদি অভিনয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। বীণা ও বেণু সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র। বৈদিকোত্তর ক্ল্যাসিক্যাল যুগে নৃত্য, গীত ও অভিনয়ের সঙ্গেও এ'দুটি বাদ্যযন্ত্রের সহযোগ থাকত, কিন্তু নাট্যবেদ বিধি ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে রচিত হবার আগে বৈদিক যুগে সামগানের সহকারী হিসাবে বেণু ও বীণার উল্লেখ আমরা বৈদিক সাহিত্যগুলিতে পাই। কালিদাস বেণু ও বীণার উল্লেখ করেছেন,

বেণুনা দর্শণপীড়িতাধরা
বীণয়া নখপদাঙ্কিতোরবঃ।
শিল্পকার্য উভয়েন বেজিতাস্তং
বিজিহ্মনয়না ব্যলোভয়ন্॥

অঙ্গসত্ত্ববচনাশ্রয়ং মিথঃ
স্ত্রীষু নৃত্যমুপধায় দর্শয়ন্।
স প্রয়োগনিপুণৈঃ প্রযোক্তৃভিঃ
সঞ্জঘর্ষ সহ মিত্রসন্নিধৌ ॥

কালিদাস বীণাকে 'বল্লকী' নামেও অভিহিত করেছেন। অবশ্য বল্লকী বীণার একটি রূপভেদ। কালিদাসের বর্ণনা হ'ল: 'রাজা অগ্নিবর্ণ অধর দ্বারা নর্তকীদের অধর দংশন করতেন ও নিজ নখ দ্বারা তাদের বক্ষদেশ ক্ষতবিক্ষত ক'রে দিতেন। সুতরাং দষ্ট অধর দ্বারা বেণুবাদন ও ক্ষতবিক্ষত বক্ষদেশে বীণাস্থাপন করতে তাদের কষ্টবোধ হ'লেও তারা কুটিল কটাক্ষ নিয়োগ ক'রে রাজার প্রতি অনুরাগ দেখাত, আর তাতেই অগ্নিবর্ণের চিত্ত অভিভূত হ'ত। রাজা নিভৃতে নর্তকীদের আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্ত্বিক এই তিন রকমের অভিনয়ে শিক্ষিতা করেছিলেন। যখন তারা বন্ধুগণের সমক্ষে শিক্ষার পরীক্ষা দিত তখন প্রয়োগ-কলাবিশারদ নাট্যাচার্যদের সঙ্গে রাজার ঘোরতর তর্ক-বিতর্ক হ'ত।' এ'থেকে বোঝা যায় কালিদাস শাস্ত্রীয় বিশুদ্ধ শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন।

মুনি ভরত চার রকম অভিনয়ের কথা উল্লেখ করেছেন: "আঙ্গিকো বাচিকশ্চৈব আহার্যঃ সাত্ত্বিকস্তথা" (৮।৯)। আঙ্গিকাভিনয় শারীর, মুখজ ও চেষ্টাকৃত-ভেদে আবার তিন রকম। এ'ছাড়া শাখাঙ্গ ও উপাঙ্গ এই দু'রকম বিভাগও আছে। শিরঃ, হস্ত, কটী, বক্ষঃ, পার্শ্ব ও পাদ এই ছ'টি অঙ্গের নাম ষড়ঙ্গ এবং এ'গুলি নাট্যের উদ্দেশ্যে 'সংগ্রহ'। ভরত নাট্যশাস্ত্রের ৮ম অধ্যায়ে (কাশী-সংস্করণ) আঙ্গিকাদি প্রধান চারশ্রেণীর অভিনয়ের পরিচয় দিয়েছেন। কালিদাস রঘুবংশে আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্ত্বিক এই তিন রকম প্রধান বিভাগের কথা উল্লেখ করেছেন, আহার্যাভিনয় সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নি। অভিনয়দর্পণকার নন্দিকেশ্বর ভরতের মতো চার রকম অভিনয়ের কথাই উল্লেখ করেছেন: "চতুর্দ্ধাভিনয়স্তত্র"। হার, কেয়ূর, বেশ প্রভৃতির দ্বারা শরীরকে ভূষিত করার (সাজানোর) নাম 'আহার্য' অভিনয়। এর দ্বারা নট ও নটীর কৃত্রিম শোভা বাড়ে মাত্র। যা শরীরের স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নয়, বেশভূষার সাহায্যে সৃষ্টি হয়, তার নামই 'আহার্য' নৈসর্গীক সৌন্দর্যের পূজারী মহাকবি কালিদাস নিশ্চয়ই নকল সৌন্দর্যের পক্ষপাতী ছিলেন না, তাই ভরতের উল্লিখিত প্রধান চার রকম অভিনয়ের বিষয় বিদিত থাকলেও আহার্যকে তিনি অপরিহার্য শিক্ষার বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেন নি।

কালিদাস 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে উপগান ও অঙ্গহারাদিসমন্বিত নৃত্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি মালবিকাগ্নিমিত্রের ২য় অঙ্কে বলেছেন: "উপগানং কৃত্বা চতুষ্পদবস্তু গায়তি"। এই উপগানের প্রসঙ্গ তিনি শর্মিষ্ঠা-কৃত 'চতুষ্পদা' বা চারটি খণ্ড বা অঙ্কযুক্ত নাটকে উল্লিখিত ছালিক্যগীতির সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন ব'লে মনে হয়। দ্বিতীয় অঙ্কটির সূচনা হ'ল: গীত-রচনা শেষ ক'রে আসনে উপবিষ্ট বয়স্যসহ রাজা এবং ধারিণী, পরিব্রাজিকা ও পরিজনগণের প্রবেশ।[১২] নাট্যাচার্য হবার যোগ্যতা বিষয়ে আলোচনার পর গণদাস প্রবেশ ক'রে বল্লেন: "দেব, শর্মিষ্ঠায়াঃ কৃতির্লয়মধ্যা চতুষ্পদাস্তি। তস্যাস্তু ছলিক-প্রয়োগমেকমনা দেবঃ শ্রোতুমর্হতি"। চতুষ্পদা-নাটকে 'ছলিক'-শব্দের অর্থে ছালিক্যগান। 'হরিবংশে সঙ্গীত' আলোচনায়[১৩] ছালিক্যগান সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করেছি। হরিবংশকার ছালিক্যক্রীড়ার প্রসঙ্গে এই শ্রেণীর গানের উল্লেখ করেছেন। হরিবংশে আছে: 'শ্ছালিক্যগান্ধর্বমথাদ্ভুতাঙ্গ', 'ছালিক্যগান্ধর্ব-মুদারাবুদ্ধিঃ', 'ছালিক্যগান্ধর্বমুদারকীর্তিঃ', 'ছালিক্যগান্ধর্বগুণোদয়েষু' প্রভৃতি। সর্বত্রই প্রায় ছালিক্যের সঙ্গে 'গান্ধর্ব'-শব্দ সম্পর্কযুক্ত। 'গান্ধর্ব' অর্থে 'গান' (বৈদিকোত্তর মার্গগান)। সুতরাং ছালিক্য যে মার্গশ্রেণীভুক্ত অভিজাত গান তা বোঝা যায়। এ'টি নাট্যগীতি বা অভিনয়ের উদ্দেশ্যে গান। বর্তমানকালের রাগমালার (রাগমালাগীতি) মতো ছ'টি গ্রামরাগে লীলায়িত ক'রে ছালিক্যগান গাওয়া হ'ত। অর্থাৎ মধ্যা, শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়া (বা গৌড়ী), মিশ্রা ও গীতিরূপা এই সাতটি গ্রামরাগের সমাবেশ দিয়ে ছালিক্যগীতি পরিবেশন করা হ'ত। মতঙ্গ প্রভৃতির মতে গ্রামরাগ-গীতিগুলির নাম ও সংখ্যা আবার ভিন্ন ভিন্ন তা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।[১৪] হরিবংশে উল্লিখিত ছ'টি গ্রামরাগের সঙ্গে মতঙ্গের উল্লিখিত সাতটি গ্রামের আসলে কোন অসঙ্গতি নাই, কারণ কৈশিক ও কৈশিক-মধ্যম গ্রামরাগ-দু'টি একইগ্রাম (মধ্যমগ্রাম) থেকে সৃষ্ট, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ নাই। ছালিক্যের (কালিদাস-উল্লিখিত 'ছলিক') প্রসঙ্গে হরিবংশকার উল্লেখ করেছেন,

শক্যং ন ছালিক্যমৃতে তপোভিঃ স্থানে বিধাতুথ মূর্ছনাসু॥
ষড়্‌গ্রামরাগেষু চ তত্র কার্যং তস্যৈকদেশাবয়বেন রাজন্।

১২। "(ততঃ প্রবিশতি সঙ্গীতরচনায়াং কৃতায়ামাসনস্থঃ সবয়স্যো রাজা, ধারিণী, পরিব্রাজিকা, বিভবতশ্চ পরিবারঃ)।"

১৩। পৃষ্ঠা ১২৯ দ্রষ্টব্য।

১৪। পৃষ্ঠা ১৩২-১৩৩ দ্রষ্টব্য।

এই ষড়্‌গ্রামরাগে মূর্ছনা, লয়, তাল, রস ও ভাবের সমাবেশ থাকত, আর থাকত বীণা, বেণু, মৃদঙ্গাদি বাদ্যযন্ত্রের সহযোগ। হরিবংশে ছালিক্যের সহকারী বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ ক'রে বলা হয়েছে: 'প্রগ্রাহ বীণামথ নারদস্তু', 'মৃদঙ্গবাদ্যানপরাংশ্চ বাদ্যান্' প্রভৃতি। অভিনয়বিশেষজ্ঞা নর্তকীরা এর উদ্দেশ্যে আসারিতাদি (নাট্য-) নৃত্যেরও (আসারিতগান নয়) অনুষ্ঠান করত। কালিদাস যে 'চতুষ্পদা' নাটকের কথা উল্লেখ করেছেন তা মুনি ভরত-উল্লিখিত নর্তকীপ্রবেশ, আসারিত-নৃত্যের উদ্দেশ্যে অভিনয়, তালের অনুগত অঙ্গহার-প্রদর্শন ও দেবতাচিহ্নরূপ নৃত্য এই চার রকম অভিনয়াঙ্গ হ'তে পারে। টীকাকার নীলকণ্ঠ (হরিবংশে) এর প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন: "ভরতো মুনিশ্চতুর্বিধমাসারিতং নৃত্যবিধাবুপদি-দেশেতি। প্রথমং নর্তকীপ্রবেশঃ, ততশ্চাসারিতার্থাভিনয়ং নাট্যং, ততস্তালানু-গত্যাঙ্গাহরণং ততো দেবতাচিহ্নরূপেণ নৃত্যম্। এবং চতুর্বপ্যভিসারেষুক্তম্"। প্রকৃতপক্ষে অভিনয়ের নায়িকা হিসাবে মালবিকারই প্রথমে আগমন হয়েছিল। কালিদাস উল্লেখ করেছেন: "মালবিকা গীতান্তে নিষ্ক্রান্তমারব্ধা"। কিন্তু এই মালবিকা নর্তকী ছিলেন কিনা? এর উত্তর রাজা অগ্নিমিত্রের ভণিতায় বেশ সুস্পষ্ট। অগ্নিমিত্র মালবিকার উদ্দেশ্যে নিজে নিজে (স্বগত) বলেছেন,

দীর্ঘাক্ষং শরদিন্দুকান্তি বদনং বাহূ নতাবংসয়োঃ,
সংক্ষিপ্তং নিবিড়োন্নতস্তনমুরঃ পার্শ্বে প্রমৃষ্টে ইব।
মধ্যঃ পাণিমিতোঽমিতঞ্চ জঘনং পাদাবরালাঙ্গুলী,
ছন্দো নর্তয়িতুর্যথৈব মনসি শ্লিষ্টং তথাস্যা বপুঃ ॥

মালবিকার এই দেহসৌষ্ঠব, রূপলাবণ্য ও নৃত্যনৈপুণ্য তাকে অভিনয়ের উত্তম পাত্রী-রূপেই প্রতিপন্ন করে। তিনি সুচতুরা নৃত্যকুশলা নায়িকা। মালবিকার এই বর্ণনার সঙ্গে অভিনয়দর্পণ ও সঙ্গীত-মকরন্দের উত্তম পাত্রলক্ষণের যথেষ্ট মিল আছে। নন্দিকেশ্বর পাত্রলক্ষণের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন,

তন্বী রূপবতী শ্যামা পীনোন্নতপয়োধরা ॥
প্রগল্‌ভা সরসা কান্তা কুশলা গ্রহমোক্ষয়োঃ।
বিশাললোচনা গীতবাদ্যতালানুবর্তিনী ॥
* * * *
এবং বিধগুণোপেতা নর্তকী সমুদীরিতা ॥

নারদ (২য়) সঙ্গীত-মকরন্দেও অনুরূপভাবে পাত্রলক্ষণের পরিচয় দিয়েছেন :

আবালতারুণ্যবিদগ্ধযৌবনা
বিম্বাধরা শোভিতচন্দ্রিকাননাঃ।
পীনোন্নতোত্তুঙ্গকুচাভির্শোভিতাঃ
সকঞ্চুকা রত্নবিচিত্রভূষণাঃ॥

* * * *

অঙ্গেনালম্বয়েদ্গীতং হস্তেনার্থং প্রদর্শয়েৎ।
নেত্রাভ্যাং ভাবয়েদ্ভাবং পাদাভ্যাং তালনির্ণয়ঃ॥

সঙ্গীত-মকরন্দকার নারদ (২য়) অবশ্য অনেক পরেকার যুগের গুণী। কিন্তু কালিদাস নায়িকা বা নর্তকীর বর্ণনায় ভরত ও নন্দিকেশ্বরকেই সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করেছেন ব'লে মনে হয়। ভরত নাট্যশাস্ত্রের (কাশী-সংস্করণ) প্রকৃতিবিচার নামক ৩৪শ অধ্যায়ে পাত্রপাত্রী-লক্ষণের পরিচয় দিয়েছেন। কালিদাসের 'চতুষ্পদ' বা 'চউপ্পদ' নাটকের প্রথমাঙ্গ সে নর্তকীপ্রবেশ এ'কথা সম্ভবত প্রমাণিত হয় এবং এ'থেকে নাট্যকলা সম্বন্ধে কালিদাসের সুচারু অভিজ্ঞতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

পূর্বোক্ত 'উপগান' সম্বন্ধে কালিদাসের বক্তব্য কিন্তু পরিস্ফুট নয়। কোন প্রধান গানের পর অঙ্গগান হিসাবে উপগান গাওয়ার রীতি ছিল। কিন্তু কালিদাস এখানে প্রধান কোন গীতির কথা উল্লেখ করেন নি।

কালিদাস নৃত্য-গীতপারদর্শিনী মালবিকার নৃত্য-নৈপুণ্যের উল্লেখ ক'রে নিজের সুমার্জিত কলাজ্ঞানেরও পরিচয় দিয়েছেন। কালিদাস সুন্দরী নর্তকী (?) মালবিকার দেহভঙ্গি ও নৃত্যছন্দের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন,

(১) বামং সন্ধিস্তিমিতবলয়ং ন্যস্য হস্তং নিতম্বে,
কৃত্বা শ্যামাবিটপসদৃশং স্রস্তমুক্তং দ্বিতীয়ম্।
পাদাঙ্গুষ্ঠালুলিতকুসুমে কুট্টিমে পতিতাক্ষং,
নৃত্যাদস্যাঃ স্থিতমতিতরাং কান্তমৃজ্বায়তার্দ্ধম্॥[১৫]

১৫। দেহ নিশ্চল ব'লে এর (মালবিকার) মণিবন্ধে বলয় স্থিরভাবে শোভা পাচ্ছে। এর বামহস্ত নিতম্বদেশে স্থাপিত, শ্যামালতার মতো দক্ষিণহস্ত শিথিলভাবে বিলম্বিত। দক্ষিণ-চরণের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পুষ্পবিস্তৃত মণিময় নৃত্যমণ্ডপে পতিত কুসুমরাশি অপসারিত হচ্ছে। এর চক্ষুদু'টি ভূমির দিকেই নিবিষ্ট। চরণ থেকে নাভি পর্যন্ত দেহের অর্দ্ধভাগ সরল ও আয়ত। এ'ভাবে অবস্থান করাতে অতীব চারুদর্শনের সৃষ্টি হয়েছে।

(২) অঙ্গৈরন্তর্নিহিতবচনৈঃ সূচিতঃ সম্যগর্থঃ,
পাদন্যাসো লয়মুপগতস্তন্ময়ত্বং রসেষু।
শাখাযোনির্মৃদুরভিনয়স্তদ্বিকল্পানুবৃত্তৌ,
ভাবো ভাবং নুদতি বিষয়াদ্রাগবন্ধঃ স এব ॥[১৬]

কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকেও সঙ্গীতের প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য। নাটকের প্রস্তাবনায় সূত্রধর নটীকে সম্বোধন ক'রে বলেছেন: 'আর্যে, সঙ্গীত ব্যতীত এ'সভায় শ্রুতিসুখকর আর কি করণীয় আছে?' নটী উত্তর করল: 'তবে কোন্ ঋতু অবলম্বন ক'রে সঙ্গীত (গান) করব?' সূত্রধর বল্লেন: 'আর্যে, আগতপ্রায় গ্রীষ্মঋতু অবলম্বন ক'রে সঙ্গীত আরম্ভ কর'। নটী 'তথাস্তু' ব'লে গান আরম্ভ করল। গানটি হ'ল:

কেশর কিঞ্জল্ক যার, অতিশয় সুকুমার
যাহে বসি অলিগণ করিছে চুম্বন।
এ' হেন শিরীষ ফুল, তুলিয়া প্রমদাকুল,
করিতেছে ধীরে ধীরে কর্ণের ভূষণ ॥[১৭]

এ'সম্বন্ধে কালিদাসের নিজস্ব ললিত ভাষা হ'ল:

॥"সূত্রধর। কিমন্যদস্যাঃ পরিষদঃ শ্রুতিপ্রসাদনতঃ করণীয়মস্তি।
নটী। অধ কদমং উণ উদুং অধিকারঅ গাইস্সম্?
সূত্রধর। আর্যে! তদিমমেব তাবদচিরপ্রবৃত্তমুপভোগক্ষমং গ্রীষ্মসময়মধিকৃত্য গীয়তাম্। সম্প্রতি হি * *।
নটী। তহ। (ইতি গায়তি)

ইসীসিচুম্বিআইং ভমরেহিং সুউমারকেসরসিহাইং।
ওদংসঅন্তি দঅমাণা পমদাথো সিরীসকুসুমাইং ॥

১৬। মুখে কোন কথা (শব্দ) উচ্চারিত না হ'লেও অঙ্গাদির ভঙ্গি (হস্তাদিকরণ) দ্বারা সকল অর্থই প্রকাশ পাচ্ছে। পদবিক্ষেপ সর্বদা লয়সঙ্গত, রস সম্বন্ধেও তন্ময়তা লক্ষ্য করা যায়, অভিনয় অতিশয় কোমল ও সুকুমার দর্শন, কেননা নৃত্যের সময় হস্তের দ্বারাই তার মান নির্ণীত হচ্ছে। অভিনয়ের সময় যে ধরণের বিচিত্র অঙ্গভঙ্গির প্রয়োজন (হাব-ভাব-দৃষ্টি প্রভৃতি) সে'গুলি সমস্তই যথাযথভাবে নিষ্পন্ন হ'চ্ছে। এ'রূপ (নৃত্যগীতাদিসহ) অভিনয় প্রত্যেক মানুষেরই অনুরাগ আকর্ষণ করে।

১৭। সত্যচরণ শাস্ত্রী-সম্পাদিত 'কালিদাসের গ্রন্থাবলী', পৃঃ ৮১৩

সূত্রধর। আর্যে! সাধু গীতম্। অহো! রাগাপহৃতচিত্ত-চিত্তবৃত্তিরালিখিত
ইব বিভাতি সর্বতো রঙ্গঃ। * *"॥

কালিদাস 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকের প্রস্তাবনায় ভারতীয় সঙ্গীতের অনেক তত্ত্বকথার যে আভাস দিয়েছেন তা মর্মগ্রাহী-মাত্রেই বুঝবেন। প্রথমে—লক্ষ্য করার বিষয় খৃষ্টীয় ১ম—৪র্থ শতাব্দীর সমাজে 'রাগ' শব্দটি ও তার রঞ্জনাশক্তিবিশিষ্ট গুণ বা সার্থকতা ছিল কিনা। অনেকের অভিমতে মুনি ভরত নাকি লোকের মনোরঞ্জনী শক্তি বা ধর্মবিশিষ্ট 'রাগ' শব্দটি তাঁর নাট্যশাস্ত্রে ব্যবহার করেন নি। কিন্তু তা যে সত্য নয়, নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীতের আলোচনায় আমরা বিশ্লেষণ করেছি। শুধু নাট্যশাস্ত্রকার ভরত কেন, শিক্ষাকার নারদও (১ম) 'রাগ'-শব্দটি গ্রামরাগপর্যায়ে উল্লেখ করেছেন: "নিপততি মধ্যমরাগে", কিংবা "তানরাগস্বরগ্রামমূর্চ্ছনানাং তু লক্ষণম্"। অবশ্য মতঙ্গ বৃহদ্দেশীতে ভরতের প্রতি অভিযোগ ক'রে বলেছেন: "রাগমার্গস্য যদ্ রূপং যন্নোক্তং ভরতাদিভিঃ। নিরূপ্যতে তদস্মাভিঃ", কিন্তু মতঙ্গ লক্ষ্য করলে বোধহয় দেখতেন যে রামায়ণকার বাল্মিকী শুদ্ধ-সপ্তজাতিগানের প্রসঙ্গে 'রাগ' শব্দটি ব্যবহার না করলেও জনচিত্তরঞ্জনকারী স্বর তথা স্বরসন্দর্ভের কথা উল্লেখ করেছেন ও এ'সম্বন্ধে রামায়ণে সঙ্গীতের আলোচনায় উল্লেখ করেছি। মহাকবি কালিদাস যদিও 'অনুরাগ' অর্থে রাগ-শব্দটি ব্যবহার করেছেন তাহলেও সাঙ্গীতিক শব্দের সার্থকতা সেই 'রাগ'-শব্দটিতে যে নিহিত তা গুণীমাত্রেই স্বীকার করবেন। তিনি একবার উল্লেখ করেছেন "শ্রুতিপ্রসাদনতঃ" ও দ্বিতীয়বার "রাগাপহৃতচিত্তচিত্তবৃত্তিরালিখিত ইব বিভাতি"। যে স্বরসন্দর্ভ মানুষের কেন—সকলের চিত্তকে রঞ্জিত বা আনন্দরসে আপ্লুত করে তাকেই 'রাগ' বলে। রাগ সম্বন্ধে মতঙ্গের বিবৃতিও তাই: "রঞ্জকো জনচিত্তানাং স চ রাগ উদাহৃতঃ" কিংবা "রঞ্জনাজ্জায়তে রাগো ব্যুৎপত্তিঃ সমুদাহৃতা"। সুতরাং ভরতের ও ভরতের সমকালীন সঙ্গীতগুণীদের বিরুদ্ধে কালিদাসোত্তর সঙ্গীতশাস্ত্রী মতঙ্গের (খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম শতাব্দী) অভিযোগ করার কিছু নাই।

দ্বিতীয়—উল্লেখযোগ্য যে নটী যখন জিজ্ঞাসা করলে কোন্ ঋতু অবলম্বন ক'রে গান (সঙ্গীত) করবে ('অধ কদমং উণ উদুং অধিকরিঅ গাইস্সম্?') তখন কালিদাসের সময়ে জাতিরাগ, গ্রামরাগ ও অভিজাত দেশীরাগগুলি যে নির্দিষ্ট ঋতুতে ও সময়ে (প্রহরে) গান করা হ'ত তা বোঝা যায়। ভরত নাট্যশাস্ত্রে জাতিরাগগুলির রসপ্রয়োগ ছাড়া (২৯শ অধ্যায়) গানের সময়ের

কথা উল্লেখ করেন নি, কিন্তু প্রাবেশিকী, নৈষ্ক্রামিকী প্রভৃতি পাঁচটি ধ্রুবাগানের বেলায় রসের সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন—

প্রাবেশিক্যাশ্রয়ো যে চ পূর্বাহ্ণে চৈব তে স্মৃতাঃ।
নক্তংদিবসমুত্থাস্তু নৈষ্ক্রামিক্যাশ্চ কালজাঃ॥
সাম্যাঃ পূর্বাহ্ণকালে তু মধ্যাহ্নে দীপ্তসংশ্রয়াঃ।
অপরাহ্ণে তথা মধ্যাঃ সন্ধ্যায়াং করুণাশ্রয়াঃ॥[১৮]

ভরতোত্তর ভারতীয় সমাজ ভরতাদির অনুবর্তী হ'য়ে সঙ্গীতের সকল উপাদান বিধি-নিষেধসহ গ্রহণ ও অনুশীলন করত। কালিদাসও সেই সবের অনুসরণ ক'রে কাব্যে ও নাটকে সঙ্গীতের বিষয় আলোচনা করেছেন ব'লে মনে হয়।

অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রস্তাবনার শেষ পর্যায়ে কালিদাস সাঙ্গীতিক 'রাগ'-শব্দটি প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করেছেন দেখা যায়:

তবাস্মি গীতরাগেণ হরিণা প্রসভং হৃতঃ।
এষ রাজেব দুষ্মন্তঃ সারঙ্গেণাতিরংহসা॥

'মহাবেগগামী হরিণ দ্বারা আকৃষ্টচিত্ত হ'য়ে রাজা দুষ্মন্ত যেমন মুগ্ধ হয়েছিলেন, আর্যে! তোমার গীতমাধুর্যে আমিও তেমনি মুগ্ধচিত্ত হয়েছিলাম'। এখানে 'গীতরাগেণ' শব্দটির পরোক্ষ অর্থ 'গীতমাধুর্য', কিন্তু অপরোক্ষভাবে এর অর্থ হবে: 'রাগাশ্রিতগীতেন' বা 'রাগানুবিদ্ধেন গীতেন', অর্থাৎ 'রাগযুক্ত বা রাগসম্পৃক্ত গানের দ্বারা আমি মুদ্ধচিত্ত হয়েছি'। এখানে সূত্রধর নটীর গানে রাগের পরিপূর্ণ বিকাশ ও তার রঞ্জনাশক্তি চিত্তকে হরণ করতে সক্ষম হয়েছিল এ'কথাই প্রশংসাচ্ছলে বলতে চেয়েছে।[১৯] সূত্রধর উপলক্ষ্য, কালিদাসেরই এ'টি অন্তরের কথা।

১৮। নাট্যশাস্ত্র (কাশী-সংস্করণ) ৩২।৩৮৯-৩৯০

১৯। অনেকে 'তবাস্মি গীতরাগেণ * * সারঙ্গেনাতিরংহসা' শ্লোকটির 'সারঙ্গেণ' শব্দের ব্যাখ্যা করেন 'সারঙ্গরাগ' এবং এ'থেকে তাঁরা প্রমাণ করেন যে কালিদাসের সময়ে (খৃষ্টপূর্ব ১০০—খৃষ্টীয় ৪০০ বা ৪৫০ শতাব্দী) সারঙ্গরাগ ভারতীয় সমাজে জন্মলাভ করেছে। এ' অর্থই অধ্যাপক জি. এচ্. রাণাডে একটি নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন: "* * we can safely say that the Nati's song in *Abhijñāna-Sakuntalam* was cast in the Sārańg Rāga and further that the Rāga continues to be the same in form as also in scale from the days of Bharat, Kālidās, Matańga or at least of Srāńgdev right upto the present day" (—Vide *The Journal of the Music Academy*, Madras, Vol. XI, 1940, pp. 90-94 and also Vol. XII, 1941, p. 80-84).

কিন্তু অধ্যাপক রাণাডের মন্তব্য শুধু কষ্টকল্পনাপ্রসূত নয়—অযৌক্তিক এবং অনৈতিহাসিকও।

পরিশেষে উল্লেখযোগ্য যে কালিদাসের সময়ে গানগুলি প্রবন্ধপর্যায়ভুক্ত ছিল। তাঁর আগে শিক্ষাকার নারদ (১ম), ভরত, কোহল, যাষ্টিক, দত্তিল, শাণ্ডিল্য, নন্দিকেশ্বর সকলেই সমাজে নিবদ্ধ প্রবন্ধগানের পরিচয় দিয়েছেন। দেশীরাগগুলি তখন অভিজাত পদমর্যাদা লাভ করেছে। ডাঃ শ্রীসুকুমার সেন তাঁর 'বাংলার সংস্কৃতি ও সাহিত্য' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন: "বহুকাল ধরে কালিদাসের বিক্রমোর্বশী-নাটিকার ৪র্থ অঙ্কের গানগুলিতে অপভ্রংশাশ্রিত সমসাময়িক লোকসাহিত্যের বোধকরি সবচেয়ে পুরাতন নিদর্শন র'য়ে গেছে। গানগুলি তালের নাচের সঙ্গে গাওয়ার নির্দেশ আছে নাটিকাটিতে। এই তাল-নাচের নামগুলি প্রাদেশিক সাহিত্যেও চলে এসেছে নাচের তালের গানের ছন্দের অথবা রচনার বিশিষ্ট ভঙ্গি হিসাবে। 'দ্বিপাদিকা' হয়েছে 'দোহা', 'চর্চরিকা' হয়েছে 'চাঁচরি', 'জম্ভলিকা' (জম্ভালিকা ?) হয়েছে 'ঝুমুর' ও 'ষট্‌পদী' হয়েছে 'ছপ্পয়'"। প্রাচীন প্রবন্ধগীতি পঞ্চালিকাও তার আদিরূপ পুতুলনাচের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তা আজও বাঙ্গালার সমাজে 'পাঁচালি' নামে প্রসিদ্ধ হ'য়ে আছে। কাজেই বহু অভিজাত প্রবন্ধগান আজও পল্লীর সমাজে লোকসাহিত্যের নাম নিয়ে বেঁচে আছে।

কেননা "সারঙ্গেনাতিরংহসা" শব্দগুলির সুস্পষ্ট অর্থ 'মহাবেগগামী হরিণ দ্বারা আকৃষ্টচিত্ত'—সারঙ্গরাগ বা 'মধ্যমাদি-সারঙ্গ' নয়। তা'ছাড়া ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে অনুশীলন করলে দেখা যায় ভরতের সময় তো দূরের কথা, খৃষ্টীয় ৪র্থ-৫ম শতাব্দীতে বসন্তরাগের মতো সারঙ্গরাগেরও আদৌ সৃষ্টি হয় নি। আর সারঙ্গরাগের খাতিরে যদি 'সারঙ্গেণ' শব্দটির প্রত্যক্ষ ও সরল অর্থকে বিকৃত ক'রে 'সারঙ্গরাগেণ' অর্থ করা যায় তবে কালিদাসের সময়কে সঙ্গীত-রত্নাকরকার শার্ঙ্গদেবেরও (১৩শ শতাব্দী) পরবর্তী সময়ে নির্দিষ্ট করতে হয়,—যা সম্পূর্ণ অসংগত ও অযৌক্তিক। তারপর অধ্যাপক রাণাডে যে উল্লেখ করেছেন "or at least of Srāngdev right up to the present day" তাই বা সঙ্গত হয় কিভাবে। সারঙ্গ কিংবা মধ্যমাদি-সারঙ্গরাগ সঙ্গীত-রত্নাকরের তালিকায়ও পাওয়া যায় না। কাজেই অধ্যাপক রাণাডের সিদ্ধান্ত মোটেই সমীচীন হয় নি ব'লে আমাদের ধারণা। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ও অধ্যাপক রাণাডের অভিমত স্বীকার করেন নি। তিনি অধ্যাপক রাণাডের অসঙ্গতিটি ভিন্নভাবে প্রমাণ ক'রে বলেছেন: "If it could be proved, then the history of the evolution of the Rāgas could be pushed back by several centuries" (—Vide *The Journal of the Music Academy*, Madras, Vol. XII, 1941, pp. 89-91).

॥ শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকে সঙ্গীত ॥

শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক'-নাটক দৃশ্যকাব্যের পর্যায়ভুক্ত ছিল। 'মৃচ্ছকটিক' নাটকটি যদিও সঙ্গীতগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত নয় তবুও সঙ্গীতের উপাদান তার মধ্যে পাওয়া যায়। কাজেই সঙ্গীতের ইতিহাসে তার মূল্য কম নয়। মহাকবি কালিদাস অপেক্ষা শূদ্রকের আবির্ভাব-কাল নিয়ে মতানৈক্য বরং বেশী। ডাঃ কৃষ্ণমাচারিয়ার নানাভাবে বিচার ক'রে বলেছেন শূদ্রককে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর শেষের দিকের কবি বা নাট্যকার বলা যেতে পারে।[১] অনেকে খৃষ্টপূর্ব যুগেও শূদ্রকের সময় নির্দেশ করেন। ডাঃ মজুমদার বলেন শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক'-নাটকটি কালিদাসের আগে কিংবা পরে লেখা কিনা তা নির্ণয় করা কঠিন, তবে পূর্ববর্তী মতটিই সাধারণত গৃহীত হ'য়ে থাকে।[২] মাননীয় পিশেল (Pischel) 'লিম্পতীব তমোহঙ্গানি' কথাগুলির ওপর ভিত্তি ক'রে শূদ্রককে দণ্ডীর সমসাময়িক ও দণ্ডীকেই মৃচ্ছকটিকের আসল রচয়িতা বলেছেন। কিন্তু তা ঠিক নয়।

প্রধানত নাগরক চারুদত্ত ও বসন্তসেনাকে নিয়ে মৃচ্ছকটিকের পরিকল্পনাটি বাস্তবে পরিণত হয়েছে। কবিপ্রবর শ্রীশূদ্রকরাজ নাটকের মধ্যে সঙ্গীতের আলোচনা শুরু করেছেন "কৃতঞ্চ সঙ্গীতকং ময়া" শব্দগুলিকে দিয়ে। চারুদত্ত রেভিলের গান শুনে বলেন: "বয়স্য, সুষ্ঠু খল্বদ্য গীতং ভাব-রেভিলেন। * * রক্তঞ্চ নাম মধুরঞ্চ সমং স্ফুটঞ্চ ভাবান্বিতঞ্চ ললিতঞ্চ মনোহরঞ্চ" প্রভৃতি। রেভিলের গান বা গীতি অনুরাগের উদ্রেক করে; তা' মধুর, পূর্বাপর সমান— কোথাও ভাবের ব্যতিক্রম আনে না এবং সুস্পষ্ট, ভাবযুক্ত, কোমল ও চিত্তাকর্ষক; বর্ণের মূর্ছনার মধ্যে উচ্চ ('মূর্ছনান্তরগতং'), শেষে কোমল, অবলীলাক্রমে অবরুদ্ধ, রাগ দু'বার উচ্চারিত অর্থে রাগের আলাপের আবৃত্তি হয় ('রাগদ্বিরুচ্চারিতং') ও স্বরলহরী বীণা প্রভৃতি বাদ্যের সঙ্গে সুসংগত ('শ্লিষ্টঞ্চ তন্ত্রীস্বনং')। চারুদত্তের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় শূদ্রকের সময় সঙ্গীতের আলাপ ও অনুশীলন শাস্ত্রানুযায়ী ও নিয়মবদ্ধ ছিল। বীণা, বংশ (বেণু) ও মৃদঙ্গের ব্যবহার ছিল (বজ্রাদি বংসো * * পুণত্র কব্বি * * সারিজ্জদি বীণা')।

১। "On this consideration Śūdraka may be assigned to the end of the 1st century A.D."—Vide *History of Classical Sanskrit Literature*, p. 575.

২। "It is even difficult to say whether the play was written before or after Kālidās; but the former view is more generally accepted."

নারীরাও মৃদঙ্গবাদ্যে পারদর্শিনী ছিল। বংস> বংশ> বাঁশী তথা বেণুর সাতটি ছিদ্রে সাতটি স্বরের বিকাশ ছিল ('বংশ বাত্র শওচ্ছিদ্দং শুশব্দং বীণং বাত্র')। শূদ্রক ৫ম অঙ্কে তুম্বুরু ও নারদের নামোল্লেখ করেছেন ('তুম্বুলু নালদে বা')। মৃদঙ্গকে তিনি 'পণব' বলেছেন। ভরতও নাট্যশাস্ত্রে পণব ও পুষ্করকে মৃদঙ্গ-শ্রেণীভুক্ত ব'লে উল্লেখ করেছেন। সমবেত সঙ্গীতের তখন যথেষ্ট প্রচলন ছিল। শূদ্রক কখনো কখনো সঙ্গীতকে মেঘের শব্দের সঙ্গে তুলনা করেছেন ('মেঘস্তনিত')। মোটকথা 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে উল্লিখিত বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ, পণব, দর্দুর, নৃত্য, গীত, নাট্য, সমীকৃত সঙ্গীত এ'সমস্তই সুষ্ঠু সঙ্গীতানুশীলনের পরিচয় দেয়।

॥ পঞ্চতন্ত্রে সঙ্গীত ॥

কথা ও কাহিনীমূলক সাহিত্য বৌদ্ধ-অবদানমালায় ও জাতকে সঙ্গীত সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করেছি। সংস্কৃত 'পঞ্চতন্ত্র'ও কথা-কাহিনীসাহিত্যের অন্যতম। পঞ্চতন্ত্রের আসল পহ্লবী বা সংস্কৃত সংস্করণটি প্রাচীন—সম্ভবত খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে সংকলিত। বর্তমান সংস্করণটি প্রাচীনেরই সারসংকলন (?)। গ্রন্থটি বিশ্বের প্রায় সকল ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ডাঃ কিথ পঞ্চতন্ত্রের বর্তমান সংস্করণের রচনা বা সংকলন-কাল বলেছেন খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী।[১] অনেকে এ'টিকে খৃষ্টীয় শতাব্দীর সূচনায় রচিত বলতে চান। নানান্ দিক দিয়ে ও বিশেষ ক'রে পঞ্চতন্ত্রে সাঙ্গীতিক আলোচনার দিক থেকে গ্রন্থটিকে খৃষ্টীয় ২য় থেকে ৫ম শতাব্দীর কোন সময়ে রচিত ব'লে মনে হয়। তা'ছাড়া গ্রন্থকার বিষ্ণুশর্মা উল্লেখ করেছেন: "স্বয়মেবং পুরা প্রোক্তং ভরতেন শ্রুতেঃ পরম্"। 'ভরতেন' বল্‌তে সম্ভবত তিনি খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর নাট্যশাস্ত্রকার মুনি ভরতের নাম উল্লেখ করেছেন। তারপর তাঁর 'রসা নব' শব্দ-দু'টিও বিশেষ অর্থবোধক। ভরত নাট্যশাস্ত্রে আটটি রসের উল্লেখ করেছেন: "চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ" (৬।১৫)। শুধু তাই নয়, নাট্যের আদি-আচার্য দ্রুহিণ-ব্রহ্মাও যে আটটি রস স্বীকার করতেন এ'কথা ভরত উল্লেখ করেছেন: "এতে হ্যষ্টৌ রসাঃ প্রোক্তা দ্রুহিণেন মহাত্মনা" (৬।১৬)।

১। "* * it is not sufficient to assign it to the 2nd century A.D., at the earliest."—Dr. A. B. Keith: *Sanskrit Literature*, p. 245.

শান্তকে নবম রস হিসাবে গণ্য ক'রে ন'টি রসের প্রচলন হয়েছিল ভরতোত্তর কালে এবং পঞ্চতন্ত্রে 'রসা নব' উল্লেখ থাকায় বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গের অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম শতাব্দীর আগেই যে নব রসের প্রবর্তন ভারতীয় সমাজে হয়েছিল এ'কথা অনুমান করা অসমীচীন নয়। কেননা সামান্যভাবে হ'লেও বৃহদ্দেশীতে রাগলক্ষণ তথা অভিজ্ঞাত দেশীরাগের লক্ষণবর্ণনায় বোট্টরাগের পরিচয় দিতে গিয়ে মতঙ্গ শান্তরসের কথা উল্লেখ করেছেন: "বোট্টরাগঃ ষড়্‌জগ্রাম সম্বন্ধঃ ষড়্‌জমধ্যমাপঞ্চমীজাত্যোর্জাতত্বাৎ। * * নিষাদো অর্ত্ত কাকলী। পূর্ণস্বরশ্চায়ম্। উৎসবে চাস্য বিনিয়োগঃ। শান্তাদিকো রসঃ পঞ্চমাদিমূর্ছনা। আরোহীবর্ণঃ। প্রসন্নান্তোঽলংকারঃ। দক্ষিণে কলা বার্তিকে কলা চিত্রে কলা। স্বরপদগীতে চচ্চৎপুটাদিতালঃ।"[২] অবশ্য শান্তরসের উল্লেখ এই একবারই মাত্র বৃহদ্দেশীতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহলেও ঐতিহাসিক আলোচনার ক্ষেত্রে তার মূল্য বা অর্থ আছে। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে শার্ঙ্গদেবের সময়ে কেন,[৩] আচার্য অভিনবগুপ্তের সময়েই (খৃষ্টিয় ৯৫০ থেকে ৯৬০ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কাল) নবম সংখ্যার পরিপূরক হিসাবে শান্তরসের আবির্ভাব দেখা দেয় (যদিও অভিনবগুপ্ত ভরত-সমর্থিত আটটি রসকে কোন প্রকারে সমর্থনও করেছেন)। সুতরাং পঞ্চতন্ত্রে নবম রস হিসাবে শান্তের উল্লেখ থাকায় বিষ্ণুশর্মা যে ভরতোত্তর কালের কথাসাহিত্যিক তা বোঝা যায়।

পঞ্চতন্ত্র কথাসাহিত্য, তাই তার আর একটি নাম 'পাঞ্চোপাখ্যান'। কথা-সাহিত্যের প্রধানত উত্তর-পশ্চিম, কাশ্মীর, জৈন ও দক্ষিণ এই কতকগুলি সংস্করণের প্রচলন দেখা যায়। উত্তর-পশ্চিম-সংস্করণের নিদর্শন হিসাবে আমরা পাই 'বৃহৎকথামঞ্জরী' ও 'কথাসরিৎসাগর', এবং 'তন্ত্রাখ্যায়িকা' নামে দু'টি কাশ্মিরী-সংস্করণ, কাশ্মিরীর মতো দু'টি জৈন-সংস্করণ এবং দক্ষিণী সংস্করণ হিসাবে 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশ'-এর নিদর্শন পাই। গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা' পৈশাচীভাষায় লেখা হ'লেও তা কাহিনীসাহিত্যের মধ্যে অন্যতম।[৪] তবে বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্রের সমাদর ও প্রচারই সম্ভবত অধিক। মাননীয় হার্টেল (Hertel)

২। বৃহদ্দেশী (ত্রিবান্দ্রম্-সংস্করণ), পৃঃ ৯৬

৩। শার্ঙ্গদেব রস-সংখ্যার ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন: " * * শান্তো নবমোঽপি রসো মতঃ" (৭।১৩৬৯)।

৪। Vide *The History and Culture of the Indian People* (The Classical Age), Vol. III, p. 314.

উল্লেখ করেছেন প্রায় বিভিন্ন ভাষায় দু'শোরও বেশী সংস্করণ এক পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থটিরই হয়েছে। খৃষ্টীয় ৫৩১—৫৭৯ শতাব্দীতে করটক ও দমনকের ভণিতায় পহ্লবীভাষায় ও খৃষ্টীয় ৭৫০ শতাব্দীতে সিরিয়াক ও আরবীভাষায় পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ হয়। এ'সম্বন্ধে পূর্বে জাতকের আলোচনায় আমরা উল্লেখ করেছি।

'পঞ্চতন্ত্র' সঙ্গীতের গ্রন্থ নয়, কিন্তু গীতরত গর্দভ ও শৃগালের মাধ্যমে বিষ্ণুশর্মা যে সাঙ্গীতিক উপাদনের পরিচয় দিয়েছেন তা সঙ্গীতের ইতিহাসে মূল্যবান। সাহিত্যে, কাব্যে, নাটকে বা কথাকাহিনীতে ও প্রবাদে যে-সব সাংস্কৃতিক উপাদানের পরিচয় পাই সে'গুলি সেই সেই সময়ের সমাজেরই চিন্তাধারার প্রতিকৃতি মাত্র। সুতরাং বিষ্ণুশর্মা পঞ্চতন্ত্র বা পঞ্চোপাখ্যানের প্রসঙ্গে যে সঙ্গীতের পরিচয় দিয়েছেন তা খৃষ্টীয় ২য় থেকে ৫ম শতাব্দীর সমাজেরই সঙ্গীতচিন্তার অনুলেখন বা প্রতিফলন।

সঙ্গীতের প্রসঙ্গে পঞ্চতন্ত্রের কাহিনীটি হ'ল: গীতরত গর্দভকে শৃগাল গীতরসে বঞ্চিত ব'লে তিরস্কার করলে গর্দভ ক্রুদ্ধ হ'য়ে ব'ল্লে: ধিক্ মূর্খ, আমি সঙ্গীত জানিনা ব'লে তুমি আমায় তিরস্কার করছ? তবে শোন—গানের কথা আমি বলি: "কিমহং ন জানামি গীতম্? তদ্‌যথা তস্য ভেদাঃ শৃণু:—

সপ্ত স্বরাস্ত্রয়ো গ্রামা মূর্ছনাশ্চৈকবিংশতিঃ।
তানাস্ত্যেকোনপঞ্চাশত্তিস্রো মাত্রা লয়স্ত্রয়ঃ॥
স্থানত্রয়ং যতীনাং চ ষড়াস্যানি রসা নব।
রাগাঃ ষট্‌ত্রিংশতির্ভাবাশ্চত্বারিংশত্ততঃ স্মৃতাঃ॥
পঞ্চাশীত্যধিকং হ্যেতদ্গীতাঙ্গানাং শতং স্মৃতম্।
স্বয়মেবং পুরা প্রোক্তং ভরতেন শ্রুতেঃ পরম্॥

ষড়্‌জাদি সাতটি লৌকিক স্বর; ষড়্‌জ, মধ্যম ও গান্ধার তিন গ্রাম, একুশ মূর্ছনা, ঊনপঞ্চাশ তান, হ্রস্বাদি তিন মাত্রা, মন্দ্রাদি তিন স্থান, বিলম্বিতাদি তিন লয়, তিন যতি, নয় রস, ছত্রিশটি রাগ, চল্লিশটি ভাব ও একশো পচাশীটি (১৮৫) গীতাঙ্গ। উপাদানগুলির বেশীর ভাগই ভরতের নাট্যশাস্ত্রে পাওয়া যায়। তিন গ্রামের কথা বিষ্ণুশর্মা কেন, শার্ঙ্গদেব (১৩শ শতাব্দী) পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন: "তৌ দ্বৌ ধরাতলে তত্র সাং ষড়্‌জগ্রাম আদিমঃ দ্বিতীয়ো মধ্যমগ্রামঃ * *। গান্ধারগ্রামাচষ্ট তদা তং নারদো মুনিঃ" (১।৪।১-৫)। কিন্তু খৃষ্টীয় শতাব্দীতে দু'টি গ্রামের মাত্র প্রচলন ছিল। একুশটি মূর্ছনা = গ্রাম ৩ × প্রত্যেকটিতে ৭ = ২১ সংখ্যক হ'লেও ষড়্‌জ ও মধ্যম গ্রাম-দু'টির মূর্ছনাদেরই মাত্র প্রয়োগ ও

ব্যবহার ছিল। সাত স্বরের আরোহণ ও অবরোহণের ক্রমসংস্থত রূপই 'মূর্ছনা': "ক্রমাৎস্বরাণাং সপ্তানামারোহশ্চাবরোহণম্" (রত্নাকর ১।৪।৯)। ষড়্জগ্রামে উত্তরমন্দ্রা, রজনী, উত্তরায়তা, শুদ্ধষড়্জা প্রভৃতি এবং মধ্যমগ্রামে সৌবীরী, হরিণাশ্বা প্রভৃতি মূর্ছনা।[৫] কিন্তু মূর্ছনার বেলায় বিষ্ণুশর্মা শিক্ষাকার নারদকে অনুসরণ করেছেন ব'লে মনে হয় ('মূর্ছনাশ্চৈকবিংশতিঃ')। কেননা ভরত পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন: "অথ মূর্ছনা দ্বৈগ্রামিক্যশ্চতুর্দশ। তদ্ যথা—"। মূর্ছনার সংখ্যা তিনি চৌদ্দটি বলেছেন, একুশটি নয়। নারদ বরং নারদীশিক্ষায় উল্লেখ করেছেন: "সপ্ত স্বরাস্ত্রয়ো গ্রামা মূর্ছনাস্ত্বেকবিংশতিঃ" (২।৪)। বিষ্ণুশর্মার আরম্ভ-শ্লোকটির ভাষাও প্রায় একই রকমের: "সপ্ত স্বরাস্ত্রয়ো গ্রামা মূর্ছনাশ্চৈকবিংশতিঃ"। সুতরাং তিনটি গ্রামের মূর্ছনার নাম নারদের (১ম) মতো বিষ্ণুশর্মা বলতে চেয়েছেন,

গান্ধারগ্রাম {
নন্দী বিশালা সুমুখী চিত্রা চিত্রাবতী সুখা।
বলায়া (?) চাথ বিজ্ঞেয়া দেবানাং সপ্তমূর্ছনাঃ ॥

মধ্যমগ্রাম {
আপ্যায়িনী বিশ্বভৃতা চন্দ্রা হেমা কপর্দিনী।
মৈত্রী বার্হতী চৈব পিতৃণাং সপ্তমূর্ছনাঃ ॥

ষড়্জগ্রাম {
ষড়্জে তূত্তরমন্দ্রা স্যাদৃষভে চাভিরুদ্গতা।
অশ্বক্রান্তা তু গান্ধারে তৃতীয়া মূর্ছনা স্মৃতা ॥
মধ্যমে খলু সৌবীরা হৃষ্যকা পঞ্চমে স্বরে।
ধৈবতে চাপি বিজ্ঞেয়া মূর্ছনা তূত্তরায়তা ॥
নিষাদাদ্রজনীং বিদ্যাদৃষীণাং সপ্তমূর্ছনা।
উপজীবন্তি গন্ধর্বা দেবানাং সপ্তমূর্ছনাঃ ॥

নারদ বলেছেন দেবতাদের মূর্ছনাই গন্ধর্বদের জন্য অভিপ্রেত। সুতরাং তিনটি গ্রামের একুশটি মূর্ছনা হ'ল:

গান্ধারগ্রামে—নন্দী, বিশালা, সুমুখী, চিত্রা, চিত্রবতী, সুখা ও বলা (মতান্তরে আলাপা)।

মধ্যমগ্রামে—আপ্যায়নী, বিশ্বভৃতা (মতান্তরে বিশ্বকৃতা ?), চন্দ্রা, হেমা, কপর্দিনী মৈত্রী ও বার্হতী (মতান্তরে চান্দ্রমসী)।

৫। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সংস্করণ) ২৮।২৭-৩১, এবং সঙ্গীত-রত্নাকর ১।৪।৯-২০ দ্রষ্টব্য।

ষড়্‌জগ্রামে—উত্তরমন্দ্রা (মতান্তরে উত্তরবর্ণা ?), অভিরুদ্‌গতা, অশ্বক্রান্তা, সৌবীরা (সৌবীরী ?), হৃষ্যকা, উত্তরায়তা ও রজনী।[৬]

নারদ (১ম) ষড়্‌জগ্রামকেই প্রাধান্য দিয়েছেন তার প্রত্যেকটি স্বরের নির্দিষ্ট মূর্ছনার উল্লেখ ক'রে। বিষ্ণুশর্মা কিন্তু কোন মূর্ছনারই নামোল্লেখ করেন নি, কেবল 'একবিংশতি' এই সংখ্যার কথাই বলেছেন।

বিষ্ণুশর্মা উনপঞ্চাশটি তানের কথা বলেছেন। তানের বেলায়ও শিক্ষাকার নারদের সঙ্গে পঞ্চতন্ত্রকারের মিল পাওয়া যায়। তানের প্রসঙ্গে নারদ (১ম) উল্লেখ করেছেন,

বিশতিং (?) মধ্যমগ্রামে ষড়্‌জগ্রামে চতুর্দশ।
তানান্ পঞ্চদশেচ্ছন্তি গান্ধারগ্রামমাশ্রিতান্॥

অর্থাৎ মধ্যমগ্রামে—২০ + ষড়্‌জগ্রামে—১৪ + গান্ধারগ্রামে—১৫ = ৪৯। নাট্য-শাস্ত্রকার ভরত বলেছেন: "তত্র মূর্ছনাতানাশ্চতুরশীতিঃ" (২৮।৩৩) এবং উনপঞ্চাশটি ষাড়্‌ব তথা ছ'টি স্বরের তান। শার্ঙ্গদেব ভরতকে অনুসরণ ক'রে বলেছেন: "এতে চৈকোনপঞ্চাশদুভয়ে ষাড়বা মতাঃ"। ভরত উল্লেখ করেছেন: "তত্রৈকোনপঞ্চাশৎ ষট্‌স্বরাঃ"।

হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত এই তিন মাত্রা। বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত তিন লয়। মন্দ্র, মধ্য ও তার তিন স্থান। সমা, স্রোতোগতা ও গোপুচ্ছা তিন যতি। শার্ঙ্গদেব বলেছেন বিলম্বিতাদি তিনটি লয়ের প্রয়োগবিধির নাম 'যতি': "লয়প্রবৃত্তিনিয়মো যতিরিত্যভিধীয়তে" (৫।৪৬)। বিষ্ণুশর্মা উল্লেখ করেছেন "ষড়াস্যানি"। এর অর্থ রহস্যময় ব'লে মনে হয়, কেননা ছ'টি আস্য বা মুখ বলতে তিনি ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছেন তা বলা কঠিন। শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত এই ন'টি রস। নাট্যশাস্ত্রে ভরত ভাব, বিভাব, অনুভাব প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেছেন ও সে' সম্বন্ধে আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। ভাবের উল্লেখ ক'রে ভরত বলেছেন: "অত্রাহ—ভাবা ইতি কস্মাৎ? কিং ভাবয়ন্তীতি ভাবাঃ? উচ্যতে রাগঙ্গসত্ত্বোপেতান্ কাব্যার্থান্ ভাবয়ন্তীতি ভাবাঃ। ভাব ইতি কারণসাধনং যথা ভাবিতো বাসিতঃ কৃত ইত্যর্থান্তরম্"। অর্থাৎ ভাবকে অবস্থা (মনের) বলে কেন? যেহেতু তা বিস্তৃত হয় (ভাবয়ন্তি), আর তারি জন্য তাকে অবস্থা বলে। ভাবকে অবস্থা বলা হয় এ'জন্য—কথা, আকার-ইঙ্গিত ও আবেগ বা মনোবৃত্তির প্রকাশের

৬। মতান্তরে বলতে শার্ঙ্গদেবের অভিমতে। সঙ্গীত-রত্নাকর ১।৪।২৩-২৬ দ্রষ্টব্য।

মাধ্যমে অভিনয়ের (নাট্যের) ভাবধারা শ্রোতাদের মনে ছড়িয়ে দেওয়া বা সংক্রমিত করা হয়। সুতরাং ভাব মাধ্যম, কারণ বা যন্ত্রবিশেষ, আর তারি জন্য 'ভাবিত', 'বাসিত' বা 'কৃত' প্রভৃতি শব্দগুলির মধ্যে কোন ভেদ নাই, তারা পরিভাষায় পৃথক হ'লেও একই অর্থের প্রকাশক। সুতরাং 'ভাব্য' অর্থে বিস্তৃত, বিকশিত বা সংক্রমিত করা বোঝায়। রস থেকে উদ্ভূত ভাবের অর্থই তাই। ভরতও বলেছেন : "অপি চ ব্যাপ্ত্যর্থম্" কিংবা—

বিভাবেনাহৃতো যোঽর্থস্ত্বনুভাবেন গম্যতে।
বাগঙ্গসত্ত্বাভিনয়ৈঃ ভাব ইতি সংজ্ঞিতঃ ॥

'বিভাব' অর্থে ভরত বলেছেন বিজ্ঞান বা বিশেষ জ্ঞান : "বিভাবো বিজ্ঞানার্থম্"। বিভাব, কারণ, নিমিত্ত ও হেতু সমপর্যায়ভুক্ত শব্দ। অনুভাব বিষয়বস্তুকে বোঝার বা গ্রহণ করার বিষয়ে সাহায্য করে। স্থায়ি, ব্যভিচারি ও সাত্ত্বিক ভাব সম্বন্ধে ভরত বলেছেন স্থায়িভাব আটটি, ব্যভিচারি ভাব তেত্রিশটি ও সাত্ত্বিকভাব আটটি। কাব্যরসকে অনুভব করার জন্য এই উনপঞ্চাশটি ভাবের প্রয়োজন হয় : "এবমেতে কাব্যরসাভিব্যক্তিহেতব একোনপঞ্চাশৎ ভাবাঃ প্রত্যবগন্তব্যাঃ।" ভরত উল্লেখ করেছেন অগ্নি যেমন শুষ্ক কাষ্ঠের সমস্ত অংশকে গ্রাস ক'রে (ব্যেপে) প্রজ্জলিত করে তেমনি রস থেকে উদ্ভূত ভাব মানুষ কেন—সমস্ত জীবজন্তুর অন্তঃকরণকে আচ্ছন্ন করে।[৭] লবণ বা চিনির উদাহরণও দেওয়া যেতে পারে, কেননা লবণ বা চিনিকে জলে ফেলে দিলে তা জলের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুর সঙ্গে একীভূত হ'য়ে যায়। রস থেকে উদ্ভূত ভাবও ঠিক তাই।

বিষ্ণুশর্মা পঞ্চতন্ত্রে সঙ্গীতের আলোচনায় রসের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু রসানুযায়ী ভাবের কথা কিছু বলেননি। আমরা অবশ্য 'রসা নব' শব্দ-দু'টির সম্পর্কে ভাব, বিভাব, অনুভাবাদি সম্বন্ধে ভরতের মতেরই পুনরাবৃত্তি করলাম এ'জন্য যে বিষ্ণুশর্মা রসের অপরিচ্ছেদ্য পরিণতি ভাবের কথা উল্লেখ না করলেও সঙ্গীতে ভাব ও তার বিচিত্র বিকাশের উপযোগিতা নিশ্চয়ই স্বীকার করতেন।

বিষ্ণুশর্মা ছত্রিশটি রাগ, চল্লিশটি ভাবরাগ (ভাষারাগ ?) ও একশো' পচাশীটি (১৮৫টি) অঙ্গরাগের উল্লেখ করেছেন। মোটকথা পঞ্চতন্ত্রকার তিন শ্রেণীর রাগের কথা বলেছেন। মতঙ্গ বৃহদ্দেশীতে জাতিরাগ>গ্রামরাগ> ভাষারাগ>

৭। যোঽর্থো হৃদয়সংবাদী তস্য ভাবো রসোদ্ভবঃ।
শরীরং ব্যাপ্যতে তেন শুষ্কং কাষ্ঠমিবাগ্নিনা।
—নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ৭।৭

বিভাষারাগ>অন্তরভাষারাগ এই পাঁচ শ্রেণীর রাগের কথা উল্লেখ করেছেন। কল্লিনাথ প্রভৃতি সঙ্গীতগুণীর মতে এ'গুলি গান্ধর্বশ্রেণীর গান হিসাবে গণ্য। কিন্তু পঞ্চতন্ত্রকার রাগ, ভাব ও অঙ্গ বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন তা নির্ণয় করা দুরূহ। অথচ তাঁর সময়ে অভিজাত দেশীরাগের অনুশীলন আরম্ভ হয়েছে। অনেকে ছত্রিশ রাগের অর্থসঙ্গতি দেখাতে চান হনুমনের ৬ রাগ+৩০ রাগিণী=৩৬ রাগ এই ধরনের অর্থ ক'রে। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে তখনও 'রাগিণী' এই স্ত্রীলিঙ্গযুক্ত রাগশ্রেণীর সৃষ্টি হয় নি। রাগ ও রাগিণী—সামাজিকী পুরুষ ও স্ত্রী প্রকৃতিসম্পন্ন রাগের (রাগবিভাগের) ঠিক ঠিক বিকাশ খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর আগে হয় নি। সুতরাং পঞ্চতন্ত্রকারের সময়ে 'রাগ'-শব্দে রাগ-রাগিণী অর্থ করা সম্পূর্ণ ভুল। হার্বার্ড-অরিয়েণ্টল-সিরিজে (১১-১৪ নং) জোহেন্স হার্টেল-অনূদিত ইংরাজী-সংস্করণ-পঞ্চতন্ত্রে সাঙ্গীতিক অংশের ব্যাখ্যা একটু বিচিত্র রকমের। মাননীয় হার্টেল 'রাগাঃ ষট্‌ত্রিংশতিঃ' শব্দগুলির অর্থ করেছেন: "thirty-six variations of the melody (*varṇa*)"। 'ভাবাশ্চত্বারিংশৎ' শব্দটির অর্থ "forty minor melodis"; 'পঞ্চাশীত্যধিকং হেতদ্গীতাঙ্গানাং শতং' শব্দগুলির অর্থ "the mode of singing will embrace all the 185 parts of song, pure as gold"; 'ষড়াস্থানি' শব্দের অর্থ করেছেন "six ways of singing"।

পঞ্চতন্ত্রকার বিষ্ণুশর্মা সাঙ্গীতিক উপাদানের যে পরিচয় দিয়েছেন তা গুপ্তযুগীয় সমাজের। ভরত থেকে আরম্ভ ক'রে কোহল, যাষ্টিক, দত্তিল, নন্দিকেশ্বর প্রভৃতির অবদান ও অনুশীলন সঙ্গীত-সাধনার জগতে তখন নবচেতনা সৃষ্টি করেছে। বিষ্ণুশর্মা-বর্ণিত রাগগুলির সঠিক পরিচয় পাওয়া না গেলেও ক্রমবিকশিত অভিজাত রাগগুলি গান্ধর্ব-সঙ্গীতের অনুপ্রেরণায় যে এক নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল তা বোঝা যায়। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের সুশাসনে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে তখন এক নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল। ললিতকলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও দর্শনের নতুন অভিযান ক্ল্যাসিক্যাল যুগকে আরো মহিমামণ্ডিত করেছিল।

মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত ও চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যই অবশ্য এই নবজাগরণ এনেছিলেন ভারতীয় সমাজে। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য প্রায় তেত্রিশ বছরেরও বেশী সগৌরবে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর মৃত্যু হয় সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ৪১৩ কিংবা ৪১৫ খৃষ্টাব্দে। তাঁর মৃত্যুর পর কুমারগুপ্ত পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কুমারগুপ্ত চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের প্রধানা-মহিষী ধ্রুবদেবীর পুত্র। মহারাজ

কুমারগুপ্ত চল্লিশ বছরেরও বেশী রাজত্ব করেন। তিনিও তাঁর পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে একটি বিরাট অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। বৈদিক সামগান সে অনুষ্ঠানটির পরিবেশ পবিত্র করেছিল। দেবকুমার কার্তিকেয় বা সুব্রহ্মণ্য-দেবতার তিনি উপাসক ছিলেন। সঙ্গীতাদি ললিতকলার তিনি পৃষ্টপোষক ছিলেন। তাঁর রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে সঙ্গীতশালা ও নাট্য-গৃহে নৃত্য, গীত, বাদ্য ও অভিনয়ানুষ্ঠানে পুরুষ ও নারী সকলেই যোগদান ক'রে শিল্পকলার অনুশীলন ও আনন্দ উপভোগ করতে সুযোগ পেত।

মহারাজ কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর স্কন্দগুপ্ত পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বিদেশী শ্বেত-হূণদের আক্রমণ শুরু হয় ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে। ঐ সময়ে গান্ধারদেশ তাদের হস্তগত হয়। স্কন্দগুপ্তও হূণদের বিরুদ্ধে অভিযান করেছিলেন। হূণরা সে' সময়ে পারস্যদেশেও অভিযান শুরু করে। সম্ভবত খৃষ্টীয় ৪৬৭ শতাব্দীতে মহারাজ স্কন্দগুপ্তের মৃত্যু হয়। স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে সঙ্গীত প্রভৃতি চারুকলার অনুশীলনে বিশেষ কিছু নতুন ঘটনা ঘটে নি।

গুপ্তরাজাদের সময়ে কিংবা খৃষ্টীয় ৫৪২ অব্দের আগেই দাক্ষিণাত্যে বাতাপী বা বাদামীতে প্রবল পরাক্রান্ত চালুক্যরাজাদের অভ্যুদয় হয়। তাদের মধ্যেও সঙ্গীত, অন্যান্য ললিতকলা ও চারুশিল্পের যথেষ্ট অনুশীলন ছিল। তা'ছাড়া খৃষ্টীয় ৩৭৬ অব্দের আগে মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত দাক্ষিণাত্যের কোন কোন অঞ্চলে রাজ্যবিস্তার করেছিলেন। সেই রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ও দক্ষিণী সভ্যতা এবং সংস্কৃতির মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু তখনও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে উত্তর ও দক্ষিণ এ'ধরণের কোন সীমারেখার বেষ্টনী সৃষ্টি হয় নি, ভারতীয় সঙ্গীতের রূপ ও বিকাশ উভয় দেশের মধ্যে একই রকমের ছিল। গুপ্তযুগের আগেই দাক্ষিণাত্যে আভীরজাতি, নাসিক ও বেরারে বাকাটকজাতি, নাসিকে পল্লব ও বৈজয়ন্তীতে কদম্বদের মধ্যে সাহিত্য ও সঙ্গীতের যথেষ্ট চর্চা ছিল। সাহিত্যে বৈদর্ভীরীতির প্রচলন নাকি বিদর্ভের বাকাটকদের রাজদরবার থেকেই হয়। অজন্তার কয়েকটি মূল্যবান ফ্রেস্কোচিত্রও বাকাটক-রাজাদের রাজত্বকালে অঙ্কিত হয়েছিল ও ঐসকল চিত্রাঙ্কনের পিছনে নাকি তাঁদের অনুপ্রেরণ ছিল অজস্র। দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়জাতির দান দ্রাবিড়ীরাগ ও আভীরজাতির আভীরী (চলিত ভাষায় আহীরী)-রাগ অভিজাত দেশী-সঙ্গীতে উল্লেখযোগ্য। মতঙ্গ 'বৃহদ্দেশী'-গ্রন্থে আভীরীরাগকে আভীরদেশ (?) থেকে আমদানী বলেছেন: "আভীরী-

দেশসম্ভবা"। জাতি ও দেশের নামানুসারে জাতীয় ও আঞ্চলিক সুরগুলিকে অভিজাত রাগপর্যায়ভুক্ত করার মহাযজ্ঞ এর অনেক আগে থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। তারই পরিণতি স্বরূপ কর্ণাটদেশ থেকে কর্ণাট বা কর্ণাটী (কানাড়া?) সৌরাষ্ট্রদেশ থেকে সৌরাষ্ট্রী, পুলিন্দজাতি থেকে পুলিন্দিকা, অন্ধ্রদেশ থেকে আন্ধ্রীর বিকাশ হয়। তা'ছাড়া গুজরাটের গুর্জরজাতির দান গুর্জরী, দক্ষিণ-বিহারের মৌখরিজাতির দান মুখারী, সিন্ধুদেশের অবদান সৈন্ধবী, গান্ধারদেশ থেকে গান্ধারী বা গান্ধারিকা, কোশলদেশ থেকে কৌশলী প্রভৃতি রাগের নামও উল্লেখযোগ্য।

তখন (গুপ্তযুগে) কনৌজ, কাশ্মীর ও গৌড়ের সংস্কৃতিগরিমা ভারতের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। মৌখরীরাজ প্রভাকরবর্ধন থানেশ্বরের পুষ্যাবতীবংশের ধারক। তিনি সঙ্গীতাদি ললিতকলার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর থানেশ্বরের রাজপ্রাসাদে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে প্রমোদগৃহ নির্মিত ছিল। প্রমোদগৃহগুলিতে সঙ্গীতশালা, প্রেক্ষাগৃহ, চিত্রশালা প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। অভিজাতবংশীয় রাজন্যবর্গ ও রাজপুরনারীরা সঙ্গীতাদি কলার সাধক ও সাধিকা ছিলেন। গায়ক ও বাদকেরা সঙ্গীতশালায় নিযুক্ত থাকত। তা'ছাড়া সঙ্গীতাদি কলায় পারদর্শী শিল্পী, নট ও নটীরা রাজদরবারের শোভা বৃদ্ধি করত। দেহসজ্জা ও প্রসাধনবৈচিত্র্যও যে তখনকার নাগরিকসমাজে ছিল না তা নয়, তবে সব-কিছুরই প্রচলন ছিল ললিতকলা ও চারুশিল্পচর্চার মান ও মাধুর্যকে গৌরবমণ্ডিত করতে।[৮]

॥ মতঙ্গ ও বৃহদ্দেশী ॥

ত্রিবান্দ্রম থেকে প্রকাশিত বৃহদ্দেশীর সম্পাদক কে. সাম্বশিব শাস্ত্রী উল্লেখ করেছেন রামায়ণ, মহাভারত, মতঙ্গলীলা, কালিদাসের রঘুবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে মতঙ্গের নামের উল্লেখ আছে: যেমন রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে (৭৩ সর্গ, ৫৩-৫৫ শ্লোক), "ঋষেস্তত্র মতঙ্গস্য", মহাভারতের সভাপর্বে (৮ম অধ্যায়, ২৯ শ্লোক) "অগস্ত্যোঽথ মতঙ্গস্য", কালিদাসের রঘুবংশে (৫ম সর্গ, ৫৩-৫৫ শ্লোক) "মতঙ্গ-শাপাদবলোপমূলাদবাপ্তবানস্মি মতঙ্গজত্বম্" প্রভৃতি। রামায়ণে সঙ্গীতের প্রসঙ্গে মতঙ্গ সম্বন্ধে পূর্বে কিছুটা আলোচনা করেছি। মনে রাখা উচিত যে মতঙ্গ মুনি, ঋষি বা সঙ্গীতশাস্ত্রী ছিলেন, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ী অমর ছিলেন না এবং একই মতঙ্গের

৮। "Indeed, whatever was done to beautify the body and the soul during this period was raised to the standard of *lalitakalā* or fine art * *."—*The History and Culture of the Indian People*, Vol. III.

পক্ষে খৃষ্টপূর্ব ৪০০ শতক থেকে খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম শতাব্দী পর্যন্ত সময়ের ব্যবধানে বেঁচে থাকাও সম্ভব নয়। কাজেই মতঙ্গ নামে বিভিন্ন মুনি বা গুণীর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অভ্যুদয় হওয়াই স্বাভাবিক।

আমরা অভিজাত দেশী-সঙ্গীতের ('বৃহদ্দেশী') গ্রন্থকার মতঙ্গের প্রসঙ্গ নিয়েই এখানে আলোচনা করছি। নানান্ দিক থেকে বিচার ক'রে সঙ্গীতগুণী ও ঐতিহাসিকরা তাঁর অভ্যুদয়-কাল নির্ধারণ করেছেন খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে কিংবা ৫ম থেকে ৭ম শতাব্দীর কোন এক সময়ে। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর গুণী এবং তাঁর পরবর্তীকালে গান্ধর্বসঙ্গীতের স্থানে যেভাবে ও ধারায় দেশী তথা জাতীয় ও আঞ্চলিক সুরগুলি অভিজাত মার্গপ্রকৃতি-সম্পন্ন রাগপর্যায়ভুক্ত হ'তে আরম্ভ হয়েছিল সেই ধারা ও সময়ের পর্যালোচনা করলে বৃহাদ্দশীকার মতঙ্গকে খৃষ্টীয় ৫ম কিংবা খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম শতাব্দীর সঙ্গীতগুণী ব'লে অনুমান করা যেতে পারে। অবশ্য দামোদরগুপ্ত-প্রণীত 'কুট্টনিমতম্' গ্রন্থে (৮৫৪ শ্লোক) একজন বংশীবাদননিপুণ মতঙ্গের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়: "সুষিরস্বরপ্রয়োগে প্রতিপাদনপণ্ডিতো মতঙ্গমুনিঃ"। দামোদরগুপ্ত সম্ভবত খৃষ্টীয় ৮ম-৯ম শতাব্দীর গুণী, কেননা কহ্লন রাজতরঙ্গিণীতে উল্লেখ করেছেন দামোদরগুপ্ত কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের (৭৭৯-৮১৩ খৃষ্টাব্দ) সভাকবি ও মন্ত্রণাদাতা ছিলেন। আমাদের অনুমান দামোদরগুপ্ত-কর্তৃক উল্লিখিত বংশীবাদনবিশারদ মুনি মতঙ্গই 'বৃহদ্দেশী' গ্রন্থের রচয়িতা। 'মুনি' একটি সম্মানসূচক উপাধি। জ্ঞানী বা জ্ঞানবৃদ্ধ গুণীমাত্রকেই মুনি, শাস্ত্রী, পণ্ডিত প্রভৃতি উপাধিতে সম্বোধন করার রীতি ছিল। অভিনবগুপ্তও (৯৫০-৯৬০ খৃষ্টাব্দ) 'অভিনবভারতী'-ভাষ্যের সুষিরাধ্যায়ে মতঙ্গকে 'বেণুনিপুণ' ব'লে উল্লেখ করেছেন: 'পূর্বং ভগবন্মহেশ্বরারাধনং মতঙ্গমুনিপ্রভৃতিভিঃ বেণুমিতং ততো বংশ ইতি প্রসিদ্ধঃ"। তাঞ্জোর-গ্রন্থাগারে নাকি জয়সিংহ (খৃঃ ১২৫৩)-রচিত 'নৃত্তরত্নাবলী' নামে একটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে ও তাতে মতঙ্গের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। মতঙ্গের বৃহদ্দেশীতে নিশ্চয়ই বাদ্য সম্বন্ধে একটি অধ্যায় ছিল, কিন্তু বর্তমান ত্রিবান্দ্রম-সংস্করণে মাত্র নাদোৎপত্তি, শ্রুতিনির্ণয়, স্বরনির্ণয়, মূর্ছনা, তান, বর্ণ, অলংকার, জাতি, রাগলক্ষণ, ভাষা-লক্ষণ ও প্রবন্ধ ব্যতীত আর কোন অধ্যায়ের (বাদ্য বা নৃত্য) আলোচনা নাই। তবে বর্তমানে মুদ্রিত গ্রন্থটি যে অসম্পূর্ণ তা মতঙ্গের ৫১১নং সমাপ্তি-শ্লোকটি পড়লেই বোঝা যায়। শেষ শ্লোকটি হ'ল:

বিবুধানাং বিনোদায় প্রবন্ধাঃ কথিতা ময়া।
ইদানীং কথয়িষ্যামি বাদ্যস্য নির্ণয়ো যথা॥

কিন্তু বাদ্য সম্বন্ধে অধ্যায়টি ত্রিবান্দ্রম-সংস্করণে নাই তা আগেই বলেছি। ডাঃ রাঘবনও কোন একটি প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে ত্রিবান্দ্রম-সংস্করণটি সত্যই অসম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ আকারের বৃহদ্দেশীর পাণ্ডুলিপি নাকি পাওয়া গেছে। ডাঃ কৃষ্ণমাচারিয়ার বলেছেন বিস্তৃতভাবে দেশী-সঙ্গীতের গ্রন্থ 'বৃহদ্দেশী' নামটি থেকে সাধারণভাবে অনুমান করা যেতে পারে 'লঘুদেশী' নামেও হয়তো মতঙ্গের নিজের অথবা অন্য কোন গুণীর লিখিত একখানি গ্রন্থ ছিল। কিন্তু এ' অনুমানের কোন ভিত্তি আছে ব'লে আমরা মনে করি না। শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীসুশীলকুমার দে তাঁর 'সাংস্কৃট্ পোয়েটিক্স' গ্রন্থে লক্ষ্মণভাস্কর-প্রণীত 'মতঙ্গভরত' নামে একটি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তার কোন চাক্ষুষ প্রমাণ তিনি দেন নি। তবে ভাস্করলক্ষ্মণ-প্রণীত 'লক্ষ্মণভরত' নামে একটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি নাকি পাওয়া গেছে। কিন্তু সে'টি অভিনয়ের গ্রন্থ, নৃত্য, গীত বা বাদ্য সম্বন্ধে কোন আলোচনা তাতে নাই।

মতঙ্গ তাঁর বৃহদ্দেশীতে কশ্যপ, ভরত, কোহল, যাষ্টিক, শার্দুল, দত্তিল, দুর্গাশক্তি, নন্দিকেশ্বর, নারদ, ব্রহ্মা, বিশ্বাবসু, বল্লভ (?), মহেশ্বর (সদাশিব-ভরত?) প্রভৃতি পূর্ব-পূর্ব আচার্যদের নামোল্লেখ করেছেন এবং তা' থেকেও প্রমাণ হয় যে তিনি ভরত, কোহল, যাষ্টিক, শার্দুল, দত্তিল, নন্দিকেশ্বর প্রভৃতি গুণীদের পরবর্তী। আর তিনি ব্রহ্মা, নারদ প্রভৃতি আচার্যদের পরবর্তী তো বটেই।

খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে নাট্য বা সঙ্গীতশাস্ত্রীদের মধ্যে সর্বপ্রথম মতঙ্গকেই দেখা যায় যে তিনি স্বরের সৃষ্টির বর্ণনায় দার্শনিক তত্ত্বের কিছুটা আলোচনা করেছেন। তাঁর নাদতত্ত্বের বর্ণনাভঙ্গিও ব্যাকরণ ও তন্ত্রশাস্ত্র অনুযায়ী। তিনি উল্লেখ করেছেন,

যথানুভূতদেশাচ্চ ধ্বনেঃ স্থানানুগাদপি।
ততো বিন্দুস্ততো নাদস্ততো মাত্রাস্বনুক্রমাৎ॥
বর্ণাস্তু মাতৃকোদ্‌ভূতা মাতৃকা দ্বিবিধা মতাঃ।
স্বরব্যঞ্জনরূপেণ জগজ্জ্যোতিরিহোচ্যতে॥
স্বর্যতে দেশভাষায়ামাদিক্ষান্তং যথাবিধি।
তেন স্বরাঃ সমাখ্যাতা অন্যে ষড়্‌জাদয়ঃ স্বরাঃ॥

* * * *

শাক্ত্যাভিব্যক্তিমাত্রেণ ব্যঞ্জনং শিবতাং গতম্ ॥
পদবাক্যস্বরূপেণ বাক্যার্থবহনেন যৎ।
বর্ণ যত্র (?) জগৎ সর্বং তেন বর্ণাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥
* * * *
ব্যক্তান্তে ধ্বনিতঃ সর্বে ততো গান্ধর্বসম্ভবঃ ॥
ধ্বনির্যোনিঃ পরা জ্ঞেয়া ধ্বনিঃ সর্বস্য কারণম্।
আক্রান্তং ধ্বনিনা সর্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥

কাশ্মিরীয় ত্রিকদর্শনে বিন্দুই মহামায়া এবং বিশ্ব বা বৈচিত্র্য-সৃষ্টির কারণ বিন্দু। একই অবিনাভাবী চৈতন্য প্রকাশশক্তি ও বিমর্শশক্তি তথা সৃষ্টির সার্থকতায় শিব ও আদ্যাশক্তি-রূপে অভিব্যক্ত হয়। নাদ, বিন্দু ও কলা ঐ প্রকাশ ও বিমর্শশক্তির তিনটি মূর্তি বা বিকাশ, অথবা লিঙ্গরূপী পরমোত্তীর্ণ শিবই ত্রিমূর্তি নাদ, বিন্দু ও কলা-রূপে প্রকাশ পায়। চিদ্‌ঘন লিঙ্গ শিব ও শক্তি উভয়ই: "শিবশক্ত্যুভয়াত্মকম্"। কলা, বিন্দু ও নাদ সর্বচরাচরের কারণরূপী শিবশক্তি কিংবা বিশ্বোত্তীর্ণ শিবেরই সৃষ্টির উন্মুখী বিকাশ। মতঙ্গ সৃষ্টির কারণ-রূপী সৃষ্ট্যুন্মুখী শক্তিকে 'বিন্দু' বলেছেন। মতঙ্গ বিন্দু থেকে নাদ, নাদ থেকে মাত্রা, মাত্রা থেকে বর্ণের বা স্বরের উৎপত্তির কথা বলেছেন। ব্যক্ত ধ্বনি বা স্বরই গান্ধর্ব তথা গানের সৃষ্টির কারণ। ধ্বনি দু'রকম: ব্যক্ত ও অব্যক্ত। অব্যক্তই ব্যক্ত ধ্বনি বা স্বরের বাস্তব রূপ।

মতঙ্গ নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধভেদে গানকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন: "নিবদ্ধশ্চানিবদ্ধশ্চ মার্গোঽয়ং দ্বিবিধো মতঃ"। আলাপ অনিবদ্ধ এবং কথা, রাগ, তাল প্রভৃতি যুক্ত গানই নিবদ্ধ। এই অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধ গান শরীরের মধ্যস্থিত অগ্নি ও বায়ুর সংঘর্ষে কারণ থেকে সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম থেকে স্থূল আকারে বিকাশ লাভ করে। কারণ থেকে স্থূল অবস্থার মধ্যে মতঙ্গ পাঁচটি অবস্থা স্বীকার করেছেন: সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম, ব্যক্ত, অব্যক্ত ও কৃত্রিম।[১] নাদের

১। নাদোঽয়ং নদতের্ধাতোঃ স চ পঞ্চবিধো ভবেৎ।
সূক্ষ্মশ্চৈবাতিসূক্ষ্মশ্চ ব্যক্তোঽব্যক্তশ্চ কৃত্রিমঃ ॥
সূক্ষ্মো নাদো গুহাবাসী হৃদয়ে চাতিসূক্ষ্মকঃ।
কণ্ঠমধ্যে স্থিতো ব্যক্তঃ অব্যক্তস্তালুদেশকে ॥
কৃত্রিমো মুখদেশে তু জ্ঞেয়ঃ পঞ্চবিধো বুধৈঃ।
ইতি তাবন্ময়া প্রোক্তা নাদোৎপত্তির্মনোহরা ॥
—বৃহদ্দেশী ২৩-২৫ শ্লোক

পঞ্চম ও কৃত্রিম অবস্থা বা বিকাশই গান বা সঙ্গীত। পূর্বে উল্লেখ করেছি যে প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রীদের মধ্যে মতঙ্গই সম্ভবত প্রথম সঙ্গীত-সৃষ্টির একটি দার্শনিকী ব্যাখ্যা উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। মনে হয় এই বিশ্লেষণী ধারণার উদ্ভব হয়েছিল মতঙ্গেরও আগে কোহল প্রভৃতি সঙ্গীতশাস্ত্রীদের সময়ে (?)।[২]

নাদ থেকে স্বরের সৃষ্টিরহস্যের উল্লেখ ক'রে মতঙ্গ শ্রুতির পরিচয় দিয়েছেন এবং এ' প্রসঙ্গে তিনি ভরত, কোহল, বিশ্বাবসু প্রভৃতি পূর্বাচার্যদের প্রমাণ-বাক্য উদ্ধৃত করেছেন। শ্রুতি সম্বন্ধে তিনি তাঁর স্বাধীন অভিমতেরও পরিচয় দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন: "শ্রূয়ন্ত ইতি শ্রুতয়ঃ। সা চৈকানেকা বা। তত্রৈকৈব শ্রুতিরিতি। তদ্ যথা—তত্রাদৌ তাবদিহাগ্নি-পবনযোগাৎ পুরুষপ্রযত্নপ্রেরিতোর্দ্ধ্বং নাভেরুর্দ্ধ্বাকারদেশমাক্রামদ্ ধূমবৎ সোপান-পদক্রমেণ পবনেচ্ছয়া আহাহরোহয়তর্ভূতপূরণপ্রাতিনিপার্ধাপাস্তয়া (?) শ্রুত্যাদি-ভেদভিন্নঃ প্রতিভাস ইতি মামকীয়ং মতম্। অন্যে পুনর্দ্বিপ্রকারাঃ শ্রুতীর্মন্যন্তে। কথং। স্বরান্তরবিভাগাৎ"। 'মামকীয়ম্' শব্দে মতঙ্গ নিজের ও তাঁর মতানুবর্তীদের অভিমতের কথা প্রকাশ করেছেন। শ্রুতি আসলে কিন্তু একটি, সোপানের মতো ক্রমোচ্চবিকাশে তা' অনেক ব'লে প্রতিভাত হয়, কাজেই তারা প্রতিভাস, একেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। কিন্তু তা'হলেও তিনি ভরতের মতানুবর্তী হ'য়ে দু'টি সমান আকারের বীণার সাহায্যে বাইশটি শ্রুতির পরিচয় দিয়েছেন। ভরতের মতো তিনিও উল্লেখ করেছেন: "দ্বে বীণে তুল্যপ্রমাণে তন্ত্র্যপপাদনং দণ্ডমূর্ছনা সমে কৃত্বা ষড়্জগ্রামাশ্রিতে কার্যে। তয়োরন্যতরস্যাং মধ্যমগ্রামিকীং শ্রুতিং কৃত্বা পঞ্চমস্যাপকর্ষাৎ তামেব শ্রুতিং পঞ্চমবশাৎ ষড়্জগ্রামিকীং কুর্যাৎ। * * এবমনেন দর্শনেন দ্বাবিংশতিশ্রুতয়ো ভবন্তি"। ভরতের মতো ধ্রুববীণা ও চলবীণা এই দু'টি বীণার মাধ্যমে শ্রুতিনির্ণয়ের প্রণালী মতঙ্গও স্বীকার করেছেন। নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীতের আলোচনায় আমরা বিস্তৃতভাবে এ' সম্বন্ধে আলোচনা করেছি।

বাইশটি শ্রুতি ছাড়া ছষট্টিটি (৬৬টি) ও অনন্ত শ্রুতির কথাও মতঙ্গ উল্লেখ করেছেন: "ইদানীং ষট্‌ষষ্টিভেদভিন্নাঃ শ্রুতয়ঃ কথ্যন্তে"। মন্দ্র, মধ্য

২। কোহলাচার্যের উক্তিতেও আমরা দেখি—

আত্মেচ্ছয়া মহিস্তনাদ্ বায়ুরুদ্যাগ্নিধার্যতে।
নাড়ীভিস্তো তথাকাশে ধ্বনিরক্তঃ স্বরঃ স্মৃতঃ।

ও তার এই তিনটি স্থানের প্রত্যেকটিতে বাইশটি ক'রে শ্রুতির বিকাশ হ'লে ২২ X ৩ = ৬৬টি শ্রুতিই পাওয়া যায়। অনন্ত শ্রুতির বেলায় তিনি বলেছেন সলিলে যেমন অসংখ্য তরঙ্গের সৃষ্টি হয় তেমনি মানুষের শরীরের মধ্যে আকাশে (বায়ু) অনন্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধ্বনির বিকাশ সম্ভব হ'তে পারে।[৩] এ' ছাড়া তিনি উল্লেখ করেছেন যে, শ্রুতিগুলিকে নাদ, শব্দ বা স্বরের তাদাত্ম্য, বিবর্তিতত্ব, কার্যত্ব, পরিণামিতা ও অভিব্যঞ্জকতা এই যে-কোন একটি নামে উল্লেখ করা যেতে পারে।[৪]

স্বরের পরিচয় দিয়ে মতঙ্গ বলেছেন রাগোৎপাদক ধ্বনি বা শব্দের নাম 'স্বর': "রাগজনকো ধ্বনিঃ স্বর ইতি"। এখানে কোহলের "আত্মেচ্ছয়া মহিতলাদ্" প্রভৃতি প্রমাণশ্লোকও মতঙ্গ উদ্ধৃত করেছেন এবং দার্শনিকের মতো বলেছেন স্বর এক এবং অনেক, ব্যাপক ও নিত্য। নিষ্কল-রূপে এক ও ষড়্‌জাদি-রূপে অনেক।[৫] এখানে কোহলাচার্যের বাক্যকে তিনি প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

স্বরের বাদীত্ব, সংবাদীত্ব প্রভৃতি নির্ণয়ের প্রসঙ্গে মতঙ্গ বলেছেন বাদী স্বামী বা রাজা, সংবাদী মন্ত্রী, অনুবাদী পরিজন ও বিবাদী শত্রুতুল্য। এখানে সামাজিক মানুষকে সমাজের ব্যবহার অনুযায়ী বাদী, সংবাদী প্রভৃতি স্বরগুলির পরিচয় দিলেও তিনি পুনরায় বলেছেন রাগের স্বরূপের প্রতিপাদন করে বলেই 'বাদী'-স্বরের সার্থকতা। মতঙ্গের এই বিশ্লেষণী ধারা সুন্দর। তিনি বলেছেন: "বদনং হি নামাত্র প্রতিপাদকত্বং বিবক্ষিতং, ন বচনমিতি। কিং তৎ প্রতিপাদয়তি। রাগস্য রাগত্বং জনয়তি"। মতঙ্গ 'প্রতিপাদন' অর্থে 'সৃষ্টি করা' বলেছেন। কোন একটি রাগের কাঠামো বা নক্সার উপাদান হিসাবে বিভিন্ন স্বরের সমাবেশ থাকলেও তাদের মধ্যে যে-স্বর রাগের প্রকৃতি ও রঞ্জনাশক্তি সৃষ্টি করে তারই নাম 'বাদী'। 'বদনাদ্‌বাদী'—স্বরূপকে দেখায়,

---

৩। যথা ধ্বনিবিশেষাণামানন্ত্যং গগনোদরে।
উত্তরোত্তরপবনোদ্বেগজলরাশিসমুদ্ভবাঃ;
কিয়ন্তঃ প্রতিপদ্যন্তে ন তরঙ্গপরম্পরাঃ।

৪। তাদাত্ম্যং চ বিবর্তত্বং কার্যত্বং পরিণামিতা।
অভিব্যঞ্জকতা চাপি শ্রুতিনাং পরিকথ্যতে।

৫। "একোঽনেকো ব্যাপকো নিত্যশ্চেতি। তত্র নিষ্কলরূপেণৈকঃ স্বরঃ ষড়্‌জাদিরূপেণানেকঃ স্বরঃ।"

বলে বা সৃষ্টি করে বলেই 'বাদী'। এ'ভাবে তিনি সংবাদী, অনুবাদী ও বিবাদী স্বর-তিনটিরও পরিচয় দিয়েছেন তাদের বিভিন্ন গুণের নিদর্শন দিয়ে।

এর পর মতঙ্গ সাতটি স্বরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, কুল, রস, ভাব, স্থান, বর্ণ প্রভৃতির পরিচয় দিয়েছেন। এখানে তাঁর বর্ণনাভঙ্গি কতক দার্শিনিকী, কতক পৌরাণিকী ও কতক জ্যোতিষশাস্ত্রের অনুগামী।

সঙ্গীতে গ্রামের পরিচয় দিতে গিয়ে মতঙ্গ বলেছেন স্বর ও শ্রুতির সমূহ বা সমষ্টিই 'গ্রাম': "সমূহবাচিনৌ গ্রামৌ স্বরশ্রুত্যাদিসংযুতৌ।" মোটকথা স্বজন-পরিজন-কুটুম্বদের নিয়ে সমাজবাসী লোক যেমন গ্রামে একত্রে বাস করে তেমনি স্বরগুলিও সমবেতভাবে অবস্থান করে।[৬] নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের মতো তিনি ষড়্জ ও মধ্যম এই দু'টি গ্রাম স্বীকার করেছেন: "ষড়্জমধ্যমসংজ্ঞৌ তু দ্বৌ গ্রামৌ বিশ্রুতৌ কিল।" গ্রামের প্রসঙ্গে তিনি আবার সামবেদকে স্বরের কারণ বলেছেন ('সামবেদাৎ স্বরা জাতাঃ') এবং তা' থেকে মনে হয় সঙ্গীত বেদজাত সুতরাং অপৌরুষেয় ও পবিত্র এ'কথা প্রমাণ করার জন্য তিনি আগ্রহশীল। কিন্তু দেবকুল থেকে উৎপন্ন ব'লে গ্রামের গ্রামত্ব ও অসাধারণত্ব এই সিদ্ধান্ত তাঁর কতটুকু যুক্তিসম্মত তা' বিচারের বিষয়। তবে প্রয়োজনের প্রসঙ্গে স্বর, শ্রুতি, মূর্ছনা, তান, জাতি তথা জাতিরাগ ও রাগ তথা গ্রামরাগ প্রভৃতির ব্যবস্থাপনার জন্য গ্রামের সার্থকতা এই অর্থই; যুক্তিযুক্ত ব'লে মনে হয়।[৭] পুনরায় তিনি উল্লেখ করেছেন: "জাতিভিঃ শ্রুতিভিশ্চৈব স্বরা গ্রামত্বমাগতাঃ"; অর্থাৎ রাগ (জাতি অর্থে এখানে রাগ) ও শ্রুতিসম্পন্ন হ'য়ে স্বরগুলি গ্রাম সৃষ্টি করে। মতঙ্গের এই অভিধান আরো বিজ্ঞানসম্মত। কেননা পূর্বেই তিনি উল্লেখ করেছেন "সমূহবাচিনৌ" প্রভৃতি; অর্থাৎ শ্রুতিযুক্ত স্বরগুলির সমূহ বা একত্র অবস্থিতির নামই গ্রাম। কিন্তু শুধুই শ্রুতিযুক্ত হ'লে সাঙ্গীতিক গ্রামের সত্যকারের কোন সার্থকতা থাকে না, তাই তিনি জাতি তথা রাগের কথা উল্লেখ করেছেন। মতঙ্গের আসল অভিপ্রায় হ'ল সঙ্গীতের প্রাণ ও অধিষ্ঠান (basic ground) 'রাগ' এবং রাগের রূপ ও প্রকৃতিকে লীলায়িত করার জন্য গ্রামের তথা শ্রুতিযুক্ত স্বরসন্দর্ভের উপযোগিতা এ'কথা প্রতিপাদন করা। তাই তিনি বলেছেন স্বর ও

৬। যথা কুটুম্বিনঃ সর্ব একীভূত্বা বসন্তি হি।
সর্বলোকেষু স গ্রামো যত্র নিত্যং ব্যবস্থিতঃ।

৭। "স্বরশ্রুতিমূর্ছনাতানজাতিরাগাণাং ব্যবস্থাপনহেতুঃ নাম প্রয়োজনম্।"

রাগ এবং রাগ ও স্বর পরস্পর পরস্পরের আপেক্ষিক। আসলে স্বরই রাগের কাঠামো তৈরী করে এবং যে পরিধির মধ্যে স্বরযুক্ত রাগের সুষ্ঠু বিকাশ সম্ভব হয় তাকেই শাস্ত্রকারভাবে সাঙ্গীতিক 'গ্রাম' বলে।

মতঙ্গ শুদ্ধ ও বিকৃত দু'রকম স্বর স্বীকার করেছেন। শুদ্ধ স্বর সাতটি ও বিকৃত স্বর সাধারণ ও কাকলি দু'টি। সাধারণ বলতে সাধারণগান্ধার ও কাকলি অর্থে কাকলিনিষাদ।

সাতটি স্বরের আরোহণ ও অবরোহণকে মতঙ্গ 'মূর্ছনা' বলেছেন। মূর্ছনা দু'রকম: সপ্তস্বরমূর্ছনা ও দ্বাদশস্বরমূর্ছনা। বারোটি স্বরের মূর্ছনায় পরিচয় দেওয়ার রীতি মতঙ্গের নিজস্ব নয়, কেননা আচার্য নন্দিকেশ্বর এদের পরিচয় দিয়েছেন এবং মতঙ্গ তা (পৃ: ৩২) উদ্ধৃতও করেছেন। সাতস্বরের মূর্ছনা আবার পূর্ণা, ষাড়বা, ঔড়বা বা উড়ুবিতা ও সাধারণা ভেদে চার রকম। পূর্ণা অর্থে সাতস্বরের মূর্ছনা। ষাড়বে ছ'টি, ঔড়বে পাঁচটি ও সাধারণে দু'টি বা কাকলি (নিষাদ) ও অন্তর (গান্ধার) স্বরের মূর্ছনা।

এর পর মতঙ্গের নিজস্ব একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল মূর্ছনা ও তানের পার্থক্য দেখানো। তিনি নিজেই প্রশ্ন করেছেন: "নমু মূর্ছনাতানয়োঃ কো ভেদঃ" * * মূর্ছনারোহক্রমেণ তানোঽবরোহণক্রমেণ ভবতীতি ভেদঃ"। অর্থাৎ স্বরসমূহ আরোহণগতিতে হ'লে 'মূর্ছনা' এবং অবরোহণগতিতে হ'লে 'তান' হয়। ত্রিবান্দ্রম-সংস্করণের বৃহদ্দেশীতে সম্ভবত মূর্ছনা ও তানের পাঠটি ভুল আছে, কেননা পণ্ডিত সোমনাথ (১৬০৯ খৃষ্টাব্দ) তাঁর 'রাগবিবোধ' গ্রন্থে তান-প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন: "যদ্যপি মূর্ছনা এব শুদ্ধাস্তানাঃ স্যুরিত্যুক্তৌ তানেষারোহাবরোহক্ষ প্রতীয়তে, তথাপি মতঙ্গমতেনারোহ এব তান ইতি জ্ঞেয়ম্। তথা চ মতঙ্গঃ— 'নমু কথং মূর্ছনাতানয়োর্ভেদঃ? উচ্যতে, আরোহাবরোহক্রমযুক্তঃ স্বরসমুদায়ো মূর্ছনেত্যুচ্যতে, তানস্বারোহণং ভবতীতি ভেদঃ' ইতি"।[৮] এখানে অর্থও বেশ স্বচ্ছ ও সুপরিস্ফুট। ষড়্জাদি স্বরসমূহ আরোহণ ও অবরোহণযুক্ত হ'লে 'মূর্ছনা' ও কেবল আরোহণযুক্ত হ'লে 'তান' হয়। মতঙ্গ "অধুনা তানানাং যজ্ঞনামানি কথ্যন্তে" প্রভৃতি ভণিতা ক'রে অগ্নিষ্টোম, বাজপেয়, ষোড়শী, অত্যগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, গোসব, মহাব্রত, অশ্বক্রান্ত, রথাক্রান্ত, বিষ্ণুক্রান্ত, সূর্যক্রান্ত, গজক্রান্ত, চতুর্মাসিক, সৌত্রামণি, সাবিত্রী, আত্মসাবিত্রী, অগ্নিচিৎ, দীক্ষা, সোম, সমিধ স্বাহাকার, গোদোহন প্রভৃতি যজ্ঞনামীয় তানের

৮। Vide *Rāgavibodha* (Adyar Library, 1945), p. 31.

উল্লেখ করেছেন। এই তানগুলি যজ্ঞে ব্যবহৃত হ'ত কিনা বৈদিক সাহিত্যে তার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। মনে হয় ভরতোত্তর কালে তানগুলিকে যজ্ঞনামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল, কিন্তু কেন এবং কোন্ সূত্রে করা হয় তার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণপঞ্জী আজও পাওয়া যায় নি। তানগুলি পূর্ণ, ষাড়ব ও ঔড়ব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতির ছিল। মতঙ্গ এদের নির্দিষ্ট সংখ্যারও পরিচয় দিয়েছেন। শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকরেও এদের নামোল্লেখ করেছেন। নারদ (২য়) সঙ্গীত-মকরন্দে পূর্ণ, ষাড়ব ও ঔড়ব তানগুলির নামোল্লেখ না করলেও তাদের "আয়ুর্ধর্মযশোবুদ্ধিধনধান্যফলং লভেৎ, * * পূর্ণরাগাঃ প্রগীয়তে" প্রভৃতি ফলের কথা বলেছেন।

মতঙ্গ চার রকম বর্ণের পরিচয় দিয়েছেন: স্থায়ি, সঞ্চারী, আরোহী ও অবরোহী।[১] এক্ষণে এই 'বর্ণ' শব্দে কি বোঝায়? মতঙ্গ বলেছেন—যা গানকে বুঝিয়ে দেয় বা প্রকাশ করে তাই বর্ণ: "বর্ণশব্দেন গানমভিধীয়তে"। চারটি বর্ণের পরিচয় আমরা নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীতের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। মতঙ্গ প্রসন্নাদি অলংকারের কথাও (পৃঃ ৩৫) উল্লেখ করেছেন এবং অলংকারগুলির বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন (পৃঃ ৩৫-৪৯)। অলংকারের প্রসঙ্গে তিনি কোহলের মতের উল্লেখ করেছেন: "কোহলমতে চ একান্তরস্বরারোহান্নিষকূজিতঃ"। গীতির প্রসঙ্গে তিনি ভরতের মতো মাগধী, অর্ধমাগধী, সম্ভাবিতা ও পৃথুলার কথা উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ৪৯) এবং তাঁদের বিস্তৃত পরিচয়ও দিয়েছেন (পৃঃ ৪৯-৫৩)। দেশজাত হ'লেও গান্ধর্বগীতির মতো এদের মধ্যে বৃত্তি, কলা, অক্ষর, ছন্দ, অলংকার প্রভৃতির সমাবেশ থাকে। মতঙ্গ চিত্রা, দক্ষিণা ও বার্তিক এই বৃত্তি-তিনটিরও পরিচয় দিয়েছেন।

মতঙ্গের বৃহদ্দেশী প্রধানত অভিজাত (দশলক্ষণযুক্ত) দেশীগানেরই সংগ্রহ ও পরিচিতি-গ্রন্থ। তাহলেও তিনি নাট্যশাস্ত্রোক্ত শুদ্ধ ও বিকৃত আঠারটি জাতি তথা জাতিরাগের পরিচয় দিয়েছেন: "আভ্যোঽষ্টাদশজাতিভ্যঃ সপ্তস্বরাখ্যাশ্চোক্তা দ্বিধা শুদ্ধা বিকৃতাশ্চেতি"। অবশ্য জাতির পরিচয় দেবার সার্থকতাও আছে। মতঙ্গ রাগলক্ষণের অধ্যায়ে "তথা চাহ ভরতমুনিঃ"—প্রভৃতি ভণিতা ক'রে ভরতের মতে সকল রাগের কারণ বা বীজস্বরূপ জাতিরাগের উল্লেখ করেছেন: "জাতিসম্ভূতত্বাদ্ গ্রামরাগাণামি'-তি" এবং নিজের প্রতিপাদ্য

১। অতঃপরং প্রবর্ণ্যন্তে বর্ণশ্চত্বার এব হি।
স্থায়িসঞ্চারিণৌ চৈব তথারোহাবরোহিণৌ।

শ্লোকটির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন : "যৎকিঞ্চিদেতদ্ গীয়তে লোকে তৎ সর্বজাতিষু স্থিতমিতি বচনাৎ"। 'ইতি বচনাৎ' প্রভৃতি শব্দ থাকলেও শেষের কথাগুলি মতঙ্গের নিজের। তবে "তথা চাহ ভরতমুনিঃ—জাতিসম্ভূতত্বাদ্ গ্রামরাগাণি" শ্লোকটি মতঙ্গ যে উদ্ধৃত করেছেন তা বর্তমান কাশী, কাব্যমালা ও বরোদা সংস্করণের নাট্যশাস্ত্রে নাই। কিন্তু আমরা মতঙ্গের এই উদ্ধৃতিকে সত্য ব'লেই গ্রহণ করব নানান্ কারণে। মনে হয় বর্তমান সংস্করণের নাট্যশাস্ত্রে শুধু এই শ্লোকাংশই নয়, অনেক শ্লোকই সর্বগ্রাসী কালের কবলে বিনষ্ট হয়েছে। যাইহোক দেশীগানের আলোচনায় মতঙ্গ যে জাতিরাগের পরিচয় দিয়েছেন তার অর্থ হ'ল সকলকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, জাতিরাগই গ্রামরাগ এবং বিভিন্ন ভাষাদি ও দেশী (ক্ল্যাসিক্যাল) রাগের কারণ, এবং কার্যের পরিচয় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কারণেরও পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

'জাতি' বলতে কি বোঝায়, কিংবা জাতি-শব্দের সার্থকতাই বা কি? প্রাচীন শাস্ত্রীদের মধ্যে মতঙ্গই বোধহয় সুপরিস্ফুটভাবে এই জাতির আভিধানিক অর্থের পরিচয় দিয়েছেন। মতঙ্গ উল্লেখ করেছেন : "শ্রুতিগ্রহস্বরাদিসমূহাজ্জায়ন্তে জাতয়ঃ। * * যস্মাজ্জায়তে রসপ্রতীতিরারভ্যত ইতি জাতয়ঃ। অথবা সকলস্য রাগাদের্জন্মহেতুত্বাজ্জাতয় ইতি। যদ্বা জাতয় ইতি জাতয়ঃ"। মতঙ্গ এই বিভিন্ন-ভাবে জাতিলক্ষণের পরিচয় দিয়েছেন। পরিচয়গুলির মর্মার্থ হ'ল : (১) শ্রুতি, গ্রহ, স্বর (অলংকার, বর্ণ) প্রভৃতি উপাদান নিয়ে যে-স্বরসম্ভার প্রকাশিত হয় তাকে 'জাতি' বলে; (২) যে স্বরসন্দর্ভের লীলায়িত গতি ও বিকাশ থেকে প্রত্যেকটি স্বরের—প্রত্যেকটি স্বরগঠনের বা রাগরূপের সত্যকারের রসপ্রতীতি হয় তাকে 'জাতি' বলে, কিংবা (৩) গান্ধর্ব ও দেশী রাগগুলি যে মূল বা কারণরাগ থেকে জন্মলাভ করে তাকে 'জাতি' বলে। এই তিনটি অভিধানই ভরতোক্ত ও ভরতপূর্ব জাতিরাগগুলির নামের ও সৃষ্টির সার্থকতা সম্পন্ন করে। শেষোক্ত "যদ্বা জাতয় ইতি জাতয়ঃ" উদাহরণটি সামাজিক ও একান্ত লৌকিক।

মতঙ্গ জাতিরাগের কেন, সকল শ্রেণীর রাগের নিয়ামক ও নির্ধারক দশলক্ষণের পরিচয় দিয়েছেন নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের মতো। পূর্বে উল্লেখ করেছি ভরত যেমন গ্রহ ও অংশকে অভেদ বলেছেন, পরবর্তী শাস্ত্রীরা সে' সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন নি। মতঙ্গের পক্ষেও তাই। মতঙ্গ নিজেই পূর্বপক্ষ করেছেন : "নম্বেবং গ্রহাংশয়োঃ কো ভেদঃ। উচ্যতে"। মতঙ্গ গ্রহ ও অংশের মধ্যে ভেদ বা পার্থক্য দেখিয়ে বলেছেন গ্রহের চেয়ে অংশের প্রাধান্য

বেশী, কেননা অংশই সামগ্রীকভাবে ('ব্যাপকত্বাৎ') রাগের রঞ্জনাশক্তি ও লাবণ্য-গুণকে প্রকাশ ও বৃদ্ধি করে, কিন্তু গ্রহ তা পারে না ব'লে অপ্রধান। এ'সম্বন্ধে মতঙ্গের নিজস্ব বর্ণনাভঙ্গি হ'ল: "অংশো বাস্তেব পরং, গ্রহস্ত বাত্তাদিভেদ-ভিন্নশ্চতুর্বিধঃ। যথা প্রধানাপ্রধানকৃতো ভেদঃ। গ্রহো হৃপ্রধানভূতঃ। নম্থ কথমংশস্তৈব প্রধানমুচ্যতে। রাগজনকত্বাদ্ ব্যাপকত্বাচ্চাংশস্তৈব প্রাধান্তম্"। পূর্বে এ'সম্বন্ধে আলোচনা করলেও মতঙ্গের প্রসঙ্গে তাঁর বর্ণনাকৌশলের পুনরুল্লেখ করলাম। সংবাদী, অনুবাদী, বিবাদী, ন্যাস, বিন্যাস প্রভৃতি দশলক্ষণের এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতিরাগগুলির অংশ ও ন্যাসাদির পরিচয় আমরা পূর্বেই দিয়েছি।

রাগলক্ষণে 'রাগ'-শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের উল্লেখ ক'রে মতঙ্গ বলেছেন: "কিমুচ্যতে রাগশব্দেন কিং বা রাগস্ত লক্ষণম্ ব্যুৎপত্তিলক্ষণং তস্ত?" এর পরিচয় দেবার আগে মতঙ্গ ভরতের ও অন্যান্য পূর্বাচার্যদের ওপর একটু কটাক্ষ (?) করতেও ছাড়েন নি। তিনি উল্লেখ করেছেন: "রাগমার্গস্ত যদ্ রূপং যন্নোক্তং ভরতাদিভিঃ, নিরুপ্যতেতদস্মাভির্লক্ষ্যলক্ষণসংযুতম্"। 'অস্মাভিঃ' বা 'আমাদের দ্বারা' বলতে মতঙ্গ আর কোন্ কোন্ শাস্ত্রীকে লক্ষ্য করেছেন তা তিনি উল্লেখ করেন নি। ভরত প্রভৃতি আচার্যরা রাগের উল্লেখ ও পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু তার কোন ব্যুৎপত্তিগত অর্থের কথা বলেন নি, অথচ সঙ্গীতের ব্যাকরণে তার সার্থকতা অবশ্যই আছে। তাই মতঙ্গ অর্থের তথা 'রাগ' শব্দ বা নামের সার্থকতা নিষ্পন্ন ক'রে বলেছেন,

যোঽসৌ ধ্বনিবিশেষস্ত স্বরবর্ণবিভূষিতঃ।
রঞ্জকো জনচিত্তানাং স চ রাগ উদাহৃতঃ॥

*   *   *   *

ইত্যেবং রাগশব্দস্ত ব্যুৎপত্তিরভিধীয়তে।
রঞ্জনাজ্জায়তে রাগো ব্যুৎপত্তিঃ সমুদাহৃতা॥

স্বরবর্ণ (শুধু স্বরবর্ণ কেন, ব্যঞ্জনবর্ণ)-যুক্ত যে ধ্বনিতরঙ্গ মানুষের মনে প্রীতি ও আনন্দের সঞ্চার করে তাকেই 'রাগ' বলে। 'রাগ'-শব্দের ব্যুৎপত্তি হ'ল: রঞ্জিত বা চিত্তকে বিমুগ্ধ করে ব'লেই রাগ; অথবা যেহেতু সাঙ্গীতিক ধ্বনি মানুষ ও জীবজন্তুর চিত্তকে আনন্দের সংস্কারযুক্ত করে সে'জন্যই তাকে 'রাগ' বলা হয়। পঙ্ক থেকে জন্মলাভ করলেও পঙ্কজ শব্দ যেমন পঙ্কে উৎপন্ন অপর কিছুকে না বুঝিয়ে পদ্মফুলকে বোঝায় তেমনি 'রাগ'-শব্দ স্বরসন্দর্ভ থেকে জন্মলাভ করলেও

স্বরকে না বুঝিয়ে জনচিত্ত-বিমোহিনীশক্তিসম্পন্ন রাগকে বোঝায়। 'রাগ' তাই যৌগিক বা যোগরূঢ় শব্দ।

গীতির পরিচয়ে মতঙ্গ শুদ্ধা, ভিন্নকা, গৌড়িকা, রাগ, সাধারণী, ভাষা ও বিভাষা এই সাতটি গীতির পরিচয় দিয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভরত, যাষ্টিক, দুর্গাশক্তি, শার্দুল প্রভৃতি পূর্বাচার্যদের মতের উল্লেখ করেছেন। তিনি সাতটি গীতির নাম ও রূপের সার্থকতা এবং সংখ্যারও পরিচয় দিয়েছেন।

ভাষারাগের পূর্বে মতঙ্গ গ্রামরাগগুলির পরিচয় দিয়েছেন। ভরত যেমন ব্রহ্মা বা ব্রহ্মভরতের প্রমাণবাক্য উদ্ধৃত ক'রে বলেছেন "মুখে তু মধ্যমগ্রামঃ ষড়্‌জঃ প্রতিমুখে ভবেৎ" তেমনি মতঙ্গ নাট্যে প্রয়োগের উপযোগী শুদ্ধাদি পাঁচটি রাগগীতির প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন,

> গানং পঞ্চবিধং যৎ তদ্ রাগৈরেভিঃ প্রযোজয়েৎ ॥
> পূর্বরঙ্গে (তু) শুদ্ধা স্যাদ্ ভিন্না প্রস্তাবনাশ্রয়া।
> বেসরামুখ্যয়োঃ কার্যা গর্ভে গৌড়ী বিধীয়তে ॥
> সাধারিতাবমর্শে স্যাদ্ সংহারে স্যাৎ+সর্বদা।[১০]

ভরত নাট্যশাস্ত্রে ২১শ অধ্যায়ে সন্ধ্যঙ্গবিকল্পপ্রসঙ্গে মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, অবমর্শ ও সংহার এই পাঁচটি অঙ্গের পরিচয় দিয়েছেন। ব্রহ্মাভরত মুখে গ্রামরাগ হিসাবে মধ্যম-গ্রামরাগ, প্রতিমুখে ষড়্‌জ-গ্রামরাগ, গর্ভে সাধারিত-গ্রামরাগ, অবমর্শে পঞ্চম-গ্রামরাগ, সংহারে কৈশিক-গ্রামরাগ, পূর্বরঙ্গে ষাড়ব-গ্রামরাগ ও (আঠারটি) অঙ্গের শেষে কৈশিকমধ্যম-গ্রামরাগের প্রয়োগ করতে বলেছেন। এখানে ছ'টি অঙ্গবিকল্পের জন্য ছ'টি গ্রামরাগ নির্বাচিত হয়েছে। নাট্যপ্রয়োজনে ভরত পাঁচটি অঙ্গের পরিচয় দিয়েছেন এবং পূর্বরঙ্গকে তিনি নাট্যের বহির্ভূত অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করেছেন ব'লে মনে হয়। মতঙ্গ পূর্বরঙ্গে শুদ্ধাগীতি, প্রস্তাবনায় ভিন্নাগীতি, মুখে বেসরাগীতি, গর্ভে গৌড়ীগীতি, অবমর্শে সাধারিতগীতি (?) ও সংহরণ বা সংহারেও তাই (যদিও স্পষ্ট কোন উল্লেখ নাই) বলেছেন। এখানেও ব্রহ্মার মতো মতঙ্গ ছ'টি সন্ধি মেনেছেন, যদিও রাগ ও গীতির নামে প্রার্থক্য আছে।

ভাষালক্ষণে ভাষারাগগুলির পরিচয় দিতে গিয়ে মতঙ্গ বলেছেন,

> গ্রামরাগোদ্ভবা ভাষা ভাষাভ্যশ্চ বিভাষিকাঃ।
> বিভাষাভ্যশ্চ সঞ্জাতাস্তথা চান্তরভাষিকাঃ ॥

১০। বৃহদ্দেশীর পাঠ এখানে বিকৃত ও লুপ্ত, সুতরাং সঠিকভাবে মতঙ্গের অভিপ্রায়ের পরিচয় দেওয়া কঠিন।

গ্রামরাগ থেকে ভাষারাগ, ভাষা থেকে বিভাষিকারাগ, বিভাষিকা থেকে অন্তর-ভাষারাগের সৃষ্টি। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে কল্লিনাথ কেন, চতুর্দণ্ডী-প্রকাশিকাকার বেঙ্কটমুখীও বলেছেন জাতিরাগ থেকে অন্তরভাষা পর্যন্ত রাগগুলি গান্ধর্ব বা মার্গশ্রেণীভুক্ত এবং রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ ও উপাঙ্গ রাগগুলি দেশীশ্রেণীভুক্ত। ভাষারাগগুলি রঞ্জনাশক্তিবিশিষ্ট কিনা তার উত্তরে শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকরের পরিশিষ্টে (পুণা-সংস্করণ) উল্লেখ করেছেন: "ভাষাণাং গ্রামরাগালাপপ্রকারাণাম্। তথা চাহহ মতঙ্গঃ—'গ্রামরাগাণামেবাহলাপনপ্রকারা ভাষা বাচ্যাঃ। ভাষাশব্দোহত্র প্রকারবাচী' ইতি। এবং বিভাষান্তরভাষা-শব্দাবপি তত্তদনন্তরোৎপন্নালাপপ্রকারবাচকবিত্যবগন্তব্যম্। তাসামপি রঞ্জনা-দ্রাগত্বং চ বোদ্ধব্যম্"। ভাষারাগের প্রসঙ্গে শার্ঙ্গদেব যাষ্টিক, কশ্যপ, শার্দুল, মতঙ্গ প্রভৃতির অভিমতও উদ্ধৃত করেছেন।

দেশীরাগ (অভিজাত) হিসাবে মতঙ্গ টক্করাগের ১৬টি (কিংবা ১০টি)+ মালবকৌশিকের ৮টি+ককুভের ৭টি+হিন্দোলের ৫টি+পঞ্চমের ১০টি+ ভিন্নষড়্জের ৯টি+সৌবীরকের ৪টি+ভিন্নপঞ্চমে ৪টি+বোট্টরাগের ১টি+মালব-পঞ্চমের ১টি+টক্কাকৈশিকের ৩টি+বেসরষাড়বের ২টি+ভিন্নতানের ১টি+গান্ধার-পঞ্চমের ১টি+পঞ্চমষাড়বের ১টি=মোট ৭৩টি ভাষারাগের নামোল্লেখ করেছেন। ভাষারাগ হিসাবে তিনি (১) ত্রিবণা (ত্রিবেণী?) ত্রবণোদ্ভবা, বেরঞ্জিকা, চ্ছেবাজ ও চ্ছেবাটী, মালবেসরী বা মালবেসরিকা, গুর্জরী, সৌরাষ্ট্রী, সৈন্ধবী, বেসরিকা, পঞ্চমাখ্যা, রবিচন্দ্রা, অম্বাহীরী, ললিতা, কোলাহলী, মধ্যমগ্রামদেশা ও গান্ধারপঞ্চমী এই রাগগুলি টক্করাগের ভাষারাগ: "এতাশ্চ যাষ্টিকে প্রোক্তাঃ টক্কারাগস্য ষোড়শ"। (২) শুদ্ধা, আন্ধ্রবেসরী বা আন্ধ্রবেসরিকা, হর্ষপুরী, মাঙ্গালী, সৈন্ধবী, আভীরী, খণ্ডরী, ও গুঞ্জরী এ'গুলি মালবকৌশিক রাগের ভাষা। (৩) কাম্বোজা, মধ্যমগ্রামিকা, সালবাহানিকা, ভাগবর্ধনী (ভোগবর্ধনী?), মধুকরী, শকমিশ্রিতা ও ভিন্নপঞ্চমী এ'গুলি ককুভরাগের ভাষা। (৪) বেসরী, মঞ্জরী, কার্যা, ছেবাটী, ষড়্জমধ্যমা, মাধুরী এ'পাঁচটি হিন্দোলের (হিন্দোলক) ভাষা। (৫) আভীরী, ভাবিনী, মাঙ্গালী, সৈন্ধবী, গুর্জরী, দাক্ষিণাত্যা, আন্ধ্রী তয়োদ্ভবা, ত্রাবণী ও কৈশিকী এ'গুলি পঞ্চমরাগের ভাষা। (৬) বিশুদ্ধা, দাক্ষিণাত্যা, গান্ধারী, শ্রীকণ্ঠী, পৌরালী, মাঙ্গালী, সৈন্ধবী, কালিন্দী, পুলিন্দি এ'গুলি ভিন্নষড়্জরাগের ভাষা। (৭) সৌবীরী, বেগমধ্যমা, সাধারিতা, গান্ধারী ও সৈন্ধবিকী সৌবীরকরাগের ভাষা। (৮) শুদ্ধা, ভিন্না, বারাহী, ধৈবতভূষিতা ও

বরাটী ভিন্নপঞ্চমরাগের ভাষা। (৯) ভাবিণী ও লোকভাবিণী মালব- পঞ্চমের ভাষা। (১০) মঙ্গল্যাখ্যা (মঙ্গলী বা মঙ্গল?) বোট্টরাগের ভাষা। (১১) বেগমধ্যম, মালবা, ভিন্নবালীকা প্রভৃতি টক্ককৈশিকের ভাষা। এ'ছাড়া মতঙ্গ শার্দুলের মতে ভাষারাগগুলির নামোল্লেখ ক'রে তাদের পরিচয় দিয়েছেন। সেইগুলির নাম দেবালবর্ধনী, পৌরালী, ত্রাবণী, তানললিতিকা, দোহ্বা, শার্দুলী (সম্ভবত এ'রাগটি মুনি শার্দুলের আবিষ্কৃত), অলধ্বী প্রভৃতি।

এ'গুলি সমস্তই প্রায় দেশজ ভাষারাগ। মতঙ্গ উল্লেখ করেছেন,

(১) সৌরাষ্ট্রিকা তু ভাষেয়ং দেশ্যাখ্যা (দেশাখ্যা?)
গীয়তে জনৈঃ।

(২) দেশভাষা তু দেশাখ্যা সৈন্ধবী টক্করাগজা।

(৩) * * সম্পূর্ণস্বরা জ্ঞেয়া পৌরালীদেশসম্ভবা।

(৪) সাধারণকৃতা হ্যেষা দেশাখ্যা হর্ষপুরি তা।

(৫) * * দেশাখ্যাং সৈন্ধবী বিদুঃ।

(৬) পূর্ণপঞ্চমজা হ্যেষা আভীরীদেশসম্ভবা।[১১]

(৭) মাঙ্গালী পঞ্চমান্তা চ ধৈবতাংশা প্রকীর্তিতা।
*   *   *   *
সঙ্কীর্ণা চ মতা নিত্যং জ্ঞেয়া বৈদেশসম্ভবা।

(৮) পঞ্চমাদ্যন্তসংযুক্তা দাক্ষিণাত্যা মনোরমা।
*   *   *   *
বিভাষেয়ং সদা জ্ঞেয়া দেশাখ্যা পঞ্চমোদ্ভবা।

(৯) সাধারণকৃতা হ্যেষা ত্রাবণীদেশসম্ভবা।

(১০) বঙ্গালদেশসম্ভূতা বঙ্গালী দিব্যরূপিণী।

(১১) এষা হ্যন্তরভাষা বৈ পুলিন্দেন গীয়তে।
পুলিন্দকে তু বিখ্যাতা ষড়্জওড়ুবিতাস্তথা ॥

(১২) কোসলদেশসম্ভূতা প্রতীহারেষু গীয়তে (—কৌসলীরাগ)।

মতঙ্গ কতকগুলি দেশজ রাগের মাঙ্গলিক প্রকৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন,

(১) দেবতারাধনে গীতা ষড়্জভাষা তু ষট্স্বরা।

(২) ঋষভেন বিহীনা তু গীয়তে ব্রহ্মবাদিভিঃ।—প্রভৃতি

১১। আভীরজাতি থেকে উৎপন্ন?

মতঙ্গ দেশীপ্রবন্ধের পরিচয় দিয়ে বলেছেন সে'গুলি দেশী হ'লেও মহাদেবের মুখ থেকে নির্গত হয়েছে।[১২] এ'ধরণের পৌরাণিকী দেবত্বারোপের কাহিনী শুধু রাগে নয়, প্রাচীন যুগে সকল জিনিসের মধ্যেই দেখা যায়। দেশী প্রবন্ধগুলির নাম কন্দাখ্য (?), বৃত্তা, গন্ধরূপ, দণ্ডক, বর্ণক, আর্যাপিধায়ক, কর্ণিতা, গাথা, দ্বিপথক, বর্ধটী, প্রাহদ্ধিলা, দোথক, বস্ত্রাখ্য, শুকসারিত, সিংহলীল, চতুরঙ্গ, ত্রিপদী, ষট্পদী, কৈবাট, ঢেঙ্কী প্রভৃতি। মতঙ্গ প্রবন্ধগুলির পরিচয়ও দিয়েছেন, কিন্তু ত্রিবান্দ্রম-সংস্করণ-বৃহদ্দেশীতে পাঠ যথেষ্ট বিকৃত। শার্ঙ্গদেব এই প্রবন্ধের অনেকগুলিকে তাঁর সঙ্গীত-রত্নাকরের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ'ছাড়া বিভিন্ন তাল, পদ, দেবতা, রীতি, বৃত্তি, কুল, রস, রাগ, বর্ণ প্রভৃতির সমাবেশ দিয়ে মতঙ্গ গণৈলা, মাত্রৈলা, বর্ণৈলা, পদ্মিন্যৈলা, দেশাখ্যৈলা প্রভৃতি দেশীপ্রবন্ধেরও পরিচয় দিয়েছেন। সঙ্গীত-রত্নাকরে ঐগুলির রূপ আরো পরিস্ফুট।

॥ দুর্গাশক্তি ও কীর্তিধর ॥

দুর্গাশক্তি ও কীর্তিধর দু'জনের মধ্যে দুর্গাশক্তি মতঙ্গের পূর্ববর্তী সঙ্গীতশাস্ত্রী, কেননা মতঙ্গ গীতি বা গ্রামরাগগীতির প্রসঙ্গে দুর্গাশক্তির নামোল্লেখ করেছেন: "ইতি তেষাং লক্ষণমুচ্যতে দুর্গাশক্তিমতম্"। মতঙ্গ দুর্গাশক্তির নাম ও মতবাদ অন্তত চারবার উদ্ধৃত করেছেন। রাগলক্ষণে ষড়্জকৈশিকরাগের প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন: "দুর্গাশক্তিমতে তু ষড়্জকৈশিক এব মুখ্যঃ। কুতঃ। ষাড়বত্বেন ক্রমায়াতত্বাৎ"। বেসরারাগের প্রসঙ্গে বলেছেন: "দুর্গাশক্তিমতে রাগা এব বেসরা গণ্যন্তে। তথা চাহ দুর্গাশক্তিঃ—'স্বরাঃ সরন্তি যদ্বেগাৎ তস্মাদ্ বেসরকাঃ স্মৃতাঃ'। দুর্গাশক্তিমতে বেসরষাড়ব এব মুখ্যঃ, ষাড়বত্বেন ক্রমায়াতত্বাৎ।" পুনরায় গান্ধারী, রক্তগান্ধারী প্রভৃতি জাতিরাগের রূপ-বর্ণনায় মতঙ্গ উল্লেখ করেছেন: "যদ্যাপি দুর্গাশক্তিমতে ধৈবতীসমুৎপন্নোঽসৌ, তথাপি পঞ্চমস্ত ত্রিশ্রুতিকত্বাদ্" প্রভৃতি। সঙ্গীত-রত্নাকরের রাগাধ্যায়ে শার্ঙ্গদেবও নর্তরাগের প্রসঙ্গে বৃহদ্দেশী থেকে দুর্গাশক্তির অভিমত উদ্ধৃত করেছেন: "তথা চোক্তং মতঙ্গেন—'দুর্গাশক্তিমতেঽয়মেব রাগো যদা পঞ্চমী'" প্রভৃতি। সুতরাং দেখা যায় দুর্গাশক্তি একজন ঐতিহাসিক প্রামাণিক শাস্ত্রী না হ'লে মতঙ্গ বা শার্ঙ্গদেব কখনোই নিজের অভিমত সমর্থন করার জন্য দুর্গাশক্তির নাম ও প্রমাণবাক্য

১২। 'দেশীকার প্রবন্ধোঽয়ং (?) হরবক্ত্রাভিনির্গতাঃ।'

উদ্ধৃত করতেন না। দুর্গাশক্তি সম্ভবত খৃষ্টীয় ২য় থেকে খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের গুণী। তবে তিনি কোহল ও দত্তিলের পরবর্তী শাস্ত্রী।

কীর্তিধরকে কিন্তু দুর্গাশক্তির পূর্ববর্তী এবং কোহলের সমসাময়িক সঙ্গীতশাস্ত্রী ব'লে অনুমিত হয়। তবে দত্তিল বা বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গ কীর্তিধরের কোন নামোল্লেখ করেন নি। কীর্তিধর 'দত্তিলম্' গ্রন্থের ২৪২ শ্লোকে উল্লিখিত "পূর্বাচার্য-মতন্ত্বেতদ্"—নামবিহীন পূর্বাচার্যশ্রেণীর অন্তর্গত কিনা বলা কঠিন। পূর্বাচার্যদের নামের তালিকায় শার্ঙ্গদেব কিন্তু কীর্তিধরের নাম উল্লেখ করেছেন: "ভট্টাভিনব-গুপ্তশ্চ শ্রীমৎকীর্তিধরঃ পরঃ"।[১] অভিনবগুপ্ত অভিনবভারতীতে কীর্তিধরের নাম অন্তত চারবার উল্লেখ করেছেন। অভিনবগুপ্ত নন্দিকেশ্বরের সঙ্গে একবার কীর্তিধরের নাম উল্লেখ ক'রে বলেছেন: "যৎ যৎ কীর্তিধরেণ নন্দিকেশ্বরতন্মাত্র-গামিত্বেন (?) দর্শিতং তদস্মা (-স্মা)-ভিঃ ন দৃষ্টং, তৎপ্রত্যয়াত্তু লিখ্যতে"। তা'ছাড়া কল্লিনাথ সঙ্গীত-রত্নাকরের নর্তনাধ্যায়ের (৭ম অধ্যায়) টীকায় খড়্গবর্তনিকার প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করেছেন,

একস্যাঽকুঞ্চিতো মুষ্টিঃ খটকাস্যোঽঞ্চিতঃ পরঃ ॥
ইতি কীর্তিধরস্ত্বাহ মুষ্টিকস্বস্তিকৌ করৌ।

কল্লিনাথ কোহলের 'সঙ্গীতমেরু' গ্রন্থ থেকে বর্তনাগুলি যে উদ্ধৃত করেছেন তা তিনি স্বীকার করেছেন: " * * তাসাং স্বরূপপরিজ্ঞানার্থং কোহলোক্তাঃ কাশ্চন বর্তনাঃ কথ্যন্তে"। এ'ছাড়া শার্ঙ্গদেব ভরতের ভাষ্যকার হিসাবে (?) সঙ্গীত-রত্নাকরে তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন। অভিনবভারতীতে কীর্তিধরের নাম অন্যপ্রসঙ্গেও উল্লিখিত আছে:

(১) এতদুক্তম্—
'প্রাহুরমেককলং সাম দ্বিকলং বহ্নিজং তথা।
চত্রস্তু (?) বিকলং শুক্রং পূর্বয়ো সার্থকং * * ॥
ইতি কীর্তিধরাচার্যঃ।

(২) ননু চত্বারি যথা কীর্তিধরোঽভ্যধাৎ ইতি।

প্রথম শ্লোকের পাঠ বিকৃত মনে হয়। যাইহোক অন্তত 'সঙ্গীতমেরু' গ্রন্থে কীর্তিধরের নাম উল্লেখ থাকায় কীর্তিধরকে দত্তিল, যাষ্টিক, নন্দিকেশ্বর প্রভৃতি সঙ্গীতশাস্ত্রী ও নাট্যাচার্যদের পূর্ববর্তী গুণী ব'লে সাধারণত অনুমিত হয়।

১। কীর্তিধরের প্রসঙ্গে ডাঃ রাঘবন তাঁর *Early Saṅgita Literature* নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন: "Though mentioned last in Śrāṅgdeva's list, if it is a fact that his work was a regular commentary on the *Bharata Nāṭyaśāstra,*

॥ শিলপ্পধিকারম্ ও সঙ্গীত ॥

তামিল নাটক 'শিলপ্পধিকারম্' সম্বন্ধে পূর্বেই আমরা (পৃ° ৩৬-৩৭) কিছুটা আলোচনা করেছি। কিন্তু অনবধানবশত তার রচনাকাল নির্দেশ করেছি খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ-৩য় শতকে। ডাঃ কৃষ্ণমাচারিয়ারের সময়-নির্ধারণেই ভুল আছে, কেননা তিনিও উল্লেখ করেছেন: "In the Tamil epic Śilappadhikāram now generally assigned not later than 4th century B. C."[১] কিন্তু নানান্ কারণে ও সঙ্গীতের বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অনুসারে নাটকটি মতঙ্গের পরবর্তী ব'লে আমাদের অনুমান হয়।

'শিলপ্পধিকারম্' নাটক হ'লেও প্রাচীন তামিল সঙ্গীতের প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে সে'টিকে গণ্য করা যায়। ভরত, কোহল, দত্তিল, মতঙ্গ প্রভৃতি প্রাচীন আচার্যদের মতো শিলপ্পধিকারমের রচয়িতা বাইশটি শ্রুতি এবং ষড়্‌জ-মধ্যম ও ষড়্‌জ-পঞ্চম ভাবের সংগতি স্বীকার করেছেন। শ্রুতির অভিধান সেখানে 'অলকু'। সমস্ত সপ্তককে বারোটি সমানভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেই ভাগের নাম 'রাশি'। গ্রন্থটিতে সাতটি স্বরে শ্রুতিসংখ্যার সন্নিবেশ ভরত থেকে ভিন্ন, কেননা ভাষ্যকার আদিয়াক্কুনল্লার উল্লেখ করেছেন ষড়্‌জ থেকে নিষাদ পর্যন্ত প্রত্যেকটি স্বরের শ্রুতিসংখ্যা ৪,৪,৩,২,৪,৩,২। বিশেষ ক'রে আব্রাহাম পণ্ডিতর্ তাঁর 'করুণামৃতসাগর' গ্রন্থে তামিলপদ্ধতি অনুসারে স্বরের শ্রুতিসংখ্যা ও'ভাবেই নির্ণয় করেছেন।[২]

শিলপ্পধিকারমে দ্বিশ্রুতিক, ত্রিশ্রুতিক ও চতুঃশ্রুতিক তথা ক্ষুদ্র, মধ্য ও বৃহৎ এই তিনটি অন্তর স্বীকার করা হয়েছে। তামিল শুদ্ধ-মেলকর্তা ছিল সম্ভবত হরিকাম্বোজা এবং শিলপ্পধিকারমেও তার আভাস পাওয়া যায়। আব্রাহাম পণ্ডিতর্ কিন্তু তা স্বীকার করেন নি, তাঁর মতে শংকরাভরণই প্রাচীন শুদ্ধ-মেলকর্তা। প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে ১২টি রাশিতে যে সপ্তককে ভাগ করা হ'ত সেই নীতি এখনো দক্ষিণীপদ্ধতিতে অনুসৃত হয়।

'শিলপ্পধিকারম্' নাটকে 'আলত্তি' বা আলপ্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

Kirtidhara was the first known commentator. * * * So Kirtidhara is earlier than the *Sangita Meru*."—Vide *The Journal of the Music Academy*, Madras, Vol. III, 1932, p. 23.

১। Vide *History of Classical Sanskrit Literature* (Madras, 1937), p. 824.

২। Vide *The Rāgas of Karnātic Music* (1938), p. 32.

বৃহদ্দেশীতে মতঙ্গ কিন্তু আলাপ বা আলপ্তির কোন আলোচনা করেন নি। পার্শ্বদেবের (৯ম-১১শ শতাব্দী) 'সঙ্গীতসময়সার' গ্রন্থেই মনে হয় আলাপ বা আলপ্তির আলোচনা (অন্তত মুদ্রিত গ্রন্থ হিসাবে) প্রথম দেখা যায়। সঙ্গীত-সময়সারের দ্বিতীয় অধিকরণে পার্শ্বদেব উল্লেখ করেছেন: "অথালপ্তির্দ্বিবিধা—রাগালপ্তি রূপালপ্তিশ্চ, তত্র রাগালপ্তিঃ কথ্যতে—"। শিলপ্পধিকারম্ নাটকে আলাপ বা আলপ্তির পরিচয় থাকায় গ্রন্থটিকে বৃহদ্দেশীর পরবর্তী ব'লেই অনুমান হয়। শিলপ্পধিকারমের অরঙ্গেরু কাদৈ-প্রকরণে শ্লোকগুলির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ভাষ্যকার আদিয়ার্ক্কু নল্লার বিশেষভাবে আলত্তি বা আলপ্তির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন সঙ্গীতের প্রারম্ভে অচ্চু ও রাগ অধিষ্ঠিত হ'লে 'পারণাই' ব্যবহার করা হ'ত। অচ্চু সর্বদা তালের ও পারণাই নৃত্যের সহচারী ছিল। আলত্তিকে তেন্না বা তেনা অথবা তেন্নাতেনা প্রভৃতি শব্দের দ্বারা বিস্তৃত করা হ'ত। আলত্তি (আলপ্তি) আবার কাট্টালত্তি (কাত্তালত্তি ?), নিরবালত্তি ও পণ্ণালত্তি এই তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। কাট্টালত্তিতে 'অচ্চু'-র সমাবেশ থাকত, নিরবালত্তিতে 'পারণাই' ও তৃতীয় পণ্ণালত্তিতে থাকত 'পণ'। পাঁচটি হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরবর্ণের যোগে আলত্তির বিস্তার করার রীতি ছিল। শিলপ্পধিকারম্-গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন মূলাধার থেকে ধ্বনির বিকাশ হ'লে তাকেই ঠিক ঠিক আলত্তি (আলপ্তি) বলা যায় ও তাকে 'ইশই' ও 'পণ' (রাগ) বলে। মূলাধার থেকে নির্গত ধ্বনি বা স্বরই বাস্তবিক বিচিত্র ইয়র্পা বা ইশই সৃষ্টি করে। ইশইয়ের অপর নাম সঙ্গীত বা সাঙ্গীতিক স্বর। ইশই জিহ্বা, নাসিকা, দন্ত প্রভৃতি আটটি স্থান স্পর্শ ক'রে তবে বাস্তব রূপ নিয়ে বাইরে বিকাশ লাভ করে। এ'ছাড়া সঙ্গীতের বিকাশে এডুতল; পডুতল, নলিডল, কম্পিতম্, কুটিলম্, ওলি, উরুত্তু ও তাক্কু এই ক্রিয়াগুলিরও সহযোগ থাকত। এই ক্রিয়াগুলিকে নাটককার 'স্থায়' বা গমক বলেছেন। প্রাচীন আলাপের রীতি দক্ষিণীপদ্ধতিতে আজও প্রায় অনুসৃত হ'য়ে আসছে।

তামিলনাটক শিলপ্পধিকারমের মতো 'তিবাকরম্' নামে একটি জৈন অভিধানের নাম পাওয়া যায়। তাতে প্রাচীন তামিল সঙ্গীতের কিছু কিছু আলোচনা আছে। 'তিবাকরম্' গ্রন্থটিতে সম্পূর্ণ কিংবা ষাড়ব ও ঔড়ব এই দু'রকম রাগের উল্লেখ আছে এবং তাদের বলা হয় 'পণ' ও 'তিরম্'। এর গ্রন্থকার বাইশটি শ্রুতির পক্ষপাতী ও শ্রুতিকে তিনি 'মাত্রা' বলেছেন। তামিল সাতটি স্বরের নাম প্রায় সংস্কৃত ষড়্জাদির মতো। 'তিবাকরম্' গ্রন্থে

সাতটি মূলরাগ নারদীশিক্ষায় উল্লিখিত সাতটি গ্রামরাগের (গ্রামের) কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মাননীয় পপ্লের মতে 'তিবাকরম্' গ্রন্থটি শিলপ্পধিকারমের প্রায় সমসাময়িক। খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে 'পরিপাদল' নামে আর একটি তামিল-গ্রন্থে ঐ সাতটি গ্রামরাগ বা 'পালই' কিংবা সাঙ্গীতিক স্বরগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেকের মতে ৭টি পালই প্রাচীন দ্রাবিড়ী মূলরাগ। শিলপ্পদিকারম্, তিবাকরম্, পরিপাদল প্রভৃতি তামিল গ্রন্থে য়াল, বীণা, মৃদঙ্গ, বেণু প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩]

॥ আচার্য মাতৃগুপ্ত ॥

আচার্য মাতৃগুপ্ত কবি ও সঙ্গীতজ্ঞানী ছিলেন। সম্ভবত তিনি মহারাজ শ্রীহর্ষ-বিক্রমাদিত্যের সময় জীবিত ছিলেন। ডাঃ রাঘবন তাঁর অভ্যুদয়-কাল খৃষ্টীয় ৬০৭-৬৪৭ শতাব্দী বলেছেন।[১] অনেকে তাঁকে বার্তিককার শ্রীহর্ষের সময়কালীন গুণী বলেন। কহ্লনের 'রাজতরঙ্গিনী' থেকে আমরা জানতে পারি যে মাতৃগুপ্ত কাশ্মীরের রাজা ছিলেন এবং তাঁর সভাকবি ছিলেন মেণ্ঠ। রাজশেখর ও ক্ষেমেন্দ্র উভয়েই কবি মেণ্ঠ-রচিত 'হয়গ্রীববধ'-কাব্য থেকে একটি পদ তাঁদের গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। শকুন্তলা-নাটকের ভাষ্যকার রাঘবও অনেকগুলি পদ 'হয়গ্রীববধ'-কাব্য থেকে উদ্ধৃত করেছেন দেখা যায়। কবি মণ্ঠের অভ্যুদয়-কাল আনুমানিক খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে।[২] সুতরাং মাতৃগুপ্তের কালও ঠিক ঐ সময়ে অনুমান করা যায়। ডাঃ দাশগুপ্ত অনুমান করেন কাশ্মীররাজ প্রবরসেনের উত্তরাধিকারী মাতৃগুপ্ত নাট্যকার মাতৃগুপ্ত থেকে সম্ভবত ভিন্ন।[৩]

৩। "The *yāl* is the peculiar instrument of the ancient Tamil land. No specimen of it exists today. * * *Silappaḍikāram* (A.D. 300 ?), a Buddhist drama, mentions the drummer, the flute player, and the *vīṇā* as well as the *yāl*, * *."—*The Music of India* (1921), p. 11.

১। "Mātrigupta lived in King Harsha's time, 607-647 A.D. He was a great poet and was latterly made king of Kashmir."—*The Journal of the Music Academy*, Madras, Vol. III, 1932, p. 26.

২। "The date of Meṇtha depends upon that of Mātrigupta who, as a predecessor of Pravarasena, may be assigned to the latter half of the sixth century A.D."—*The History and Culture of Indian People* (The Classical Age), Vol. III, p. 312.

৩। "Of Mātrigupta, who is said to have been Pravarasena's predecessor on the throne of Kashmir, and who may or may not be

তবে মেণ্ঠ বা ভট্টমেণ্ঠ যে মহারাজ মাতৃগুপ্তের সভাকবি ছিলেন এ'কথা তিনি এবং ডাঃ শ্রীসুশীলকুমার দে স্বীকার করেন।[৪]

ডাঃ কৃষ্ণমাচারিয়ার উল্লেখ করেছেন সুন্দরমিশ্র-রচিত 'নাট্যপ্রদীপ' থেকে জানা যায় মাতৃগুপ্ত নাকি আর্যাছন্দে ভরতের নাট্যশাস্ত্রের একটি ভাষ্য রচনা করেছিলেন। পণ্ডিত সিল্‌ভ্যাঁ লেভির অভিমতও তাই। নাট্যপ্রদীপে সুন্দর-মিশ্র উল্লেখ করেছেন: "অত্র চ ভরতঃ। আশীর্বচনসংযুক্তা······প্যালংকৃতা. অস্য ব্যাখ্যানে মাতৃগুপ্তাচার্যৈঃ ষোড়শাঙ্ঘ্রিপদান্বিতা ইয়ং উদাহৃতা"।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে কাশ্মীররাজ মাতৃগুপ্ত ও নাট্যকার এবং সঙ্গীতগুণী মাতৃগুপ্তাচার্য এক ও অভিন্ন ব্যক্তি কিনা। আমাদের অনুমান উভয়ে ঠিক এক ব্যক্তি ছিলেন না—যদিও উভয়ের অভ্যুদয় প্রায় একই সময়ে হয়েছিল। কেননা অভিনবগুপ্ত, কুম্ভক, সুন্দরমিশ্র, বহুরূপমিশ্র, সারদাতনয়, ভাষ্যকার বাসুদেব, রঙ্গনাথ, সর্বানন্দ, ক্ষেমেন্দ্র, বল্লভদেব সকলেই আচার্য বা ভট্টমাতৃ-গুপ্তের নাম উল্লেখ করেছেন, 'মহারাজ মাতৃগুপ্ত' এই নামের উল্লেখ কারু উদ্ধৃতিতে পাওয়া যায় না। যেমন অভিনবগুপ্ত অভিনবভারতীতে (ততোধ্যায়, vol. IV. p. 32) উল্লেখ করেছেন: "তথোক্তং ভট্টমাতৃগুপ্তেন—'পুষ্পং চ জনয়ত্যেকো ভূয়োঽনুস্পর্শনান্বিতঃ"। কুম্ভক উল্লেখ করেছেন: "অনুসরণদিক্-প্রদর্শনং পুনঃ ক্রিয়তে। যথা মাতৃগুপ্তঃ—মঞ্জীরপ্রভৃতীনাং সৌকুমার্যবৈচিত্র্য-সংবলিত * *।" শার্ঙ্গদেব রঙ্গীত-রত্নাকরে ও নারদ (২য়) সঙ্গীত-মকরন্দেও মাতৃগুপ্তাচার্যের নামোল্লেখ করেছেন। সুতরাং আচার্য মাতৃগুপ্ত যে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন ও নাট্য, নৃত্য ও সঙ্গীতের জগতে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য এ'কথা স্বীকার করতে হবে।[৫]

identical with dramaturgist Mātriguptāchārya, * *."—*A History of Sanskrit Literature* (Classical Period), 1947, p. 119.

৪। Vide also *Fragments of Mātriguptāchārya,* appeared in *Journal of Oriental Research,* Madras, Vol. II (1928), pp. 118-128.

৫। ডাঃ কানে তাঁর *The History of Sanskrit Poetics* গ্রন্থে আচার্য মাতৃগুপ্ত সম্বন্ধে যা উল্লেখ করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন: "Abhinava once quotes Mātrigupta on *puṣpa,* a technical term for a particular way of playing on the Viṇā defined in *Nātyaśāstra,* 29, 93: "যথোক্তং ভট্টমাতৃগুপ্তেন" প্রভৃতি। He appears to have been a poet and a writer on Nātya and Saṅgita. * *

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

॥ মধ্য ও পূর্ব-এশিয়ায় ভারতীয় সঙ্গীত ॥

(খৃষ্টীয় ৪র্থ—৭ম শতাব্দী)

খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে গৌরবময় গুপ্তযুগে যে সঙ্গীত-সংস্কৃতির আলোকচ্ছটা সমগ্র ভারতবর্ষকে উদ্ভাসিত করেছিল তা' ক্রমশ ভারতের চতুঃসীমা অতিক্রম ক'রে শিল্পী, বণিক ও ধর্মপ্রচারকের মাধ্যমে মধ্য ও পূর্ব-এশিয়ার দেশগুলিতে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই সময়ে বিশেষ ক'রে চীন ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক যোগসূত্রের নিদর্শন পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয়। পুনরায় খৃষ্টীয় ৫৮০ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্ধনের রাজ্যাভিষেক ও চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন-সাঙের ভারতে পদার্পণের পর থেকে চীনসাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতের যোগসূত্র আরো নিবিড় হ'য়ে উঠেছিল। কাশ্মীর, তিব্বত, পেশোয়ার বা পুরুষপুর, উড্ডীয়ান, কপিশা, কাশগর, খোটান, কুচী (কুচীয়া—*ch'iu-tzŭ*) প্রভৃতি দেশগুলির সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ আগে থেকেই ছিল। খৃষ্টীয় ১ম থেকে ৩য় শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ভাবধারার বীজ চীন প্রভৃতি দেশে রোপিত হয়েছিল। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে কুচীর বৌদ্ধশ্রমণরাই নতুন ক'রে আবার চীনের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার করেছিল। খৃষ্টীয় ৩৮৩ শতাব্দীতে কুমারজীব

Several verses of his are quoted in about 20 different places by Rāghavabhatta in his *Arthadyotanikā* (commentary on *Śakuntala*) on *Sūtradharaguṇas, on Āryāvarta, on Śaurasenī* being the dialect for woman of all castes in dramas, on *Nātyalakṣmaṇa* (5½ verses), on *Vīja* (3 verses), one verse on who were to speak Sanskrit in dramas, * *. The *Nātakalakṣmanaratnaprakāśa* of Sāgaranandin quotes several verses of Mātrigupta on pp. 5, 14, 20, 21, 23, 56. * * The *Rājataraṅginī* (III. 125-323) describes at great length how Mātrigupta was the court-poet of Harṣa-vikramāditya, * * The *Nātyapradīpa* of Sundaramiśra composed in 1613 A.D. quotes the definition of *Nāndi* from Bharata's *Nātyaśāstra* (5.25 & 206) and the remarks : 'অস্য ব্যাখ্যানে মাতৃগুপ্তাচার্যৈঃ ষোড়শাঙ্গিব পদাপীরমুদাহৃতাঃ' (Vide I. O. Cat. of Mss. pt. III, p. 348, No. 1199). * * All that it means is that Mātrigupta in his work on dramaturgy dealt with Bharata's definition of *Nāndī*. * * If we rely on the *Rājataraṅgini,* Mātrigupta must have flourished in the first half of the 7th century."—*History of Sanskrit Poetics* (1951), pp. 52-53.

যুদ্ধবন্দী হ'য়ে চীনদেশে যান। কুমারজীবের পিতার নাম ছিল কুমারায়াণ ও মাতা র নাম জীবা।

বন্ধুদত্তের কাছে বৌদ্ধশাস্ত্রের অধ্যয়নাদি শেষ ক'রে যখন তিনি মধ্যএশিয়া থেকে কুচীতে যান তখনই চীনা সৈন্যাধ্যক্ষের দ্বারা তিনি বন্দী হন। কাঙ্-সুতে কু-সাঙের রাজার কাছে তিনি অতিবাহিত করেছিলেন প্রায় পনেরো বছর। খৃষ্টীয় ৪০১ অব্দে সম্রাটের আমন্ত্রণে তিনি উপস্থিত হ'ন চীনের রাজধানীতে। তিনি একশো সংস্কৃত গ্রন্থ চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। তাতে ক'রে ভারতের বোধি-সংস্কৃতির বিস্তৃতি ঘটলো চীনসাম্রাজ্যে। কাশ্মীর থেকেও বৌদ্ধশ্রমণরা গিয়েছিলেন চীনদেশে: যেমন সঙ্ঘভূতি খৃষ্টীয় ৩৮১-৩৮৪ অব্দে, গৌতম-সঙ্ঘদেব খৃষ্টীয় ৩৮৪-৩৯৭ অব্দে, পুণ্যত্রাত খৃষ্টীয় ৪০৪ অব্দে, বিমলাক্ষ খৃষ্টীয় ৪০৬-৪১৩ অব্দে, বুদ্ধজীব খৃষ্টীয় ৪২৩ অব্দে, ধর্মমিত্র খৃষ্টীয় ৪১৪-৪৪২ অব্দে, ধর্মযশ খৃষ্টীয় ৪০০-৪২৪ অব্দে। কাশগরে রাজা একহাজার বৌদ্ধশ্রমণকে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে যান আর তারি সঙ্গে গিয়েছিলেন পণ্ডিত বুদ্ধযশ। খৃষ্টীয় ৪২৪ শতাব্দীতে নান্‌কিঙের বৌদ্ধশ্রমণদের অনুরোধে চীনা-সম্রাট আমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গেলেন গুণবর্মণকে। মধ্যদেশ, বারাণসী, পূর্বভারত তথা বঙ্গদেশ ও কামরূপ এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল থেকে বৌদ্ধশ্রমণরাও চীনদেশে গিয়েছিল ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অগ্রদূত হিসাবে। কনৌজের কৌমুদী-সঙ্ঘারামের ধর্মগুপ্ত টক্কের দেববিহারে কিছুদিন অতিবাহিত ক'রে তারপর চীনদেশে গমন করেন। উত্তর-পঞ্জাবের এই টক্কদেশ থেকেই টক্করাগের প্রচলন হয় অভিজাত দেশীসঙ্গীতের সমাজে। সম্ভবত কাঞ্চির পল্লবরাজপুত্র বোধিধর্মও চীনদেশে যান চীনা-সম্রাট য়ুয়ের আমন্ত্রণে। উড্ডীয়ানের (অনেকের মতে দক্ষিণ-ভারতের) বিনীতরুচিও ৫৮২ খৃষ্টাব্দে চীনসাম্রাজ্যে যান। সুতরাং দেখা যায় ভারতের প্রায় সকল দিক থেকে ভারতীয় সংস্কৃতির অগ্রদূতেরা চীনদেশে গমন করেছিলেন। ৬৪১ খৃষ্টাব্দে মহারাজ হর্ষবর্ধনও প্রথম রাজনীতিক দল প্রেরণ করেছিলেন চীনসাম্রাজ্যে। গান্ধার, মগধ, কাশ্মীর, কপিশা, উড্ডীয়ানের সঙ্গে চীনের রাজনৈতিক সম্পর্ক বজায় ছিল অবশ্য আগে থেকেই।

সিন্‌বংশের রাজত্বের সময়ে (খৃষ্টীয় ৩১৭-৪০২) চীনে ছোট বড় ক'রে অন্তত ১৭,০৬৮টি বৌদ্ধসংঘের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সাঙ্‌বংশের রাজত্বের সময় চীনদেশে শিল্পসংস্কৃতির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। তাতে ক'রে গান্ধার ও ইরাণী ভাবের কিছুটা সংমিশ্রন হ'লেও ভারতীয় আদর্শেরই ছিল প্রভাব ও প্রবুদ্ধ প্রেরণা।

ভারতের ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিদেশীয় সংস্কৃতিও চীনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। কুচী তখন ভারতীয় সঙ্গীতশিল্পীদের প্রধান কেন্দ্র-রূপে পরিণত হয়েছিল। কুচীর ভারতীয় শিল্পীরাই সম্ভবত চীনদেশে ভারতীয় সঙ্গীতের বীজ রোপন করেছিল। চীনের রাজদরবারেও ভারতীয় সঙ্গীতের আসন হয়েছিল প্রতিষ্ঠিত।

খৃষ্টীয় ৫৮১ খৃষ্টাব্দে চীনা-সম্রাটের আমন্ত্রণে ভারতবর্ষ থেকে একদল সঙ্গীতশিল্পী প্রেরিত হয়েছিল। চীনা-সম্রাট কুচী, সমরকন্দ, বুখারা, কাশগর, জাপান, কাম্বোজ (কাম্বোডিয়া) প্রভৃতি দেশ থেকেও সঙ্গীতশিল্পীদের আমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে যান। সে' সময়ে কোরিয়াতেও অনেক ভারতীয় সঙ্গীতশিল্পীরা বাস করত। কোরিয়ার রাজা শিরগী ৫৮১ খৃষ্টাব্দের কিছু আগেই কোরিয়া থেকে একদল ভারতীয় শিল্পীকে জাপানে পাঠিয়ে দেন। চীনের প্রাচীন নথিপত্র থেকে জানা যায় যে-সকল ভারতীয় সঙ্গীতশিল্পী চীনে প্রেরিত হয়েছিল তাদের পরিধানে পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল: মাথায় কাল টুপি, গায়ে সিল্কের কাপড় (চাদর?) ও লাল রঙের জামা। তাদের পায়ে ছিল দড়ির জুতা। সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র ছিল বিভিন্ন রকমের: চামড়ার বাদ্য—মৃদঙ্গ, বাঁয়া ও তবল (?)[১], গঙ্, সানাই, বীণা, তানপুরা[২], করতাল ও শঙ্খ। খৃষ্টীয় ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতীয় সঙ্গীতের সমাদর এতই বেশী হয়েছিল যে সম্রাট কাওস্থ (খৃষ্টীয় ৫৮১-৫৯৫) নাকি নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন ভারতীয় সঙ্গীতের অনুশীলন বন্ধ করার জন্য। কিন্তু সেই নিষেধাজ্ঞার ফল হয়েছিল বিপরীত, তাঁর উত্তরাধিকারী সম্রাট ইয়াঙ্-টি তাঁর রাজদরবারে ভারতীয় সঙ্গীতকে আবার সমাদরে স্থান দিয়েছিলেন। তাঁর রাজদরবারে পো-মিঙ্-টা নামে ইন্দোচীন-বংশের একজন সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন, তাঁর সহায়তায় কতকগুলি রাগও তিনি নাকি রচনা ও প্রবর্তন করেছিলেন।

খৃষ্টীয় ৫৬০-৫৭৮ শতাব্দীতে চীনের রাজদরবারে সুজীব নামে একজন ভারতীয় শিল্পীর নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতীয় সঙ্গীতে তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি বীণাবাদ্যে পারদর্শী ছিলেন। চীনদেশের সঙ্গীত-পিপাসুদের তিনি ভারতীয় রাগপদ্ধতি শিক্ষা দিতেন। যতদূর জানা যায় খৃষ্টীয় ৯ম-১০ম শতাব্দী পর্যন্ত চীনের অধিবাসীরা ভারতীয় সঙ্গীতেরই সাধক

১। কিন্তু খৃষ্টীয় ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীতে তবল ও বাঁয়ার সৃষ্টি বা প্রচলন হয় নি, সুতরাং এ' বিবরণ প্রামাণিক কিনা সন্দেহ। ডা: বাগচীর 'ভারত ও চীন' পুস্তিকায় 'চীনদেশে ভারতীয় সংগীত' আলোচনা দ্রষ্টব্য।

২। তানপুরা তখন 'তুম্বীবীণা' নামে পরিচিত ছিল।

ছিল। চীন ও কোরিয়া থেকে ভারতীয় সঙ্গীতের অভিযান শুরু হয় জাপানে। জাভা (যবদ্বীপ), বালি (বলিদ্বীপ), সুমাত্রা, কম্বোজ প্রভৃতি দেশেও ভারতীয় সঙ্গীতের অনুশীলন ও সমাদর ছিল। গান্ধার, কপিশা, উড্ডীয়ান, কাশগর, কুচী এবং খোটানেও ভারতীয় সঙ্গীতের অনুশীলন যে অব্যাহত ছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তিব্বতের ধর্মসঙ্গীতগুলিতে এখনো ভারতীয় সামগানের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। খোটান, কাশগর প্রভৃতি স্থানে ভারতীয় সঙ্গীতের যে এক সময়ে বিশেষ সমাদর ছিল স্যর অরেল ষ্টাইন (Sir Aurel Stein) তাঁর 'খোটানের ধ্বংসস্তূপ' (*Sand-Burried Ruins of Khotān*) ও 'আন্তর এশিয়া' (***Innermost Asia***) প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি খোটানের রাজধানী যোৎকানের বালুস্তূপ থেকে যে কয়েকটি তাম্রমুদ্রা, খরোষ্ঠী ভাষায় তাম্রলিপি ও পোড়ামাটির মূর্তি পেয়েছিলেন সে'গুলি মধ্য-এশিয়ায় অতীত যুগের প্রাচীন সভ্যতার সাক্ষ্য দান করে। প্রাপ্ত আটটি বানরের মূর্তির মধ্যে একটিকে বৌদ্ধযুগের বীণার মতো বাদ্যযন্ত্র ও অপরটিকে মৃদঙ্গবাদ্যে ব্যাপৃত দেখা যায়। খৃষ্টীয় ৪০০ শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন খোটানে অনেকগুলি বৌদ্ধমন্দির ও বিহার দেখেছিলেন।[৩] যোৎকানের ধ্বংসস্তূপ থেকে প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির কতকগুলি উপাদান (তাম্রমুদ্রা) পাওয়া গেছে এবং তাতে নাকি খৃষ্টীয় ৬১৮-৯০৭ শতাব্দীর চীনের সাঙ্‌বংশের নিদর্শন সুস্পষ্ট।[৪] স্যর ষ্টাইন উল্লেখ করেছেন দ্বিতীয় হাঙ্‌বংশের বিচিত্র নিদর্শনও খোটানের বালুস্তূপের মধ্যে নীরবে আত্মগোপন ক'রে আছে। তা'ছাড়া একটি কক্ষের ধ্বংসস্তূপ থেকে গীটারের মতো একটি বাদ্যযন্ত্র পাওয়া গেছে ও তা দেখতে অবিকল ভারতীয় রবাবের মতো। স্যর ষ্টাইন তার উল্লেখ ক'রে বলেছে : "I strangely recalled the disposition of rooms, etc., I had observed in modern Khotān dwelling places

৩। "From the detailed description which the earlier Chinese pilgrim Fá-hien gives of the splendid Buddhist temples and monasteries he saw on his visit to Khotān (circ. 400 A.D.) * *."—*Sand-Buried Ruins of Khotān* (1904), p. 241.

৪। "The copper coins, which are found plentifully, range from the bilingual pieces of the Indigenous rulers, showing Chinese characters as well as early Indian legends in Kharoshthi, struck about the commencement of our era, to the square-holed issues of the T'ang dynasty (618-907 A.D.)."—*Ibid.*, p. 242.

of some pretensions. In a room, which seems to have served as an office, there were found, besides a number of inscribed tablets of varying shape, * *; also writing pens of tamarisk wood; eating-sticks of wood like those still used by the Chinese; * *. In the long, narrow passage that traverses this house I came upon the well-preserved upper part of a guitar, resembling the Rabāb still in popular use throughout Turkestān, and retaining bits of the ancient string, as well as upon more samples of carpet materials."[৫] এ' ছাড়া- মধ্য-এশিয়া, কাউ-সু ও পূর্ব-ইরাণের বিভিন্ন অঞ্চল খনন ক'রে যে সকল উপাদান পাওয়া গেছে তার বিস্তৃত বিবরণ দিতে গিয়ে স্তর ষ্টাইন তাঁর *Innermost Asia* (1927) নামক সুবৃহৎ গ্রন্থে বিভিন্ন প্রাচীরচিত্র, ভাস্কর্যমূর্তি ও বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ করেছেন। সেই বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে কোনটি পাওয়া গেছে কুচীতে (কুচা—*Ch'in tzŭ*), কোনটি কাশগর ও লোয়্-লেনের মাঝামাঝি স্থানে, কোনটি চীনা-তুর্কীস্থানে, তুর্ফানে অস্তানের সমাধিস্থানে ও কোনটি বা কারা-খোতো ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে।[৬] মাননীয় ষ্টাইন ৩য় খণ্ডে চিত্রের পরিচয়প্রসঙ্গে (Vide Vol. III,

৫। Vide (a) *Sand-Buried Ruins of Khotān* (London, 1904), p. 357.
(b) *Ancient Khotān,* Vols. I & II.

৬। স্তর অরেল ষ্টাইন উল্লেখ করেছেন:

(*a*) " * * by the notices of Kucha (*ch'iu-tzŭ*) contained in the dynastic annals and other Chinese texts from Han to T'ang times, and on the other by the number and extent of the Buddhist sacred sites to be found in the district."—*Innermost Asia* (Detailed Report of Explorations in Central Asia, Kau-su and Eastern Iran, 1927), Vol. II, Chapt. XXIII, p. 803.

(*b*) "The fondness of the people for good living, amusements of various sorts, and music is quite correctly brought out. It still survives with the modifications involved by the changes of times."—Vide "Turfan under the Uigurs", Ibid., Vol. II, p. 583.

(*c*) "The musical instrument played by a girl in the fragment (Ast. iii. 4. 010.e) on the right of Pl. CVI closely resembles in shape the type of the *genkin* which the *Shōsōin Catalogue* (i. plate 42, 57) illustrates from specimens actually to be found in the great collection deposited by the Empress Kōken in A.D. 748."—Ibid., Vol. II, p. 657.

Plates and Plans, p. CVI, Fragments from different panels of Silk Painting, Ast, iii, 4. 010. b. J, From Astána Cemetery) উল্লেখ করেছেন সাতজন চীনা সুন্দরীকে (অপ্সরা ?) একটি চিত্রে দেখা যায় তার আকৃতি অনেকটা ইংরাজী বাদ্যযন্ত্র ব্যাঞ্জোর মতো। ঠিক এ'ধরণের যন্ত্রই খোটানের বালুস্তূপ থেকে পাওয়া গেছে। এই গ্রন্থের শেষের দিকে চিত্র-পরিচয়ে বাদ্যযন্ত্র দু'টির প্রতিকৃতি দেওয়া হ'ল। পুনরায় আর একটি চিত্রে দেখা যায় (Vide Vol. III, p. CVII, pieces of Paintings on paper and silk from Khara-Khoto, Astána Cemetery and Watch-Station, y, 11) জনৈক চীনাবেশী সম্রাট সিংহাসনে আসীন। সামনে একজন সেবক তাঁকে পানপাত্র দিচ্ছে ও তার পাশে দু'জন চীনা-অমাত্য আসীন। সামনের দিকে একটি চীনা-নটী নৃত্য করছে। পাশে একজন মৃদঙ্গজাতীয় (?) বাদ্যযন্ত্র ও একজন বাঁশী বাজাচ্ছে এবং নীচে একজন শিল্পী নত হ'য়ে একটি গঙ্জাতীয় বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে। অস্তানের সমাধিস্থানে প্রাপ্ত একটি চিত্রে দু'জন নর্ত্তকের প্রতিকৃতিও পাওয়া গেছে (Vide Vol. III, pp. CVIII and CIX)।[৭] নৃত্য, গীত ও বাদ্য তথা সঙ্গীতের স্বতন্ত্র অনুশীলন সকল দেশেই ছিল এবং নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও পদ্ধতি সকল সভ্য দেশেরই থাকে এ'কথা স্বীকার্য। তবে পূর্ব ও মধ্য-এশিয়ার অতীত গৌরবগাথার সঙ্গে ভারতবর্ষের অনেক-কিছুই যে জড়িত বা সম্পর্কিত এ'কথা ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে জানা যায়। খৃষ্টপূর্বাব্দে ও খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার

(*d*) (Two women's heads found) : "Fig. behind appears to hold large stringed musical instrument resembling a *genkin* with gilded edges, five frets, and long yellow head. No strings shown. Head of the first woman obscures most of body of instrument, the sides of which are foiled in prob. nine slight curves, that at top running up to neck. Both hands of musician are covered by her long sleeves."—"From Cemeteries near Astana", Ibid., Vol. II, p. 694.

(*e*) KK. II. 0233. b. 0280., a. 0290. a. Frs. of block-printed Paper leaves : * * "To R. of centre is an orchestra of seven female celestial performers, all imbate. The instruments include cymbals, mouth organ, (*wu*), clappers, whistle, conch, syrinx, the Chinese elongated lute and possibly another instrument not recognizable."—Antiques from Khara-Khoto and Neighbouring Sites : Vol. I, p. 482.

—(All from *Innermost Asia* (1927), Vols. I-III by Sir Aurel Stein).

৭। Vide *Uttaramndrā* (a monthly journal of music), Vol. I, March, 1940.

দিকে বৌদ্ধভিক্ষুদের ধর্মপ্রচার ও ভারতীয় বণিকদলের বাণিজ্যব্যাপারই ভারত এবং মধ্য-এশিয়া ও সুদূর-প্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির যোগসূত্র রচনা করেছিল। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তো বটেই। ডাঃ বাগচী *On the Duffusion of Indian Music in Ancient Times* নিবন্ধে[৮] ভারত ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গীতের অনুপ্রবেশের কথা বর্ণনা করেছেন। অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভিও ৭ম শতাব্দীতে চীনদেশে ও জাপানে ভারতীয় সঙ্গীতের অনুশীলনের কথা উল্লেখ করেছেন।[৯] ভারতের সপ্ত স্বর, গ্রাম, মূর্ছনা প্রভৃতির প্রমাণ চীনদেশের প্রাচীন পুঁথিপত্রের মধ্যেও পাওয়া যায়। ডাঃ বাগচী *Indian Civilization in Central Asia* প্রবন্ধেও চীনদেশের সাঙ্গীতিক স্বরকে ভারতের অবদান ব'লে উল্লেখ করেছেন।[১০] তিনি তাঁর 'ভারত ও চীন', 'ভারত ও মধ্য-এশিয়া', 'ভারত ও ইন্দোচীন' প্রভৃতি পুস্তিকায় পূর্ব ও মধ্য-এশিয়ার দেশগুলিতে ভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতির প্রসার ও সমাদরের কথা উল্লেখ করেছেন। এ'ছাড়া কম্বোজ, এঙ্কোর, চম্পা প্রভৃতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে ভারতের অবদান উল্লেখযোগ্য। এঙ্কোরের বায়ন, টা-প্রোম, প্রা-খান, এঙ্কোর-ভাট প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ ইন্দ্রবর্মণ, যশোবর্মণ, সূর্যবর্মণ প্রভৃতির বিজয়গাথার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দোচীন ও ভারতের গৌরবকাহিনীর কথা প্রকাশ করে। খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রথমে চম্পার সঙ্গে তাম্রলিপ্ত-বন্দরের যোগসূত্র ও ভারতীয় শিল্প ও সভ্যতার অনুপ্রবেশের কথা সুবিদিত। ইন্দোচীনের সঙ্গীত-সংস্কৃতিও ভারতের কাছে ঋণী। আমরা চিত্রে পূর্ব ও মধ্য-এশিয়া ও বৃহত্তর-ভারতের সঙ্গীতানুশীলনের পরিচয় দেবার চেষ্টা করব।

৮। Vide *The Four Arts Annual,* 1935.

৯। প্রজ্ঞানানন্দ : 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' (পূর্বভাগ), পরিশিষ্ট (২য়) দ্রষ্টব্য।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

।গুপ্তযুগ ও পুরাণসাহিত্যে সঙ্গীত॥
(খৃষ্টীয় ৩য়-৪র্থ—৭ম শতাব্দী)

পুরাণে সঙ্গীতের আলোচনা করার আগে পুরাণ সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা দরকার। 'পুরাণ'-শব্দটি প্রাচীনতার পরিচায়ক। বায়ুপুরাণে (১।২০৩) 'পুরাণ'-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত (সার্থকতা-নির্ণয়ক) অর্থের পরিচয় দেওয়া হয়েছে : "যস্মাৎপুরা হি অনতীদং পুরাণম্"। পুরাণ সাহিত্যের অন্তর্গত, আবার ইতিহাসও বটে। অধ্যাপক উণ্টারনিজের মতে অতীত আখ্যানই পুরাণ : The word *purāṇa* means originally nothing but *purāṇam ākhyānam* i.e. old narrative". কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতক) 'পুরাণ' ও 'ইতিবৃত্ত' শব্দদু'টির উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ ও বৌদ্ধসাহিত্যে সাধারণত ইতিহাসের সম্পর্কে 'পুরাণ'-শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়।[১] অনেক জায়গায় আবার 'ইতিহাস' ও 'পুরাণ' অথবা 'ইতিহাস-পুরাণ' শব্দেরও উল্লেখ আছে।[২] অনেকে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত পুরাণ ও ইতিবৃত্ত শব্দদু'টির পার্থক্য দেখিয়েছেন এ'ভাবে যে ইতিবৃত্তে থাকে বিভিন্ন সময়ের সত্যকারের ঘটনা আর পুরাণে থাকে পৌরাণিকী কাহিনী বা ঘটনার সমাবেশ : একটিতে থাকে 'historical events' ও অপরটিতে থাকে 'mythological and legendary lore', আর তারি জন্য পুরাণকে ইতিহাস পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, কিন্তু পুরাণ ইতিবৃত্ত নয়। এখানে 'ইতিহাস' ও 'ইতিবৃত্ত' পরিভাষা-দু'টির মধ্যে বেশ কিছুটা দ্যোতনার ও অর্থের পার্থক্য দেখা যায়।

প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থ গৌতমীয়ধর্মশাস্ত্রে পুরাণের যে নাম পাওয়া যায় তাকে

১। অথর্ববেদ (১১।৭।১৪ ; ১৫।৬।৪), শতপথব্রাহ্মণ (১৩।৪।৩ ; ১১।৫।৬, ৮), গোপথব্রাহ্মণ (১।১০), জৈমিনীয়-উপনিষদ্ব্রাহ্মণ (১।৫৩), বৃহদারণ্যক-উপনিষৎ (২।৪।১০, ৪।১।২), ছান্দোগ্য উপনিষৎ (৩।৪।১-২, ৭।১।২, ৪, ৭।২।১, ৭।৭।১), তৈত্তিরীয় আরণ্যক (২।৯), শাঙ্খ্যায়ন-শ্রৌতসূত্র (১৫।২।২৭), গৌতমীয়ধর্মসূত্র (৮।৬, ১১।১৯) প্রভৃতি বৈদিক, ব্রাহ্মণে ও সূত্র-সাহিত্যে ইতিহাসের প্রসঙ্গে 'পুরাণ' শব্দটির উল্লেখ আছে।

২। ছান্দোগ্য-উপনিষদে (৭।১।১, ৪) ইতিহাস ও পুরাণ শব্দদু'টি পৃথকভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

বেদের মতো সাহিত্যের পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আপস্তম্বীয়ধর্মসূত্রেও পুরাণের উল্লেখ আছে। ধর্মসূত্রগুলির রচনাকাল মোটামুটিভাবে খৃষ্টপূর্ব ৫ম-৩য় শতক বলা যায়। অবশ্য বিভিন্ন পণ্ডিতদের মধ্যে কল্প ও ধর্মসূত্রাদির রচনা ও সংকলন-কাল নিয়ে মতভেদ আছে।[৩] যাইহোক ধর্ম ও গৃহ্যসূত্র-গুলিতে 'পুরাণ'-শব্দের উল্লেখ থাকায় আসল পুরাণগুলি (অবশ্য সমস্ত পুরাণ নয়)[৪] যে প্রাচীন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মহাভারত আগে—কি পুরাণ আগে এই নিয়েও মতভেদ আছে—যেমন আছে রামায়ণ ও মহাভারতের পৌর্বাপর্য নিয়ে মতদ্বন্দ্ব। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে বর্তমান আকারের মহাভারত-রচনার আগেই পুরাণসাহিত্যের অস্তিত্ব (প্রচলন) ছিল। অবশ্য মহাভারতে (১।৫।৫৫) 'পুরাণ'-শব্দটি বিশেষ ও সাধারণ দু'রকমভাবে উল্লিখিত হয়েছে। তা'ছাড়া মহাভারতে যেখানে (১৮।৬।৩০৪) পুরাণকে সাহিত্য হিসাবে গণ্য করা হয়েছে সেখানে আঠারটি

৩। "It is difficult to assign any precise date to the Kalpa-sūtra texts. The dates of the principal Śrauta-sūtras (viz. those of Āpastamba, Āśvalāyana, Baudhāyana, Kātyāyana, Śāṅkhyāna, Lātyāyana, Drāhyāyana and Sātyāshadha) and some of the Grihya-sūtras (Āśvalāyana, Āpastamba, etc.), have been fixed between 800 and 400 B.C. The Dharma-sūtras of Gautama, Baudhyāyana, Vāsishtha and Āpastamba have been placed by eminent scholars like Bühler and Jolly between the sixth and fourth (or third) centuries B.C., though others assign a somewhat later date. But although none of the extant Dharma-sūtras is older than 600 B.C., there is no doubt that there were works of this class belonging to an earlier period. For not only the oldest text, viz. *Gautama-Dharma-sūtra,* probably belonging to sixth century B.C., refers, both directly and indirectly, to other works of this class, but even Yāska's *Nirukta* seems to allude tb them. On the whole the Kalpa-sūtras may be roughly placed between the eighth and third centuries B.C."—*The History and Culture of the Indian People* (second impression, 1952), Vol. I, p. 477. Cf. also Dr. Kane: *History of the Dharmaśāstras,* Vol. I, pp. 8-9; *Sacred Books of the East, II.* XIV, Introduction.

৪। ডাঃ হাজরার অভিমত যে কতকগুলি পুরাণের উল্লেখ আপস্তম্বীয়ধর্মসূত্র প্রভৃতিতে থাকলেও তার দ্বারা এ'কথা বোঝাবে না যে আঠারটি পুরাণ ঋষি আপস্তম্বের সময়ে প্রচলিত ছিল: "The existence of more Purāṇas than one in Āpasthamba's time or earlier does not, however, mean that the canon of eighteen Mahāpurāṇas came into vogue at such an early period. As a matter of fact that canon can be scarcely be dated earlier than the third century A.D."—*Studies In the Purāṇic Records and Hindu Rites and Customs* (1940), p. 2.

পুরাণ প্রাচীনকাল থেকেই কাহিনীর আকারে প্রচলিত ছিল (?) এ'কথাই বলা হয়েছে। মহাভারতের অনেক জায়গায় 'পুরাণে কথিতম্', 'পুরাণে উক্তম্' শব্দগুলির ব্যবহার দেখা যায়। খিলহরিবংশে তথা মহাভারতের পরিশিষ্টে বায়ুপুরাণ থেকে অনেক অংশ উদ্ধৃতি দেখা যায়। অনেকের মতে এ'গুলি পরবর্তীকালের প্রক্ষিপ্ত অংশ। মাননীয় ল্যূডার্স বলেছেন ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যানটি মহাভারত ও পদ্মপুরাণ উভয় গ্রন্থেই উল্লেখ আছে, কিন্তু মহাভারতের চেয়ে পদ্মপুরাণে উল্লিখিত কাহিনিটিই প্রাচীন। অধ্যাপক উন্টারনিজের অভিমত অনেকটা তাই।[৫]

পুরাণের পাঁচটি লক্ষণ :

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরানি চ।
বংশানুচরিতং চেতি লক্ষণানাং তু পঞ্চকম্॥

সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত এই পাঁচটি লক্ষণ পুরাণের প্রকৃতি বা ধর্ম। প্রতিসর্গ অর্থে মুখ্যসৃষ্টি, সর্গ অর্থে গৌণসৃষ্টি, বংশ—বিভিন্ন রাজ্য-শাসকদের বংশকাহিনী, মন্বন্তর—মনুর কাল এবং বংশানুচরিত বলতে সূর্য ও চন্দ্র বংশ-দু'টির অন্তর্গত বিভিন্ন নৃপতি ও তাঁদের পূর্বপুরুষদের প্রসঙ্গ। ঐতিহাসিক রামচন্দ্র দীক্ষিতরের অভিমত যে পঞ্চলক্ষণটিতে কোন চাক্ষুষ বা বাস্তব ঘটনার পরিচয় মিলবে এমন কোন কথা নেই, তবে এর দ্বারা সত্যকারের কোন্‌টি প্রাচীন বা আধুনিক পুরাণ তা নির্ণয় করা সম্ভব হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন পুরাণ হিসাবে আমরা দু'তিনটি মাত্র পেয়ে থাকি, নচেৎ আঠার এই বিভিন্ন পুরাণের সৃষ্টি বা বিকাশ হয়েছিল পরবর্তী যুগে।

আখ্যায়িকা হিসাবে সমাজে পুরাণ বিস্তৃতি ও সমাদর লাভ করেছিল বৈদিক যুগের শেষের দিকে। ছান্দোগ্য উপনিষৎ ও বৌদ্ধগ্রন্থ সুত্তনিপাত এ'দুটি গ্রন্থই নাকি পুরাণকে পঞ্চমবেদের কৌলিন্য দান করেছে।[৬] অথর্ববেদে উল্লেখ আছে যে ঋক্, সাম, ছন্দ ও পুরাণগুলি যজুর্বেদের সঙ্গে যজ্ঞের উপাদান থেকে সৃষ্টি হয়েছে : "ঋচঃ সামানি ছন্দাংসি পুরাণম্ যজুষা সহ উচ্ছিষ্টাজ্জজ্ঞিরে"।

৫। "From all this it appears that Purāṇas, as a species of literature, existed long before the final reduction of the Mahābhārata, and that even in the Purāṇas which have come down to us there is much that is older than our present Mahābhārata".—*A History of Indian Literature,* Vol. I, p. 521.

৬। Vide *The Indian Historical Quarterly,* Vol. VIII, Dec. 1932, No. 4, p. 751.

বৃহদারণ্যক উপনিষদে (২।৪।১০) উল্লিখিত হয়েছে : "মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতম্ এতদ্ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্"। শতপথ-ব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্য উপনিষৎ, সাংখ্যায়ন-শ্রৌতসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থেও পুরাণের পঞ্চম বেদ ব'লে উল্লেখ আছে।

পুরাণের রচয়িতা বা সংকলিতা হিসাবে আমরা বেদ-বিভাগকারী বেদব্যাসের নাম পাই। এই বেদব্যাস প্রকৃতই ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা এ'নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। অবশ্য ইন্দ্র, ব্রহ্মা, ভরত, প্রজাপতি প্রভৃতির মতো 'ব্যাস'-ও একটি উপাধিবিশেষ। বায়ুপুরাণে (১।৬০) উল্লিখিত হয়েছে,

প্রথমং সর্বশাস্ত্রাণাং পুরাণং ব্রহ্মণা স্মৃতম্।
অনন্তরং চ বক্ত্রেভ্যো বেদাস্তস্য বিনিঃসৃতা ॥

মৎস্যপুরাণেও এর উল্লেখ আছে। এ'থেকে প্রমাণ হয় যে বৈদিক যুগের পরে তথা ক্ল্যাসিক্যাল যুগে আখ্যায়িকার আকারে পুরাণের অস্তিত্ব ছিল। আখ্যায়িকাগুলি পুরাণশ্রেণীর অন্তর্গত, সুতরাং তাদের অস্তিত্ব বেদ-সংকলনের আগেও ছিল ও পরে আখ্যায়িকা-রূপে বেদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এ'কথা অনেকে বলেন এবং যুক্তি প্রদর্শন করেন : "প্রথমং সর্বশাস্ত্রাণাং পুরাণং ব্রহ্মণা স্মৃতম্",—বেদ-রচনার আগেই ব্রহ্মা মনে মনে অনুশীলনের দ্বারা পুরাণ সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু শ্লোকের তাৎপর্য এই নয় যে, পুরাণ রচিত হয়েছে আগে ও বেদের সংকলন কিংবা বেদের বিভাগ পরে, আর তারি জন্য পুরাণ বেদের চেয়ে প্রাচীন।[৭] ঔপনিষদিক যুগের প্রারম্ভে পুরাণগুলি অবশ্য বর্তমান নামে পরিচিত হয়েছিল। ডাঃ ওয়েবার এ'কথাই বলেছেন[৮]। মনে হয় রামচন্দ্র দীক্ষিতর ডাঃ ওয়েবারের অভিমতকে অনুসরণ করেছেন। অধ্যাপক ম্যাকডোনেলের মতে ঋক্‌মন্ত্রগুলিই ভারতীয় দর্শন ও পুরাণের পূর্বরূপ।[৯]

পুরাণগুলির মধ্যে দেশীয় বা প্রাদেশিক ব্রাহ্মণ্যপ্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন ব্রহ্মপুরাণে উৎকল বা উড়িষ্যার, পদ্মপুরাণে পুষ্করের, অগ্নিপুরাণে গয়ার,

৭। মাননীয় রামচন্দ্র দীক্ষিতরও এ'কথাই বলেছেন : "This need not mean that the Purāṇa as an independent literature grew up before the Vedic composition. It means that legendary lore existed from remote times and was handed down to posterity without interruption. The Purāṇa or old tales existed but not the Purāṇic literature as such".—Cf. *The Indian Historical Quarterly*, Vol. VIII, Dec. 1932, No. 4, pp. 752-753.

৮। Vide Dr. Weber : *History of Indian Literature* (1914), p. 24.

৯। Vide Macdonell : *History of Indian Literature*, p. 138.

বরাহপুরাণে মথুরার, বামনপুরাণে থানেশ্বরের, কূর্মপুরাণে বারাণসীর, মৎস্যপুরাণে নর্মদার ব্রাহ্মণদের প্রভাবের পরিচয় আছে। একটি পুরাণের মধ্যে একাধিক পুরাণের কাহিনী এবং ভাবধারারও মিশ্রণ আছে। মাননীয় পার্জিটারের অভিমত যে ভবিষ্যপুরাণটি মৎস্য, বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের উপাদান বা উপকরণ নিয়ে সংকলিত হয়েছিল। কতকগুলি পুরাণ প্রাকৃতভাষায় ও কতকগুলি আবার সংস্কৃতভাষায় লিখিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে প্রাকৃতভাষার পুরাণগুলিকে আবার সংস্কৃতে রূপান্তরিত করা হয়েছিল।[১০]

কতকগুলি পুরাণে অন্যান্য প্রাচীন রাজাদের নামের সঙ্গে সঙ্গে, সুঙ্গ নন্দ, মৌর্য, শিশুনাগ, অন্ধ্র ও গুপ্ত রাজাদের নাম ও বংশের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১১] সুঙ্গরাজাদের ভিতর মহারাজ বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর নামের উল্লেখ আছে। জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যে এদের (পুরাণগুলিকে) মহাবীর ও বুদ্ধদেবের সমসাময়িক (খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতক) বলা হয়েছে। ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ বিষ্ণুপুরাণে মৌর্যবংশের ও মৎস্যপুরাণে অন্ধ্রবংশের বিবরণের উল্লেখ করেছেন। বায়ুপুরাণে গুপ্তবংশের উল্লেখ আছে ও এ'থেকে অনুমান হয় যে, এই পুরাণটি গুপ্তযুগেই লিখিত (সংকলিত ?) হয়েছিল।

পুরাণগুলিতে রাজবংশাবলীর পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে শূদ্র, ম্লেচ্ছ, আভীর, শক, যবন, তুষার, হূন প্রভৃতি জাতির এবং বিশেষভাবে গন্ধর্বদের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। গন্ধর্বদের বিষয় পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। সম্রাট অশোকের সময় গন্ধর্বরা স্বাধীন জাতি হিসাবে পরিচিত ছিল। তারা নৃত্য, গীত ও বাদ্যের ছিল একান্ত অনুরাগী। উত্তরাপথে (ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল) গান্ধার-দেশের তারা অধিবাসী ছিল। পালিসাহিত্যে গান্ধারের পাশাপাশি কাশ্মীরের উল্লেখ আছে। রামায়ণে (২।৬৮।১৯-২২ ; ৭।১১৩।১৪) গান্ধারদেশকে 'গন্ধর্ব-বিষয়'-ও বলা হয়েছে। একটি বৌদ্ধজাতকে কাশ্মীরকে গান্ধাররাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। পুনরায় গান্ধার ও কাশ্মীর দেশ-দু'টি নাকি পৃথক পৃথকভাবে একজন রাজার অধীনে ছিল এ'কথারও উল্লেখ পাওয়া যায়। খৃষ্টপূর্ব ৫৪৯—৪৮৬ শতকে কাশ্যপ-প্যারোস>কাশ্যপপুর>কাশ্মীর নাকি মেলিতোষের রাজা হেকাতোষের নিয়ন্ত্রাধীনে ছিল। কাশ্যপপুর বা কাশ্মীর তখন

১০। Cf. V. S. Rao : *The Quarterly Journal of the Andhra Historical Research Society*, Vol. II, Octo. 1927, No. 2, p. 84.

১১। Cf. Dr. Winternitz : *A History of Indian Literature*, Vol. I, p. 526.

গান্ধারদেশের একটি নগরবিশেষ ছিল। গন্ধর্বেরা সিন্ধুনদের উত্তর পার্শ্বে রাজত্ব বিস্তার করেছিল। চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন-সাঙ্ পুরুষপুরকে (বর্তমান পেশোয়ার) গান্ধারের (দেশ) রাজধানী ব'লে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন গান্ধার ও গন্ধর্বদেশ সিন্ধুনদ ও সুলেমান-পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল।[১২] পুরাণগুলিতে গন্ধর্বজাতির সঙ্গীতপ্রতিভার কথা উল্লেখ আছে। নারদ, তুম্বুরু, বিশ্বাবসু, হাহা, হুহু প্রভৃতি গন্ধর্বদের সঙ্গে সঙ্গে নর্তকী তিলোত্তমা, মিশ্রকেশী, রম্ভা ইত্যাদি নর্তকীদেরও (দেবদাসী?) উল্লেখ আছে। নারদ, তুম্বুরু এঁরা গন্ধর্বদের আচার্যস্থানীয় ছিলেন। পুরাণগুলি নারদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

দিগম্বর জৈনসম্প্রদায় নাকি খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী থেকে তাঁদের পুরাণ-রচনার কাজ আরম্ভ করেন। অধ্যাপক উন্টারনিজ বলেছেন প্রায় ৬২৫ খৃষ্টাব্দে কবি বাণ তাঁর হর্ষচরিতে উল্লেখ করেছেন যে তিনি তাঁর জন্মভূমিতে বায়ুপুরাণ পাঠ করেছিলেন। মীমাংসাকার কুমারিল (প্রায় ৭৫০ খৃষ্টাব্দ) ও শংকরাচার্য (খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দী) পুরাণের বহু অংশ প্রমাণবাক্য হিসাবে তাঁদের ভাষ্যে উদ্ধৃত করেছেন দেখা যায়। ১২শ শতাব্দীতে রামানুজের ভাষ্যে পুরাণের উদ্ধৃতি বরং বেশী। প্রায় ১০০০—১০৩০ খৃষ্টাব্দে আরব পরিব্রাজক আলবেরুণী আঠারটি পুরাণ সম্বন্ধে বিদিত ছিলেন। তিনি তাঁর ভ্রমণবিবরণীতে আদিত্য, বায়ু, মৎস্য ও বিষ্ণুপুরাণের অনেক অংশ উল্লেখ করেছেন। বিষ্ণুধর্মোত্তর-পুরাণখানি নাকি তিনি বিশেষভাবে পাঠ করেছিলেন।[১৩]

পুরাণগুলির রচনাকাল নিয়ে মতভেদ আছে। ডাঃ হাজরা মার্কণ্ডেয়, ব্রহ্মাণ্ড, বায়ু, বিষ্ণু, ভাগবত ও মৎস্যপুরাণগুলি রচনাকাল নির্ণয় করেছেন :

(১)	মার্কণ্ডেয়পুরাণ	...	খৃষ্টীয় ৩য় থেকে ৫ম শতাব্দী (অনেকে কিছু পরেও বলেন)।
(২)	ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ	...	খৃষ্টীয় ৩য় থেকে ৫ম শতাব্দী।
(৩)	বায়ুপুরাণ		
(৪)	বিষ্ণুপুরাণ	...	খৃষ্টীয় ৩য় থেকে ৪র্থ শতাব্দী।
(৫)	ভাগবতপুরাণ	...	খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী

১২। Cf. ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া : *Asoka and His Inscriptions* (1946), pt. I, pp. 92-93

১৩। Dr. Winternitz : *A History of Indian Literature,* Vol. I, p. 326.

(৬) মৎস্যপুরাণ ... খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ থেকে ৭ম শতাব্দী (অনেকে আবার খৃষ্টীয় ১০০০০ শতাব্দী কিংবা তার আগেও বলেন।

প্রধান বা মহাপুরাণ সংখ্যায় ১৮টি ও তাদের নাম : ব্রহ্ম, পদ্ম, বৈষ্ণব, শৈব বা বায়বীয়, ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, আগ্নেয়, ভবিষ্য বা ভবিষ্যৎ, ব্রহ্মবৈবর্ত, লিঙ্গ, বারাহ, স্কান্দ, বামন, কূর্ম, মাৎস্য, গারুড় ও ব্রহ্মাণ্ড। এ'ছাড়া বিষ্ণুধর্মোত্তরাদি উপপুরাণের সংখ্যাও আঠারটি। পুরাণেও সঙ্গীতের তথা নৃত্যগীত ও বাদ্যের বিবরণ বা আলোচনা আছে। সঙ্গীতের ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে তাদের মূল্য অত্যন্ত বেশী। সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মের বিবর্তন-কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের বিচিত্র বিকাশের কথাও পুরাণগুলিতে পাওয়া যায়। তবে সকল পুরাণেই গান্ধর্ব বা সঙ্গীতের আলোচনা নাই। পুরাণগুলির মধ্যে মার্কণ্ডেয়, বায়ু, অগ্নি, বিষ্ণুধর্মোত্তর (উপপুরাণ) ও বৃহদ্ধর্মপুরাণেই (উপপুরাণ) বিধিবদ্ধভাবে সঙ্গীতের ঔপপত্তিক অংশের আলোচনা আছে। অপরাপর পুরাণেও যে একেবারে সঙ্গীতের বিবরণ নাই—তা নয়, তবে এত কম যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। গুপ্তযুগের মধ্যে আমরা যে কয়টি পুরাণের উল্লেখ পাই তাদের মধ্যে মার্কণ্ডেয়পুরাণে মোটামুটি ও বায়ুপুরাণে বিশেষভাবে (দু'টি অধ্যায়) সঙ্গীতের উপাদানের উল্লেখ আছে। খৃষ্টীয় ৩য়-৪র্থ থেকে ৭ম শতাব্দীর মধ্যে (গুপ্তযুগে) পুরাণসাহিত্যে সঙ্গীতের আলোচনায় তাই মার্কণ্ডেয় ও বায়ু এ'দু'টি পুরাণের অনুশীলন ক'রে সঙ্গীত-উপাদানের পরিচয় দেবার চেষ্টা করব।

॥ মার্কণ্ডেয়পুরাণে সঙ্গীত ॥

পুরাণগুলির মধ্যে মার্কণ্ডেয়, বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড, বিষ্ণু, মৎস্য, ভাগবত ও কূর্মই নাকি প্রাচীন, কারণ আদি-সংস্করণের বেশীর ভাগ উপাদান এই পুরাণগুলির মধ্যে পাওয়া যায়।[১] মার্কণ্ডেয়পুরাণ নাকি এ'গুলির মধ্যে আবার প্রাচীন : "One of the oldest and most important of the extant Purāṇas."[২] মার্কণ্ডেয়পুরাণের বিষয়বস্তুও বিস্তৃত। তবে ঐতিহাসিকরা

১। " * * which are of earlier dates and have preserved much of their older materials."—Dr. Hāzrā : *Studies in the Purāṇic Records on Hindu Rites and Customs* (1940), p. 8.

২। অধ্যাপক উইণ্টারনিজ বলেছেন : " * * probably one of the oldest works of the whole Purāṇa literature."

বলেন এই পুরাণটির (শুধু মার্কণ্ডেয় কেন, সকল পুরাণেরই) সকল অধ্যায় একই সময়ে লিখিত নয়, বিচিত্র বিষয়ের অবতারণা ক'রে বিভিন্ন সময়ে রচিত বা সংকলিত হয়েছিল। বিশেষ করে মাননীয় পার্জিটার[৩], অধ্যাপক উন্টারনিজ প্রভৃতির এই অভিমত। মার্কণ্ডেয়পুরাণের প্রাচীনত্ব নিয়ে অবশ্য ঐতিহাসিকদের ভিতর মতদ্বৈত আছে।[৪]

মার্কণ্ডেয়ঋষির নামানুসারে এই পুরাণটির নাম হয়েছে মার্কণ্ডেয়পুরাণ। শ্রীচণ্ডীর বিবরণ ও মাহাত্ম্যই গ্রন্থের কলেবরকে শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন করেছেন। দেবী দুর্গার মহিমাকীর্তনসূচক 'দেবীমাহাত্ম্য' পুরাণখানিও এই পুরাণের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। 'দেবীমাহাত্ম্য' অংশটি (পুরাণ ?) রচিত ও মার্কণ্ডেয়পুরাণে সংযোজিত হয়েছে সম্ভবত খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পরে নয়। অবশ্য ৯৯৮ খৃষ্টাব্দে লিখিত দেবীমাহাত্ম্যের একখানি পাণ্ডুলিপি নাকি পাওয়া যায় ও সে'জন্য অধ্যাপক ভাণ্ডারকরের অভিমত যে সম্ভবত খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর আগেই দেবীমাহাত্ম্যটি রচিত হয়েছে। খৃষ্টীয় ৬০৮ শতাব্দীতে একটি শিলালিপিতেও নাকি দেবীমাহাত্ম্যের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। তা'ছাড়া অনেক ঐতিহাসিকই স্বীকার করেন যে ৬২৫ খৃষ্টাব্দে কবি বাণভট্ট যে 'চণ্ডীশতক' রচনা করেন তার উপাদানও তিনি দেবীমাহাত্ম্য থেকে গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং সে'দিক থেকে দেবীমাহাত্ম্যের রচনাকাল দাঁড়ায় খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কিংবা খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে।[৫] মাননীয় পার্জিটার

৩। "The Devīmāhātmya, the latest part, was certainly complete in the 9th century and very certainly in the 5th or 6th century A.D. The third and fifth parts (i.e. chapts. 45-81 and 93-136 respectively), which constituted the original Purāṇa, were very probably in existence in the third century, and perhaps even earlier; and the first and second parts (i.e. chapts. 1-9 and 10-44 respectively) were composed between that two periods".—Cf. *Mārkandya-Purāṇa* (Eng. Trans.), Introduction, p. xx.

৪। মাননীয় ভীমশংকর রাওয়ের মতে ব্রহ্মপুরাণই প্রাচীন ও আদি। বিষ্ণুপুরাণ নাকি প্রাচীনতমদের ভিতর তৃতীয়। অনেকে বায়ুপুরাণকে আবার প্রাচীনতম বলেন। তিনি উল্লেখ করেছেন: "The Brahma-Purāṇa stands first and it is called Ādi-Purāṇa and Viṣnu-Purāṇa stands third in the list. Some are of opinion that Vāyu was the oldest."—Cf. *The Quarterly Journal of the Andhra Historical Research Society,* Vol. II, Octo. 1927, No. 2, p. 85.

৫। অধ্যাপক উন্টারনিজ বলেছেন: "We may probably regard those sections as the oldest, in which Mārkandeya is actually the speaker and

মার্কণ্ডেয়পুরাণের সকলের চেয়ে প্রাচীন অধ্যায়গুলির রচনাকাল খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দী ব'লে অনুমান করেন।[৬]

বেদবিভাগকর্তা ও পুরাণ-রচয়িতা বেদভ্যাস বা ব্যাসকে অনেকে সঙ্গীতশাস্ত্রী ব'লেও উল্লেখ করেছেন। সারদাতনয় তাঁর 'ভাবপ্রকাশন' গ্রন্থে বলেছেন,

অস্যাঙ্কমেকং ভরতঃ দ্বাবঙ্কাবিতি কোহলঃ।
ব্যাসাঞ্জনেয়গুরবঃ প্রাহুরঙ্কত্রয়ং যথা॥

শার্ঙ্গদেব কিন্তু সঙ্গীত-রত্নাকরে পূর্বাচার্যগণের তালিকায় ব্যাসের নামোল্লেখ করেন নি। তাই পুরাণ-সংকলিতা ব্যাস ও সঙ্গীতশাস্ত্রী ব্যাস (অবশ্য সঙ্গীত-গ্রন্থকার হিসাবে ব্যাস সত্যিকারের কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা তারও প্রমাণ নাই) এক ও অভিন্ন ব্যক্তি নয় বলেই আমাদের ধারণা। ডাঃ রাঘবন তাঁর *Early Saṅgita Literature* নিবন্ধে এ'প্রশ্নটি আলোচনা করেছেন দেখা যায়। এর মীমাংসা হিসাবে তিনি দু'টি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন: (১) প্রথম—বিভিন্ন পুরাণের রচয়িতা বা সংকলয়িতা হিসাবে ব্যাস (বেদব্যাস) পরিচিত। কয়েকটি পুরাণে নৃত্য, গীত, বাদ্য ও নাট্যের আলোচনা আছে ও সে'দিক থেকে সঙ্গীতের পরিচয় দেওয়ার জন্য তিনি সঙ্গীতশাস্ত্রী হিসাবে গণ্য হ'তে পারেন, এবং (২) দ্বিতীয়—ব্যাসের নামাঙ্কিত হয়তো কোন একটি নাট্যগ্রন্থ ছিল ও তারি জন্য তাঁকে সঙ্গীত বা নাট্যাচার্য বলা হয়।[৭] কিন্তু পুরাণে উল্লিখিত সঙ্গীত-আলোচনার উদ্বোধক কিংবা আনুমানিক একটি নাট্যগ্রন্থের রচয়িতা

instructs his pupil Krauṣṭuki upon the creation of the world, the ages of the world, the genealogies and the other subjects peculiar to the Purāṇas."

৬। "May belong to the third century A.D."

৭। "Sāradātanaya mentions at the beginning of his work that he studied and learnt the schools of the following writers on Nātya—Sadāśiva, Śiva, Pārvatī, Gourī, Vāsukī, Sarasvatī, Nārada, Kumbhod-bhava i.e. Agastya, Vyāsa, Bharata's pupils and Añjaneya. * * Vyāsa is quoted now and then by Sāradātanaya. There are two possibilities. * * The story of the origin of Nātya which Sāradātanaya attributes to Vyāsa, the exact number of acts in *Utsriṣtikāṁka,* according to Vyāsa referred to by Sāradātanaya, are not traceable to the known Purāṇas which deal with drama and music. The other possibility is that there was some work on Nātya current as Vyāsa's. Anyway Vyāsa is not a mere name, since Sāradātanaya attributes to him two definite opinions on pp. 55 and 251."—*The Journal of the Music Academy,* Vol. III, 1932, pp. 29-30.

হিসাবে পুরাণ-সংকলয়িতা বেদব্যাস তথা ব্যাসকে সঙ্গীতশাস্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করার কোন যৌক্তিকতা ও সার্থকতা আছে ব'লে আমরা মনে করি না। তবে সঙ্গীতশাস্ত্রী হিসাবে কোন 'ব্যাস' যদি থাকেন তিনি সম্ভবত ভাব-প্রকাশনকার সারদাতনয়ের (খৃষ্টীয় ১২৭৫-১২৫০) কিছু পূর্বে জীবিত ছিলেন।

মার্কণ্ডেয়পুরাণ ২৩৭-তম অধ্যায়ে বিভক্ত। কিন্তু সকল অধ্যায়েই সঙ্গীতের তথা নৃত্য, গীত ও বাদ্যের প্রসঙ্গ নাই। প্রথম অধ্যায়ের ৩৪-৩৫ শ্লোক-দুটিতে নৃত্য ও নর্তকের গুণাগুণ সম্বন্ধে সামান্যভাবে উল্লেখ আছে। দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় দেবর্ষি নারদ এবং নর্তকীদের মধ্যে রম্ভা, মিশ্রকেশী, উর্বশী, তিলোত্তমা, ঘৃতাচী, মেনকা প্রভৃতি উপস্থিত। ইন্দ্র নারদকে আদেশ করলেন অপ্সরাদের নৃত্য করার জন্য। নারদ তখন অপ্সরাদের উদ্দেশ ক'রে বল্লেন,

যুষ্মাকমিহ সর্বাসাং রূপৌদার্যগুণাধিকম্।
আত্মানং মন্যতে যা তু সা নৃত্যতু মমাগ্রতঃ॥
গুণরূপবিহীনায়াঃ সিদ্ধির্নাট্যস্য নাস্তি বৈ।
চার্বধিষ্ঠানবন্নৃত্যং নৃত্যমন্যদ্‌বিড়ম্বনম্॥

'তোমাদের মধ্যে নিজেকে সকলের চেয়ে রূপ, গুণ ও ঔদার্যশালিনী ব'লে যার জ্ঞান বা ধারণা আছে, সেই আমার সাম্‌নে নৃত্য করুক, কেননা গুণ-রূপবিহীনা নারীর কোন বিষয়েই সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব নয়। সুন্দর অঙ্গসৌষ্ঠববিশিষ্ট নৃত্যই নৃত্য-রূপে পরিগণিত, অন্যথা বিড়ম্বনা-মাত্র'।

এখানে নর্তকীর গুণাগুণ বিচার করা হয়েছে। নৃত্যে সকলের অধিকার নাই এই বলাই পুরাণকারের উদ্দেশ্য। কণ্ঠ-সঙ্গীতের মতো নৃত্যও রস ও ভাবকে আশ্রয় ক'রে প্রকাশ পায়। তাই নট ও নটীকে (নর্তক ও নর্তকী) রূপ, গুণ ও উদার মনোভাবের অধিকারী হ'তে হয়, নচেৎ রস ও ভাবের অভিব্যক্তি হয় না, নৃত্যও বিফল হয়। পুরাণে তাই গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের নর্তক ও নর্তকী হিসাবে প্রশংসা করা হয়েছে। উভয় শ্রেণীর শিল্পীরাই স্বর্গ ও মর্ত্যের অধিবাসী। মার্কণ্ডেয়পুরাণে "প্রগীতগন্ধর্বগণাঃ প্রনৃত্তাপ্সরসাংগণাঃ" শ্লোকে গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের স্বর্গের নৃতশিল্পী হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

মার্কণ্ডেয়পুরাণের ২৩শ অধ্যায়েই সঙ্গীতের বিশেষ পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তবে অন্যান্য পুরাণ যেমন বায়ু, বৃহদ্ধর্ম ও বিষ্ণুধর্মোত্তর প্রভৃতির তুলনায় মার্কণ্ডেয়পুরাণে সঙ্গীতের আলোচনা সংক্ষেপ। তা'হলেও সঙ্গীতের সত্যকারের তথ্যের পরিবেশন করতে পুরাণকার কার্পণ্য দেখান নি। মার্কণ্ডেয়পুরাণের ২৩শ

অধ্যায়ে দেখা যায়, নাগরাজ অশ্বতর, তাঁর ভাই কম্বল ও দেবী সরস্বতী সঙ্গীতের আলোচনায় প্রধান অংশ গ্রহণ করেছেন। দেবী সরস্বতীর বিবর্তমান ইতিহাস উল্লেখযোগ্য। সঙ্গীত-রত্নাকরে শার্ঙ্গদেব উল্লেখ করেছেন: "সামগীতিরতো ব্রহ্মা বীণাসক্তা সরস্বতী"। বীণার সঙ্গে সরস্বতীর সম্পর্ক সর্বত্রই দেখানো হয়েছে: 'বীণাপুস্তকধারিণী'। দেবী সরস্বতী বৈদিক যজ্ঞের সোমলতা তথা 'সোম্' থেকে ওম্, ইড়া, স্বাহা, স্বধা, গায়ত্রী এবং পরে 'বাক্' বা বাগ্‌দেবীতে রূপান্বিত হয়েছেন। বৌদ্ধ 'সাধনমালা' গ্রন্থে সরস্বতীকে 'ভদ্রকালী' নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং এখনো-পর্যন্ত সরস্বতীর প্রণামমন্ত্রে পাওয়া যায়: "সরস্বত্যৈঃ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈঃ নমো নমো"। বৌদ্ধমতাবলম্বীরা দুর্গা, তারা, অপরাজিতা, গণেশ, কালী, ব্রহ্মা প্রভৃতিকে বৌদ্ধদেবী বলেন, কিন্তু আসলে তাঁরা হিন্দু-দেবদেবী এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিকরা পরে তাঁদের নিজস্ব দেবদেবীর কোঠায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন কিনা তা আলোচনার বিষয়।[৮] সাধারণত সরস্বতীকে আমরা জ্ঞান, বিদ্যা ও সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী-রূপে কল্পনা করি।

অশ্বতর নাগরাজ ও কম্বল তাঁর ভ্রাতা। সম্ভবত এঁরা নাগবংশ থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্নব নগেন্দ্রনাথ বসু উল্লেখ করেছেন: নাগপূজার প্রবর্তন করেন নাগবংশের রাজারা ও এঁরা ছিলেন সীথিয়ানদেরই একটি শাখা-বিশেষ। সেই সময়ে ভারতবর্ষের সকল সভ্যদেশে নাগবংশীয় রাজাদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। সম্রাট আলেকজাণ্ডার নাকি পঞ্জাবে নাগপূজা ও নাগোপাসক-দের প্রভাব লক্ষ্য করেছিলেন।[৯] মাননীয় ফার্গুসন সাচীর পূর্বদ্বারে নাগপূজকদের একটি প্রস্তরমূর্তির কথা উল্লেখ করেছেন।[১০] গ্রুন্‌ভেডল সাহেবও সাঁচীর প্রাচীন প্রস্তরচিত্রে নাগোপাসকদের মূর্তির কথা উল্লেখ করেছেন।[১১] শ্রদ্ধেয় ওয়াটারের অভিমতও তাই।[১২] নন্দবংশের রাজত্বের আগে ভারতের ইতিহাসে শিশুনাগ-বংশের নাম উল্লেখযোগ্য। নাগ বা সর্পের উপাসনার সঙ্গে শিশুনাগবংশ সম্পর্কিত কিনা তা ঠিক জানা যায় না। তবে পালিসাহিত্যে ও পুরাণে নব নন্দের নামোল্লেখ আছে। ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের ১৪০ বছর পরে

৮। প্রজ্ঞানানন্দ: 'শ্রীদুর্গা' (১৩৫৪ সাল), পৃঃ ৮-১১দ্রষ্টব্য।

৯। Cf. *The Archaeological Survey of Mayurvañja* (1911), Vol. I, pp. xxxv-xxxvi.

১০। Cf. *Tree and Serpent-Worship*, p. 133.

১১। Cf. *Buddhist Art in India*, p. 62.

১২। Cf. *On Yuān Chawāng*, Vol. II, p. 133.

সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব ৩৪৮ অথবা ৩৪৭ শতকে নন্দবংশের—অনেকের মতে পৌরাণিক শিশুনাগ বা শৈশুনাগবংশের অবসান হয়। শিশুনাগবংশের অভ্যুদয় ও অবসান যুগেই অভ্যুদয় হয় এবং তখনই হয়েছিল।[১৩] নাগোপাসকদের প্রভাব ও বিস্তৃতিও একসময়ে ভারতের সর্বত্র ও ভারতেতর দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।[১৪] মাননীয় চমনলাল মেক্সিকোতে নাগপূজকদের প্রভাব লক্ষ্য করেছিলেন, তাই তিনি সেখানকার সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে হিন্দু তথা ভারতবর্ষীয় ব'লে উল্লেখ করেছেন: "The worship of the snake in India and Mexico is one of the important links between the Hindus, Māyas and Artecs."[১৫]

অশ্বতর ও কম্বল সঙ্গীত-সমাজে বিশেষ পরিচিত, কেননা তাঁরা দু'জনেই ছিলেন গান্ধর্বশাস্ত্রে পারদর্শী। তাঁদের রচিত সঙ্গীতের প্রামাণিক গ্রন্থও নাকি ছিল। মহাভারতের অনেক জায়গায় কম্বল ও অশ্বতরের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন মহাভারতের আদিপর্বে (৩৫ অঃ ১০ শ্লোঃ) "কম্বলাশ্বতরৌ চাপি নাগঃ কালীয়কস্তথা"। শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকরে উল্লেখ করেছেন "অশ্বতরস্তথা" (১।১৬), অথবা "এতদল্পনিগাস্বাহুঃ কম্বলাশ্বতরাদয়ঃ, অল্পদ্বিশ্রুতিকে রাগভাষাদাবপি তন্মতম্" (১।৭।২২)। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটিতে শার্ঙ্গদেব স্বর ও শ্রুতির প্রয়োগের বেলায় 'তন্মতম্' অর্থাৎ 'ভরতাদীনাং সম্মতম্' ও সঙ্গে সঙ্গে ব'লে কম্বল ও অশ্বতরের মতেরও নিদর্শন দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, শার্ঙ্গদেব কম্বল ও অশ্বতরকে নাট্যশাস্ত্র-কার ভরতের মতো সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন। এ'ছাড়া কোহল ও দত্তিল অথবা নারদ ও তুম্বুরুর নাম যেমন একসঙ্গে প্রায় উল্লিখিত হয়, কম্বল ও অশ্বতরের নামও তাই, প্রামাণিক সঙ্গীতাচার্য হিসাবে এঁদের উভয়ের নামই একসঙ্গে প্রায় সর্বত্র ব্যবহৃত হয়। এ' সম্বন্ধে পূর্বেও আমরা উল্লেখ করেছি।

১৩। Cf. ডাঃ বড়ুয়া: *Asoka and His Inscriptions* (1946), Vol. I, pp. 41-42.

১৪। শ্রীবিমলাচরণ লাহা উল্লেখ করেছেন শিশুনাগবংশ খৃষ্টপূর্ব ৬০০ শতকের পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়: "The Śiśunāga dynasty was established before 600 B.C. (perhaps in 642 B.C.) by chieftain of Banaras named Śiśunāga who fixed his capital at Giribraja or Rājagriha" (—*Tribes in Ancient India*, 1943, p. 199)। তিনি আরো বলেছেন অঙ্গ ও মগধের ভিতর দিয়ে যে চম্পানদী প্রবাহিত ছিল তার তীরদেশে চাম্পেয় নামে একজন নাগরাজা বাস করতেন।

১৫। Vide *Hindu America* (1941), p. 18.

মার্কণ্ডেয়পুরাণের উপাখ্যানটি হ'ল : নাগরাজ অশ্বতর কঠোর তপস্যা ক'রে দেবী সরস্বতীকে সন্তুষ্ট করলেন। দেবী সন্তুষ্ট হ'য়ে অশ্বতরকে বর দিতে চাইলেন : "এবং স্তুতা তদা দেবী বিষ্ণোর্জিহ্বা সরস্বতী"। সূর্যের আর একটি নাম বিষ্ণু। সরস্বতী সূর্য তথা সূর্যরশ্মিরই অভিন্ন মূর্তি বিষ্ণোর্জিহ্বা। অগ্নিরও একটি নাম নারায়ণ বা বিষ্ণু, কেননা অগ্নি হ'ল রাত্রিকালের কিংবা পৃথিবীস্থ সূর্য, সুতরাং দেবী অগ্নিরও প্রতীক। ব্রাহ্মণসাহিত্যে ও সংহিতায় দেবী নদীরূপাও বটে। শতপথব্রাহ্মণে (৩।২।৪।২-৭) সরস্বতীর একটি উপাখ্যান সোমলতা ও গন্ধর্বগণের সঙ্গে আবার সম্পর্কিত হয়েছে। মার্কণ্ডেয়পুরাণকার দেবীকে "বিষ্ণুর্জিহ্বা" এই উপাধি দিয়ে বৈদিকের সঙ্গে পৌরাণিক সংস্কৃতির একটি যোগসূত্র রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন।

অশ্বতর বর ভিক্ষা করলে দেবী সরস্বতী নাগরাজকে বল্লেন,

বরং তে কম্বলভ্রাতঃ প্রযচ্ছাম্যুরগাধিপ।
তদুচ্যতাং প্রদাস্যামি যৎ তে মনসি বর্ততে ॥

'নাগরাজ অশ্বতর, তুমি ইচ্ছানুযায়ী যে বর প্রার্থনা করবে আমি সেই বরই তোমায় দেব'। অশ্বতর দেবীর কথায় প্রীত হ'য়ে উত্তর করলেন,

সহায়ং দেহি দেবি ত্বং পূর্বং কম্বলমেব মে।
সমস্তস্বরসম্বন্ধমুভয়োঃ সম্প্রযচ্ছ চ ॥

'দেবি, প্রথমে ভ্রাতা কম্বলকে আমার সহায়কের যোগ্যতা দান করুন। পরে সঙ্গীতশাস্ত্রের সকল জ্ঞান যাতে আমাদের দু'জনের অধিগত হয় তার বিধান করুন। ভ্রাতা কম্বলের জন্যও বর প্রার্থনা করাতে দেবী অশ্বতরের উদারতায় একান্ত সন্তুষ্ট হ'য়ে বল্লেন : 'তথাস্তু'—তাই হোক। তারপর অশ্বতর ও কম্বলকে এই কথা ব'লে দেবী বর দান করলেন,

সপ্তস্বরাঃ গ্রামরাগাঃ সপ্ত পন্নগসত্তম।
গীতকানি স সপ্তৈব তাবতীশ্চাপি[১৬] মূর্ছনাঃ ॥
তানাশ্চৈকোনপঞ্চাশৎ[১৭] তথা গ্রামত্রয়ঞ্চ যৎ।
এতৎ সর্বং ভবান্ গাতা[১৮] কম্বলশ্চ তথানঘ[১৯] ॥

১৬। পাঠভেদ — তাবত্যশ্চাপি
১৭। " — তানাশ্চৈকোনপঞ্চাশৎ
১৮। " — বেত্তা
১৯। " — কম্বলশ্চৈব তেঽনঘ

জ্ঞাস্যসে মৎপ্রসাদেন ভুজগেন্দ্রাপরং তথা।
চতুর্বিধং পদং[২০] তালং[২১] ত্রিপ্রকারং লয়ত্রয়ম্ ॥
যতিত্রয়ং[২২] তথা তোদ্যং[২৩] ময়া দত্তং চতুর্বিধম্।

* * * *

অস্যান্তর্গতমায়ত্তং স্বরব্যঞ্জনসম্মিতম্[২৪]।
তদশেষং ময়া দত্তং ভবতঃ কম্বলস্য চ ॥
তথা নান্যস্য ভূর্লোকে পাতালে চাপি পন্নগ।
প্রণেতারৌ ভবন্তৌ চ সর্বস্যাস্য ভবিষ্যতঃ।
পাতালে দেবলোকে চ ভূর্লোকে চৈব পন্নগৌ ॥

'নাগরাজ, তোমরা দু'জনেই সাতটি স্বর, সাতটি গ্রামরাগ, সাত রকম গীতি, সাতটি মূর্ছনা, উনপঞ্চাশ তান ও ষড়্জাদি তিনটি গ্রাম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করবে। চারটি পদ, তিনটি তাল, তিনটি প্রকার, তিনটি লয়, তিনটি যতি ও চার রকমের তোদ্য (আতোদ্য ?) সম্বন্ধেও তোমরা জ্ঞান অর্জন করবে। আমার প্রসাদে এদের অন্তর্গত স্বর ও ব্যঞ্জনযুক্ত সঙ্গীতের যাবতীয় উপাদানের তোমরা অধিকারী হবে। আমি তোমাকে ও কম্বলকে সমস্তই দান ক'রলাম। স্বর্গে, মর্ত্যে ও পাতালে ও কার্যত সর্বলোকে সঙ্গীতবিদ্যার সাধক ও ধারক হিসাবে তোমরা শ্রদ্ধা ও সমাদর লাভ করবে'।

আখ্যানটি রূপক, কিন্তু আখ্যানের নায়ক বা উপলক্ষ্য অশ্বতর ও কম্বল মনে হয় ঐতিহাসিক ও প্রমাণিক সঙ্গীতশাস্ত্রী। সম্ভবত অশ্বতর ও কম্বল নাগোপাসক ছিলেন। অশ্বতরের উপাধি 'নাগরাজ', অথবা তাঁরা নাগবংশজাত রাজাও হ'তে পারেন।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে সঙ্গীতের উপাদান সামান্য হ'লেও মূল্যবান। ষড়্জাদি সাতটি গ্রামরাগের আলোচনা আমরা পূর্বে করেছি। নারদীশিক্ষায় নারদ (১ম) ষাড়ব, পঞ্চম, মধ্যমগ্রাম, ষড়্জগ্রাম, সাধারিত, কৈশিকমধ্যম ও কৈশিক এই সাতটি গ্রামরাগের পরিচয় দিয়েছেন। মধ্যমগ্রামজাত কৈশিক ও কৈশিকমধ্যম

২০। " — পরম্
২১। " — কালম্
২২। " — গীতত্রয়ম্
২৩। " — কালম্
২৪। " — স্বরব্যঞ্জনয়োশ্চ যৎ।

গ্রামরাগ-দু'টির পার্থক্য ও স্বরূপের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। গ্রামজাত গ্রামরাগ-সাতটির প্রচলন থাকায় সাতটি গ্রামের প্রয়োগও যে খৃষ্টীয় ৩য় থেকে ৫ম কিংবা ৬ষ্ঠ শতাব্দীর সমাজে ছিল পুরাণকার তারই যেন ইঙ্গিত দিয়েছেন এ'কথা আমরা ধরে নিতে পারি। গ্রামরাগ সাতটি, সুতরাং (গ্রাম-) রাগগীতিও সাতটি। বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গ 'ইদানীং সম্প্রবক্ষ্যামি' ব'লে শুদ্ধা, ভিন্নকা, গৌড়িকা, রাগগীতি, সাধারণ, ভাষা ও বিভাষা এই সাতটি গীতির উল্লেখ করেছেন।[২৫] মতঙ্গ নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের মতানুবর্তী হ'লেও গীতি তথা গ্রামরাগগীতির বেলায় নিজস্ব মতবাদ কিংবা তদানীন্তন সময়ে সমাজে প্রচলিত ধারারই পরিচয় দিয়েছেন। মূর্ছনা, তান, গ্রাম প্রভৃতির পরিচয় আমরা দিয়েছি। "গ্রামত্রয়ঞ্চ" —তিনটি গ্রামের তথা ষড়্‌জ, মধ্যম ও গান্ধার গ্রামের নামোল্লেখ করলেও খৃষ্টীয় ৩য় থেকে ৫ম শতাব্দীর সমাজে যে গান্ধারগ্রামের অপ্রচলন হয়েছিল তা পূর্বে উল্লেখ করেছি। নির্যুক্ত ও অনির্যুক্তভেদে পদ দু'রকম। নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ ভেদেও আবার পদ দু'রকম: "নিবদ্ধঞ্চানিবদ্ধঞ্চ তৎপদং দ্বিবিধং স্মৃতম্"। বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত তিন লয়। সমা, স্রোতোগতা ও গোপুচ্ছা তিন যতি। সামুদ্গ, সমুদ্গা ও বিবৃত্ত তিনটি প্রকার: "সামুদ্গশ্চ সমুদ্গোঽপি বিবৃত্তশ্চেতি কীর্তিতঃ"। আবাপ, নিষ্ক্রাম, বিক্ষেপ ও প্রবেশক চারটি তাল। এক একটি গ্রামের মূর্ছনা সাতটি করে। সাতটি মূর্ছনা বলতে মুখ্য বা প্রধান গ্রাম হিসাবে মনে হয় ষড়্‌জেরই সাতটি (উত্তরমন্দ্রাদি) মূর্ছনার কথা পুরাণকার উল্লেখ করেছেন। অশ্বতর ও কম্বলকে বর দান ক'রে দেবী সরস্বতী অন্তর্হিতা হলেন,

ইত্যুক্ত্বা সা তদা দেবী সর্বজিহ্বা সরস্বতী।
জগামাদর্শনং সদ্যো নাগস্য কমলেক্ষণা॥
তয়োশ্চ তদ্‌যথাবৃত্তং ভ্রাতোঃ সর্বমজায়ত।
বিজ্ঞানমুভয়োরগ্র্যং পদতালস্বরাদিকম্॥

* * * *

গীতকৈঃ সপ্তভির্নাগৌ তন্ত্রীলয়সমন্বিতৌ॥

এখানে সরস্বতীকে বিষ্ণোর্জিহ্বার পরিবর্তে সর্বজিহ্বা—'সকলের জিহ্বাস্বরূপা' বলা হয়েছে। সরস্বতী বিদ্যা বা জ্ঞানের প্রতীক। জ্ঞান বা চৈতন্য প্রাণীমাত্রেরই অধিষ্ঠান, চৈতন্য ছাড়া কোন জীব বা প্রাণীই বাঁচতে পারে না, কাজেই সরস্বতী

২৫। সাতটি গীতি বলতে ঋক, গাথা, পাণিকা বা ওবেনক, রোবিন্দক, উল্লোপ্যাদিও হ'তে পারে, কিন্তু এরা ব্রহ্মগীতি। পুরাণকার ব্রহ্মগীতিকে লক্ষ্য করেননি ব'লে মনে হয়।

যে সর্বজিহ্বা এ' বিষয়ে আর সন্দেহ কি। অশ্বতর ও কম্বল গান্ধর্ববিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। পদ, তাল ও স্বর-সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান অধিগত হয়েছিল। পদ, তাল ও স্বরই আসলে গান্ধর্বগানকে প্রাণবান করে।

মার্কণ্ডেয়পুরাণকার পুনরায় উল্লেখ করেছেন,

(ক) গীতশব্দৈস্তথান্যত্র বীণাবেণুস্বনানুগৈঃ।
মৃদঙ্গপণবাতোদ্যং হারিবেশ্মশতাকুলম্ ॥
—(২৩শ অধ্যায়)

(খ) বীণাবেণুস্বনং গীতং কিন্নরাণাং মনোহরম্।
—(৬১-তম অধ্যায়)

(গ) বীণাবেণুমৃদঙ্গানাবাতোদ্যস্য পরিগ্রহম্।
করোতি গায়তাং বিত্তং নৃত্যতাঞ্চ প্রযচ্ছতি ॥
—(৬৮-তম অধ্যায়)

(ঘ) প্রাবাদ্যন্ত ততস্তত্র বেণুবীণাদিদর্দুরাঃ।
পণবাঃ পুষ্করাশ্চৈব মৃদঙ্গাঃ পটহানকাঃ।
দেবদুন্দুভয়ঃ শংখাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥
গায়দ্ভিশ্চৈব গন্ধর্বৈর্নৃত্যদ্ভিশ্চাপ্সরোগণৈঃ।
তূর্যবাদিত্রঘোষৈশ্চ সর্বং কোলাহলীকৃতম্ ॥
—(১০৬-তম অধ্যায়)

(ঙ) জগুঃ কেচিৎ তথৈবান্যে মৃদঙ্গপটহানকান্।
অবাদয়ন্ত চৈবান্যে বেণুবীণাদিকাংস্তথা ॥
—(১২৮-তম অধ্যায়)

মার্কণ্ডেয়পুরাণের সময়ে বেণু, বীণা, দর্দুর, পণব, পুষ্কর, মৃদঙ্গ, পটহ, আণক, দেবদুন্দুভি, শঙ্খ প্রভৃতি বাদ্যের প্রচলন ছিল। শুধু তাই নয়, "শতশোঽথ সহস্রশঃ"—শত শত সহস্র সহস্র বীণা, বেণু প্রভৃতির ব্যবহার ছিল। কিন্তু পুরাণকার বীণার শ্রেণীভেদের কথা, অর্থাৎ কত রকম বীণার প্রচলন ছিল সে'সম্বন্ধে কোন-কিছু উল্লেখ করেন নি।

গান ও বাদ্যের সঙ্গে তখন নৃত্যের প্রচলন ছিল এবং তা কিন্নর, অপ্সরা প্রভৃতি ছাড়াও অভিজাতবংশীয় অন্তঃপুরচারিণীদের মধ্যে প্রসারিত ছিল কিনা সে-বিষয়ে পুরাণকার নিরুত্তর থাকলেও ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা জানিতে পারি যে পুরুষ ও নারী সকলেই তখন গীত ও নৃত্যকলার চর্চা করত।

পুরাণকার নৃত্যপ্রসঙ্গে পুনরায় উল্লেখ করেছেন,

(ক) প্রগীতগন্ধর্বগণাঃ প্রনৃত্তাপ্সরসাংগণাঃ।
হারনূপুরমাধুর্যশোভিতান্যুত্তমানি চ ॥

—(১০ম অধ্যায়)

(খ) বিশ্বাচী চ ঘৃতাচী উর্বশ্যথ তিলোত্তমা।
মেনকা সহজন্যা চ রম্ভাশ্চাপ্সরসাং বরাঃ ॥
ননৃতুর্জগতামীশে লিখ্যমানে বিভাবসৌ।
হাবভাববিলাসাঢ্যান্ কুর্বন্তোঽভিনয়ান্ বহূন্ ॥

—(১০৬-তম অধ্যায়)

(গ) ননৃতুশ্চ তথা তত্র বহবোঽপ্সরসাং গণাঃ।
পুষ্পবৃষ্টিমুচো মেঘা জগর্জুর্মৃদুনিঃস্বনাঃ ॥

—(১২৭-তম অধ্যায়)

নৃত্য ছাড়া নাটকাভিনয়েরও প্রচলন ছিল। বিশ্বাচী, ঘৃতাচী, তিলোত্তমা প্রভৃতি অপ্সরারা নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত হাব ভাব, অঙ্গহার ও মুদ্রাদির যথাযোগ্য প্রয়োগ ক'রে নৃত্য ও গীতের সঙ্গে নাটকের প্রত্যক্ষ রূপ দান করত। বিবাহ-বাসরে, মাঙ্গলিক কর্মে ও রাজসভায় নৃত্য, গীত ও বাদ্যের অবাধ প্রচলন ছিল। ৬৯-তম অধ্যায়ে উল্লেখ আছে মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র রাজা সুরুচি যখন সুরাপানে রত তখন বারবিলাসিনীরা নৃত্য-গীতে তাঁকে আনন্দ দান করেছিল : "বারমুখৈঃ প্রগীয়মানমধুরৈর্গেয়গায়নতৎপরৈঃ"। এ'থেকে বোঝা যায় যে, রাজসভায় বারবিলাসিনীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল না। পুরাণকার বারবিলাসিনী ('বারমুখৈঃ') বল্‌তে ঘৃতাচী, মেনকা, বিশ্বাচী, সহজন্যা প্রভৃতি অপ্সরাদের নির্দেশ করেছেন কিনা বলা যায় না। অবশ্য রামায়ণে, মহাভারতে বা অন্যান্য পুরাণে রাজসভায় অপ্সরাদের নৃত্য-গীতের কথা সুপরিচিত এবং সে-সম্বন্ধে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

॥ বায়ুপুরাণে সঙ্গীত ॥

বায়ু বা বায়বপুরাণে শৈবধর্মের প্রভাব থাকায় একে শিবপুরাণও বলা হয়। মাননীয় পার্জিটার বায়ুপুরাণকে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলেছেন। পণ্ডিত হপ্‌কিন্স ও হোল্‌জম্যানের অভিমত যে এই পুরাণটি মহাভারত ও

হরিবংশের চেয়ে প্রাচীন, কেননা মহাভারত ও হরিবংশের জায়গায় জায়গায় বায়ুপুরাণ থেকে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত দেখা যায়। কবি বাণভট্ট (প্রায় ৬২৫ খৃষ্টাব্দ) উল্লেখ করেছেন যে তিনি বায়ুপুরাণের পাঠ শুনেছিলেন এবং তাতে গুপ্তরাজাদের কাহিনী বর্ণিত ছিল। কবি বাণের স্বীকৃতি থেকে অধ্যাপক ভাণ্ডারকর-প্রমুখ ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন যে তাহলে কবি বাণের সময়ে কোন একটি পুরাণ ছিল ও সে'টি নিশ্চয়ই বায়ুপুরাণ। তাই বায়ুপুরাণের সংকলন-কাল মনে হয় খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর আগে বা খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে ডাঃ হাজরা খৃষ্টীয় ৩য় থেকে ৫ম শতাব্দীতে বায়ুপুরাণের রচনা বা সংকলন-কাল নির্ণয় করেছেন। আভীর, শক, হূণ, ম্লেচ্ছ (?) প্রভৃতি জাতির ইতিকাহিনীও এতে বর্ণিত আছে। খৃষ্টীয় ১০৩০ শতাব্দীতে আলবেরুণী তাঁর বিবরণীতে যে আঠারটি পুরাণের নাম উল্লেখ করেছেন বায়ুপুরাণ তাদের অন্যতম।

বায়ুপুরাণের ৮৬ এবং ৮৭-তম অধ্যায়-দুটিতে সঙ্গীতের ঔপপত্তিক আলোচনা আছে। বায়ুপুরাণে সঙ্গীতকে বলা হয়েছে 'গান্ধর্ব'। ৮৬-তম অধ্যায়ে সঙ্গীতালোচনার সূত্রপাত হয়েছে এ'ভাবে—

কিয়ন্তো বা স্বরগণা গান্ধর্বাস্তত্র কীদৃশাঃ।
যচ্ছ্রুত্বা রৈবতঃ কালান্ মুহূর্তমিব মন্যতে॥

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করলেন: 'হে সূতনন্দন, যে গান শুনে রৈবতরাজা সুদীর্ঘকালকে মুহূর্ত ব'লে মনে করেছিলেন সে গান কি রকম? ব্রহ্মার সভায় কোন্ কোন্ দেবতাই বা উপস্থিত ছিলেন? এ'সব শুন্‌তে আমাদের ইচ্ছা হয়'। সূত বল্লেন: গান বা গান্ধর্ব স্বরমণ্ডলসমন্বিত ও সেই স্বরমণ্ডলে সাত স্বর, তিন গ্রাম, একুশ মূর্ছনা ও উনপঞ্চাশ তানের সমাবেশ থাকে:

গান্ধর্বমূর্ছনালক্ষণকথনম্।
সপ্ত স্বরাস্ত্রয়ো গ্রামা মূর্ছনাস্ত্বেকবিংশতিঃ।
তানাশ্চৈকোনপঞ্চাশদিত্যেতৎস্বরমণ্ডলম্॥

বায়ুপুরাণের এই শ্লোকটিতে নারদীশিক্ষায় উল্লিখিত স্বরমণ্ডলের প্রতিধ্বনি পাই। শিক্ষাকার নারদ উল্লেখ করেছেন,

সপ্ত স্বরাস্ত্রয়ো গ্রামা মূর্ছনাস্ত্বেকবিংশতিঃ।
তানাএকোনপঞ্চাশদিত্যেতৎস্বরমণ্ডলম্॥

সপ্তস্বর ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। তিন গ্রাম—

ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধার। একুশটি মূর্ছনা সৌবীরী প্রভৃতি। বায়ুপুরাণকার মূর্ছনাগুলির পরিচয় দিয়ে উল্লেখ করেছেন,

সৌবীরির্মধ্যমগ্রামো[১] হরিণাস্যা তথৈব চ।
স্যাৎ কলোপবলোপেতা[২] চতুর্থী শুদ্ধমধ্যমা ॥
শার্ঙ্গী চ পাবনী চৈব দৃষ্টকা চ যথাক্রমম্ ॥[৩]

সৌবীরি বা সৌবীরী কলোপবলা, শুদ্ধমধ্যমা, শার্ঙ্গী, পাবনী ও দৃষ্টকা এই সাতটি মূর্ছনা মধ্যমগ্রামের। নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের মতে মধ্যমগ্রামের মূর্ছনা হ'ল :

সৌবীরি হরিণাশ্বা[৪] চ স্যাৎ কলোপনতা তথা।
চতুর্থী শুদ্ধমধ্যমা তু মার্গবী পৌরবী তথা ॥
হৃষ্যকা চৈব বিজ্ঞেয়া সপ্তমী দ্বিজসত্তমাঃ ॥[৫]

মূর্ছনার বেলায় শিক্ষাকার নারদ, ভরত, মকরন্দকার নারদ ও শার্ঙ্গদেব[৬] সকলেই বায়ুপুরাণের অনুযায়ী মধ্যমগ্রামের মূর্ছনাদের নাম ও বিভেদ উল্লেখ করেছেন; সুতরাং নারদীশিক্ষাকে বাদ দিলে দু'একটি নামের বিকৃতি ছাড়া আর সকলের মধ্যেই বেশ একটি সাদৃশ্যের ভাব লক্ষ্য করা যায় :

১। আনন্দাশ্রম-সংস্করণে পাঠভেদ "মধ্যমগ্রামে"।

২। ঐ "কলোপনতোপে"।

৩। বায়ুপুরাণ ৮৬।৩৮-৩৯

৪। অনেকে 'হারিণাশ্বা' শব্দ ব্যবহার করেন। কিন্তু এক রত্নাকর (১।৪।১১) ছাড়া আর সকল স্থানেই আমরা প্রায় 'হরিণাশ্বা' শব্দ পেয়ে থাকি।

৫। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং), ২৮।২৯-৩০

৬। শার্ঙ্গদেবের পরবর্তী সোমনাথের রাগবিবোধ, দামোদর মিশ্রের সঙ্গীতদর্পণ প্রভৃতি সকল গ্রন্থই শার্ঙ্গদেবকে অনুসরণ করেছে ব'লে আমরা আর তাদের নাম উল্লেখ করলাম না।

শিক্ষাকার নারদ	ভরত	মকরন্দকার নারদ	শার্ঙ্গদেব	বায়ুপুরাণ
আপ্যায়নী	সৌবীরী	সংবীরা (রী) (সৌবীরী ?)	সৌবীরী	সৌবীরী
বিশ্বকৃতা	হরিণাশ্বা	হরিণাশ্বা	হরিণাশ্বা	হরিণাস্যা (হরিণাশ্বা ?)
চন্দ্রা	কলোপনতা	কলোপনতা	কলোপনতা	কলোপবলা (কলোপনতা ?)
হেমা	শুদ্ধমধ্যমা	শুদ্ধমধ্যা (শুদ্ধমধ্যা)	শুদ্ধমধ্যা	শুদ্ধমধ্যমা
কপর্দিনী	মার্গবী (বা মার্গী)	মার্দলী	মার্গী	শার্ঙ্গী
মৈত্রী	পৌরবী	পৌরবী	পৌরবী	পাবনী
চান্দ্রমসী	হৃষ্যকা	হৃষ্যকা	হৃষ্যকা	দৃষ্টকা (হৃষ্যকা ?)

এই রকম অপরাপর গ্রামের মূর্ছনাদেরও নামের পার্থক্য মধ্যে। তবে গান্ধার-গ্রামের মূর্ছনাদের পার্থক্য কেবল নারদীশিক্ষা ও মকরন্দের সঙ্গে। বায়ুপুরাণকার গান্ধারগ্রামের মূর্ছনা সম্বন্ধে বলেছেন,

গান্ধারগ্রামিকাংশ্চান্যান্ কীর্ত্যমানান্নিবোধত ।
অগ্নিষ্টোমিকমাদ্যন্তু দ্বিতীয়ং বাজপেয়িকম্ ॥

তৃতীয়ং পৌণ্ড্রকং প্রোক্তং চতুর্থং চাশ্বমেধিকম্।
পঞ্চমং রাজসূয়ঞ্চ ষষ্ঠং চক্র[৭]-সুবর্ণকম্ ॥
সপ্তমং গোসবং[৮] নাম মহাবৃষ্টিকমষ্টমম্।
ব্রহ্মদানঞ্চ নবমং প্রাজাপত্যমনন্তরম্ ॥
নাগপক্ষাশ্রয়ং বিদ্যাদ্গোতরঞ্চ তথৈব চ।
হয়ক্রান্তং মৃগক্রান্তং বিষ্ণুক্রান্তং মনোহরম্ ॥
সূর্যক্রান্তং বরেণ্যঞ্চ মত্তকোকিলবাদিনম্।[৯]
সাবিত্রমর্ধসাবিত্রং সর্বতোভদ্রমেব চ ॥
* * * *
অভিরম্যশ্চ শুক্রশ্চ পুণ্যারকঃ স্মৃতঃ ॥[১০]

মূর্ছনাদের নামের উল্লেখ ক'রে বায়ুপুরাণকার অগ্নিষ্টোমিকাদির পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু সে'গুলি যথার্থই মূর্ছনা—কি তান তা বিচারযোগ্য। তা'ছাড়া 'পঞ্চদশেচ্ছন্তি গান্ধারগ্রামসংস্থিতান্' কথাগুলি বলা সত্ত্বেও তিনি অন্ততপক্ষে তেত্রিশটি মূর্ছনার নামোল্লেখ করেছেন। তাই মনে হয়, সমাজে গান্ধারগ্রামের তখন (খৃষ্টীয় ৩য়—৫ম শতাব্দী) প্রচলন না থাকায় তিনি তার মূর্ছনাগুলিরও পরিচয় দেওয়ার আবশ্যকতা অনুভব করেন নি। মূর্ছনাদের নামে অগ্নিষ্টোমিকাদি তেত্রিশটি উপাদানের যে নামোল্লেখ করেছেন সে'গুলি মনে হয় যজ্ঞনামীয় তান। এর নিদর্শনও পাই আমরা খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম শতাব্দীর গ্রন্থ বৃহদ্দেশীতে ও ১৩শ শতাব্দীর গ্রন্থ সঙ্গীত-রত্নাকরে। বৃহদ্দেশী বায়ুপুরাণের প্রায় সমসাময়িক ব'লে মনে হয়। তানগুলির প্রসঙ্গে মতঙ্গ বৃহদ্দেশীতে উল্লেখ করেছেন,

অধুনা তানানাং যজ্ঞনামানি কথ্যন্তে—
অগ্নিষ্টোমোঽত্যগ্নিষ্টোমো বাজপেয়োঽথ ষোড়শী।
* * * *
অশ্বক্রান্তো রথক্রান্তো বিষ্ণুক্রান্তস্তথৈব চ।
সূর্যক্রান্তো গজক্রান্তো বলভীনামবজ্রকৌ ॥

—প্রভৃতি।

৭। আনন্দাশ্রম-সংস্করণে "ষষ্ঠ বহুসুপর্ণকম্" পাঠভেদ।
৮। „ "গৌসবং" „
৯। „ পাঠান্তর আছে।
১০। এই লাইনটি কোন কোন সংস্করণে নাই। এই শ্লোকগুলি বায়ুপুরাণ ৮৬।৪১-৪৯ দ্রষ্টব্য।

বায়ুপুরাণকার মূর্ছনা-প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন,

গান্ধারগ্রামিকাংশ্চান্যান্ কীর্ত্যমানান্নিবোধত।
অগ্নিষ্টোমিকমাদ্যন্তু দ্বিতীয়ং বাজপেয়িকম্॥
তৃতীয়ং পৌণ্ড্রকং প্রোক্তং চতুর্থং চাশ্বমেধিকম্।
পঞ্চমং রাজসূয়ঞ্চ ষষ্ঠঞ্চক্রসুবর্ণকম্॥

*   *   *   *

হয়ক্রান্তং মৃগক্রান্তং বিষ্ণুক্রান্তং মনোহরম্॥
সূর্যক্রান্তং বরেণ্যঞ্চ মত্তকোকিলবাদিনম্।

—প্রভৃতি।

সুতরাং বায়ুপুরাণে পাঠের ব্যতিক্রম বা বিকৃতি থাকার জন্য যজ্ঞনামীয় তানগুলি মূর্ছনা নামে প্রচলিত হয়েছে। তা'ছাড়া লক্ষ্য করার বিষয় যে, বায়ুপুরাণকারের উল্লিখিত মধ্যম ও ষড়্‌জগ্রামের মূর্ছনাগুলির সঙ্গে বৃহদ্দেশীতে উল্লিখিত মূর্ছনাগুলির যথেষ্ট মিল আছে। দু'টি গ্রামের মূর্ছনাপ্রসঙ্গে মতঙ্গ ষড়্‌জগ্রামে মূর্ছনাদের নামের উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

ষড়্‌জে চোত্তরমন্দ্রা স্যান্নিষাদে রজনী স্মৃতা॥
ধৈবতে চোত্তরা জ্ঞেয়া শুদ্ধষড়্‌জা চ পঞ্চমে।
মধ্যমে মৎসরী জ্ঞেয়া গান্ধারে চাশ্বক্রান্তিকা॥
ঋষভেণ চ বিজ্ঞেয়াঃ সপ্তমী চাভিরুদ্গতা।[১১]
ষড়্‌জগ্রামাশ্রিতা তোয়ং (?)[১২] বিজ্ঞেয়া সপ্ত মূর্ছনাঃ॥

তেমনি মধ্যমগ্রামের বেলায় বলেছেন: সৌবীরী, হরিণাশ্বা (এখানে বৃহদ্দেশী পাঠ ভুল—'হরিনাহ্বয়া'), শুদ্ধমধ্য (শুদ্ধমধ্যা বা শুদ্ধমধ্যমা—শুদ্ধপাঠ), মার্জিকা (?), পৌরবী, হৃষ্যকা, কলোপনতা এই সাতটি মূর্ছনা। বায়ুপুরাণে উল্লিখিত মূর্ছনার সঙ্গে এদের নামের মিল থাকলেও সংখ্যার তারতম্য আছে। বায়ুপুরাণকার উল্লেখ করেছেন: "ষড়্‌জগ্রামশ্চতুর্দশ"। কিন্তু "জানীয়াৎ সপ্তমীঞ্চ তাম্" (?) ব'লে আসলে তিনি সাতটি মূর্ছনারই নামোল্লেখ করেছেন। তান ও মূর্ছনাগুলির তুলনামূলক অনুশীলন করলে মনে হয় বায়ুপুরাণকার শুধু মূর্ছনার বিষয়ে নয়, সাঙ্গীতিক উপাদানের অনেক-কিছুর জন্য বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গের কাছে ঋণী।

১১। এখানে বৃহদ্দেশীতে পাঠে ভুল আছে: "সপ্তমী চ ভিরুদ্গতা চ"।—বৃহদ্দেশী (ত্রিবান্দ্রম সং), পৃঃ ২৪

১২। তেহয়ং?

পুনরায় নারদীশিক্ষায় ও সঙ্গীত-মকরন্দে উল্লিখিত মূর্ছনাগুলির সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় বায়ুপুরাণের "পঞ্চদশেচ্ছন্তি গান্ধারগ্রামসংস্থিতান্",[১৩] অর্থাৎ গান্ধারগ্রামের ১৫টি মূর্ছনার সঙ্গে নারদীশিক্ষা বা মকরন্দের মূর্ছনাদের কিছুই মিল নাই। যেমন,

(১) নারদীর মতে গান্ধারগ্রামের 'মূর্ছনা'[১৪] : নন্দা, বিশালা, সুমুখী, চিত্রা, চিত্রবতী, সুখা ও আলাপা।

(২) মকরন্দের মতে[১৫] : সংরা (?), বিশালা, সুমুখী, চিত্রা, চিত্রাবতী, শুভা ও অলাপা।

(৩) বায়ুপুরাণের মতে : অগ্নিষ্টৌমিক (?), বাজপেয়িক, পৌণ্ড্রিক, আশ্বমেধিক, রাজসূয়, চক্রসুবর্ণক, গোসব, মহাবৃষ্টিক, ব্রহ্মদান, প্রাজাপত্য, নাগ পক্ষাশ্রয়, গোতর, হয়ক্রান্ত, মৃগক্রান্ত, বিষ্ণুক্রান্ত (মত্তকোকিলের স্বরের মতো মনোরম), সূর্যক্রান্ত, সাবিত্র, অর্ধসাবিত্র, সর্বতোভদ্র, সুবর্ণ, সুতন্ত্র, বিষ্ণু, বিষ্ণুবর, সাগর (সকলের মনোরম), বিজয় (তুম্বুরু ঋষির প্রিয়), হংস (অলম্বুজ ও নারদাদি গন্ধর্বগণের প্রিয় ও ভীমসেন-কর্তৃক প্রশংসিত), অঘাত্র্য, বিকল, উপনীত, বিনত (ভার্গবপ্রিয়), শ্রী, অভিরম্য ও পুণ্যারক।

বায়ুপুরাণের এই পনরটি মূর্ছনার নাম একটু অভিনব। এর কতকগুলি নাম অগ্নিষ্টৌমিক (?), বাজপেয়িক প্রভৃতি বৈদিক ব'লে মনে হয়, কতকগুলি আবার পৌরাণিক। বায়ুপুরাণের এই মূর্ছনাগুলির নামের সঙ্গে অন্য কারো বিশেষ মিল নাই।[১৬] বায়ুপুরাণকার এগুলি কোথা থেকে পেয়েছেন, আর সত্যই সেই সময়ে এ'গুলির প্রচলন ছিল কিনা এ'সব কিছুরই উল্লেখ করেন নি, অথচ অন্য গ্রাম-দু'টির মূর্ছনার সংখ্যা ও নামের সাদৃশ্য অন্যান্যের সঙ্গে অনেক পরিমাণে পাওয়া যায়।

এর পরই দেখা যায় বায়ুপুরাণকার মূর্ছনাগুলির নামের সার্থকতার একটি সদুত্তর এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের অধিদেবতারও পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন। নারদীশিক্ষাকার দেব, পিতৃ ও ঋষি এই তিন বিভাগ অনুসারে

১৩। বায়ুপুরাণ ৮৬।৫০

১৪। নারদীশিক্ষা, পৃঃ ৪০০

১৫। মকরন্দ ১।৬২ ; রত্নাকর, পৃঃ ৫০

১৬। তবে মকরন্দকার নারদও "অগ্নিষ্টোমাদিনামানি তৈরুক্তা নারদাদিভিঃ" (১।৯৮) শ্লোকে অগ্নিষ্টোমাদি (অগ্নিষ্টোমিকা ?) মূর্ছনাদের নামোল্লেখ করেছেন।

মূর্ছনাদের শ্রেণীবিভাগ করেছেন।[১৭] সঙ্গীত-রত্নাকরেও ঠিক এ' রকম বিভাগ দেখানো হয়েছে।[১৮] বায়ুপুরাণের বর্ণনা—

(১) ভগবান ব্রহ্মা সৌবীরার (সৌবীরী) সঙ্গে 'গান্ধারী' গান করেন। এর অধিদেবতা ব্রহ্মা।

(২) হরিদেশে উৎপন্ন ব'লে 'হরিণাস্যা' (শ্বা ?)। এর অধিদেবতা 'ইন্দ্র'।

(৩) মরুদ্‌গণ স্বরমণ্ডলের মধ্যে হস্ত প্রসারণ ক'রে গ্রহণ করেছিলেন ব'লে 'কলোপনতা'।[১৯] এর অধিদেবতা মরুদ্‌গণ।

(৪) মরুদেশ থেকে উৎপন্ন ব'লে 'শুদ্ধমধ্যমা' এবং এর অধিদেবতা 'গন্ধর্ব'।

(৫) সিদ্ধগণের পথ প্রদর্শনের সময়ে মৃগগণের সঙ্গে বিচরণ করে ব'লে 'মার্গী'। এর অধিদেবতা 'মৃগেন্দ্র'।

(৬) রজোগুণ দ্বারা মূর্ছনা যোজনা করা হয় ব'লে 'রজনী'। এর অধিদেবতা 'ষড়্‌জ'।

(৭) উত্তর তাল প্রথম তালের অনুযায়ী ব'লে 'উত্তরমন্দ্রা'। এর অধিদেবতা 'ধ্রুব'।

(৮) বিস্তার ও উত্তরত্বের জন্য ধৈবতের মূর্ছনার নাম 'উত্তরায়ণ'। এর অধিদেবতা শ্রাদ্ধীয় পিতৃগণ।

(৯) মহর্ষিগণ শুদ্ধষড়্‌জ স্বরে অগ্নির উপাসনা করেন ব'লে 'শুদ্ধষাড়্‌জিক'।

(১০) যক্ষিগণ পঞ্চমস্বরের মূর্ছনার দ্বারা সাধুগণকে মোহিত করেছিলেন ব'লে 'যাক্ষিকা'।

এইরূপে বায়ুপুরাণকার ৮৬।৫০-৬৮ শ্লোক পর্যন্ত অধিকাংশ মূর্ছনাদের

১৭। পিতৄণাং মূর্ছনাঃ সপ্ত তথা যক্ষা ন সংশয়ঃ।
ঋষীণাং মূর্ছনাঃ সপ্ত যাস্ত্বিমা লৌকিকাঃ স্মৃতাঃ॥
—নারদী, পৃঃ ৪০০

১৮। অশ্বক্রান্তা * * ঋষীণাং সপ্ত মূর্ছনাঃ
আপ্যায়নী বিশ্বকৃতা * * পিত্র্যা মূর্ছনা ইমাঃ।
নন্দা বিশালা * * তাশ্চ স্বর্গে প্রযোক্তব্যা * *॥
—সঙ্গীতরত্নাকর (Adyar ed.) ১ম ভাগ, পৃঃ ১১২, ২৩-২৬ শ্লোক

১৯। এখানে "সা কলোপনতা" (৮৬।৫২) বলা হয়েছে, কিন্তু বঙ্গবাসী-সংস্করণে ৮৬।৩৮ শ্লোকে "স্যাৎ কলোপবলোপেতা * *" প্রভৃতির উল্লেখ আছে। আনন্দাশ্রম-সংস্করণে "কলোপনতা"-ই বলা হয়েছে। কাজেই মনে হয় বঙ্গবাসী-সংস্করণের ৮৭।৩৮ শ্লোকের "কলোপবলো" শব্দটি বিকৃত।

নামের সার্থকতার ও অধিদেবতাদের পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই প্রতিপাদন ও অর্থ কতটুকু যুক্তিসঙ্গত তা নির্ণয় করা কঠিন। এদের অনেকগুলি আবার কিংবদন্তীকে অনুসরণ ক'রে হেয়ালীর নামান্তর ব'লে মনে হয়।

৮৭-তম অধ্যায়ে সূত আবার ৪৬ শ্লোকের অবতারণা ক'রে সঙ্গীতের গীতালঙ্কার, স্থান, বর্ণ, বর্ণালঙ্কার, স্বরের মন্দ্র, মধ্য ও তার অনুসারে স্থান ও তাল প্রভৃতির পরিচয় দিয়েছেন। শ্রদ্ধেয় ঋষিগণকে উদ্দেশ ক'রে তিনি বলেছেন :

ত্রিশতং বৈ অলঙ্কারাস্তান্মে নিগদতঃ শৃণু।[২০]

এ'থেকে বোঝা যায় বায়ুপুরাণে তিনশত গীতালঙ্কারের উল্লেখ আছে। কিন্তু নাট্যশাস্ত্রে ভরত ৩৩-টি অলঙ্কারের উল্লেখ করেছেন: "অলঙ্কারাস্ত্রয়-স্ত্রিংশদেবমেতে ময়োদিতাঃ।"[২১] এ'সম্বন্ধে ভরত ২১ অধ্যায়ের ২৫-৭৫ শ্লোক পর্যন্ত "প্রসন্নাদিঃ প্রসন্নান্তঃ প্রসন্নাদ্যন্ত এব চ" প্রভৃতি শ্লোকে অলঙ্কার বর্ণনা করেছেন। শার্ঙ্গদেব সঙ্গীতরত্নাকরের ১ম অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ বর্ণালঙ্কার-প্রকরণে ৫-৬৪ শ্লোক পর্যন্ত "প্রসন্নাদিঃ প্রসন্নান্তঃ প্রসন্নাদ্যন্তসংজ্ঞকঃ ইতি প্রসিদ্ধালংকারাস্ত্রিষষ্টিরুদিতা ময়া"[২২] প্রভৃতি শ্লোকে ৬৩ রকম অলঙ্কারের উল্লেখ করেছেন। শার্ঙ্গদেব স্থায়ি, আরোহী, অবরোহী, সঞ্চারী এই চারটি বর্ণানুযায়ী সমস্ত অলঙ্কারের পরিচয় দিয়েছেন। সঙ্গীত-রত্নাকরের টীকাকার সিংহভূপাল বরং কল্লিনাথের চেয়ে এ'বিষয়ে টীকায় বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

বায়ুপুরাণকার গীতালঙ্কারের সংখ্যা দিয়েছেন "ত্রিশতং"—তিনশো। অলঙ্কার বলতে তিনি বলেছেন: "স্বৈঃ স্বৈর্বর্ণৈঃ প্রহেতবঃ সংস্থানযোগৈশ্চ", অর্থাৎ স্ব স্ব অনুগুণ বর্ণ ও পদসমূহের যোগ-বিশেষকেই 'অলঙ্কার' বলে। পদ এবং বাক্য সংযুক্ত হ'লে তবে অলঙ্কার অভিব্যক্ত হয়: "বাক্যার্থপদযোগার্থৈর-লঙ্কারস্তু পূরণম্"। পুরাণকার বক্ষ, কণ্ঠ ও মস্তক এই তিন জায়গায় মন্দ্র, মধ্য ও তার স্বরের উৎপত্তি-স্থান বলেছেন। 'বর্ণ' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন প্রকৃতিগত বর্ণ চারটি মাত্র এবং বিচারও তার চার রকমের। দেবতাদের জন্য আবার ১৬ (ষোড়শ) রকমের বর্ণের উল্লেখ পাওয়া

২০। বায়ুপুরাণ ৮৭।১

২১। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ২৯।৭৬; মকরন্দ ২।১৫

২২। রত্নাকর ১।৬।৬৩

যায়। তবে বর্ণ-বিষয়ে যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁদের মতে স্থায়ী, সঞ্চারী, আরোহী ও অবরোহী এই চার রকমেরই বর্ণ।[২৩] বায়ুপুরাণকার উল্লেখ করেছেন,

চত্বারঃ প্রকৃতৌ বর্ণাঃ প্রবিচারশ্চতুর্বিধঃ।
বিকল্পমষ্টধা চৈব দেবাঃ ষোড়শধা বিদুঃ॥
স্থায়ী বর্ণঃ প্রসঞ্চারী তৃতীয়মবরোহণম্।
আরোহণং চতুর্থং তু বর্ণং বর্ণবিদো বিদুঃ॥[২৪]

'স্থায়ী' প্রভৃতি চার রকমের বর্ণ কাকে বলে তার পরিচয় দিতে গিয়ে বায়ুপুরাণকার বলেছেন: (১) একই ভাবে যার সঞ্চরণ হয় তাকে 'স্থায়ী', (২) নানা প্রকারে যার সঞ্চরণ হয় তাকে 'সঞ্চারী', (৩) যার গতি নিম্ন দিকে তাকে 'অবরোহণ' এবং (৪) যার গতি উচ্চ দিকে তাকে 'আরোহণ' বর্ণ বলে।[২৫] তা'ছাড়া স্থাপনী, ক্রমরেজিনী, প্রমাদ ও অপ্রমাদ এই চারটি অলঙ্কারেরও উল্লেখ করা হয়েছে। এর পর নাট্যশাস্ত্র[২৬] ও রত্নাকরের রীতি[২৭] অনুযায়ী অলঙ্কারগুলির ভিন্ন ভিন্ন নাম ও অর্থ নিয়ে বায়ুপুরাণকার আলোচনা করেছেন—যদিও নাট্যশাস্ত্র ও রত্নাকরের সঙ্গে নামের ভিন্নতা আছে।[২৮]

কলাপ্রমাণে যে বিন্দুস্বর উৎপন্ন হয় তা একান্তরভাবে ১২ রকমের। তাদের মধ্যে দ্বিকলাত্মকগুলিকে 'ত্রাসিত' ও চতুষ্কলাত্মকগুলিকে 'মক্ষিপ্রচ্ছাদন' বলা হ'য়েছে।

বায়ুপুরাণকার বহির্গীতেরও পরিচয় দিয়েছেন। যথাযথভাবে স্বরগুলি আলাপে ব্যবহৃত হ'লে 'গীত' হয় ও গীত যদি তার নির্দিষ্ট স্বর ছাড়া অন্য স্বরে লীলায়িত হয় তবে তাকে 'বহির্গীত' বলে। বায়ুপুরাণকারের গীত ও বহির্গীতের পরিচয়

২৩। এখানে ভরত বা শার্ঙ্গদেবের সঙ্গে পুরাণাকারের মিল আছে। যেমন ভরত বলেছেন: "আরোহী চাবরোহী চ স্থায়িসঞ্চারিণৌ তথা" (২৯।১৯) এবং শার্ঙ্গদেব বলেছেন: "গানক্রিয়োচ্যতে বর্ণঃ স চতুর্ধা নিরূপিতঃ। স্থায়্যারোহ্যবরোহী চ সঞ্চারীত্যথ লক্ষণম্।"—রত্নাকর ১।৬১

২৪। বায়ুপুরাণ ৮৭।৫-৬

২৫। তত্রৈকসঞ্চরস্থায়ী সচরস্তু চরীভবন্
অথারোহণবর্ণানামবরোহং বিনির্দিশেৎ॥
আরোহণেন চারোহবর্ণং বর্ণবিদো বিদুঃ।

২৬। নাট্যশাস্ত্র ২৯।২৫-৭২

২৭। রত্নাকর ১।৬।১৪-৬২

২৮। যেমন উষ্ট্রকলাখ্য, আবর্ত, কুমার, শ্যেন, সতার ও সঞ্চারীদ্বয় ও ত্রাসিত প্রভৃতি।

সম্পূর্ণ নতুন। তাদের প্রয়োগও মনে হয় লোপ পেয়েছে। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত গীত ও বহির্গীতের যে পরিচয় দিয়েছেন তার সঙ্গে বায়ুপুরাণকারের মিল নাই। ভরত গীত বা গীতি বলতে গ্রামরাগগীতি, ব্রহ্মগীতি, মাগধী প্রভৃতি বিচিত্র রকমের গীতির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি 'বহির্গীত' সম্বন্ধে বলেছেন যে-গান রঙ্গের বহির্ভাগে গীত হয় তাকে 'বহির্গীত' বলে। ভরতের বহির্গীত বৈদিক 'বহিষ্পবমান'-স্তোত্রগীতেরই যেন পরবর্তী (ক্ল্যাসিক্যাল) রূপ। কাজেই নাট্যশাস্ত্রে বৈদিকের সঙ্গে লৌকিকের বেশ একটি যোগসূত্রের আভাস পাওয়া যায়। বায়ুপুরাণের পরিচয়ভঙ্গি কিন্তু অভিনব রকমের। পুরাণকার বহির্গীতের অধিদেবতাও কল্পনা করেছেন।

বায়ুপুরাণে 'মদ্রক' গীতির উল্লেখ আছে। তবে নাট্যশাস্ত্রকারের বর্ণনার সঙ্গে তার কোন মিল নাই। পুরাণকার মদ্রকের মধ্যে স্বরান্তরগীতির পরিচয় দিয়েছেন। অপরান্তিক ও শুল্ল নামক গীতির রীতিভেদ বলতে পুরাণকার কি বুঝিয়েছেন তা নির্ণয় করা দুরূহ। অপরান্তিক দু'টি ও শুল্ল আটটি। পদভেদ ও গানভেদের কথাও পুরাণকার উল্লেখ করেছেন। পদ ও মাত্রার বিভিন্নতায় মতিবীরণা, যান প্রভৃতি গীতিরূপের বিকাশ হয়।

পরিশিষ্টে বায়ুপুরাণের সাঙ্গীতিক অধ্যায়-দু'টি অনুবাদের সঙ্গে সংযোজিত হ'ল, কাজেই বায়ুপুরাণে সঙ্গীতের উপাদান সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আর নিষ্প্রয়োজন।

* * *

খৃষ্টপূর্ব ৬০০ শতক থেকে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় সঙ্গীতের বিকাশ ও বিবর্তনের ইতিকথার পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া হ'ল। বর্তমান উত্তর-ভারতীয় ও দক্ষিণীপদ্ধতির সঙ্গীতধারার সঙ্গে প্রাচীন গীতিরূপ, বাদনপদ্ধতি ও নৃত্যছন্দের অনেক অংশে মিল না থাকলেও এ'কথা ঠিক যে বর্তমান ধারা প্রাচীনের অনুপ্রেরণা ও চেতনা নিয়েই প্রাণবান ও গতিশীল। সে'যুগের সেই সমাজের ধারা—সে'যুগের সেই জীবনের গতি আজ আমাদের কাছে লুপ্ত। তার সাড়া আমাদের জীবনে আর পাওয়া যাবে না। তবুও এ'কথা ঠিক যে আমাদের আজকের এই ধারাও বিগত কালের পরিণতি। দিনে দিনে বছর এগিয়ে চলে, প্রথম দিনটি থেকে শেষের দিনটি কতদূরে চলে যায়, কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে প্রথমের গতিকে অনুসরণ করেই সে তার স্থান পায় পুরোভাগে। সমাজ-সংস্কৃতি ও মানুষের সভ্যতার ধারাও ঠিক তেমনি, একটিকে অনুসরণ ক'রে আর একটি এগিয়ে চলে। অগ্রগতির

স্রোত শুরু থেকে শেষের দিকে হয়তো এমনই তফাৎ হ'য়ে যায় যে তাদের আর একনজরে মিলিয়ে নেওয়া যায় না, তাই সত্যকারভাবে তাকে জানতে গেলে বা চিনতে হ'লে গোড়ার অনুসন্ধান করতেই হয়। যুগে যুগে এগিয়ে চলেছে সমগ্র বিশ্বের গতি ও ধারা, কিন্তু প্রতিটি যুগ তার উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়ে কিছু-না-কিছু চিহ্ন বা নিদর্শন রেখে গেছে ঐতিহ্যের প্রবাহে, ভাঙাগড়ার ভিতর দিয়ে সে কিছু দান ক'রে গেছে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভাণ্ডারে। যুগে যুগে তিল তিল সঞ্চয়ের অবদানে অলংকৃত ও সুষমান্বিত হয়েছে ভারতের সংস্কৃতি, লাভ করেছে সে মহিমময় রূপ! সেই রূপকে অন্তরের মাঝে গ্রহণ করতে হ'লে—প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করতে গেলে তার অতীতের গৌরবোজ্জ্বল সমৃদ্ধিকে অবহেলা করলে চলবে না, শ্রদ্ধার বিনিময়ে তাকে গ্রহণ বা বরণ করতে হবে। এ'জন্যই প্রয়োজন ইতিহাসের। এগিয়ে চলার জন্য পিছনের সহায়তার সার্থকতা আছে। বর্তমান ও ভবিষ্যতের ক্রটী-বিচ্যুতিকে সংস্কৃত ও সংশোধন করার জন্যও প্রয়োজন অতীতের ভালোমন্দের সঙ্গে যোগসূত্র রাখার। সঙ্গীতের ইতিহাসের সার্থকতাও সে'দিক থেকে তাই অপরিহার্য। সংস্কৃতির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ তার নিজের ধারাটিকে অক্ষুণ্ণ রেখে এগিয়ে এসেছে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে সঙ্গে নিয়ে। আজও সে প্রতিষ্ঠিত ও সেই প্রতিষ্ঠার মাঝে সে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সাহিত্যে, কাব্যে, চিত্রে, ভাস্কর্যে ও সঙ্গীতে প্রতিভার দান তার অফুরন্ত। ভারতের ললিত সম্পদ এই 'সঙ্গীত' যে-পথে এগিয়ে চলেছে তার জয়যাত্রার সূচনা ক'রে, ঐতিহাসিক আলোচনায় সেই পথে কিছুটা আলোকপাত করতে পারব ব'লে বিশ্বাস করি ও তারি জন্য এই প্রচেষ্টা!

॥ পরিশিষ্ট ॥

॥ বায়ুপুরাণে সঙ্গীতাংশ ॥

॥ ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

॥ সূত উবাচ ॥

ন জরা ক্ষুৎপিপাসা[১] বা ন চ মৃত্যুভয়ং ততঃ ।
ন চ রোগঃ প্রভবতি ব্রহ্মলোকগতস্য হি ॥৩৪
গান্ধর্বং প্রতি যচ্চাপি পৃষ্টস্তু মুনিসত্তমাঃ ।
ততোঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি[২] যাথাতথ্যেন সুব্রতাঃ ॥৩৫

গান্ধর্বমূর্চ্ছনালক্ষণ কথনম্ ।

সপ্ত স্বরাস্ত্রয়ো গ্রামা মূর্চ্ছনাস্ত্বেকবিংশতিঃ ।
তানা[৩]শ্চৈকোনপঞ্চাশদিত্যেতৎস্বরমণ্ডলম্ ॥৩৬
ষড়্‌জর্ষভৌ চ গান্ধারো মধ্যমঃ পঞ্চমস্তথা ।
ধৈবতশ্চাপি বিজ্ঞেয়স্তথা চাপি নিষাদবান্ ॥৩৭
সৌবীরী মধ্যমগ্রামো[৪] হরিণাস্যা তথৈব চ ।
স্যাৎকলোপ[৫]-বলোপেতা চতুর্থী শুদ্ধমধ্যমা ॥৩৮
শার্ঙ্গী চ পাবনী চৈব দৃষ্টকা চ যথাক্রমম্ ।
মধ্যমগ্রামিকাঃ খ্যাতাঃ ষড়্‌জগ্রামং নিবোধত ॥৩৯
উত্তরমন্দ্রা রজনী তথা যা চোত্তরায়তা ।
শুদ্ধষড়্‌জা তথা চৈব জানীয়াৎ সপ্তমীঞ্চ তাম্ ॥৪০
গান্ধারগ্রামিকাং[৬]-শ্চান্যান্ কীর্ত্যমানান্নিবোধত ।
আগ্নিষ্টোমিকমাদ্যন্তু দ্বিতীয়ং বাজপেয়িকম্ ॥৪১

পাঠভেদ :—১। পিপাসে বা, ২। যথাতথ্যেন, ৩। তানাশ্চৈব, ৪। গ্রামে, ৫। -পনতোপে, ৬। -মিকাশ্চান্যাঃ।

তৃতীয়ং পৌণ্ড্রকং প্রোক্তং চতুর্থং চাঽশ্বমেধিকম্।
পঞ্চমং রাজসূয়ঞ্চ ষষ্ঠঞ্চ[৭]-ক্রসুবর্ণকম্ ॥৪২
সপ্তমং গোসবং[৮] নাম মহাবৃষ্টিকমষ্টমম্।
ব্রহ্মদানঞ্চ নবমং প্রাজাপত্যমনন্তরম্ ॥৪৩
নাগপক্ষাশ্রয়ং বিদ্যাদ্গোতরঞ্চ তথৈব চ।
হয়ক্রান্তং মৃগক্রান্তং বিষ্ণুক্রান্তং মনোহরম্ ॥৪৪
সূর্যক্রান্তং বরেণ্যঞ্চ মত্তকোকিলবাদিনম্[৯]।
সাবিত্রমর্ধসাবিত্রং সর্বতোভদ্রমেব চ ॥৪৫
সুবর্ণঞ্চ সুতন্দ্রঞ্চ[১০] বিষ্ণুবৈষ্ণুবরাবুভৌ।
সাগরং বিজয়ঞ্চৈব সর্বভূতমনোহরম্ ॥৪৬
হংসং জ্যেষ্ঠং বিজানীমস্তম্বুরুপ্রিয়মেব চ।
মনোহরমঘাত্র্যঞ্চ গন্ধর্বানুগতঞ্চ যঃ ॥৪৭
অলম্বুষেষ্টশ্চ[১১] তথা নারদপ্রিয় এব চ।
কথিতো ভীমসেনেন নাগরাণাং যথা প্রিয়ঃ ॥৪৮
বিকলোপনীতবিনতা স্ত্রীরাখ্যো ভার্গবপ্রিয়ঃ[১২]।
অভিরম্যশ্চ শুক্রশ্চ পুণ্যঃ পুণ্যারকঃ স্মৃতঃ ॥৪৯
বিংশতির্মধ্যমগ্রামঃ ষড়্জগ্রামচতুর্দশ।
তথা পঞ্চদশেচ্ছন্তি গান্ধারগ্রামসংস্থিতান্।
সসৌবীরা তু গান্ধারী ব্রহ্মণা হ্যপগীয়তে[১৩] ॥৫০
উত্তরাদিস্বরশ্চৈব ব্রহ্মা বৈ দেবতাঽত্র চ।
হরিদেশে সমুৎপন্না হরিণাস্যা ব্যজায়ত ॥৫১
মূর্ছনা হরিণাস্যৈব অস্যা ইন্দ্রোঽধিদৈবতম্।
করোপনীতবিততা[১৪] মরুদ্ভিঃ স্বরমণ্ডলে ॥৫২
সা কলোপনতা তস্মান্মারুতশ্চাত্র দৈবতম্।
মরু[১৫] দেশসমুৎপন্না মূর্ছনা শুদ্ধমধ্যমা ॥৫৩
মধ্যমোঽত্র স্বরঃ শুদ্ধো গন্ধর্বশ্চাত্র দেবতা।
মৃগৈঃ সহ সঞ্চরতে সিদ্ধানং মার্গদর্শনে ॥৫৪

পাঠভেদ ঃ—৭। বায়ুসুপর্ণকম্, ৮। গৌসবং, ৯। কোকিলনাপি সা বা জীবনং, ১০। সুভদ্রং চ ১১। গম্বুশ্রেষ্ঠঞ্চ, ১২। ভয়াপ্রিয়ঃ, ১৩। সসৌবীরাঃ তু সৌবীরী ব্রহ্মণো হ্যুপিগীয়ন্তে, ১৪। নীতা বিবক্তা, ১৫। মরুদেশ।

যস্মাত্তস্মাৎ স্মৃতা মার্গী মৃগেন্দ্রোঽস্যাশ্চ দেবতা।
সা চাশ্রমসমাযুক্তা অনেকান্ পৌরবান্ রবান্ ॥৫৫
মূর্ছনা যোজনা হ্যেষা রজসা রজনী ততঃ।
তাল উত্তরমন্দ্রাখ্যঃ ষড়্জদৈবতকো বিদুঃ ॥৫৬
তস্মাদুত্তরতালঞ্চ প্রথমং স্বায়তং বিদুঃ।
তস্মাদুত্তরমন্দ্রোঽয়ং দেবতাস্য ধ্রুবো ধ্রুবম্ ॥৫৭
আয়ামাদুত্তরত্বাচ্চ ধৈবতস্তোত্তরায়ণঃ।
স্যাদিয়ং মূর্ছনা হ্যেবং পিতরঃ শ্রাদ্ধদেবতাং ॥৫৮
শুদ্ধষড়্জস্বরং কৃত্বা যস্মাদগ্নিং মহর্ষয়ঃ।
উপতিষ্ঠন্তি তস্মাত্তং জানীয়াচ্ছুদ্ধষড়্জিকম্ ॥৫৯
যঃ সতাং মূর্ছনাং কৃত্বা পঞ্চমস্বরকো ভবেৎ।
যক্ষীণাং মূর্ছনা সা তু যাক্ষিকা মূর্ছনা স্মৃতা ॥৬০
নাগা দৃষ্টিবিষা গীতা নোসর্পন্তি মূর্ছনাম্।
ভবন্তীব হৃতা হ্যেতে ব্রহ্মণা নাগদেবতাঃ ॥৬১
অহীনাং মূর্ছনা হ্যেষা বরুণশ্চাত্র দেবতা।
জলাধিপেন দৃষ্ট্বা স্যাদপ্সু লীনা তথৈব চ ॥৬২
শকুন্তানাং (?) কৃত্বা চ উপগায়ন্তি কিন্নরাঃ।
উত্তমমূর্ছনা তস্মাৎ পক্ষিরাজোঽত্র দেবতা ॥৬৩
মনো মন্দয়তী তেষাং মূর্ছনা মন্দনীত্যপি।
ঋষীণাং স্নাতকানাঞ্চ বিশ্বেদেবাত্র দৈবতম্ ॥৬৪
অশ্বাঃ ক্রমন্তীত্যতো বা রমন্তে বাত্র বাজিনঃ।
অশ্বক্রান্তেতি নিত্যা বৈ অশ্বিনো বাত্র দৈবতম্ ॥
গান্ধাররাগশব্দেন গাঞ্চ ধারয়তেঽর্থতঃ।
তস্মাদ্বিশুদ্ধগান্ধারী গন্ধর্বশ্চাধিদৈবতম্ ॥৬৫
গান্ধারানন্তরং গত্বা স্যষ্টেয়ং মূর্ছনা যতঃ।
তস্মাদুত্তরগান্ধারী বসবশ্চাত্র দেবতাঃ ॥৬৬
সেয়ং খলু মহাভূতা পিতামহমুপস্থিতা।
ষড়্জেয়ং মূর্ছনা তস্মাৎ স্মৃতা হ্যনলদেবতা ॥৬৭
দিব্যেয়ং চায়তা তেন মন্দষষ্ঠা চ মূর্ছনে।
নিবৃত্তগুণনামানং পঞ্চমং চাত্র দৈবতম্ ॥৬৮

পূর্ণাঃ সপ্ত স্বরা হ্যেবং মূর্ছনাঃ সম্প্রকীর্তিতাঃ।
নানা সাধারণাশ্চৈব ষড়েবাহুবিদস্তথা ॥৬৯

॥ সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

॥ সূত উবাচ ॥

পূর্বাচার্যমতঃ বুদ্ধা প্রবক্ষ্যাম্যনুপূর্বশঃ।
ত্রিশতং বৈ অলংকারাস্তান্মে নিগদতঃ শৃণু ॥১
অলংকারাস্তু বক্তব্যাঃ স্বৈঃ স্বৈর্বর্ণৈঃ প্রহেতবঃ।
সংস্থানযোগৈশ্চ তথা পদানাং চান্ববেক্ষয়া ॥২
বাক্যার্থপদযোগার্থৈবলংকারস্থ পূরণম্।
পদানি গীতকস্যাহুঃ পুরস্তাৎ পৃষ্ঠতোঽথবা ॥৩
স্থানানি ত্রীণি জানীয়াদুরঃকণ্ঠঃশিরস্তথা।
এতেষু ত্রিষু স্থানেষু প্রবৃত্তো বিধিরুত্তমঃ ॥৪
চত্বারঃ প্রকৃতৌ বর্ণাঃ প্রবিচারশ্চতুর্বিধঃ।
বিকল্পমষ্টধা চৈব দেবাঃ ষোড়শধা বিদুঃ ॥৫
তত্রৈকসঞ্চারস্থায়ী সচরাস্তু চরীভবম্।
অথ রোহণবর্ণানামবরোহং বিনির্দিশেৎ ॥৭
আরোহণেন চারোহবর্ণং বর্ণবিদো বিদুঃ।
এতেষামেব বর্ণানামলংকারান্নিবোধত ॥৮
অলংকারাস্তু চত্বারঃ স্থাপনীক্রমরেজিনঃ।
প্রমাদশ্চাপ্রমাদশ্চ তেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণম্ ॥৯
বিস্তরোষ্ট্রকলাশ্চৈব স্থানাদেকান্তরং গতঃ।
আবর্তস্যাক্রমোৎপত্তী দ্বে কার্যে পরিণামতঃ ॥১০
কুমারমপরং বিদ্যাদ্বিস্তরঞ্চ মনাগ্‌গতম্।
এষ বৈ চাপ্যপাঙ্গস্তু কৃতারেকঃ কলাধিকঃ ॥১১
শ্যেনস্ত্বেকান্তরে জাতঃ কলামাত্রান্তরে স্থিতঃ।
তস্মিংশ্চৈব স্বরে বৃদ্ধিস্তিষ্ঠতে তদ্বিলক্ষণা ॥১২
শ্যেনস্তু অপরোঽস্তু চ উত্তরঃ পরিকীর্তিতঃ।
কলাকলপ্রমাণাচ্চ সবিন্দুর্নাম জায়তে ॥১৩

বিন্দুরেককলা কার্যা বর্ণান্তস্থায়িনী ভবেৎ।
বিপর্যয়ে স্বরোঽপি স্যাদ্ যস্তু দুর্ঘটিতোঽপিন ॥১৪
একান্তরাত্ত্ু বাহ্যস্তু ষড়্জতঃ পরমঃ স্বরঃ।
আক্ষেপাস্কন্দনং কার্যং কাকস্যেবাচপুস্কলম্ ॥১৫
সন্তারৌ তৌ তু সঞ্চার্যৌ কার্যং বা কারণং তথা।
আক্ষিপ্রমবরোহ্যাপি প্রোক্ষমস্যস্তথৈব চ ॥১৬
দ্বাদশঞ্চ কলাস্থানমেকান্তরগতং ততঃ[১] ॥১৭
দ্বিকলং বা যথাভূতং যত্তদ্রাসিতমুচ্যতে (?)।
যস্তু স্যাদবরোহো বা তারতো মন্দতোঽপি বা।১৮
একান্তরহিতা হ্যেতে তমেব স্বরমন্ততঃ ॥১৯
মক্ষিপ্রচ্ছেদনো নাম চতুষ্কলগণঃ স্মৃতঃ ॥২০
অলংকারা ভবন্ত্যেতে ত্রিংশদ্ যে বৈ প্রকীর্তিতাঃ।
বর্ণস্থানপ্রয়োগেন কলামাত্রাপ্রমাণিতঃ ॥২১
সংস্থানঞ্চ প্রমাণঞ্চ বিকারো লক্ষণং তথা।
চতুর্বিধমিদং জ্ঞেয়মলংকারপ্রয়োজনম্ ॥২২
যথাত্মনো হ্যলংকারো বিপর্যস্তোঽতিগর্হিতঃ।
বর্ণমেবাপ্যলং কর্তুং বিষমং হ্যাত্মসম্ভবাৎ ॥২৩
নানাভরণসংযোগাদ্ যথা নার্যা বিভূষণম্।
বর্ণস্য চৈবালংকারো বিপর্যস্তোঽতিগর্হিতঃ ॥২৪
ন পাদে কুণ্ডলে দৃষ্টে ন কণ্ঠে রসনা তথা।
এবমেব হ্যলংকারো বিপর্যস্তো বিগর্হিতঃ ॥২৫
ক্রিয়মাণোঽপ্যলংকারো রাগাৎ যশ্চৈব দর্শয়েৎ।
যথোদ্দিষ্টস্য মার্গস্য কর্তব্যস্য বিধীয়তে ॥২৬
লক্ষণং পর্যবস্যাপি বর্ণিকাভিঃ প্রবর্তনম্।
যাথাতথ্যেন বক্ষ্যামি মাসোদ্ভবমুখোদ্ভবে ॥২৭
ত্রয়োবিংশত্যশীতিস্তু তেষামেতদ্বিপর্যয়ঃ।
ষড়্জপক্ষেঽপি তত্ত্বাদৌ মধ্যা হীনস্বরো ভবেৎ ॥২৮

১। প্রঙ্খেলিতমলংকারমেবং স্বরসমন্বিতম্।
স্বরসংক্রামকাশ্চৈব ততঃ প্রোক্তস্তু পুষ্কলম্॥
প্রক্ষিপ্তমেব কলয়া পাদানীতরয়োর্ভবেৎ।
সার্ধশ্লোকোঽয়মধিকঃ পুস্তকান্তরধৃতঃ ॥

ষড়্জমধ্যময়োশ্চৈব গ্রাময়োঃ পর্যয়স্তথা।
মানোয়োত্তরমন্দ্রস্য ষড়েবাত্রাধিকস্য চ ॥২৯
স্বরাসম্প্রত্যয়শ্চৈব সর্বেষাং প্রত্যয়ঃ স্মৃতঃ।
অনুগম্য বহির্গীতং বিজ্ঞাতং পঞ্চদৈবতম্ ॥৩০
গোরূপাণাং পুরস্তাত্তু মধ্যমাংশস্ত পর্যয়ঃ।
তয়োর্বিভাগো গীতানাং লাবণ্যের্মার্গসংস্থিতিঃ ॥৩১
অনুষঙ্গং ময়োদিষ্টং স্বসারঞ্চ স্বরান্তরম্।
পর্যয়ঃ সম্প্রবর্তেতে সপ্তস্বরপদক্রমম্ ॥৩২
গান্ধারাংশেন গীয়ন্তে চত্বারি মদ্রকাণি চ।
পঞ্চমো মধ্যমশ্চৈব ধৈবতে চ নিষাদজৈঃ ॥৩৩
ষড়্জর্ষভৈশ্চ জানীমো মদ্রকেষ্বেবনান্তরে।
দ্বে চাপরান্তিকে বিদ্যাদ্ধয়শুল্লাষ্টকস্য তু ॥৩৪
প্রাকৃতে বৈণবৈশ্চৈব গান্ধারাংশে প্রযুজ্যতে।
পদস্য তু ত্রয়ং রূপং সপ্তরূপস্ত কৌশিকম্ ॥৩৫
গান্ধারাংশেন কার্ৎস্ন্যেন পর্যয়স্য বিধিঃ স্মৃতঃ।
এবঞ্চৈব ক্রমোর্দিষ্টো মধ্যমাংশস্য মধ্যমঃ ॥৩৬
যানি গীতানি প্রোক্তানি রূপেণ তু বিশেষতঃ।
তত্তু সপ্তস্বরং কার্যং সপ্তরূপঞ্চ কৌশিকম্ ॥৩৭
অঙ্গদর্শনমিত্যাহুর্মানে দ্বে সমকে তথা।
দ্বিতীয়ভাবাচরণা মাত্রা নাভিপ্রতিষ্ঠিতা ॥৩৮
উত্তরে চ প্রকৃত্যেবং মাত্রা তল্লীয়তে তথা।
হুস্তারঃ পিণ্ডকো যত্র মাত্রায়াং নাতিবর্ততে ॥৩৯
পাদেনৈকেথ মাত্রায়াং পাদোনামতিবীরণা।
সংখ্যায়াশ্চোপহণনং তত্র যানমিতি স্মৃতম্ ॥৪০
দ্বিতীয়ং পাদভাগঞ্চ গ্রহেণাভিপ্রতিষ্ঠিতম্।
পূর্বমষ্টতৃতীয়ে তু দ্বিতীয়ং চাপরান্তিকে ॥৪১
অর্ধেন পাদসাম্যস্য পাদভাগাচ্চ পঞ্চকে।
পাদভাগং সপাদস্ত প্রকৃত্যামপি সংস্থিতম্ ॥৪২
চতুর্থমুত্তরে চৈব মদ্রবত্যাঞ্চ মদ্রকে।
মদ্রকে দক্ষিণস্যাপি যথোক্তা বর্ততে কলা ॥৪৩

পূর্বমেবানুযোগস্তু দ্বিতীয়া বুদ্ধিরিষ্যতে।
পাদৌ চাহরণং চান্মাৎ পারং নাত্র বিধীয়তে ॥৪৪
একত্বমুপযোগস্য দ্বয়োর্চাদ্ধি দ্বিজোত্তম্।
অনেকসমবায়স্তু পতাকাহরিণং স্মৃতম্ ॥৪৫
তিস্রণাঞ্চৈব বৃত্তীনাং বৃত্তৌ-বৃত্তা চ দক্ষিণা।
অষ্টৌ তু সমবায়াস্তে সৌবীরীমূর্চ্ছনা তথা।
কুশত্যানুত্তরং সত্যং সপ্তসত্ত্বস্বরস্তু যঃ[২] ॥৪৭

॥ ভাবার্থানুবাদ ॥

॥ ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

সূত বল্লেন, ব্রহ্মলোকে যাঁরা যান তাঁদের ক্ষুধা তৃষ্ণা জরা মৃত্যু ভয় রোগাদি থাকে না। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ, সঙ্গীত-বিষয়ে আপনারা যে প্রশ্ন করলেন, সে'সম্বন্ধে আমি যথাযথ বলছি। সাতটি স্বর, তিনটি গ্রাম, মূর্ছনা একুশটি ও তান উনপঞ্চাশ রকমের। এদেরই স্বরমণ্ডল বলে। সাতস্বর—ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। মূর্ছনা হিসাবে সৌবীরী, হরিণাস্যা, কলোবল (কলোপনতা ?), শুদ্ধমধ্যমা, শার্ঙ্গী, পাবনী ও দৃষ্টকা মধ্যমগ্রামের অন্তর্গত। উত্তরমন্দ্রা, রজনী, উত্তরায়তা, শুদ্ধষড়্‌জা প্রভৃতি ষড়্‌জগ্রামের অতন্তর্ভুক্ত। এবার গান্ধারগ্রামের মূর্ছনাদের নাম বলছি শ্রবণ করুন। আগ্নিষ্টোমিক, বাজপেয়িক, পৌণ্ড্রক, আশ্বমেধিক, রাজসূয়, চক্রসুবর্ণক, গোসব, মহাবৃষ্টিক, ব্রহ্মদান, প্রাজাপত্য, নাগপক্ষাশ্রয়, গোতর, হয়ক্রান্ত, মৃগক্রান্ত, বিষ্ণুক্রান্ত, (মত্তকোকিলের স্বরের মতন মনোরম), সূর্যক্রান্ত, সাবিত্র, অর্ধসাবিত্র, সর্বতোভদ্র, সুবর্ণ, সুতন্ত্র, বিষ্ণু, বৈষ্ণুবর, সাগর, (সকল প্রাণীর মনোরম), বিজয় (তুম্বুরু ঋষির পরম প্রিয় ও অতীব উত্তম), হংস (অলম্বুষ ও নারদাদি গন্ধর্বগণের অতিশয় প্রিয় ও ভীমসেন-কর্তৃক নগরের সর্বসাধারণের কাছে প্রশংসিত ও মনোহর), অঘাত্র, বিকল, উপনীত, বিনত (ভার্গবের অশেষ প্রিয়), শ্রী, অভিরম্য (শুক্র ও পুণ্যপ্রদ) ও পুণ্যারক এই মূর্ছনাগুলি গান্ধারগ্রামের অন্তর্গত। ৩৪—৪৯। কুড়িটি মূর্ছনা মধ্যমগ্রামের, চৌদ্দটি ষড়্‌জগ্রামের ও পনেরটি গান্ধারগ্রামের মূর্ছনা। ব্রহ্মা

২। চিত্রশাখানুক্তং তস্য ধার্মিকস্য মহাত্মনঃ। ইদমর্ধং পুস্তকান্তরধৃতমধিকম্।

সৌবীরীর সঙ্গে গান্ধারী গান ক'রে থাকেন। উত্তরাদি স্বরের অধিদেবতা ব্রহ্মা। হরিণাস্বা মূর্ছনা হরিদেশ থেকে উৎপন্ন। হরিণাস্বার অধিদেবতা ইন্দ্র। মরুদ্‌গণ স্বরমণ্ডলের মধ্যে হস্তপ্রসারিত ক'রে মূর্ছনা গ্রহণ করেছিলেন ব'লে মূর্ছনার নাম (করোপনীতা) 'কলোপনতা' (?)। এই মূর্ছনার অধিদেবতা মরুদ্‌গণ। শুদ্ধমধ্যমা মূর্ছনা মরুদেশ থেকে উৎপন্ন, এর স্বর শুদ্ধমধ্যম ও অধিদেবতা গন্ধর্ব। সিদ্ধগণের পথপ্রদর্শনকালে মৃগগণের সঙ্গে বিচরণ করে ব'লে মূর্ছনার নাম 'মার্গী'। এর অধিদেবতা মৃগেন্দ্র। বিচিত্র স্বরের দ্বারা এই মূর্ছনা বিভূষিত। মূর্ছনা রজোগুণের দ্বারা সংযোজিত হয় ব'লে তাকে 'রজনী' বলা হয়েছে। উত্তরমন্দ্রা নামে তানের অধিদেবতা ষড়্‌জ; উত্তর ও প্রথম তানানুযায়ী ব'লে নাম 'উত্তরমন্দ্রা'। উত্তরমন্দ্রার অধিদেবতা ধ্রুব। বিস্তার ও উত্তরত্বের জন্য ধৈবতের মূর্ছনার নাম 'উত্তরায়ণ'। পিতৃগণ এর অধিদেবতা। মহর্ষিগণ শুদ্ধষড়্‌জ স্বরে অগ্নির উপাসনা করেন ব'লে সেই ঔপাসনিক স্বরের নাম 'শুদ্ধষড়্‌জিক'। যক্ষীরা পঞ্চমস্বরের মূর্ছনা দ্বারা সাধু ও বিরাগীদের মোহ উৎপন্ন করেছিল, তাই সে'ই মূর্ছনার নাম 'যাক্ষিকা'। অহিমূর্ছনা শুনে বিষধর সাপেরাও বিমুগ্ধ হয়। এই অহিমূর্ছনার অধিদেবতা বরুণ। পূর্বে এই মূর্ছনা জলমধ্যে আত্মগোপন ক'রে ছিল, বরুণদেবতা তার আবিষ্কার করেন (অর্থাৎ প্রথম দর্শন করেন)। 'শকুন্তক'-মূর্ছনায় কিন্নরগণ পক্ষীদের শব্দের অনুসরণ ক'রে গান করে। এই উত্তমমূর্ছনার অধিদেবতা পক্ষীরাজ। 'মন্দিনী'-মূর্ছনা স্নাতক ঋষিদের মনকেও শিথিল করে। বিশ্বদেবগণ এই মূর্ছনার অধিদেবতা। 'অশ্বক্রান্তা'-মূর্ছনার অধিদেবতা অশ্বিনীকুমারদ্বয়। এই মূর্ছনার গতি ও বিকাশ অশ্বের মতো, তাই অশ্বরা এই মূর্ছনা শুনে আনন্দিত হয়। 'গান্ধার'-রাগের স্বরমাধুর্য পৃথিবীকে ধারণ করে অর্থাৎ পৃথিবীর স্থিতিশক্তি বৃদ্ধি করে, তাই এর মূর্ছনার নাম 'বিশুদ্ধগান্ধারী'। এর অধিদেবতা গন্ধর্ব। গান্ধার-স্বরের পর সৃষ্টি হয়েছে ব'লে মূর্ছনার নাম 'উত্তরগান্ধারী'। এর অধিদেবতা বসুগণ। 'ষড়্‌জ'-মূর্ছনা প্রথমে পিতামহের (ব্রহ্মার ?) নিকটে উপস্থিত হয়; এর অধিদেবতার নাম অনল বা অগ্নি। 'দিব্যা' 'আয়তা', 'মন্দষষ্ঠা' মূর্ছনার গুণমাহাত্ম্য বর্ণনাতীত। এদের অধিদেবতা পঞ্চম। সম্পূর্ণ মূর্ছনা সাত স্বরের ও আরো সাধারণ ছ'রকম মূর্ছনা যথাযথ আমি বর্ণনা করলাম। ৫০—৬৯

॥ সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায় ॥

সূত বল্লেন : হে মুনিগণ, এখন আমি পূর্ব-আচার্যদের অভিমত অনুসারে যথাক্রমে তিনশত গীতালংকার বলছি আপনারা শুনুন। নিজের নিজের অনুগুণ বর্ণ ও পদসমূহের সংযোগ-বিশেষকেই 'অলংকার' বলে। পদ ও বাক্যের সংযোগে উৎপন্ন অর্থের দ্বারা অলংকারের অভিব্যক্তি হয়। গীতগুলির পদসমূহ পূর্বে বা পরে বিন্যস্ত হয়। তিনটি স্থান : বক্ষ, কণ্ঠ ও মস্তক। এই তিন স্থানে উচ্চারিত স্বর বা ধ্বনিই উত্তম। প্রকৃতিগত বর্ণ চারটি ও এদের বিচার চার রকমের। কিন্তু দেবগণের অভিমতে বিচার ষোল রকমের। বর্ণতত্ত্ববিদেরা বলেন বর্ণ চার প্রকার : স্থায়ী, সঞ্চারী, আরোহণ ও অবরোহণ। একই ভাবে যার বিস্তার (বিকাশ) হয় তাকে স্থায়ী বলে। নানান্ রকমে যার সঞ্চরণ (গতি) হয় তাকে সঞ্চারী বলে। যার নিম্নগতি হয় তাকে অবরোহণ ও যার ওপরে গতি তাকে আরোহণ বলে। বর্ণতত্ত্ববিদ্‌দের সিদ্ধান্ত তাই। এ'সকল বর্ণের অলংকার সম্বন্ধে বলছি শুনুন। ১-৮

অলংকার চারটি : স্থাপনী, ক্রমরেজিনী, প্রমাদ ও অপ্রমাদ। এদের লক্ষণ : উষ্ট্রকলা নামে বিকৃত স্বরটি একস্থান থেকে আরম্ভ হ'য়ে অন্যস্থানে শেষ হয়। আবর্ত নামক স্বরের উৎপত্তি ও ক্রমব্যত্যয় পরিমাণ অনুযায়ী করা উচিত। কুমার নামক স্বর অল্পে অল্পে বিস্তার লাভ করে ; এতে কখনও অপাঙ্গভঙ্গী ও কখনও বা তারকা-সংকোচাদি বিচিত্র রকমের কলাকৌশল থাকে। শ্যেণস্বর একান্তর কলায় উৎপন্ন হ'য়ে অন্য কলায় বা মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্বরাশ্রয়ে বৃদ্ধির লক্ষণা থাকে। শ্যেণস্বর উত্তরাবরোহী, অর্থাৎ পরে নিম্নদিকে এর বিকাশ হয়। বিন্দুযুক্ত স্বর কলা অথবা মাত্রার আকারে (মাত্রা অনুযায়ী) সৃষ্টি হয়। বিন্দু অর্থে এককলা, এই কলা বর্ণান্তস্থায়ী। অনবধানের ফলে স্বরে বিপর্যয় দেখা দেয় বটে, কিন্তু অনবহিত না হলেও ইচ্ছা ক'রে স্বরে বিপর্যয় ঘটানো যায়। ষড়্‌জ থেকে আরম্ভ প্রধান স্বরে একান্তর ভাবে কাকের মতো কখন উচ্চ, আবার কখনও নীচক্রমে আক্ষেপ ও অবস্কন্দন দরকার। উচ্চধ্বনি বা উচ্চস্বরের সঙ্গে সঞ্চারী এই স্বরদ্বয় কার্য বা কারণ-স্বরূপ এতে অবরোহী জলধারায় মতো প্রবাহকারা গতি থাকে। কলাস্থান একান্তরভাবে বারো রকমের হয়। ত্রাসিতস্বর দুই কলা-বিশিষ্ট। এর উচ্চারণে দু'টি স্বর প্রকাশিত হয়। এর উচ্চারণও আটটি স্বরান্তরে করতে হয়। উচ্চ বা নীচ থেকে আরম্ভ হ'য়ে অবরোহক্রমে ও

একান্তরভাবে ত্রাসিতস্বর প্রধান স্বরকে অনুসরণ করে। মক্ষিপ্রচ্ছেদন নামক গণ চারটি কলা বা মাত্রাযুক্ত। বর্ণ, স্থান ও প্রয়োগের অনুযায়ী কলা, মহাপ্রমাণ ও ত্রিশ প্রকার অলংকার সম্বন্ধে বলা হ'ল। ৯-২১। সংস্থান, প্রমাণ, বিকার, ও লক্ষণ অলংকারের জন্য প্রয়োজন। মানুষের শরীরে শোভিত অলংকারের মতো সাঙ্গীতিক অলংকার সঙ্গীতের বর্ণের শোভা-সম্পাদন করে ; কিন্তু অযথাভাবে অলংকারের বিন্যাস হ'লে মানুষের যেমন কষ্টকর হয় তেমনি সঙ্গীতের পক্ষেও। ফলতঃ নারীদের অলংকারের মতো সঙ্গীতে অলংকারের যথাযোগ্য বিন্যাস দরকার। পায়ে কুণ্ডল ও গলায় কাঞ্চী পরালে যেমন নারীদের পক্ষে অশোভন হয়, সঙ্গীতের বেলায়ও তাই। যথাযথভাবে অলংকার বিন্যাস না করলে শোভাযুক্ত হয় না। সুতরাং শিল্পী যথাকালে ও যথাবিধানে রাগের বিকাশ ও রাগে অলংকারের সংযোগ করবেন। সূত বল্লেন: এখন আমি সঙ্গীতের যথাযথ প্রবৃত্তি, মাসোৎপত্তি, মুখোৎপত্তি প্রভৃতি তত্ত্বসমূহ বর্ণনা করব। ষড়্‌জস্বর সম্বন্ধে তেইশ রকম অলংকারের বিধান আছে। পুনরায় আশী রকমেও তার বিধান করা যায়। ষড়্‌জাদি স্বর মন্দ্র, মধ্য ও তার (নীচ, মধ্য ও উচ্চ) হিসাবে তিন রকম ভাবে বিকশিত হয়। ষড়্‌জগ্রাম ও মধ্যমগ্রাম এই দু'টির রীতি প্রায় এক রকমের। নীচ ও উচ্চ স্বর-দু'টির ছ'রকমভাবে মান নির্ণীত হয়। ২২-২৯

স্বরসমূহের যথাযথভাবে আলাপন হ'লে স্বরগুলি 'গীত' নামে কথিত হয়। সেই গীত যদি কোন স্বরের মধ্যে থেকে অন্যস্বরে বা স্বরান্তরে প্রকাশ পায় তবে তাকে 'বহির্গীত' বলে। এই বহির্গীতের অধিদেবতা পঞ্চদেবতা। শব্দময় অর্থাৎ ভাষা তথা সাহিত্যসম্বলিত সঙ্গীতসমূহের (গীতসমূহের) আদি, মধ্য ও শেষভাগে অলংকারাদি কৌশলের মধ্যে বিচিত্র রীতিতে বা ধারায় প্রকাশ পায়। পদক্রমানুসারে সাতটি স্বর থেকে অপরাপর কতকগুলি শব্দের স্বরের (?) সৃষ্টি হয়। আমি ইতঃপূর্বে তার আভাস দিয়েছি। গান্ধারস্বর অনুসারে চারটি মদ্রক গীত হয়। পঞ্চম, মধ্যম, ধৈবত, নিষাদ ও ষড়্‌জ স্বরগুলিতেও (স্বরগুলির সাহায্যেও) ঐ ধরণের মদ্রক গাওয়া যায়। মদ্রকের মধ্যে 'স্বরান্তর' গীত হয় না। প্রকৃত গীতে ও বাঁশীর স্বরে (কণ্ঠে ও যন্ত্রে) প্রযুক্ত গান্ধারাংশ অনুসারে দু'টি 'অপরান্তিক' ও আট রকমের 'উল্ল' নামে রীতিভেদ দেখা যায়। পদের ভেদ তিন রকম ও গানের ভেদ সাত রকম। গান্ধারাংশের অনুগত ভেদের বিবরণ এইরূপ। মধ্যমস্বরেরও ভেদক্রম এই প্রকার। পূর্বে যে সকল সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে তাদের বিষয়ে সাত স্বরের অন্তর্নিবেশ দরকার, কেননা গীত

(গান) সাত রকমের। সম-দু'টিতে প্রযুক্ত মানই সঙ্গীতের অঙ্গরূপ। দ্বিতীয়াদি তাল এর চরণ ও মাত্রাসমূহ নাভিমণ্ডল। সঙ্গীতের প্রকৃতি অনুসারে কখনও কখনও মাত্রাসমূহ লীণ হ'য়ে অবস্থান করে (মাত্রা সকল আত্মগোপন ক'রে থাকে)। সঙ্গীতের যে অংশে মাত্রানুসারে তানের বিন্যাস না থাকে সেই অসম্পূর্ণ পদবিশিষ্ট অংশকে 'মতিবীরণা' বলে। যে অংশে নির্দিষ্ট মাত্রাসংখ্যার বিপর্যয় হয় তাকে 'যান' বলে। পূর্বে উক্ত আট প্রকারের শুল্ল (?) ও অপরান্তিক এই দু'টি শ্রেণীরর দ্বিতীয় পাদভাগে সঙ্গীতারম্ভ হ'লে তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী পদবিভাগ চতুর্থাংশে বর্ধিত হ'য়ে পঞ্চম পাদে সম্পূর্ণতা লাভ করে এবং অর্ধভাগে সমতা প্রাপ্ত হয়। দক্ষিণ বা উত্তর মন্ত্রকে চতুর্থ পাদান্তেই শেষ হয়। প্রথমে কলাসমূহের অনুযোজন, পরে তার বৃদ্ধি, নিয়োগ ও পাদদ্বয়ের সংযোগ দরকার। এ'সম্বন্ধে আর অন্য রকম বিধান হয় না। হে দ্বিজবর, দুই বা ততোধিক স্বরকে একত্রিত করলে তা 'পতাকারিণ' নামে কথিত হয়। তিন রকম সঙ্গীত-বৃত্তির একীকরণ হ'লে তাকে 'দক্ষিণা' বলে। মিলিত আট রকম সৌবীরী-মূর্ছনা পর পর সাতটি স্বরকে যথাক্রমে আকর্ষণ ক'রে প্রকাশ পায়। ৩০-৪৬

॥ শব্দসূচী ॥

(সাঙ্গীতিক উপাদান হিসাবে যে শব্দগুলি একান্ত প্রয়োজনীয় মাত্র সে'গুলিরই শব্দসূচী দেওয়া হ'ল)

গ্রন্থপঞ্জী (BIBLIOGRAPHY)

1. ABHEDĀNANDA, SWĀMI : *India and Her People* (published by the Rāmakrishna Vedānta Math, Calcutta).
2. ĀCHĀRYA, DR. P. R. :
   (a) *The Play-house of the Hindu Period* (an article appeared in Dr. S. K. Āiyāṅger Commemoration Volume).
   (b) *Mānasāra*, Vols. I-III (Allahabad).
3. ĀGRAWĀLA, DR. V. S. :
   (a) *Some Early References to Musical Rāgas and Instruments* (an article appeared in the Journal of the Music Academy, Madras, Vol. XXIII, pts. I-IV, 1952).
   (b) *Dance Terminology from Kālidāsa* (an article appeared in U.S.I.C. Centre News,, Ālmorā, October 15, 1942).
4. ĀIYĀNGĀR, S. KRIṢṆASWĀMĪ : *Some Contribution of South India to Indian Culture* (Calcutta).
5. AUFRECHT : *Catalogues Catalogorum*, pt. I, No. 130 (Leipzig).
6. *AVADĀNA-ŚATAKA* (Bibliothica Buddhica).
7. BAṚUĀ, DR. B. M. :
   (a) *Trends in Ancient Indian History* (an article appeared in the Calcutta Review, Feb. 1946).
   (c) *Asoka and His Inscription* (1946), Vols. I & II.
   (c) *Bārhut*, Vols. I-III (Indian Research Institute, Calcutta).
8. BASU, NAGENDRA NĀTH : *The Archaeological Survey of Mayurbhañja* (1911), Vol. I.
9. BĀGCHI, DR. PRABODH CHANDRA :
   (a) *Studies in Tantras* (Calcutta University, 1939).
   (b) *The Diffusion of Indian Music in Ancient Times* (an article appeared in the musical journal 'Uttaramandrā'; Vol. I, March, 1940).
   (c) *Indian Civilization in Central Asia* (—The Four Arts Annual, 1935)
10. BARRETT, DOUGLAS : *Sculptures from Amarāvati in the British Museum* (London, 1954).
11. BASĀK, DR. RĀDHĀGOVINDA : *The Literary Merit of Ancient Indian Inscriptions* (an article appeared in Bulletin of the Rāmakrishna Mission Institute of Culture, Vol. II, April, 1956, Vol. 4).
12. BEAL, SĀMUEL : *The Romantic Legend of Śākya Buddha* (from Chinese-Sanskrit), London, 1875.
13. *Bhāndārkar Oriental Research Institute Catalogue of MSS.*, Vol. XII.

14. BHADRABAHU : *Kalpasūtra* (Jaina Pustakoddhāra Fund Series, No. 61).
15. BHĀNDĀRKAR, Dr. D. R. : *A Note on Dancing* (in U.S.I.C. 'Centre News', Ālmora, Sept. 22, 1941).
16. BHĀNDĀRKAR, Prof. R. G. : *Nāsik Cave Inscriptions* (appeared in International Congress of Orientalists, London, 1876).
17. BHĀTKHANDE, PANDIT V. N. :
 (a) *A Short Historical Survey of the Music of Upper India* (Bombay, 1934).
 (b) *A Comparative Study of Some of the Leading Music Systems of the 15th, 16th, 17th and 18th Centuries* (Bombay).
18. BOSE, PHANINDRANĀTH : *Indian Teachers of Buddhist Universities* (Madras, 1923).
19. BREASTED, Prof. JAMES HENRY : *A History of Egypt* (2nd edition, 1951).
20. BROWN, PERCY :
 (a) *Indian Architecture* (Buddhist & Hindu Periods), Second Edition, published from Bombay.
 (b) *Indian Painting* (The Heritage of India Series).
21. *Bulletin of the Deccan College, The* (1956), Vol. 14, No. 4.
22. CALAND, Dr. : *Pañchavimśa-Brāhmaṇa* (Eng. Trans., 1937), published by the Asiatic Society of Bengal, Calcutta.
23. CHAITANYA DEVA, B. :
 (a) *Imergence of the Drone in Indian Music* (appeared in the Journal of the Music Academy, Madras, Vol. XXIII, 1952).
 (b) *Psychology of the Drone in Melodic Music* (—Bulletin of the Deccan College Research Institute, Sept. 1950).
24. CHAMANLĀL : *Hindu America* (1941).
25. CHĀTTERJI, Dr. BIJAN RĀJ : *Indian Cultural Influence in Cambodia* (Calcutta University, 1928).
26. COLEBROOKS, H. T. : *Miscellaneous Essay*, Vols. I & II (edited by E. B. Cowell, London, 1873).
27. COOMERASWĀMY, Dr. A. K : . *Bulletin of the Museum of Fine Arts*, Vol. XXVIII, No. 160 (Boston, April, 1929).
28. CUNNINGHAM, Sir ALEXANDER : *Reports of Archaeological Survey of India*.
30. DĀSGUPTA, Dr. S. N. : *A History of Indian Philosophy*, Vol. I & II.
31. DAY, Captain R. : *The Musical Instruments of Southern India and Deccan* (1891).
32. DE, Dr. S. K. :
 (a) *History of Sanskrit Poetics*, Vols. I & II.
 (b) *The Curtain in Ancient Indian Theatre* (appeared in Bhāratiya Vidyā, Vol. IX, 1948).

33. *Descriptive Catalogue of Sanskrit MSS. in the Oriental MSS. Library*, Madras, Vol. XII, No. 8735; Vol. XXII, Nos. 8725, 8726, 8735 (with Telegu Commentary).
34. DHARMA, P. C. : *Musical Culture in the Rāmāyaṇa* (appeared in the Indian Culture, Vol. IV, No. 4, April, 1939).
35. *Dialogue of Buddha*, pts. I & II.
36. DIKṢIT, RĀI BĀHĀDUR, K. N. : *Prehistoric Civilization of Indus Valley* (Madras, 1939).
37. DUTTA, DR. N. K. : *Mahāyāna Buddhism and Its Relation to Hīnayāna* (1930).
38. EGGELING : *Catalogue of Sanskrit MSS. in India Office*, London, Nos. 3025, 3089.
39. ENGLE, CARL : *The Music of the Most Ancient Nations* (1865).
40. *Epigraphia Indica*, Vol. XX.
41. FERGUSSON, JAMES :
    (a) *History of Architecture*, Vols. I-V (London, 1893).
    (b) *Tree and Serpent Worship*.
42. FÉTIS, M. : *'Antonic Stradivari précédé des les Transformations des Instruments à Achet'* (Paris, 1856).
43. FELBER, DR. ERWIN : *The Indian Music of the Vedic and the Classical Period* (with text and translation by Bernherd Geiger, and a brief Eng. Trns. by Prof. G. H. Rānāde, published in the Journal of the Music Academy, Madras. The original book was published in 1912, SAW. No. 170/17, Vienna).
44. GALPIN, F. W. : *A Text Book of European Musical Instruments* (1937).
45. GĀNGOLI, PROF. O. C. :
    (a) *Rāgas and Rāginīs* (Bombay, 1948).
    (b) *Non-Aryan Contribution to Aryan Music* (—Annals of the Bhāndārkar Oriental Research Institute, Poona, Vol. XV, pts. I-II, 1934).
    (c) *Dhruvā : A Type of Old Indian Stage-Songs* (—Journal of the Music Academy, Madras, Vol. XIV, pts. I-IV).
    (d) *The Meaning of Music* (—The Hindoostan, Jan.-March, 1940).
    (e) *A New Document of Indian Dancing* (—U.S.I.C. 'Centre News' Ālmora, Vol. V, No. 50, April, 1943).
46. GHOSE, DR. MONOMOHAN :
    (a) *The Nātyaśāstra*, Vol. I (Eng. Trans.), published by the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1951.
    (b) *Abhinaya-Darpaṇa by Nandikeśvara* (published by the Metropolitan Printing House, Calcutta, 1943).
    (c) *Hindu Drama and Theatre of Asia Minor* (Hindusthan Standard, 1952).
47. GRÜNWEDEL, PROF. A. : *Buddhistische Kunst in Indien.* Its Eng. Ed. by A. C. Gibson and J. Burges (London, 1901).

48. HUNG, DR. MARTIN: *Aitareya-Brāhmaṇa of Rigveda*, Vols. I & II (Bombay, 1863).
49. HAZRA, DR.: *Studies in the Purāṇic Records on Hindu Rites and Customs* (1490).
50. *Hermes*, Vol. XXIX (1894).
51. HOOGT, J. M. VAN DER: *The Vedic Chant Studies in Its Textual and Melodic Form* (Holland, 1929).
52. HOPKINS, W.:
    (a) *Epic Mythology* (Strassburg, 1915).
    (b) *The Great Epic of India.*
53. (a) *Indian Historical Quarterly*, Vol. II, 1926.
    (b) Do., Vol. VIII, Dec., 1932, No. 4.
    (c) Do., Vol. VI, March, 1930.
54. *Jātaka or Stories of the Buddha's Former Births* (Eng. Trans. by E. B. Cowell, Vols. I-VII, Cambridge, 1907).
55. (a) *Journal of the Music Academy*, Madras, Vol. XVIII, 1946.
    (b) Do., Vol. IX.
    (c) Do., Vol. XXIII, 1952.
    (c) Do., Vol. XX, 1949.
    (e) Do., Vol. XII, 1955.
56. (a) *Journal of Andhra Historical Research Society, Quarterly*, Vol. III.
    (b) *Do.*, Vol. II, Octo., 1927, No. 2
57. *Journal of Philology, The*, Vol. XII, 1883.
58. KALA, S. C.: *Entertainments in the Second Century B.C.* appeared in U.S.I.C. 'Centre News', Ālmora, Octo. 15, 1943).
59. KĀNE, DR. P. V.:
    (a) *The History of Sanskrit Poetics* (or History of Alaṁkāra-śāstra), 3rd Ed., Bombay, 1951.
    (b) *History of Dharmaśāstras*, Vol. I to IV, Bombay).
60. KRAMRISCH, STELLA:
    (a) *The Art of India* (Through the Ages), Phaldon Press.
    (b) *Indian Sculpture* (Calcutta).
61. KRISHNAMACHĀRIĀR, DR. M.: *History of Classical Sanskrit Literature* (Madras, 1937).
62. LĀHĀ, DR. N. N.:
    (a) *Mahenjo-daro and the Indus Valley Civilization* (an article appeared in the Indian Historical Quarterly, Vol. VIII, March, 1932).
    (b) *Studies in Indian History and Culture* (Calcutta Oriental Series, No. 18. E. 11, 1925).
    (c) *Inter-State Relations in Ancient India*, Pt. I (Calcutta).
63. *Laṅkavatāra-Sūutra* edited by Dr. Bunyi Nanjo (Otani University Press, Kyoto, 1923).

64. LAW, DR. B. C.:
(a) *Tribes in Ancient India* (1943).
(b) *Geography of Early Buddhism* (London, 1932).
(c) *Historical Gleanings* (Calcutta).
(d) *Ancient Mid-Indian Kshatriya Tribes.*
65. LEFFMANN, DR. S.: *Lalita-Vistara* (Halle a. S., 1902).
66. LEGGE, T.: *Record of the Buddhist Kingdoms* (Eng. Trans., Oxford, 1886).
67. MACDONALD, K. S.: *The Story of Barlaam and Joasaph: Buddhism and Christianity* (Calcutta, 1895).
68. MACDONELL, A. A.:
(a) *Vedic Mythology* (forms the part of Encyclopaedia of Indo-Aryan Research, edited by G. Bühler, Vol. III, part I a.).
(b) *History of Sanskrit Literature* (London & New York).
69. (a) *Madras MSS. Trinnial Catalogue,* Vol. XXII, Nos. 13014 & 13015.
(b) *Madras, Triennial Catalogue of Sanskrit MSS. in Oriental Library,* Vol. II, No. 1360; Vol. III, No. 2435.
(c) Do., 1910-1011 to 1912-1913 & 1916-1918, No. 2432.
70. (a) *Mahābhārata* (Souther Recension), critically edited by P. P. S. Sastri, B.A. (Oxon.), M.A., Vols. I-XVII (Madras, 1933).
(b) *Mahābhārata* (Northern Recension) with commentary *Bhāvadīpa* (Poona).
(c) *Mahābhārata* (As History & a Dharma) by Rai Promatha Nāth Mullic Bāhādur (Calcutta, 1939).
71. MAJUMDER, DR. R. C. & DR. A. D. PUSALKER:
(a) *The History and Culture of the Indian People* (The Vedic Age), Vol. I (2nd Ed., 1952).
(b) Do., (The Imperial Age), Vol. II (Bombay, 1951).
(c) Do., (The Classical Age), Vol. III (Bombay, 1954).
72. MAJUMDER, DR. R. C. & DR. H. C. ROYCHOUDHURY & DR. KALI KINKAR DUTT: *An Advanced History of India* (London, 1953).
73. MĀNKĀD, D. R.: *Ancient Indian Theatre* (1950).
74. MĀRKANDEYA-PURĀṆA (Eng. Trans.) by F. E. Pārgiter.
75. MARSHALL, SIR JOHN: *A Guide to Taxilā* (Calcutta, 1921).
76. MITRA, R. L.:
(a) *Antiquities of Orissa,* Vols. 1 & II.
(b) *Indo-Aryans* (Calcutta, 1881), Vols. I & II.
77. MUIR, J.: *Origin and History of the People of India,* Pts. I & II (Williams & Norgate, MDCCC.LX).
78. MUKHERJEE, P. K.: *Indian Literature Abroad (China).*
79. MUKHERJEE, DR. R. K.:
(a) *Ancient Indian Education* (Macmillan & Co., 1941).
(b) *Hindu Civilization* (Indian Ed., 1950).

80. (a) *Nāṭyaśāstra* (Baroda Ed.), Vols. I-III with Abhinavagupta's Commentary *'Abhinavabhārati'*.
(b) *Nāṭyaśāstra* (Kāvyamālā Ed. Bombay).
(c) *Nāṭyaśāstra* (Banaras Ed.).
(d) *Nāṭyaśāstra* (Eng. Trans. by Dr. M. M. Ghose, Calcutta).

81. OLDENBERG, PROF. : *Literatar des alten Indian.*

82. *Pañchatantra,* Vol. I (& do, Harvard Oriental Series).

83. PĀNDEY, DR. K. C. :
(a) *Abhinavagupta* (An Historical & Philosophical Study), Vol. I (Chokhāmbā Sans. Series, Banaras, 1935).
(b) *Indian Aesthetics* (Cowkhāmbā Sans. Series, Banaras, 1950).

84. PĀNDURANG, PANDIT SANKAR : *Who wrote the Raghuvaṁśa and When* (appeared in International Congress of Orientalists, London, 1879).

85. PANTULU-GURU, PROF. ĀPPĀ RAO : *The Flutes and Its Theory* (appeared in the Journal of the Music, Academy, Madras, Vol. II, 1931).

86. PARSONS, E. A. : *The Alexandrian Library* (1952).

87. PHARKE, PANDIT A. S. : *Sports and Games as Referred to in Sanskrit Literature* (an article appeared in the Journal of the Princess of Wales Sarasvatī Bhavana Studies, Vol. X, 1939).

88. PIGGOT, STUART : *Prehistoric India* (1950).

89. PISHAROTI, K. R. : *The Ancient Indian Theatre* (appeared in Rājāh Sir Ānnāmalai Chettiār Commemoration Volume, 1941).

90. *Poona Orientalists, The,* Vol. IV, April-July, 1939, Nos. 1 & 2.

91. PRAJÑĀNĀNANDA, SWAMI :
(a) *Music of India and China* (—Hindusthan Standard, April, 1955).
(b) *A Historical Outlook of Indian Music* (Free-Lance).
(c) *Some Musical Features in Nāradī-Sikṣā and Nāṭyaśāstra* (—The Souvenir of Entally Cultural Conference, 9th Annual Session, 1956).
(d) *A Peep into the History of Music of Hindu and Buddhist India* (appeared in Entally Cultural Conference, 8th Annual Session, 1955).
(e) *Ancient Methods of Tuning in Indian Music* (appeared in the Souvenir, All India Sadāraṅg Music Conference, 2nd Session, 1955 and reappeared in 'Eastern Post', Winter—1955-56).
(f) *Music and Musical Literatures of Bengal* (appeared in the Souvenir, Jhankar, Music Circle, Calcutta, 1955).
(g) *Music has Its Change* (appeared in the Official Programme of All Bengal Music Conference, 13th Session, 1953).
(h) *Sāmagāna in the Vedic Literature* (Series of Articles appeared in the 'Rhythm', 1955-56).

64. LAW, DR. B. C.:
(a) *Tribes in Ancient India* (1943).
(b) *Geography of Early Buddhism* (London, 1932).
(c) *Historical Gleanings* (Calcutta).
(d) *Ancient Mid-Indian Kshatriya Tribes.*
65. LEFFMANN, DR. S.: *Lalita-Vistara* (Halle a. S., 1902).
66. LEGGE, T.: *Record of the Buddhist Kingdoms* (Eng. Trans., Oxford, 1886).
67. MACDONALD, K. S.: *The Story of Barlaam and Joasaph: Buddhism and Christianity* (Calcutta, 1895).
68. MACDONELL, A. A.:
(a) *Vedic Mythology* (forms the part of Encyclopaedia of Indo-Aryan Research, edited by G. Bühler, Vol. III, part I a.).
(b) *History of Sanskrit Literature* (London & New York).
69. (a) *Madras MSS. Trinnial Catalogue,* Vol. XXII, Nos. 13014 & 13015.
(b) *Madras, Triennial Catalogue of Sanskrit MSS. in Oriental Library,* Vol. II, No. 1360; Vol. III, No. 2435.
(c) Do., 1910-1011 to 1912-1913 & 1916-1918, No. 2432.
70. (a) *Mahābhārata* (Souther Recension), critically edited by P. P. S. Sastri, B.A. (Oxon.), M.A., Vols. I-XVII (Madras, 1933).
(b) *Mahābhārata* (Northern Recension) with commentary *Bhāvadīpa* (Poona).
(c) *Mahābhārata* (As History & a Dharma) by Rai Promatha Nāth Mullic Bāhādur (Calcutta, 1939).
71. MAJUMDER, DR. R. C. & DR. A. D. PUSALKER:
(a) *The History and Culture of the Indian People* (The Vedic Age), Vol. I (2nd Ed., 1952).
(b) Do., (The Imperial Age), Vol. II (Bombay, 1951).
(c) Do., (The Classical Age), Vol. III (Bombay, 1954).
72. MAJUMDER, DR. R. C. & DR. H. C. ROYCHOUDHURY & DR. KALI KINKAR DUTT: *An Advanced History of India* (London, 1953).
73. MĀNKĀD, D. R.: *Ancient Indian Theatre* (1950).
74. MĀRKANDEYA-PURĀṆA (Eng. Trans.) by F. E. Pārgiter.
75. MARSHALL, SIR JOHN: *A Guide to Taxilā* (Calcutta, 1921).
76. MITRA, R. L.:
(a) *Antiquities of Orissa,* Vols. 1 & II.
(b) *Indo-Aryans* (Calcutta, 1881), Vols. I & II.
77. MUIR, J.: *Origin and History of the People of India,* Pts. I & II (Williams & Norgate, MDCCC.LX).
78. MUKHERJEE, P. K.: *Indian Literature Abroad* (*China*).
79. MUKHERJEE, DR. R. K.:
(a) *Ancient Indian Education* (Macmillan & Co., 1941).
(b) *Hindu Civilization* (Indian Ed., 1950).

80. (a) *Nāṭyaśāstra* (Baroda Ed.), Vols. I-III with Abhinavagupta's Commentary *'Abhinavabhāratī'*.
(b) *Nāṭyaśāstra* (Kāvyamālā Ed. Bombay).
(c) *Nāṭyaśāstra* (Banaras Ed.).
(d) *Nāṭyaśāstra* (Eng. Trans. by Dr. M. M. Ghose, Calcutta).

81. OLDENBERG, PROF. : *Literatar des alten Indian.*

82. *Pañchatantra,* Vol. I (& do, Harvard Oriental Series).

83. PĀNDEY, DR. K. C. :
(a) *Abhinavagupta* (An Historical & Philosophical Study), Vol. I (Chokhāmbā Sans. Series, Banaras, 1935).
(b) *Indian Aesthetics* (Cowkhāmbā Sans. Series, Banaras, 1950).

84. PĀNDURANG, PANDIT SANKAR : *Who wrote the Raghuvaṁśa and When* (appeared in International Congress of Orientalists, London, 1879).

85. PANTULU-GURU, PROF. ĀPPĀ RAO : *The Flutes and Its Theory* (appeared in the Journal of the Music, Academy, Madras, Vol. II, 1931).

86. PARSONS, E. A. : *The Alexandrian Library* (1952).

87. PHARKE, PANDIT A. S. : *Sports and Games as Referred to in Sanskrit Literature* (an article appeared in the Journal of the Princess of Wales Śarasvatī Bhavana Studies, Vol. X, 1939).

88. PIGGOT, STUART : *Prehistoric India* (1950).

89. PISHAROTI, K. R. : *The Ancient Indian Theatre* (appeared in Rājāh Sir Ānnāmalai Chettiār Commemoration Volume, 1941).

90. *Poona Orientalists, The,* Vol. IV, April-July, 1939, Nos. 1 & 2.

91. PRAJÑĀNĀNANDA, SWAMI :
(a) *Music of India and China* (—Hindusthan Standard, April, 1955).
(b) *A Historical Outlook of Indian Music* (Free-Lance).
(c) *Some Musical Features in Nāradī-Śikṣā and Nāṭyaśāstra* (—The Souvenir of Entally Cultural Conference, 9th Annual Session, 1956).
(d) *A Peep into the History of Music of Hindu and Buddhist India* (appeared in Entally Cultural Conference, 8th Annual Session, 1955).
(e) *Ancient Methods of Tuning in Indian Music* (appeared in the Souvenir, All India Sadāraṅg Music Conference, 2nd Session, 1955 and reappeared in 'Eastern Post', Winter—1955-56).
(f) *Music and Musical Literatures of Bengal* (appeared in the Souvenir, Jhankar, Music Circle, Calcutta, 1955).
(g) *Music has Its Change* (appeared in the Official Programme of All Bengal Music Conference, 13th Session, 1953).
(h) *Sāmagāna in the Vedic Literature* (Series of Articles appeared in the 'Rhythm', 1955-56).

(i) *Iconography of Indian Music* (appeared in the Souvenir of All India Tāsseu Saṅgit Sammelān, 1955).
(j) *Maṅgalagīti, Its Nature and Form* (During the time of Kālidāsa)—appeared in the Souvenir of Jhaṅkār, Music Circle, August, 1956.
(k) *Śrī Durgā* (Published by R. K. V. Math, Calcutta).
(l) *Is Bhairava the Ādi-Rāga* (—Prabuddha Bhārata, August, 1953).
(m) *A Study in Indian Music* (appeared in 'Hindusthān Standard', Pujā Annual, 1952).
(n) *Music in Markandeya Purana* (appeared in 'Hindusthan Standard', Pujā Annual, 1951).
(o) *A Forgotten Chapter of Indian Music* (—Hindusthān Standard, Pujā Annual, 1950).
(p) *Province of Grammar in Indian Music* (appeared in the Proceedings of Music Conference of the Music Academy, Madras, 1954).
(q) *Culture of Indian Music* (—Rhythm, July, 1953).
(r) *Introduction to 'Saṅgītasāra-Saṁgraha'* (published by the R. K. V. Math, Cal., 1956). *Philosophy of Music, Psychology of Music, Psychology of the Rāgas, Spirit of Indian Music, Sāmagāna in post-Bharat Literature* etc. in Rhythm, Hindusthān Standard, Modern Review and other Periodicals and Journals).

92. RĀDHĀKRISHNA, SIR S. : *Indian Philosophy*, Vol. I (1940).

93. RĀGHAVAN, DR. V. :
(a) *The Number of Rasas* (Adyar Library, Madras, 1940).
(b) *Studies in Some Concepts of the Alaṁkāra-Śāstra* (Adyar Library, Madras, 1942).
(c) *Why is the Mridaṅga so called* (—The Journal of the Music Academy, Madras, Vol. XXIV).
(d) *Some Names in Early Sṅgīta-Literature* (—Journal of the Music Academy, Madras, Vol. III, 1932; Vol. IV, 1933).
(e) *An Outline Literary History of Indian Music* (—Journal of the Music Academy, Madras, Vol. XXII, 1952).
(f) *Some Early References to Musical Rāgas and Instruments* (—Journal of the Music Academy, Madras, Vol. XXIII, 1952).
(g) *The Indian Origin of the Violin* (—Journal of the Music Academy, Madras, Vol. XIX, 1948).
(h) *Kālidāsa-Hridayam : Music and Dance* (—Journal of the Music Academy, Madras, Vol. XXIV, Pts. i-iv).

94. RĀJĀ RAGHUNATH : *Saṅgita-Sudhā* (published by Music Academy, Madras).

95. RĀMACHANDRAN, N. S.: *Rāgas of Karnātic Music* (Madras, 1938).
96. RĀMACHANDRA, T. N.: *Nāgārjunakonda* (Memoirs of the Archaeological Survey of India, No. 77, 1938).
97. *Rāmāyaṇa* (of Vālmikī) with the Commentary of Rāma (Bombay, 1909).
98. RĀMĀMATYA, PANDIT: *Svaramelakalaānidhi* edited by Rāmaswāmi Āiyar (Ānnāmālāi University, 1932).
99. RAO, PROF. ĀPPĀ: *A Note in Musical Reference in the Laṅkāvatāra-Sūtra* (Journal of the Music Academy, Madras, Vol. XIV, (1945).
100. RĀO, T. V. SUBBĀ:
    (a) *The Rāgas of the Saṅngita-Sārāmrita* (—Journal of the Music Academy, Madras, Vol. XVI).
    (b) *A Plea for a Rational Interpretation of Saṅgīta-Sāstra* (Journal of the Music Academy, Madras, Vol. IX, 1938).
101. RAPSON, E. J.: *Ancient India* (Cambridge, 1914).
102. RHYS DAVIDS, MRS.: *Psalms of the Sisters.*
103. *Rigveda-Prātiśākhqa* (with the Commentary of Uvata), edited by Dr. Maṅgala Deva Śāstrī, Vol. II (Allahabad, 1931).
103A. ROWLAND, BENJAMIN: *The Art and Architecture of India* (published by the Penguin Books, 3rd Impression, 1952).
104. *Sacred Books of the East* (edited by Max Müller), Vol. XIV.
105. SAMADDĀR, DR. J. N.: *The Glories of Magadha* (Patnā, 1924).
106. SAṄKARAṆA, C. R. & B. CHAITANYA DEVA: *Postulational Methods and Indian Musicology* (appeared in the Journal of the University of Bombay, Vol. XVIII, pt. II, Sept. 1949).
107. SAṄKALIĀ: *The University of Nālandā.*
108. ŚĀSTRĪ: *Catalogue,* Vol. II.
109. ŚĀSTRĪ: MM. HARA PRASĀD: *History of India* (London, 1907).
110. SHĀMĀSASTRY, DR. R.: *Arthaśāstra* (of Kautilya), Mysore, 5th Ed., 1956.
111. *Silappadhikāraṁ*: Eng. Trans. by V. R. R Dīkṣit (Oxford, 1939).
112. SMITH, VINCENT:
    (a) *Asoka, the Buddhist Emperor of India* (2nd Ed., Oxford, 1909).
    (b) *A History of Fine Art in India and Ceylon* (Oxford, 1911).
    (c) *Early History of India* (3rd Ed., Oxford, 1914).
113. SOMANĀTH, PANDIT: *Rāgavibodha*: edited by Pt. Subrāhmanya Śāstrī (Adyar Library, Madras, 1945).
114. SONNERAT, M.: *Voyage aux Indes Orientals* (Paris, 1806).
115. SPEYAR, J. S.: *The Jātakamālā* by Ārya Sūra (Eng. Trans.) London, 1895.

১৪৬। 'বায়ুপুরাণ'—((১) আনন্দ-আশ্রম-সংস্করণ, বোম্বাই ; (২) পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন-সংপাদিত, বঙ্গবাসী-সংস্করণ, কলিকাতা' ১৩১৭)।

১৪৭। বাগচী, ডাঃ প্রবোধচন্দ্র : (ক) 'ভারত ও মধ্য-এশিয়া' (১৯০৬)।
(খ) 'ভারত ও চীন' (বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৭)।
(গ) 'ভারত ও ইন্দোচীন' (বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৭)।

১৪৮। 'বিশ্ববাণী'—পত্রিকা (শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ পরিচালিত, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫৭)।

১৪৯। ভোজরাজ : 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণম্' (বোম্বাই সং)।

১৫০। মতঙ্গ : 'বৃহদ্দেশী' (কে. সাম্ব শিবশাস্ত্রী সংপাদিত, ত্রিবান্দ্রম-সংস্করণ, ১৯২৮)।

১৫১। 'মনুসংহিতা' (বসুমতী সাহিত্য-মন্দির-সংস্করণ, কলিকাতা)।

১৫২। মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত : 'বাঘ ও অজন্তা' (রত্নসাগর-গ্রন্থমালা, কলিকাতা ১৩৬২)।

১৫৩। মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ : 'পদাবলী-পরিচয়' (কলিকাতা)।

১৫৪। 'যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা' (-বসুমতী সাহিত্য-মন্দির, কলিকাতা)।

১৫৫। শাস্ত্রী, পণ্ডিত সত্যচরণ : 'কালিদাসের গ্রন্থাবলী' (শ্রীরামপুর)।

১৫৬। সেন, রামদাস : 'ঐতিহাসিক-রহস্য' (বহরমপুর, ১২৮১)।

১৫৭। সেন, পণ্ডিত শ্রীক্ষিতিমোহন : 'ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্তসাধনা' (বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ, কলিকাতা)।

॥ চিত্র-পরিচয় ॥

রেখাচিত্র (চিত্র-পরিচয়) পৃ° ১—৪৪ মুদ্রিত করেছেন শ্রীপরমানন্দ সিংহ রায়, শ্রীকালী প্রেস, ৬৭, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯ এবং হাফটোন ছবি পৃ° ৪৫—৫২ মুদ্রিত করেছেন মেসার্স বেঙ্গল অটোটাইপ কোং, ২১৩, কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

॥ পূর্ব-পরিচিতি ॥

গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে 'মধ্য ও পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সঙ্গীত' আলোচনায় আমরা বিশেষ ক'রে কুচী, খোটান, চীন প্রভৃতি দেশ ও রাজ্যের শিল্প ও সঙ্গীত সংস্কৃতির কথা উল্লেখ করেছি। অপরাপর দেশ বা রাজ্যগুলির সঙ্গীত-উপাদান নিয়ে আলোচনা করিনি এ'জন্য যে, সেখানকার গিরিগুহা ও ভিত্তি-চিত্রগুলিতে সঙ্গীতসামগ্রী বা সঙ্গীতানুশীলনের নিদর্শন খুবই অল্প। আমরা চিত্রে তাদের কিছু কিছু নিদর্শন দেবার চেষ্টা করেছি। তাই পৃথকভাবে তাদের দীর্ঘ আলোচনা না করলেও চিত্রের পরিচয়প্রসঙ্গে তাদের সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা উচিত।

মধ্য ও পূর্ব-এশিয়ার জনপদ, নগর বা রাজ্যগুলির বেশীর ভাগ মরুভূমির উত্তর ও দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত। দক্ষিণদিকে কাশগর, চোক্কুক বা ইয়ারকন্দ, খোটান (খোতান ?); উত্তরদিকে মারালবাশি, কুচার, কাবাশর, তুর্ফান প্রভৃতি দেশ ও রাজ্য। পুরুষপুরের (বর্তমান পেশোয়ার) পর কুভা বা কাবুল-নদীর (এই কাবুলের প্রাচীন নাম 'কুভা' থেকে 'ককুভ' বা ককুভা রাগের সৃষ্টি কিনা কে বলতে পারে) ধার দিয়ে উত্তর-পশ্চিমে নগরহার ও পরে কপিশদেশে যাওয়া যেত। গান্ধারের চেয়ে কপিশ তখন বেশী সমৃদ্ধ ছিল। কপিশের পরেই শিল্প-সংস্কৃতিতে খোটান সমৃদ্ধ ছিল। অবশ্য গান্ধার, নগরহার, লম্পাক, উড্ডিয়ান অঞ্চলগুলির শিল্পসমৃদ্ধিও কম ছিল না। তবে এ'গুলি তখন কপিশরাজ্যের অধীনে ছিল।

তখন কপিশ একরকম ভারতবর্ষেরই সীমানাভুক্ত ছিল। কপিশে ছিল ১০০ শতেরও বেশী বৌদ্ধবিহার। ভারতের বৌদ্ধশ্রমণরাই সেখানে গিয়ে ভারতীয় শিক্ষা, সভ্যতা, ও শিল্প-সংস্কৃতির বিস্তার করেছিল। কপিশ থেকে তিনটি গিরিপথের যেকোনটি দিয়ে বাহ্লীকদেশে (ব্যাক্ট্রিয়া) যাওয়া যেত। দক্ষিণ-পশ্চিমের গিরিপথকে বলা হ'ত বামিয়েন। খৃষ্টীয় ৭ম শতকে বামিয়েনের চীনা নাম ছিল বাম-ইয়েন-না (বামিয়েন্ন) বা বাম-ইয়েন। কাবুল বা কুভা থেকে ঘোরবান্দ-নদীর ধার দিয়ে বামিয়েন যাবার পথ ছিল। কপিশের মতো বামিয়েন ছিল বিভিন্ন দেশীয় বণিকদের সংযোগ-স্থল ও কেন্দ্রস্থান। বামিয়েনের রাজধানীতে অসংখ্য বৌদ্ধবিহারে প্রায় সহস্রাধিক বৌদ্ধশ্রমণ বাস করত। তাদের মধ্যে দার্শনিক, চিত্রশিল্পী সঙ্গীতশিল্পী, ভাস্কর প্রভৃতিও ছিল। বিশেষ

ক'রে শিল্প-প্রতিভায় বৌদ্ধশ্রমণরা যথেষ্ট উন্নত ছিল। অজন্তা প্রভৃতি গুহা-চিত্রই তার প্রমাণ। বামিয়েনের বিহারবাসীরা ভারতের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ছিল। তাদের চিত্রে, বাস্তযন্ত্রে ও সঙ্গীতেও তাই ভারতীয় ভাবধারারই নিদর্শন পাওয়া যায়। ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিকরা বামিয়েনের লুপ্তকীর্তি উদ্ধার করেছিলেন। বামিয়েনের গুহামন্দিরগুলিতে শিল্পের নিদর্শন প্রচুর। আনুমানিক খৃষ্টীয় ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বামিয়েনের গুহামন্দিরগুলি নির্মিত হয়। প্রায় ঐ সময়ে ভারতে অজন্তা, মধ্য-এশিয়ায় কুচার, তুন্-হোয়াং প্রভৃতি স্থানেও বামিয়েন-গুহামন্দিরের অনুরূপ শিল্প-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। এ'সকল গুহামন্দিরের ভিত্তিচিত্রে সঙ্গীতের চাক্ষুষ নিদর্শন পাওয়া যায়। ডাঃ বাগচী বামিয়েনের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন: 'বামিয়েন ভারতীয় সভ্যতার খুব বড় কেন্দ্র ছিল। তার শিক্ষা, দীক্ষা, শিল্প, সাহিত্য সমস্তই ছিল ভারতীয় এবং ভারতীয় রাজবংশ সেখানে রাজত্ব করত'।

বামিয়েন থেকে হিন্দুকুশ অতিক্রম ক'রে বাহ্লীকদেশে যাওয়া যেত। খৃষ্টীয় ৩য়-৪র্থ শতাব্দীতে চীনা বৌদ্ধভিক্ষুরা সেখানে বসবাস করতেন। সমরকন্দ বা শূলিকদেশ, কাশনগর প্রভৃতি দেশে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। কাশনগর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কুন্-লুন্-পর্বতের শাখা-পর্বতশ্রেণী ছিল। সেখান থেকে খোটানের পথে চোক্কুক বা ইয়ারকন্দ যাওয়া যেত। ইয়ারকন্দ যাবার পথে যে নদী পাওয়া যেত তার প্রাচীন নাম ছিল 'সীতা' ও বর্তমান নাম কিজিল-দরিয়া। ভারতীয় সাহিত্যে সীতানদীর নাম উল্লেখ পাওয়া যায়। ইয়ারকন্দ কাশনগর অপেক্ষা সমৃদ্ধশালী রাজ্য ছিল। ইয়ারকন্দের ভিতর দিয়ে কিজিল-দরিয়া ও ইয়ারকন্দ-দরিয়া দু'টি নদী প্রবাহিত ছিল।

কাশনগর ও ইয়ারকন্দের পর খোটানের নাম উল্লেখযোগ্য। তবে কাশনগর ও ইয়ারকন্দ খোটান থেকেই তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভাব পেয়েছিল। খৃষ্টপূর্ব ২য় শতকের চীনাসাহিত্যে খোটানের নাম উল্লেখ আছে। খোটানে শক, শূলিক বা সুগ্দীয়, চীনা, প্রাচ্য-ইরাণীয় প্রভৃতি মিশ্রজাতির বাস ছিল। তাদের তখন ভারতীয় হিসাবেই কিন্তু গণ্য করা হ'ত। যোৎকান, রাওয়াক, দান্দান্-উইলিক, নিয়া প্রভৃতি দেশ খোটানের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল। খৃষ্টীয় ৩য় থেকে ৭ম-৮ম শতাব্দী পর্যন্ত নিয়া প্রভৃতি দেশগুলির অস্তিত্বের খবর পাওয়া যায়।

খোটানের রাজধানী ছিল যোৎকান। খোটানের কোমারি-মজর নামক

স্থানে গোমতী ও গোশৃঙ্গ নামে দু'টি বৌদ্ধবিহার ছিল। তাদের ধ্বংসস্তূপ থেকে ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতির বিচিত্র উপাদান আবিষ্কৃত হয়েছে। নিয়াদেশ খোটানের দক্ষিণবাহী পথের উপর অবস্থিত ছিল। খোটান থেকে নিয়া যাবার পথে দান্দান্-উইলিক স্থানেও ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। সেখানকার বৌদ্ধগুহাগুলিতে খৃষ্টিয় ৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দীর অনেক প্রাচীনচিত্র আবিষ্কৃত হ'য়েছে। তাতে ভারতীয় বীণা ও বেণুর মতো কতকগুলি বাদ্যযন্ত্রও পাওয়া গেছে। দান্দান্-উইলিকের গুহামন্দিরের প্রাচীরচিত্রের সঙ্গে বামিয়েনের গুহামন্দিরগুলির চিত্রের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। বিশেষ ক'রে নাগী ও বোধিসত্ত্বের চিত্রের অঙ্কনপদ্ধতি অজন্তার অঙ্কনপদ্ধতির সঙ্গে অনেকটা মেলে।

নিয়া থেকে তুন্-হোয়াং পর্যন্ত দক্ষিণবাহী পথের দু'ধারে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। তুন্-হোয়াং অঞ্চলের গিরিগুহাগুলি আকারে বৃহৎ ছিল। সেখানেও ৫০০ শতের অধিক গুহা ও প্রায় ৪০০ গুহাচিত্র ও ভাস্কর্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে আরবদের আক্রমণ হবার আগে পর্যন্ত তুন্-হোয়াং-এ বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তাদের শিল্প-সংস্কৃতির নিজস্বতা বেজায় রেখেছিল। ডাঃ বাগচী উল্লেখ করেছেন: 'আর্টের ইতিহাসে তুন-হোয়াং-এর গুহামন্দিরের স্থান অতুলনীয়। বহু বিভিন্ন ধারার সম্মিলনে যে কী চিত্তাকর্ষক চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের সৃষ্টি হ'তে পারে তার প্রমাণ তুন্-হোয়াং-এর গিরিগুহা এখনো বহন করছে'। তুন্-হোয়াং-এ সঙ্গীতানুশীলনের নিদর্শন-স্বরূপ কয়েকটি বাদ্যযন্ত্রের চিত্রও আবিষ্কৃত হয়েছে। ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে তাদের মিলও যথেষ্ট।

নিয়া থেকে তুন্-হোয়াং যেতে দক্ষিণবাহী পথের উপর তুখারজাতির দেশ ছন্নলন বা চেরচেন্, লব-নোর (লবণহ্রদ) প্রভৃতি অবস্থিত। ছন্নলন থেকে আরো দক্ষিণে শেন্-শেন্ (প্রাচীন চীনানাম ল্যু-লান) স্থানে ভারতীয় ও গ্রীসীয় সভ্যতা-দু'টির সংমিশ্রন ঘটেছিল বলে মনে হয়। 'শেন্-শেনের কাছে মিরাণ-অঞ্চলেও বৌদ্ধকীর্তির নিদর্শন পাওয়া গেছে। মিরাণের শিল্প-সংস্কৃতির অভ্যুদয় হয় খৃষ্টীয় ৮ম-৯ম শতাব্দীতে। তাছাড়া কাশগর থেকে তরুফের পথে মারালবাশির কাছে তুমচুক নামক স্থানেও ভারতীয় শিল্প-নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায়। কুচীয় শিল্প-সংস্কৃতির ভিতর সঙ্গীতানুশীলনের স্থান মধ্য-এশিয়ার দেশগুলির শীর্ষস্থানে ছিল। কুচীয় শিল্পীদের সঙ্গীতপ্রীতি ও সঙ্গীত-প্রতিভার কথা পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি। চিত্রে উপরিউক্ত দেশগুলির বাদ্যযন্ত্রে নিদর্শনের সঙ্গে

সঙ্গে বাজাকুলিক, কিজিল, রাশিয়ায় মুমারা, আফগানিস্তানে হাড্ডা, সিংহলে পোলোনেরুয়া, কম্বোজ, এঙ্কোরভাট, চম্পা, বরবুদুর, ময়ূরভঞ্জে খিচিঙ্, কাশ্মীর, সাতনা, বাচান, ইজিপ্ট, গ্রীস, চ্যালদিয়, এছাড়া তক্ষশীলা, সাঁচী, বারহুত, অজন্তা, বাগ, ভুবনেশ্বর, বেলুর (দক্ষিণ-ভারত) হালেবিডি (হায়দারাবাদ) পম্বাই, মহাবলীপুরম্, বাগালি-কালেশ্বর, দেবালনা, তাঞ্জোর, আইহোল, গুজরাট, পরশু-রামেশ্বর, পায়োইয়া, বাঙ্গালা, মথুরা প্রভৃতি অঞ্চলের নৃত্য ও বাদ্যযন্ত্রের চিত্রও সন্নিবেশিত হয়েছে। তাতে ক'রে ভারতীয় সঙ্গীত-সংস্কৃতির প্রসারতা ও সমৃদ্ধির সৌন্দর্য এবং মান বোঝা যাবে। একই বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ ও নৃত্যছন্দ ভিন্ন ভিন্ন দেশের পরিবেশে ও বিভিন্ন জাতির রুচি অনুযায়ী কিভাবে গঠনে ও বিকাশে বিচিত্র হ'তে পারে তার চাক্ষুষ নিদর্শনও আমাদের কাছে প্রতিভাত হবে। বিদেশী বাদ্যযন্ত্রে ভারতের প্রভাবও লক্ষ্য করার বিষয়। ভিন্ন ভিন্ন যুগের প্রস্তরচিত্র, ভিত্তিচিত্র, তাম্রমুদ্রা, শিলালেখমালা ও তাম্রলিপিই ইতিহাসের প্রাণশক্তি সঞ্চার করে। তারাই আসলে প্রতিটি যুগের শিক্ষা, সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য। তাই মসীর তুলিকায় বাস্তব কথাকাহিনীর আলেখ্য রচনা করলেও বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সময়ের চিত্র, মূর্তি ও উৎকীর্ণ লেখমালার নিদর্শন সন্নিবেশিত হ'ল ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক আলোচনাকে প্রত্যক্ষতা ও প্রামাণিকতার আলোকে সমুজ্জ্বল করার জন্য।

বেশীরভাগ চিত্রের পাশে ইংরাজী নামও দেওয়া হয়েছে বাঙ্গলাভাষাভাষী যাঁরা নন তাঁদের বোঝার সুবিধার জন্য। নীচে বাঙ্গালা নাম দেওয়া হ'ল প্রত্যেকটি ছবির তারিখ ও প্রাপ্তিস্থানের মোটামুটি পরিচয় দিয়ে। ছবিগুলিকে একটি ধারায় সাজানো হয়েছে: যেমন প্রথমেই নাট্য ও পরে শুষির, তত, অনবদ্ধ ও নৃত্য এই পর্যায়ের চিত্র দিয়ে। ভারতীয় চিত্রের পাশাপাশি কতকগুলি বৈদেশিক বাদ্য-যন্ত্রের চিত্রও সন্নিবেশিত হ'ল তুলনামূলক অনুশীলনের জন্য। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, খৃষ্টপূর্ব থেকে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর সমাজেরই কেবল নৃত্য, গীত, বাদ্য ও অভিনয়েরই নিদর্শন-চিত্র সন্নিবেশিত হয়নি। ঐ যুগপরিধির সাঙ্গীতিক উপাদানে আলোকপাত করার জন্য খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর পরেকার যুগের (খৃষ্টীয় ১৫শ-১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত) কিছু কিছু বাদ্যযন্ত্রেরও নিদর্শন দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে প্রাচীন ভারতের রাগ হিসাবে পরিচিত মালবকৌশিক ও ককুভ এই দু'টি ছাড়াও মধ্যযুগীয় রাগ বসন্ত ও গৌড়মল্লারের ছবি দেওয়া হ'ল। গৌড়মল্লার-রাগটি বাঙ্গলাদেশের অবদান ব'লে মনে হয়।

॥ চিত্র-পরিচয় ॥

১। **পৃষ্ঠা ১ ॥** (১) অজন্তাচিত্রে (খৃষ্টপূর্ব ২য়—খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী) অভিনয়মঞ্চ ও নেপথ্যগৃহ। (২) সীতাবেঙ্গা-গুহা-রঙ্গপীঠ। মধ্যপ্রদেশ। খৃষ্টপূর্ব ২য় শতক।

২। **পৃষ্ঠা ২ ॥**

উপরে—রোমনগরীর গৌরবস্মৃতি ফ্লেবিয়ান-এম্পিথিয়েটারের নক্সা। বামদিকে রঙ্গমঞ্চের ভিত্তি ও দক্ষিণদিকে দর্শকদের জন্য আসনের প্রতিকৃতি।

নীচে—অরেঞ্জে (রোম) অবস্থিত অশেষ সৌন্দর্যমণ্ডিত রঙ্গমঞ্চের নক্সা। অরেঞ্জ ফান্সের দক্ষিণে রোমীয় গৌরবকীর্তি। এর দর্শকগৃহটি ৩৪০ × ১১৬ ফিট পরিমাপের ছিল। মাননীয় মিডিল্টন উল্লেখ করেছেন পোম্পিয়াইয়ের রঙ্গালয়টি নাকি ৫৪ খৃষ্টপূর্বাব্দে পাথরে তৈরী ছিল।—'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' (উত্তরভাগ), পৃ° ৩৩৫ দ্রষ্টব্য।

৩। **পৃষ্ঠা ৩ ॥**

মুনি ভরতের নাট্যশাস্ত্রে (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) উল্লিখিত চতুরস্র, বিকৃষ্ট ও ও ত্র্যস্র এই তিন রকম আকারের নাট্যমণ্ডপের নক্সা।—'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' (উত্তরভাগ), পৃ° ৩২৯-৩৩১ দ্রষ্টব্য।

৪। **পৃষ্ঠা ৪ ॥**

মৌর্য ও গুপ্তযুগে রাজপ্রাসাদের নক্সা ('মানসার' থেকে গৃহীত)। সেই যুগের প্রত্যেকটি রাজপ্রাসাদে সঙ্গীতশালা ও নাট্যশালা অপরিহার্য-রূপে থাকত। রাজপ্রাসাদের দ্বিতীয় বেষ্টনীর মাঝখানে সঙ্গীতশালা ও প্রথম বেষ্টনীর দক্ষিণ কোণে নাট্যশালা থাকত। আমরা কুমারগুপ্তের সময়ে রাজপ্রাসাদ ও নাট্য-গৃহের উল্লেখ করেছি।—'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' (উত্তরভাগ), পৃ° ৪২৯ দ্রষ্টব্য।

৫। **পৃষ্ঠা ৫ ॥**

পদ্মাসন বা পদ্মসিংহাসন ('মানসার' থেকে গৃহীত)। খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাজসিংহাসনগুলি বিভিন্ন আকারে বিভিন্ন ধাতুদ্রব্য দিয়ে তৈরী হ'ত আর প্রত্যেকটি ভিত্তিতে নৃত্য-গীতের নিদর্শন থাকত। ৫ম পৃষ্ঠার চিত্রটিতে পণব ও মৃদঙ্গজাতীয় চর্মবাদ্য ও নৃত্যের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ আছে।

৬। পৃষ্ঠা ৬ ॥

শুষিরবাদ্যের নিদর্শন। ১ম চিত্র—সাঁচী (খৃষ্টপূর্ব ২য়—১ম শতক)। ২য় চিত্র—অমরাবতী (খৃষ্টীয় ২য়-৩য় শতাব্দী) 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি', (উত্তরভাগ), পৃ° ২০৫ দ্রষ্টব্য। ৩য় চিত্র—বারহুত (খৃষ্টপূর্ব ২য় শতক) এবং ৪র্থ চিত্র—কাথিয়াওয়াড় (খৃ° ১৩শ শতাব্দী)। সুঘোষ-শঙ্খ।

৭। পৃষ্ঠা ৭ ॥

শুষিরবাদ্য: ১ম চিত্র—বাঙ্গালাদেশ (৯ম-১০ম শতাব্দী)। ২য় চিত্র—অমরাবতী (খৃষ্টীয় ২য়-৩য় শতাব্দী)। ৩য় চিত্র—দেবালানা (জৈনমন্দির, প্রাচীর-চিত্র) খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দী। ৪র্থ চিত্র—গুজরাটের (জৈন) ১৬শ-১৭শ শতাব্দী। গুর্জরদেশ বেণু বা বাঁশী। ৫ম চিত্র—শঙ্খ।

৮। পৃষ্ঠা ৮ ॥

শুষিরবাদ্য: ১ম চিত্র—কম্বোজ (খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ-১৩শ শতাব্দী)। ২য় চিত্র—এঙ্কোরভাট (খৃ° ১০ম শতাব্দী)। ৩য় চিত্র—গোমুখ-শঙ্খ। ৪র্থ—বারৃতক-শঙ্খ এবং ৫ম—অনন্তবিজয়-শঙ্খ।

৯। পৃষ্ঠা ৯ ॥

১ম চিত্র—গ্রীস (খৃষ্টপূর্ব ২৭০০-২৫০০)। ২য় চিত্র—হাড্ডা (আফগানিস্তান), খৃষ্টীয় ৫ম-৬ম শতাব্দী। ৩য় চিত্র—এঙ্কোরভাট (খৃষ্টীয় ১২ম শতাব্দী)।

১০। পৃষ্ঠা ১০ ॥

১ম চিত্র—বেণুবাদিনী, অজন্তা (খৃষ্টপূর্ব ২য় শতক থেকে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত)। ২য় চিত্র—শিঙ্গা।

১১। পৃষ্ঠা ১১ ॥

ততযন্ত্র: বৃন্দবাদ্য ও নৃত্য—বারহুত (খৃষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দী)। ২য় চিত্র—প্রাচীন আকারের বীণা—বারহুত।

১২। পৃষ্ঠা ১২ ॥

১ম চিত্র—বীণাবাদনরত মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত (খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী)। সমুদ্রগুপ্ত—

'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' (উত্তরভাগ), পৃ° ৩৯৪-৩৯৫ দ্রষ্টব্য। ২য় চিত্র—প্রাচীন বীণা—অমরাবতী (খৃষ্টীয় ২য়-৩য় শতাব্দী)।

১৩। **পৃষ্ঠা ১৩ ॥**

১ম চিত্র—প্রাচীন বীণা (পাশ্চাত্য হার্পজাতীয়) গান্ধার (খৃষ্টীয় ১ম-২য় শতাব্দী)। ২য় চিত্র—একটি হার্পজাতীয় বীণা ও অপরটি স্বরোদজাতীয় বীণা (দু'টিই বীণাশ্রেণীর বাদ্যযন্ত্র)—চীন।

১৪। **পৃষ্ঠা ১৪ ॥**

১ম চিত্র—বীণা, বরবুদুর (খৃ° ৮ম শতাব্দী))। ২য় চিত্র—বীণা, এঙ্কোর-টোম্ (১২শ-১৩শ শতাব্দী)। ৩য় চিত্র—বীণা, বর্মা (২য়—৮ম শতাব্দী)। ৪র্থ চিত্র—বীণা, কম্বোজ (খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ-১৩শ শতাব্দী)। ৫ম চিত্র—বর্মা।

১৫। **পৃষ্ঠা ১৫ ॥**

১ম চিত্র—বীণাহস্তে যুগলমূর্তি, কিজিল (তুর্কান, মধ্য-এশিয়া, খৃ° ৬ষ্ঠ শতাব্দী)। ২য় চিত্র—বীণা, কিজিল (তুর্ফান, মধ্য-এশিয়া)। ৩য় চিত্র—বীণা (উর, চ্যালডিয়া)। ৪র্থ চিত্র—হার্পজাতীয় বীণা, মিশর (প্রাচীন রাজত্ব, খৃষ্টপূর্ব ৪০০০ (?)।

১৬। **পৃষ্ঠা ১৬ ॥**

১ম চিত্র—হার্পজাতীয় বীণা, মিশর। ২য় চিত্র—সুমেরীয় (খৃষ্টপূর্ব ৩২০০)। ৩য় চিত্র—হার্পজাতীয় বীণা, ফিন্ল্যাণ্ড এবং ৪র্থ চিত্র—বীণা, জর্জিয়া (রুশ)

১৭। **পৃষ্ঠা ১৭ ॥**

১ম চিত্র—শোভাযাত্রায় বীণা, বেণু ও নৃত্য, অমরাবতী (খৃষ্টীয় ২য়-৩য় শতাব্দী)। ২য় চিত্র—বীণা, অজন্তা (খৃষ্টপূর্ব ২য়-খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী)।

১৮। **পৃষ্ঠা ১৮ ॥**

১ম চিত্র—বীণা, গান্ধার (খৃষ্টীয় ১ম-২য় শতাব্দী)। ২য় চিত্র—বীণা, অমরাবতী। ৩য় চিত্র—বীণা, নাগার্জুনকুণ্ড (খৃ° ২য়—৩য় শতাব্দী)। ৪র্থ চিত্র—বীণা, সাতনা (খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী)।

১৯। **পৃষ্ঠা ১৯ ॥**

১ম চিত্র—বীণা, চীন। ২য় চিত্র—বীণা, বাজাক্লিক্, কিজিল (তুর্ফান, মধ্য-এশিয়া) (খৃ° ৬ষ্ঠ শতাব্দী)। ৩য় চিত্র—বীণা, যোৎকান, খোটান (খৃষ্টপূর্ব ২য় শতক—খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দী) স্যর অরেল ষ্টাইন যোৎকানের বালুস্তূপ থেকে এই বীণাবাদ্যবর বানরের মূর্তি পেয়েছিলেন। ৪র্থ চিত্র—বীণা, বাজাক্লিক্, কিজিল (তুর্ফান, মধ্য-এশিয়া)।

২০। **পৃষ্ঠা ২০**

১ম চিত্র—বীণা, স্থমারা (রাশিয়া—মধ্য-এশিয়া, খৃষ্টীয় ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দী)। ২য় চিত্র—বীণা, বরবুদুর (খৃ° ৮ম শতাব্দী)। এবং ৩য় চিত্র—বীণা, চম্পা (খৃষ্টীয় ১ম-২য় থেকে ১৩শ শতাব্দী)।

২১। **পৃষ্ঠা ২১ ॥**

১ম চিত্র—বীণা, মহাবলীপুরম্ (খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী)। ২য় চিত্র—বীণা, বাগালি-কালেশ্বর, খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দী, বাঙ্গালা। ৩য় চিত্র—বীণা, রঙ্পুর, বাঙ্গালা (পালযুগ, খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দী)। ৪র্থ চিত্র—বীণা, অজন্তা।

২২। **পৃষ্ঠা ২২ ॥**

১ম চিত্র—পোলানেরুয়া (সিংহল, ৭ম শতাব্দী)। ২য় চিত্র—বীণা, চম্পা (খৃষ্টীয় ১ম-২য়—১৩শ শতাব্দী)। ৩য় চিত্র—বীণা, এঙ্কোর-ভাট। ৪র্থ চিত্র—বীণা, মাদাগাস্কার।

২৩। **পৃষ্ঠা ২৩ ॥**

১ম চিত্র—বীণা, পাহাড়পুর, খৃ° ৮ম শতাব্দী। ২য় চিত্র—বীণা, অনুরাধাপুর, সিংহল (২য়-৩য় শতাব্দী)। ৩য় চিত্র—বীণা, বরবুদুর (৮ম শতাব্দী)। ৪র্থ—সম্ভবত বীণা জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের কাণ্ড (খোটানের বালুস্তূপ থেকে অরেল ষ্টাইন এই বাদ্যযন্ত্রের অংশটি আবিষ্কার করেছেন); সম্ভবত খৃষ্টীয় ৩য়-৮ম শতাব্দী। ৫ম চিত্র—একতন্ত্রীকা, বাঙ্গালাদেশ।

২৪। **পৃষ্ঠা ২৪ ॥**

অবনদ্ধযন্ত্র : ১ম চিত্র—দু'জন বাদক বর্তমান ঢাকজাতীয় মৃদঙ্গ বহন ক'রে বাজাচ্ছে। অমরাবতী (খৃষ্টীয় ২য়-৩য় শতাব্দী)। ২য় চিত্র—দু'টি বড় মৃদঙ্গ-জাতীয় অবনদ্ধযন্ত্র, পম্বাই (দক্ষিণ-ভারত), খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দী। ৩য় চিত্র—দু'টি পুষ্করবাদ্য পাশাপাশি রেখে একজন বাদক হস্তের দ্বারা বাজাচ্ছে। অমরাবতী। ৪র্থ চিত্র—একজন বাদক দু'টি পুষ্কর পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে ও একটি শায়িত অবস্থায় রেখে হস্তের দ্বারা বাজাচ্ছে। বারহুত (খৃষ্টপূর্ব ২য় শতক)।—'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' (উত্তরভাগ), পৃ° ৩০৪-৩০৫ দ্রষ্টব্য।

২৫। **পৃষ্ঠা ২৫ ॥**

অবনদ্ধ : ১ম চিত্র—তিনটি পুষ্কর : দু'টি দাঁড়করানো ও একটি শায়িত অবস্থায়। একজন বাদক দুই হাতে বাজাচ্ছে। বরবুদুর (৮ম শতাব্দী)। ২য় চিত্র—একটি মৃদঙ্গ, কম্বোজ (খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ—১৩শ শতাব্দী)। মৃদঙ্গটি দেখতে বর্তমান কালের মাদলের মতো। ৩য় চিত্র—দু'টি পুষ্কর একজন বাদক বাজাচ্ছে। পাহাড়পুর (খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দী)।

২৬। **পৃষ্ঠা ২৬ ॥**

অবনদ্ধ : ১ম চিত্র—পণবজাতীয় মৃদঙ্গ বা পণব, বেলুর (দক্ষিণ-ভারত, আনুমানিক খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দী)। ২য় চিত্র—মৃদঙ্গ, বারহুত। ৩য় চিত্র—মৃদঙ্গ, তাঞ্জোর (চোলবংশের রাজত্বকালে ভিত্তিচিত্র, খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দী)। ৪র্থ চিত্র—মৃদঙ্গ, বাচানজাতীয় বাদ্য দক্ষিণ-ভারত, খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দী। কথাকলিনৃত্যে সাধারণত এই বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

২৭। **পৃষ্ঠা ২৭ ॥**

বাগগুহা চিত্র। বৃন্দবাদ্য ও নৃত্য। এখানে কাঠবাদ্য হস্তমুদ্রা লক্ষ্য করার বিষয়। খৃষ্টীয় ৪র্থ থেকে ৬ষ্ঠ শতাব্দী।

২৮। **পৃষ্ঠা ২৮ ॥**

১ম চিত্র—মৃদঙ্গ, কাশ্মীর (খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী)। ২য় চিত্র—মৃদঙ্গ, কিজিল (তুর্ফান, মধ্য-এশিয়া, ৬ষ্ঠ শতাব্দী)। ৩য় চিত্র—পণবজাতীয় মৃদঙ্গ, সাসানিয় যুগ (পারস্য)। ৪র্থ চিত্র—বামিয়েন (খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম শতাব্দী)।

২৯। পৃষ্ঠা ২৯ ॥

১ম চিত্র—মৃদঙ্গ, সাঁচী (খৃষ্টপূর্ব ২য়-১ম শতক)। ২য় চিত্র—মৃদঙ্গ, বারহুত (খৃষ্টপূর্ব ২য় শতক)। ৩য় চিত্র—মৃদঙ্গ, গান্ধার (খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী?) এবং ৪র্থ চিত্র—মৃদঙ্গ, অমরাবতী, (খৃষ্টীয় ২য়-৩য় শতাব্দী)।

৩০। পৃষ্ঠা ৩০ ॥

১ম চিত্র—মৃদঙ্গ, হালেবিড (হায়দারাবাদ), খৃষ্টীয় ৯ম—১২শ শতাব্দী। ২য় চিত্র—মৃদঙ্গ, হালেবিড। ৩য় চিত্র—মৃদঙ্গ, খিচিং (ময়ূরভঞ্জ, ১০ম শতাব্দী)। ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ পর পর তিনটি মৃদঙ্গ: ৪র্থ—সাঁচী, (খৃষ্টপূর্ব ২য়-১ম শতক), ৫ম—মথুরা (৪র্থ শতাব্দী) ও ৬ষ্ঠ—রাজপুতনা ও বাঙ্গালা (১৭শ শতাব্দী?)—ঢাক জাতীয় চর্মবাদ্য।

৩১। পৃষ্ঠা ৩১ ॥

অবনদ্ধ: ১ম চিত্র—মথুরা (৪র্থ শতাব্দী), ২য় চিত্র—বারহুত (খৃষ্টপূর্ব ২য় শতক)। ৩য় চিত্র—বরবুদুর (৮ম শতাব্দী) এবং চতুর্থ চিত্র—পাহাড়পুর (খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দী)। দু'টি ঘটবাদ্যজাতীয় অবনদ্ধ, একজন বাদক দু'হাত দিয়ে বাজাচ্ছে।

৩২। পৃষ্ঠা ৩২ ॥

ঘনবাদ্য ॥ ১ম চিত্র—অজন্তা (খঞ্জনী)। ২য় চিত্র—আইহোল (হায়দারাবাদ, ১৩শ শতাব্দী)। ৩য় চিত্র—তাঞ্জোর (চোল-ভিত্তিচিত্র, খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দী) ৪র্থ চিত্র—অমরাবতী।

৩৩ পৃষ্ঠা ৩৩ ॥

নৃত্য ॥ ১ম চিত্র—বাগগুহায় বৃন্দবাদ্য ও নৃত্য। পূর্বেও এর সম্পূর্ণ চিত্রটি দেওয়া হয়েছে। পৃথক ক'রে কাঠবাদ্যটি দেখাবার জন্য পুনরায় দেওয়া হ'ল। ২য় চিত্র—পাহাড়পুর। ৩য় চিত্র—খঞ্জনী, এক্কোর-ভাট।

৩৪। পৃষ্ঠা ৩৪ ॥

১ম চিত্র—বিজয়াভিযানে সঙ্গীতরত গন্ধর্বকুল। অজন্তা, গুহা নং ১৭। খৃষ্টপূর্ব ২য় শতক থেকে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী। ২য় চিত্র। সিদ্ধার্থ বীণাশিক্ষা করছেন, গান্ধার, খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী।

৩৫। **পৃষ্ঠা ৩৫ ॥**

পাঠশালায় শিক্ষারত সিদ্ধার্থ। উপরে স্বরোদের মতো বীণা ঝোলানো আছে। অজন্তা-ভিত্তিচিত্র থেকে আঁকা—'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' (উত্তরভাগ), পৃ° ১৯৬-১৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩৬। **পৃষ্ঠা ৩৬ ॥**

বৃন্দবাদ্য। অজন্তা। মৃদঙ্গ ও মন্দিরা, খৃষ্টপূর্ব ২য় শতক—খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী।

৩৭ **পৃষ্ঠা ৩৭ ॥**

তক্ষশীলার ভীরমণ্ডের ধ্বংসস্তূপ থেকে আবিষ্কৃত উর্ধতাণ্ডবমূর্তি। 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' (উত্তরভাগ), পৃ° ৩১৯-৩২° দ্রষ্টব্য। ৩য় চিত্র—তাঞ্জোরে ও ৪র্থ চিত্র—চিদাম্বরম্‌মন্দিরে উর্ধতাণ্ডবমূর্তি।

৩৮। **পৃষ্ঠা ৩৮ ॥**

নৃত্য ॥ ১ম চিত্র—বৃন্দবাদ্য ও নটীনৃত্য। পাইয়োইয়া (গোয়ালিয়র), খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর (?)। বৃন্দবাদ্যে বীণা (দু'রকম: ১ম—স্বরোদ বা স্বরবীণা-জাতীয় বীণা ও হার্পজাতীয় বীণা), বেণী, দু'টি পুষ্কর প্রভৃতির সমাবেশ আছে। ২য় চিত্র—ঘুঙুর, গান্ধার। ৩য় চিত্র—নুপুর।

৩৯ **পৃষ্ঠা ৩৯ ॥**

নব রসের রেখাচিত্র। অঙ্কন করেছেন আচার্য শ্রীনন্দলাল বসু (শান্তিনিকেতন);

৪০। **পৃষ্ঠা ৪০।**

হস্তমুদ্রা (১২টি)। পরিচয় চিত্রের সঙ্গে দেওয়া আছে।

৪১। **পৃষ্ঠা ৪১ ॥**

করণ ॥ ১ম চিত্র—নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত নৃত্যের বৃশ্চিককরণম্‌ ও ২য় চিত্র—ললাটতিলকম্‌।—'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' (উত্তরভাগ), পৃ° ৩১৭ দ্রষ্টব্য।

৪২। **পৃষ্ঠা ৪২ ॥**

১ম চিত্র—নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত বৈশাখরেচিতকরণম্।

২য় চিত্র— „ „ ললিতকরণম্।

—'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' (উত্তর ভাগ), পৃ° ২১৬ ৩১৭ দ্রষ্টব্য।

৪৩। **পৃষ্ঠা ৪৩ ॥**

১ম চিত্র—তলপুষ্পপুটম্ „

২য় চিত্র—গঙ্গাবতরণম্ (নাট্যশাস্ত্র)

৪৪। **পৃষ্ঠা ৪৪ ॥**

১ম চিত্র—বারহুত—নর-পিরামিডমূর্তি। খৃষ্টপূর্ব ৩য়-২য় শতক।—'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' (উত্তর-ভাগ), পৃ° ১২৫-১৩০ দ্রষ্টব্য। ২য় চিত্র—বেলুরের (হায়দারাবাদ) নৃত্যমূর্তি। চল্লিশটি মদনকৈ-মূর্তির অন্যতম নৃত্যশীলা দেবীমূর্তি (বহিৰ্প্ৰাচীর-গাত্রে উৎকীর্ণ)। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দী।

৪৫। **পৃষ্ঠা ৪৫ ॥**

১ম চিত্র—বৃন্দবাদ্য (ভুবনেশ্বর)—বেণু, বীণা, পুষ্কর ও নৃত্যের সমাবেশ। আনুমানিক খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দী। ২য় চিত্র—বৃন্দবাদ্য (ভুবনেশ্বর)—জানালার উপরে দু'টি প্যানেলে উৎকীর্ণ : বাঁশী, মৃদঙ্গ ও নৃত্য।

৪৬। **পৃষ্ঠা ৪৬ ॥**

১ম চিত্র—বৃন্দবাদ্য, আলমপুর (হায়দারাবাদ), আনুমাণিক ৯ম শতাব্দী। চিত্রটিতে বাঁশী, বীণা দু'টি পুষ্কর, নন্দী (বৃষ) ও নটরাজনৃত্যের প্রতিকৃতি সমুজ্জল। বামে গণপতি বীণাবাদ্যরত। তাঁর দক্ষিণে একজন নর্তক করণ প্রদর্শন ক'র দণ্ডায়মান। ২য় চিত্র—প্রথমটির দ্বিতীয় অংশ।

৪৭। **পৃষ্ঠা ৪৭ ॥**

১ম চিত্র—নৃত্যশিব ও পুষ্করবাদ্য (ভুবনেশ্বর)। দক্ষিণে গণেশ ও বামে পুষ্কর-বাদক।—'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' (উত্তরভাগ), পৃ° ৩০৭ দ্রষ্টব্য। ২য় চিত্র—নৃত্য-সরস্বতী, হালেবিড-মন্দিরের একটি মূর্তি। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ।

৪৮। **পৃষ্ঠা ৪৮ ॥**

১ম চিত্র—স্তম্ভশীর্ষে মদনকৈ (নর্তকীমূর্তি), বেলুর, মহীশূর (হায়দারাবাদ), খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দী। ২য় চিত্র—নৃত্যভৈরব, কোনার্ক (খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দী)।

৪৯। **পৃষ্ঠা ৪৯ ॥**

১ম চিত্র—মৃদঙ্গ (কোনার্ক) এবং ২য় চিত্র—মৃদঙ্গ (কোনার্ক)।

৫০। **পৃষ্ঠা ৫০ ॥**

১ম চিত্র—বেণুবাদিনী (কোনার্ক)।
২য় চিত্র—মন্দিরা (কোনার্ক)।

৫১। **পৃষ্ঠা ৫১ ॥**

১ম চিত্র—রাগ মালবকৌশিক। রাজস্থানী চিত্র (খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর মাঝামাঝি)। এ'টি প্রাচীন রাগ। মতঙ্গের (খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম শতাব্দী) বৃহদ্দেশীতে এর উল্লেখ আছে।

২য় চিত্র—রাগ বসন্ত। রাজস্থানী (খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর মাঝামাঝি)। এ'টি মধ্যযুগীয় রাগ। বসন্তঋতুর সঙ্গে সম্পর্কিত।—'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' (পূর্বভাগ) এবং 'রাগ ও রূপ' গ্রন্থ-দু'টিতে আরো দু'টি ভিন্ন রকমের বসন্তরাগের চিত্র সংযুক্ত আছে।

৫২। **পৃষ্ঠা ৫২ ॥**

১ম চিত্র—রাগ গৌড়মল্লার। পিছনে বীণা, মৃদঙ্গ ও করতালির সমাবেশ। সঙ্গীতের সুরে ময়ূর ও হরিণ নৃত্যশীল। রাজস্থানী (১৬শ শতাব্দীর মাঝামাঝি)। এটি মধ্যযুগের শেষের দিকের রাগ। প্রাচীন বাঙ্গালার রাজধানী গৌড়দেশের সঙ্গে এ'টি সম্পর্কিত। অনেকে মল্লারের শ্রেণী হিসাবে এই রাগটিকে বাঙ্গালাদেশের অবদান বলেন।

২য় চিত্র—রাগ ককুভা বা ককুভ। রাজস্থানী চিত্র হলেও এতে মোগল-প্রভাব আছে। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীতে অঙ্কিত মনে হয়।

॥ প্রচ্ছদপট-চিত্র-পরিচয় ॥

হায়দারাবাদ-রাজ্যে রামপ্প-মন্দিরে (পালম্পেট, দক্ষিণ-ভারত) কৃষ্ণপ্রস্তরের নর্তকীমূর্তি (খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দী)। কাকতীয়রাজ গণপতি খৃষ্টীয় ১২১৩ শতাব্দীতে পালম্পেটে রামপ্প-মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। এ'টি ভারতীয় নৃত্যছন্দের অঙ্গসৌষ্ঠব, পূর্ণ শ্রেষ্ঠ নৃত্যশীলা নটীমূর্তির অন্যতম।

[শেষের হাফটোন ছবিগুলির মধ্যে অধিকাংশ অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার বসু মহাশয়ের দান। বীণাবাদিনী সুরসুন্দরীর ছবি দিয়ে সাহায্য করেছেন ব্রহ্মচারী সদানন্দ এবং রেখাচিত্রগুলি সমস্তই অঙ্কন করেছেন প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়। ভরতের নির্দেশিত নাট্যমণ্ডপ ও হস্তমুদ্রাগুলি অঙ্কন করেছেন শিল্পী শ্রীবরেণ নিয়োগী এবং অপূর্ব রস-চিত্র অঙ্কন করেছেন শ্রদ্ধেয় আচার্য শ্রীনন্দলাল বসু (শান্তিনিকেতন)]

। তারিখগুলি সমস্তই আনুমানিক ।
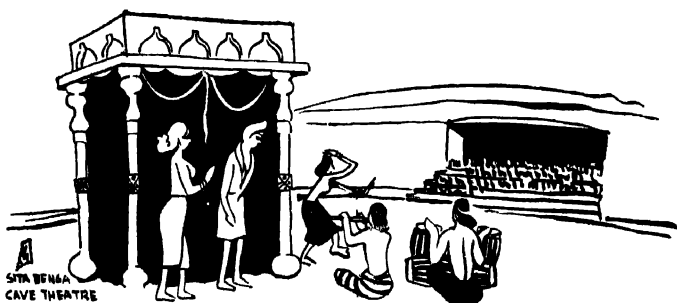
উপরে—অজন্তাচিত্রে অভিনয়মঞ্চ ও নেপথ্যগৃহ
নীচে—সীতাবেঙা-গুহা রঙ্গপীঠ
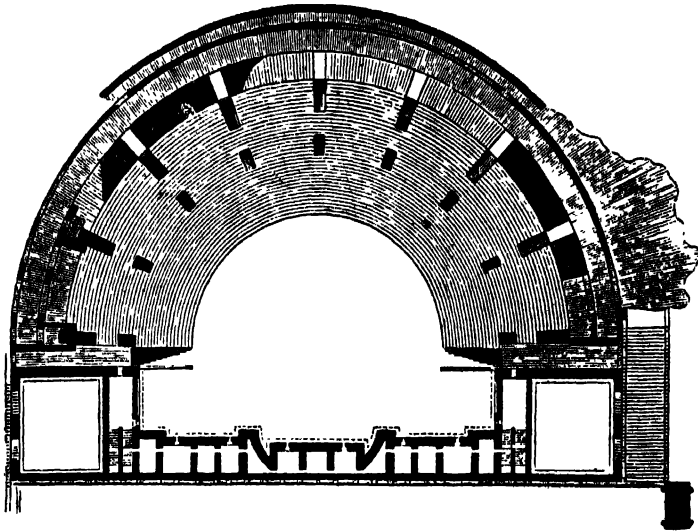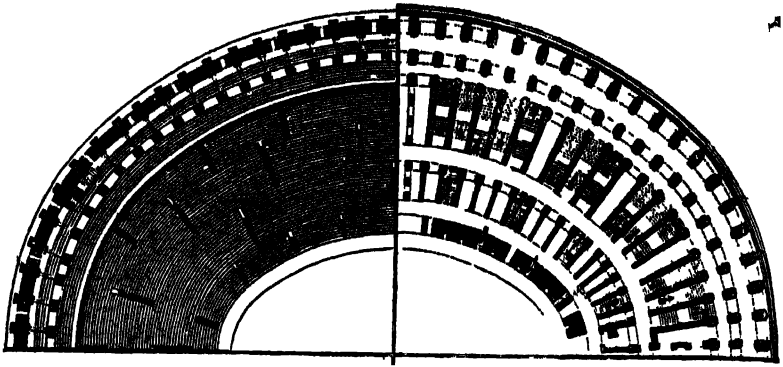
উপরে
ফ্লেবিয়ান এম্পি-থিয়েটার,
বামে—ভিত্তিগৃহ
দক্ষিণে—বসিবার আসন

নীচে
অরেঞ্জ থিয়েটারের নক্সা

ভরতের মতে নাট্যমণ্ড

প্রাচীন রাজপ্রাসাদের নক্সা (মানসার)

মধ্যে-দক্ষিণ-পার্শ্বে—নৃত্যশাল নিম্নে দক্ষিণ-পার্শ্বে নাট্যশালা

পদ্ম সিংহাসন (মানসার)

শুষিরবাদ্য

সাঁচী,
অমরাবতী

বারহুত,
কাথিয়াবাড়,
সুঘোষ-শঙ্খ

শুষিরবাদ্য
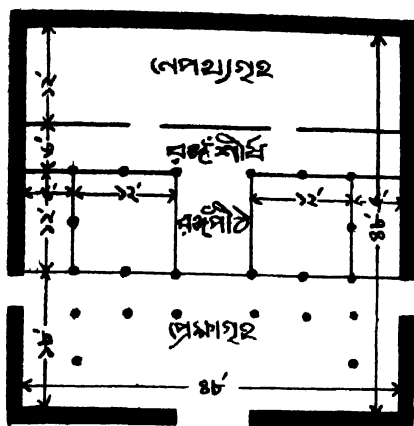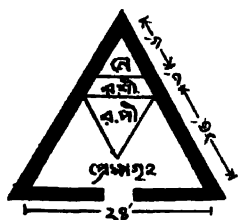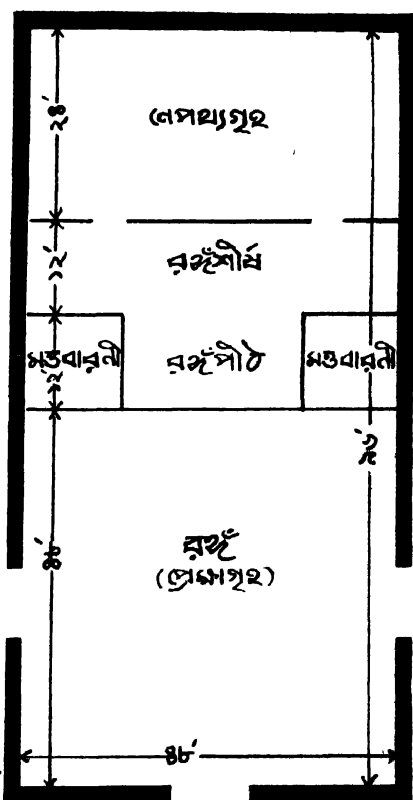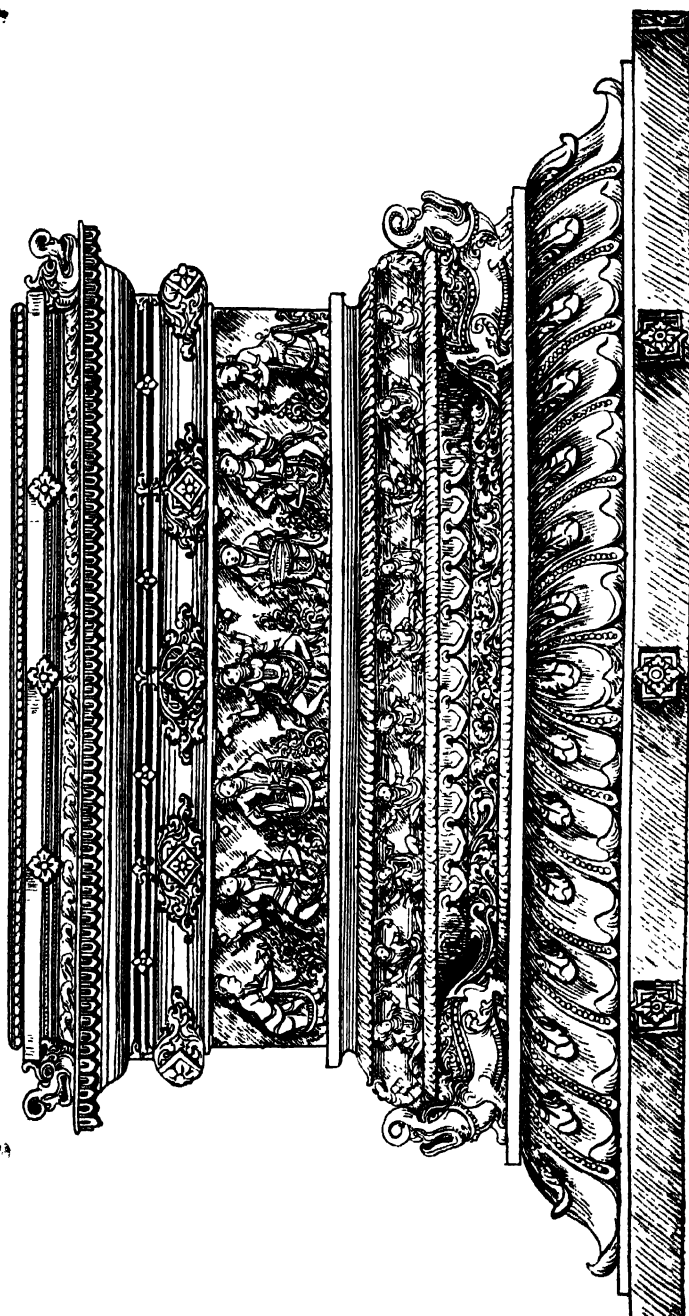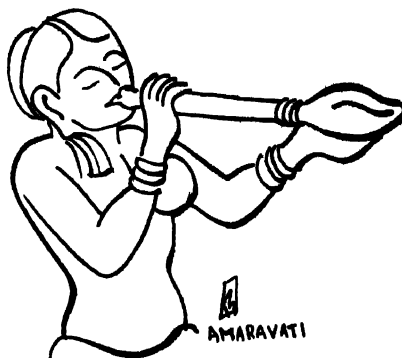
অমরাবতী, দেবালানা,
বাঙলা, গুজরাট, শঙ্খ

CAMBODGE

ANGKORVAT

GO-MUKHA

শুষিরবাদ্য
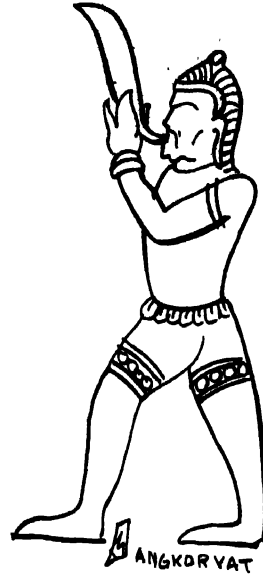
কম্বোজ, এঙ্কোর-ভাট,
গোমুখ, বারতক, অনন্তবিজয়-শঙ্খ

শুষিরবাদ্য
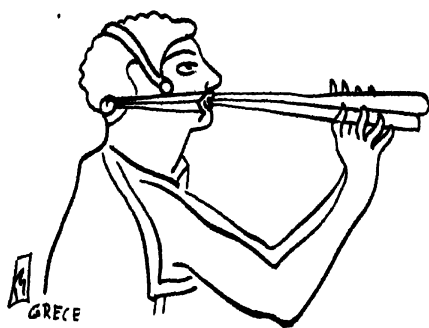
গ্রীস, আফগানিস্তান, এঙ্কোর-ভাট

শুষিরবাদ্য

বেণু - অজন্তা, শিঙ্গা

তত্‍যন্ত্র

বারহুত

ততযন্ত্র

বীণাবাদ্যরত সমুদ্রগুপ্ত ; বীণা—অমরাবতী

ততযন্ত্র

গান্ধার, চীন

তত্যন্ত্র

বরবুদুর, এঙ্কোর-থম্, কম্বোজ, ব্রহ্মদেশ

তত্যন্ত্র

তুর্ফান, কিজিল, উর, মিশর
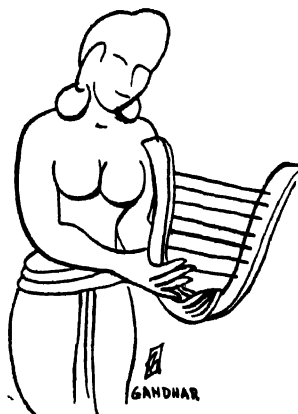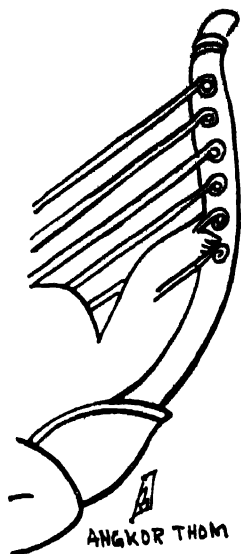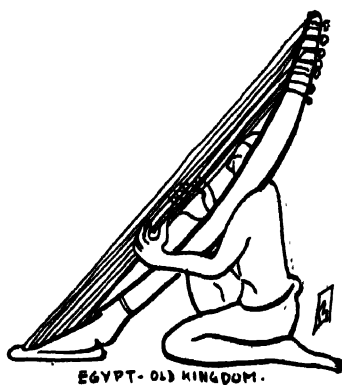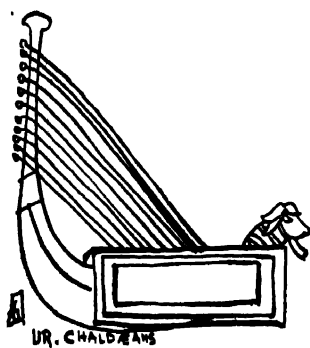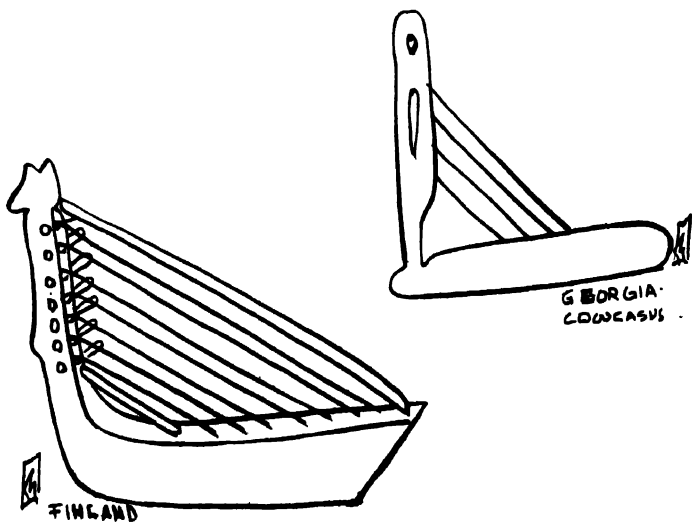
ততযন্ত্র

মিশর, সুমেরীয়, ফিনল্যাণ্ড, রুশ

ততযন্ত্র

উপরে—অমরাবতী

নীচে—অজন্তা
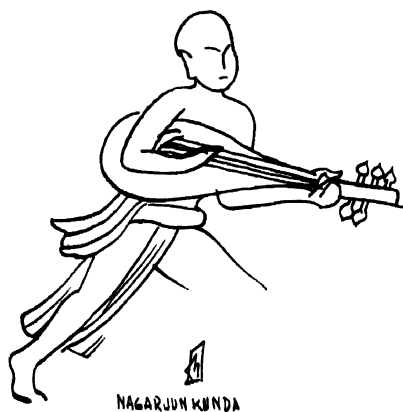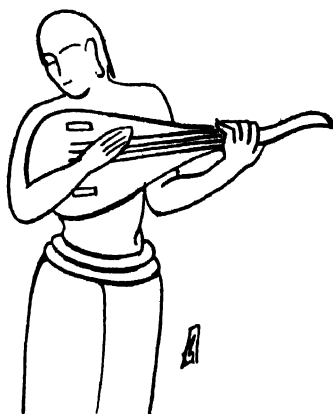
ততযন্ত্র

উপরে গান্ধার ও অমরাবতী,

নীচে— নাগার্জুনকুণ্ড ও সাতনা

তত্ত্বযন্ত্র

উপরে চীন ও বাজাক্‌লিক (তুর্ফান)

নীচে—যোৎকান (খোটান) ও কিজিল (তুর্ফান)
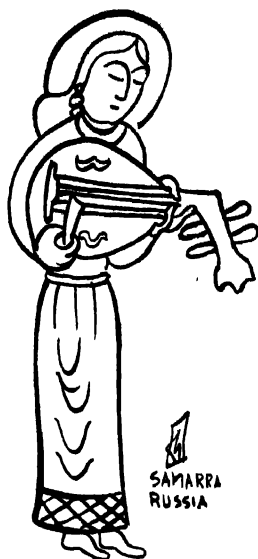
ততযন্ত্র

উপরে—রাশিয়া

নীচে—বরবুদুর ও চম্পা.

ততযন্ত্র

উপরে— মহাবলীপুরম্ ও বাগালি-কালেশ্বর

নীচে—রঙপুর (বাঙলা) ও অজন্তা

ততযন্ত্র
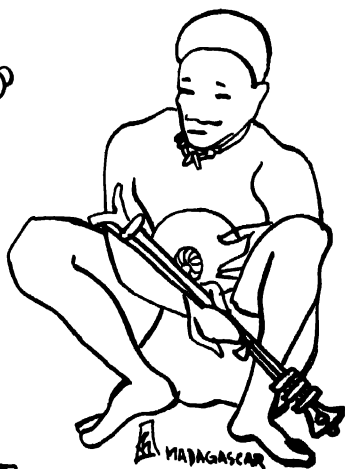
উপরে—পোলানেরুয়া (সিংহল) ও চম্পা

নীচে—এঙ্কোর-ভাট ও মাদাগাস্কার

তত্যন্ত্র
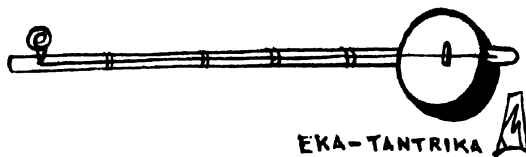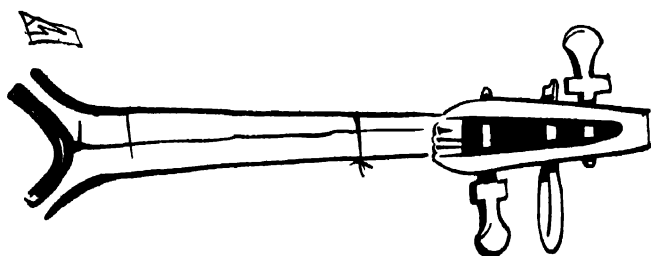
পাহাড়পুর, সিংহল, বরবুদুর,
খোটান, একতন্ত্রবীণা
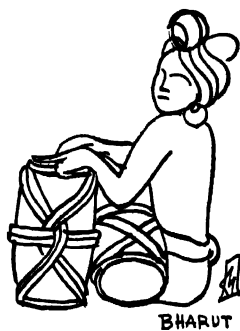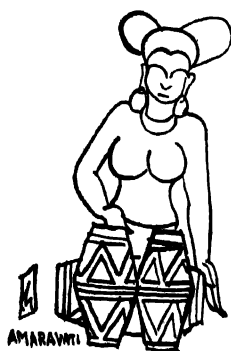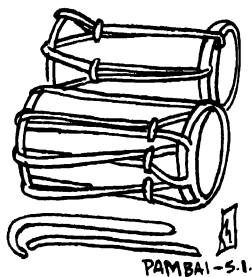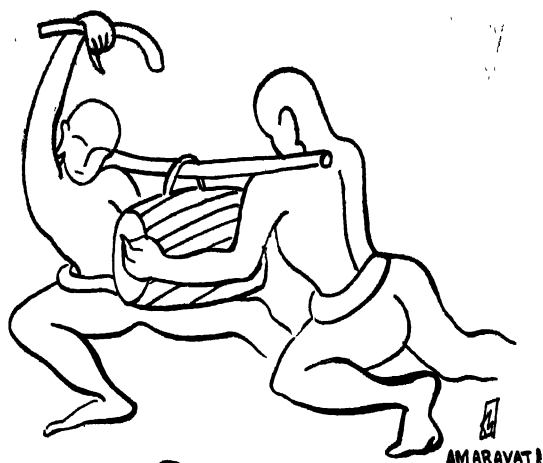
অবনদ্ধ

উপরে—অমরাবতী ও পম্বাই (দক্ষিণ-ভারত)

নীচে—অমরাবতী ও বারহুত

অবনদ্ধ

উপরে — বরবুদুর ও কম্বোজ

নীচে — পাহাড়পুর
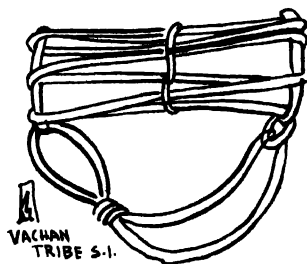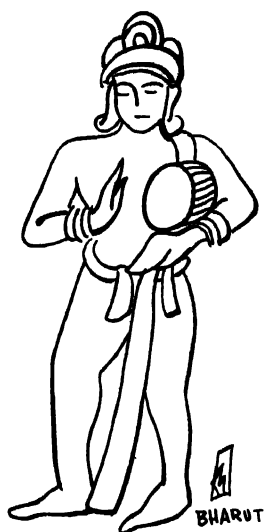
অবনদ্ধ

উপরে—বেলুর, (দক্ষিণ-ভারত) ও বারহুত,

নীচে—তাঞ্জোর, (চোলচিত্র) ও বাচান (দক্ষিণ-ভারত)

বৃন্দবাদ্য ও নৃত্য (বাগগুহা)

অবনদ্ধ

উপরে—সাঁচী ও বারহুত

নীচে—গান্ধার ও অমরাবতী
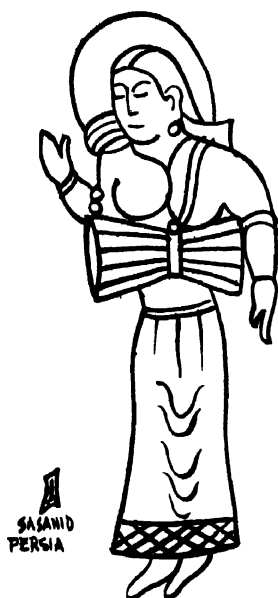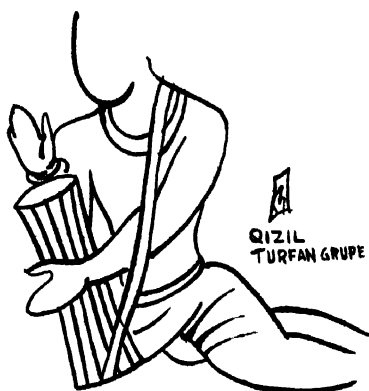
অবনদ্ধ

উপরে—কাশ্মীর ও কিজিল (তুর্ফান)
নীচে—সাসানিয়া (পারস্য) ও বামিয়েন

অবনদ্ধ
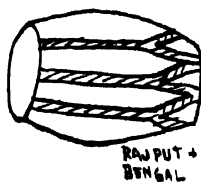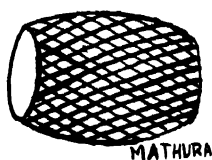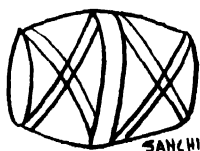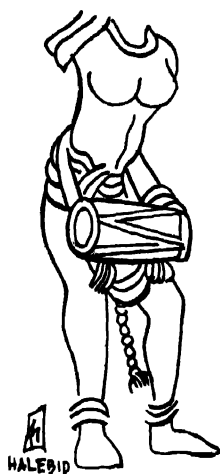
হালেবিড, খিচিঙ্ (ময়ুরভঞ্জ) সাঁচী, মথুরা, রাজপুতনা, বাঙলা
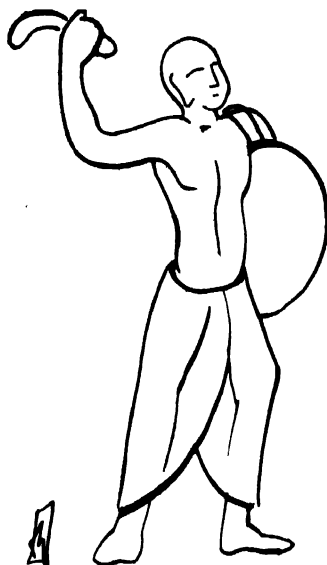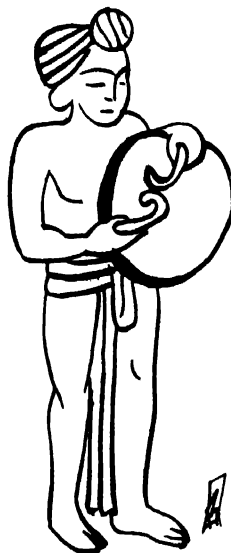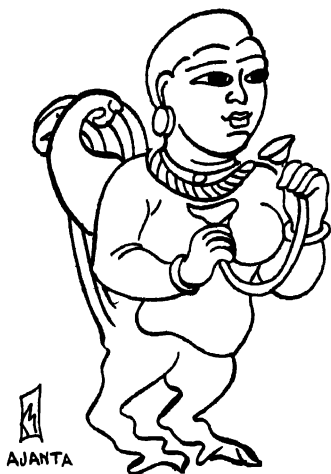
অনবদ্ধ

উপরে—মথুরা ও বারহুত

নীচে -বরবুদুর ও পাহাড়পুর

ঘনবাদ্য
অজন্তা, আইহোল
তাঞ্জোর, অমরাবতী,
করতাল

বৃন্দবাদ্য
(ভুবনেশ্বর)

বৃন্দবাদ্য ও নৃত্য
(ভুবনেশ্বর)

বৃন্দবাদ্য ও নৃত্য (হায়দ্রাবাদ)

নৃত্যশিব
ও
পুষ্করবাদ্য
ভুবনেশ্বর

নৃত্য-সরস্বতী
(হালেবিড়)

নৃত্য ভৈরব (কোনার্ক)

মদনকৈ (বেলুর)

মুরজ (কোনার্ক)

মন্দিরা
(কোনার্ক)

বেণুবাদিনী
(কোনার্ক)

রাগ বসন্ত

রাগ মালবকৌশিক

রাগ ককুভ

রাগ গৌড়
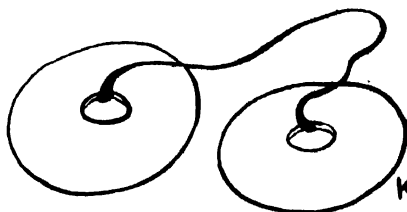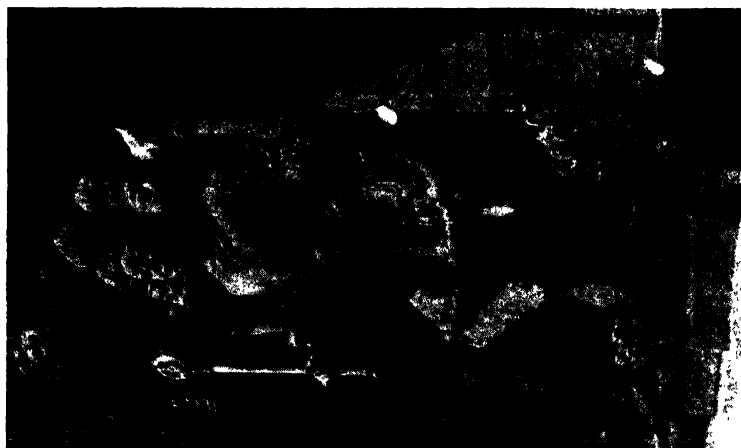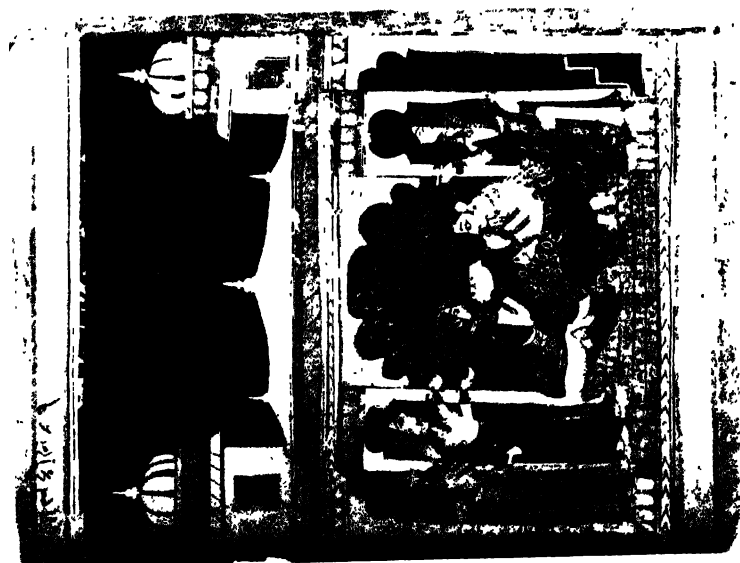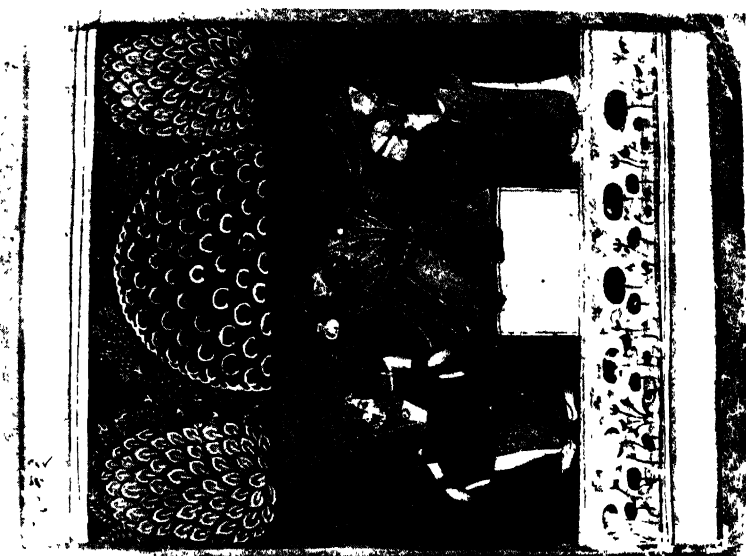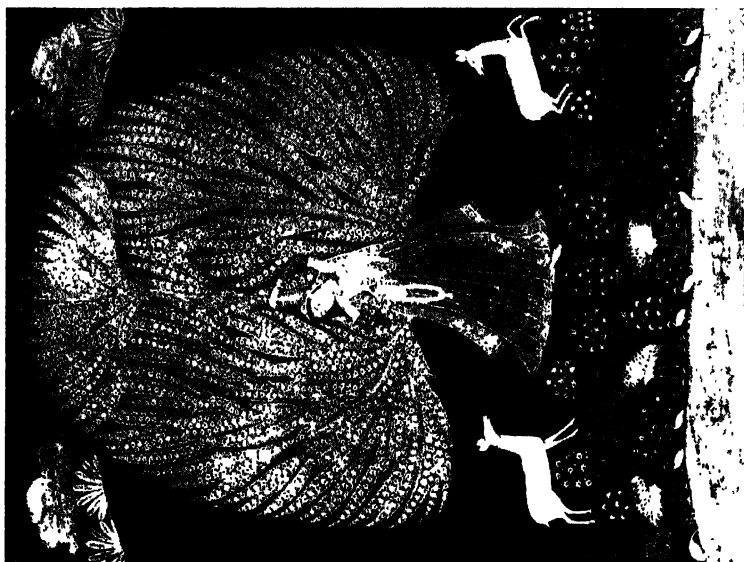
সঙ্গীত ও সংস্কৃতি

(পূর্বভাগ—বৈদিকযুগ)

॥ কয়েকটি অভিমত ও সমালোচনা ॥

॥ অভিমত ॥

1. " * * I have been very much impressed by the wide extent of your reading of the history of music in the various countries, * * you have presented the whole thing in a most readable form. Your book is quite a successful one, I should say, because, although the subject is highly technical, your way of presenting it makes it attractive and easy of understanding." (*The 19th August, 1953*)—Dr. Suniti Kumar Chatterji, Chairman, The Bengal Legislative Council.
2. "The book appears to be the result of your untiring search for truth from the sources themselves and their masterly exposition. Please allow me to congratulate you on the successful production of an authoritative book in support of India's claims for proving the fountainhead of Music and particularly the songs, to the world." (*The 10th November, 1953*)—Dr. S. Dutta, the Registrar, Calcutta University.

॥ সমালোচনা ॥

1. *Sunday Amrita Bazar Patrika,* May 10, 1953:

"The colossal volume is only the first part of a detailed history of Indian music. * * The name of Swâmijî needs no fresh introduction to the scholars and music-lovers of the country. The stamp of his genius, as well as his deep study of musical theories are already there in his famous book 'Râga O Rūpa', as well as his many illuminating articles on music. They show very clearly and indisputedly his mastery over the subject and his profound study and understanding of the scriptures. * * *

We again congratulate the author and the publisher for the serious publication of these volumes of profound knowledge of Indian Music previously unexplored."—Kumar Śrī Birendra Kishore Roy-Choudhury of Gauripur.

2. *The Indo-Asian Culture,* Delhi, Vol. II, No. 1, July, 1953:

"This book constitutes the first volume of a History of Indian Music. It deals with all references to matters concerning music in literary works dating from the earliest times and also illustrates the matter by reproducing musical scenes as depicted in ancient sculpture and painting."

3. *The Prabuddha Bharata*, May, 1953:

"*Sangit O Samskriti* is the First Volume of a comprehensive history of Indian music, written in Bengali by Swâmi Prajñânânanda, a pioneer writer in the field of Indian music and the author of *Râga O Rūpa*, * *. His works are not only valuable studies of the artistic and scientific aspects of music but also a contribution to Bengali literature as such. The book under review may be said to be the first result of a strenous research which he has begun in the sphere of the history of Indian music. This volume embodies a systematic and thorough discussion of the musical developments in the Vedic, Prâtiśākhya and Śīkṣâ periods. This discussion, elaborate as it is, is supported by quotations from and references in the Vedas, Prâtiśākhyas, Śīkṣās and other treatises on music. * *

The book carries some coloured plates, many illustrations and jacket-cover design from the eminent artist Dr. Nandalâl Bose. * * The author deserves the gratitude of all music lovers for his elaborate and scholarly study of the abstruse subject-matter, into which—vast though it is—he has put much of his knowledge and effort in order to bring out a new and masterly exposition."—M. Mitra.

4. **'প্রবাসী', ১৩৬০**

"স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাঁর 'রাগ ও রূপ' গ্রন্থে আভাস দিয়েছিলেন যে ভারতীয় সঙ্গীতের আনুপূর্বিক ইতিহাস প্রকাশে তিনি ব্রতী হয়েছেন। সে ইতিহাসের প্রথম খণ্ড পাঠ ক'রে প্রত্যেকে স্বীকার করবেন যে কি অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনায় তিনি এই ইতিহাস রূপায়িত করেছেন। ভারতীয় সঙ্গীতের পটভূমিকার প্রথম অধ্যায় রচনা ক'রে তিনি তুলনামূলক পদ্ধতিতে ভারতের সঙ্গে ভারতেতর দেশে সাঙ্গীতিক যোগাযোগ বিষয়েও গভীর আলোচনা তুলেছেন। এ' ধরণের আলোচনা একমাত্র ফরাসী ভাষায় সাঙ্গীতিক বিশ্বকোষ (Encyclopedia of Music) প্রকাশিত হয়েছে।

* * এই সব দুষ্প্রাপ্য ও দুর্বোধ্য গ্রন্থাদি মন্থন ক'রে প্রজ্ঞানানন্দজী যে অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেছেন সে'টি বহুকাল আমাদের অনুপ্রাণিত করবে। * * গ্রন্থখানিতে বিচিত্র বাদ্যযন্ত্র, রাগ-রাগিণীর চিত্র ও ছন্দোবদ্ধ মুদ্রার চিত্র সন্নিবেশিত ক'রে গ্রন্থের উপযোগিতা বর্দ্ধিত করেছেন। আমরা তাঁর দ্বিতীয় খণ্ড পঠনের আশায় উন্মুখ হ'য়ে আছি এবং আশা করি স্বামিজী সুস্থ শরীরে ভারতীয় সঙ্গীতের এই বিরাট বিশ্বকোষ সুসম্পন্ন ক'রে যাবেন।

—ডাঃ শ্রীকান্তি

5. **'দেশ' (১৯শে বৈশাখ, ১৩৬০ সাল):**

"দুঃখের বিষয়, ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এ'যাবৎ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ইতিহাস রচনার কোন চেষ্টাই হয় নি। * * এই কারণে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের

মতো পণ্ডিত ব্যক্তি যখন বাংলাভাষায় একখানি পূর্ণাঙ্গ সঙ্গীতেতিহাস রচনায় হাত দিয়েছেন তখন আমরা এই ভেবে আশান্বিত হয়েছি যে, এতদিন পরে বাঙালীর সঙ্গীত-সাধনার অন্যতম প্রধান অন্তরায়, তথা বাঙলা-সাহিত্যের এক-দিককার এক শোচনীয় দৈন্য দূর হ'তে চলেছে। এই বিরাট, দুরূহ এবং অসমসাহসিকতাপূর্ণ কার্যে হস্তক্ষেপ করার জন্য স্বামিজীকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাছি। * * *

* * বিভিন্ন বৈদিক ও লৌকিক কর্মে বিভিন্ন ধরণের সঙ্গীতের উপযোগ সম্বন্ধে স্বামিজীর লেখা পড়ে আমরা অনেক বিচিত্র, কৌতূহলোদ্দীপক এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ের সন্ধান পেয়েছি। এ' লাভ সামান্য নয়, আর এইটুকু লাভের জন্যই আমরা স্বামিজীর অনন্যসাধারণ পরিশ্রমকে সার্থক মনে করতে পারি। * *"

—শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, সঙ্গীতশাস্ত্রী

6. 'যুগান্তর', ১২।৭।৫৩ ঃ

"এই অনন্যসাধারণ গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের জন্য আমরা প্রথমেই প্রজ্ঞানানন্দ স্বামিজীকে অভিনন্দন জানাইতেছি। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস রচনার মতো সুকঠিন কার্যে অগ্রসর হইতে গিয়া যে বিপুল গ্রন্থরাজি হইতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অসংখ্য তথ্যের সংগ্রহে তাঁহাকে মন দিতে হইয়াছে এবং অধিকাংশ স্থলে প্রাচীন গ্রন্থ-রচনার সময়-নির্দেশে বহুজনের বহু মতানৈক্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইয়াছে, এমনকি অনেকস্থলে পরস্পরবিরোধী টীকা ও ব্যাখ্যার মধ্যে মূল-রচনার প্রকৃত মর্মের জন্য ধৈর্য ও পরিশ্রম সহকারে অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে, সেই সকল কথা বিবেচনা করিলে বলিতে হয়, সঙ্গীতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং অনুরক্তি আছে বলিয়াই এই জাতীয় গ্রন্থ-রচনার উপযোগী শক্তি আর উদ্যম স্বামিজীর পক্ষে লাভ করা সম্ভবপর হইয়াছে।

* * কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস রচনার পক্ষে সে সকল গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নাই সেই সব গ্রন্থের সাহায্যে এমন কোন কথা বলা চলে না যা স্বামিজী বলেন নাই। এইখানেই তাঁহার কৃতিত্ব। * * প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অনেক মনীষী ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে অনেক কথা বলিয়াছেন। সেই সব কথার সবগুলিই যে যুক্তিসহ নয়, স্বামিজী তাহা দেখাইয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের যুক্তিপূর্ণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। * অভিমতের মধ্যে আমরা এমন সব তথ্যের সন্ধান পাই যা অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিরও ধারণার অতীত। * * *

একদিকে যেমন গ্রন্থখানিকে যথেষ্ট মূল্যবান করিয়াছেন, অপরদিকে বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ অভাব পূরণে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে।

আমাদের যতদূর জানা আছে, বাংলাভাষায় ভারতীয় সঙ্গীতের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস-রচনার এই গ্রন্থই প্রথম উদ্যমের চিহ্নস্বরূপ।

7. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০শে শ্রাবণ ১৩৬০ (৯ই আগষ্ট ১৯৫৩, রবিবার):

"* * সঙ্গীতের আর একটি প্রধান দিক হইল উহার ইতিহাসের বিচার। * * স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ এ'জাতীয় আলোচনায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন এবং এ'খ্যাতি তাঁহার সর্বাংশে প্রাপ্য। যে পাণ্ডিত্য, অধ্যয়ননিষ্ঠা ও শ্রমশীলতা থাকিলে ঐতিহাসিক আলোচনায় সাফল্যের সহিত অবতীর্ণ হওয়া চলে স্বামিজীর মধ্যে উক্ত ত্রিবিধ গুণ প্রভূত পরিমাণে আছে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতপ্রীতি ও স্বাভাবিক জ্ঞানানুশীলনের অভ্যাস তাঁহার মানসিক গঠনের ভিতর একত্র বিধৃত হইয়া তাঁহাকে সঙ্গীতের ইতিহাস আলোচনার ন্যায় কঠিন কার্যের একান্ত যোগ্যপাত্রে পরিণত করিয়াছে। ভারতীয় প্রাচীন সঙ্গীতের ইতিহাস আলোচনায় পুরাজ্ঞান অপরিহার্য। এই জ্ঞান স্বামিজীর ভিতর কিঞ্চিৎ প্রয়োজনাতিরিক্ত রূপেই আছে। বস্তুতঃ জায়গায় জায়গায় তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান তাঁহার সাঙ্গীতিক জ্ঞানকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইতিহাসের ক্ষেত্রে স্বামিজীর বহু দিনের অধ্যয়ন, গবেষণা ও চিন্তনের ফল তাঁহার 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' গ্রন্থটিতে নিপুণভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বাংলায় এ'জাতীয় গ্রন্থ ইতিপূর্বে রচিত হয় নাই বলিয়াই আমাদের ধারণা।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-কৃত 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি'-র আলোচ্য বিষয় অতি বিশাল ও ব্যাপক। * * গ্রন্থকার একটি দুরূহ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তবে আলোচ্য গ্রন্থে তাঁহার গভীর জ্ঞান ও সঙ্গীতপ্রীতি ও অধ্যবসায়ের পরিচয় পাইয়াছি। * * বেদ-চতুষ্টয়, সংহিতা, আরণ্যক, উপনিষৎ, প্রাতিশাখ্য, বিভিন্ন শিক্ষাগ্রন্থ ও প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্র প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি এই গ্রন্থে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনায় তাঁহার পাণ্ডিত্য ও অধ্যয়নের ব্যাপ্তির অজস্র প্রমাণ মেলে। * * 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' একটি প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থ। ইহাতে ভারতীয় বৈদিক সঙ্গীতের বিষয় যে বিপুল তথ্যের সমাবেশ ঘটানো হইয়াছে তাহাতে তথ্যনিষ্ঠ সঙ্গীতামোদী ব্যক্তির নিকটে ইহা অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। ইতিহাসকার, ইতিহাসের ছাত্র, শিল্পতত্ত্বসন্ধানী, শিল্পী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর সংস্কৃতিপ্রিয় ব্যক্তি গ্রন্থটির সবিশেষ সমাদরে আগ্রহান্বিত হইবেন সন্দেহ নাই।